অনুবাদকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد -

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সম্যধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে 'পনের পারার সূরা কাহফ থেকে বিশ পারার শেষ পর্যন্ত' [৪র্থ খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ৪র্থ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মাযহারী সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

লেখক ও সম্পাদক

ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

সূচিপত্র

الجزء السادس عشر : ষষ্ঠদশ পারা

[৯৯-২৭৮]

বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء العشرون : বিংশতিতম পারা
[৭৩১ – ৮৬০]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. اَلْحَمْدُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتٌ لِلّٰهِ وَهَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ لِلْاِيْمَانِ بِهٖ اَوِالثَّنَاءُ بِهٖ اَوْ هُمَا اِحْتِمَالَاتٌ اَفْيَدُهَا الثَّالِثُ اَلَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ اَیْ فِيْهِ عِوَجًا ـ اِخْتِلَافًا وَتَنَاقُضًا وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْكِتَابِ ـ

٢. قَيِّمًا مُسْتَقِيْمًا حَالٌ ثَانِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِيُنْذِرَ يُخَوِّفَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِيْنَ بَأْسًا عَذَابًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ـ

٣. مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ـ هُوَ الْجَنَّةُ ـ

٤. وَيُنْذِرَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ـ

অনুবাদ :

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। হামদ বলা হয় সিফাতে কামালিয়া বর্ণনা করাকে। জুমলায়ে খবরিয়া বা সংবাদমূলক বাক্য ব্যবহার করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি হামদ সাব্যস্তের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের সংবাদ দেওয়া, নাকি প্রশংসা করা উদ্দেশ্য, নাকি উভয়টিই উদ্দেশ্য? মোট তিন ধরনের সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনাটি অধিকতর উপকারী। যিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর কিতাব আল-কুরআন এবং তাতে রাখেননি কোনো প্রকার বক্রতা অর্থাৎ শাব্দিক বিরোধ ও অভিব্যক্তির দিক দিয়ে ত্রুটি। আর لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ বাক্যটি اَلْكِتٰبَ থেকে حَالٌ হয়েছে।

২. একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সরল قَيِّمًا শব্দটি كِتَابٌ থেকে حَالٌ ثَانِيَةٌ এবং جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ -এর তাকীদ। সতর্ক করার জন্য যাতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে কিতাবের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। এবং মু'মিনগণ যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

৩. যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী আর উত্তম পুরস্কারটি হলো জান্নাত।

৪. এবং সতর্ক করার জন্য কাফের দলের মধ্যে ঐ কাফেরদেরকে, যারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٥. مَا لَهُمْ بِهِ بِهٰذَا الْقَوْلِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَائِهِمْ ط مِنْ قَبْلِهِمُ الْقَائِلِيْنَ لَهُ كَبُرَتْ عَظُمَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ط كَلِمَةً تَمْيِيْزٌ مُفَسِّرَةٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوْفٌ اَىْ مَقَالَتُهُمُ الْمَذْكُوْرَةُ اِنْ مَا يَقُوْلُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ اِلَّا مَقُوْلًا كَذِبًا .

অনুবাদ :

৫. তাদের কোনো জ্ঞান নেই এ বিষয়ে এই কথার এবং তাদের পিতৃ পুরুষদেরও ছিল না যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তারাও সে কথার প্রবক্তা ছিল। কি সাংঘাতিক মন্দ তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য كَلِمَةً শব্দটি تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যা كَبُرَتْ -এর মধ্যস্থিত উহ্য যমীর বা সর্বনামের ব্যাখ্যা করছে। আর এখানে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো তাদের উক্তি- اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا তারা তো কেবলই মিথ্যা বলে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عِوَجًا : عِوَجًا শব্দটির عَيْن বর্ণে যের হলে অর্থ হবে فَسَادٌ فِى الْمَعَانِىْ তথা অর্থের দুর্বোধ্যতা, অর্থ বিকৃত হওয়া, অর্থ নষ্ট হওয়া। আর عَيْن বর্ণে যবর হলে অর্থ হবে فَسَادٌ فِى الْاَجْسَامِ তথা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়া, বিকৃত হওয়া, অকেজো হওয়া। অর্থাৎ عَوَجٌ হলো এমন বক্রতা যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। আর عِوَجٌ [عَيْن বর্ণে যের] এমন বক্রতা যা জ্ঞানের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গ নীতি নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : وَهَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ : এই বাক্য দ্বারা শারেহ (র.)-এর এ কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য যে, জুমলায়ে খবরিয়ার মাধ্যমে ثُبُوْتُ حَمْد -এর যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এর দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে-

১. হয়তো এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলি اَزَلِىْ وَاَبَدِىْ তথা অনাদি ও অনন্ত বুঝানো উদ্দেশ্য। এ সুরতে বাক্যটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয়ভাবেই خَبَرِيَّةٌ হবে। আর খবর দেওয়ার জন্য ثَابِتٌ উহ্য বের করে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গ্রহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইঙ্গিত করা যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অনাদিকাল থেকে আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। বান্দার জন্য এই বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক।

২. অথবা اِنْشَاءُ حَمْد উদ্দেশ্য হবে। আর গ্রন্থকার এটাকেই وَالثَّنَاءُ بِهِ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই সূরতে বাক্যটি শব্দগতভাবে খবরিয়া এবং অর্থগতভাবে اِنْشَائِيَّةٌ হবে। যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اَحْمَدُ وَاُنْشِئُ حَمْدًا لِنَفْسِىْ لِعِجْزِ خَلْقِىْ مِنْ كُنْهِ حَمْدِىْ

৩. অথবা উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। এর দিকেই গ্রন্থকার اَوْ هُمَا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ اِنْشَاء حَمْد এবং اِخْبَار حَمْد উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। এই সুরতে বাক্যের ব্যবহার خَبَرٌ এবং اِنْشَاءٌ উভয়ের মধ্যে হবে। আর এটা حَقِيْقَتْ এবং مَجَازٌ একত্র হওয়ার ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু خَبَرٌ -এর মধ্যে হাকীকত এবং اِنْشَاءٌ -এর মধ্যে مَجَازٌ হবে। আর উদ্দেশ্য হবে ثُبُوْت حَمْد -এর উপর ঈমানের খবর দেওয়া এবং اِنْشَاءُ حَمْد করা।

قَوْلُهُ اَفْيَدُهَا الثَّالِثُ : ব্যাখ্যাকার বলেন, উল্লিখিত তিনটি সুরতের মধ্যে তৃতীয় সুরতটিই উপকারী ও উত্তম। কেননা এই সুরতে اِخْبَارٌ এবং اِنْشَاءٌ উভয়টি مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ হয়ে থাকে, প্রথম দুই সুরতের বিপরীত। তাতে একটি مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتْ এবং অপরটি مَقْصُوْدٌ بِالتَّبْعِ হয়ে থাকে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, اِنْشَاءٌ ثَنَاءٌ এটা اِخْبَارٌ بِالثَّنَاءِ -কে আবশ্যক করে। আর তা এভাবে যে- اِنْشَاءُ حَمْد -কারীও প্রশংসাকারী হয়ে থাকে।

এর উত্তরে বলা হয় যে, مَقْصُوْدٌ بِالتَّبْعِ এবং مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন– যদি বাক্যকে শুধুমাত্র খবরিয়া বলা হয় তখন এই সুরতে إِخْبَارٌ بِالْحَمْدِ উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু إِنْشَاءُ ثَنَاءٍ এটা تَبْعًا হবে। আর যদি বাক্যকে শুধুমাত্র إِنْشَائِيَّةٌ বলা হয়, তখন এই সুরতে إِنْشَاءُ حَمْدٍ তো ইচ্ছাকৃত হবে; কিন্তু إِخْبَارٌ بِالْحَمْدِ টি ضِمْنًا ও تَبْعًا হবে। আর যদি উভয়টি তথা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এবং إِنْشَائِيَّةٌ বলা হয়, তখন إِخْبَارٌ এবং إِنْشَاءٌ উভয়টিই উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ : এটা ثُبُوْتُ حَمْدٍ-এর জন্য ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত। কেননা صِلَةٌ ও مَوْصُوْلٌ মিলে যখন সিফত হয় আর صِلَةٌ টা مُشْتَقٌّ হয়, তখন এ জাতীয় সিফত মওসূফের জন্য ثُبُوْتُ حُكْمٍ-এর عِلَّتْ হয়ে থাকে। এই নীতির ভিত্তিতেই اَلَّذِىْٓ اَنْزَلَ টা اَلْحَمْدُ ثَابِتٌ لِلّٰهِ-এর জন্য ইল্লত হবে অর্থাৎ আল্লাহর জন্য প্রশংসা এ কারণে যে, তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

اَلْحَمْدُ-এর পরে ثَابِتٌ বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে حَمْدٌ-এর অর্থ বর্ণনা করা। আর هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ উহ্য মেনে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, اَلْحَمْدُ হলো মুবতাদা আর لِلّٰهِ শব্দটি ثَابِتٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে খবর।

প্রশ্ন : ثَبَتَ-এর পরিবর্তে ثَابِتٌ [যা ইসমে ফায়েল] কে উহ্য নেওয়ার দ্বারা ফায়দা কি?

উত্তর : ثَابِتٌ ইসমে ফায়েল। এটা دَوَامٌ ও إِسْتِمْرَارٌ কে বুঝায়, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য ثُبُوْتُ حَمْدٍ টা دَائِمِىْ এবং اَزَلِىْ তথা সর্বদা আছে এবং সর্বদাই থাকবে। এটা ثَبَتَ-এর বিপরীত। কেননা এটা تَجَدُّدٌ এবং حُدُوْثٌ-কে বুঝায়।

لَهٗ-এর ব্যাখ্যা فِيْهِ দ্বারা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এখানে لَامٌ টা فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ قَيِّمًا : এটা সিফাতের সীগাহ। এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

১. সরল সঠিক। যেমন– ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ এটাই সরল সঠিক পদ্ধতি।

২. সংশোধনকারী। অর্থাৎ এমন কিতাব যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় বিষয়কে সংশোধন করে থাকে। এ সুরতে قَيِّمًا শব্দটি مُقَوِّمٌ অর্থে হবে।

قَيِّمًا শব্দটি اَلْكِتَابُ হতে দ্বিতীয় حَالٌ হয়েছে। আর এ সুরতে এটা حَالٌ مُتَرَادِفَةٌ হবে। প্রথম حَالٌ হলো وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا বাক্যটি। অথবা قَيِّمًا শব্দটি لَهٗ-এর যমীর থেকে حَالٌ হবে। তখন এটা حَالٌ مُتَدَاخِلَةٌ হবে এবং এটাকে مُؤَكِّدَةٌ-ও বলা হবে; যেহেতু দ্বিতীয় حَالٌ টা প্রথম حَالٌ-এর مَفْهُوْمٌ-এর তাকিদ করে থাকে। আর এটা উহ্য ফেলের مَفْعُوْلٌ ثَانِىْ-ও হতে পারে। উহ্য ইবারত হবে– جَعَلَهٗ قَيِّمًا

قَوْلُهٗ لِيُنْذِرَ : এখানে لَامٌ টি تَعْلِيْلٌ বা عَاقِبَتْ-এর জন্য। আর এটা اَنْزَلَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ। আর لِيُنْذِرَ-এর مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ হলো اَلْكَافِرِيْنَ যা উহ্য রয়েছে। আর بَأْسًا شَدِيْدًا হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর مِنْ لَّدُنْهُ টা উহ্য كَائِنًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে জুমলা হয়ে بَأْسًا-এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। অর্থাৎ بَأْسًا شَدِيْدًا كَائِنًا مِنْهُ

قَوْلُهٗ يُبَشِّرُ : يُبَشِّرَ-এর আতফ لِيُنْذِرَ-এর উপরে হয়েছে। আর اَلْمُؤْمِنِيْنَ শব্দটি يُبَشِّرَ-এর মাফউল। আর اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الخ বাক্যটি اَلْمُؤْمِنِيْنَ-এর সিফত হয়েছে। আর اَنَّ لَهُمْ-এর পূর্বে একটি ب হরফে জার উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ مَاكِثِيْنَ : এটা لَهُمْ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর فِيْهِ-এর যমীরেরর مَرْجِعٌ হলো اَجْرٌ আর দ্বিতীয় يُنْذِرَ-এর আতফ হয়েছে لِيُنْذِرَ আর এই আতফকে বলা হয় عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ আর এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بَأْسًا شَدِيْدًا

قَوْلُهٗ مَا لَهُمْ : مَا لَهُمْ এটা হলো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ আর لَهُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর مِنْ عِلْمٍ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর مِنْ টি হলো অতিরিক্ত। আর بِهٖ-এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো قَوْلٌ

قَوْلُهُ : كَبُرَتْ : كَبُرَتْ শব্দটি فِعْل مَاضِىْ যা اِنْشَاءُ ذَمْ -এর জন্য। আর তার মধ্যস্থিত هِىَ যমীর হলো فَاعِلْ যা مَقَالَتُهُمْ -এর দিকে ফিরেছে। كَلِمَةٌ হলো تَمْيِيْز আর تَخْرُجُ বাক্য হয়ে كَلِمَةٌ -এর সিফত হয়েছে। আর مَقَالَتُهُمْ الْمَذْكُوْرَة হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাহফের ফজিলত : হাদীস শরীফে এ সূরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, এক সাহাবী এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তার গৃহে একটি চতুষ্পদ জন্তু ছিল। সে ছুটাছুটি করতে লাগলো। সাহাবী লক্ষ্য করলেন, আকাশে তাঁর ঘরের উপরে একটি মেঘখণ্ড চাঁদোয়ার মতো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। উক্ত সাহাবী প্রিয়নবী ﷺ-এর খেদমতে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এটি হলো সাকিনা, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআন কারীম তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত উবাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.)।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরাটি পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

তাফসীরে ইবনে মারদূইয়াহ রয়েছে, জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমার দিন পাঠ করে তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম (র.) আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্যে দু'জুমার মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ সেভাবে তেলাওয়াত করে, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে তবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।

বর্ণিত আছে, যে হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রত্যেক রাতে এই সূরা পাঠ করতেন।

ইবনে মারদূইয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এই সূরা কোনো রাতে পাঠ করা হয় তাতে সেই রাতে ইবলীস শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে রাখবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই কথাটি সূরা কাহাফের শেষ দশটি আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো না, যা নাজিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন? তা হলো সূরা কাহাফ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তাসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হামদ দ্বারা। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে হামদ দ্বারা।

দ্বিতীয়ত: সূরা বনী ইসরাঈলে একটি আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করেছে। একটি রূহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে, তৃতীয়টি জুলকারনাইন সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নটির জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান পেয়েছে।

যেহেতু কাফেরদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নাশর তথা মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্যে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্বহীনতা এবং কিয়ামত ও আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে- وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ, তোমাদেরকে খুবই অল্প জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যাতে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে ইলম দান করেছেন, তা অতি সামান্য। কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ে ইলম দিয়েছেন, অন্য লোককে সেই ইলম না দিয়ে অন্য ইলম দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর এই ঘটনা এ কথারই প্রমাণ যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য ইলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কিয়ামত এবং আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবুয়তের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সম্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মুজেজার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরি, নাফরমানি এবং শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পলায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো- 'তাদের কথা যারা কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে কোনো পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।' এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে পলায়ন কর, দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচিরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় আসহাবে কাহাফের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈমানের হেফাজতের জন্য এবং কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করে, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট ইবাদত। স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নবুয়ত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো, আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্যধন্য হওয়ার চেষ্টা সর্বজন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রাসূল কারীম ﷺ -এর মহাশূন্য পরিভ্রমণ তথা মেরাজের কথা সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনার পর এই সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

শানে নুজুল : ইবনে জরীর ইকরিমার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নজর ইবনে হারেস এবং উকবা ইবনে আবী মুআইত নামক দু'ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে এবং এই নির্দেশ দেয় যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অবস্থা মদীনার ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট বর্ণনা কর এবং ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তাদের নিকট জ্ঞানের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা আমাদের নেই। আর তারা তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দেয় তা আমাদেরকে অবগত কর। উভয় দূত যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছে ইহুদি ধর্মযাজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর অবস্থা তাদের নিকট বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন

ইহুদি ধর্মযাজকরা বলে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। যদি তিনি সঠিক উত্তর দিয়ে দেন, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর যদি এই প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি না দেন, তবে জেনে রাখ যে, তিনি সত্যবাদী নন। তিনটি প্রশ্ন হলো এই-

১. সেই যুবকগণ কারা ছিল, যারা অতীতকালে বিদায় নিয়েছেন এবং যাদের ঘটনা সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিস্ময়কর, আর সেই ঘটনাগুলো কি?

২. সে ব্যক্তি কে? যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার ঘটনাবলি কি?

৩. রূহের তাৎপর্য কি?

কুরাইশদের প্রেরিত ঐ দুই ব্যক্তি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং কুরাইশদেরকে তাদের ভ্রমণের ফলাফল জানিয়ে দিল। এরপর তারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করলো। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল বলবো।

হুজুর ﷺ তাদেরকে কথা দিলেন যে, আগামীকাল তিনি তাদের কথার জবাব দিবেন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পনের দিন বিলম্ব হলো। এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-ও আসেননি এবং আল্লাহ পাক কোনো ওহীও প্রেরণ করেননি। তখন প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত অস্থির হলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত কাফেররা বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলো।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাহাফ নিয়ে আগমন করলেন। এই সূরায় দুটি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর রূহ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৬৮, ৬৯]

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত : পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, সর্বাধিক প্রিয় নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। মূলত সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাই তাঁর মহান দরবারে পেশ করি সকল প্রশংসা! পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে এই মহান নিয়ামত দানে বাধিত করেছেন। পবিত্র কুরআন অদ্বিতীয়, মহান আসমানি গ্রন্থ, যার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল, যার বর্ণনাধারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং সাবলীল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় কোনো বক্রতা নেই, এতে নেই কোনো জটিলতা। এর জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মনে দাগ কাটে, তাকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই- যখনই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার কথা আসে তখনই তার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার হামদ বা প্রশংসার কথা উল্লিখিত হয়। যেমন- বলা হয় সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এই সূরার শুরুতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ বলে আল্লাহ তা'আলার হামদের কথা ইরশাদ হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার কথা হবে প্রথমে, এরপর ঘোষণা করা হবে তার হামদ বা প্রশংসার কথা। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মেরাজ হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর সর্বপ্রথম উচ্চ মর্তবার কথা। আর তাঁর নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করা হলো তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করা। এই পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মেরাজের মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ উপরের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী উপর থেকে নিচের দিকে এসেছে। এই কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো যারা পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত, তাদেরকে সতর্ক করা এবং যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ৭৩-৭৪]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলাই দয়া করে স্বীয় বান্দাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিয়ামত দান করেছেন। আর এজন্য কুরআনের নিয়ামতের উল্লেখ করে তার প্রশংসার শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানবজাতি আল্লাহ পাকের এই মহান নিয়ামতের জন্য তাঁর দরবারে শুকরগুজার হয়। এই শিক্ষার প্রতি আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৬৯]

قَوْلُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا : عِوَجٌ শব্দের অর্থ হলো- কোনো প্রকার বক্রতা এবং এক দিকে ঝুঁকে পড়া। কুরআন পাক শাব্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোনো জায়গায় এতটুকু ক্রটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا বাক্যে যে অর্থটি ঋণাত্মক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই قَيِّمًا শব্দের মধ্যে ধনাত্মক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা قَيِّمًا -এর অর্থ হচ্ছে مُسْتَقِيْمًا [সঠিক]।

مُسْتَقِيْم তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে قَيِّمْ শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাজতকারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ক্রটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হেফাজত করে। এখন উভয় শব্দের সারসংক্ষেপ এই যে, কুরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী। -[তাফসীরে মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয় চতুষ্টয় : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্র কুরআনের বড়ত্ব ও মহত্ব।

২. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩. কুরআনের ধারক বাহকের জিম্মাদারী কতটুকু?

৪. আল্লাহ তা'আলা এ সমগ্র সৃষ্টিজীবকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এর শেষ পরিণতি কি ঘটবে?

উপরিউক্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ : সকল প্রশংসা সেই পবিত্র সত্তার জন্য যিনি স্বীয় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ যেই সত্তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করছেন, তিনি সকল সৌন্দর্যের অধিকারী, সর্বপ্রকার স্তুতি গানের উপযুক্ত, সর্বোত্তম শুকর ও কৃতজ্ঞতার আধার। আর সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা হতে চিরমুক্ত। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এই কিতাবে সামান্যতম বক্রতারও স্থান দেননি। শাব্দিকভাবেও নয় যে, তা ফাসাহাত ও বালাগাতের পরিপন্থি হবে এবং অর্থগতভাবেও নয় যে, তার কোনো বিধান ও নির্দেশ প্রজ্ঞার খেলাফ হবে। আর কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো- কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা ও সৎকর্মশীল পুণ্যবান মু'মিনগণকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আগাম সুসংবাদ পরিবেশন করা। বিশেষ করে সে সকল কাফের সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করতে সদা তৎপর। আল্লাহ তা'আলার সন্তান রয়েছে, এ আকীদায় বিশ্বাসী কাফেরদেরকে সাধারণ কাফের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ জনগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই লিপ্ত ছিল। অথচ এর সপক্ষে না তাদের কাছে কোনো ন্যূনতম প্রমাণ ছিল, না তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট। আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মুখ থেকে খুবই ভয়ানক মন্দ কথা নির্গত হয়, যা কোনো সামান্যতম বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও বলতে পারে না। -[জামালাইন, খ. ৪, পৃ. ২৪-২৫]

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত : আয়াতে বর্ণিত عَبْدِهٖ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, عَبْدِيَّتْ তথা দাসত্বের সমপর্যায়ের কোনো উচ্চ স্থান নেই। আর এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, রাসূল ﷺ এর সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আয়াতে বর্ণিত لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর মারেফত থেকে বঞ্চিত থাকাও এক ধরনের কঠিন শাস্তি। কাজেই সাধককে মারেফত বঞ্চিত হওয়া থেকে ভয় করা উচিত।

আয়াতে বর্ণিত وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ দ্বারা সে সকল আমল উদ্দেশ্য যার দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কারো কারো নিকট আল্লাহর প্রেমে ডুবে থাকার ফলে স্বীয় প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা থেকে নারাজি উদ্দেশ্য।

আয়াতে বর্ণিত أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا -এর মধ্যস্থ أَجْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি বাস্তব চোখে অবলোকন করা।

অনুবাদ :

٦. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُهْلِكٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ بَعْدَهُمْ اَىْ بَعْدَ تَوَلِّيْهِمْ عَنْكَ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْقُرْاٰنِ اَسَفًا ـ غَيْظًا وَحُزْنًا مِنْكَ لِحِرْصِكَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ وَنَصْبُهٗ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لَهٗ ـ

৬. সম্ভবত আপনি আত্মবিনাশী হালাক ও ধ্বংস হয়ে পড়বেন, তাদের পিছনে ঘুরে অর্থাৎ তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর [তারা এই বাণী] আল কুরআন বিশ্বাস না করলে দুঃখে মনস্তাপে রাগে ও চিন্তায় তাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আপনার লোভ থাকার কারণে। اَسَفًا শব্দটি مَفْعُوْل لَهٗ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

٧. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَالْاَنْهَارِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ لِنَخْتَبِرَ النَّاسَ نَاظِرِيْنَ اِلٰى ذٰلِكَ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ فِيْهِ اَىْ اَزْهَدُ لَهٗ ـ

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা ইত্যাদি আমি সেগুলোকে করেছি শোভা জমিনের জন্য, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, অর্থাৎ মানুষকে এ ব্যাপারে এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে দুনিয়াবিমুখতা প্রদর্শন করে।

٨. وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ـ يَابِسًا لَا يَنْبُتُ ـ فُتَاتًا

৮. জমিনের উপর যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব। এমন শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করব যাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ بَاخِعٌ : অভিধানে بَخَعَ نَفْسَهٗ -এর অর্থ করা হয়েছে مَنَعَ । এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, আপনি তাদের ঈমান গ্রহণ না করার ফলে এত চিন্তিত ও পেরেশান হবেন না, যা আপনাকে বিনাশ সাধন করবে। তবে কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণে নফসকে চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা যাবে না। কেননা সেটাতো ঈমানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। এটা থেকে কিভাবে বারণ করা যাবে? কেননা কুফরের উপর সন্তুষ্টি থাকাও তো কুফরেরই নামান্তর।

قَوْلُهٗ بَعْدَهُمْ : এটা اٰثَارٌ -এর তাফসীর হয়েছে। আর بَعْدَ تَوَلِّيْهِمْ এটা তাফসীরের তাফসীর হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো– আপনি কাফেরদের ঈমান না আনার কারণে এত চিন্তিত হবেন না যে, নিজেই নিজেকে বিনাশ করে দিবেন।

لَعَلَّ : এটা تَرَجِّىْ এবং اِشْفَاقٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে نَهْى -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনাকে এ পরিমাণ চিন্তিত হওয়া থেকে বারণ করার জন্য।

اٰثَارٌ শব্দটি اَثَرٌ -এর বহুবচন, অর্থাৎ তাদের পিছনে তথা তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করবেন না।

قَوْلُهٗ لَمْ يُؤْمِنُوْا : এর দুটি তারকীব হতে পারে– ১. اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا হলো শর্ত আর পূর্বের উপর নির্ভর করে جَزَاءٌ টা উহ্য থাকবে অর্থাৎ فَلَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ

২. لَمْ يُؤْمِنُوْا হলো شَرْط مُؤَخَّرٌ আর فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ হলো جَزَاءٌ مُقَدَّمٌ

اَسَفًا শব্দটি بَاخِعٌ -এর مَفْعُوْل لَهٗ অথবা بَاخِعٌ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ لِحِرْصِكَ : এটা ইল্লতের ইল্লত। অর্থাৎ আপনার এত বেশি পেরেশানি কেন? যেহেতু তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে আপনি অতিশয় আগ্রহী, তাই আপনি এত পেরেশান।

قَوْلُهُ اِنَّا جَعَلْنَا : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ যদি جَعَلَ ফে'লটি صَيَّرَ -এর অর্থে হয় তাহলে زِيْنَةً টি তার مَفْعُوْل ثَانِيْ হবে। আর لَهَا -এর لَامْ টা زِيْنَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে। আর এটাও হতে পারে যে, তা كَائِنَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে زِيْنَةً -এর صِفَةٌ হবে। مَا عَلَى الْاَرْضِ হলো مَفْعُوْلٌ اَوَّلْ আর جَعَلَ যদি খَلَقَ অর্থে হয় তাহলে خَلَقَ হবে শব্দটি হয়তো حَالْ হবে অথবা পরবর্তীতে مَفْعُوْلٌ لَهُ হবে।

قَوْلُهُ جُرُزًا : এটা صَعِيْدًا শব্দের صِفَتْ হয়েছে। এতে اِسْنَادْ مَجَازِيْ হয়েছে। কেননা جُرُزٌ -এর মূল অর্থ হলো- এমন ভূমি যার ঘাস কেটে ফেলা হয়েছে। এটাকে مَا عَلَى الْاَرْضِ -এর সিফত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এটা اَرْض -এর সিফত। কাজেই عَلَاقَةْ مُجَاوَرَتْ -এর কারণে اِسْنَادْ مَجَازِيْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ : এটা মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা হয়েছে। আর তার خَبَرْ হলো اَحْسَنُ আর عَمَلًا হলো تَمْيِيْز এটা জুমলা হয়ে نَبْلُوَ -এর দ্বিতীয় মাফঊলের স্থলাভিষিক্ত।

فِيْهِ -এর যমীরের مَرْجِع হলো مَا عَلَى الْاَرْضِ আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু রয়েছে।

قَوْلُهُ اَزْهَدَ لَهُ : এটা اَحْسَنُ عَمَلًا -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ اَسَفًا : اَسَفًا শব্দের ব্যাখ্যায় غَيْضًا وَ حُزْنًا এনে এ শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য। কেননা اَسَفًا শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ : এ বাক্যটি مَا عَلَى الْاَرْضِ -এর بَيَانْ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاظِرِيْنَ اِلَى ذٰلِكَ : দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, هُمْ হলো ذُو الْحَالِ আর نَاظِرِيْنَ তার থেকে حَالْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ : এ আয়াত দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে এবং দুনিয়াদার ও পরকালবিমুখদেরকে/গাফেলদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, এ পৃথিবী ও তাঁর নিয়ামতসমূহ গুটি কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কাজেই এতে অধিক আসক্তির সাথে নিপতিত হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি উদাসীন থাকা মোটেও সমীচীন নয়। আর اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ হতে এটাই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও তার আরাম আয়েশ শুধুমাত্র গুটি কয়েকদিন তথা সামান্য সময়ের জন্য। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৫৬৩]

قَوْلُهُ : فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا -এর শানে নুযূল :
ইবনে মারদূইয়াহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ কুরাইশের একটি দলের সঙ্গে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কথা বলেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এই দলে ছিল রবীয়ার দুই পুত্র ওতবা এবং শায়বা, আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, নজর ইবনে হারেস, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ও আবুল বুখতারী প্রমুখ।

কিন্তু তারা কোনো যুক্তি প্রমাণ মানতে রাজি হলো না। তখন প্রিয়নবী ﷺ ঐ মজলিস থেকে মনক্ষুণ্ন হয়ে উঠে গেলেন। কুরাইশ সর্দারদের বিরোধিতা, তাদের আপত্তিকর মন্তব্য ও তার উপদেশ গ্রহণ না করা প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তার পক্ষে এ কষ্ট যেন অসহনীয় ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল ﷺ ! যদি কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, সরল সঠিক পথ অবলম্বন না করে, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং আপনার রেসালাতকে অস্বীকার করে তবে এই হতভাগাদের জন্য আপনি কি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলবেন? হে নবী! এর কোনো প্রয়োজনই নেই। আপনার দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দেওয়া, এ ব্যাপারে আপনি সফলকাম হয়েছেন। সত্যের প্রচার প্রসারে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন। হতভাগারা যদি ঈমান না আনে তবে তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা ঈমান না আনলে আপনার কোনো ক্ষতি নেই, তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়নি, একথা চিন্তা করেও দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা হে রাসূল ﷺ! আপনাকে প্রেরণ করেছি ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা রূপে। আর এ কাজটি আপনি সঠিকভাবেই করেছেন। তাদের ঈমান না আনার জন্যে আপনি দায়ী নন। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا : অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি, এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক বস্তুও তো রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোনো কিছুই খারাপ নয়। কেননা প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন–

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا : অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু পরীক্ষাস্বরূপ এ মর্মে যে, কে কাজ ভালো করে, কে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করে? আর কে মন্দ কাজ করে?

মুজাহিদ (র.) বলেন, مَا عَلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীতে যা আছে, এতে মানব দানব, বৃক্ষ তরুলতা, ফল-ফুল এক কথায় সৃষ্টি মাত্রই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা শুধু মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকারদের মতে এ শব্দটি দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এবং নেককারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাই পৃথিবীর সৌন্দর্য।

ইবনে আবি হাতেম হাসান বসরী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যদি এই শব্দটি দ্বারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে তা অযৌক্তিক হবে না। কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যে প্রতিটি বস্তুরই অংশ রয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সেসব বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার দ্বারা কেনো কিছুকে সুসজ্জিত করা হয়। যেমন, সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুন্দর বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসুর, খ. ৪, পৃ. ২৩৩]

اَحْسَنُ عَمَلًا হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট এই বাক্যটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবীজী ﷺ তখন ইরশাদ করেছিলেন– اَحْسَنُكُمْ عَقْلًا وَ اَوْرَعُكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَاَسْرَعُكُمْ فِىْ طَاعَتِهٖ سُبْحَانَهٗ

অর্থাৎ বুদ্ধি যার ভালো, যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে হারাম বস্তুকে বর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে যে ছুটে চলে, তাকেই উত্তম আদর্শের অনুসারী বলা হয়েছে।

ইবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো যারা দুনিয়াত্যাগী হয়, তাদের আমলই উত্তম।

قَوْلُهُ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا : অর্থাৎ দুনিয়ার ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য যতই মনোরম এবং মনোহর হোক না কেন, এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। মানুষ যত সম্পদ, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করুক না কেন, কোনো কিছুই টিকে থাকবে না; বরং প্রত্যেককেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে এ পৃথিবী থেকে। যদি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করা হয়, তথা পারলৌকিক সম্পদ অর্জন করা হয় তবে এতে দুনিয়ার সম্পদের সার্থকতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক অবশেষে একদিন পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য, বৃক্ষ তরুলতা এক কথায় সব কিছু ভেঙ্গে একাকার করে দেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে সমতল প্রান্তরে পরিণত করবেন। তখন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য দূরীভূত হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

হে রাসূল ﷺ! আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য; আর আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। মূলত এ কারণেই যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা দুনিয়ার সম্পদের লোভে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে না। এমনিভাবে কারো ভয়-ভীতি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করতে পারে না। আসহাবে কাহাফের ঘটনাই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

قَوْلُهُ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ الخ : আয়াতের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর সীমাহীন দয়া, অনুগ্রহ ও বিরোধীদেরকে স্বীয় মতালম্বী বানানোর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ الخ : আয়াতে উল্লিখিত حُسْنَ عَمَلْ বা সৎকর্ম ব্যাপক, যাতে পৃথিবীর সকল বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও মহত্ত্বের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করার দর্পণ বানানোও অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ইবনে আতা (র.) বলেন, সকল বিপদ আপদকে ভ্রুক্ষেপ না করাও حُسْنَ عَمَلْ বা সৎ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَهْلُ مُحَبَّتْ وَمَعْرِفَتْ আর তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবেদনও حُسْنَ عَمَلْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

-[কামালাইন, পারা ১৫, পৃ. ৮৬০-৮৭]

অনুবাদ :

٩. اَمْ حَسِبْتَ اَىْ اَظَنَنْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ الْغَارِ فِى الْجَبَلِ وَالرَّقِيْمِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوْبِ فِيْهِ اَسْمَاءُ هُمْ وَاَنْسَابُهُمْ وَقَدْ سُئِلَ ﷺ عَنْ قِصَّتِهِمْ كَانُوْا فِىْ قِصَّتِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ـ خَبَرُ كَانَ وَمَا قَبْلَهُ حَالٌ اَىْ كَانُوْا عَجَبًا دُوْنَ بَاقِى الْاٰيَاتِ اَوْ اَعْجَبُهَا لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ ـ

৯. আপনি কি মনে করেন অর্থাৎ, ধারণা করেন যে, গুহা ও রকীমের অধিবাসীরা স্বীয় ঘটনার দিক দিয়ে আমার সকল নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর কিছু। কাহাফ হলো পাহাড়ের গুহা। আর রকীম হলো ঐ **ফলক** যাতে আসহাবে কাহাফের নাম এবং তাদের বংশধারা লেখা ছিল। রাসূল ﷺ -এর কাছে তাদের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। عَجَبًا শব্দটি كَانَ -এর খবর। এবং তাদের পূর্বের বাক্যটি অর্থাৎ مِنْ اٰيَاتِنَا হলো كَانُوْا -এর মধ্যস্থ যমীর থেকে حَالٌ অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শনাবলি ছাড়া কেবল সেই নিদর্শনটাই আমার কুদরতের মধ্যে আশ্চর্যের ছিল অথবা বিস্ময়কর বিষয়সমূহের মধ্যে সেটিই অধিকতর বিস্ময়কর ছিল। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়।

١٠. اُذْكُرْ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ جَمْعُ فَتًى وَهُوَ الشَّابُّ الْكَامِلُ خَائِفِيْنَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمِ الْكُفَّارِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ قِبَلِكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ اَصْلِحْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ هِدَايَةً ـ

১০. ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল। فِتْيَةٌ শব্দটি فَتًى -এর বহুবচন। অর্থ– পূর্ণাঙ্গ যুবক। তারা তাদের কাফের সম্প্রদায়ের কৃত অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে নিজেদের ঈমানের জন্য আশঙ্কাবোধ করে তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে অর্থাৎ তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। হেদায়েতপূর্ণ বানিয়ে দাও।

١١. فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ اَىْ اَنَمْنَاهُمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ـ مَعْدُوْدَةً ـ

১১. অতঃপর আমি গুহার মাঝে তাদের কর্ণ কুহরে কয়েক বছরের জন্য পর্দা আচ্ছাদন করে দিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রাখলাম।

١٢. ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ اَىْ اَيْقَظْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ الْفَرِيْقَيْنِ الْمُخْتَلِفِيْنَ فِىْ مُدَّةِ لُبْثِهِمْ اَحْصٰى فِعْلٌ بِمَعْنٰى ضَبَطَ لِمَا لَبِثُوْا لِلُبْثِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ اَمَدًا ـ غَايَةً ـ

১২. পরে আমি তাদেরকে উঠালাম অর্থাৎ, জাগ্রত করলাম জানবার জন্য ইলমে মুশাহাদার ভিত্তিতে দুই দলের মাঝে কোন দল তাদের অবস্থানকাল নির্ণয় সম্পর্কে মতবিরোধকারী দু'দলের মধ্যে তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে اَحْصٰى শব্দটি ফে'লে মাযী ضَبَطَ তথা আয়ত্ত রাখা অর্থে لِمَا لَبِثُوْا তার পরবর্তী শব্দের সাথে مُتَعَلِّقٌ আর اَمَدًا অর্থ غَايَتٌ বা সীমা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَمْ حَسِبْتَ : اَمْ حَسِبْتَ-এর মধ্যে اَمْ مُنْقَطِعَةٌ টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার এই ধারণা পোষণ করা শোভন নয়।

قَوْلُهُ اِنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ : এটি জুমলা হয়ে حَسِبْتَ ফে'লের مَفْعُوْلٌ بِهٖ আর كَانُوْا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا জুমলা হয়ে اِنَّ-এর খবর হয়েছে। আর عَجَبًا শব্দটি উহ্য اٰيَةً-এর সিফত হয়ে اِنَّ-এর খবর হয়েছে। আর اَصْحَابُ الْكَهْفِ হলো اِنَّ-এর ইসিম।

كَهْفٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَكْهُفٌ ـ كُهُوْفٌ অর্থ– গুহা, গর্ত। كَهْفٌ এবং غَارٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো غَارٌ [গর্ত] সংকীর্ণ ও ছোট হয়ে থাকে। আর كَهْفٌ [গুহা] বড় ও প্রশস্ত হয়ে থাকে।

رَقِيْم অর্থ مَرْقُوْمٌ তথা লিখিত, লিপিবদ্ধকৃত, সিলকৃত।

رَقِيْم সম্পর্কে মুফাসসিরগণের ছয় ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা–

১. এটা সেই গ্রামের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিলেন।

২. এটা সেই পাহাড়ের নাম যাতে সেই গুহা বিদ্যমান।

৩. আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম হলো رَقِيْم

৪. সেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত খোলা ময়দানের নাম হলো رَقِيْم

৫. এটা ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের সদস্যদের নাম লিখে গর্তের মুখে স্থাপন করা হয়েছিল।

৬. এটা সীসা নির্মিত সেই ফলক যাতে আসহাবে কাহফের নাম খোদাই করে শাহী ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (র.) শেষোক্ত উক্তিটিকে তাঁর সহীহ বুখারীতে تَعْلِيْقًا উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর সনদকে বুখারীর শর্তের উপর রয়েছে বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ هَيِّئْ : শব্দটি بَابُ تَفْعِيْل হতে اَمْرٌ-এর সীগাহ। মাসদার تَهْيِئَةٌ অর্থ– পরিশুদ্ধ করা। ঠিক করা। তৈরি করা। প্রস্তুত করা।

قَوْلُهُ اَحْصٰى : শব্দটি بَابُ اِفْعَالٌ-এর ফে'লে মাযীর সীগাহ, اِسْمُ تَفْضِيْل-এর নয়। কেননা ثُلَاثِىْ مَزِيْد থেকে اِسْمُ تَفْضِيْل-এর সীগাহ اَفْعَلُ-এর ওজনে আসে না।

قَوْلُهُ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ : মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে مُبْتَدَاٌ আর اَحْصٰى জুমলা হয়ে খবর। আর اَحْصٰى-এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحِزْبَيْنِ অর্থাৎ উভয় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি।

قَوْلُهُ لِمَا لَبِثُوْا : এটা حَرْفُ جَارٌ-এর মাধ্যমে اَحْصٰى ফে'লের مَفْعُوْلٌ بِهٖ হয়েছে। আর اَمَدًا হলো تَمْيِيْز

قَوْلُهُ ضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ : এখানে ضَرَبْنَا-এর মাফঊল حِجَابًا বাক্যের মধ্যে مَجَازٌ হিসেবে উহ্য রয়েছে। কেননা اِلْقَاءُ نَوْم-কে ضَرْبُ حِجَابٌ দ্বারা তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর ضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ অর্থ হলো اَنَمْنَا তথা নিদ্রামগ্ন রাখা।

قَوْلُهُ عَدَدًا : এটা مَعْدُوْدًا অর্থে। আর এটা سِنِيْنَ-এর সিফত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا : বস্তুত আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরত-হেকমতের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন আকাশে পাতালে ছড়িয়ে আছে তার তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনা আদৌ এমন বিস্ময়কর কিছু নয়। যিনি কোনো স্তম্ভ ব্যতীত নীলাভ আকাশকে চাঁদোয়ার মতো করে রেখেছেন, যিনি সমগ্র

বিশ্বের সৃষ্টিকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার নির্দেশে এবং মর্জিতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা সদা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার নিকট আসহাবে কাহাফের ঘটনা এমন আর কি আশ্চর্যজনক হতে পারে! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে হিজরতের রাতে অগণিত কাফেরদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়ে গেলেন, আর তারা কিছুই দেখলো না, যিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর নামক গুহায় প্রিয়নবী ﷺ ও তার একমাত্র সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-কে দুশমনের কবল থেকে নিরাপদে রাখলেন, তার অনুসন্ধানকারী শত্রুদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলেন, যিনি নিরস্ত্র প্রায় তিনশত তের জন মুসলমানকে বদরের রণাঙ্গনে বিজয়ী করলেন এবং সহস্র অশ্বারোহী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে দিলেন, ইতিপূর্বে যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় ফেরাউনকে এবং হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর মোকাবিলায় নমরুদকে ধ্বংস করলেন, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনাকে খুব একটা বিস্ময়কর বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু ইহুদিরা এ সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করেছেন তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রমাণ এবং কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট দলিল। আসহাবে কাহাফের ঘটনা কিয়ামতের দলিল এই মর্মে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন শত শত বছর ধরে মৃত রাখার পর তাদেরকে জাগ্রত করতে পারেন তখন হাজার হাজার বছর ধরে মৃত অবস্থায় থাকার পর জীবিতও করতে পারেন। কেননা প্রবাদ বাক্য হলো– "নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই।"

আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম : اَلْكَهْفُ সেই প্রশস্ত গর্তকে বলা হয় যা পাহাড়ের ভিতরে থাকে। আর رَقِيْم শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ বস্তু। যেহেতু লোকেরা আসহাবে কাহাফের নাম ও তাদের ঘটনা একটি ফলকের উপর লিপিবদ্ধ করে তা এই গর্তের মুখে রেখে দিয়েছিল, তাই তাদেরকে'আসহাবে কাহাফ' ও 'আসহাবে রকীম' বলা হয়। আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দলের দুটি খেতাব। গর্তের অধিবাসী হওয়ার কারণে আসহাবে কাহাফ বলা হয়। আর যেহেতু একটি ফলকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল এজন্যে তাদেরকে আসহাবে রকীম বলা হয়।

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৮]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, رَقِيْم সেই উপত্যকার নাম, যেখানে আসহাবে কাহাফ ছিল। আর কা'বে আহবার বলেছেন, رَقِيْم সেই শহরের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন رَقِيْم ঐ পাহাড়ের নাম যাতে আসহাবে কাহাফ এর গর্ত ছিল। এসব অভিমত যাদের, তারা এ মতও পোষণ করেন যে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দল ছিল, ভিন্ন ভিন্ন কিছু ছিল না। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম ভিন্ন ভিন্ন দুটি দল।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে মারদূইয়াহ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসহাবে রকীম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, এরা তিন ব্যক্তি ছিল, যারা একটি গর্তে প্রবেশ করেছিল।

ইমাম আহমদ ও ইবনুল মুনযির হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বকালের তিন ব্যক্তি উপজীবিকার সন্ধানে বের হয়েছিল। পথে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা একটি গর্তে আশ্রয় নেয়। গর্তের ভিতর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট পাথরখণ্ড গর্তের মুখে এসে পড়লো। ফলে গর্তের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। এক ব্যক্তি বলল, আমাদের যে কেউ জীবনে কোনো নেক কাজ করে থাকে সেই নেক কাজটির কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা উচিত। হয়তো আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে আমাদের উপর রহমত নাজিল করবেন। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি একদিন কিছু লোককে কাজের জন্য রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি লোক দ্বিপ্রহরে আমার কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য আসলো। কেননা সে অর্ধেক দিনে এত কাজ করেছে যে অন্যরা তা সারাদিনে করেছে। আমি তাকে অন্যদের সমান পারিশ্রমিক দান করি। অন্য শ্রমিকদের একজন এ কারণে রাগান্বিত হলো এবং তার পারিশ্রমিক সে আমার নিকট রেখে চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিক ঘরে সংরক্ষণ করলাম। কিছুদিন পর তার ঐ পারিশ্রমিক দ্বারা একটি বকরির বাচ্চা ক্রয় করলাম। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ঐ বকরির বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুদীর্ঘ সময় পর সেই শ্রমিক আমার নিকট ফিরে আসলো। সে বর্তমানে বৃদ্ধ হয়ে গেছে

এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তাকে চিনতেও পারিনি। সে বলল, আপনার নিকট আমার কিছু হক রয়েছে। এরপর সে তার হকের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। পরে আমি তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ বকরির পাল তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তা শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে আমাদের জন্যে এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন সঙ্গে সঙ্গে একটু ফাঁক হলো, বাইরের আলো আসতে লাগলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমার কাছে সম্পদ ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেতে লাগলো। একজন অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক আমার কাছে আসলো এবং সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি বললাম, আমি তোমার বিনিময় দিতে পারি, শুধু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং প্রত্যাবর্তন করলো। তিনবারই এমন হলো। অবশেষে এ সম্পর্কে সে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করলো। সে বললো, তোমার দুর্দশা এবং অভুক্ত সন্তান সন্ততির প্রয়োজনের আয়োজনে তুমি রাজী হতে পার। তাই স্ত্রী লোকটি আমার কাছে আসলো। কিন্তু সে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিল এবং তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কম্পমান ছিল। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আমি ভীত সন্ত্রস্ত। আমি বললাম, এত কষ্টে থেকেও তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভর কর আর আমি এমন স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি না। তখন আমি অসৎ কাজ থেকে তওবা করলাম এবং ঐ অবস্থায় তার চাহিদা মোতাবেক সম্পদ দ্বারা সাহায্য করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐ নিঃস্ব স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করে থাকি, তবে আজ তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও এবং এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন পাথরটি এতখানি সরে গেল যে তারা এক অন্যকে চিনতে পারলো।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমার কাছে কয়েকটি বকরি ছিল, আমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে আহার করিয়ে বকরি নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতাম। একদিন বকরিগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে একত্র করতে বিলম্ব হয়ে গেল। অনেক রাতে আমি বাড়ি ফিরলাম এবং দুধের পাত্র হাতে নিয়ে পিতামাতাকে পান করাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রইলাম। ভোরে যখন তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন আমি তাদেরকে দুধ পান করালাম।

হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও ও বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং আমরা সকলে বেরিয়ে আসলাম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আসহাবে রকীম বাক্যটি এদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৭৩-৭৪, দুররে মানসূর, খ. ৪, পৃ. ২৩৪, মা'আরিফুল কুরআনম আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৯]

আসহাবে কাহাফের ঘটনা : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, দাকয়ানূস নামক এক ব্যক্তি রোমের সম্রাট ছিল। লোকটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বড় জালেম। সে শুধু গোঁড়া পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়, বরং সে জনসাধারণকে বল প্রয়োগ করে মূর্তি পূজার জন্যে বাধ্যও করতো। তাই অনেকেই তার ভয়ে অথবা অর্থ-সম্পদের লোভে মূর্তিপূজা করতো। যার সম্পর্কে সে জানতে পারতো যে, সে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে হাজির করে বলা হতো, হয় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত কর, অথবা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। এভাবে যারা মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করতো তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্যে তখন সে তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে জুলুম অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছিল। ঐ দেশেরই কয়েকজন যুবক যারা রাজ পরিবারের লোক ছিল, তারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, তাওহীদের উপর কায়েম ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সঠিক অনুসারী ছিল। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের লোক ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর তারা জাগ্রত হয়েছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ৫, পৃ. ২২১]

ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তারা হযরত ঈসা (আ.) -এর পরে এসেছেন। আর তাদের ঘটনা ঘটেছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)-ও লিখেছেন এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের। যাহোক, কয়েকজন সত্যপন্থি যুবক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, আমরা রাজা দাকয়ানুসের জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না এবং তাওহীদকে বাদ দিয়ে মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না। রাজা দাকয়ানূস তাদেরকে তার দরবারে হাজির করল এবং বলল, তোমরা যদি মূর্তি পূজা করতে প্রস্তুত না হও এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী থাক তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। কিন্তু তারা তাওহীদের বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিল। তাই রাজা দাকয়ানূসের মুখের

উপর বলে দিল, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেছি। যিনি আসমান জমিনের মালিক, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, যুবকদের একথা শ্রবণ করে সকলেই বিস্মিত হলো। সে তাদের পরিধেয় মূল্যবান বস্ত্র এবং স্বর্ণরৌপ্যের যে অলংকার তাদের সাথে ছিল তা খুলে নিল এবং বললো, তোমাদের জন্যে যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমরা বিষয়টি আরো ভেবে চিন্তে দেখ, তাই তোমাদেরকে আরো কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দেওয়া হলো। নওজোয়ানরা তখন পরস্পর পরামর্শ করল যে, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে রয়েছে, রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারের সম্মুখে আমরা টিকতে পারবো কিনা, তা জানি না। তাই আপাতত কোনো পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করা সমীচীন মনে করি। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং আমাদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক দান কর। তখন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে নিল। তন্মধ্যে কিছুটা আল্লাহর রাহে খয়রাত করলো এবং অবশিষ্ট সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গর্তের দিকে রওয়ানা হলো। পথে একজন কৃষক এবং তার কুকুরটিও সাথে সাথে চলতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করার পরও তাদেরকে বিদায় করা সম্ভব হলো না। আল্লাহ তা'আলা সেই কুকুরটিকেও বাকশক্তি দান করলেন। সে বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না, আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে আপন জানি, আমি তোমাদের নিরাপত্তা এবং প্রহরার দায়িত্ব পালন করবো। যখন তারা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলো, তখন কৃষক লোকটি বলল, আমি এ পাহাড়ের একটি গর্ত সম্পর্কে অবগত, সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। তখন তারা একমত হয়ে পাহাড়ের গর্তের দিক রওয়ানা হলো। গর্তে পৌঁছে তারা নামাজ, তাসবীহ, তাহলীলে মশগুল হলো এবং তাদের মধ্যে তালমীখা নামক ব্যক্তির নিকট সকলে নিজ নিজ টাকা-পয়সা জমা দিল। সে রাত্রিকালে গোপনে নিজের বেশ পরিবর্তন করে শহরে গমন করতো এবং তাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতো। শহরের খবরও সে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

দাকয়ানুস সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ সাতজন যুবকের অনুসন্ধানের আদেশ দিল। তালমীখা যখন জানতে পারলো যে সরকারের তরফ থেকে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ঠিকানা বলার জন্যে তখন সে সামান্য খাবার সংগ্রহ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাথীদের নিকট আসলো এবং অবস্থা বর্ণনা করলো যে সেই নিষ্ঠুর জালেম পুনরায় শহরে এসেছে এবং আমাদের খোঁজ করছে। এ খবর শ্রবণ করে সকলে সেজদারত হলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্রন্দনরত হয়ে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালেম থেকে রক্ষা কর! তাদের সকলের চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরেছিল। তারা দোয়া শেষ করে পরস্পর আলাপ করছিল এবং একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ তাদেরকে নিদ্রিত করে দিলেন এবং কুকুরটি গর্তের মুখে পড়ে রইলো।

এদিকে দাকয়ানুস তাদের খোঁজ করে কোথাও পেল না। শহরের গণ্যমান্য লোকদের সে বলল, এই যুবকদেরকে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তারা যদি মত পরিবর্তন করতো এবং আমার উপাস্যদের পূজা করতো, তবে আমি তাদের মাফ করে দিতাম। শহরের সর্দাররা বলল, আপনি তো তাদের প্রতি অনেক দয়া করেছেন, তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন; কিন্তু তারা তো নিজেদের মত পরিবর্তন করল না, তারা অবাধ্যই রয়ে গেল। তখন রাজা দাকয়ানুস অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ঐ যুবকদের পিতাদের হাজির করার আদেশ জারি করলো। তারা বলল, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে এই যুবকরা আপনার অবাধ্য হয়েছে এবং কোথাও আত্মগোপন করেছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমরাতো আপনার অবাধ্য নই, দয়া করে আমাদেরকে হত্যা করবেন না। তখন দাকয়ানুস তাদের পিতাদের ছেড়ে দিল এবং যুবকদের অনুসন্ধানে বের হলো। দাকয়ানুস এই তথ্য সম্পর্কে অবগত হলো যে তারা পাহাড়ের কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছে। তাই পরদিন নিজের সৈন্যদল নিয়ে তাদের সন্ধানে বের হলো এবং সেই গর্তের কাছে পৌঁছে গেল, যেখানে তারা আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু সেখানে দাকয়ানুস এবং তার সঙ্গীদের মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হলো যে, কেউ এ গর্তে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাদেরকে নিষ্ঠুর জালেম দাকয়ানুসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হিজরতের রাতে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আবূ জেহল ও অন্যান্য মুশরিকদের জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেননা দুশমনরা গারে সওরের কাছে এসেছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.)-কে দেখতে পায়নি।

যা হোক দাকয়ানুস যখন তাদের সন্ধান পেল না তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তার অন্তরে এই ইচ্ছা হলো যে, গর্তের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে করে তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গর্তের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর এ গর্তই তাদের কবরে পরিণত হয়।

দাকয়ানুসের ধারণা ছিল তারা গর্তের ভিতর জাগ্রত আছে আর তাদের গর্তের দ্বার বন্ধ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা অবগত আছে। কিন্তু সে জানতো না যে তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের কুকুরটিও দুয়ারে পড়ে ছিল। দাকয়ানুসের সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি ছিল যারা তাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান। তাদের একজনের নাম ছিল বেদরস। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল রোনাস। তারা দুটি ফলকের মধ্যে এই নওজোয়ানদের নাম এবং বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখে তামার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে ঐ গর্তে রেখে দেয়। হয়তো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে কখনও এই নওজোয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো মু'মিন সম্প্রদায়কে অবগত করবেন।

হাফেজ আসকালানী (র.) লিখেছেন, যখন অনেক অনুসন্ধানের পরও আসহাবে কাহফের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন রাজা দাকয়ানুস নিজেই এই আদেশ দিয়েছে যে এদের নাম লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হোক। -[ফতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬]

যাহোক সাতজন যুবক যে গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন, সেখানে একাধারে তিনশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রইলেন। এই সময়ের মাঝে দাকয়ানুসের মৃত্যু হলো। তার জুলুমের রাজত্ব শেষ হলো। আর একের পর এক রাজা হলো। কিন্তু আসহাবে কাহফ তিনশত নয় বছর যাবত গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করলেন। যখন তাদের জাগ্রত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে দেশে এমন একজন বাদশাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, যিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি ইবাদতগুজার, পরহেজগার এবং সুবিচারক ছিলেন। যিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই আসহাবে কাহাফ জাগ্রত হলেন। এই রাজা অত্যন্ত নেককার ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বেদরোস। ৫৮ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। সে যুগে কিয়ামত সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং তারা বলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন হবে না। আর কোনো কোনো লোক বলে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, তবে আধ্যাত্মিকভাবে হবে, শারীরিকভাবে নয়। রূহগুলো একত্র হবে, দেহগুলো নয়। কেননা মৃত্যুর পর দেহগুলোকে মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু রূহ বাকি থাকে। আর কেউ কেউ বলতো, আত্মা এবং দেহ উভয়েরই হাশর হবে।

যেহেতু তখনকার বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত নেককার ঈমানদার, তাই কিয়ামত সম্পর্কে মানুষের এই মতভেদ তাঁর জন্য বড় কষ্টদায়ক হয়। তিনি মানুষকে এ সম্পর্কে উপদেশ দেন। কিন্তু লোকেরা তা মানতে চায় না।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে বেদরুস নিজের ঘরে প্রবেশ করে দুয়ার বন্ধ করে দিলেন এবং রাত দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্রন্দন করে এই দোয়া করতে লাগলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি মানুষের মতভেদ সম্পর্কে অবগত রয়েছো, তুমি গায়েব থেকে এমন কিছু নিদর্শন প্রেরণ কর, যার দ্বারা সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং বাতিলের বাতুলতা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছেন। ঐ শহরের আলিয়াস নামক এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি ইলহাম করলেন যে, বেদযুস নামক গর্তের উপর যে ইমারত নির্মিত হয়েছে তা ভেঙ্গে তাকে তার বকরি রাখার স্থান করবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রমিকরা ঐ ইমারতটি ভাঙ্গতে শুরু করলো। যখন গর্তের মুখের পাথরটি ভেঙ্গে দিল তখন আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফকে জাগ্রত করলেন। তাদের ধারণা হলো তাঁরা কিছুক্ষণ নিদ্রিত হওয়ার পর জাগ্রত হয়েছেন। একদিন বা অর্ধেক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। অথচ তিনশত নয় বৎসরের এই সুদীর্ঘ সময় এরই মধ্যে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। এ সময়ে জালেম নিষ্ঠুর দাকয়ানুস পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। তারা জাগ্রত হয়ে নামাজ আরম্ভ করলেন। নামাজের পর তারা ক্ষুধা অনুভব করে তামলীখাকে বললেন, শহরে যাও, আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আন। জালেম দাকয়ানুস এবং শহরবাসীদের অবস্থাও জানার চেষ্টা কর। তামলীখা বললেন, গতকাল শহরে তোমাদের খোঁজ করা হয়েছে। জালেম রাজার ইচ্ছা হলো, তোমাদেরকে পাকড়াও করে মূর্তির সম্মুখে সেজদা করতে বাধ্য করবে, যদি তোমরা তাতে প্রস্তুত না হও তবে তোমাদেরকে হত্যা করবে। তাদের মধ্যে মেকলেমিসা নামক ব্যক্তি বললেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা জান, একদিন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাজির হতে হবে, অতএব আল্লাহর এ দুশমনের কথায় তোমরা কুফর ও শিরক করো না। এরপর তামলীখাকে বললেন, তুমি শহরে যাও এবং জানার চেষ্টা কর দাকয়ানুস আমাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুব সতর্ক হয়ে যাবে আর অতি সত্বর আমাদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত।

তামলীখা তার পোশাক পরিবর্তন করলেন। শ্রমিকদের ন্যায় ময়লা কাপড় পরিধান করলেন। দাকয়ানুসের যুগের কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করে শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। যেহেতু মনে দাকয়ানুসের ভয় অত্যন্ত বেশি ছিল সেজন্য অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং ধীর গতিতে অগ্রসর হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শহরের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ঈমানদার লোকও দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং চিন্তা করলেন যে, হয়তো এটি তারসুস শহর নয়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন এই শহরটির কি নাম? সে বলল, তারসুস। যাহোক তিনি রুটিওয়ালার দোকানে পৌঁছে

দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা দোকানদারকে দিলেন এবং বললেন, এর বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দাও। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে বিস্মিত হলো এবং অন্য দোকানদারকে দেখিয়ে বলল, এটি তো দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা! পরে দোকানদার বললো, মনে হয় এ লোক মাটির নিচে রক্ষিত মুদ্রা পেয়েছে এবং নিজের রহস্য সে প্রকাশ করতে চায় না। তখন লোকেরা তাকে বলল, তুমি সত্য সত্য বল এই মুদ্রা কোথায় পেয়েছো? হয়তো তুমি মাটির নিচের সম্পদ পেয়ে গেছ। তামলীখা এসব কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হলেন। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হলো। তিনি ধারণা করলেন, হয়তো এরা আমার পরিচয় পেয়ে গেছে এবং সকলে মিলে আমাকে পাকড়াও করে দাকয়ানুসের নিকট নিয়ে যাবে। এরপর শহরে একথা প্রচার হতে লাগল। সকলের মুখে একই কথা যে, এ লোকটি মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ পেয়েছে। এ কারণে শহরের অনেক লোক তার চারিপার্শ্বে একত্র হলো এবং বলতে লাগল, এই ব্যক্তি অবশ্যই এ শহরের অধিবাসী নয়। কিন্তু তামলীখার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার পিতা ও তার ভাই এই শহরের অধিবাসী। তারা সংবাদ পেলে অবশ্যই আমাকে মুক্ত করবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলো তারা আসলো না। তখন শহরবাসী তামলীখাকে শহরের দুজন কর্মকর্তার নিকট হাজির করলো। তারা দুজন অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল আরইউস, আর একজনের নাম ছিল তানতিউস। তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই সিদ্ধান্ত করলো যে, এই ব্যক্তিকে বাদশাহর নিকট হাজির করতে হবে। তামলীখা তখন ধারণা করলেন যে, হয়তো তাকে জালেম দাকয়ানুসের নিকট হাজির করা হবে, তাই তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম দাকয়ানুসের মৃত্যু হয়েছে বহুপূর্বে, তখন তার ভয়-ভীতি দূর হলো এবং ক্রন্দন বন্ধ হলো। এ সময় তিনি তার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা কয়েকজন যুবক দাকয়ানুসের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজ আমি সকলের জন্য খাবার নিতে এসেছি, আমি জমিনের গুপ্তধন পাইনি। এই মুদ্রা আমাকে আমার পিতা দিয়েছিলেন। এই মুদ্রাতে এই শহর অঙ্কিত রয়েছে; এই শহরেই এগুলো তৈরি হয়েছে। অতঃপর তিনি নিজের সাথীদের নাম প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি আমার কথায় আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকে তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, ঐ গর্ত খুব দূরেও নয়। তখন তারা সকলেই আসহাবে কাহাফকে স্বচক্ষে দেখার জন্য রওয়ানা হলো।

এদিকে তামলীখার সাথীগণ গর্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। কেননা, খাবার আনয়নে তামলীখার অনেক বিলম্ব হয়েছে। খোদা না করুন, যদি সে ধরা পড়ে যায়, তখন কি হবে? তাই তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি শুরু করলেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। নামাজের পর একে অন্যকে অসিয়ত করলেন। ঠিক সেই সময় আরইউস ও তার সাথীরা গর্তের সম্মুখে হাজির হলেন। তামলীখা তাদের পূর্বে গর্তে প্রবেশ করলেন এবং সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তারা জানতে পারলেন যে, তারা তিনশত নয় বৎসর নিদ্রিত ছিলেন। আর তাদেরকে শুধু এজন্য জাগ্রত করা হয়েছে যেন তারা মানুষের জন্য কিয়ামতের একটি নিদর্শন হিসেবে হাজির হয় এবং হাশরের ময়দানে যে প্রত্যেকটি মানুষকে সশরীরে হাজির হতে হবে– এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে তারা লোকালয়ে উপস্থিত হয়। এ সুদীর্ঘ সময় নিদ্রিত থাকার পর জাগ্রত হয়ে লোকালয়ে উপস্থিত হলে লোকেরা কিয়ামত এবং হাশর সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ঈমান আনবে।

যাহোক তামলীখা প্রথমে গর্তে প্রবেশ করে এবং তারপর আরইউস গর্তে প্রবেশ করে। সে সেখানে একটি তামার সিন্দুক দেখতে পেল, যার উপর রূপালী সীলমোহর লাগানো রয়েছে। গর্তের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে আরউইস সে দেশের তদানীন্তন গণ্যমান্য লোকদের ডাকলো এবং সকলের সম্মুখে ঐ সিন্দুকটি খোলার আদেশ দিল। তা থেকে দুটি ফলক বের করা হলো। সীসার ফলকে ঐ যুবকদের নাম, পরিচয় এবং তাদের অন্তর্ধানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। আসহাবে কাহাফের নাম, মেকসালমীনা, মেখ শালমীনা, তামলীখা, মরতুনাস, কাশতুনাস, বেরুনাস তাইমুনাস, লাত বুয়াস, কাবুস, আর কুকুরটির নাম কেতমীর। এই যুবকগণ জালিম রাজা দাকয়ানুসের ভয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষার লক্ষ্যে পলায়ন করে এই গর্তে আত্মগোপন করেছে।

যখন জালেম দাকয়ানুস তাদের আত্মগোপনের খবর পায় তখন সেই এই গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। আমরা তাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে দিলাম, যাতে করে পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের সত্যিকারের পরিচয় পায়। এই সীসার ফলকটি পাঠ করার পর তামলীখা বললেন, আমিই তামলীখা এবং এরা আমার সাথী। আরইউস ফলকের লেখা পাঠ করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলেন যে, সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর কাল নিদ্রিত থাকার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে হামদ ও ছানা পেশ করলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন সকলকে জীবিত করার নমুনা উপস্থাপিত

করেছেন। নেককার বাদশাহর নিকট এই ঘটনার বিবরণ পেশ করা হলো এবং বেদারুস নামক বাদশাহকে আহ্বান করলো যে, আপনি স্বয়ং এসে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখুন। আপনার শাসনামলেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে হাশরের নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ ঈমানের নূর অর্জন করতে পারে এবং শারীরিকভাবে হাশর হবে একথা বিশ্বাস করে। আর সেই নিদর্শন হলো আল্লাহ পাক কয়েকজন যুবককে সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর যাবত নিদ্রিত রেখেছেন। এরপর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় জাগ্রত করেছেন। ঠিক এভাবে কিয়ামতের দিন রূহ এবং দেহকে একত্র করে উঠানো হবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের এক বিস্ময়কর নমুনা এবং মহিমা প্রকাশ করেছেন, যেন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে যে কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে সশরীরে হাজির করা হবে।

বাদশাহ বেদরুস এই সংবাদ পাওয়া মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গর্তে প্রবেশ করে ঐ যুবকদেরকে দেখলেন। আনন্দের অতিশয্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তিনি সেজদারত হলেন। তারপর আসহাবে কাহাফের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আসহাবে কাহাফ জমিনে বসে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করেছিলেন। বাদশাহ বেদরুসের মোলাকাতের পর তারা বাদশাহকে বললেন, আমরা তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করি। আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং তোমার রাজত্বের হেফাজত করুন! জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করুন! আর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। একথা বলে বাদশাহকে তারা বিদায় দিলেন এবং নিজেরা শয়নস্থলে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ তা'আলা সেখানেই তাদেরকে ওফাত দান করলেন। বাদশাহ তাদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং আদেশ দিলেন তাদের প্রত্যেককে স্বর্ণনির্মিত সিন্দুকে রাখা হোক। রাতে বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন– তারা বলছেন, আমরা স্বর্ণ দিয়ে নয়, মাটি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছি; আর মাটির সাথেই মিশে যাব, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে ছিলাম, সেভাবেই আমাদেরকে গর্তের ভিতর মাটিতে রেখে দাও যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পুনরুত্থান করান। বাদশাহ এবং তার সঙ্গীরা যখন গর্ত থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তারা এত ভীত হলেন যে, দ্বিতীয়বার তাতে প্রবেশ করার সাহস আর তাদের হলো না। বাদশাহ গর্তের মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুররআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৯০-৩৯৬, মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৩৬-২৩৭, ইবনে কাসীর পারা-১৫ পৃ. ৮৪-৮৬, রূহুল মা'আনী পারা– ১৫, পৃ. ২১৬ - ২১৭, কুরতুবী খ. ১০, পৃ. ৩৫৭]

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রিস্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহাফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবু কালাম আজাদ আয়লার [আকাবা] নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লিখেন– 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭ এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর।

–[এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬ সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর [স্মার্ণা] শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র.)-ও 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরোনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থে একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওরাতও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন। –[দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত]

জর্দানে আম্মানের নিটকবর্তী এক মাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দুটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীর ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহাফের গুহাটি অবস্থিত।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহাফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লিখেন, যে অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। এরপর তিনশ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তাফসীরে হক্কানীতেও তাদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তুরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য প্রাচীন তাফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হলো। আমি পূর্বেই আরজ করেছিলাম যে, কুরআনের কোনো আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কুরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোনো জরুরি অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরও কোনোরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়; কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তুরতুস শহরের নিকট ঘটেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ সত্য এই যে, এসব গবেষণার পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান নির্ধারণের না কোনো প্রয়োজন আছে এবং না কোনো নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব। তাফসীরবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ কথাই বলেছেন–

قَدْ اَخْبَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِذٰلِكَ وَاَرَادَ مِنَّا فَهْمَهٗ وَتَدَبُّرَهٗ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ هٰذَا الْكَهْفِ فِىْ اَىِّ الْبِلَادِ مِنَ الْاَرْضِ اِذْ لَا فَائِدَةَ لَنَا فِيْهِ وَلَا قَصْدَ شَرْعِيٍّ .

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহাফের কুরআনে বর্ণিত অবস্থাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন জায়গায় এবং কোন শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোনো উপকার নিহিত নেই এবং শরিয়তের কোনো উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

–[ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৭৫]

আসহাবে কাহাফ এখনো জীবিত আছেন কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাকে কাহাফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহাফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশহার জন্য দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন–

قَالَ قَتَادَةُ غَزَا اِبْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُّوْا بِكَهْفٍ فِىْ بِلَادِ الرُّوْمِ فَرَأَوْا فِيْهِ عِظَامًا فَقَالَ قَائِلٌ هٰذِهٖ عِظَامُ اَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ بَلِيَتْ عِظَامُهُمْ مِنْ اَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ مِأَةِ سَنَةٍ

অর্থাৎ, হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল, এগুলো আসহাবে কাহাফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তাদের হাড় তো তিনশত বছর পূর্বে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কুরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কুরআনের কোনো আয়াত বুঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোনো অকাট্য ফায়সালা করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কুরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হবে।

ফায়দা : আসহাবে কাহাফের ঘটনা অসংখ্য হওয়ার কারণে اَصْحَابُ كَهْفٍ-এর পরে اَلرَّقِيْمِ-কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. যাহহাক (র.) বলেন, রোমের এক শহরে একটি গুহা আছে যাতে ২১ জন মানুষ শায়িত। মনে হয় যেন তারা শুয়ে রয়েছেন।

২. ইবনে আতিয়া (র.) শাম দেশের একটি গুহার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে কিছু মরা লাশ রয়েছে এবং সেই গুহার নিকট একটি মসজিদও রয়েছে।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে আকাবা উপকূলের নিকট ফিলিস্তীনের নিম্নাঞ্চল ঈলা এর নিকটবর্তী একটি গুহা রয়েছে।

৪. আফসূস শহরের একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। যার ইসলামি নাম হলো তুরতুস। এই শহর এশিয়া মাইনরের -এর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

মোটকথা দীন ও ঈমানের সংরক্ষণে গুহায় আশ্রয় নেওয়ার অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে সকল ঘটনাবলি হতে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যাদের নাম ও অবস্থা সীসার ফলকে খোদাই করে শাহী ধনাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। যেহেতু এই যুবকবৃন্দ উচ্চ বংশের মধ্যমণি ছিলেন তাই তাদের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া তাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বংশধর এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রের জন্যও দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার কারণ ছিল। এই কতিপয় যুবক কালের প্রথা ডিঙ্গিয়ে ক্ষমতাধর কাফেরের জুলুম নিপীড়ন থেকে পলায়ন করে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য শহর তথা লোকালয় হতে বেরিয়ে গহীন অরণ্যের একটি অন্ধকার গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তথায় বসে তারা ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে কায়মনো বাক্যে দরবারে ইলাহীতে ফরিয়াদ জানালেন–

প্রভু হে! আমাদেরকে অনুগ্রহ কর, দয়া কর, রহম কর, আমাদের ঈমান সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! আমাদেরকে সাহায্য কর! তোমার সহায়তা বিনে দীনে ইলাহীতে দৃঢ়পদ থাকা সম্ভব নয়। ওগো দয়াময়! চতুর্দিকে বিরোধিতার জাল ছেয়ে গেছে। আমাদের ঈমান হরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা, অন্যথায় হত্যার হুমকি ধমকি দিচ্ছে, আমাদেরকে হত্যার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। অন্যায় তো শুধু একটিই, আমরা তোমাকে এক বলে বিশ্বাস করি, তোমার বিধান মতে জীবন গড়ি। ওগো আল্লাহ! আমরা আমাদের জীবন প্রদীপের জন্য চিন্তা করি না, শুধু ভাবি দীন থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

আল্লাহ তা'আলা এই মজলুম যুবকবৃন্দের দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের ও তাদের প্রাণপ্রিয় দীনের হেফাজতের উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন। –[জামালাইন, খ. ৪ পৃ. ২৮-২৯]

অনুবাদ :

١٣. نَحْنُ نَقُصُّ نَقْرَأُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ط بِالصِّدْقِ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ـ

১৩. আমি আপনার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে সত্য সহকারে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।

١٤. وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ قَوَّيْنَاهَا عَلٰى قَوْلِ الْحَقِّ اِذْ قَامُوْا بَيْنَ يَدَىْ مَلِكِهِمْ وَقَدْ اَمَرَهُمْ بِالسُّجُوْدِ لِلْاَصْنَامِ ـ فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ اِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا ـ اَىْ قَوْلًا ذَا شَطَطٍ اَىْ اِفْرَاطٍ فِى الْكُفْرَانِ دَعَوْنَا اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَرْضًا ـ

১৪. আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম অর্থাৎ সত্য কথা বলার জন্য তাদের অন্তর শক্তিশালী করেছিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়াল তাদের রাজার সামনে অথচ রাজা তাদেরকে মূর্তির সামনে সিজদা করতে বলেছিল। তখন তারা বললেন, আমাদের প্রতিপালক হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তার পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করব না। যদি করে বসি, তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে। অর্থাৎ ধরে নিলাম যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ ডেকেই বসি তাহলে আমরা কুফরিতে সীমালঙ্ঘনকারী রূপে সাব্যস্ত হবো।

١٥. هٰؤُلَاۤءِ مُبْتَدَاٌ قَوْمُنَا عَطْفُ بَيَانٍ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ط لَوْلَا هَلَّا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ عَلٰى عِبَادَتِهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ بِحُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَمَنْ اَظْلَمُ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ـ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ اِلَيْهِ تَعَالٰى ـ

১৫. এরাই আমাদের স্বজাতি। هٰؤُلَاۤءِ শব্দটি مُبْتَدَاٌ আর قَوْمُنَا হলো عَطْفُ بَيَانٍ এরা আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। কেন তারা উপস্থিত করে না তাদের সম্বন্ধে তাদের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ প্রকাশ্য দলিল। কে তার অপেক্ষা অধিক জালিম অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম আর কেউ নয়, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাঁর প্রতি অংশীদার সাব্যস্ত করে।

١٦. قَالَ بَعْضُ الْفِتْيَةِ لِبَعْضٍ ـ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ـ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ مَا تَرْتَفِقُوْنَ بِهٖ مِنْ غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ ـ

১৬. যুবকরা পরস্পর একজন অন্যজনকে বলল, তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ কর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। مِرْفَقًا শব্দটি مِيْم হরফে যের এবং فَاءْ হরফে যবর দিয়ে এবং তার উল্টোভাবেও পঠিত। مَرْفِقْ অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যার ঐ খাবার যা দ্বারা তোমরা উপকৃত হবে।

অনুবাদ :

১৭. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّاوَرُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ تَمِيْلُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ نَاحِيَتَهُ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تَتْرُكُهُمْ وَتَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ فَلَا تُصِيْبُهُمُ الْبَتَّةَ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِنْهُ . مُتَّسِعٌ مِنَ الْكَهْفِ يَنَالُهُمْ بَرْدُ الرِّيْحِ وَنَسِيْمُهَا ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ دَلَائِلِ قُدْرَتِهٖ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا .

১৭. আর তুমি দেখতে পাবে সূর্য উদয়কালে তাদের গুহায় ডান পার্শ্বে হেলে যায় تَزَّاوَرُ শব্দটির زَاءْ বর্ণটি তাশদীদ যুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে রেখে ঝুঁকে অতিক্রম করে চলে যায়। যার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের উপর রৌদ্র পড়ে না। তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত প্রশস্ত জায়গায়। যেখানে তাদের শীতল বাতাস এবং পূবালী সমীরণ পৌঁছে। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন। অর্থাৎ, তাঁর কুদরতের প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِتْيَةٌ : فِتْيَةٌ শব্দটি فَتًى-এর বহুবচন। যেমন صِبْيَةٌ শব্দটি صَبِيٌّ-এর বহুবচন। অর্থ– যুবক, নওজোয়ান।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : এটা مُتَلَبِّسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে হয়তো نَقُصُّ-এর فَاعِلٌ থেকে حَالٌ হবে অথবা نَبَا-এর মাফঊল থেকে حَالٌ হবে।

قَوْلُهُ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ : এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ : বাক্যটি জুমলা হয়ে فِتْيَةٌ-এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبَطْنَا : শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে মাযীর সীগাহ। মাসদার اَلرَّبْطُ অর্থ হলো– বাঁধা, শক্তিশালী করা।

قَوْلُهُ لَنْ نَّدْعُوَا : এটি جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ-এর نَفْيُ تَاكِيْد بِلَنْ دَرْ فِعْلُ مُسْتَقْبِلٌ-এর সীগাহ, এর শেষের واو টি হলো لَامْ كَلِمَةٌ; এটা বহুবচনের وَاوْ নয়। তবে বহুবচনের وَاوْ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে এর শেষে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে লেখা হয়েছে। অর্থ– কখনো আহ্বান করবে না।

قَوْلُهُ شَطَطًا : এটা بَابُ نَصَرَ وَ ضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ হলো– সীমাতিক্রম করা। সত্য হতে দূরে অবস্থান করা। رَبَطْنَا إِذْ قَامُوْا হলো رَبَطْنَا-এর ظَرْفٌ আর فَاذْا-এর فَاءٌ টি جَزَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ قَوْلًا ذَا شَطَطٍ : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَطَطًا শব্দটি মুজাফ উহ্য থেকে মাসদার হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর তার মওসূফ قَوْلًا উহ্য রয়েছে। আর যদি ذَا-কে উহ্য না মানা হয় তবে মাসদারের حَمْلٌ মুবালাগার ভিত্তিতে হবে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মধ্যে হয়েছে।

قَوْلُهُ فَرْضًا : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা তো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। না জ্ঞানের দিক থেকে, না শরিয়তের দিক থেকে, না চারিত্রিকভাবে। এরপরেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ এরূপ করল তবে সে নিশ্চিতভাবেই মারাত্মক গর্হিত কাজ করল।

قَوْلُهُ هٰؤُلَاءِ : এখানে هٰؤُلَاءِ শব্দটি مُبْتَدَأٌ আর اِتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হলো তার خَبَرٌ

قَوْلُهُ قَوْمُنَا : قَوْمُنَا শব্দটি هٰؤُلَاءِ হতে আতফে বয়ান হয়েছে। আবার এটা بَدَلٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ تَزَاوَرُ : এ শব্দটি মূলত تَتَزَاوَرُ ছিল। একটি تَاءٌ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে تَزَاوَرُ হয়েছে। আর শব্দটিকে যদি تَزَّاوَرُ তথা زَاءٌ তাশদীদযুক্ত ধরা হয়, তবে এক تَاءٌ -কে زَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করে زَاءٌ -কে زَاءٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। ফলে تَزَّاوَرُ হয়েছে। অর্থ– মানুষের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করা। আর যদি এর صِلَةٌ টা عَنْ আসে তখন অর্থ হবে মুখ ফিরানো। একে অপরকে পরিত্যাগ করা।

قَوْلُهُ تَقْرِضُهُمْ : এটা مُضَارِعٌ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– কর্তন করা। কাটা। টুকরা করা।

قَوْلُهُ ذَاتَ : এটা ذُوْ -এর স্ত্রী লিঙ্গ। আয়াতে ذَاتَ শব্দটি অতিরিক্ত হয়েছে। যাকে বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আনা হয়েছে। আর ذَاتَ الْيَمِيْنِ এবং ذَاتَ الشِّمَالِ শব্দদ্বয় تَزَاوَرُ -এর যরফে মাকান হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاحِيَتَهُ : তাফসীরে نَاحِيَةٌ বৃদ্ধি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ذَاتَ الْيَمِيْنِ এবং ذَاتَ الشِّمَالِ শব্দদ্বয় ظَرْفُ مَكَانٍ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ : এটা হলো جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ

قَوْلُهُ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ : এ বাক্যটি ঘটনা বর্ণনার মাঝে একটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, যাতে করে যারা সত্য সাধনায় রত, যারা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সৎকাজের দৃঢ়তা অর্জন করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাহায্য কামনা করে তাদের জন্য এই ঘটনাটি হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়।

قَوْلُهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ : তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ বাক্যটি এ জন্য ইরশাদ করেছেন যে, আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়। এর মধ্যে অনেক অসত্য কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ঘটনা বর্ণনার পূর্বাহ্নেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আমি আপনার নিকট এই ঘটনার সঠিক বিবরণ পেশ করছি। আসহাবে কাহাফ হলেন কয়েকজন নওজোয়ান। তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল, অথচ তাদের সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ মূর্তিপূজক। তারা শিরক, কুফর, মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল এবং তারা অন্যদেরকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করতো।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ : فَتًى -এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ– যুবক। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুবক।

–[ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান]

قَوْلُهُ وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা যখন হয়েছে, তখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আপন মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَأْوُوْا اِلَى الْكَهْفِ : ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গাম্বরের সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায়।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

فَأْوُوْا اِلَى الْكَهْفِ : আয়াতাংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের প্রেমাস্পদের সাথে একাকিত্ব গ্রহণ কর, তবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিবেন। কতিপয় বুজুর্গ বলেন, গায়রুল্লাহ হতে দূরে সরে নির্জনতা ও একাকিত্ব গ্রহণই হলো রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ وَتَرَى الشَّمْسَ الخ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলোর সাথে আঁধারের সংমিশ্রণের উপকারিতা হলো এই যে অতিরিক্ত আলোর কারণে একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কেননা, অন্ধকার থেকে সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে সাহায্য পাওয়া যায়। এ কারণেই তো ধ্যান করার জন্য ক্ষীণ আলোকময় স্থানকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তদুপরি চোখ বন্ধ করেই ধ্যানমগ্ন হতে হয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ الخ : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে যোগ্যতাই নেই তার সংশোধন করা খুবই কঠিন। এমনকি এটা অসম্ভবও বটে।

অনুবাদ :

১৮. وَتَحْسَبُهُمْ لَوْ رَأَيْتَهُمْ اَيْقَاظًا اَىْ مُنْتَبِهِيْنَ لِاَنَّ اَعْيُنَهُمْ مُفَتَّحَةٌ جَمْعُ يَقِظٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَّهُمْ رُقُوْدٌ نِيَامٌ جَمْعُ رَاقِدٍ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ق لِئَلَّا تَاكُلَ الْاَرْضُ لُحُوْمَهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ يَدَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط بِفِنَاءِ الْكَهْفِ وَكَانُوْا اِذَا انْقَلَبُوْا اِنْقَلَبَ وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِى النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْهُمْ رُعْبًا ـ بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا مَنَعَهُمُ اللّٰهُ بِالرُّعْبِ مِنْ دُخُوْلِ اَحَدٍ عَلَيْهِمْ ـ

১৮. যদি আপনি তাদেরকে দেখতেন তাহলে আপনি মনে করতেন তারা জাগ্রত অর্থাৎ জাগ্রত মনে করতেন এজন্য যে, তাদের চোখ উন্মুক্ত। اَيْقَاظٌ শব্দটি يَقِظٌ-এর বহুবচন। অথচ তারা নিদ্রিত رُقُوْدٌ শব্দটি رَاقِدٌ-এর বহুবচন। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করতাম ডান দিকে ও বাম দিকে যাতে জমিন তাদের শরীরের গোশত খেয়ে না ফেলে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে গুহার আঙ্গিনায়। আর গুহার অধিবাসীরা যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করে তথা শয়ন ও জাগরণের ক্ষেত্রে কুকুরটির অবস্থানও তাদের মতোই। আপনি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছন ফিরে পলায়ন করতেন ও তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন لَمُلِئْتَ শব্দটির لَامْ বর্ণটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। رُعْبًا শব্দের ع বর্ণটিতে সুকূন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ভীতির সৃষ্টি করে লোকজনকে তাদের কাছে যেতে বারণ করেছেন।

১৯. وَكَذٰلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكَرْنَا بَعَثْنٰهُمْ ـ اَيْقَظْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ط عَنْ حَالِهِمْ وَمُدَّةِ لُبْثِهِمْ ـ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط لِاَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهْفَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَبُعِثُوْا عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَظَنُّوْا اَنَّهُ غُرُوْبُ يَوْمِ الدُّخُوْلِ ثُمَّ قَالُوْا مُتَوَقِّفِيْنَ فِىْ ذٰلِكَ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ز فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا بِفِضَّتِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ

১৯. এভাবেই যেমনিভাবে আমি আসহাবে কাহাফের উপরে বর্ণিত আচরণ করেছি। আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম। যাতে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান কাল সম্পর্কে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা গুহায় সূর্য উদিত হওয়ার সময় প্রবেশ করেছিল এবং সূর্যাস্তের সময় জাগ্রত হয়েছিল তাই তারা মনে করল এটা গুহায় প্রবেশের দিনেরই সূর্যাস্ত। কেউ কেউ ক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা করে বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর। بِوَرِقِكُمْ শব্দের رَاءْ বর্ণে সুকূন ও কাসরা উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

يُقَالُ اِنَّهَا الْمُسَمَّاةُ الْاٰنَ طَرَطُوْسُ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا اَىْ اَطْعِمَةِ الْمَدِيْنَةِ اَحَلُّ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ـ

অনুবাদ :

কথিত আছে যে, বর্তমানে সে শহরটিকে তারাতুস বলা হয়। طَرَطُوْس -এর رَاء বর্ণে যবর হবে। সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম অর্থাৎ সে শহরের কোন খাদ্যটি হালাল এবং তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করে। এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।

٢٠. اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا يَطَّلِعُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ يَقْتُلُوْكُمْ بِالرَّجْمِ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِىْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَىْ اِنْ عُدْتُمْ فِىْ مِلَّتِهِمْ اَبَدًا ـ

২০. তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে অবগত হতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাও তবে তোমরা কিছুতেই সফল হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْوَصِيْدِ : اَلْوَصِيْدُ -এর অর্থ ফটকদ্বার। চৌকাঠ। দেউড়ি। প্রবেশদ্বার। গ্রন্থকার এখানে অর্থ নিয়েছেন প্রশস্ত জায়গা, আঙ্গিনা।

قَوْلُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ : এটা حِكَايَت حَال مَاضِيَة কেননা ইসমে ফায়েল যদি মাযীর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমল করা থেকে বিরত থাকে।

قَوْلُهُ بِالْوَصِيْدِ : এটা بَاسِطٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ এবং ذِرَاعَيْهِ হলো بَاسِطٌ-এর মাফঊলে বিহী।

قَوْلُهُ فِرَارًا : এটা وَلَّيْتَ ফেলের مَفْعُوْلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهٖ আবার এটা وَلَّيْتَ থেকে حَال -ও হতে পারে আবার مَفْعُوْل -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ رُعْبًا : অর্থ হলো خَوْفًا এটা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এরপর এটা وَلَّيْتَ-এর مَفْعُوْل ثَانِىْ হয়েছে। আর كَمَا فَعَلْنَا -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَذَالِكَ-এর مَرْجِعْ -কে প্রকাশ করে দেওয়া।

قَوْلُهُ بَعَثْنَا : بَعَثْنَا -এর তাফসীর اَيْقَظْنَا দ্বারা করা হয়েছে অর্থকে নির্দিষ্ট করার জন্য। কেননা بَعَثْنَا ফেয়েলটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ্রত হওয়া।

قَوْلُهُ لِيَتَسَاءَلُوْا : এর মধ্যে لَامْ টি عَاقِبَة বা سَبَبِيَّة -এর জন্য হয়েছে। كَمْ টি ظَرْفِيَّتْ -এর কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। এর مُمَيَّزْ টা উহ্য রয়েছে। মূলত তা এরূপ ছিল যে- كَمْ مُدَّةً لَبِثْتُمْ

قَوْلُهُ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : এটা لِيَتَسَاءَلُوْا-এর بَيَانٌ হয়েছে। আর اَزْكٰى হলো তার খবর।

قَوْلُهُ طَعَامًا : طَعَامًا হলো تَمْيِيْز মুযাফ ইলাইহি হতে مَنْقُوْل অর্থাৎ اَزْكَى الطَّعَامِ এরপর এটা জুমলা হয়ে يَنْظُرُ -এর مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। اَيُّهَا-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْاَطْعِمَةُ যা পরস্পর কথোপকথনের সময় مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে তারকীব এভাবে যে, أَيُّهَا -এর هَاءِ যমীরের مَرْجِعْ হবে مَدِيْنَة তখন মূল ইবারত এরূপ হবে যে- اَيُّ اَهْلِهَا اَطْيَبُ طَعَامًا অর্থাৎ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি খাবার দাবারের ব্যাপারে পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

قَوْلُهُ اِذًا : اِذًا -এর পরে اِنْ عُدْتُمْ এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِذًا হলো لَنْ مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنٰى شَرْطٍ আর تُفْلِحُوْا হলো তার জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসহাবে কাহাফের কুকুর : আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের হেফাজতের প্রকাশ্য ব্যবস্থা হিসেবে ঐ গর্তের বাইরে একটি কুকুরও মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এই পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, কুকুরটিকে চৌকাঠে রাখার কারণ হলো এই, যে গৃহে কুকুর বা ছবি বা নাপাক ব্যক্তি বা কাফের থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি : বস্তুত সংসর্গ এক বিস্ময়কর বিষয়, যদি ভালো লোকেরা সংসর্গ কেউ অর্জন করে তবে সে আরো ভালো হয় আর মন্দ লোকেরা সংসর্গে ভালো মানুষও মন্দ হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আসহাবে কাহাফের ন্যায় নেককার লোকদের সংসর্গে থাকার কারণে তাদের কুকুরটি এত গুরুত্ব পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ হয়েছে। এই কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর।

বর্ণিত আছে যে, আসহাবে কাহফের একজনেরই ছিল এই কুকুরটি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে এটি ছিল দাকয়ানুস রাজার বাবুর্চির কুকুর। সে আসহাবে কাহাফের সাথী হয়ে হিজরত করেছিল। কিতমীর নামক এই কুকুরটি বেহেশতে যাবে বলে বর্ণিত আছে। এজন্য শায়খ সাদী (র.) বলেছেন-

پسر نوح بابدان نشست * خاندان نبوتش گم شد ۔

سگ اصحاب كهف روزے چند * پئے نيكان گرفت مردم شد ۔

হযরত নূহ (আ.)-এর পূত্র সঙ্গদোষে নবুয়ত হারালো, আর আসহাবে কাহাফের কুকুর কয়েকদিন নেককার লোকদের সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ হয়ে গেল।

মুজাহিদ (র.) ও যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতের اَلْوَصِيْدِ শব্দটির অনুবাদ করেছেন গর্তের আঙ্গিনা। আর তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো চৌকাঠ। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, এই শব্দটির অর্থ হলো দুয়ার। ইকরামার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিলো; কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি কুকুর ছিল না; বরং এটি ছিল বাঘ। কেননা সকল চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেই আরবি ভাষায় "কালব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।" লাহাবের পুত্র উৎবার জন্যে বদদোয়া করে ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ নিজের কোনো কালবকে [কুকুরকে] তার উপর চড়াও করে দাও [এই বদদোয়া কবুল হয়েছে] এবং উতবাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলেছিল। এ মতপোষণ করেছেন ইবনে জুরাইজ (র.)। তবে প্রথম অভিমত তথা আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিল এ মতই সর্বজনবিদিত।

-[তাফসীরে রুহুল মাআনী, খ. ১৫, পৃ. ২২৫]

মুকাতেল (র.) বলেছেন, কুকুরটির বর্ণ ছিল হলুদ, আর কুরতুবী (র.) বলেছেন, তার বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত হলুদ। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তার বর্ণ ছিল পাথরের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর। আর হযরত আলী (রা.)-এর মতে তার নাম ছিল রিয়ান। আর আওযায়ী (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল তাকুর। কাব (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল 'সাহবা'।

খালেদ ইবনে মিদান বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর এবং বালম ইবনে বাউরের গাধা ব্যতীত কোনো চতুষ্পদ জন্তু জান্নাতে যাবে না। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিফাজতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু' কিরাত হ্রাস পায়। [কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের বিধান ব্যতিক্রম বলে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাজতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার ভক্ত আসহাবে কাহাফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরিয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খ্রিস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাজতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন ককুরও তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎসঙ্গের বরকত কুকরের সম্মানও বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়া বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরিতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফজল জওহারীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের নেকীর অংশ সেও পাবে। দেখ, আসহাবে কাহাফের কুকুর তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সৎসঙ্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালোবাসে তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মনেপ্রাণে ভালোবাসে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজদি থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ [যে তা আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ]? এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলো। অতঃপর সে বলল, আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামাজ, রোজা ও দান খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তাই হয় তবে [শুনে নাও] তুমি [কিয়ামতে] তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাস। হযরত আনাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে একথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চেয়ে বেশি আনন্দিত কোনো সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন, [আলহামদুলিল্লাহ] আমি আল্লাহকে, তার রাসূল ﷺ -কে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে ভালোবাসি। এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব। -[কুরতুবী]

আসহাবে কাহাফের ভীতিপ্রদ অবস্থা : আসহাবে কাহাফকে আল্লাহ তা'আলা এত ভীতিপ্রদ অবস্থা দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না। لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ আয়াতে বাহ্যত সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই এটা জরুরি নয় যে, আসহাবে কাহাফের ভয়ভীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে।

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কুরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এই যে, তাদের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপ দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসেবে আলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভব। কুরআন ও হাদীস যখন এর কোনো বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক।

তাফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমরা রোমকদের মোকাবিলায় হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে এক জিহাদে শরিক হয়েছিলাম, যা 'গজওয়াতুল মুযীফ' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া (রা.) আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার চেয়েও বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি لَوِ اطَّلَعْتَ আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত কবুল করলেন না। [সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কুরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহাফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। –[তাফসীরে মাযহারী]

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ الخ : তারা এতো গভীর ঘুমে ছিলেন যে, তারা কতকাল ঘুমিয়েছিলেন তাও অনুভব করতে পারছিলেন না। জাগ্রত হওয়া পর একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, কতকাল ঘুমিয়েছ? সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনুমান করে নিদ্রিত সময়ের কথা বলতে লাগলেন। তখন তাদের একজন বললেন যে, এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত করে এসো কাজের কথা বলি।

قَوْلُهُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ : হতে পারে এটা সামান্য সময়ের প্রতি ইঙ্গিত। ফুকাহায়ে কেরাম তাদের ধারণাপ্রসূত কথা যাতে পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কোনোরূপ দোষারোপ করা হয়নি" থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কেউ যদি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলে ফেলেন যা বাস্তবের অনুকূলে হয় না তবে এ কারণে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না।

قَوْلُهُ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ : এখানে টাকা দ্বারা সে মুদ্রাই উদ্দেশ্য যা দাকয়ানুসের যুগে সে দেশে প্রচলিত ছিল। তার সেই মুদ্রায় রোম সম্রাটের ছবি খোদাইকৃত ছিল। সে কালের কিছু মুদ্রা তাদের পকেটে ছিল।

قَالَ الْمُفَسِّرُوْنَ كَانَتْ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ عَلَيْهَا صُوْرَةُ الْمَلِكِ كَانَ فِىْ زَمَانِهِمْ ـ (كَبِيْر)

মুহাক্কিকগণ/সূক্ষ্মদর্শীগণ এখান থেকে এই মাসআলা বের করেছেন যে, সফরকালে সফরের পাথেয় সাথে নিয়ে ভ্রমণ করাটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়।

وَحَمْلُهُمُ الْوَرَقَ عِنْدَ فِرَارِهِمْ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ حَمْلَ النَّفَقَةِ وَمَا يَصْلُحُ لِلْمُسَافِرِ هُوَ رَاْىُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَى اللّٰهِ دُوْنَ الْمُتَّكِلِيْنَ عَلَى الْاِنْفَاقَاتِ ـ (مَدَارِكْ)

তাফসীরে বায়যাবীতে আছে- وَحَمْلُهُمْ لَهٗ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ التَّزَوُّدَ رَاْىُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

ফুকাহায়ে কেরাম এখান থেকে আরেকটি মাসআলা বের করেছেন যে, কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত পূজি থেকে খাবার ক্রয় করে সকলেই একত্রে আহার করলে যদিও তাতে কম বেশি হয়ে থাকে তা জায়েজ।

يَدُلُّ عَلٰى جَوَازِ خَلْطِ دَرَاهِمِ الْجَمَاعَةِ وَالشِّرٰى بِهَا وَالْاَكْلُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِىْ بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يَاْكُلُ اَكْثَرَ مِمَّا يَاْكُلُ غَيْرُهٗ وَهٰذَا الَّذِىْ يُسَمِّيْهِ النَّاسُ الْمُنَاهَدَةَ وَيَفْعَلُوْنَهٗ فِى الْاَسْفَارِ ـ (جَصَّاصْ)

–[তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬৩১]

অনুবাদ :

٢١. وَكَذٰلِكَ كَمَا بَعَثْنَاهُمْ اَعْثَرْنَا اَطْلَعْنَا عَلَيْهِمْ قَوْمَهُمْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ لِيَعْلَمُوْٓا اَيْ قَوْمُهُمْ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ بِطَرِيْقِ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى اِنَامَتِهِمُ الْمُدَّةَ الطَّوِيْلَةَ وَاِبْقَائِهِمْ عَلٰى حَالِهِمْ بِلَا غِذَاءٍ قَادِرٌ عَلٰى اِحْيَاءِ الْمَوْتٰى وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا ج اِذْ مَعْمُوْلٌ لِاَعْثَرْنَا يَتَنَازَعُوْنَ اَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكُفَّارُ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ اَمْرَ الْفِتْيَةِ فِي الْبِنَاءِ حَوْلَهُمْ فَقَالُوْا اَيِ الْكُفَّارُ ابْنُوْا عَلَيْهِمْ اَيْ حَوْلَهُمْ بُنْيَانًا يَسْتُرُهُمْ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ اَمْرِ الْفِتْيَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ حَوْلَهُمْ مَّسْجِدًا ـ يُصَلّٰى فِيْهِ وَفُعِلَ ذٰلِكَ عَلٰى بَابِ الْكَهْفِ ـ

২১. এভাবে যেমনিভাবে তাদেরকে জাগিয়েছি আমি জানিয়ে দিলাম অবগত করলাম তাদের বিষয় তাদের সম্প্রদায় ও ঈমানদারগণের অবস্থা যাতে তারা সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য। কেননা যে সত্তা এত দীর্ঘ সময় ঘুমন্ত রাখতে সক্ষম এবং পানাহার ব্যতিরেকে স্বীয় অবস্থায় স্থির রাখতে পারেন অবশ্যই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করতে সক্ষম। নিশ্চয় কিয়ামতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন اِذْ এটা اَعْثَرْنَا -এর مَعْمُوْلٌ তারা মু'মিন ও কাফেররা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতেছিল তাদের কর্তব্য বিষয়ে ঐ যুবকদের স্মরণে এখানে ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে তখন তারা কাফেররা বলল, তাদের উপর গর্তের উপর নির্মাণ কর সৌধ যা তাদেরকে ছায়া দিবে। তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল যুবকদের ব্যাপারে। তারা হলো মু'মিনগণ। আমরা তো নিশ্চয় তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব যেখানে নামাজ পড়া হবে। সে মতে গুহার প্রবেশ পথে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

٢٢. سَيَقُوْلُوْنَ اَيِ الْمُتَنَازِعُوْنَ فِيْ عَدَدِ الْفِتْيَةِ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَيْ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ هُمْ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُوْلُوْنَ اَيْ بَعْضُهُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَالْقَوْلَانِ لِنَصَارٰى نَجْرَانَ رَجْمًا ۢ بِالْغَيْبِ ج اَيْ ظَنًّا فِي الْغَيْبَةِ عَنْهُمْ وَهُوَ رَاجِعٌ اِلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَنَصَبُهُ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لَهُ اَيْ لِظَنِّهِمْ ذٰلِكَ وَيَقُوْلُوْنَ اَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ـ

২২. কেউ কেউ বলবে মহানবী ﷺ -এর যুগে আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে বিতর্ককারীরা পরস্পরে বলবে তারা ছিল তিনজন তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, অর্থাৎ পরস্পরে তাঁরা ছিল পাঁচজন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। এ দুটি অভিমত নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ শুধুই ধারণা করে رَجْمًا بِالْغَيْبِ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত উভয় মতের সাথেই। আর رَجْمًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ لِظَنِّهِمْ ذٰلِكَ অর্থে আবার কেউ কেউ মু'মিনগণ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।

اَلْجُمْلَةُ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ صِفَةُ سَبْعَةٍ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَقِيْلَ تَاكِيْدٌ أَوْ دَلَالَةٌ عَلٰى لُصُوْقِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوْفِ وَ وَصْفُ الْأَوَّلَيْنِ بِالرَّجْمِ دُوْنَ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ مَرْضِيٌّ صَحِيْحٌ ـ قُلْ رَّبِّيْٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَا مِنَ الْقَلِيْلِ وَذَكَرَهُمْ سَبْعَةً فَلَا تُمَارِ تُجَادِلْ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ تَطْلُبُ الْفُتْيَا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدِ أَحَدًا ـ وَسَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْ خَبَرِ أَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ أُخْبِرُكُمْ بِهِ غَدًا وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَنَزَلَ ـ

অনুবাদ :

এ বাক্যটি মুবদাতা-খবর এবং وَاوْ বৃদ্ধিসহ سَبْعَةٌ -এর সিফত। কারো মতে সিফত এবং মওসূফের মধ্যে জোর সৃষ্টি এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে وَاوْ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর শুধু প্রথম দুটি অভিমতকে رَجْمًا بِالْغَيْبِ বিশেষণে বিশিষ্ট করা এবং তৃতীয়টিকে না করা এবং তৃতীয় অভিমতটি পছন্দনীয় ও বিশুদ্ধ হওয়াকে বুঝায়। আপনি বলুন আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভালো জানেন; তাদের সংখ্যার খবর অল্প কয়েকজনই জানে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা ছিল সাতজন। আপনি তর্ক করবেন না বহছ করবেন না। তাদের বিষয়ে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তাদের বিষয়ে ওদের আহলে কিতাব ইহুদিদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। মক্কাবাসী রাসূল ﷺ -কে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে আগামীকাল বলে দিব। এক্ষেত্রে তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে–

٢٣. وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْئٍ أَيْ لِأَجْلِ شَيْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ـ أَيْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الزَّمَانِ ـ

২৩. কখনোই আপনি কোনো বিষয়ে বলবেন না যে, আমি তা আগামীকাল করব। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো দিন।

٢٤. إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ أَيْ إِلَّا مُتَلَبِّسًا بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ بِأَنْ تَقُوْلَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ أَيْ مَشِيَّتَهُ مُعَلَّقًا بِهَا إِذَا نَسِيْتَ التَّعْلِيْقَ بِهَا وَيَكُوْنُ ذِكْرُهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ كَذِكْرِهَا مَعَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ وَقُلْ عَسٰٓى أَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا مِنْ خَبَرِ أَهْلِ الْكَهْفِ فِي الدَّلَالَةِ عَلٰى نُبُوَّتِيْ رَشَدًا ـ هِدَايَةً وَقَدْ فَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ ـ

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কথা না বলে/ইনশাআল্লাহ না বলে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে জুড়ে দিয়ে বলবেন, ইনশাআল্লাহ। আর স্মরণ করুন আপনার প্রতিপালককে অর্থাৎ কাজটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করুন যখন ভুলে যান তার সাথে সম্পৃক্ত করাটা অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা। সুতরাং ভুলে যাওয়ার পর তা বলা কথার সাথে উল্লেখ করার মতোই। হযরত হাসান (র.) বলেন, ভুলে যাওয়ার পর এক মজলিস অব্যাহত থাকা পর্যন্ত উক্ত বাক্যটি বললে শুরুতে বলার হুকুমে হবে। আর বলুন! সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়েও অধিক। আমার নবুয়তের বিষয়টি বুঝানোর ক্ষেত্রে আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

অনুবাদ :

٢٥. وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ بِالتَّنْوِيْنِ سِنِيْنَ عَطْفُ بَيَانٍ لِثَلَاثَمِائَةٍ وَهٰذِهِ السِّنُوْنَ الثَّلَاثُمِائَةِ عِنْدَ اَهْلِ الْكِتَابِ شَمْسِيَّةٌ وَتَزِيْدُ الْقَمَرِيَّةُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَرَبِ تِسْعَ سِنِيْنَ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِىْ قَوْلِهِ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ـ اَىْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَالثَّلَاثُمِائَةِ الشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعٌ قَمَرِيَّةٌ ـ

২৫. তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর مِأَةٍ শব্দটি তানভীনসহ পঠিত। আর سِنِيْنَ হলো ثَلَاثَ مِأَةٍ -এর আতফে বয়ান। আর এই তিনশত বছর সময় আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বছর গণনায়। আরবরা চান্দ্র মাসের হিসেবে আরো নয় বছর বৃদ্ধি করেছে। যা সামনে বর্ণিত হয়েছে। আর মানুষেরা আরো নয় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নয় বৎসর, সুতরাং তিনশত বছর হলো সৌর মাস গণনার ভিত্তিতে আর তিনশত নয় বছর হলো চন্দ্রমাস গণনার ভিত্তিতে।

٢٦. قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ج مِمَّنِ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ـ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ عِلْمُهٗ اَبْصِرْ بِهٖ اَىْ بِاللّٰهِ هِىَ صِيْغَةُ تَعَجُّبٍ وَاَسْمِعْ ط بِهٖ كَذٰلِكَ بِمَعْنٰى مَا اَبْصَرَهٗ وَمَا اَسْمَعَهٗ وَهُمَا عَلٰى جِهَةِ الْمَجَازِ وَالْمُرَادُ اَنَّهٗ تَعَالٰى لَا يَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهٖ وَسَمْعِهٖ شَىْءٌ مَا لَهُمْ لِاَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ نَاصِرٍ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ـ لِاَنَّهٗ غَنِىٌّ عَنِ الشَّرِيْكِ ـ

২৬. আপনি বলুন! তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তাদের চেয়ে বেশি যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করছে। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ! اَبْصَرَ শব্দটি বিস্ময়সূচক শব্দ। এবং কি সুন্দর শ্রোতা তিনি। এ اَسْمَعَ শব্দটিও বিস্ময়সূচক শব্দ। এ উভয় শব্দ مَا اَبْصَرَهٗ وَمَا اَسْمَعَهٗ -এর অর্থে। আর এভাবে বলাটা রূপক হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর আয়াতের মর্মার্থ হলো কোনো বস্তুই তার দৃষ্টি এবং শ্রবণের বাইরে নয়। তাদের নেই আসমান ও জমিনবাসীদের তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরিক করেন না। কেননা তিনি শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَعْثَرْنَا : এ শব্দটি بَابِ اِفْعَالٌ থেকে مَاضِىْ -এর সীগাহ, মাসদার হলো اِعْثَارٌ অর্থ– অবগত করানো, জানিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهٗ قَوْمَهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ : এটা হলো اَعْثَرْنَا -এর উহ্য مَفْعُوْلٌ بِهٖ

قَوْلُهٗ لِيَعْلَمُوْا : এটা اَعْثَرْنَا -এর مُتَعَلِّقٌ আর وَاَنَّ السَّاعَةَ -এর আতফ হয়েছে اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ -এর উপর।

قَوْلُهٗ يَسْتُرُهُمْ : এটা জুমলা হয়ে بُنْيَانًا -এর সিফত হয়েছে। আর ثَلٰثَةٌ শব্দটি هُمْ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যে দিকে ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ : এই বাক্যটি مُبْتَدَأ ও خَبَرٌ মিলে ثَلٰثَةٌ -এর সিফত হয়েছে। পরবর্তীতে আগত দুটি বাক্যের তারকীবও এরূপই হবে।

قَوْلُهُ رَجْمًا بِالْغَيْبِ : এটা يَرْمُوْنَ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে। অর্থাৎ يَرْمُوْنَ رَمْيًا হালও হতে পারে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِ كَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ رَاجِمِيْنَ بِالْغَيْبِ ; رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ جَاعِلُهُمْ اَرْبَعَةً بِانْضِمَامِهِ اِلَيْهِمْ

قَوْلُهُ وَثَامِنُهُمْ : এখানে وَاوْ টি অতিরিক্ত। تَاكِيْدِىْ مَعْنًى ভ্রুক্ষেপ না করে অথবা تَاكِيْد مَعْنٰى হিসেব করে অর্থাৎ সিফতের সাথে মওসুফের গুণান্বিত হওয়ার তাকিদের জন্য তথা বুঝানোর জন্য। কেননা মওসূফ যখন সিফতের সাথে গুণান্বিত হয় তখন মওসূফের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক হবে। কেন সিফত মওসূফ বিনে অস্তিত্বে আসতে পারে না। উদ্দেশ্য এই হলো যে, আসহাবে কাহাফ কুকুরের সাথে মিলে আট সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তারা হলেন সাতজন আর অষ্টম হলো তাদের কুকুর।

قَوْلُهُ اَوْ دَلَالَةً : এটা اَقْرَبُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর رَشَدًا শব্দটি لِيَهْدِيَنِ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ আর এটা اَقْرَبُ থেকে تَمْيِيْز -ও হতে পারে। অর্থাৎ لِاَقْرَبَ هِدَايَةٍ مِنْ هٰذَا

আর مِأَةٍ শব্দটি ثَلَاثَ -এর تَمْيِيْز এবং سِنِيْنَ শব্দটি مِأَةٍ এর عَطْف بَيَانْ বা بَدَل হয়েছে। কেননা সাধারণ مِأَةٍ -এর تَمْيِيْز যর বিশিষ্ট একক শব্দ বা مُفْرَدْ مَجْرُوْر হয়ে থাকে। এ কেরাতে مِأَةٍ سِنِيْنَ ইযাফতের সাথে রয়েছে। সেই সুরতে سِنِيْن শব্দটি مِأَةٍ -এর تَمْيِيْز হবে এবং বহুবচন বা جَمْع টা مُفْرَدْ -এর মহলে হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনার ইতি টানা হয়েছে। এখানে সর্বমোট পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে–

১. দীর্ঘদিন পর আসহাবে কাহাফকে জাগ্রতকরণ ও জনসম্মুখে তাদের অবস্থা প্রকাশের মধ্যে কি হিকমত ছিল?

২. মানুষের মধ্যে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। একদল গুহার নিকট সৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অপর দল তথায় মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অতঃপর মসজিদ নির্মাণকারী দল বিজয়ী হয়ে তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন।

৩. আসহাবে কাহাফের সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। সেই বিরোধপূর্ণ উক্তিগুলো উল্লেখ করে সঠিক সংখ্যাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. অবশেষে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, আসহাবে কাহাফের যতটুকু বিবরণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অহেতুক অতিরিক্ত আলোচনা করা যাবে না। এ ব্যাপারে অন্য কারো থেকে কোনো কিছু অকাট্যরূপে জানা যাবে না। আর যদি তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব আগামীতে দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ বলে নিতে হবে।

৫. আসহাবে কাহাফ কতকাল নিদ্রিত ছিলেন?

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ الخ : অর্থাৎ যেভাবে আমি আসহাবে কাহাফকে পর্বতগুহায় আশ্রয় দান করেছি, কয়েক শতাব্দী যাবত তাদেরকে নিদ্রিত রেখেছি এবং তাদের দেহকে হেফাজত করেছি, জালেমের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছি, ঠিক এমনিভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছি। যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কিয়ামতের দিন সকল মানুষের পুনরুত্থান হবে, তাঁর ওয়াদার সত্যতা যে মানুষ উপলব্ধি করে এজন্যই আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা। কেননা যে আল্লাহ তা'আলা তিনশত বৎসর ধরে এই আসহাবে কাহাফের রূহকে নিজের কাছে রেখেছেন আর তাদেরকে নিদ্রিত অবস্থায়

ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনশত নয় বৎসর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করেছেন, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৯৫]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

অর্থাৎ এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে বের করবো।

এমনিভাবে আরো ইরশাদ হয়েছে– قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ

তিনি বললেন, তোমরা তাতেই জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং এরপর সেখান থেকে তোমাদেরকে উঠানো হবে। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে।

قَوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا : আর এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ বৈধ, যেন তাঁদের মাজার থেকে বরকত লাভ করা যায়। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ বৃদ্ধি পায় [যখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন] তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে তার কষ্ট হয়, তখন চাদর চেহারা মোবারক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার লা'নত হোক ইহুদি ও নাসারাদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা হুজুর ﷺ এই উম্মতকে আহলে কিতাবদের ন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর ﷺ কবরকে পাকা করা, তার উপর উপবিষ্ট হওয়া এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে আবুল হেয়াজ -এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। আবুল হেয়াজ বলেছেন, আমাকে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করবো না? যে কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি কোনো মূর্তি পাও তবে তাকে ধ্বংস কর, আর যদি কোনো উঁচু কবর পাও তবে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এই হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর লিখেছেন, এই হাদীসসমূহ দ্বারা কবরকে পাকা করা, উঁচু করা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে হুজুর ﷺ আহলে কিতাবের একটি পর্যালোচনা করেছেন। কেননা তারা নবী রাসূলগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। এর অর্থ হলো, তারা কবরকে সেজদা করা শুরু করেছিল।

হযরত আবূ মারসাদ গনবী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবিষ্ট হয়ো না এবং কবরের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করো না। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ১৯৭, মুসলিম শরীফ]

মাসআলা : কোনো মসজিদের পাশে অথবা কোনো ঘরে কাউকে দাফন করা জায়েজ নেই। মৃতব্যক্তিকে কবরস্থানেই দাফন করা চাই। হাদীসে এসেছে– صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا অর্থাৎ তোমরা স্বীয় ঘরে নামাজ পড়। ঘরকে কবর বানিয়ো না। উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁকে স্বীয় হুজরায় দাফন করা হয়েছে।

–[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪০]

আসহাবে কাহফের সংখ্যা : বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা : سَيَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ তাঁরা বলবে। 'তাঁরা' কারা– এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। **১.** এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহাফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তিটি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তিটি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তিটি করেছিল। –[বাহর]

২. سَيَقُوْلُوْنَ বাক্যে নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'ইয়াকুবিয়্যা'। তাঁরা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তুরীয়া'। তাঁরা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসে এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। -[বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ وَثَامِنُهُمْ : এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে وَاو عَاطِفَه [সংযোগকারী ওয়াও] ব্যবহার না করে বলা হয়েছে- ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سَبْعَةٌ -এর وَاو عَاطِفَه এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পর যে সংখ্যা আসত তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হতো। যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি, নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় وَاو عَاطِفَه ব্যবহার করতো না। সাতের পর কোনো সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে وَاو عَاطِفَه এনে পৃথক করে বর্ণনা করতো। এজন্যই وَاوْ -কে وَاو ثَمَان নাম দেওয়া হয়। -[মাযহারী]

আসহাবে কাহাফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তাফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থ বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাঁদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে- মুফসালামিনা, তামলীখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিতুনুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতিয়ুনুস।
তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

هُمْ سَبْعَةٌ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ سَبْعَةُ نَفَرٍ اَسْمَائُهُمْ يَمْلِيْخَا . وَمَكْسَلْمِيْنَا وَمَشْلِيْنَا وَ بَرْنُوْش وَشَاذْنُوْش وَالسَّابِعُ كَفْشَطِيْطُوْش اَوْ كَفَشْطَطِيُوْش وَهُوَ الرَّاعِيْ وافَقَهُمْ وَقَالَ الْكَاشِفِيُّ الْاَصَحُّ اَنَّهُ مَرْطُوْشُ .

-[জালালাইন পৃ. ২৩৪, হাশিয়া নং. ১৪]

কেউ কেউ আসহাবে কাহাফের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, ১. মাকসালমীনা ২. তামলীখা ৩. মারতূনাস ৪. নায়নূনাস ৫. সারবূলাস ৬. যূনাওয়াস ৭. কালইয়াসতুয়ূনাস। এই শেষোক্ত ব্যক্তি রাখাল ছিল যে রাস্তা থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে। তার সাথে একটি কুকুরও ছিল। যার নাম ছিল 'কিতমীর'। -[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪২]

فَائِدَةٌ : قَالَ النَّيْشَابُوْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ اَسْمَاءَ اَصْحَابِ الْكَهْف تَصْلُحُ لِلطَّلَبِ وَالْهَرَبِ وَاِطْفَاءِ الْحَرِيْقِ تُكْتَبُ فِيْ خِرْقَةٍ وَيُرْمٰى فِيْ وَسَطِ النَّارِ وَلِبُكَاءِ الطِّفْلِ تُكْتَبُ وَتُوْضَعُ تَحْتَ رَاْسِه فِى الْمَهْدِ وَلِلْحَرْثِ تُكْتَبُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَتُرْفَعُ عَلٰى خَشَبٍ مَنْصُوْبٍ فِيْ وَسَطِ الزَّرْعِ وَلِلضَّرْبَانِ وَالْحُمَّى الْمُثَلَّثَةِ وَالصُّدَاعِ وَالْغِنٰى وَالْجَاهِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى السَّلَاطِيْنِ تُشَدُّ عَلَى الْفَخِذِ الْيُمْنٰى وَلِعُسْرِ الْوِلَادَةِ تُشَدُّ عَلٰى فَخِذِهَا الْيُسْرٰى وَلِحِفْظِ الْمَالِ وَالرُّكُوْبِ فِى الْبَحْرِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الْقَتْلِ .

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফ ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে জাগ্রত হয়ে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন, পৃ. ২৪৩, হাশিয়া নং ১৪]

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا الخ : আসহাবে কাহাফ গুহায় অর্ন্তধানের তিনশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর খ্রিস্ট মতাবলম্বীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কঠিন বিরোধের সৃষ্টি হলো যে, হাশর-নাশর রূহের উপর হবে, না শরীরের উপর হবে। তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান পাদ্রী 'থিয়োডর' সরাসরি শরীরের উপর হাশর নাশর হওয়াকে অস্বীকার করে বসেছিল। এ আলোচনা যখন তুঙ্গে উঠেছিল ঠিক সে সময় আসহাবে কাহাফ সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার ফলে সকলের মধ্যে এ মহা বিভ্রাটের পরিসমাপ্তি ঘটে।

قَوْلُهُ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ : অর্থাৎ যাতে তাদের সমসাময়িকদেরও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, হাশর-নাশরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। হাশর-নাশরের ব্যাপারটি গ্রহণে যখন এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছিল। ঠিক সে সময়ে আসহাবে কাহাফের সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া হকপন্থিদের জন্য এক বিরাট নজির স্থাপন করেছিল। যা শারীরিক হাশর-নাশরের পক্ষে মজবুত দলিল ছিল। ঐ ব্যক্তি যখন টাকা নিয়ে খাবার ক্রয়ের জন্য বাজারে পৌঁছলেন যেহেতু সুদীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাই শহরের চাল-চলন, পোশাক-আশাক, ভাষা, ভূমিচিত্র সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি রাজ্য ক্ষমতারও ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টান বিরোধীদের জায়গায় স্বয়ং খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল। এই ব্যক্তি তার শতাধিক বর্ষের পুরাতন পোশাকের কারণে এমনিতেই মানুষের নিকট হাসি তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি যখন সে তার পকেট থেকে বহু পুরাতন টাকা বের করলেন তখন মানুষের পেরেশানি ও ভুল ধারণার আর সীমা রইল না। সবাই তাকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে স্বীয় আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। তখন কিছু লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর সাথে গুহার দ্বারে আসল। –[তাফসীরে মাজেদী : পৃ. ৬৩১]

قَوْلُهُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا : আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে মসজিদ নির্মাণ করব যাতে করে এটা বুঝা যায় যে, এ লোকগুলো একত্ববাদে বিশ্বাসী আবেদ ছিল। কেউ যেন তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে না নেয়। আসহাবে কাহাফের সেই গুহার মুখে এখনো একটি খ্রিস্টীয় খানকাহ/উপাসনালয় বিদ্যমান রয়েছে।

আয়াতে اَلَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে যুগের শাসক। قَالَ قَتَادَةُ هُمُ الْوُلَاةُ (بَحْر) কেউ কেউ বলেন যে, মুসলিম বাদশাহ। আবার কেউ কেউ বলেন, শহরের কোতোয়াল। –[তাফসীরে কাবীর]

عَلَيْهِمْ অর্থ হলো সে গুহার উপর। সে গুহার মুখে اَىْ عَلٰى بَابِ الْكَهْفِ অর্থাৎ গুহার দ্বারে। –[মাদারিক]

আয়াতে مَسْجِدًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– তৎকালীন যুগের ইবাদতগাহ বা উপাসনালয়। ইসলামি পরিভাষার মসজিদ উদ্দেশ্য নয়।

আল্লামা থানবী (র.) ও অন্যান্য ফকীহ মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কোনো যুগে মসজিদ নির্মাণের ফলে সহিংসতার আশঙ্কা থাকে তাহলে মসজিদ নির্মাণ জায়েজ হবে না। থানবী (র.) আরো বলেন যে, এই মসজিদ দ্বারা সেই মসজিদ উদ্দেশ্য ছিল না যা জাহেলী যুগে কবরের কাছে নির্মাণ করা হতো। কাজেই এ ঘটনা দ্বারা কবর পুজারীদের পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। –[তাফসীরে মাজেদী : পৃ. ৬৩২]

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান : এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের নিদ্রাকাল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনশত বৎসর এরপর তিনশত নয় বছর বলা হয়েছে। সাধারণ রীতি মতে প্রথমেই তিনশত বছর বলা হয়নি কেন?

এর উত্তরে মুফাসসিরগণ লিখেন, যেহেতু ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর বছরের প্রচলন ছিল তাই সে হিসেবে তিনশত বছরই হয়। চান্দ্র বছরে প্রতি বছরে দশদিন তিন বছরে একমাস এবং ৩৬ বছরে এক বছর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ হিসেবে প্রতি একশত বছরে প্রায় তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশত সৌর বছরে চান্দ্র বছরের প্রায় তিনশত নয় বছর হয়। এই হিসাবটা অনুমানিক তথা ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে। অন্যথায় ৩০৯ -এর আরো কিছুমাস বেড়ে যাবে। আর বড়বড় গণনার ক্ষেত্রে সাধারণত ভগ্নাংশকে বাদ দিয়েই হিসাব ধরা হয়। আর সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যই বাকরীতির উপরিউক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর উদ্ধৃতিতে আসহাবে কাহাফের অবস্থান ও তার ইতিহাস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই অত্যাচারী শাসকের ভয়ে ভীত হয়ে আসহাবে কাহাফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ২৫০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তারা তিনশত বছর পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। সব মিলে তারা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছিলেন ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। আর রাসূল ﷺ -এর পবিত্র জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছে। তাই রাসূল ﷺ -এর জন্মের বিশ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফের জাগ্রত হওয়া ঘটনা ঘটেছিল। আর তাফসীরে হক্কানীতে তাদের অবস্থানস্থলের নাম 'আফসূস' বা 'তুরতুস' বলা হয়েছে। যা এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখনো তাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

–[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪৪]

অনুবাদ :

٢٧. وَاتْلُ مَا أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ـ مَلْجَأً ـ

২৭. আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আপনার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ করে শুনান, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবেন না। مُلْتَحَدً শব্দটির অর্থ হলো مَلْجَأً আশ্রয়স্থল, মাথা গোঁজার জায়গা।

٢٨. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اِحْبِسْهَا مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَجْهَهٗ تَعَالٰى لَا شَيْئًا مِنْ اَغْرَاضِ الدُّنْيَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَا تَعْدُ تَنْصَرِفُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ج عَبَّرَ بِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِمَا تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا اَيِ الْقُرْاٰنِ وَهُوَ عُيَيْنَةُ ابْنُ حِصْنٍ وَاَصْحَابُهٗ وَاتَّبَعَ هَوٰيهُ فِى الشِّرْكِ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ اِسْرَافًا ـ

২৮. আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন আপনার নফসকে আটকিয়ে রাখবেন তাদের সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাদের ইবাদত দ্বারা দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নয়। আর তাঁরা হলো দরিদ্রগণ। আর আপনি ফিরাবেন না সরিয়ে নিবেন না তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি দৃষ্টি বলে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উদ্দেশ্য পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর আপনি তাঁর অনুসরণ করবেন না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। অর্থাৎ কুরআন থেকে। আর সে ব্যক্তি হলো উমাইয়া ইবনে হিসন ও তার সঙ্গীরা। আর যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে শিরকের মাঝে আর যার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে সামনে বেড়ে গেছে।

٢٩. وَقُلْ لَهٗ وَلِاَصْحَابِهٖ هٰذَا الْقُرْاٰنُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ تف فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ تف وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ج تَهْدِيْدٌ لَهُمْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ اَيِ الْكَافِرِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط مَا اَحَاطَ بِهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ كَعَكَرِ الزَّيْتِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط مِنْ حَرِّهٖ اِذَا قُرِّبَ اِلَيْهَا بِئْسَ الشَّرَابُ ط هُوَ وَسَاءَتْ اَيِ النَّارُ مُرْتَفَقًا ـ تَمْيِيْزٌ مَنْقُوْلٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ قَبُحَ مُرْتَفَقُهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ الْاٰتِىْ فِى الْجَنَّةِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاِلَّا فَاَىُّ اِرْتِفَاقٍ فِى النَّارِ ـ

২৯. আর বলুন তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে, এই কুরআন সত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক এটা তাদের জন্য ধমকী স্বরূপ আমি প্রস্তুত রেখেছি জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। ঐ বেষ্টনী যার দ্বারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হবে। তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়। যা তেলের গাদ সদৃশ হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে তার উত্তাপে যখন তা তার নিকটবর্তী করা হবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এটি আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয় জাহান্নাম। مُرْتَفَقًا তমীয মূল বাক্য বিন্যাসে এটি فَاعِلْ ছিল। ইবারতটি এরূপ ছিল যে– قَبُحَ مُرْتَفَقُهَا এরপরে আগত জান্নাতের বর্ণনায় وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে, সে হিসেবে এখানে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে। অন্যথায় জাহান্নামে আরাম আয়েশের কি আছে?

অনুবাদ :

৩০. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ـ اَلْجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ الَّذِيْنَ وَفِيْهَا إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْمَعْنٰى اَجْرَهُمْ اَىْ نُثِيْبُهُمْ بِمَا تَضَمَّنَهُ ـ

৩০. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে। إِنَّا لَا نُضِيْعُ এ বাক্যটি إِنَّ الَّذِيْنَ الخ -এর খবর হয়েছে এবং এখানে যমীরের স্থলে ইসমে জাহের ব্যবহার করা হয়েছে। এর মর্ম হলো তাদের প্রতিফল হবে ঐ ছওয়াব যা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১. اُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ إِقَامَةٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ قِيْلَ مِنْ زَائِدَةٌ وَقِيْلَ لِلتَّبْعِيْضِ وَهِىَ جَمْعُ اَسْوِرَةٍ كَاَحْمِرَةٍ جَمْعُ سَوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ مَا رَقَّ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَّاِسْتَبْرَقٍ مَا غَلُظَ مِنْهُ وَفِىْ اٰيَةِ الرَّحْمٰنِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ جَمْعُ اَرِيْكَةٍ وَهِىَ السَّرِيْرُ فِى الْحَجَلَةِ وَهِىَ بَيْتٌ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ وَالسُّتُوْرِ لِلْعُرُوْسِ نِعْمَ الثَّوَابُ الْجَزَاءُ الْجَنَّةُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ـ

৩১. তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলঙ্কৃত করা হবে। কারো মতে مِنْ اَسَاوِرَ -এর مِنْ টি অতিরিক্ত। আর কারো মতে مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّة আর اَسَاوِر শব্দটি اَسْوِرَةٌ -এর বহুবচন, اَحْمِرَةٌ -এর ওজনে। আর اَسْوِرَةٌ হলো سَوَارٍ -এর বহুবচন। তাঁরা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র। সূরা আর রাহমানের আয়াতে রয়েছে بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। اَرَائِك শব্দটি اَرِيْكَةٌ -এর বহুবচন। এটি এক বিশেষ ধরনের কক্ষ, যা নব দম্পতির জন্য কাপড় ও পর্দার দ্বারা সজ্জিত করা হয় কত সুন্দর পুরস্কার প্রতিদান। সেটি হবে জান্নাত ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُتْلُ : তুমি পাঠ কর। এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। অর্থ– পাঠ করা। তেলাওয়াত করা। এ শব্দটি تَلُوٌّ থেকে নির্গত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার অর্থ হলো– অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

قَوْلُهُ مِنَ الْكِتَابِ : এর مِنْ টি بَيَانِيَّة এটা مَا مَوْصُوْلَة -এর বয়ান।

قَوْلُهُ مُلْتَحَدًا : ইসমে যরফ, মাসদারে মীমী, বাবে اِفْتِعَال থেকে অর্থ– আশ্রয়স্থল, আশ্রয় নেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ : এ বাক্যটি مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ বাক্যের বয়ান হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَعْدُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ হরফে নাহীর কারণে শেষের وَاوْ টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাবে نَصَرَ -এর মাসদার عَدْوًا অর্থ– কোনো জিনিসকে অতিক্রম করা, দৌড়ানো।

قَوْلُهُ عَيْنَاكَ : এটা لَا تَعْدُ -এর ফায়েল। আর تُرِيْدُ الخ বাক্যটি عَيْنَاكَ -এর كَافٌ [যা মুযাফ ইলাইহি, তা] থেকে حَالٌ হয়েছে। যদি مُضَافٌ اِلَيْهِ টা مُضَافٌ -এর جُزْء হয় তবে مُضَافٌ اِلَيْهِ থেকে حَالٌ হতে পারে। কেননা عَيْنٌ [চক্ষু, দৃষ্টি] দ্বারা উদ্দেশ্য হলে] صَاحِب عَيْنٌ কাজেই ফে'লের اِسْنَادٌ বাহ্যিক দৃষ্টিতে مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর দিকে হলেও বাস্তবে তা مُضَافٌ -এর দিকেই হয়েছে।

قَوْلُهُ فُرُطًا : এটা বাবে نَصَرَ হতে মাসদার। অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা। فَرَطَ فِى الْاَمْرِ অর্থ হলো- ত্রুটি বিচ্যুতি করা, অসম্পূর্ণ কাজ করা।

قَوْلُهُ الْحَقُّ : এটা هٰذَا الْقُرْاٰنُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর اَلْحَقُّ শব্দটি উহ্য ফে'লের فَاعِلٌ -ও হতে পারে অর্থাৎ جَاءَ الْحَقُّ

قَوْلُهُ مِنْ رَّبِّكُمْ : হয়তো এটা اَلْحَقُّ থেকে حَالٌ হবে অর্থাৎ كَائِنًا مِنْ رَبِّكُمْ অথবা هٰذَا الْقُرْاٰنُ উহ্য মুবতাদার দ্বিতীয় খবর হবে। অর্থাৎ كَائِنٌ مِنْ رَبِّكُمْ

قَوْلُهُ اِنَّا اَعْتَدْنَا : এটা لَفّ نَشْر غَيْر مُرَتَّبْ অর্থাৎ اِنَّا اَعْتَدْنَا -এর সম্পর্ক وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ -এর সাথে। আর اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর সম্পর্ক فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ -এর সাথে। আর اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا এটা نَارًا -এর সিফত হয়েছে। سُرَادِقٌ -এর বহুবচন হলো سُرَادِقَاتٌ আর سُرَادِقٌ বলা হয় এমন বস্তুকে যার দ্বারা কোনো কিছুকে পরিবেষ্টন করা হয়, ঘিরে ফেলা হয়। চাই তা দেয়ালের মাধ্যমে হোক বা সামিয়ানার দ্বারা হোক বা পার্টিশনের দ্বারা হোক। সবগুলোই سُرَادِقٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ يَسْتَغِيْثُوْا : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর মাসদার। অর্থ- সাহায্য প্রার্থনা করা। يَسْتَغِيْثُوْا মূলে ছিল يَسْتَغْوِثُوْا - وَاوْ -এর যেরকে তার পূর্বের বর্ণে দিয়ে وَاوْ -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يَسْتَغِيْثُوْا হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ الْمُهْلِ : এটি اِسْمٌ অর্থ- তেলের গাদ, পুঁজ, পুঁজ মিশ্রিত রক্ত। يَشْوِى الْوُجُوْهَ পূরো বাক্যটি مَاءٍ -এর সিফত হতে পারে। আবার اَلْمُهْلِ থেকে حَالٌ -ও হতে পারে।

عَكَرٌ : অর্থ- গাদ, তেলের তলানি, কাইট।

قَوْلُهُ الشَّرَابُ : এটা بِئْسَ -এর ফায়েল। আর مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। তা হলো هُوَ যার مَرْجِعْ হলো مُسْتَغَاثٌ بِهِ

قَوْلُهُ مُرْتَفَقًا : এটা نِسْبَتْ থেকে تَمْيِيْز যা فَاعِلٌ হতে مَنْقُوْل অর্থাৎ قَبُحَ مُرْتَفَقُهَا আর مُرْتَفَقٌ হলো ظَرْف مَكَانٌ অর্থ- আরামের জায়গা, দোজখীদের জন্য এ শব্দটি اِسْتِهْزَاء বলা হয়েছে। অথবা مُشَاكَلَتْ -এর ভিত্তিতেও হতে পারে। যেহেতু জান্নাতীদের জন্য حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا : اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। এর যমীর نَا হলো اِنَّ এর اِسْم আর لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا জুমলা হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة মিলে خَبَرْ ও اِسْم তার اِنَّ -এর খবর হয়েছে। এরপর اِنَّ তার اِسْم ও خَبَرْ -কে নিয়ে প্রথম اِنَّ -এর খবর। اِنَّ -এর خَبَرِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ : এখানে لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّم আর جَنّٰتُ عَدْنٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ এরপর এটা جُمْلَة خَبَرْ হয়ে হয়েছে اُولٰئِكَ মুবতাদার।

قَوْلُهُ مِنْ اَسَاوِرَ : এখানে مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّة হয়েছে। অথবা مِنْ টি مَفْعُوْل بِهٖ -এর উপর অতিরিক্ত। আর مِنْ ذَهَبٍ -এর মধ্যে مِنْ টি بَيَانِيَّة এবং তা كَائِنَةً বা مَصْنُوْعَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اَسَاوِرَ -এর সিফত হয়েছে। আর اَسَاوِرَ এটা سِوَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ- চুরি, অলঙ্কার।

قَوْلُهُ مُتَّكِئِيْنَ : এটা উহ্য ফে'ল يَجْلِسُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي الْحَجَلَةِ : এটা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে اَلسَّرِيْرُ থেকে حَالٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এই সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের অবতরণকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরপর এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যারা এই ক্ষণভঙ্গুর জগত ও জীবনের যাবতীয় আনন্দ উল্লাসকে তুচ্ছ মনে করে সুদৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তারা অবশেষে সফলকাম হয়, আর অহংকারী জালেম দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর এখন আলোচ্য আয়াতে পুনরায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কাফেরদের অনেক প্রশ্নের জবাবও রয়েছে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ন্যায় যে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস বর্জন করে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন, তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ রয়েছে, যেমন হযরত আম্মার (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দীন ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রতি সুনজর রাখার তাগিদ হয়েছে। আর যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার নির্দেশ রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) তাঁর 'এজালাতুল খেফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এ আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর সেসব লোকের সঙ্গ লাভের আদেশ দেওয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে; এমন লোকদের থেকে বিমুখ না হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, পথভ্রষ্ট তাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ হয়েছে। এ আয়াতে যে দলের সঙ্গে উঠাবসা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রাহে বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাই তারা হয়েছিলেন রিক্তহস্ত, এটি ছিল তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

কাফেররা রাসূল ﷺ -কে একথা বলতো, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার কথা শ্রবণ করি এবং আপনার উপর ঈমান আনয়ন করি তবে যখন আমরা আপনার নিকট আসি তখন আপনি এ দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন, তাদের সঙ্গে একত্রে বসা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাছাড়া তাদের পোষাক থেকে দুর্গন্ধ আসে। এরা আমাদের সঙ্গে বসবার লোক নয়। তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে কাফেরদের দরখাস্ত মঞ্জুর না করার নির্দেশ রয়েছে এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এই অহংকারী লোকদের দিকে মনোনিবেশ করবেন না; বরং ইসলামের সত্য-সাধনায় যারা শত কষ্ট সহ্য করেও অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে রেখে চলুন। তারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল রয়েছে, তারাই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়বান্দা এবং আসহাবে কাহাফের নমুনা। অহংকারী কাফেররা এই নিঃস্ব মুসলমানদের সঙ্গে বসা পছন্দ করেনি আল্লাহ তা'আলা তাদের এই আবদার রক্ষা না করার আদেশ দিয়েছেন। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১১৪, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪১১ - ১২]

قَوْلُهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ الخ - শানে নুযূল :

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাজারী সম্পর্কে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উয়াইনা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়। তখন তার দরবারে কয়েকজন নিঃস্ব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রা.) অন্যতম। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল।

তিনি ছিলেন ঘর্মাক্ত, তখন উয়াইনা বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ ! এই লোকদের দুর্গন্ধ আপনার কষ্টের কারণ হয় না? আমরা মোজের গোত্রের নেতা, সমাজের উচুস্তরের লোক। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে সব লোক মুসলমান হয়ে যাবে; কিন্তু এসব লোকদের উপস্থিতি আমাকে আপনার অনুসরণে বাধা দিচ্ছে, আপনি যদি এদেরকে আপনার এখান থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করবো অথবা আমাদের জন্যে বসবার কোনো ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করুন এবং তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২০৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কুরাইশদের তথাকথিত কোনো নেতারা এসে প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করল, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনি তবে এই দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার মজলিস থেকে সরিয়ে দিন অথবা এ ব্যবস্থা করুন, যখন আমরা হাজির হই, তারা যেন না থাকে। আর তাদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিন। তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১১৪-১৫]

বিশিষ্ট তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন– اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ বাক্য দ্বারা আসহাবে সোফফাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা ছিল সাতশত। তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব ও হৃতসর্বস্ব। ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা তাঁদের সকল ধন-সম্পদ মক্কা শরীফে রেখে হিজরত করে এসেছেন মদীনা মুনাওয়ারায়। তাঁদের বাড়ি ঘরও ছিল না, বাগবাগিচাও ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল না। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতেন। তাঁরা এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে দ্বিতীয় নামাজের জন্যে মসজিদে অপেক্ষা করতেন। যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্যে, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হতো। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বণ্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হতো। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেতো। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

জান্নাতীদের অলঙ্কার : يُحَلَّوْنَ فِيْهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কঙ্কন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে।

হযতর আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, একজন সাধারণ জান্নাতবাসীকে যে সাধারণ অলঙ্কার পরানো হবে, যদি তা দুনিয়ার অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তা দুনিয়ার সমস্ত অলঙ্কারের চেয়ে উন্নততর এবং উচ্চতর হবে। আবুশ শেখ কাবে আহবারের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা তার সৃষ্টিলগ্ন থেকে জান্নাতবাসীর জন্য অলঙ্কার তৈরী করে যাচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তৈরী করতে থাকবে। যদি জান্নাতবাসীর একটি অলঙ্কার সামনে আনা হয় তবে তার মোকাবিলায় সূর্যের জ্যোতি নিস্প্রভ হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীগণ সবুজ বর্ণের মিহি এবং মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করবেন। তন্মধ্যে পালংকে হেলান দিয়ে তারা বসবে। অর্থাৎ কখনো তাদের পোশাকের আস্তর মোটা হবে আর কখনো মিহি হবে। উভয় প্রকার পোষাকই তারা ব্যবহার করবেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, স্বর্ণ এবং রেশম জান্নাতী পুরুষদের জান্নাতী পোষাক। যারা পৃথিবীতে এই দুটি জিনিষ ব্যবহার করবে সে জান্নাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জান্নাতীদের পোষাক মোটা অস্তরের হওয়ার অর্থ হলো তা তৈরী করা হবে অত্যন্ত মজবুতভাবে। ইমাম নাসায়ী, আবূ দাউদ এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! জান্নাতবাসীদের পোষাক কি রকম হবে, তা কি তৈরী পোষাক হবে, নাকি তৈরী করা হবে? একথা শ্রবণ করে মজলিসের এক ব্যক্তির হাসি পেল। তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি জানে না সে ব্যক্তি যখন কোনো জ্ঞানী লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে, তখন তোমরা হাস কেন?

তাবারানী (র.) হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে হযরত আবুল খায়ের মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে তাতে মিহি রেশম তৈরী হয়, তার দ্বারাই জান্নাতবাসীর পোষাক তৈরী হবে।

এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলঙ্কার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভণীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কঙ্কন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথাও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে মনে করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোনো বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষণীয় মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলঙ্কার এবং রেশমী বস্তু শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারো কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো অলঙ্কার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু জান্নাতে পৃথক এক জগৎ। সেখানে এ আইন থাকবে না।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الخ : এ আয়াতে এমন সকল দরিদ্র লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যারা সবকিছু কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সদা ব্যাপৃত। هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقِىْ جَلِيْسُهُمْ

قَوْلُهٗ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ الخ : আয়াতে মাশায়েখে কেরামের জন্য এই নির্দেশ রয়েছে যে, তাঁরা যেন স্বীয় মুরিদ, ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রদের প্রতি সদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন; তাদের ব্যাপারে যেন বিরূপ না হন।

قَوْلُهٗ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا : আয়াতে সে সকল লোকদের কুৎসা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা সম্পদশালীদের নিকট ধন্না দেয় ও তাদের সম্পদের কারণে তাদেরকে তোশামোদ করে।

قَوْلُهٗ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا الخ : আয়াতে বদকার, আল্লাহবিমুখ, ফাসেক ও জ্ঞানপাপীদের আনুগত্য না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কেননা তার সাথে নম্র ব্যবহার করলে মুখে যদিও তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মনে হবে যে, তারই আনুগত্য করা হচ্ছে।

-[কামালাইন ১৫পারা, পৃ. ১০৭]

অনুবাদ :

٣٢. وَاضْرِبْ اِجْعَلْ لَهُمْ لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ بَدْلٌ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ تَفْسِيْرٌ لِلْمَثَلِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا الْكَافِرِ جَنَّتَيْنِ بُسْتَانَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا اَحْدَقْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ـ يُقْتَاتُ بِهِ ـ

৩২. আপনি বর্ণনা করুন পেশ করুন তাদের কাছে কাফের এবং মুসলমানদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা مَثَلًا হলো بَدْلٌ আর رَجُلَيْنِ শব্দটি তার পরবর্তী ইবারতসহ مَثَلًا -এর তাফসীর। আমি তাদের একজনকে কাফেরকে দিয়েছিলাম দুটি দ্রাক্ষা উদ্যান আঙ্গুরের বাগান এবং পরিবেষ্টিত করেছিলাম সে দুটোকে كِلْتَا শব্দটি একবচন কিন্তু দ্বিবচনের অর্থ দেয়। আর তারকীবে মুবতাদা হয়েছে। খেজুর বৃক্ষ দ্বারা এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র যা খানাপিনার কাজে আসে।

٣٣. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ كِلْتَا مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّثْنِيَةِ مُبْتَدَأٌ اٰتَتْ خَبَرُهُ اُكُلَهَا ثَمَرَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ـ يَجْرِيْ بَيْنَهُمَا ـ

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করত كِلْتَا টি শব্দ হিসেবে مُفْرَدٌ ; কিন্তু অর্থগত দিক থেকে تَثْنِيَة বা দ্বিবচন বুঝায়। كِلْتَا হলো মুবতাদা। আর اٰتَتْ তার খবর। এতে কোনো ত্রুটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর যা উভয়ের মাঝে প্রবাহিত হয়।

٣٤. وَّكَانَ لَهُ مَعَ الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرٌ ج بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِضَمِّهِمَا وَبِضَمِّ الْاَوَّلِ وَسُكُوْنِ الثَّانِيْ وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ كَشَجَرَةٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ وَبَدَنَةٍ وَبَدَنٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُفَاخِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ـ عَشِيْرَةً ـ

৩৪. আর তার ছিল দুটি বাগানসহ প্রচুর সম্পদ ثَمَرٌ শব্দে তিনটি পাঠ রয়েছে– ১. ثَاء এবং مِيْم উভয়টিতে ফাতাহ। ২. উভয়টিতে পেশ বা জুম্মা ৩. প্রথমটিতে ফাতাহ দ্বিতীয়টিতে সুকূন। ثَمَرٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ -এর বহুবচন। যেমন شَجَرَةٌ -এর বহুবচন شَجَرٌ , خَشَبَةٌ -এর বহুবচন خَشَبٌ এবং بَدَنَةٌ -এর বহুবচন بَدَنٌ আসে। অতঃপর সে তার বন্ধুকে মু'মিনকে বলল তার সাথে আলোচনাকালে গর্বভরে ধন সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী জনবলে আত্মীয়স্বজনে।

٣٥. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ بِصَاحِبِهِ يَطُوْفُ بِهِ فِيْهَا وَيُرِيْهِ اَثْمَارَهَا وَلَمْ يَقُلْ جَنَّتَيْهِ اِرَادَةً لِلرَّوْضَةِ وَقِيْلَ اِكْتَفٰى بِالْوَاحِدِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ بِالْكُفْرِ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ تَنْعَدِمَ هٰذِهٖ اَبَدًا ـ

৩৫. সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে এবং তাতে প্রদক্ষিণ করে তাকে তার ফলফলাদি দেখাতে ছিল। جَنَّتَيْهِ দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করেননি। সাধারণ বাগান বুঝানোর জন্য। কেউ কেউ বলেন, শুধু একটি বাগান দেখানোর উপরে ক্ষান্ত করা হয়েছে। দুটি দেখায়নি। নিজের প্রতি জুলুম করে কুফরি করে। সে বলল যে, আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অনুবাদ :

٣٦. وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ فِى الْاٰخِرَةِ عَلٰى زَعْمِكَ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ج مَرْجِعًا .

৩৬. আমি এও মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হই। আখিরাতে তোমার ধারণা অনুযায়ী তবে আমি তো নিশ্চয় এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।

٣٧. قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ يُجَاوِبُهٗ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ لِاَنَّ اٰدَمَ خُلِقَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِىٍّ ثُمَّ سَوّٰىكَ عَدَلَكَ وَصَيَّرَكَ رَجُلًا .

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু তার সঙ্গে আলোচনা কালে কথার জবাব দিয়ে তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। কেননা হযরত আদম (আ.) কে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ও পরে শুক্র বীর্য থেকে। তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে বানিয়েছেন।

٣٨. لٰكِنَّا اَصْلُهٗ لٰكِنْ اَنَا نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ اِلَى النُّوْنِ وَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ ثُمَّ اُدْغِمَتِ النُّوْنُ فِىْ مِثْلِهَا هُوَ ضَمِيْرُ الشَّاْنِ يُفَسِّرُهُ الْجُمْلَةُ بَعْدَهٗ وَالْمَعْنٰى اَنَا اَقُوْلُ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا .

৩৮. কিন্তু لٰكِنَّا শব্দটি মূলত لٰكِنْ اَنَا ছিল। হামযার হরকত টি نُوْن -এ দিয়ে হামযাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর نُوْن-কে نُوْن -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। তিনিই هُوَ হলো যমীরে শান, যার ব্যাখ্যা করছে পরবর্তী বাক্য। মর্ম হলো– আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরিক করি না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِضْرِبْ : যদি ضَرْب -এর ব্যবহার مَثَلْ -এর সাথে হয় তাহলে তার দুটি মাফউল হয়ে থাকে। এখানে একটি মাফউল হলো مَثَلًا আর দ্বিতীয় মাফউল হলো رَجُلَيْنِ । বাস্তবিক পক্ষে উভয় মাফউল একই এবং رَجُلَيْنِ উহ্য মুযাফের সাথে مَثَلًا থেকে بَدْل -ও হতে পারে।

قَوْلُهٗ مِنْ اَعْنَابٍ : এখানে مِنْ টি হলো بَيَانِيَّة আর مَا فِى الْجَنَّتَيْنِ হলো مُبَيَّنْ এবং مِنْ اَعْنَابٍ হলো بَيَانْ।

قَوْلُهٗ حَفَفْنَا : এটা বাবে نَصَرَ -এর حَفٌّ মাসদার হতে মাযীর সীগাহ। অর্থ– হলো– বেষ্টন করে নেওয়া, ঘিরে ফেলা।

قَوْلُهٗ كِلْتَا : যেহেতু শব্দ হিসেবে كِلْتَا টি مُفْرَدٌ এ কারণেই اَتَتْ -কে একবচন আনা হয়েছে। আর خِلَالَهُمَا হলো অর্থের দিকে বিবেচনা করে এটাকে দ্বিবচন আনা হয়েছে। كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ এটা মুরাক্কাব হয়ে مُبْتَدَأ আর اَتَتْ হলো خَبَرْ খবর

قَوْلُهٗ ثَمَرٌ : এ শব্দটি দ্বারা বাগ-বাগিচা ব্যতীত অন্যান্য সম্পদ বুঝানো হয়েছে। চাই তা নগদ টাকা হোক কিংবা অন্য কিছু।

قَوْلُهٗ يُحَاوِرُ : এ শব্দটি বাবে تَفَاعُلْ -এর مُحَاوَرَةٌ ও حِوَارًا মাসদার থেকে। অর্থ– কথাবার্তা বলা, উত্তর দেওয়া। قَرِيْنَة مَقَامْ -এর কারণে يُحَاوِرُ -এর তাফসীর يُفَاخِرُ দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مَالًا وَنَفَرًا : এটা নিসবত হতে تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ اَثْمَارُهَا : কোনো কোনো নোসখায় اَثْمَارُهَا -এর জায়গায় اَثَارُهَا রয়েছে অর্থ হলো– সৌন্দর্য, চমক, টাটকা, সজীবতা।

قَوْلُهُ سَوَّاكَ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো– বরাবর করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যশীল বানানো। এ سَوَّاء টা جَعَلَ এবং صَيَّرَ -এর অর্থে হয়েছে। "كَ" হলো প্রথম মাফঊল আর رَجُلًا হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل

قَوْلُهُ لٰكِنَّا : মূলে ছিল لٰكِنْ اَنَا হামযাকে খেলাফে কিয়াস ফেলে দিয়ে نُوْن -কে نُوْن -এর মধ্যে اِدْغَامْ করেছে। ফলে لٰكِنَّا হয়েছে। لٰكِنَّا -এর মধ্যে لكن হলো আমলহীন তার ضَمِيْر হলো প্রথম মুবতাদা। هُوَ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা, اَللّٰهُ তৃতীয় মুবতাদা এবং رَبِّىْ হলো খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা অর্থ-সম্পদের নেশায় মগ্ন ছিল এবং দরিদ্র মুসলমানদেরকে হীন মনে করত এবং তাদের সাথে বসা অপমানজনক মনে করতো। নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করতো। তাঁরা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে এই আরজি পেশ করতো যে, আপনি এই নিঃস্ব মুসলমানদেরকে সরিয়ে দিন!

আলোচ্য আয়াতে ঐ অহংকারী লোকদেরকে শ্রবণ করাবার জন্য এবং পৃথিবীর অস্তিত্বহীনতা প্রকাশ করার জন্যে বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী কাফের ছিল, আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। আর নিজের অর্থ-সম্পদের কারণে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল মুমিন এবং দরবেশ। সম্পদশালী কাফের অর্থ-সম্পদের নেশায় মত্ত ছিল এবং আখিরাতকে অস্বীকার করতো। আর তার মুসলিম ভাই আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিল। সে এই সত্য উপলব্ধি করতো যে, এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, যিনি তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর বন্দেগীতেই রয়েছে সত্যিকার সম্মান এবং মর্যাদা। আর এই প্রকৃত মর্যাদা মু'মিনই অর্জন করে। মু'মিন ব্যক্তি তার সম্পদশালী ভাইকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার শিক্ষা দিত, তাঁর নাফরমানি না করার তাগিদ করতো এবং বলতো, আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ হয়ো না, যে কোনো সময় যে কোনো বিপদ তোমার প্রতি আপতিত হতে পারে এবং তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অবশেষে তাই হয়েছে। হঠাৎ এক আসমানি বালা অবতরণ করে। পরিণামে তার বাগানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে। তখন সে উপলব্ধি করে আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়।

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪১৫]

ইমাম রাজী (র.) লিখেছেন এ আয়াতসমূহের মর্মকথা হলো– ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা তাদের ধন শক্তি এবং জনশক্তির ব্যাপারে গর্ব করতো এবং দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো।

আলোচ্য ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মানবকে জানিয়ে দিতে চান যে ধনী হওয়া কোনো গৌরবের বিষয় নয়, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমেই মানুষ গৌরবান্বিত হয়, আল্লাহ তা'আলার দরবারে বান্দা হিসেবে তার গুরুত্ব হয়। ধন-সম্পদ নিতান্তই অস্থায়ী জিনিস, আজ যে ধনী, কাল সে হয় ফকির; আর আজ যে ফকির কাল সে ধনী হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে ধনী দরিদ্র হয়ে যায়; তাঁর মর্জি হলে দরিদ্রও ধনী হয়ে যায়।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা– ১৫, পৃ. ৯৭ তাফসীরে কাবীর– খ. ২১, পৃ. ১২৩-১২৪]

قَوْلُهُ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ - শানে নুযূল : অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি তাদের নিকট দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন। এই দুই ব্যক্তি কে? তাদের পরিচয় কি? এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আল্লামা বগভী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মক্কায় বনূ মখজুম গোত্রের দুই ভাই বাস করতো। একজন ছিলেন মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফের। যিনি মু'মিন ছিলেন তার নাম আবূ সালমা আব্দুল্লাহ [তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সাবেক স্বামী] ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়ালাইল। আর যে কাফের ছিল তার নাম ছিল আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়ালাইল। এই দুজনের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উয়াইয়া ইবনে হুসাইন এবং হযরত সালমান (রা.)-এর অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা। আর মুজাহেদ (র.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল তামলীখা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতরুস। ওয়াহ্যাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতফারু। প্রথম ব্যক্তি মুসলমান ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের ছিল। সূরা ওয়াসসাফফাতেও ঐ দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) মা'মারের সূত্রে এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে খোরাসানীর প্রদত্ত বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন। এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। পিতার ওয়ারিশসূত্রে উভয়ে আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা করে পায় এবং প্রত্যেকে তা ভাগ করে নেয়। এক ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করে। আর দ্বিতীয়জন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমার ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করেছে, আমি তোমার নিকট থেকে এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের জমি ক্রয় করলাম। প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি বাড়ি নির্মাণ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দারিদ্রপীড়িত মানুষকে দান করে এবং এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! সে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বাড়ি নির্মাণ করেছে, আর আমি তোমার নিকট থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের একটি বাড়ি ক্রয় করলাম। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি আরজি পেশ করছি যে, জান্নাতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে গোলাম বাঁদি এবং ঘরের আসবাব পত্র ক্রয় করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করে এবং জান্নাতে খাদেম, খেদমতগার এবং আসবাব পত্রের জন্য আরজি পেশ করে।

যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত সম্পদ এভাবে দান করে ফেলে এবং অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে চিন্তা করলো যে ভাইয়ের নিকট আমি সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি। আর একথা চিন্তা করে সে তার ভাই যে রাস্তা অতিক্রম করবে তার পার্শ্বে বসে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তার সম্পদশালী ভাই চাকর বাকর নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করলো। ভাইকে দেখে সে চিনতে পারলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, বর্তমানে আমি অত্যন্ত দরিদ্র এবং আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সম্পদশালী ভাই বললো, তোমার অর্থ-সম্পদ কি হয়েছে? তুমি তো তোমার অংশ নিয়েছিলে। দরিদ্র ভাই তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন সে বলল, আচ্ছা তুমি দান খায়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো, তুমি যেতে পার আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। এভাবে সে তার দরিদ্র ভাইকে বিদায় করে। যাহোক অবশেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ.৭, পৃ. ২১৩]

قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ : ثَمَرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]

কামুস গ্রন্থে আছে, ثَمَرٌ শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-বাসনের যাবতীয় সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার উক্তি যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا -ও এ অর্থই বুঝায়।

قَوْلُهُ : مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ শুআবুল ঈমানে হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন- কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّلُ إِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোনো বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কালেমা পাঠ করলে তা 'চোখ লাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইমামু দারিল হিজরত হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) স্বীয় দরজার উপর مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ লিখে রেখেছিলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, হুজুর ঘরের দরজায় এটা লিখেছেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন- وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ এ কারণেই তো আমি ঘরের দরজায় এটা লিখেছি। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৩]

ফায়েদা : আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি হচ্ছে যে, তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মোহ থেকে নিবৃত্ত রাখেন। আর কাফেরদেরকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত রাখেন এবং ঈমানদারগণকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন। -[প্রাগুক্ত : ৬০৪]

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত : وَاضْرِبْ الخ আয়াতে দুনিয়ার মোহে নিপতিত সম্পদশালীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং গরিব, অসহায়, নিঃস্ব আল্লাহনির্ভর ব্যক্তিবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে

অনুবাদ :

٣٩. وَلَوْلَا هَلَّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ عِنْدَ إِعْجَابِكَ بِهَا هٰذَا مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فِي الْحَدِيْثِ مَنْ أُعْطِيَ خَيْرًا مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ فَيَقُوْلُ عِنْدَ ذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَمْ يَرَ فِيْهِ مَكْرُوْهًا إِنْ تَرَنِ أَنَا ضَمِيْرُ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَفْعُوْلَيْنِ أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا .

৩৯. আর কেন তুমি বললে না যখন প্রবেশ করলে তোমার বাগানে তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে এটি ঐ জিনিস যা চেয়েছেন আল্লাহ, নেই কোনো শক্তি আল্লাহ ছাড়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ধনসম্পদ ও সন্তানাদি প্রাপ্ত হলে مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করে সে তাতে কোনো অপছন্দনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করবে না। যদি তুমি মনে কর আমাকে أَنَا হলো দুটি মাফঊলের মাঝে পার্থক্যকারী যমীর ধনে ও সম্পদে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

٤٠. فَعَسٰى رَبِّيْ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ جَوَابُ الشَّرْطِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا جَمْعُ حُسْبَانَةٍ أَيْ صَوَاعِقَ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا . أَرْضًا مَلْسَاءَ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهَا قَدَمٌ .

৪০. তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এটি جَوَاب شَرْط এবং পাঠাবেন তোমার বাগানে গজব حُسْبَانًا শব্দটি حُسْبَانَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– বিদ্যুৎ চমক। আকাশ থেকে, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। মসৃণ ভূমি যাতে পা স্থির থাকে না।

٤١. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا بِمَعْنٰى غَائِرًا عَطْفٌ عَلٰى يُرْسِلَ دُوْنَ تُصْبِحَ لِأَنَّ غَوْرَ الْمَاءِ لَا يَتَسَبَّبُ عَنِ الصَّوَاعِقِ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا . حِيْلَةً تُدْرِكُهُ بِهَا .

৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে غَوْرًا শব্দটি غَائِرًا -এর অর্থে। এর عَطْف হবে يُرْسِلَ -এর সাথে يُصْبِحَ -এর সাথে নয়। কেননা পানি বর্ষিত হয় বিজলীর কারণে; গর্জনের কারণে নয়। এবং তুমি কখনো তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। এমন কৌশল যার মাধ্যমে তা লাভ করবে।

٤٢. وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهِ بِأَوْجُهِ الضَّبْطِ السَّابِقَةِ مَعَ جَنَّتِهِ بِالْهَلَاكِ فَهَلَكَتْ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا عَلٰى مَا أَنْفَقَ فِيْهَا فِيْ عِمَارَةِ جَنَّتِهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا دَعَائِمِهَا لِلْكَرْمِ بِأَنْ سَقَطَتْ ثُمَّ سَقَطَ الْكَرْمُ وَيَقُوْلُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْ أَحَدًا .

৪২. তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল। ثَمَرٌ শব্দে পূর্বে বর্ণিত তিনটি পঠনই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাগান সমুদয় ফল-ফলাদিসহ বিনষ্ট হয়ে যায়। এবং সে হাত কচলাতে লাগল আক্ষেপ ও লজ্জায় তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য বাগান আবাদ করার জন্য। যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে পড়ল আঙ্গুরের মাচান। এভাবে যে প্রথমে মাচান ভূপাতিত হলো। অতঃপর আঙ্গুর পতিত হয়েছে। সে বলতে লাগল, হায়! يَاءِ সতর্ক করার জন্য আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের সাথে শরিক না করতাম।

অনুবাদ :

٤٣. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِنْدَ هَلَاكِهَا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا - عِنْدَ هَلَاكِهَا بِنَفْسِهِ -

৪৩. আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোনো লোকজন ছিল না। تَكُنْ শব্দটি يَاء ও تَاء উভয়ভাবে পঠিত। তা ধ্বংসের সময় এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না তা ধ্বংসের সময় নিজের পক্ষ থেকেও কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি।

٤٤. هُنَالِكَ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الْوَلَايَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ النُّصْرَةُ وَبِكَسْرِهَا الْمُلْكُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ط بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْوَلَايَةِ وَبِالْجَرِّ صِفَةُ الْجَلَالَةِ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا مِنْ ثَوَابِ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ يُثِيبُ وَّخَيْرٌ عُقْبًا - بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُوْنِهَا عَاقِبَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَنَصْبِهِمَا عَلَى التَّمْيِيْزِ -

৪৪. সেখানে কিয়ামতের দিন কর্তৃত্ব وَلَايَةُ শব্দে وَاوْ টি যবর যোগে পঠিত, অর্থ– সাহায্য করা। আর وَاوْ টি যের যোগে পঠিত হলে অর্থ হবে– মালিক হওয়া। আল্লাহরই, যিনি সত্য اَلْحَقّ শব্দটি رَفْع বা পেশ যোগে পঠিত হলে এটি اَلْوَلَايَةُ -এর সিফত হবে। আর جَرّ বা যের যোগে পঠিত হলে اَللّٰه শব্দের সিফত হবে। পুরস্কার দানে তিনি শ্রেষ্ঠ অন্য কেউ যদি প্রতিদান দিত তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ প্রতিদান দিতে পারে না। এবং পরিণাম নির্ধারণে শ্রেষ্ঠ عُقْبًا শব্দের قَافْ টি পেশ ও সুকূন উভয়ভাবেই পড়া যায়। আর تَمْيِيْز হিসেবে তাতে নসব হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَوْلَا : শব্দটি تَخْصِيْصِيَّة তথা প্রস্তুত করা, সন্তুষ্ট করা, সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

اِذْ دَخَلْتَ-এর ظَرْف টা مُقَدَّمْ হয়েছে। مَا شَاءَ اللّٰهُ বাক্যটি مَوْصُوْل ও صِلَة মিলে উহ্য মুবতাদা মাহযূফের খবর হয়েছে। উহ্য ইবারত اَلْاَمْرُ مَا شَاءَ اللّٰهُ হলো মুবতাদা। আর তার خَبَرْ হলো كَائِنٌ যা উহ্য রয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, مَا হলো شَرْطِيَّة আর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَىُّ شَىْءٍ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ بِاللّٰهِ এটা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে لَائے نَفِى جِنْس -এর খবর।

قَوْلُهُ اِنْ تَرَنِ : اِنْ হলো حَرْف شَرْط আর تَرَن হলো فِعْل مَجْزُوْم বা জযমযুক্ত ফে'ল। সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর মধ্যে نُوْن -এর পূর্বে يَاء যা লাম কালিমা উহ্য রয়েছে। نُوْن وِقَايَة আর يَاء যমীর مُتَكَلِّمْ -এর জন্য। উহ্য প্রথম মাফঊল। نُوْن -এর নিচে যের হলো তার নিদর্শন। আর رُؤْيَت قَلْبِىْ দ্বারা رُؤْيَتْ উদ্দেশ্য। আর اَنَا দুই মাফঊলের মাঝে ضَمِيْر فَصْل তাকিদের জন্য। اَقَلَّ হলো مَفْعُوْل ثَانِىْ আর مَالًا এবং وَلَدًا হলো تَمْيِيْز আর فَعَسٰى হলো جَوَاب شَرْط। আর যদি تَرَن দ্বারা رُؤْيَت بَصَرِىْ উদ্দেশ্য হয় হবে اَقَلَّ টা حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে।

قَوْلُهُ يُؤْتِيَنِ : এ শব্দের শেষে مُتَكَلِّمْ -এর যমীর يَاء উহ্য রয়েছে يُؤْتِيَنِ সীগাহটি মুযারে' -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাবে اِفْعَال হতে অর্থ– দেওয়া।

قَوْلُهُ حُسْبَانًا : এর অর্থ হলো– গরম বাতাসের ঝড়, শাস্তি।

حُسْبَانٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে غُفْرَانٌ ওজনে মাসদার অর্থ– হিসাব তথা مِقْدَارُ قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا -এর একবচন হলো حُسْبَانَةٌ

قَوْلُهُ تُصْبِحَ : এটা فِعْل نَاقِصْ তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هِيَ হলো তার اِسْم আর صَعِيْدًا زَلَقًا মওসূফ সিফত মিলে হলো তার খবর।

قَوْلُهُ وَيُصْبِحَ : এর عَطْف পূর্ববর্তী জুমলা يُرْسِلُ -এর উপর হয়েছে। تُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا -এর উপর নয়। যদি حُسْبَانٌ -এর তাফসীর مُطْلَق عَذَابٌ দ্বারা করা হয় তখন يُصْبِحَ -এর আতফ فَتُصْبِحَ -এর উপর করা বৈধ হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার আজাব ফলবাগানকে উদ্ভিদশূন্য মরুদ্যানে পরিণত করার ও পানি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার কারণ। غَوْرًا টা غَائِرٌ -এর অর্থে, যাতে করে حَمل করা বৈধ হতে পারে। অন্যথায় مُبَالَغَة হিসেবে زَيْدٌ عَدلٌ -এর অনুরূপ প্রয়োগ করা হবে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا : এটা يقلب -এর متعلق হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَوْجُهِ الضَّبْطِ السَّابِقَةِ : এর উদ্দেশ্য হলো ثَمَرٌ -এর মধ্যে পূর্বে যে তিনটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। এখানেও সেই কেরাতগুলো প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا : এ শব্দ দুটি বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يُقَلِّبُ -এর صِلَة হলো عَلٰى এজন্য বৈধ হবে যে, يُقَلِّبُ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا -এর অর্থে হয়েছে। অন্যথায় يُقَلِّبُ -এর صِلَه টা عَلٰى হতে পারে না। تَحَسُّرًا এটা يُقَلِّبُ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ خَاوِيَةٌ : এটা اِسْم فَاعِلْ হলেও অর্থগত ভাবে اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হবে অর্থ হলো– পতিত জিনিস।

قَوْلُهُ عُرُوْشٌ : শব্দটি عَرْشٌ -এর বহুবচন, অর্থ– বেড়া, কাঠামো, ডালপালা দ্বারা নির্মিত ছাদ।

قَوْلُهُ دعَائِم : এটা دَعَامَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– মাচান, ছাদ।

قَوْلُهُ يَنْصُرُوْنَهٗ : এটি جُمْلَة টা فِئَةٌ -এর صِفَت اَوَّلْ আর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা كَائِنَةٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে صِفَت ثَانِىْ হয়ে হয়ে

قَوْلُهُ هُنَالِكَ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ আর اَلْوِلَايَةُ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ - لِلّٰهِ হলো خَبَر ثَانِىْ আর اَلْحَقِّ টি اَلْوِلَايَةُ -এর সিফত হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। আর যদি اَلْحَقِّ -এর নিচে যের দেওয়া হয় তবে তা اَللّٰهِ -এর সিফত হবে। আর عُقُبًا এটা تَمْيِيْز - আর عُقْبٌ অর্থ হলো– প্রতিদান, ছওয়াব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ : অর্থাৎ মু'মিন ভাই তার সম্পদশালী অহংকারী কাফের ভাইকে বলল, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে যে, আমার এই বাগান স্থায়ী সম্পদ? কেন এ কথা বললে না যে, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দিবেন?

অহংকার পতনের মূল : বস্তুত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সেই ধন-সম্পদ তার জন্যে বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলার মর্জি, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্য দরবারে এলাহীতে শুকরগুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব এক আল্লাহ তা'আলারই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারে না। এজন্য হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মানুষ যখন সুখ শান্তিতে থাকে বা কোনো সুখসামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। যদি সে এ কথাটি বলে, তবে তার ধন-সম্পদ সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা বাড়ী ঘর দেখে এই দোয়া পাঠ করে তা মানুষের বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বুজুর্গানে দ্বীনের আমল : আল্লামা বগভী (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তার কোনো পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন–

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন, তখন বলতেন–

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এমনিভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বাড়ির ফটকেও লেখা ছিল– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে যে হযরত মূসা (আ.) তাঁর কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজি পেশ করেছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের আয়োজন পূরণে হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন– مَا شَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি অনেক আগে এই প্রয়োজনের আরজি পেশ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা! তুমি যে مَا شَآءَ اللّٰهُ বলেছ তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে।

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করছেন, আমি কি জান্নাতের একটি দ্বারের কথা বলবো না? তখন তিনি বললেন, কোন দ্বার? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তখন বললেন– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবূ ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর ﷺ হযরত আবূযর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি বাক্য শিখাবো না? তখন তিনি বললেন, জী-হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

মুসনাদে আহমদে আছে, হুজুরে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কি জান্নাতের একটি ভাণ্ডারের কথা তোমাদেরকে বলে দিব? সেই ভাণ্ডার হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আমার এই বান্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, শুধু مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-ই নয়; বরং তা-ও যা সূরা কাহফে আছে। অর্থাৎ– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

–[তাফসীরে নূরুল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. ৪২১-৪২৪]

قَوْلُهُ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا الخ - আয়াতের মর্মকথা : এই আয়াত দ্বারা কয়েকটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো–

১. সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।
২. বিপদের মুহূর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।
৩. অতএব এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।
৪. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের কর্মফল বা ছওয়াব কখনো বাতিল হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।
৫. এই ক্ষণস্থায়ী জগতের কোনো সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা এখানকার সবকিছুই নিতান্ত সাময়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর; যে কোনো সময় সম্পদ বা শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও, তবু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সবকিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।
৬. অতএব মনো-ভূবনে স্থান থাকবে এক আল্লাহ তা'আলার আর কারো নয়, আর কোনো কিছুরও নয়। যদি দুনিয়ার সম্পদ থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককারদের জন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে অনন্ত অসীম নিয়ামত রেখে দিয়েছেন।
৭. কোনো লোককে দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করেছে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাকেও দান করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

অনুবাদ :

٤٥. وَاضْرِبْ صَيِّرْ لَهُمْ لِقَوْمِكَ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ كَمَاءٍ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ تَكَاثَفَ بِسَبَبِ نُزُوْلِ الْمَاءِ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَامْتَزَجَ الْمَاءُ بِالنَّبَاتِ فَرَوٰى وَحَسَنَ فَاَصْبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيْمًا يَابِسًا مُتَفَرِّقَةً اَجْزَاؤُهٗ تَذْرُوْهُ تُثِيْرُهٗ وَتُفَرِّقُهُ الرِّيٰحُ ط فَتَذْهَبُ بِهٖ الْمَعْنٰى شَبَّهَ الدُّنْيَا بِنَبَاتٍ حَسَنٍ فَيَبِسُ وَتَكَسَّرُ فَفَرَّقَتْهُ الرِّيَاحُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الرِّيْحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا قَادِرًا .

৪৫. বর্ণনা করুন পেশ করুন তাদের নিকট আপনার সম্প্রদায়ের সামনে পার্থিব জীবনের উপমা এটি প্রথম মাফউল এটা পানির ন্যায় দ্বিতীয় মাফউল যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি, যা দ্বারা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয় পানি বর্ষণের ফলে ঘন হয় ভূমিজ উদ্ভিদ এবং পানি উদ্ভিদের সঙ্গে মিশে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ছড়িয়ে দেয় ও বিচ্ছিন্ন করে দেয় বাতাস। সারকথা দুনিয়াকে এমন উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা পূর্বে তরতাজা ছিল। অতঃপর তা শুকিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাতাসের সাথে মিশে গেছে। অপর এক কেরাতে اَلرِّيْحُ পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান ক্ষমতাবান।

٤٦. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج يُتَجَمَّلُ بِهِمَا فِيْهَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ هِىَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ . خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا . اَىْ مَا يَأْمِلُهُ الْاِنْسَانُ وَيَرْجُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা যা দ্বারা এ পৃথিবীর সাজসজ্জা লাভ হয়। আর স্থায়ী সৎকর্ম অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আর কেউ কেউ এতে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বৃদ্ধি করেছেন। আপনার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আশা আকাঙ্ক্ষা করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِضْرِبْ : اِضْرِبْ-এর তাফসীর صَيِّرْ দ্বারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন اِضْرِبْ-এর ব্যবহার مَثَلْ-এর সাথে হয় তখন এটা দুই মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। আর এ উপমাতে পার্থিব জীবনের শুরু ও শেষকে বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন ঘাসের শুরু এবং শেষের/শেষ পরিণতির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَاءٍ : এর মধ্যে كَافْ অর্থ مَثَلٌ [ন্যায়/মতো] এবং اِضْرِبْ-এর দ্বিতীয় মাফঊল مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا হলো প্রথম মাফঊল। আর اِضْرِبْ এটা صَيِّرْ -এর অর্থে হয়েছে।

كَمَاءٍ এটা هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর। আর اَنْزَلْنَاهُ এটা জুমলা হয়ে مَاءٍ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْهَشِيْمَ : এটা বাবে ضَرَبَ-এর هَشْيًا মাসদার থেকে ব্যবহৃত। অর্থ– টুকরো টুকরো করা, ছিন্ন ভিন্ন হওয়া। هَشِيْمٌ শব্দটি مَهْشُوْمٌ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ رَوٰى : এটা বাবে سَمِعَ থেকে মাসদার رَوًا অর্থ– সজীব সতেজ হওয়া, তরতাজা হওয়া, চাকচিক্যময় হওয়া, মনোমুগ্ধকর হওয়া।

قَوْلُهُ شَبَّهَ : এটা فِعْل اَمْر-এর فَاعِلٌ রাসূল ﷺ زِيْنَةٌ শব্দটি মাসদার اِسْم مَفْعُوْل-এর অর্থে হয়েছে। যাতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন সবই সমান। এ কারণেই زِيْنَةٌ শব্দটি اَلْمَالُ এবং اَلْبَنُوْنَ উভয়েরই খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ : এটা এমন একটি কিয়াস যার كُبْرٰى এবং نَتِيْجَةٌ উহ্য রয়েছে। কিয়াসের তারতীব হচ্ছে اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا . وَكُلُّ مَا هُوَ زِيْنَتُهَا فَهُوَ هَالِكٌ . فَالْمَالُ وَالْبَنُوْنَ هَالِكٌ এরপর বলা হবে كُلُّ مَا هُوَ هَالِكٌ لَا يُفْتَخَرُ بِهٖ فَالْمَالُ وَالْبَنُوْنَ لَا يُفْتَخَرُ بِهِمَا

قَوْلُهُ اَلْبَاقِيَاتُ : এটা হলো صِفَتْ; -এর مَوْصُوْف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلْكَلِمَاتُ বা اَلْاَعْمَالُ

قَوْلُهُ خَيْرًا : এটা اِسْم تَفْضِيْل কিন্তু এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার بِسَبَبِ النُّزُوْلِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِه -এর মধ্যে بَاء টি سَبَبِيَّه

قَوْلُهُ اِمْتَزَجَ الْمَاءُ : এখান থেকে اِخْتَلَطَ -এর দ্বিতীয় তাফসীরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে اِمْتِزَاجٌ যেহেতু উভয়ের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এ কারণেই اِمْتِزَاجٌ-এর নিসবত পানি ব্যতীত উদ্ভিদের দিকে করা বৈধ। যদিও উরফ এবং ব্যবহার এর বিপরীত। উরফ ও লুগাতে بَاء টি طَارِئٌ كَثِيْر غَيْر -এর উপর দাখিল হয়। যেমন اِمْتَزَجَ الْمَاءُ بِاللَّبَنِ [পানি দুধে মিশ্রিত হয়ে গেছে, দুধ পানিতে মিশেনি।] এখানে بَاء টি كَثِيْر طَارِئٌ -এর উপর দাখেল হয়েছে পানি আধিক্যের ক্ষেত্রে مُبَالَغَة করার জন্য। আর যদি দুধ কম হয় এবং পানি বেশি হয়, তখন বলা হবে اِمْتَزَجَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ [দুধ পানিতে মিশে গেছে] এমনিভাবে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, পানি এত বেশি যে, মনে হয় পানিই মূল।

قَوْلُهُ اَمَلًا : اَمَلًا -এর তাফসীর مَا يَاْمُلُهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَمَلًا মাসদার, এটা اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানিয়ে দেওয়া যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। আর আলোচ্য আয়াতেও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই, এ জগত ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এ জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই অস্থায়ী। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ যেসব লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে গর্ব করে অহংকারী হয় তাদের উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। দুনিয়ার জীবন সেই পানির ন্যায় যা আমি আসমান থেকে অবতরণ করি, শুষ্ক জমিনে বৃষ্টিপাত হয় তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই তাতে সজীবতা আসে, তরুলতা জন্মায়, কয়েক দিনের মধ্যেই মাঠের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, সবুজের মেলা বসে, সবুজ তরুলতায় মাঠ ভরে উঠে, আর ঐ মনোরম দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা কয়দিন, কতক্ষণ? সামান্য কয়েকদিন অতিবাহিত

হওয়ার পরই ফসল কেটে আনা হয় এবং যা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে তা ধূলির ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকে। সবুজের মেলা কোথাও খুঁজেও পাওয়া যায় না। এজন্য কবি বলেছেন–

چند روزان زندگی مثل حباب آب هے

ای نظام دور عالم بس تجهے آداب هے

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষের কয়েক দিনের জীবন যেন পানির বুদবুদ, হে বিশ্ব! তোমাকে সালাম জানিয়ে বিদায় হই।

দুনিয়ার অবস্থা ঠিক এরূপই, এমন একদিন আসবে যখন এই পাহাড় পর্বত এই বৃক্ষ তরুলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আকাশ ও ইমারতগুলোর কোনো চিহ্ন থাকবে না। এখানকার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য সবই বিদায় নেবে, সারা পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। অতএব, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই অস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ শান্তি ভুলে থাকা নিতান্ত বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীকে যিনি আবাদ করেছেন, যিনি তাকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনিই তার সবকিছু শেষ করে দিবেন।

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا : আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করার সময় নিয়ামতদাতাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

অর্থাৎ ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক আমলের উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আশা রয়েছে।

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হোক অথবা সন্তান সন্ততি ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের শোভা মাত্র। এসবই দুদিনের সাথী, যখন মানুষের জীবনের অবদান ঘটে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে তখন সবই বিদায় নেয়, মানুষ পৃথিবীতে একা আসে এবং একাই চলে যায়, অর্থ–সম্পদ সঙ্গে যায় না, যায় না সন্তান-সন্ততি বা কোনো আপনজন।

نہ قسمت ساتھ جائیگی نہ دولت ساتھ جائیگی * نہ عظمت ساتھ جائیگی نہ صولت جائیگی

جو کچھ پوچھے جائیگے محشر میں وہ نیک اعمال ہیں تیرے * جو کچھ کام ائینگے وہ نیک افعال ہیں تیرے

অর্থাৎ তোমার সৌভাগ্য বা সম্পদ তোমার সঙ্গে যাবে না। উচ্চ মর্যাদা, সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কিছুই সঙ্গে যাবে না। পরকালীন জিন্দেগীতে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে নেক আমল কি নিয়ে এসেছো। বস্তুত শুধু নেক আমলই সেদিন কাজে আসবে। ইরশাদ হয়েছে– وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাইয়্যান ও হাকিম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (র.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– যত বেশি সম্ভব بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ অর্জন কর। নিবেদন করা হলো– بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ কি? তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করা। হাকিম (র.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ওকায়লী নো'মান ইবনে বশীরের উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ এগুলোই হচ্ছে بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বরাতে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি বর্ণনা করেছে যে– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ কালেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয় যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারাবিশ্বের চেয়ে অধিক প্রিয়।

হযরত জাবের (রা.) বলেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কালেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতের بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ শব্দটির তাফসীর তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরিউক্ত কালেমাসমূহ পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, মাসরুক ও ইবরাহীম (র.) বলেন যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ-এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে উপরিউক্ত কালেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে। তা পাঞ্জেগানা নামাজই হোক অথবা অন্যান্য সৎকর্ম হোক, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাদাতা (রা.) থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযহারী]

এ তাফসীর কুরআনের শব্দাবলিরও অনুকূল বটে। কেননা بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎকর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জারীর, তাবারী ও কুরতুবী (র.) এ তাফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, শস্যক্ষেত্র দু'রকম। দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎকর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবাইদ ইবনে ওমর (র.) বলেন- بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ হচ্ছে নেক কন্যা সন্তান। তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ ছওয়াবের ভাণ্ডার। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করল, হে আল্লাহ তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালনপালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। -[কুরতুবী]

তবে بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো- بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ দ্বারা সে সকল ভালো কর্মসমূহ উদ্দেশ্য যার ফলাফল সর্বদা অব্যাহত থাকে। যেমন- কাউকে ইলম শিক্ষা দিল, যা সর্বদাই চলতে থাকে বা কোনো ভালো নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করল বা মসজিদ, বা কূপ বা সরাইখানা বা বাগান বা ক্ষেত আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াকফ করে দিল অথবা স্বীয় সন্তানকে সৎকর্মপরায়ণ আলেমরূপে গঠন করে গেল। এগুলো সবই সদকায়ে জারিয়া। যার বিনিময় ব্যক্তির মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

এ অভিমতটি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এই যে, এটা পূর্বোক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে নামাজ রোজা, হজ, হাদীসে বর্ণিত দোয়া সমূহ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল পবিত্র উক্তি ও কর্ম যার ফলাফল পরকালের জন্য অবশিষ্ট থাকে এই সবগুলোই بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। এই অভিমতকে ইমাম তাবারী ও হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) পছন্দ করেছেন।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৮]

অনুবাদ :

٤٧. وَاذْكُرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ يُذْهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْاَرْضِ فَتَصِيْرُ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصْبِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ظَاهِرَةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ جَبَلٍ وَلَا غَيْرِهٖ وَحَشَرْنٰهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرُكْ مِنْهُمْ اَحَدًا .

৪৭. এবং স্মরণ কর সেদিন আমি পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করব। অর্থাৎ পাহাড়কে পৃথিবী হতে উপড়ে ফেলব এবং পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় রূপান্তরিত হবে। অন্য এক কেরাতে نُوْن দ্বারা ى -তে কাসরা দ্বারা। আর اَلْجِبَالُ নসবের সাথে। [এখানে উক্ত কেরাত অনুযায়ই অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যথায় মুসান্নিফ (র.)-এর মতে শব্দটি হচ্ছে يَسِيْرُ] আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর প্রকাশ্যভাবে। তাতে পাহাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আমি একত্র করব তাদের সকলকে মু'মিন ও কাফেরদেরকে এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না।

٤٨. وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا . حَالٌ اَيْ مُصْطَفِّيْنَ كُلُّ اُمَّةٍ صَفٌّ وَيُقَالُ لَهُمْ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ز اَيْ فُرَادٰى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَيُقَالُ لِمُنْكِرِي الْبَعْثِ بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَيْ اَنَّهٗ لَنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا . لِلْبَعْثِ .

৪৮. এবং তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এটি حَالٌ বা অবস্থাবাচক অর্থাৎ مُصْطَفِّيْنَ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একেকটি কাতার হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ অর্থাৎ একাকী উলঙ্গ বদনে, খালি পা, খতনাবিহীন অবস্থায়। আর পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনো উপস্থিত করবো না। اَنْ টি مُثَقَّلَةٌ হতে مُخَفَّفَةٌ করা হয়েছে অর্থাৎ اَنَّهٗ

٤٩. وَوُضِعَ الْكِتٰبُ اَيْ كِتَابُ كُلِّ امْرِئٍ فِيْ يَمِيْنِهٖ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِيْ شِمَالِهٖ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ مُشْفِقِيْنَ خَائِفِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيْهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا فِعْلَ لَهٗ مِنْ لَفْظِهٖ مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً مِنْ ذُنُوْبِنَا اِلَّا اَحْصٰهَا عَدَّهَا وَ اَثْبَتَهَا تَعَجَّبُوْا مِنْهُ فِيْ ذٰلِكَ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا مُثْبَتًا فِيْ كِتَابِهِمْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا . لَا يُعَاقِبُهٗ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ مُؤْمِنٍ .

৪৯. এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা। যদি মু'মিন হয় তবে ডান হাতে আর যদি কাফের হয় তবে বাম হাতে প্রদান করা হবে। ফলে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন কাফেরদেরকে তাতে যা রয়েছে তার কারণে আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে অর্থাৎ আমলনামায় লিখিত বদ আমলগুলো দেখে হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! يَا হরফটি সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত। وَيْلَتَنَا শব্দটি هَلَكَتَنَا অর্থে وَيْلٌ টি এমন মাসদার যার মূলবর্ণ থেকে কোনো ফে'লের ব্যবহার নেই। এটা কেমন গ্রন্থ তা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না আমাদের পাপরাশি থেকে বরং তা সবই হিসাব করে রেখেছে। তারা তা দৃষ্টে অবাক হয়ে পড়বে তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে তাদের আমলনামায় বিদ্যমান। আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি কাউকে অপরাধ ছাড়া শাস্তি দিবেন না এবং কোনো মু'মিনের প্রতিদান হ্রাস ও করবেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حَشَرْنَا وَعُرِضُوا وَوُضِعَ : উল্লিখিত তিনটি ফে'ল مَاضِىْ -এর সীগাহ হওয়া সত্ত্বেও এখানে مُضَارِعْ -এর অর্থ- প্রদান করবে। নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়া বুঝানোর প্রতি ইঙ্গিত করে মাজীর সীগাহ আনা হয়েছে। لَمْ نُغَادِرْ -এর আতফ হয়েছে حَشَرْنَا -এর উপর। কেননা لَمْ نُغَادِرْ টা لَمْ -এর কারণে مَاضِىْ مَنْفِىْ -এর অর্থে হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ صَفًّا : এটা عُرِضُوا ফে'ল এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচন রয়েছে। يَسِيْر -এর তাফসীর يَذْهَبُ بِهَا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَسِيْر ফে'ল টা بَاءْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। আর اَلْجِبَالْ হলো তার প্রথম মাফউল।

হযরত হাসান, ইবনে কাছীর ও আবূ আমের (র.) تَسِيْرُ الْجِبَالُ -কে مَجْهُوْل পড়েছেন এবং اَلْجِبَالْ -কে نَائِبْ فَاعِلْ বলেছেন এবং جِبَالْ -কে مَفْعُوْل বলেছেন। আর ইবনে মাহিস (র.) تَسِيْرُ الْجِبَال পড়েছেন এবং اَلْجِبَالْ -কে فَاعِلْ আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বাকূন (র.) نُسَيِّرُ الْجِبَالَ পড়েছেন এবং اَلْجِبَالْ -কে مَفْعُوْل আখ্যা দিয়েছেন আর আল্লাহ তা'আলাকে فَاعِلْ বলেছেন। উল্লেখ্য যে, نُسَيِّرُ শব্দটি উহ্য فِعْل - اُذْكُرْ -এর যরফ হয়েছে।

قَوْلُهُ نُغَادِرْ : এর তাফসীর نترك দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে نُغَادِرْ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةْ থেকে যদিও উভয়প্রান্ত থেকে ফে'লকে কামনা করে। কিন্তু এখানে طَرْفَيْن থেকে ফে'ল উদ্দেশ্য নয়; غَادَرَ অর্থ হলো غَدَرَ অর্থাৎ نَتْرُكْ আর এটা عَاقَبْتُ اللِّصَّ -এর সম্প্রদায়ভুক্ত।

قَوْلُهُ مُصْطَفِّيْنَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَفًّا যদিও مُفْرَدْ কিন্তু মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচনের অর্থ রয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَاءٍ : এটা হয়তো মাফউলে মুতলাক। অথবা ضَمِيْر مَرْفُوْع হতে حَالْ হয়েছে। প্রথম সূরতে كَمَاءٍ মাসদার মাহযুফের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ فَجِئْنَا كَائِنًا كَمَاءٍ

قَوْلُهُ اَنْ لَّنْ : এখানে দুটি বর্ণ রয়েছে। প্রথমটি হলো مُخَفَّفَةْ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ তার اِسْم হলো উহ্য ضَمِيْر شَانْ অর্থাৎ اَنَّهُ আর لَنْ نَجْعَلَ الخ বাক্যটি তার খবর।

দ্বিতীয় শব্দ لَنْ এটা নসবদাতা বর্ণ اَنْ كَانُوْا -কে لَنْ -এর لَا -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। আর কুরআনের رَسْم اَلْخَطّ -এর মধ্যে نُوْن -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর لَكُمْ হলো نَجْعَلْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল। আর مَوْعِدًا হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ كِتَابُ كُلِّ امْرِئٍ : শারেহ (র.) اَلْكِتَابْ -এর তাফসীর كِتَابُ كُلِّ امْرِئٍ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْكِتَابُ -এর اَلِفْ لَامْ টি مُضَافْ اِلَيْهِ -এর পরিবর্তে এসেছে।

قَوْلُهُ مُشْفِقِيْنَ : এর তাফসীর خَائِفِيْنَ করার অর্থ অর্থকে নির্ধারণ করা। কেননা مُشْفِقِيْنَ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে ভীতি, ভয় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَا لِهٰذَا الْكِتَابُ : এর মধ্যে مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّةْ যা مُبْتَدَأْ আর এই ইস্তেফহাম হলো تَوْبِيْخِىْ আর ل টি حَرْفُ جَارْ - هٰذَا ইসমে ইশারা اَلْكِتَابُ হলো مُشَارْ اِلَيْهِ

لِهٰذَا -এর لَامْ কুরআনের رَسْمُ الْخَطْ -এর মুতাবেক هٰذَا থেকে পৃথক লেখা হয়। যথা- ل هٰذَا মাসহাফে উসমানীতে এভাবে লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ صَغِيْرَةً وَكَبِيْرَةً : এর মওসূফ হচ্ছে هَنَّةً বা উহ্য فِعْلَةً আবার مَعْصِيَةْ -কেও উহ্য ধরা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ .... وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا : এ আয়াতে কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কিয়ামত যখন কায়েম হবে তার পূর্বে পাহাড় পর্বত কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু নিজ নিজ স্থান ছেড়ে চলে যাবে, বড় বড় পাথরগুলো তুলার ন্যায় শূন্যে উড়তে থাকবে, বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। সমগ্র মানবজাতিকে সেদিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

ارے عاقل نہو غافل تجھے دنیا سے جانا ہے * تجھے اخر خدا کو منہ اپنا ایک دن دیکھانا ہے

হে বুদ্ধিমান! গাফেল হয়ো না তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। অবশেষে তোমাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে।

বস্তুত এ জগত ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীও সত্য। ইতিপূর্বে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম না, এখন আছি একথা সত্য, এমন একদিন আসবে যখন আমরা থাকবো না, একথা সত্য। প্রশ্ন হলো, কোথায় যাব? আখিরাতে দুটি স্থান রয়েছে। যারা ঈমানদার এবং নেককার হবে তাদের জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের জন্য দোজখ।

قَوْلُهُ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً الخ : অর্থাৎ আর হে রাসূল ﷺ! আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীকে একটি উন্মুক্ত ময়দান, তাতে থাকবে না কোনে ইমারত এবং থাকবে না কোনো পাহাড় পর্বত।

ইমাম কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু তাফসীরকার আতা (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জমিনের অভ্যন্তরীণ অংশ উপরে উঠে আসবে এবং মৃত ব্যক্তিরা বের হয়ে আসবে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২১, তাফসীরে কাবীর খ. ২১. পৃ. ১৩৩]

কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কিয়ামতের দিনের পূর্বের কিছু ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, পাহাড় তুলার ন্যায় উড়ে যাবে, সারা পৃথিবী একটি উন্মুক্ত ময়দানে রূপান্তরিত হবে। উঁচু নিচু স্থান একাকার হয়ে যাবে। কোনো বাড়ি ঘর থাকবে না, কোনো তরুলতা পাথরের অস্তিত্ব থাকবে না। সেদিন সমগ্র মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত করা হবে। ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অনুমতি দেবেন তারা ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। যারা পৃথিবীতে কিয়ামতের এই দিনকে অস্বীকার করতো তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে–

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ তোমরা যে মহা সত্যকে অস্বীকার করতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করতে না, অবশেষে সেই কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন তোমরা হয়েছো। যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা হাজির হয়েছো। অর্থাৎ নগ্ন দেহে তোমরা আমার দরবারে হাজির হয়েছো। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু, পারা– ১৫, পৃ. ১০২]

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে নগ্ন দেহে নগ্ন পায়ে আল্লাহর তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পোষাক পরিধান করানো হবে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্ন পায়ে নগ্ন দেহে বিবস্ত্র অবস্থায় হাজির করা হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তখন পুরুষ ও নারী সকলেই কি এক সাথে থাকবে এবং একে অন্যকে তারা দেখবে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আয়েশা! তখন অত্যন্ত কঠিন সময় হবে [অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবস্থা থাকবে না।]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের নাকি অন্যকে নগ্ন অবস্থায় উঠতে হবে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, লোকেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজে ব্যস্ত থাকবে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, প্রত্যেকের সম্মুখে তার জীবনের আমলনামা রাখা হবে, যাতে তার ছোট বড় সকল কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২২]

যারা পাপিষ্ঠ তারা তাদের অন্যায় কাজের বিবরণ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হবে। আর আক্ষেপ করে বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা আমাদের জীবনকে গাফলতের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। হায় আক্ষেপ! আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম, আর কি বিস্ময়কর এই গ্রন্থ, এতে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি।

তাবারানীতে একটি বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বলেন, যে আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রিয়নবী ﷺ এক জায়গায় অবস্থান করলেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাও, জ্বালানী বা কাষ্ঠখণ্ড বা ঘাস যা কিছু পাও নিয়ে এসো! আমরা এদিক সেদিক চলে গেলাম। এ সম্পর্কীয় যা পাওয়া গেল আমরা সবকিছু সংগ্রহ করে স্তুপাকারে একত্র করলাম। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা দেখছো, এভাবে গুনাহগুলো একত্র হয়ে স্তুপ আকার ধারণ করে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, ছোট বড় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা সবকিছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে, ভালোমন্দ যে যা করে সে সবই দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا - وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ -

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন প্রত্যেকে তার ভালো এবং মন্দ সর্বপ্রকার আমল দেখতে পাবে।"

আরো ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন সকল রহস্য উদঘাটিত হবে, যেদিন সকল গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে, সেদিন মানুষের কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও সে পাবে না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পতাকা তার রানের কাছে হবে, আর ঘোষণা করা হবে এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার চিহ্ন। হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি কোনো সৃষ্টির প্রতি জুলুম করবেন। হ্যাঁ ক্ষমা করা তাঁর গুণ, তাঁর ন্যায় বিচার কায়েম করার লক্ষ্যে তিনি পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। দোজখ পাপিষ্ঠ এবং অবাধ্য লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে গুনাহগার মু'মিনদেরকে রেহাই দেওয়া হবে, আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম অবিচারও করেন না। তিনি নেক আমলকে বৃদ্ধি করেন, আর গুনাহকে সমানই রাখেন। সেদিন ন্যায় বিচারের পাল্লা সম্মুখে থাকবে, কারো প্রতি অবিচার হবে না। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ খবর পেলাম যে, এক ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর একখানা হাদীস শ্রবণ করেছিলেন যা তিনি বর্ণনা করেন। আমি ঐ হাদীস বিশেষভাবে শ্রবণ করার জন্যে একটি উষ্ট্র ক্রয় করলাম এবং সফরের অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরি করলাম। একমাস সফরের পর সিরিয়ায় পৌঁছে জানতে পারলাম, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উয়াইস (রা.)। আমি দ্বার রক্ষীকে বললাম, যাও খবর দাও যে, হযরত জাবের (রা.) দরজায় অপেক্ষমাণ। এ কথা শ্রবণমাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিয়াস সম্পর্কে কোনো একটি হাদীস শুনেছেন। আমার ইচ্ছা হলো আমি আপনার নিকট থেকে সেই হাদীসটি শ্রবণ করি, এজন্য এখানে এসেছি। আর এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীস শ্রবণের পূর্বে যেন আমার মৃত্যু না হয়ে যায় বা আপনার মৃত্যু না হয়। এখন আপনি ঐ হাদীস বর্ণনা করুন! তখন তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে একত্র করবেন নগ্ন দেহ, খতনা ব্যতীত, অসহায় অবস্থায়। এরপর একটি ঘোষণা করা হবে যা নিকট দূরের সকলেই শ্রবণ করবে। ঘোষণাটি হচ্ছে- আমি মালিক, আমি প্রতিদান প্রদানকারী, কোনো দোজখী সে পর্যন্ত দোজখে যাবে না। যে পর্যন্ত কোনো জান্নাতীর উপর তার যে হক রয়েছে তা তাকে না দিয়ে দেই। আর কোনো জান্নাতীও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার কোনো হক

তাকে না দিয়ে দেই যা কোনো দোজখীর উপর রয়েছে, তা একটি চপেটাঘাতই হোক না কেন। আমরা আরজ করলাম, এই হক কিভাবে দেওয়া হবে, অথচ আমরা সেখানে সকলেই নগ্ন দেহ এবং নগ্ন পা অবস্থায় থাকবো, কোনো অর্থ-সম্পদ বা কোনো আসবাব পত্র আমাদের থাকবে না। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, সেদিন হক নেক আমল এবং বদ আমল দ্বারা আদায় হবে। যে দেনাদার তার নেকী পাওনাদারকে দেওয়া হবে, যদি তবু দেনা শোধ না হয় তবে পাওনাদারের গুনাহের বুঝা দেনাদারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ১৫, পৃ. ১০২ - ৩]

قَوْلُهُ وَ وُضِعَ الْكِتَابُ الخ : বস্তুত কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদের পাপের কথা মনে করে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। কেননা, ছোট বড় সবকমের বিবরণ স্থান পাবে আমলনামায়। তাই ইরশাদ হয়েছে- فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

অর্থাৎ [হে রাসূল ﷺ !] আপনি দেখতে পাবেন পাপিষ্ঠরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا .

আর তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! এ কিতাবের কি হলো ছোট বড় কোনো কিছুই তো বাদ দেয়নি সবই তো এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে اَلْمُجْرِمِيْنَ তাদেরকে বলা হয়েছে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু আমলনামায় তারও এক একটি হিসাব লিপিবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ ছোট হোক বড় হোক কোনো গুনাহই না লিখে ছাড়েনি। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সেই সকল গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা কর যে গুলোকে তুচ্ছ মনে করা হয়। তুচ্ছ গুনাহসমূহের উদাহরণ হলো এরূপ যেমন কিছু সংখ্যক লোক একটি উপত্যকায় সমবেত হয়ে কেউ একটি লাকড়ি খুঁজে আনলো অন্যজন আরেকটি লাকড়ি খুঁজে আনলো; [এভাবে এক একটি তুচ্ছ লাকড়ি জমা হয়ে এত হলো] যা রান্না করার জন্য যথেষ্ট হলো। [অর্থাৎ ছোট ছোট তুচ্ছ গুনাহগুলো জমা হয়ে বড় হয়ে যায়। ঐ ছোট গুনাহগুলোও বড় গুনাহের মতো ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। -[বগভী]

নাসায়ী ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান হযরত আয়েশা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেসব গুনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকেও তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, কিয়ামতের দিন] সেগুলো সম্পর্কেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমরা এমন আমল কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র। আমরা হুজুর ﷺ -এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

قَوْلُهُ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا - কর্মানুযায়ী প্রতিদান : অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তাফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেননি যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দকর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে যারা জাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে اَنَا مَالُكَ অর্থাৎ আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। কুরবানির জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গুনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

কুরআনে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হবে। উপরিউক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আসল অর্থেই থাকে।

কুরআনে এতিমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আগুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনো আগুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইয়ের বাষ্পকে আগুন বললে তা নির্ভুল হবে কিন্তু এর দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্রোলকে আগুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে। তবে এর জন্য আগুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে, সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিন্নরূপ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا - কিয়ামতের দিন যেভাবে হিসাব হবে : ইমাম রাযী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো বান্দা যে কাজ করেনি তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয় না, আর কোনো ব্যক্তির অন্যায়ের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার চেয়ে অধিক পরিমাণে শাস্তি দেওয়া হয় না, এমনিভাবে একজনের অন্যায়ের জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়া হয় না। ইমাম রাজী (র.) এই পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে সম্মুখে রেখে মানুষের হিসাব করা হবে। হযরত ইউসূফ (আ.) হযরত আইয়ূব (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)। যারা গোলাম [বা চাকরিরত] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি ইবাদত কেন করোনি? সে বলবে, আমিতো অন্য একজনের গোলাম ছিলাম এজন্য ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত ইউসূফ (আ.)-কে ডাকা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, ইউসুফ তোমার ন্যায়ই গোলাম ছিল; কিন্তু আমার ইবাদত থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে। এরপর এমন একজনকে হাজির করা হবে, যে অসুস্থ বিপদগ্রস্ত। সে বলবে আমিতো বালা মসিবতে আক্রান্ত ছিলাম, আমি কি করে ইবাদত করবো। তখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এই ব্যক্তিকে তোমার চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত করেছি; কিন্তু তার বিপদ তাকে আমার ইবাদত থেকে মাহরুম করেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। এরপর একজন বাদশাহকে [বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে] আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমল নিয়ে এসেছো? সে বলবে, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এ হলো আমার বান্দা সুলায়মান (আ.)। আমি তাকে তোমার চেয়ে বেশি ক্ষমতা এবং তোমার চেয়ে বেশি সম্পদ দান করেছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ তাকে আমার বন্দেগী থেকে বাধা দেয়নি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২১, পৃ. ১৩৪-৩৫]

٥٠. وَاذْ مَنْصُوْبٌ بِاُذْكُرْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ لَا وَضْعِ جَبْهَةٍ تَحِيَّةً لَهٗ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ قِيْلَ هُمْ نَوْعٌ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقِيْلَ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَاِبْلِيْسُ اَبُو الْجِنِّ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ وَذُكِرَتْ مَعَهٗ بَعْدَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ لَا ذُرِّيَّةَ لَهُمْ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَىْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهٖ بِتَرْكِ السُّجُوْدِ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَلْخِطَابُ لِاٰدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَالْهَاءُ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِاِبْلِيْسَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ تُطِيْعُوْنَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط اَىْ اَعْدَاءٌ حَالٌ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ـ اِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهٗ فِىْ اِطَاعَتِهِمْ بَدَلَ اِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

٥١. مَا اَشْهَدْتُّهُمْ اَىْ اِبْلِيْسَ وَذُرِّيَّتَهٗ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَىْ لَمْ اُحْضِرْ بَعْضَهُمْ خَلْقَ بَعْضٍ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّيَاطِيْنَ عَضُدًا ـ اَعْوَانًا فِى الْخَلْقِ فَكَيْفَ تُطِيْعُوْنَهُمْ ـ

অনুবাদ :

৫০. এবং স্মরণ কর এখানে اِذْ টি اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম "আদমের প্রতি সেজদা কর" শুধু মাথা ঝুকানোর মতো সেজদা মাটিকে কপাল রাখার সেজদা নয়। তার সম্মানার্থে। তখন তারা সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে জিনদের একজন। কেউ বলেন, তারা ছিল ফেরেশতাদেরই একটি প্রকার। তখন ইস্তেছনাটি মুত্তাসিল হবে। আর কেউ বলেন, ইস্তেছনাটি মুনকাতি, আর ইবলিস হলো জিনদের আদি পিতা এবং তার সন্তান রয়েছে। যার কথা পরে বর্ণিত হয়েছে। আর ফেরেশতাদের কোনো সন্তান নেই। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল অর্থাৎ সেজদার নির্দেশ বর্জন করে আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে গ্রহণ করছ এখানে হযরত আদম (আ.) এবং তার বংশধরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর উভয়স্থানে هَاءٌ -এর মারজি হলো ইবলীস। আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করবে। বস্তুত তারা তো তোমাদের শত্রু। এখানে عَدُوٌّ টা اَعْدَاءٌ -এর অর্থে এবং এটি حَالٌ হয়েছে। জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ ইবলীস এবং তার বংশধররা। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য।

৫১. আমি তাদেরকে ডাকিনি অর্থাৎ ইবলীস ও তার বংশধরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও নয়। অর্থাৎ স্বয়ং তাদের কতেককে সৃষ্টির সময় তাদের কাউকে উপস্থিত রাখিনি। আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে শয়তানদেরকে সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করার নই। অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বীয় সাহায্যকারী গ্রহণ করি না। এরপরও তোমরা তাদের আনুগত্য কেন কর?

অনুবাদ :

٥٢. وَيَوْمَ مَنْصُوْبٌ بِاذْكُرْ يَقُوْلُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الْاَوْثَانَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ لِيَشْفَعُوْا لَكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ لَمْ يُجِيْبُوْهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْاَوْثَانِ وَعَابِدِيْهَا مَوْبِقًا ـ وَادِيًا مِنْ اَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ يَهْلِكُوْنَ فِيْهِ جَمِيْعًا وَهُوَ مِنْ وَبَقَ بِالْفَتْحِ هَلَكَ ـ

৫২. এবং সে দিনের কথা স্মরণ কর এটা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যেদিন তিনি বলবেন يَقُوْلُ শব্দটি يَاءٌ এবং نُوْن উভয়রূপেই পঠিত। তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে মূর্তিকে তাদেরকে আহ্বান কর যাতে করে তোমাদের ধারণা মতে সে তোমাদের জন্য সুপারিশ করে। তারা তাদেরকে আহ্বান করবে; কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে না। উত্তর দিবে না। এবং তাদের উভয়ের অর্থাৎ মূর্তি ও তার উপাসকদের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর অর্থাৎ জাহান্নামের উপত্যকাসমূহ হতে কোনো একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে দিব। তারা সকলে তাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। مَوْبِقًا শব্দটি وَبَقَ [بَاءٌ বর্ণে যবর সহকারে] হতে মুশতাক বা নির্গত। এর অর্থ হলো- هَلَكَ

٥٣. وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَيْ اَيْقَنُوْا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا اَيْ وَاقِعُوْنَ فِيْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا مَعْدِلًا ـ

৫৩. অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখে বুঝবে যে, অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবে তাঁরা তথায় পতিত হচ্ছে অর্থাৎ তাতে প্রবেশ করছে এবং তারা তা হতে কোনো পরিত্রাণস্থল পাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَحِيَّةً لَهُ : এটা اُسْجُدُوْا-এর مَعْمُوْل কেউ কেউ বলেছেন كَانَ অর্থ صَارَ অর্থাৎ صَارَ مِنَ الْجِنِّ আর كَانَ مِنَ الْجِنِّ এটা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ এবং لَمْ يَسْجُدْ-এর ইল্লত।

قَوْلُهُ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ : এখানে فَاءٌ টি تَعْلِيْلِيَّةٌ এবং سَبَبِيَّةٌ উভয়ই হতে পারে। فَسَقَ অর্থ হলো خَرَجَ ; যখন খেজুর স্বীয় চামড়া থেকে বেরিয়ে পড়ে আরবগণ বলে থাকেন- فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا। এমনিভাবে তারা আরো বলেন- فَسَقَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُحْرِهَا [ইঁদুর তার গর্ত থেকে বেরিয়ে গেছে]। এটা বাবে نَصَرَ ـ ضَرَبَ ও كَرُمَ হতে ব্যবহৃত হয়। فِسْق-এর পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে- সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়া। অবাধ্য হয়ে যাওয়া, শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম করা।

قَوْلُهُ هُمْ نَوْعٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : এটা হলো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হওয়ার ব্যাখ্যা। আর اِبْلِيْسُ وَاَبُو الْجِنِّ এটা হলো مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হওয়ার ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ : এখানে হামযাটি অস্বীকার জ্ঞাপক ও পেরেশানি প্রকাশ করার জন্য। আর فَاءٌ হলো تَعْقِيْب-এর জন্য। ذُرِّيَّتَهُ-এর আতফ تَتَّخِذُوْنَهُ-এর যমীরের উপর হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ইবলিসের সন্তানাদির মধ্যে لَاقِسْ এবং وَلْهَانْ রয়েছে। এদের কাজ হলো তাহারাতের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেওয়া।

قَوْلُهُ ذُرِّيَّةً : এটা اَبُو الْجِنِّ-এর উপর تَفْرِيْع হয়েছে فِسْق-এর তাফসীরে خَرَجَ এনে এর শাব্দিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর عَنْ طَاعَتِهِ بِتَرْكِ السُّجُوْدِ বৃদ্ধি করে فِسْق-এর পারিভাষিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ : এখানে হামযাটা উহ্য বস্তুর উপর প্রবেশ করেছে। পরবর্তী فَاءٌ হলো عَاطِفَةٌ মাতূফ আলাইহি উহ্য রয়েছে। এটা اِسْتِفْهَامٌ تَوْبِيْخِيٌّ মূল ইবারত হলো-

اَبَعْدَ مَا حَصَلَ مِنْهُ مَا حَصَلَ مِنَ الْاِبَاءِ وَالْفِسْقِ يَلِيْقُ مِنْكُمْ اِتِّخَاذُهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ ـ

قَوْلُهُ مِنْ دُوْنِيْ : এটা উহ্য বস্তুর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اَوْلِيَاءْ-এর সিফত হয়েছে। আবার مِنْ دُوْنِيْ-এর مُتَعَلِّقْ টা تَتَّخِذُ-এর সাথেও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ : এটা مَفْعُوْلْ কিংবা فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে। عَدُوٌّ মাসদার হওয়ার কারণে اَعْدَاءْ-এর অর্থে হয়েছে। لِلظَّالِمِيْنَ এটা بَدَلْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর بَدَلاً টা بِئْسَ-এর উহ্য ضَمِيْر فَاعِلْ থেকে تَمْيِيْز হয়েছে। আর اِبْلِيْس وَذُرِّيَّتُهُ হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ-এর بَيَانْ ; মূল ইবারত হলো- بِئْسَ الْبَدَلُ بَدَلاً هُوَ اِبْلِيْسَ وَذُرِّيَّتُهُ

قَوْلُهُ زَعَمْتُمُوْهُمْ شُرَكَائِيْ : এর উভয় মাফউলই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ زَعَمْتُمُوْهُمْ شُرَكَائِيْ

قَوْلُهُ رَأَى : কূফীগণের মতে رَأَى-এর শেষে يَاءْ লিখা হয়। বসরীগণের মতে লিখতে হয় না। [رَأَى মূলত رَأَيَ ছিল। হরকতযুক্ত يَاء-এর পূর্বাক্ষর مَفْتُوْح হওয়ার কারণে يَاءْ-কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করায় رَأَى হয়ে গেছে। আরবি ভাষায় কূফীগণের رَسْمُ الْخَطْ বা লেখারীতি প্রচলিত। কাজেই رَأَى-এর শেষে يَاءْ লিখা হবে।

قَوْلُهُ مُوَاقِعُوْا : এটা جَمْعُ مُذَكَّرْ-এর اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। এটি মূলত ছিল مُوَاقِعُوْنَ ; ইযাফতের কারণে نُوْنْ পড়ে গেছে। অর্থ- একে অন্যের নিকটবর্তী হওয়া। মাসদার হলো- مُوَاقَعَةً

قَوْلُهُ مَصْرِفًا : এটা ظَرْفُ مَكَانْ অর্থ হলো- ফিরে আসার স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কতিপয় সম্পদশালী কাফেরের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকরা দাবি করেছিল যে, তারা উচ্চ বংশের লোক এবং তারা ধন সম্পদশালী। অতএব, দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদের সাথে তারা বসবে না। ঠিক এভাবেই ইবলীসও অহংকার করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছিল, হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দেওয়ার আদেশ অমান্য করে বলেছিল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দিয়ে, তাই আমি আদমকে সিজদা করতে পারি না।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে ইবলীসের ঘটনা বর্ণনা করার কারণ হলো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তোমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছো তা হলো ইবলীস শয়তানের পন্থা, আর ইবলীস শয়তানের পন্থা হলো ধ্বংসের পন্থা।

সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার : অহংকার শুধু একটি মাত্র অন্যায় নয়; বরং সকল অন্যায়ের উৎসই হলো অহংকার, যা শুরু হয়েছিল অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান দ্বারা। পক্ষান্তরে বিনয়, আনুগত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করা এসবই যাবতীয় কল্যাণকর কাজের উৎস, যা শুরু করেছিলেন হযরত আদম (আ.)। অতএব, মানবজাতির একান্ত কর্তব্য হলো আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর অনুসরণ করা। কাফেররা অহংকার করেছে আর দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় মনে করেছে, ঠিক এমনিভাবে ইবলীস শয়তান অহংকার করেছে এবং হযরত আদম (আ.)-কে হেয় মনে করেছে। অতএব, ইবলীসের শোচনীয় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে অহংকারীকে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪ পৃ. ৪২৫]

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানুষের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার দুটি পন্থা রয়েছে। যথা- ১. অর্থ-সম্পদের লোভ। ২. ইবলীস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হওয়া। ইতিপূর্বে অর্থ-সম্পদের লোভ এবং অর্থ-সম্পদ লাভের কারণে অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ইবলীস শয়তানের ধোঁকাবাজির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে-

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ .

অর্থাৎ আর সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম যে তোমরা আদমের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দাও। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা দিল। ইবলীস ছিল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইবলিস তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।

ইবলীসের ইতিকথা : আয়াতের বর্ণনাশৈলী দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, ইবলীসের অবাধ্য হওয়ার কারণ হলো, জিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা ফেরেশতাগণ কোনো সময়ই আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেন না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদেরকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদেরকে জিন বলা হতো। আর হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতা ছিল না; বরং সে ছিল জিন। যেভাবে হযরত আদম (আ.) সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা, ঠিক এমনিভাবে জিনদের আদি হলো ইবলীস।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-এর এই অভিমতকে অযৌক্তিক বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি। এই আয়াত এবং সূরা আর রাহমান ও সূরা জিনের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের ন্যায় জিনদের মধ্যেও কিছু নেককার এবং কিছু জালেম কাফের রয়েছে। জালেম ও কাফেররা নিঃসন্দেহে দোজখী হবে। আর ইবলীস এবং তার বংশধররা সকলেই আল্লাহ তা'আলার শত্রু, ওলী আল্লাহগণের শত্রু। অতএব, ইবলীস কোনো অবস্থাতেই জিনদের আদি ব্যক্তি হতে পারে না। كَانَ مِنَ الْجِنِّ -এর অর্থ হচ্ছে- ইবলীস ছিল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। জিন হওয়া সত্ত্বেও তার অত্যধিক ইবাদতের কারণে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। আর এ কারণেই যখন ফেরেশতাদেরকে সিজদা দেওয়ার হুকুম হয়, সেই হুকুম ইবলীসের ব্যাপারেও হয়। কিন্তু এই হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ইবলীসের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। সে অহংকারী হয়, আর অহংকারের কারণেই সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, আদম সন্তানেরা তাদের পৈত্রিক শত্রু ইবলীস শয়তানকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে এবং তাকে নিজেদের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মানবজাতিকে ইবলীস শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এই মর্মে, ইবলীস তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শত্রু। অতএব, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অমান্য করো না এবং ইবলীসের অনুগমন করো না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইবলীসকে অগ্নি দ্বারা। যদিও ইবলীস দিবারাত্রি ফেরেশতাদের ন্যায় ইবাদত করেছিল, কিন্তু হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। তার ভিতর যে অহংকার নিহিত ছিল, তার কারণে সে হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা- ১৫, পৃ. ১০৩]

قَوْلُهُ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ : এ আয়াতে মানুষকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা কি তবে, আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং শয়তান সন্তান সন্ততিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু।

অর্থাৎ ইবলীসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়, ইবলীস শয়তানই মানুষকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের সম্মোহনীয় ফাঁদে ফেলে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে ধ্বংস করে।

قَوْلُهُ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا - পাপীদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ : কাফেররা যে আল্লাহ তা'আলার স্থলে ইবলীস ও তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের এ কাজটি অত্যন্ত মন্দ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মুজাহিদ (র.) ইমাম শা'বী (র.)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বসেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবলীসের স্ত্রী আছে কি? আমি জবাব দিলাম আমি জানি না। এরপর আমার স্মরণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন- اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ তোমরা কি ইবলীস এবং তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছো? আর বংশধর স্ত্রী ব্যতীত হতে পারে না। এ কথা স্মরণ হওয়ার পর আমি বললাম, হ্যাঁ ইবলীসের স্ত্রী আছে।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, মানুষের ন্যায় শয়তানের সন্তান সন্ততি হয়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে, লাকীন, ওয়ালহান, হাফাফ, মোররা, জালনাবুর, আওয়ার, মাতূস, ইয়াসূর, ওয়াসেম।

ওয়ালহান অজু গোসল ও নামাজের সময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়। আর ইবলীসকে বলা হয় আবূ মোররা অর্থাৎ ইবলীস এই উপনামেই বিখ্যাত। জালনাবূর বাজারে মিথ্যা শপথ করায় এবং বিক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। আওয়ার নামক শয়তান মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। মাতূস মানুষের মধ্যে গুজব রটায়। আর ইয়াসূর নামক শয়তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে শরিয়ত বিরোধী পন্থায় বিলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ওয়াসেম নামক শয়তানের কাজ হলো মানুষ যখন বাড়িতে যায়, সে কাউকে সালাম দেয় না, আল্লাহ তা'আলার জিকিরও করে না তখন ওয়াসেম নামক শয়তান যে ব্যক্তির বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসিকে এদিক সেদিক করে বিনষ্ট করে রাখে যা দেখে মানুষ রাগান্বিত হয়। আর সে বাড়ির লোকদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে। আর বিসমিল্লাহ পাঠ না করে আহার করা আরম্ভ করে, তখন ওয়াসেম নামক শয়তান তার সাথে খাবারে অংশীদার হয়। আ'মাশ (রা.) বলেছেন, কোনো কেনো সময় বিসমিল্লাহ না বলে কেউ গৃহে প্রবেশ করে এবং কাউকে সালামও করে না, এরপর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অজুতে প্রতারণাকারী শয়তানকে বলা হয় ওয়ালহাম, তোমরা তার ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, যে হযরত ওসমান ইবনে আবীল আস প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! শয়তান আমার নামাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং আমার নামাজের ব্যাপারে সন্দিহান করেছে। [আমার মনে থাকে না কয় রাকাত পড়েছি] তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন এ হলো শয়তান তাকে খিনজিব বলা হয়। যখন এ অবস্থা উপলব্ধি কর, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর! অর্থাৎ আউজুবিল্লাহ পাঠ কর এবং বা দিকে তিনবার থুথু ফেল। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি তাই করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার শয়তানকে দূর করে দিয়েছেন। -[মুসলিম শরীফ]

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইবলীস তাঁর আসন পানির উপর স্থাপন করে। এরপর তার দলবলকে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ইবলীসের কাছে সবচেয়ে নৈকট্যধন্য সেই হয় যে, সবচেয়ে বেশি অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কেউ এসে বলে, আমি এই কাজ করেছি। ইবলীস বলে, তুমি কিছুই করনি। আরেক শয়তান বলে, আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইবলীস বলে তুমি ভালো কাজ করেছো। এরপর ঐ শয়তানকে নিজের কাছে টেনে আনে। আ'মাশের বর্ণনা হলো এই যে, বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপর ইবলীস তাকে জড়িয়ে ধরে। -[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهٗ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি কাফেরদের এবং তাদের উপাস্যদের মধ্যে একটি আড়াল রেখে দিব।" مَوْبِقًا অর্থ- ধ্বংসের স্থান। তাফসীরকার আতা এবং যাহ্যাক (র.) শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مَوْبِقٌ হলো দোজখের একটি ময়দানের নাম। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, গরম পানির একটি হ্রদ। আর ইকরামা (র.) বলেছেন مَوْبِقٌ হলো অগ্নির একটি সাগর। যার তীরে কালো বর্ণের খচ্চরের সমান সর্প রয়েছে। আর ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, দু'টি জিনিসের মধ্যে যা আড়াল করে রাখে তাকে مَوْبِقٌ বলা হয়।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩০]

قَوْلُهٗ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ .... عَنْهَا مَصْرِفًا : তাফসীরকারগণ লিখেছেন প্রথম প্রথম পাপিষ্ঠদের মনে ক্ষীণ আশা থাকবে যে, হয়তো নাজাত হতেও পারে। কিন্তু যখন দোজখ দেখতে পাবে তখন আর এ সত্য বুঝতে বাকি থাকবে না যে, দোজখই তাদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে; নাজাতের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা দোজখের অগ্নি তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আর সবদিক থেকেই ফেরেশতারা প্রহরায় রত থাকবে। আর যাদেরকে তারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার শরিক মনে করতো তারা এত অসহায় হবে যে পূজারীদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা তাদের কাছেও আসতে পারবে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহমদে সংকলিত হয়েছে। এতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কাফেররা দোজখকে ৪০ মাইল দূরত্ব থেকে দেখবে। এরপর তাদের মনে নাজাতের আর কোনো আশা থাকবে না, ঐ দোজখেই তারা নিক্ষিপ্ত হবে- এই সত্য তারা উপলব্ধি করবে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৬]

٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَّا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ـ صِفَةٌ لِمَحْذُوْفٍ اَيْ مَثَلاً مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ لِيَتَّعِظُوْا وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَيِ الْكَافِرُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ـ خُصُوْمَةً فِي الْبَاطِلِ وَهُوَ تَمْيِيْزٌ مَنْقُوْلٌ مِنْ اِسْمِ كَانَ الْمَعْنٰى وَكَانَ جَدَلُ الْاِنْسَانِ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيْهِ ـ

অনুবাদ :

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আয়াতে বর্ণিত مِنْ كُلِّ مَثَلٍ বাক্যটি উহ্য مَثَلاً মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের উপমা যাতে করে উপদেশ গ্রহণ করে। এবং মানুষ অর্থাৎ কাফেররা অধিকাংশ ব্যাপারেই কলহপ্রিয় অর্থাৎ বাতিল বিষয়ে বিতর্ক করে থাকে। আর جَدَلاً শব্দটি كَانَ -এর ইসিম হতে مَنْقُوْل হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে। মূল ইবারত হলো- وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيْهِ

٥٥. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰى اَيِ الْقُرْاٰنُ وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّاۤ اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ فَاعِلٌ اَيْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ وَهِيَ الْاِهْلَاكُ الْمُقَدَّرُ عَلَيْهِمْ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ـ مُقَابَلَةً وَعِيَانًا وَهُوَ الْقَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضُمَّتَيْنِ جَمْعُ قَبِيْلٍ اَيْ اَنْوَاعًا ـ

৫৫. কেবল এ অপেক্ষা মানুষকে বিরত রাখে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে ঈমান আনয়ন হতে এটা مَفْعُوْل ثَانِيْ হয়েছে। যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে অর্থাৎ কুরআন এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত নীতি আসুক। سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ এটা تَاْتِيَهُمْ -এর ফায়েল। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে আমার রীতি। আর তা হলো তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংস অথবা আসুক তাদের নিকট সরাসরি আজাব মুখোমুখি এবং প্রকাশ্যে। আর তা ছিল বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া। অপর এক কেরাতে قُبُلًا শব্দের ق ও ب পেশ সহকারে পঠিত রয়েছে। তখন এটি قَبِيْل -এর বহুবচন হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের।

٥٦. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج مُخَوِّفِيْنَ لِلْكَافِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ بِقَوْلِهِمْ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً وَنَحْوِهِ لِيُدْخِضُوْا بِهٖ لِيُبْطِلُوْا بِجِدَالِهِمُ الْحَقَّ الْقُرْاٰنَ وَاتَّخَذُوْا اٰيَاتِيْ الْقُرْاٰنَ وَمَاۤ اُنْذِرُوْا بِهٖ مِنَ النَّارِ هُزُوًا ـ سُخْرِيَّةً ـ

৫৬. আমি রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি কেবল সুসংবাদদাতা মু'মিনদের জন্য ও সতর্ককারী রূপেই ভীতি প্রদর্শনকারী কাফেরদের জন্য। কিন্তু কাফেররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে। তাদের এ জাতীয় উক্তি দ্বারা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন ইত্যাদি। তা দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। বিতণ্ডার মাধ্যমে বাতিল করে দেওয়ার জন্য। সত্যকে কুরআনকে আর তারা গ্রহণ করে থাকে আমার নিদর্শনাবলিকে কুরআনকে ও যা দ্বারা তাদেরকে নরকাগ্নি থেকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে উপহাসের বস্তু হিসেবে।

অনুবাদ :

٥٧. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ط مَا عَمِلَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ فَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْ عَاقِبَتِهَا اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَغْطِيَةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ مِنْ اَنْ يَّفْقَهُوا الْقُرْاٰنَ اَيْ فَلَا يَفْهَمُوْنَهٗ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط ثِقْلًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهٗ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَيْ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُوْرِ اَبَدًا .

৫৭. তার চেয়ে অধিক জালেম কে? যাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি, তারপরও সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়। অর্থাৎ তা হলো কুফর ও গুনাহের কাজ যা সে করেছে। আর সে তার শেষ পরিণতির ব্যাপারে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি। যেন তারা তা বুঝতে না পারে তাদের কুরআন বুঝা থেকে অর্থাৎ ফলে তারা কুরআন বুঝে না। আর তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি। ভারত্ব। ফলে তারা কুরআন শুনতে পারে না। আপনি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না উপরিউক্ত কর্মের কারণে। অর্থাৎ হৃদয়ে আবরণ ফেলে দেওয়া ও কর্ণে বধিরতা ফেলে দেওয়ার কারণে।

٥٨. وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ فِيْهَا بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا . مَلْجَأً مِنَ الْعَذَابِ .

৫৮. এবং আপনার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন পৃথিবীতে, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন পৃথিবীতেই কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত। আর তা হলো কিয়ামতের দিন যা হতে তারা কখনোই কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না। অর্থাৎ শাস্তি হতে পরিত্রাণের জায়গা।

٥٩. وَتِلْكَ الْقُرٰى اَيْ اَهْلُهَا كَعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَغَيْرِهِمَا اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا كَفَرُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ لِاِهْلَاكِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْمِيْمِ اَيْ لِهَلَاكِهِمْ مَوْعِدًا .

৫৯. ঐসব জনপদ অর্থাৎ তার অধিবাসীগণকে যেমন– আদ, ছামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে তাদের অধিবাসীবৃন্দ। কে, আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। অর্থাৎ কুফরি করেছিল। এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। অন্য এক কেরাতে مِيْم বর্ণটি যবরসহ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَقَدْ صَرَّفْنَا : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে صَرَّفَ تَصْرِيْفًا অর্থ– বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা, বিভিন্নভাবে বুঝানো।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ : এর মধ্যে مِنْ টি অতিরিক্ত। এটা مَثَلًا উহ্য মওসূফের সিফত হয়ে صَرَّفْنَا -এর মাফউলে বিহী। মূল ইবারত হলো– صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مَثَلًا كَائِنًا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

قَوْلُهُ قَوْلًا جَدَلًا : এটা اَكْثَرَ شَيْءٍ -এর নিসবত থেকে تَمْيِيْز হয়েছে। كَانَ -এর اِسْم থেকে স্থানান্তরিত। অর্থাৎ كَانَ جِدَالُ الْاِنْسَانِ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيْهِ اَيْ جِدَالُهٗ اَكْثَرَ مِنْ كُلِّ مُجَادِلٍ .

قَوْلُهُ مَنَعَ : এটা বাবে فَتَحَ থেকে ফে'লে মাযীর সীগাহ। আর اَلنَّاس হলো এর প্রথম মাফউল। اَنْ يُّؤْمِنُوْا এটা جُمْلَةٌ بِتَاوِيْلِ مَصْدَرٍ হয়ে দ্বিতীয় মাফউল اَنْ يُّؤْمِنُوْا -এর পূর্বে একটি مِنْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ جَاۤءَهُمْ : এটা يُؤْمِنُوْا -এর ظَرْف হয়েছে। আর يَسْتَغْفِرُوْا -এর আতফ হয়েছে يُؤْمِنُوْا -এর উপর।

قَوْلُهُ اَنْ تَاْتِيَهُمْ : এটা مَصْدَرٌ بِتَاوِيْلِ হয়ে مَنَعَ -এর فَاعِلٌ আর اِنْتِظَارُ মুযাফ উহ্য রয়েছে। اَنْ تَاْتِيَهُمْ হলো মুযাফ ইলাইহি যা মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। আর يَاْتِيَهُمْ -এর আতফ হয়েছে تَاْتِيَهُمْ -এর উপর।

قَوْلُهُ قُبُلًا : এটা اَلْعَذَابُ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থ- সামনে, মুখোমুখি। এক কেরাতে এসেছে قُبُلًا যা قَبِيْل -এর বহুবচন, যার অর্থ হলো প্রকার। যেমন- سُبُلٌ এটা سَبِيْلٌ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ : এটা مُرْسَلِيْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। يُجَادِلُ -এর মাফউল اَلْمُرْسَلِيْنَ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لِيُدْحِضُوْا : এটা يُجَادِلُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ ; اِدْحَاضٌ বাবে اِفْعَالٌ থেকে অর্থ- পিছনে যাওয়া, টলে যাওয়া।

قَوْلُهُ مَا اُنْذِرُوْا : এর মধ্যে مَا টি হলো مَوْصُوْلَةٌ আর انذروا এটা جُمْلَةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। عَائِدٌ بِهٖ উহ্য مَا অথবা مَا টা مَصْدَرِيَّةٌ যা اِنْذَارَهُمْ -এর অর্থে হয়েছে। اُنْذِرُوْا -এর আতফ اٰيَاتِيْ -এর উপর হয়েছে। আর هُزُوًا এটা اِتَّخَذُوْا -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর اٰيَاتِيْ এবং وَمَآ اُنْذِرُوْا জুমলায়ে আতেফা হয়ে اِتَّخَذُوْا -এর প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ مَنْ : এটা শাব্দিকভাবে مُفْرَدٌ বা একবচন, আর অর্থগতভাবে বহুবচন, কাজেই এর দিকে একবচন ও বহুবচন উভয়ের যমীরই ফিরতে পারে। যেমন সামনে পাঁচটি যমীর مُفْرَدْ -এর এবং পাঁচটি جَمْع -এর যমীর مَنْ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ اَكِنَّةً : এটা كِنَانٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পর্দা। এ বাক্যটি نِسْيَانٌ ও اِعْرَاضٌ -এর ইল্লত।

قَوْلُهُ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُوْرِ : اِذًا -এর মফহুম নির্দিষ্ট করণার্থে এই جُمْلَةٌ -টির প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبُّكَ : এটা مُبْتَدَأٌ আর اَلْغَفُوْرُ হলো প্রথম খবর আর ذُو الرَّحْمَةِ হলো দ্বিতীয় খবর।

قَوْلُهُ مَوْئِلًا : এটা যরফ, অর্থ- আশ্রয়স্থল, বাবে ضَرَبَ হতে মাসদার وَلَ، يَئِيْلُ، وَالًا অর্থ- আশ্রয় গ্রহণ করা।

قَوْلُهُ تِلْكَ الْقُرٰى : এটা মুবতাদা, আর اَهْلَكْنَاهُمْ হলো খবর। تِلْكَ الْقُرٰى উহ্য ফেলের কারণে مَنْصُوْبٌ -ও হতে পারে। তখন মূল ইবারত হবে- اَهْلَكْنَا تِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنَاهُمْ

قَوْلُهُ مَهْلِكَ : এটা مَصْدَرٌ مِيْمِيٌّ অর্থ- ধ্বংস করা। অথবা ظَرْفُ زَمَانٍ অর্থ- ধ্বংস হওয়ার সময়, বহুবচনে مَهَالِكُ مَهْلِكٌ -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে-

১. مِيْم -এর মধ্যে পেশ এবং لَامْ -এর মধ্যে যবর হবে- مُهْلَكٌ

২. مِيْم এবং لَامْ উভয়টিতে যবর হবে- مَهْلَكٌ

৩. مِيْم -এর মধ্যে যবর এবং لَامْ -এর মধ্যে যের হবে- مَهْلِكٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, কাফেররা তাদের ধন সম্পদের কারণে অহংকার করেছে এবং দারিদ্র পীড়িত মুসলমানকে হেয় মনে করেছে, তাদের এই আচরণ শুধু নিন্দনীয়ই নয়; বরং তাদের জন্য বিপদজনকও। এই পর্যায়ে ইতিপূর্বে দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে আমি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, বারে বারে সত্যকে বুঝাবার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু যারা কলহপ্রিয়, যারা তর্কপ্রিয়, তাদের তর্কের শেষ হয় না। ঈমান না আনার জন্য, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস না করার জন্যে তাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ বা যুক্তিও থাকে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের জিদ এবং হঠকারিতা ও অযথা তর্ক শেষ হয় না। তাদের এই ঘৃণ্য আচরণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেদের জন্যে চরম ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ আমি তাদের জন্যে প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্টভাবে বার বার বর্ণনা করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সঠিক পথ থেকে দূরে থাকে।

এই আয়াতের তাফসীরে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আলী (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীস প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রে প্রিয়নবী ﷺ আমার এবং তাঁর কন্যার নিকট আগমন করলেন এবং ইরশাদ করলেন, তোমরা উভয়ে রাত্রে নামাজ আদায় কর না? [অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ, বা নফল নামাজ] আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন উঠিয়ে নেন। আমার এই আরজীর পর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম, তিনি তাঁর রানের উপর হাত মেরে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন- وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বড় কলহপ্রিয়।

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে হযরত আলী (রা.) মুস্তাহাব বা নফল ইবাদতের ব্যাপারে এই জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই, তিনি তাওফীক দিলেই ইবাদত করতে পারে, আর তিনি তাওফীক না দিলে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা সম্ভব হয় না। প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব শ্রবণ করে কোনো কথা বললেন না; বরং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, হয়তো হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব তিনি পছন্দ কনেনি, তাই আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩১; মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪২৭, ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ১৫. পৃ. ১০৫, রূহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. ৩০০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانُ শব্দ দ্বারা নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কালবী (র.)-এর মতে উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের اَلْاِنْسَانُ শব্দ দ্বারা সকল কাফেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কাফেররা সকলেই কলহপ্রিয়। সত্য গ্রহণে তাদের চরম অনীহা রয়েছে। তারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, اِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। [মুমিন হোক কিংবা কাফের।] -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, খ. ২৩১]

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁর আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছুই নেই। লোকটি বলবে, আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। লোকটি বলবে, আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সামনে লওহে মাযফুজ রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপেই লিখিত রয়েছে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কিনা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫৯৯-৬০০]

قَوْلُهُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا .... سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ - কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী : যখন মানুষের কাছে পবিত্র কুরআনে হেদায়েত এসে পৌঁছে তখন ঐ হেদায়েত গ্রহণ করায় এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছিল না। কিন্তু শুধু এতটুকুই বাধা ছিল যে তারা এই অপেক্ষায় রয়েছে যে অতীত কালে যেসব উম্মত আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'আলার কোপগ্রস্থ হয়েছে তাদের দশা এদেরও হোক, অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তাদের প্রতি আজাব আসুক। কেননা ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জিদ ও হঠকারিতার কারণে সত্যের বিরোধিতা করেছে তাদের শাস্তি হয়েছে যুগে যুগে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তার নিকট নাজিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করে। অতএব তাদের এই আচরণ এ তথ্যেরই প্রমাণ যে তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের هُدًى শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআন এবং ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন এর দ্বারা স্বয়ং হুজুর ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ হলো আল্লাহ তা'আলার আজাবের সেই পন্থা যা পূর্বকালের কাফেরদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে পন্থায় তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ - প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : রাসূলগণকে প্রেরণের দুটিই উদ্দেশ্য। যথা- ১. মুমিনদের জন্য সওয়াব এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা। ২. কাফেরদেরকে দোজখের আজাবের ভয় প্রদর্শন করা। এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে আমি কোনো পয়গাম্বরকে এ বিষয়ের অধিকার দেই না যে কাফেররা কোনো প্রকার মুজিজা তলব করলেই তা পেশ করবেন। অথবা এর অর্থ হলো, আমি কোনো পয়গাম্বরকে এই দায়িত্ব দেই না যে সারা পৃথিবীর মানুষকে হেদায়েত করবেন; বরং তাদের কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া। যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে সে ভাগ্যবান হবে, আর যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না সে ভাগ্যহত হবে। কোনো লোককে হেদায়েত গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা পয়গাম্বরের কাজ নয়। এতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা। এই মর্মে যে, হে রাসূল! যদি মক্কাবাসী আপনার প্রতি ঈমান না আনে তবে আপনি তার জন্যে দায়ী নন। কেননা মক্কার কাফেররা বলেছিল, হে আল্লাহ যদি এই নবী সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা কোনো যন্ত্রনাদায়ক আজাব প্রেরণ কর! এমনকি তারা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিল, হে নবী! আমরা তো আপনাকে পাগল মনে করি; তাই ফেরেশতা কেন আনেন না? তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কববাণী উচ্চারণ করার পর প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করেছেন এই মর্মে যে, হে রাসূল! আপনার কাজ হলো মুসলমানদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা এবং কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। আর এই দায়িত্ব আপনি সঠিকভাবে পালন করেছেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু], পারা- ১৫, পৃ. ১০৬, মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩২, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৭]

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায় আচরণের বিবরণ দেওয়ার পর তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে কেন রয়েছে, তাদের শাস্তি কেন হয় না? তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অনন্ত অসীম তাঁর রহমত। আর এই রহমতের কারণেই তিনি দুর্বৃত্ত কাফেরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না; বরং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকে না।

কাফেরদের অবকাশ প্রদানের কারণ : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান। তার একটি প্রমাণ হলো এই যে মক্কার দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে চরম কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। তাদের উপর আজাব আপতিত হয় না। তবে তাদের এ অবকাশ চিরদিনের জন্য নয়; বরং কয়েক দিনের জন্য। বস্তুত মানুষের কৃতকর্ম এত মন্দ যে, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে, কিন্তু করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন করুণা ও রহমতই তাদের শাস্তি বিধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। যেন এই সুযোগে তারা আত্ম সংশোধনে মনোনিবেশ করতে পারে। এটি আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই ইরশাদ হয়েছে- بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلًا "বরং তাদের জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময়, তা থেকে সরে যাওয়ার কোনো স্থান তারা পাবে না।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। আর [দুনিয়াতে] বদরের যুদ্ধের দিন। কেননা বদরের যুদ্ধের দিন মক্কার কাফেরদের তথাকথিত নেতা উপনেতাদের অনেকেই নিহত হয়।

قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ .... لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا : আদ জাতি, সামূদ জাতি, ফেরাউনের দলবল তথা যাদেরকে ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তারা তাদের কীর্তি কলাপের শাস্তি পেয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদের জানা উচিত যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব আপতিত হয়, তখন তাদের জন্য কোথাও আশ্রয়স্থল থাকে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে অবাধ্য কাফেরদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক এমনিভাবে যখন এদের জন্য নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তাদেরও আত্মরক্ষার কোনো স্থান থাকবে না।

অনুবাদ :

٦٠. وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ لِفَتٰـهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَكَانَ يَتَّبِعُهٗ وَيَخْدِمُهٗ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَآ اَبْرَحُ لَا اَزَالُ اَسِيْرُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مُلْتَقٰى بَحْرِ الرُّوْمِ وَبَحْرِ فَارِسَ مِمَّا يَلِى الْمَشْرِقَ اَىِ الْمَكَانَ الْجَامِعَ لِذٰلِكَ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ـ دَهْرًا طَوِيْلًا فِىْ بُلُوْغِهٖ اِنْ بَعُدَ ـ

৬০. ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন হযরত মূসা (আ.) তিনি ইমরানের ছেলে বলেছিলেন, তার সঙ্গীকে অর্থাৎ ইউশা' ইবনে নূনকে, সে তাঁর অনুসরণ করত। তাঁর খেদমত করত এবং হযরত মূসা (আ.) থেকে ইলম অর্জন করত। আমি থামব না সফরে চলতেই থাকব দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব দিক হতে রোম সমুদ্র ও পারস্য সমুদ্রের সঙ্গমস্থল অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। যদি লক্ষ্যস্থল খুঁজে না পাই তবে এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকব।

٦١. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ نَسِيَا حُوْتَهُمَا نَسِىَ يُوْشَعُ حَمْلَهٗ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَنَسِىَ مُوْسٰى تَذْكِيْرَهٗ فَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ اَىْ جَعَلَهٗ بِجَعْلِ اللّٰهِ سَرَبًا ـ اَىْ مِثْلَ السَّرَبِ وَهُوَ الشِّقُّ الطَّوِيْلُ لَا نَفَاذَ لَهٗ وَذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمْسَكَ عَنِ الْحُوْتِ جَرْىَ الْمَاءِ فَانْجَابَ عَنْهُ فَبَقِىَ كَالْكُوَّةِ لَمْ يَلْتَئِمْ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهٗ مِنْهُ ـ

৬১. তারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন তারা নিজেদের মৎসের কথা ভুলে গেলেন হযরত ইউশা' রওয়ানার প্রাক্কালে মৎস উঠিয়ে নিতে ভুলে গেলেন। আর হযরত মূসা (আ.) তাকে মৎস্য উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলে দিতে ভুলে গেলেন। তা মৎস্যটি সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। অর্থাৎ মৎস্যটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এরূপ করেছে। এবং সুড়ঙ্গের মতো রাস্তা এতো লম্বা ছিল যে, তার এপার ওপার ছিল না। এটা এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মৎস্য চলে যাওয়ার পর পানিকে আটকে দিয়েছিলেন। যার কারণে পানি মৎসের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই ঐ সুড়ঙ্গটি সিড়ির মতো হয়ে গিয়েছিল। আর এটা হযরত মূসা (আ.) ফেরত আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। আর মৎস্যটি যেখান দিয়েই অতিক্রম করত সেখানেই পানি জমে যেত। যার ফলে সেই রাস্তা সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করেছিল।

٦٢. فَلَمَّا جَاوَزَا ذٰلِكَ الْمَكَانَ بِالسَّيْرِ اِلٰى وَقْتِ الْغَدَاءِ مِنْ ثَانِىْ يَوْمٍ ـ قَالَ لِفَتٰـهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز هُوَ مَا يُؤْكَلُ اَوَّلَ النَّهَارِ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ـ تَعَبًا وَحُصُوْلُهٗ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ ـ

৬২. যখন তারা আরো অগ্রসর হলেন ঐ ফিরে আসার জায়গা থেকে সামনে চলে গেলেন এবং দ্বিতীয় দিন প্রাতঃরাশের সময়কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের প্রাতঃরাশ আন অর্থাৎ যা দিনের প্রথমভাগে ভক্ষণ করা হয়। আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। نَصَبٌ শব্দের অর্থ হলো تَعَبٌ এবং এই ক্লান্তি প্রতিশ্রুত স্থান থেকে সম্মুখে চলে যাওয়ার পর অনুভূত হলো।

অনুবাদ :

٦٣. قَالَ اَرَاَيْتَ اَىْ تَنَبَّهْ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ بِذٰلِكَ الْمَكَانِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ يَبْدُلُ مِنَ الْهَاءِ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج بَدَلُ اِشْتِمَالٍ اَىْ اَنْسَانِىْ ذِكْرَهٗ وَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ـ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَىْ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ مُوْسٰى وَفَتَاهُ لَمَّا تَقَدَّمَ فِىْ بَيَانِهٖ ـ

৬৩. সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম সেইস্থানে তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। اَنْ اَذْكُرَهٗ এটা اَنْسَانِيْهُ-এর যমীর থেকে بَدْل اِشْتِمَالْ অর্থাৎ আমাকে তার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মৎস্য আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। عَجَبًا শব্দটি اِتَّخَذَ-এর দ্বিতীয় মাফঊল। এ ঘটনার কারণে হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর খাদেম আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٦٤. قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ اَىْ فَقْدُنَا الْحُوْتَ مَا الَّذِىْ كُنَّا نَبْغِ ق نَطْلُبُهٗ فَاِنَّهٗ عَلَامَةٌ لَنَا عَلٰى وُجُوْدِ مَنْ نَطْلُبُهٗ فَارْتَدَّا رَجَعَا عَلٰى اٰثَارِهِمَا يَقُصَّانِهَا قَصَصًا فَاَتَيَا الصَّخْرَةَ ـ

৬৪. বললেন, হযরত মূসা (আ.) সে স্থানটিই তো মৎস্য হারিয়ে যাওয়ার স্থানটি আমরা অনুসন্ধান করছিলাম খোঁজ করছিলাম। কেননা সেটিই তো আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের অস্তিত্বের নিদর্শন। অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। এবং সেই শিলাখণ্ডের নিকট পৌঁছলেন।

٦٥. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا هُوَ الْخَضِرُ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا نُبُوَّةً فِىْ قَوْلٍ وَ وِلَايَةً فِىْ اٰخَرَ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ قِبَلِنَا عِلْمًا ـ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَىْ مَعْلُوْمًا مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ رَوَى الْبُخَارِىُّ حَدِيْثَ اَنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ ـ

৬৫. অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের তিনি হলেন হযরত খিজির (আ.) যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম। এক অভিমতে নবুয়ত এবং অন্য অভিমতে وِلَايَتْ এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। আর আমার নিকট হতে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। عِلْمًا এটা عَلَّمْنَاهُ থেকে দ্বিতীয় মাফঊল অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াবলি জানার জ্ঞান দিয়েছিলাম। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, সবচেয়ে জ্ঞানী কে?

فَقَالَ اَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّ لِىْ عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِىْ بِهٖ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهٗ فِىْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَّ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَاَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهٗ فِىْ مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهٗ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ حَتّٰى اَتَيَا الصَّخْرَةَ فَوَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِى الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِىَ صَاحِبُهٗ اَنْ يُّخْبِرَهٗ بِالْحُوْتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا حَتّٰى اِذَا كَانَا مِنَ الْغَدَاةِ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا اِلٰى قَوْلِهٖ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا ـ

অনুবাদ : তিনি জবাবে বললেন, আমি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই জবাব দেওয়ার কারণে তিরস্কার করলেন। যেহেতু তিনি এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করেননি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার অমুক বান্দা তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি করে তার সাক্ষাৎ পেতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার সাথে একটি মৎস্য নাও এবং সেটাকে থলেতে রাখ। যেখানেই মৎস্যটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি তাঁকে পাবে। অতঃপর তিনি থলেতে একটি ভাজা মাছ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী হলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। তাঁরা উভয়ে শিলাখণ্ডের নিকট এসে তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মৎস্যটি থলের ভেতর লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করে দিল এবং থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। আর তা সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। আল্লাহ তা'আলা মৎস্যের পথ থেকে পানির সঞ্চালন বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা একটি সিড়ির মতো হয়ে গেল। যখন হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হলেন তার সাথী তাকে মৎস্যের বিষয়টি বলতে ভুলে গেলেন। দিনের অবশিষ্টাংশ ও সারারাত চলার পর যখন প্রাতঃরাশের সময় হলো তখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সঙ্গীকে বললেন, আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো! وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا পর্যন্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন– كَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا অর্থাৎ মৎস্যের পানিতে এভাবে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যের জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। আর হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সাথীর জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَتًى : একবচন; বহুবচনে فِتْيَةٌ অর্থ– নওজোয়ান, সেবক, খাদেম, গোলাম, দাস, যুবক। মুফাসসিরগণ এখানে فَتًى দ্বারা সাধারণত খাদেম উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

قَوْلُهٗ لَا اَبْرَحُ : এটা فِعْل نَاقِصْ যা لَا اَزَالُ অর্থে হয়েছে। এর اِسْم হলো اَنَا যা তার মধ্যে আবশ্যকরূপে উহ্য রয়েছে। আর তার খবর حَتّٰى ابلغ -এর قَرِيْنَةٌ -এর কারণে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَسِيْرُ যদি এই فِعْل টি تَامْ মেনে নেওয়া হয় তবে তার খবরের প্রয়োজন নেই।

মুসান্নিফ (র.) হযরত মূসা (আ.)-এর নামের তাফসীরে ইবনে ইমরান উল্লেখ করে সে সকল লোকদের বক্তব্যকে রহিত করেছেন যারা এখানে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)-কে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ এ আয়াতে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে ইমরান (আ.) উদ্দেশ্য, যিনি একজন জলীলুল কদর পয়গাম্বর ছিলেন।

قَوْلُهُ لَا اَبْرَحُ : এর তাফসীর لَا اَزَالُ اَسِيْرُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَبْرَحُ হলো فِعْل نَاقِص আর তার খবর হলো উহ্য اَسِيْرُ আর উহ্য থাকার উপর قَرِيْنَةٌ হলো حَتّٰى اَبْلُغَ অর্থাৎ لَا اَبْرَحُ سَائِرًا

قَوْلُهُ حُقُبًا : একটি সুদীর্ঘ কালকে حُقُبْ বলা হয়। আবার একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদকালকেও حُقُبْ বলে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ৭০ বছর কেউ ৮০ বছর। কেউ ত্রিশ হাজার বছরও বলেছেন। তবে এখানে রূপকভাবে সুদীর্ঘকাল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ سَرَبْ : এর অর্থ সুড়ঙ্গ, নালা, গর্ত। سَرَبًا এটা اِتَّخَذَ-এর দ্বিতীয় মাফউল। আর سَبِيْلَهٗ হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ نَصَبًا : এটা اِسْم অর্থ হলো ক্লান্তি, অবসাদ, কষ্ট, ব্যথা, যন্ত্রণা, চোট, দুঃখ ইত্যাদি। نَصَبًا শব্দটি لَقِيْنَا-এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ

قَوْلُهُ اَرَاَيْتَ : এর হামযাটি হলো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ تَعَجُّبِيَّةٌ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, এমন ঘটনা আশ্চর্যজনক হওয়ার কারণে বিস্মৃত হওয়ার অযোগ্য ছিল; কিন্তু তাকে ভুলে গেছে। اَرَاَيْتَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَرَاَيْتَ مَا نَابَنِىْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ বাকরীতিতে اَخْبِرْنِىْ-এর অর্থে ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ اَوَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَوِيًّا . اِوَاءً অর্থ- ঠিকানা নেওয়া, অবতরণ করা।

قَوْلُهُ اَنْسَانِيْهُ : এটা বাবে اِفْعَالْ থেকে اِنْسَاءٌ মাসদার। অর্থ- ভুলিয়ে দেওয়া। نُوْنْ হলো نُوْن وِقَايَةْ আর ى হলো وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর যমীর যা প্রথম মাফউল। ه হলো وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর যমীর এবং দ্বিতীয় মাফউল। ه-এর মূল হলো সর্বদা পেশযুক্ত হওয়া। কিন্তু যদি এর পূর্বে يَاءْ سَاكِنْ অথবা যের হয় তখন ه-কে যের দেওয়া হয়। যেমন- بِهٖ . فِيْهِ . عَلَيْهِ কিন্তু দুই স্থানে ইমাম হাফস (র.) মূলের মতোই তথা পূর্বে يَاءِ سَاكِنْ থাকা সত্ত্বেও ه-কে পেশ দিয়ে পড়েছেন। একটি اَنْسَانِيْهُ-এর মধ্যে। আর দ্বিতীয়টি হলো সূরা ফাতাহ-এর ১০নং আয়াতে عَلَيْهُ اللّٰهَ যাকে মোল্লা আলী কারী (র.) شَاطِبِيَّه-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩২০ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ اَذْكُرَهٗ : এখানে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ আর اَذْكُرَ শব্দটি بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে اَنْسَانِيْهُ-এর দ্বিতীয় মাফউল হতে بَدْل اِشْتِمَالْ হয়েছে। অর্থাৎ مَا اَنْسَانِىْ ذِكْرَهٗ اِلَّا الشَّيْطَانُ ; ذِكْر অর্থ অন্তরে স্মরণ করা। আর কারো সম্মুখে স্মরণ করার জন্য ذِكْر لَهٗ ব্যবহার হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ عَجَبًا : এটা اِتَّخَذَ-এর ভিত্তিতে مَنْصُوْب হবে। অর্থাৎ كَائِنًا فِى الْبَحْرِ এবং اِتَّخَذَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ ও পারে نَبْغِ মূলত نَبْغِىْ ছিল। পবিত্র কুরআনের রুসমে খতে এখানে يَاءْ-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর সূরা ইউসুফের ৬৫নং আয়াতে বহাল রাখা হয়েছে।

اِسْم-এর মধ্যে يَاءْ কে ফেলে দেওয়া তো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন- قَاضِىْ-এর মধ্যে। তবে ফে'লের মধ্যে এটা شَاذْ ও খেলাপে কিয়াস।

قَوْلُهُ قَصَصًا : এটা বাবে نَصَرَ-এর মাসদার অর্থ- অনুসরণ করা, আনুগত্য করা, অথবা এটা حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ قَاصِّيْنَ قَصَصًا

قَوْلُهُ مِنْ عِنْدِنَا : এটা উহ্য শব্দের مُتَعَلِّقْ হয়ে رَحْمَةً-এর حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ لَّدُنَّا : এটাও উহ্য শব্দের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে عِلْمًا হতে حَالْ হয়েছে। فَاصِلَهْ-এর প্রতি লক্ষ্য করে مُقَدَّمْ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে পরীক্ষা করার জন্য তিনটি প্রশ্ন করেছিল। সেগুলো হলো– ১. রূহ ২. আসহাবে কাহাফ এবং ৩. জুলকারনাইন সম্পর্কে। আর ইহুদিরা তাদের বলে দিয়েছিল যে, যদি তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, তবে তোমরা জানবে যে, তিনি সত্য নবী। পক্ষান্তরে যদি তিনি এর সঠিক জবাব না দেন তবে তিনি নবী নন। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যেন ইহুদিরা জানতে পারে যে, নবীর জন্য সবকিছু জানা জরুরি নয়; বরং নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওহী এবং হেদায়েতের ইলম থাকা একান্ত জরুরি। আর এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ইলম তার নিকট ছিল না, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। আর এ জন্যই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন, যাতে করে তিনি সেই ইলম অর্জন করেন যা বিশেষভাবে হযরত খিজির (আ.)-কে দান করা হয়েছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী হওয়ার জন্যে সব বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের, তাঁর নৈকট্যে ধন্য হওয়ার এবং হেদায়েতের পথ ও পন্থা তথা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। হযরত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ ইলম দান করেছিলেন তা এই প্রকার ছিল না। আর এ বিষয়ে হযরত মূসা (আ.) থেকে হযরত খিজির (আ.)-এর ইলম অধিকতর ছিল; কিন্তু হেদায়েতের ইলম এবং শরিয়তের বিধান সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-এর ইলম তখন সর্বাধিক ছিল।

قَوْلُهُ وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ : এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গাম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মূসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

فَتًى -এর শাব্দিক অর্থ– যুবক। শব্দটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয় , যেসব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামি শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভালো খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتًى শব্দটিকে মূসা (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই এখানে অর্থ হবে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউসা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ (আ.)। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগ্নে ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই। –[কুরতুবী]

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ -এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বুঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে এটি হচ্ছে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান। কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। [অনেকের মতে বাহরে আন্দালুস ও বাহরে মুহীদের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর কাহিনী : সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের এক সভার ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.)-এর জানা মতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বলেন, আমি সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রকৃত আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে তিরস্কার করে ওহী নাজিল হলো যে, দুই

সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। [একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত।] তাই বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থলিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। হযরত মূসা (আ.) নির্দেশমতো থলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলি থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। [মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরো একটি মুজিজা এই প্রকাশ পেল যে] মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউসা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। তখন হযরত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন হযরত ইউশা ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা হযরত মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। বলল, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল। [অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।]

সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং সেই স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। হযরত মূসা (আ.) তদবস্থাই সালাম করলে হযরত খিজির (আ.) বললেন, এই [জনমানবহীন] প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি মূসা! হযরত খিজির (আ.) প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি বনী ইসলাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিজির (আ.)-কে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই হযরত খিজির (আ.) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ.) স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, তাঁরা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এটাতো আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হযরত মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল [ইতিমধ্যে] একটি পাখি এসে নৌকায় এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিজির (আ.) কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানির।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিজির (আ.) এক বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহের কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন

না। হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিজির (আ.) এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোম্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন- هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর হযরত খিজির (আ.) উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন- ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا অর্থাৎ এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ. যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন, হযরত মূসা (আ.) যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের আরো কিছু জানা যেত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) বলতে বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। আর দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত খিজির (আ.)। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬০৪-৬০৬]

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গাম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা : لَا أَبْرَحُ حَتّٰى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

এ বাক্যটি হযরত মূসা (আ.) তার সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিকও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। কারণ সফরের জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حِقْبَةٌ -এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারো কারো মতে আরো বেশি সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গাম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

فَلَمَّا بَلَغَا .... فِي الْبَحْرِ سَرَبًا - হযরত খিজির (আ.)-এর তুলনায় হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মুজেযা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) নবীকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিজির (আ.)-এর নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু তিনি তো রাসূল ছিলেন না। তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই এবং কোনো বিশেষ উম্মতও নেই, তাই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর চেয়ে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্যও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাদের দ্বারা ত্রুটি শুধরিয়ে নেওয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ছিল না। যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিজিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা হযরত মূসা (আ.)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হতো না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাওয়া যাবে।

বুখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলিয়ায় মাছ রেখে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিযা হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও তা দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তাফসীর থেকেও বুঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিযাই ছিল।

হযরত খিজির (আ.)-এর অস্পষ্ট ঠিকানা দেওয়ার বিষয়টিও হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরো পরীক্ষা ছিল এই যে, ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে نَسِيَا حُوْتَهُمَا বলে তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বুখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় হযরত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। শুধু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জাগ্রত হওয়ার পর হযরত মূসা (আ.)-কে জানাবার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুলে ফেলে রাখেন। সুতরাং আয়াতে "উভয়ে ভুলে গেলেন" কথাটা এমন হবে, যেমন অন্য এক আয়াতে يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ বলে মিঠা সমুদ্র ও লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি শুধু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু تَغْلِيْبٌ -এর কায়দা অনুযায়ী এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে সেখান থেকে সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গে নেওয়ার কথা বিস্মৃত ছিলেন। তাই আয়াতে ভুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপারটি সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) আরো একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে তখন তা وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর নবুয়ত প্রসঙ্গ : কুরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا [আমার বান্দাদের একজন] বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিজির উল্লেখ করা হয়েছে। খিজির অর্থ- সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তাফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত। মাটি যেরূপই হোক না কেন। কুরআন পাক একথাও বর্ণনা করেনি যে, হযরত খিজির (আ.) পয়গাম্বর ছিলেন নাকি একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরিয়তবিরোধী। আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত শরিয়তের নির্দেশ কোনোরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গাম্বর ছাঁড়া আল্লাহ তা'আলা ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরিয়তের কোনো নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, হযরত

খিজির (আ.) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরিয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে– وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশে করছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিজির (আ.)-ও একজন নবী। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাফসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত ও আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরিয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরিয়তে হারাম কিন্তু তরিকতে হালাল। কাজেই কোনো ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিজির (আ.)-কে দুনিয়ার কোনো ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং শরিয়তের বিরুদ্ধে তার কোনো কাজকে বৈধ বলা যায় না।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দা কে? : ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির ও ইবনে আবি হাতেম (র.) তাদের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, যে আমাকে স্মরণ রাখে এবং কখনো ভুলে না।

হযরত মূসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম শাসনকর্তা কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না এবং যে হক বা সত্য সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বললেন, যে নিজের ইলমের সঙ্গে অন্যের ইলম একত্র করে বা অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা করে নিজের ইলম বৃদ্ধি করে। [এই উদ্দেশ্যে হয়তো তার নিকট থেকে হেদায়েতের কোনো পথ জানা যায় এবং ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসা যায়।] হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে বড় আলেম যদি থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা ও পথ বাতলিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ কররেন, তোমার চেয়ে বেশি ইলম রয়েছে হযরত খিজির (আ.)-এর। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি খিজিরকে কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, সমুদ্রের তীরে পাথরের নিকট। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি তার চিহ্ন কি করে জানবো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাবে। হযরত মূসা (আ.) তার খাদেমকে বললেন, যেস্থানে মাছটি হারিয়ে যায় সেখানে আমাকে বলবে। এরপর হযরত মূসা (আ.) এবং তার খাদেম ইউশা তাঁরা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৩৫]

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : এই ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, সফরে সাথী বা খাদেম রাখা নবীগণের সুন্নত। হযরত মূসা (আ.) বলেছেন, যে পর্যন্ত আমি দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে না পৌছব সে পর্যন্ত চলতে থাকবো। এর তাৎপর্য হলো, জ্ঞানের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রমের ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (র.) লিখেছেন, এর দ্বারা একথাও জানা যায় যে, শায়খে কামেলের অন্বেষণে চরম সাধনা করা উচিত, যতক্ষণ এর দ্বারা কোনো ওয়াজিব বিনষ্ট না হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা এই ঘটনায় যে পাথরের উল্লেখ রয়েছে, সেই পাথরটির নিচে আবে হায়াতের ঝরণা ছিল, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যদি কোনো মৃত প্রাণীর উপর ঐ পানি পড়তো তবে তা জীবিত হয়ে যেত।

কালবী (র.) বলেছেন, ইউশা ইবনে নূন আবে হায়াত দ্বারা অজু করে ভাজা মাছটির উপর পানির ছিটা দিয়েছিলেন। ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। মাছটি তার লেজ দিয়ে আঘাত করলে পানির ভিতর পথ তৈরি হয়।

হযরত খিজির (আ.) প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত : হযরত খিজির (আ.) সর্বকালের সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি রহস্যের অনেক অসাধারণ জ্ঞান দান করেছিলেন। তার প্রকৃত নাম হলো, বিলিয়া বিন মালকান। অথবা আল ইয়াসা, অথবা ইলিয়াস। খিজির হলো তাঁর উপাধি। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। আল্লামা বগভী হোমাম ইবনে মোনাব্বার সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, খিজিরকে খিজির এজন্যে বলা হয়, তিনি যখন কোনো স্থানে বসতেন, তখন সেই স্থানটি সবুজ হয়ে যেত। চারিপার্শ্বে সবুজের মেলা বসতো। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে স্থানে হযরত খিজির (আ.) নামাজ আদায় করতেন তার চারিপার্শ্বে সবকিছু সবুজ হয়ে যেত। আল্লামা বগভী (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) ইসরাঈলী বংশধর ছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রাজপুত্র, যিনি দুনিয়াত্যাগী হয়েছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে আমার মতে হযরত খিজির (আ.) ইসরাঈলী ছিলেন না। কেননা তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ করা তার কর্তব্য হতো। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪০]

হযরত খিজির (আ.) নবী ছিলেন নাকি শুধু শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের মতভেদ রয়েছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী না হলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান প্রদানে ধন্য করেছেন।

-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃ. ৩৯০]

সুদ্দী (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) কোনো স্থানে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের তলদেশে উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো যা দু'পাকে ঢেকে দিত। ইবনে আসাকের যাহহাক (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত খিজির (আ.) ছিলেন হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। তার মায়ের নাম ছিল রূমিয়া।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, তিনি ছিলেন শাহজাদা, পূর্বকালের কোনো বাদশহার পুত্র। সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ওহাব ইবনে মোনাব্বাহ (র.) বলেছেন, তিনি হলেন মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আবের ইবনে সারেখ ইবনে আরফাখসাজ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)।

আল্লামা আলুসী (র.) ইমাম নববী (র.)-এর অভিমতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে হযরত খিজির (আ.)-এর নাম ছিল বিলিয়া ইবনে মালকান। অধিকাংশ আলেম এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলূসী (র.) আরো বলেছেন, যেভাবে তার নবুয়তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তেমনিভাবে বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন কিনা? এ সম্পর্কেও তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের এক দলের অভিমত হলো তিনি এখন জীবিত নেই। ইমাম বুখারী (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত খিজির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) এখনো কি জীবিত আছেন? তখন তিনি বলেন, কিভাবে? কেননা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে, একশত বৎসর পর তাদের কেউ থাকবে না।' এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ইরশাদ করেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে যারা আছে, একশত বছরের মাথায় তারা কেউ থাকবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, যদি হযরত খিজির (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তাঁর কর্তব্য হতো হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হওয়া, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করা, অথচ বদরের যুদ্ধের দিন হুজুর ﷺ দোয়া করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدْ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ!" যদি এই ছোট দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমার বন্দেগী আর হবে না। আর বদরের রণাঙ্গণে সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিনশত তেরজন এবং তাঁরা ছিলেন সুপরিচিত, সুবিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে হযরত খিজির (আ.)-তো ছিলেন না।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী- খ. ১৫, পৃ. ৩১৯-২০]

কুরআন পাকে যে ব্যক্তিকে عَبْد [বান্দা] বলা হয়েছে বুখারী শরীফ এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তাঁকে خَضِرْ [খিজির] বলা হয়েছে। তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য-ধন্য একজন মকবুল বান্দা।

قَوْلُهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا : আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা হযরত খিজির (আ.)-এর মকবুল বান্দা হওয়া সম্পর্কে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। অবশ্য এই বিশেষ রহমতটি নবুয়ত রূপে হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং হযরত খিজির (আ.)-এর নবী হওয়ার

ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি একজন নবী, তবে রাসূল নন। আবার কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি একজন রাসূল। অনেকে বলেছেন, তিনি একজন ওলী। কুশাইরী এবং অপর একটি সম্প্রদায় এই অভিমত পোষণ করেন। তাফসীরে মোয়ালেমুত তানজীল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অনেক আলেমের মতে তিনি নবী নন।

قَوْلُهُ وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا : অর্থাৎ "আমি তাকে নিজের তরফ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছিলাম।" এই ইলম তাকে চেষ্টার মাধ্যমে উপার্জন করতে হয়নি বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়নি, বরং কোনো বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে এই ইলম সরাসরি দেওয়া হয়েছিল। এই ইলম ছিল বিশ্বসৃষ্টির গোপন রহস্য। মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য বিশ্বজগতের গোপন রহস্য জানা জরুরি নয়; বরং ইলমে শরয়ী ও ইলমে ইলাহী [শরিয়ত ও মারিফত] আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য জরুরি। এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে, হযরত মূসা (আ.) এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী নবী হওয়ার কারণে একথা নিশ্চিত যে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং তাকে কিভাবে তখন অন্য এক ব্যক্তির নিকট জ্ঞান লাভের জন্য পাঠানো সম্ভব হলো। কিন্তু ইমাম রাযী (র.) বলেন যে, এটা অতি সহজেই সম্ভব হয়। কোনো ব্যক্তি যদি অনেক ধরনের ইলমে সমৃদ্ধ হয়েও থাকেন, তবুও তার কাছে কোনো কোনো বিষয় অজানা থাকতে পারে এবং তা শিক্ষা করতে তাঁকে কারো কাছে পাঠানো যেতে পারে।

قَوْلُهُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا : "আমার বান্দাগণের মধ্যে একজন বান্দা।" অর্থাৎ তিনি কামেল বুজুর্গ এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার একজন বান্দা-ই ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দার চেয়ে কণা পরিমাণ অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। আর আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দার মধ্য থেকে তিনি ছিলেন একজন মাত্র বান্দা।

قَوْلُهُ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا : অর্থাৎ আর আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি, যা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে عِلْمًا শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলির ইলম।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى الخ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কামিল শায়খ বা পীরের খুঁজে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা করার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো তাতে যেন কোনো ওয়াজিব ছুটে না যায়।

نَسِيَا حُوْتَهُمَا الخ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরকালে সফরের সম্বল ও পাথেয় ইত্যাদি সাথে রাখা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়।

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا الخ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, অসুস্থতার অবস্থা প্রকাশ করাও তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়।

وَمَا اَنْسَانِيْهُ الخ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তানি প্রভাব ও ওয়াসওয়াসার কারণে ভুলত্রুটি হয়ে যাওয়াটা وِلَايَتْ -এর পরিপন্থি নয়। তবে শয়তানের যে প্রভাব মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে ফেলে তা অবশ্যই নবুয়তের শানের বিপরীত।

وَاٰتَيْنَا مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا এ আয়াত থেকে যে ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান হলো। সেটা হলো ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। আর এই ইলমে লাদুন্নীকে 'ইলমে হাকীকত' এবং 'ইলমে বাতেন'ও বলা হয়। যে ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীতে প্রদান করা হয়েছে তাদের ইলমও ইলমে লাদুন্নীর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। মোটকথা এই আয়াতটি হলো ইলমে লাদুন্নীর উৎস-মূল।

অনুবাদ :

٦٦. قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ـ اَىْ صَوَابًا اَرْشِدُ بِهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِ الشِّيْنِ وَسَأَلَهُ ذٰلِكَ لِاَنَّ الزِّيَادَةَ فِى الْعِلْمِ مَطْلُوْبَةٌ ـ

৬৬. হযরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন– এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? رُشْدًا অর্থ হলো صَوَابًا অর্থাৎ যার মাধ্যমে সঠিক পথ অর্জন করব। অপর এক কেরাতে رُشْدًا শব্দটি رَاء বর্ণে পেশ এবং شِيْن বর্ণে সাকিনসহ পঠিত হয়েছে। ইলমের ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করার উদ্দেশ্যেই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে প্রশ্ন করেছেন।

٦٧. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ

৬৭. তিনি বললেন, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

٦٨. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ـ فِى الْحَدِيْثِ السَّابِقِ عَقَّبَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ يَا مُوْسٰى اِنِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ وَقَوْلُهُ خُبْرًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى لَمْ تُحِطْ اَىْ لَمْ تُخْبَرْ حَقِيْقَتَهُ ـ

৬৮. যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে এ আয়াতের পরে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যে বিষয়ে আপনি অনবহিত। আর আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জ্ঞান দান করেছেন যে বিষয়ে আমি অনবগত। আল্লাহর বাণীতে خُبْرًا শব্দটি মাসদার আর لَمْ تُحِطْ ফে'লটি لَمْ تُخْبَرْ حَقِيْقَتَهُ অর্থে হয়েছে।

٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ اَىْ وَغَيْرَ عَاصٍ لَكَ اَمْرًا ـ تَاْمُرُنِىْ بِهٖ وَقَيَّدَ بِالْمَشِيَّةِ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلٰى ثِقَةٍ مِنْ نَفْسِهٖ فِيْمَا الْتَزَمَ وَهٰذِهٖ عَادَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْاَوْلِيَاءِ اَنْ لَا يَثِقُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

৬৯. হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না। অর্থাৎ যে বিষয়ে আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন আমি তাতে নাফরমানি করব না। হযরত মূসা (আ.) স্বীয় অঙ্গীকারকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে শর্তায়িত করেছেন। কেননা হযরত মূসা (আ.) নিজের উপর আবশ্যককৃত পাবন্দির ব্যাপারে ভরসা ছিল না। আর এটাই নবী ও ওলীগণের চিরাচরিত রীতি যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও নিজের উপর নির্ভরশীল থাকেন না।

٧٠. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيْدِ النُّوْنِ عَنْ شَىْءٍ تُنْكِرُهُ مِنِّىْ فِىْ عِلْمِكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ـ أَىْ اَذْكُرُهُ لَكَ بِعِلَّتِهٖ فَقَبِلَ مُوْسٰى شَرْطَهُ رِعَايَةً لِأَدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ ـ

অনুবাদ :

৭০. হযরত খিজির (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যাকে আপনার জ্ঞানে গর্হিত মনে হয়, এবং ধৈর্যধারণ করবেন। আর تَسْئَلْنِىْ শব্দটি এক কেরাতে লাম বর্ণটি যবরযুক্ত এবং نُوْن বর্ণটি তাশদীদ বিশিষ্ট যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অর্থাৎ আমি আপনাকে এর কারণ বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমাকে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। হযরত মূসা (আ.) ছাত্র-শিক্ষকের শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার শর্ত মেনে নিলেন।

٧١. فَانْطَلَقَا نِد يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ حَتّٰى إِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ الَّتِىْ مَرَّتْ بِهِمَا خَرَقَهَا ط الْخَضِرُ بِاَنْ اِقْتَلَعَ لَوْحًا اَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ الْبَحْرِ بِفَاسٍ لَمَّا بَلَغَتِ اللُّجَّ قَالَ لَهُ مُوْسٰى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ رَفْعِ اَهْلِهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ـ اَىْ عَظِيْمًا مُنْكَرًا - رُوِىَ اَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَدْخُلْهَا ـ

৭১. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন সমুদ্রের পাড় ঘেষে চলতে লাগলেন পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলেন যে নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল তিনি তখন তা বিদীর্ণ করে দিলেন অর্থাৎ নৌকাটি নদীর মধ্যস্থলে পৌঁছার পর হযরত খিজির (আ.) কুঠারের সাহায্যে একটি বা দুটি কাঠ উপড়ে ফেললেন। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? এক কেরাতে لِتُغْرِقَ-এর تَاء-এর স্থলে যবরবিশিষ্ট يَاء এবং رَاء বর্ণে যবর ও اَهْلُهَا রফা অবস্থায় পঠিত রয়েছে। আপনি কত গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে ফেললেন। বর্ণিত আছে যে, নৌকায় কাঠ খুলে ফেলার পরও তাতে পানি প্রবেশ করেনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ : এটা اَتَّبِعُكَ-এর كَاف থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِكَ مُعَلِّمًا لِىْ

قَوْلُهُ رُشْدًا : এটা تُعَلِّمَنِ-এর দ্বিতীয় মাফঊল হয়েছে। অর্থাৎ تُعَلِّمَنِ عِلْمًا ذَا رُشْدٍ

قَوْلُهُ اَنْ تُعَلِّمَنِ : এর মধ্যে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّة এবং শেষের نُوْن টি হলো نُوْن وِقَايَة আর يَائے مُتَكَلِّمْ এখানে উহ্য রয়েছে। আর نُوْن-এর যের উহ্য يَاء-কে বুঝাচ্ছে।

رُشْدًا শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে, অর্থ হলো– হেদায়েত পাওয়া।

قَوْلُهُ لَمْ تُحِطْ : اَحَاطَ بِهٖ অর্থ– বেষ্টন করে ফেলা, ঘিরে ফেলা।

أَحَاطَ بِهِ عِلْمًا অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ রূপে অবগত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে জানা।

قَوْلُهُ خُبْرًا : এটি হয়তো فَاعِل থেকে স্থানান্তরিত হয়ে نِسْبَتْ থেকে تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। অথবা এটা مَفْعُوْل مُطْلَقْ তাকিদের জন্য । কেননা لَمْ تُحِطْ অর্থ হলো لَمْ تُخْبِرْ আর خَبْرٌ অর্থ عِلْم অর্থাৎ বাক্যের অর্থ হবে لَمْ تَعْلَمْ بِهِ عِلْمًا

قَوْلُهُ لَا اَعْصِىْ لَكَ : এর আতফ হয়েছে صَابِرًا-এর উপর আর لَا অর্থ হলো غَيْرَ

قَوْلُهُ وَغَيْرَ عَاصٍ : এই বাক্য দ্বারা মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَا টা غَيْرَ -এর অর্থে হয়েছে। আর এটা صَابِرًا-এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَأْمُرُنِىْ : تَأْمُرُنِىْ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَمْرًا টি تَأْمُرُ উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاسٌ : অর্থ হলো, কুঠার, কুড়াল, বহুবচনে فُؤُوْسٌ

قَوْلُهُ اِصْبِرْ : اِصْبِرْ উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ এটা উহ্য مُغَيًّا -এর অংশ। আর اِصْبِرْ হলো مُغَيًّا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا : হযরত মুসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে বললেন, আপনার থেকে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে এবং ইবনে আসাকের (র.) হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-কে তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বললেন, তখন হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইলমের জন্য তাওরাত যথেষ্ট, আর আমলের জন্য বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের প্রচেষ্টা যথেষ্ট। আর বাড়তি ইলম ও আমলের কোনো প্রয়োজন নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন আপনার সঙ্গে থেকে আমার ইলম বৃদ্ধি করি। হযরত মূসা (আ.) তাঁর এই কথায় অত্যন্ত আদব ও বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট দরখাস্ত করেছেন যে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তার কিছু অংশ আমাকে দান করুন!

ইলম হাসিল করার আদব : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করেন তখন তিনি অত্যন্ত আদব এবং ভদ্রতার পরিচয় দেন। যেমন–

১. তিনি হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট বিনয় প্রকাশ করে এভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেন– هَلْ اَتَّبِعُكَ অর্থাৎ আমি আপনার অনুসরণ করবো কি?
২. তিনি তাঁকে অনুসরণ করার জন্য এমন এক ভঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন যার ভাষাটি হলো "আমার নিজেকে আপনার অনুগত করে দিতে আমাকে অনুমতি দিন", এটা ছিল চরম বিনয়ের দৃষ্টান্ত।
৩. তিনি আরজ করেছিলেন, আমাকে আপনি শিক্ষা দান করবেন। একথা দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞ এবং হযরত খিজির (আ.)-কে বিজ্ঞ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।
৪. তিনি তার কাছে এভাবে আরজ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্যে থেকে কিছু আমাকে দান করুন। مِنْ শব্দটি ব্যবহার করে কিছু জ্ঞান প্রার্থনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু বা কিঞ্চিৎ জ্ঞান তিনি প্রার্থনা করেছেন। কথা বলার এই ভঙ্গিটিও

বিনয়ের এক অনন্য উদাহরণ, যেন তিনি বলছেন, আমি আপনার কাছে সেই পরিমাণ চাই না যে জ্ঞানের দ্বারা আমাকে আপনার সমান বানিয়ে দিবেন; বরং আপনার অগাধ ইলমের কিছু অংশ দান করবেন, যেরূপ একজন বিত্তবানের কাছে তার বিশাল সম্পদ থেকে একজন ভিক্ষুক সামান্য কিছু প্রার্থনা করে থাকে।

৫. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন– مِمَّا عُلِّمْتَ অর্থাৎ আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ কথার দ্বারা তিনি স্বীকার করেছেন যে হযরত খিজির (আ.) যত ইলমের অধিকারী হয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেন।

৬. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন– رُشْدًا অর্থাৎ হেদায়েত। তিনি হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে হযরত খিজির (আ.)-এর কাছ থেকে ইলম হাসিল করতে চেয়েছেন। আর হেদায়েত এমন এক বস্তু যদি তা হাসিল না হয় তবে তার স্থলে হাসিল হয় গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

৭. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন– تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এ কথার মধ্যেও হযরত মূসা (আ.)-এর বিনয় প্রকাশ পেয়েছে এই মর্মে যে, আপনি আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিবেন তা হবে আপনার তরফ থেকে আমার প্রতি সেইরূপ একটি দান যেরূপ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিয়ামত স্বরূপ দান করেছেন। এখানে যেন এ কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে, আমি তার অনুগত যার কাছ থেকে আমি একটি মাত্র হরফ শিখেছি। –[তাফসীরে কবীর, খ. ২১, পৃ. ১০১]

قَوْلُهُ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا : হযরত খিজির (আ.) হলেন, নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্যজ্ঞানী। আর হযরত মূসা (আ.) হলেন শরিয়তের আইন কানুনের ধারক বাহক এবং প্রচারক। একজনের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হলো অভ্যন্তরীণ রহস্য বা হিকমত। আর আরেকজনের যাবতীয় পদক্ষেপ হলো শরিয়তের বিধান মোতাবেক। তাই হযরত মূসা (আ.) প্রকাশ্য শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজকে সহ্য করবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا

অর্থাৎ আর যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ ইলম নেই, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সবর করবেন?

আলোচ্য আয়াতের خُبْرًا শব্দটির অর্থ ইলম, খবর। হযরত খিজির (আ.) জানতেন এমন এমন ঘটনা ঘটবে যা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হবে। আর নবীগণ নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন না, যে পর্যন্ত না সেই নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনো বৈধতা তাদের নিকট প্রকাশিত হয়। হযরত মুসা (আ.) মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর হযরত খিজির (আ.)-এর কাজ হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত মোতাবেক ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ছিল। তাই উভয়ের সহযাত্রা বা সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে হযরত খিজির (আ.) মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এজন্য সুফী সাধকগণ বলেন, যদি মুরীদ একথা পূর্ণ বিশ্বাস করে যে পীর কামেল এবং তিনি আরেফ, কামেল, তবে তাঁর কোনো কাজে প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি পীরে কামেলের সাথে মুরীদের মত-বিরোধ হয়ে যায় এবং মুরীদ পীরের কর্মের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন না করে থাকতে না পারে, তবে পীরের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত, কাছে থেকে প্রশ্ন করার চেয়ে দূরে থাকা অনেক ভালো। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪২-২৪৩]

হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান ও হযরত খিজির (আ.)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান : এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত খিজির (আ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহপ্রদত্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তার বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিনম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরিয়ত নাজিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে যত নবী রাসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবার উপরই শরিয়তের আইন প্রয়োগ ও

সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোনো কেনো পয়গাম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিজির (আ.) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরিয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরিয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গাম্বরের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়, যার জিম্মায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের আওতাবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরিয়তের আইন বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।
–[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬১১]

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَا حَتّٰى الخ : হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে কোনো প্রকার প্রশ্ন না করার অঙ্গীকারের পর তাঁদের উভয়ের যাত্রা শুরু হলো। তাদের নৌকায় আরোহণের প্রয়োজন হলো এবং একটি নৌকা পেয়েও গেলেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি নৌকা তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নৌকার মালিক হযরত খিজির (আ.)-কে চিনতে পেরেছিলো, তাই সে তাদেরকে বিনা পয়সায় আরোহণ করালো।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا الخ : নৌকাটি তীরের কাছাকাছি হওয়ার পূর্বেই হযরত খিজির (আ.) নৌকার একখানি তক্তা খুলে তাতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এ কাজ পছন্দ করলেন না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্যই কি আপনি তাদের ফাটল ধরিয়ে দিলেন। তারাতো আমাদেরকে বিনা পয়সায় আরোহণ করিয়েছে, এখন পানি প্রবেশ করবে এবং সকলেই নিমজ্জিত হবে। নিশ্চয় আপনি একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) হয়তো লক্ষ্য করেননি, কিন্তু নৌকার আরোহীরা যেন নিমজ্জিত না হয় এবং আপাতত নৌকাটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তক্তাটি পরে যেন জুড়ে দেওয়া যায় সেদিকে হযরত খিজির (আ.) লক্ষ্য রেখেছেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত খিজির (আ.) যে তক্তায় ছিদ্র করেছেন ঐ ছিদ্রের উপর তিনি একটি পাত্র স্থাপন করেছেন। ফলে নৌকায় পানি প্রবেশ করতে পারেনি। বিখ্যাত তাফসীরকার জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, নৌকাটিতে পানি প্রবেশ না করা ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৪৬]

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

قَوْلُهُ هَلْ اَتَّبِعُكَ : এখানে হযরত মূসা (আ.) -এর পক্ষ হতে যে বিনয় নম্রতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয়েছে, তা سُلُوْك এবং تَعْلِيْم -এর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

قَوْلُهُ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ الخ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শায়খের জন্য মুরিদের প্রতি কিছু যথাযথ শর্তারোপ করার অধিকার রয়েছে।

قَوْلُهُ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا الخ : এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত আকাবিরগণ থেকে অনেক সময় এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যার দৃশ্যত শরিয়তের খেলাফ হলেও বাস্তবে তা শরিয়তের খেলাফ নয়।

দ্বিতীয়ত কতিপয় আল্লাহওয়ালা যাদেরকে قُطْبُ التَّكْوِيْنِ এবং صَاحِبِ خِدْمَتْ বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তারা কিছু تَكْوِيْنِىْ تَصَرُّفَاتْ -ও করে থাকেন।

অনুবাদ :

٧٢. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ

৭২. তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।

٧٣. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ اَىْ غَفَلْتُ عَنِ التَّسْلِيْمِ لَكَ وَتَرْكِ الْاِنْكَارِ عَلَيْكَ وَلَا تُرْهِقْنِىْ تُكَلِّفْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ـ مَشَقَّةً فِىْ صُحْبَتِىْ اِيَّاكَ اَىْ عَامِلْنِىْ فِيْهَا بِالْعَفْوِ وَالْيُسْرِ ـ

৭৩. হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না। অর্থাৎ আমার থেকে আপনার আনুগত্যে ও আপনার কর্মে প্রশ্ন করা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনার সান্নিধ্য গ্রহণে কঠোরতার আশ্রয় নিবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে বিনয় ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন!

٧٤. فَانْطَلَقَا بَعْدَ خُرُوْجِهِمَا مِنَ السَّفِيْنَةِ يَمْشِيَانِ حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ اَحْسَنُهُمْ وَجْهًا فَقَتَلَهُ الْخَضِرُ بِاَنْ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيْنِ مُضْطَجِعًا اَوِ اقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهٖ اَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْجِدَارِ اَقْوَالٌ وَاَتٰى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِاَنَّ الْقَتْلَ عَقْبُ اللِّقَاءِ وَجَوَابُ اِذَا قَالَ لَهُ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً اَىْ طَاهِرَةً لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ التَّكْلِيْفِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ زَكِيَّةً بِتَشْدِيْدِ الْيَاءِ بِلَا اَلِفٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَىْ لَمْ تَقْتُلْ نَفْسًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا بِسُكُوْنِ الْكَافِ وَضَمِّهَا اَىْ مُنْكَرًا ـ

৭৪. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন নৌকা থেকে নেমে তারা উভয়ে হাঁটতে লাগলেন। চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলো সে বালকটি এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, সে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলায় মত্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদর্শন ছিল। আর হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করলেন এভাবে যে, তাকে শুইয়ে ছুরি দ্বারা জবাই করে ফেললেন, অথবা হাতে ধরে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন, অথবা তার মস্তককে দেওয়ালের সাথে সজোরে আঘাত করে মেরে ফেললেন, এই তিনটি উক্তিই বর্ণিত রয়েছে। فَقَتَلَهُ -এর মধ্যে فَا تَعْقِيْبِيَّه عَاطِفَه -কে এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, যাতে এটা বুঝা যায় যে, সাক্ষাতের পরেই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। এবং এটি اذا -এর জবাব। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অর্থাৎ এমন এক নিষ্পাপ শিশু যে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। এক কেরাতে زَاكِيَةً শব্দের ى বর্ণে তাশদীদ ও আলিফবিহীন তথা زَكِيَّةً পঠিত হয়েছে। হত্যার অপরাধ ছাড়াই অর্থাৎ সে কাউকে হত্যাও করেনি। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। نُكْر শব্দটি ك বর্ণটি সুকুন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। অর্থাৎ গর্হিত কাজ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَنْ تَسْتَطِيْعَ : لَنْ تَسْتَطِيْعَ শব্দটি اِسْتِطَاعَةٌ মাসদার থেকে نَفِيْ تَاكِيْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِل -এর مَعْرُوْف -এর وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ, অর্থ হলো– তুমি কখনো করতে পারবে না, সক্ষম হবে না।

قَوْلُهُ بِمَا نَسِيْتُ : এখানে مَا হলো مَوْصُوْلَه । জার ও মাজরূর মিলে لَا تُوَاخِذْنِيْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। عَائِدْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَا تَأْخُذْنِيْ بِاَمْرِ الَّذِيْ نَسِيْتُهُ কেউ কেউ বলেছেন– نَسِيْتُ হলো تَرَكْتُ -এর অর্থে যা نَسِيْتُ -এর لَازِمِيْ অর্থ। আবার এটাও হতে পারে যে, مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ لَا تَأْخُذْنِيْ بِنِسْيَانِيْ আর نَسِيْتُ -এর তাফসীর غفلت দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে نَسِيْتُ -এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং لَازِمِيْ অর্থ উদ্দেশ্য। আর তা হলো غَفْلَتْ -এবং تَرْك ; কেননা نِسْيَانْ -এর জন্য تَرْك আবশ্যক।

قَوْلُهُ لَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ يُسْرًا : عُسْرًا টি لَا تُرْهِقْنِيْ -এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর تُرْهِقْنِيْ -এর মধ্যে ى হলো প্রথম মাফঊল। বলা হয়– اَرْهَقَهُ عُسْرًا অর্থাৎ সে তাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে বা তার সাথে সংকীর্ণতার আচরণ করেছে।

قَوْلُهُ زَاكِيَةً : زَاكِيَة বলা হয় এমন আত্মাকে যা এখনো গুনাহে লিপ্ত হয়নি। আর زَكِيَّة বলা হয় এমন আত্মাকে যা গুনাহের পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লামা কিসায়ী (র.) বলেন– زَاكِيَة ও زَكِيَّة উভয়টিরই একই অর্থ।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ نَفْسٍ : এখানে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে–

১. بِغَيْرِ نَفْسٍ এটা قَتَلْتَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে।

২. উহ্য শব্দের সাথে مُتَعَلِّقْ হবে এবং فَاعِلْ অথবা مَفْعُوْل থেকে حَالْ হবে অর্থাৎ قَتَلْتَهُ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

৩. উহ্য মাসদারের সিফত হবে। অর্থাৎ قَتَلْتَ قَتْلًا مُتَلَبِّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

قَوْلُهُ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ : এ ইবারতে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَقْتَ الْحِنْثِ আর غُلَامْ -এর তাফসীর لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থ নির্দিষ্ট করা। কেননা غُلَامْ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا : হযরত মূসা (আ.)-এর মন্তব্যের জবাবে হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। এভাবে হযরত খিজির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর শর্তের কথা মনে করিয়ে দিলেন। এদিকে হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করা হলেও আরোহীদের কোনো ক্ষতি হয়নি, পানি ভেতরে প্রবেশ করেনি।

قَوْلُهُ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলক্রমে কথাটি বলে ফেলেছি। অতএব, দয়া করে আমার ভুল ধরবেন না।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল দোষ স্বীকারে, আর তৃতীয় জিজ্ঞাসা ছিল ইচ্ছা করে বিদায় গ্রহণে।

قَوْلُهُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا : হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে বললেন, আমার কাজকে কঠিন করবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। ভুলবশত আমি প্রশ্ন করেছি, এর জন্য এমন কঠোর ব্যবহার করবেন না যে আপনার সঙ্গে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهُ : নৌকা থেকে অবতরণ করে তারা পুনরায় চলতে থাকেন। অবশেষে তারা একটি বালককে দেখতে পান, হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, একটি বালক অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তাদের মধ্যে সবেচেয় সুদর্শন বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বালকটি নাবালক ছিল। পবিত্র কুরআনের غُلٰمًا শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা সাবালক হওয়ার পর غُلٰمًا শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন, যে হযরত মূসা (আ.) বলেছেন– اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً

অর্থাৎ আপনি কি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন। নিহত ছেলেটি নাবালক ছিল বলেই হযরত মূসা (আ.) তাকে নিষ্পাপ বলেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ছেলেটি সাবালক ছিল। আর কালবী (র.) বলেছেন , সে নওজোয়ান ছিল। সে পথিক মুসাফিরের সম্পদ লুণ্ঠন করতো এবং তার পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতো। যাহহাক (র.) বলেছেন, নাবালক ছিল, কিন্তু খারাপ কাজ করতো, এজন্য তার পিতা মাতা ব্যথিত হতো।

ইমাম মুসলিম হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করেছেন সে জন্মগত কাফের ছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তার পিতাকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে লিপ্ত করতো। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে দেখেই হত্যা করেছেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এ হত্যাকাণ্ডের হিকমত বুঝতে না পেরে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন–

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا .

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন আপনি কি একটি নিষ্পাপ শিশুকে কোনো অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলেন! নিশ্চয় আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি অকারণে তথা কোনো অপরাধ ব্যতীত তাকে যে হত্যা করলেন, তা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায়। বিশেষত যখন সে এমন কোনো অন্যায় করেনি যার শাস্তি হতে পারে মৃত্যু। সে হত্যাকারীও নয় এবং মুরতাদও নয়। অতএব, এমন একটি বালককে হত্যা করার চেয়ে আর অন্যায় কি হতে পারে?

اَلْجُزْءُ السَّادِسُ عَشَرَ : ষষ্ঠদশ পারা

৭৫. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ زَادَ لَكَ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ لِعَدَمِ الْعُذْرِ هُنَا ـ

৭৬. وَلِهٰذَا قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۭ بَعْدَهَا اَىْ بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبْنِىْ ج لَا تَتْرُكْنِىْ اَتَّبِعُكَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ مِنْ قِبَلِىْ عُذْرًا ـ فِىْ مُفَارَقَتِكَ لِىْ ـ

৭৭. فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةٍ هِىَ اِنْطَاكِيَّةُ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا طَلَبَا مِنْهُمُ الطَّعَامَ ضِيَافَةً فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا اِرْتِفَاعُهٗ مِائَةُ ذِرَاعٍ يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ اَىْ يَقْرُبُ اَنْ يَّسْقُطَ لِمَيْلَانِهٖ فَاَقَامَهٗ ط اَلْخَضِرُ بِيَدِهٖ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ جُعْلًا حَيْثُ لَمْ يُضَيِّفُوْنَا مَعَ حَاجَتِنَا اِلَى الطَّعَامِ ـ

৭৮. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ هٰذَا فِرَاقُ اَىْ وَقْتُ فِرَاقِ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ فِيْهِ اِضَافَةُ بَيْنَ اِلٰى غَيْرِ مُتَعَدِّدٍ سَوَّغَهَا تَكْرِيْرُهٗ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ سَاُنَبِّئُكَ قَبْلَ فِرَاقِىْ لَكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ـ

অনুবাদ :

৭৫. তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। এখানে لَّكَ বৃদ্ধি করেছেন পূর্বের বিপরীতে। কেননা তথায় হযরত মূসা (আ.) ভুল ত্রুটির উজর পেশ করেননি।

৭৬. এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) বললেন এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি এই বারের পর তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না অর্থাৎ আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিবেন না। আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে لَّدُنِّىْ -এর نُوْن টি তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। مِنْ لَّدُنِّىْ অর্থ مِنْ قِبَلِىْ অর্থাৎ আপনি আমাকে আপনার থেকে পৃথক করার ব্যাপারটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

৭৭. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা এক জনপদের এন্তাকিয়া অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ মেহমানদারীর ভিত্তিতে খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা তাদের পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ার কারণে ভেঙ্গে পড়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যার উচ্চতা ছিল একশত হাত। তখন হযরত খিজির (আ.) স্বীয় হাত দ্বারা ঐ দেয়ালটিকে সুদৃঢ় করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। অন্য এক কেরাতে لَتَخِذْتَ রয়েছে। কেননা আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের মেহমানদারী করেনি।

৭৮. বললেন হযরত খিজির (আ.) এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদের সময় বা কারণ। এখানে بَيْنَ -এর ইজাফত غَيْرِ مُتَعَدِّدْ -এর প্রতি হয়েছে। যার ফলে وَاو عَاطِفَة -এর মাধ্যমে بَيْنَ -কে تَكْرَارْ আনা হয়েছে। আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতেছি। আপনার থেকে বিচ্ছেদের পূর্বেই তার তাৎপর্য যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا فِرَاقُ : বিনিময় ছেড়ে দেওয়ার উপর প্রশ্ন করাই ছিল বিচ্ছেদের কারণ তথা বিচ্ছেদের সময়। অর্থাৎ সে সময়ই হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ : এখানে بَيْنَ -এর ইজাফত مُتَعَدِّدْ -এর দিকে হয়েছে। অথচ بَيْنَ -এর ইজাফত مُتَعَدِّدْ -এর প্রতি হওয়া আবশ্যক। যেমন- بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -এর মধ্যে مُتَعَدِّدْ -এর দিকে ইজাফত হয়েছে।

قَوْلُهُ يُرِيْدُ : মুফাসসির (র.) يُرِيْدُ -এর তাফসীরে يَقْرُبُ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, جِدَارٌ -এর দিকে يُرِيْدُ -এর নিসবত اسناد مجازى হিসেবে হয়েছে। কেননা جِدَارٌ শব্দটি اِرَادَةْ বিশিষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ تَسْتَطِعْ : تَسْتَطِعْ মূলত تَسْتَطِيْعُ ছিল শুরুতে لَمْ আসার কারণে শেষের ع টি সাকিন হয়ে গেছে। এখন يَاء এবং عَيْن -এর মধ্যে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে يَاء পড়ে গেছে ফলে تَسْتَطِعْ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا : হযরত মূসা (আ.) যখন দেখলেন হযরত খিজির (আ.) একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছেন, তখন তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তাই তিনি অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে পড়লেন। অবস্থাদৃষ্টে তিনি হযরত খিজির (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন- لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। তখন হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-এর বক্তব্যের জবাবে বলেন- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

অর্থাৎ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না। অবশেষে তাই হলো যা ইতিপূর্বে আমি বলেছি। যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে তাই হযরত খিজির (আ.) এবার বিশেষভাবে তাগিদ করে বলেছেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমি যা বলেছিলাম আপনি মনে হয় তা ভুলে গেছেন।

হযরত মূসা (আ.) ধারণা করলেন যে, এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলির উপর সবর করা অত্যন্ত কঠিন। তাই হযরত মূসা (আ.) শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে যদি এরপর আপনার নিকট আর কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনি ওজর আপত্তি গ্রহণের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন আর আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তিনবার আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। যাহোক যেহেতু হযরত মূসা (আ.) বার বার হযরত খিজির (আ.)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তাই তিনি লজ্জিত হলেন এবং বললেন, যদি এরপরও আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আর আপনার সঙ্গে থাকার কোনো অধিকার আমার থাকবে না। আর আপনি যদি আমাকে সরিয়ে দেন তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। শুধু জটিলই নয়, বরং দুর্বোধ্য রহস্যময়, এমন অন্যায় কাজ যা দেখে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়, আর কথা বললে কৃত অঙ্গীকারের বিরোধিতা হয়। তাই হযরত মূসা (আ.) সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, এরপরও যদি আমি এমন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। একে একে তিনবার আমাকে সতর্ক করেছেন। এমন অবস্থায় যদি আপনি আমাকে সঙ্গে না রাখেন তবে আপনার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা যাবে না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) আমাদের প্রতি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত হোক, তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তবে আরো বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন, কিন্তু তিনি তার সাথীর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেছেন।

ইবনে মরদবীয়া এই হাদীসকে এভাবে সংকলন করেছেন, "আমার ভাই মূসার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজিল করুন! তিনি লজ্জিত হয়েছেন বলে একথাটি বলেছেন। যদি তিনি তার সাথীর সাথে অবস্থান করতেন তবে আরো বিস্ময়কর বিষয় দেখতেন।" -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪৯]

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ : তারা উভয়ে চলতে চলতে এক গ্রামের অধিবাসীর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল আনতাকীয়া। ইবনে সীরীন (র.) বলেছেন, স্থানটি

ছিল আইকা। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ঐ বস্তির নাম ছিল বারকা। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, এটি ছিল স্পেনের একটি শহর। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ১৬, পৃ. ১]

قَوْلُهُ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا : তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর নিকট খাবার চান, কিন্তু গ্রামবাসীরা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) গ্রামবাসীকে বলেছিলেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিদের মেহমানদারীর সৌভাগ্য ঐ ভাগ্যহত লোকদের অদৃষ্টে ছিল না, এজন্যে তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ঐ বস্তির অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত কৃপণ। হযরত খিজির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের এলাকায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করেনি, এমনকি যখন তারা নিজেদের তরফ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন, তখনও তারা অস্বীকার করলো।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, অত্যন্ত মন্দ সে বস্তি যার অধিবাসীরা মেহমানদারী করেনি।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, যখন সেই বস্তির পুরুষরা মেহমানদারীতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাঁরা স্ত্রীলোকদেরকে বললেন, একজন স্ত্রী লোক তাদের মেহমানদারী করলেন।

حَتّٰى اِذَا اَتَيَا 'অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন', এই বাক্যটির বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন করা যায় যে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.) শুধু পথ অতিক্রম করার জন্যেই সে গ্রামে উপস্থিত হননি, বরং ইচ্ছা করেই সে গ্রামে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীর এই ব্যবহারে হযরত খিজির (আ.) অসন্তুষ্ট হননি, বরং বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়েছিলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৫০]

তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন- فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ

অর্থাৎ তারা সেখানে একটি পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। প্রাচীরটি প্রায় পড় পড় অবস্থায় ছিল। হযরত খিজির (আ.) সেই প্রাচীরটি ঠিক করে দিলেন। কেননা যে কোনো সময় তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হযরত খিজির (আ.) হাতের ইঙ্গিতে প্রাচীরটি ঠিক করে দিয়েছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) প্রাচীরটি স্পর্শ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরটি সোজা এবং সুদৃঢ় হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) পুরোনো প্রাচীরটিকে ফেলে দিয়ে নতুন প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছেন। যাহোক, এটি ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা।

قَوْلُهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا : অর্থাৎ এ সময় হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি এমন কঠোর অন্তর বিশিষ্ট, অনুদার এবং কৃপণ লোকদের প্রতি ইহসান করলেন! অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন, যা দ্বারা আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো।

قَوْلُهُ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ : এবার হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইতিপূর্বে আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এটি আমাদের বিচ্ছেদের সময়। আপনি এখন আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তাঁদের উভয়ের সহ অবস্থান যে সম্ভব নয়, তা হযরত মূসা (আ.)-ও উপলব্ধি করেন। কেননা তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.)-কে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা জনসাধারণের অনুসরণযোগ্য। কেননা তিনি জাহেরী শরিয়তের বিধান প্রচার করতেন এবং তা কায়েম করতেন। কিন্তু হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট যে জ্ঞান ছিল, তার অনুসরণ করা এমন কি তার রহস্য উপলব্ধি করাও সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হিকমত : হযরত মূসা ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার হিকমত হযরত মূসা (আ.)-কে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল।

যখন হযরত মূসা (আ.) নৌকা ভেঙ্গে ফেলার কারণে আপত্তি উত্থাপন করলেন এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন এবং বাহ্যিক উপকরণকে গুরুত্ব দিলেন। তখন হযরত মূসা (আ.)-কে বলা হলো, হে মূসা যখন তোমাকে সিন্দুকে ভরে নীলনদে নিক্ষেপ করা হলো তখন তোমার রক্ষার বাহ্যিক উপকরণ কোথায় ছিল? যখন হযরত মূসা (আ.) শিশু হত্যার প্রতি আপত্তি পেশ করলেন তখন আওয়াজ আসল সে সময় তোমার আপত্তি কোথায় ছিল যখন তুমি একজন কিবতীকে হত্যা করেছিলে? যখন হযরত মূসা (আ.) বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল ঠিক করে দেওয়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করলেন তখন তাকে বলা হলো যখন তুমি পাথর সরিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কন্যাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়েছ তখন তোমার আপত্তি কোথায় ছিল?

অনুবাদ :

৭৯. اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ عَشْرَةٍ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ بِالسَّفِيْنَةِ مُوَاجِرَةً لَهَا طَلَبًا لِلْكَسْبِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ إِذَا ارَجَعُوْا اَوْ اَمَامَهُمْ الْاٰنَ مَّلِكٌ كَافِرٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ـ نَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُبَيِّنِ لِنَوْعِ الْاَخْذِ ـ

৭৯. নৌকার ব্যাপারটি হলো– এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তি দশজন তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো নৌকার মাধ্যমে তা ভাড়ায় চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। আর তাদের পেছনে ছিল যখন তারা ফিরে যাবে অথবা এখন থেকে তাদের সম্মুখে এক রাজা কাফের যে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিতো غَصْبًا -এর নসব اَنْ مَصْدَرِيَّة -এর ভিত্তিতে হয়েছে যা প্রকার বর্ণনার জন্য হয়েছে।

৮০. وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ـ فَاِنَّهُ كَمَا فِىْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَاَرْهَقَهُمَا ذٰلِكَ اَىْ لِمَحَبَّتِهِمَا لَهُ يَتَّبِعَانِهِ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৮০. আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরিরর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রয়েছে যে, সেই বাচ্চা জন্মগতভাবে কুফরির উপর সৃষ্টি হয়েছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে নিশ্চিতভাবে সে তার পিতামাতার উপর প্রাধান্য লাভ করতো। আর তারা অধিক ভালোবাসার কারণে কুফরিতে তার অনুসরণ করতো।

৮১. فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً اَىْ صَلَاحًا وَتُقًى وَّاَقْرَبَ مِنْهُ رُحْمًا ـ بِسُكُوْنِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا رَحْمَةً وَهِىَ الْبِرُّ بِوَالِدَيْهِ فَاَبْدَلَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى جَارِيَةً تَزَوَّجَتْ نَبِيًّا فَوَلَدَتْ نَبِيًّا فَهَدَى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ اُمَّةً ـ

৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদেরকে তার পরিবর্তে اَنْ يُّبْدِلَهُمَا শব্দটির دَالْ বর্ণে তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। তাদের পালনকর্তা যেন এক সন্তান পবিত্র এবং খোদাভীরু দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। رُحْمًا শব্দটির ح বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত রয়েছে। এর অর্থ হলো দয়া। পিতামাতার আনুগত্য ও অনুসরণ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেলে সন্তানের পরিবর্তে একটি কন্যা সন্তান দান করলেন। যার সাথে এক নবীর বিবাহ হয়েছে এবং তার গর্ভে একজন নবী জন্ম নিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গোটা একটি জাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

৮২. وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ مَالٌ مَدْفُوْنٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَحَفِظَا بِصَلَاحِهِ فِىْ اَنْفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا اَىْ اِيْنَاسُ رُشْدِهِمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ مَفْعُوْلٌ لَهُ عَامِلُهُ اَرَادَ وَمَا فَعَلْتُهُ اَىْ مَا ذُكِرَ مِنْ خَرْقِ السَّفِيْنَةِ وَقَتْلِ الْغُلَامِ وَاِقَامَةِ الْجِدَارِ عَنْ اَمْرِىْ اَىْ اِخْتِيَارِىْ بَلْ بِاَمْرِ اِلْهَامٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ـ يُقَالُ اِسْطَاعَ وَاسْتَطَاعَ بِمَعْنٰى اَطَاقَ فَفِىْ هٰذَا وَمَا قَبْلَهُ جَمْعٌ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ فِىْ فَاَرَدْتُ فَاَرَدْنَا فَاَرَادَ رَبُّكَ ـ

অনুবাদ :

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি। এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে রয়েছে তাদের গুপ্তধন। স্বর্ণ ও রৌপ্য জাতীয় সম্পদ প্রোথিত ছিল। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাঁর সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কারণেই তার জান ও মাল নিরাপদ থাকল। সুতরাং আপনার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হোক। অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাক দয়াপরবশ হয়ে। এবং তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। رَحْمَةً হলো مَفْعُوْل لَهٗ তার আমেল হলো اَرَادَ আর আমি করিনি অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তথা নৌকা ছিদ্র করা, কিশোর হত্যা করা এবং দেয়াল ঠিক করার ব্যাপারে। আমার নিজের পক্ষ হতে অর্থাৎ আমার নিজের ইচ্ছায়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমেই করেছি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা। اِسْطَاعَ এবং اِسْتَطَاعَ উভয়টিই اَطَاقَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে এবং তার পূর্বে উল্লিখিত শব্দে দুই লোগাতে একত্রিকরণ হয়েছে। আর فَاَرَدْتُ ـ فَاَرَدْنَا এবং فَاَرَادَ رَبُّكَ -এর মধ্যে ইবারতে تَنَوُّعٌ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلسَّفِيْنَةُ : سَفِيْنَةٌ এটা একবচন, বহুবচনে سَفِيْنٌ ـ سَفَائِنُ অর্থ– নৌকা, জাহাজ, জলযান।

قَوْلُهُ وَرَائَهُمْ : وَرَاءَ শব্দটি اَضْدَادٌ তথা বিপরীতধর্মী শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ– আগে পিছে। এটা মূলত মাসদার। এর অর্থ হলো– আড়াল, বিচ্ছিন্নতার সীমানা। এটা اِضْمَار قَد -এর সাথে جُمْلَة حَالِيَة হয়েছে।

قَوْلُهُ غَصْبًا : এটা يَأْخُذُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ যা نَوْع বর্ণনা করার জন্য। যেহেতু يَأْخُذُ -এর মধ্যে غَصْب -এর অর্থ রয়েছে। কাজেই উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, غَصَبَ غَصْبًا আর وَرَائَهُمْ -এর তাফসীর رَجَعُوْا -এবং اَمَامَهُمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَرَاءَ এটা اَضْدَادْ -এর অন্তর্গত; এটা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ سَفِيْنَةٍ : এর সিফত صَالِحَة শব্দটি উহ্য রয়েছে। হযরত উবাই এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাতে صَالِحَة শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا : অর্থাৎ কিশোরটি তার পিতামাতাকে বাধ্য করবে। বলা হয় رَهِقَهُ অর্থাৎ غَشِيَهُ

قَوْلُهُ طُغْيَانًا : এটা يُرْهِقَهُمَا -এর মাফউল। আর كُفْرًا -এর আতফ طُغْيَانًا -এর উপর হয়েছে।

قَوْلُهُ رُحْمًا : এটা মাসদার। অর্থ হলো– দয়া, অনুগ্রহ, মেহেরবানি। বাবে سَمِعَ হতে মাসদার رَحْمَةٌ . رَحْمًا অর্থ– মেহেরবান হওয়া। আর زَكٰوة এবং رُحْمًا এ দুটি خَيْرًا থেকে تَمْيِيْز হয়েছে। এখানে اِسْم تَفْضِيْل -এর অর্থে নয়।

قَوْلُهُ رَحْمَةً : হয়তো رَحْمَةً শব্দটি يَبْلُغَا এবং يَسْتَخْرِجَا -এর مَفْعُول لَهُ অথবা فَعَلْتَهُ উহ্য ফে'লের مَفْعُول بِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ : কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তাঁরা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচজন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকিনের সংজ্ঞা : কারো কারো মতে মিসকিন এমন ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই। আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকিনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চেয়ে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا : আল্লামা বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিজির (আ.) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারী বাদশাহর এলাকা অতিক্রম করার পর হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে নৌকাটি ঠিক করে দেন। আল্লামা রূমী (র.) চমৎকার বলেছেন–

گرخضر در بحر کشتی را شکست

صد درستی در شکست خضر هست

অর্থাৎ হযরত খিজির (আ.) যদিও নদীতে নৌকা ভেঙ্গে ফেলেছেন; কিন্তু তার নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে হাজারো কল্যাণ নিহিত ছিল।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْغُلَامُ : হযরত খিজির (আ.) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতার ছিল সৎকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিজির (আ.) বলেন, আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি সৎকর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতামাতাকে ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكٰوةً : অর্থাৎ ফলে আমি চাই যে তাদের প্রতিপালক যেন এর পরিবর্তে পবিত্রতা এবং স্নেহ মায়ার নিরিখে তার চেয়ে উত্তম সন্তান তাদেরকে দান করেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, বালকটির মৃত্যু হলো, তবে তার পিতামাতা বিপদমুক্ত হলো, তারা তাদের পুত্র হারালো, কিন্তু তাদের ঈমান রক্ষা পেল, শুধু তাই নয়; বরং এই পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করলেন জনৈকা পুণ্যবতী কন্যা।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা অনুধাবন করা যায়, ঐ পুত্রের বদলে যে কন্যা সন্তান তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তা হবে দয়ামায়ার প্রতীক এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত এবং তাদের স্নেহধন্য ও খেদমতগুজার।

আল্লামা বগভী (র.) কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ পুত্রের বদলে তাকে একটি পুণ্যবতী কন্যা দান করেছেন, যার সঙ্গে একজন নবীর বিয়ে হয়।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন যার বংশে সত্তরজন নবী হয়েছেন।

ইবনে জোরাইজ বলেছেন, এই বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তাকে একান্ত অনুগত একটি কন্যা দান করেছেন।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কন্যা সন্তান দান করেছেন, যার থেকে বহু পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন।
ইমাম বুখারী (র.) এবং তিরমিযী (র.) হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে এক কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।
মুতরিফ (র.) লিখেছেন, যখন ঐ বালকটি পয়দা হয়েছিল তখন তার পিতামাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। এরপরে যখন তাকে হত্যা করা হয় তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

আয়াতে خَشِيْنَا ও اَرَدْنَا ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, হযরত খিজির (আ.) এ দুটি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় اردنا -এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে হযরত খিজির (আ.) অথবা অন্য কেউ শরিক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফের হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে– এ বিষয়টি যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হতে পারে না।
উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফের হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিপক্ষে নয়। –[মাযহারী]
ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দুজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী [নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন।

قَوْلُهُ وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا : হযরত আবুদ্দারদা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নিচে রক্ষিত এতিম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার। –[তিরমিযী, হাকিম]
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল–
১. বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম।
২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তামুক্ত হয়।
৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, সে আল্লাহ তা'আলাকে রিজিকদাতারূপে বিশ্বাস করে। এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।
৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎকাজে গাফিল হয়।
৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।
৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।
উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)ও এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]
তাফসীরে জালালাইনের ২৫১নং পৃষ্ঠার ৭নং হাশিয়ায় বর্ণিত রয়েছে–

قَوْلُهُ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا ـ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِى الْكَنْزِ فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ كَانَ مَالاً جَسِيْمًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ عِلْمًا فِىْ صُحُفٍ مَدْفُوْنَةٍ وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كَانَ لَوْحًا مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوْبٍ فِىْ اَحَدِ جَانِبَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَحْزَنُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالرِّزْقِ كَيْفَ يَتْعَبُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَغْفَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِاَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ اِلَيْهَا ـ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَفِى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ مَكْتُوْبٌ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِىْ لَا شَرِيْكَ لِىْ خَلَقْتُ الْخَيْرَ فَطُوْبٰى لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلْخَيْرِ وَاَجْرَيْتُهُ عَلٰى يَدَيْهِ وَالْوَيْلُ لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلشَّرِّ وَاَجْرَيْتُهُ عَلٰى يَدَيْهِ ـ

قَوْلُهُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ : বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে হযরত খিজির (আ.) বললেন, আর আমি যা কিছু করেছি এর কোনোটিই আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি; বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমেই করেছি। কেননা, কারো কোনো সম্পদ নষ্ট করা, অথবা কোনো লোককে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীত বৈধ হতে পারে না। এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেকই আমি কাজ করেছি। আর এ হলো সেসব বিষয়, যে সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেননি। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৬২]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.) থেকে বিদায় হওয়ার সময় বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, জ্ঞানের অন্বেষণ এবং ইলম হাসিল করুন তার উপর আমল করার জন্যে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্যে নয়।

শিক্ষণীয় বিষয় : আল্লামা বায়যাবি (র.) লিখেছেন, এই ঘটনা দ্বারা আমাদের জন্য যা শিক্ষণীয় তা হলো এই, কোনো ব্যক্তিরই তার ইলমের জন্যে গর্ব করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত কোনো কথা অপছন্দনীয় হলে, তথা সঠিক বলে মনে না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা হয়তো এর পেছনে এমন কোনো রহস্য থাকতে পারে, যা তার অজানা রয়েছে।

আল্লামা সানউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো ব্যক্তির কথা যদি সঠিক মনে না হয়, আর সে ব্যক্তি দীনদার পরহেজগার আলেম হয়, তবে তার কথা সঙ্গে অস্বীকার করা অনুচিত; বরং তার নিকট থেকে আরো ইলম হাসিল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য এবং যিনি শিক্ষা দেন, তার প্রতি আদব রক্ষা করা উচিত, তার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আর যদি দেখা যায় তিনি বার বারই ভুল করে যাচ্ছেন তবে তার নিকট থেকে দূরে থাকা উত্তম। হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা থেকে এমনি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায়।

পয়গাম্বরসুলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত : এ দৃষ্টান্তটি বুঝার আগে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালোমন্দ সবই আল্লাহ তা'আলার সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যেসব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্ব প্রকৃতির জন্য সবই জরুরি এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হিসেবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন–

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যক ভালো ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোনো মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্ট না বলা আদব। কুরআনে উল্লিখিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন– اَلَّذِىْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ এতে তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহ তা'আলার প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে اِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিজির (আ.)-এর উক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرَدْتُّ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দকাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভালো কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرَدْنَا অর্থাৎ "আমরা ইচ্ছা করলাম" বলেছেন। যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভালো কাজটি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে এতিমদের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভালো কাজ। তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করে فَاَرَادَ رَبُّكَ অর্থাৎ "আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন" বলেছেন।

অনুবাদ :

٨٣. وَيَسْئَلُوْنَكَ اَيِ الْيَهُوْدُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ط اِسْمُهُ اِسْكَنْدَرُ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قُلْ سَأَتْلُوْا سَاَقُصُّ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ مِنْ حَالِهِ ذِكْرًا - خَبَرًا -

৮৩. ইহুদিরা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তার নাম হলো ইস্কান্দার। আর তিনি নবী ছিলেন না। আপনি বলুন! আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করব।

٨٤. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْاَرْضِ بِتَسْهِيْلِ السَّيْرِ فِيْهَا وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ سَبَبًا - طَرِيْقًا يُوْصِلُ اِلٰى مُرَادِهِ -

৮৪. আমি তো তাকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। পৃথিবীতে ভ্রমণ করাকে সহজ করে দিয়ে। এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। যার দিকে সে মুখাপেক্ষী ছিল। এমন পথ যার মাধ্যমে সে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতো।

٨٥. فَاَتْبَعَ سَبَبًا - سَلَكَ طَرِيْقًا نَحْوَ الْمَغْرِبِ -

৮৫. অতঃপর তিনি একপথ অবলম্বন করলেন পশ্চিম দিকে চলার পথ অবলম্বন করলেন।

٨٦. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ مَوْضِعَ غُرُوْبِهَا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ ذَاتَ حِمَاةٍ وَهِىَ الطِّيْنُ الْاَسْوَدُ وَغُرُوْبُهَا فِى الْعَيْنِ فِىْ رَأْيِ الْعَيْنِ وَاِلَّا فَهِىَ اَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا وَوَجَدَ عِنْدَهَا اَيِ الْعَيْنِ قَوْمًا كَافِرِيْنَ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ بِالْهَامٍ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ الْقَوْمَ بِالْقَتْلِ وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا - بِالْاَسْرِ -

৮৬. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছলেন সূর্য ডোবার স্থানে। তখন সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তাগমন করতে দেখলেন কালো মাটি বিশিষ্ট জলাশয়ে সূর্যের অস্ত যাওয়া দর্শকের দৃষ্টির অনুভূতি অনুসারে অন্যথায় সূর্য তো পৃথিবী থেকেও অনেক বড়। এবং তিনি তথায় জলাশয়ের নিকটে এক কাফের সম্প্রদায় দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন! ইলহামের মাধ্যমে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার সম্প্রদায়কে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। বন্দী করে।

٨٧. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ بِالشِّرْكِ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ نَقْتُلُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا - بِسُكُوْنِ الْكَافِ وَضَمِّهَا شَدِيْدًا فِى النَّارِ -

৮৭. তিনি বললেন, যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে আমি তাকে শাস্তি দিব তাকে হত্যা করব। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। نُكْرٌ শব্দটি ك বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থ– আগুনের কঠিন শাস্তি।

অনুবাদ :

٨٨. وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءُ الْحُسْنٰى ج اَىِ الْجَنَّةُ وَالْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِنَصَبِ جَزَاءً وَتَنْوِيْنِهٖ قَالَ الْفَرَّاءُ وَنَصَبُهٗ عَلَى التَّفْسِيْرِ اَىْ لِجِهَةِ النِّسْبَةِ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ـ اَىْ نَاْمُرُهٗ بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ ـ

৮৮. তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত। আর ইজাফত হলো اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ অপর এক কেরাতে جَزَاءُ শব্দটি نَصَبْ এবং تَنْوِيْن সহ পঠিত হয়েছে। ইমাম ফাররা বলেন যে, এর নসব হয়েছে جِهَةِ نِسْبَتْ -এর তাফসীরের কারণে। এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব অর্থাৎ আমি তার জন্য এমন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করব যা তার জন্য সহজ হবে।

٨٩. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ـ

৮৯. আবার তিনি এক পথ ধরলেন পূর্ব দিকে।

٩٠. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ مَوْضِعَ طُلُوْعِهَا وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ هُمُ الزَّنْجُ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا اَىِ الشَّمْسِ سِتْرًا ـ مِنْ لِبَاسٍ وَلَا سَقْفٍ لِاَنَّ اَرْضَهُمْ لَا تَحْمِلُ بِنَاءً وَلَهُمْ سُرُوْبٌ يَغِيْبُوْنَ فِيْهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَيَظْهَرُوْنَ عِنْدَ ارْتِفَاعِهَا ـ

৯০. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছলেন সূর্য উদিত হওয়ার জায়গা তখন তিনি দেখলেন তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে তারা হলো নিগ্রো সম্প্রদায় যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। যেমন– পোশাক, ছাদ/আচ্ছাদন ইত্যাদি। কেননা তাদের ভূমিতে ইমারত নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য গর্ত ছিল। তারা তাতে সূর্যোদয়কালে আত্মগোপন করত এবং সূর্যাস্তকালে গুহা হতে বের হতো।

٩١. كَذٰلِكَ ط اَىِ الْاَمْرُ كَمَا قُلْنَا وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ اَىْ عِنْدَ ذِى الْقَرْنَيْنِ مِنَ الْاٰلَاتِ وَالْجُنْدِ وَغَيْرِهَا خُبْرًا ـ عِلْمًا ـ

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই বিষয়টি এমনই যা আমি বর্ণনা করেছি। তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি। অর্থাৎ জুলকারনাইনের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সৈন্য ইত্যাদি সম্পর্কে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سَاَتْلُوْا : এখানে سِيْنْ টি শুধুমাত্র তাকিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। مُسْتَقْبِلْ -এর জন্য নয়। কেননা পূর্ণ কুরআন ধারাবাহিকভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنْهُ : এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةْ আর যমীর জুলকারনাইনের দিকে ফিরেছে। আর مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مِنْ اَخْبَارِهٖ জার মাজরূর বাস্তবিক পক্ষে ذِكْرًا -এর সিফত। কিন্তু مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে حَالْ হয়েছে।

২. مِنْهُ-এর যমীর اَللّٰهُ-এর দিকে ফিরেছে। আর مِنْ হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ অবস্থা পড়ে শুনাচ্ছি। তবে এই সম্ভাবনাটি খুবই দুর্বল।

سَاَتْلُوْ-এর مَفْعُوْل بِهٖ আর যদি اَتْلُوْا এটা اَذْكُرُ-এর অর্থে হয়ে থাকে তবে ذِكْرًا এটা مَفْعُوْل مُطْلَق এটা ذِكْرًا হবে। ذِكْرًا টি প্রথম সুরতে نَبَأً-এর অর্থে হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে কুরআনের অর্থে হবে। আর مِنْهُ-এর তাফসীর مِنْ حَالُهُ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো উহ্য মুজাফের প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা প্রশ্ন অবস্থা সম্পর্কে হয়ে থাকে ذَاتٌ সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهُ مَكَّنَّا : এটা বাবে تَفْعِيْل-এর تَمْكِيْن মাসদার হতে মাযীর সীগাহ। অর্থ- শক্তি বা ক্ষমতা দেওয়া, পা সুদৃঢ় করা।

قَوْلُهُ سَبَبَ : এটা একবচন, বহুবচনে اَسْبَابٌ অর্থ হলো রশি, মাধ্যম, উপকরণ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَجَدَ : وَجَدَ অর্থ হলো رَاٰى বা দেখা, অনুভব করা।

قَوْلُهُ حَمِئَةٍ : এটা বাবে سَمِعَ হতে صِفَت مُشَبَّه মাসদার حَمَئًا আর حَمَا الْمَاءُ অর্থ- পানি ঘোলাটে হলো। কর্দমযুক্ত হলো। اَلْحَمِئَةُ অর্থ- কালো মাটি।

قَوْلُهُ اَمَّا : এটা اَنْ এবং مَا-এর সমন্বয়ে ঘটিত। এটা حَرْف تَفْصِيْل বা ব্যাখ্যামূলক অব্যয়। আর اَنْ تُعَذِّبَ-এর মধ্যে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَة আর পূর্ণ বাক্য হলো بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে হয়তো মুবতাদা হবে এবং خَبَرْ উহ্য হবে। অর্থাৎ اَمَّا تَعْذِيْبُكَ وَاقِعٌ অথবা خَبَرْ হবে এবং তার مُبْتَدَأ উহ্য থাকবে অর্থাৎ اَمَّا اَمْرُكَ تَعْذِيْبُكَ অথবা উহ্য ফেলের مَفْعُوْل হবে। অর্থাৎ اَمَّا تُوْقِعُ تَعْذِيْبَكَ আর اَمَّا تَتَّخِذُ-এর মধ্যেও উপরিউক্ত সম্ভাবনাগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ رَاْيِ الْعَيْنِ : فِيْ رَاْيِ الْعَيْنِ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, وَجَدَ এখানে তার حَقِيْقِيْ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না; বরং দৃষ্টিতে আসা বা অনুভব করা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা সূর্য পৃথিবীর কোনো জলাশয়ে অস্ত যাওয়া অসম্ভব। যেহেতু সূর্য তের লক্ষ পৃথিবীর সমান এবং তার ব্যাস ৮৬,৬৫.০০০ মাইল। সূর্যের জলাশয়ে অস্ত যাওয়ার বিষয়টি এরূপ যেমন কোনো দর্শক দেখেন যে, আকাশ চতুর্দিক দিয়ে দিগন্তের সাথে মিলিত রয়েছে। অথচ বাস্তবে এরূপ নয়। অনুরূপভাবে যদি আপনি রেল লাইনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে রেল লাইন দেখেন তবে মনে হবে যে, একটি লাইন অপর লাইনের খুবই নিকটবর্তী। এমনকি এক পর্যায়ে মনে হবে যে, উভয় লাইন একেবারেই মিলে গেছে। অথচ বাস্তবিক অবস্থা এরূপ নয়। সূর্য জলাশয়ে অস্ত যাওয়ার বিষয়টিও তদ্রূপ।

قَوْلُهُ حُسْنًا : এর مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَا حُسْنٍ অথবা মুবালাগা হিসেবে মাসদারের حَمْل করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ : এখানে اَمَّا হলো حَرْف تَفْصِيْل বা ব্যাখ্যামূলক অব্যয়। কিন্তু তাতে শর্তের অর্থও বিদ্যমান আছে এজন্যই তার জবাবে فَاء আনা জরুরি।

قَوْلُهُ فَلَهُ جَزَاءٌ : لَهُ হলো خَبَر مُقَدَّم আর اَلْحُسْنٰى হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ আর جَزَاءٌ শব্দটি تَمْيِيْز বা حَالْ হবে। অর্থাৎ لَهُ الْحُسْنٰى جَزَاءً كَمَا يُقَالُ لَكَ هٰذَا الثَّوْبُ هِبَةً

قَوْلُهُ يُسْرًا : এর مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَا يُسْرٍ অথবা মাসদারের حَمْل মুবালাগা রূপে হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمْ نَجْعَلْ : এটা قَوْم-এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ : এটা উহ্য مُبْتَدَأ-এর সিফত হয়েছে। অর্থাৎ اَلْاَمْرُ كَذٰلِكَ

قَوْلُهُ اَحَطْنَا : এটা جُمْلَة مُسْتَأنِفَة হয়েছে।

قَوْلُهُ خُبْرًا : এটা خَبَرْ-এর মাসদার বাবে فَتَحَ ও كَرُمَ ; خَبُرَ الشَّيْئَ وَبِهٖ অর্থ- বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

قَوْلُهُ بِإِلْهَامٍ : এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত জুলকারনাইন নবী ছিলেন না; বরং একজন নেককার বাদশাহ ছিলেন।

قَوْلُهُ سَنَقُوْلُ : سنقول -এর তাফসীর نَأْمُرُ -এর দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থকে নির্দিষ্টকরণ। কেননা قَوْل শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। ১. রূহের তাৎপর্য ২. আসহাবে কাহাফ ৩. জুলকারনাইন। এই সূরার শুরুতে আসহাবে কাহাফের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর সূরার শেষের দিকে জুল কারণাইন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

জুলকারনাইন-এর পরিচিতি : জুলকারনাইন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের রাজত্ব দান করেছিলাম। সমগ্র বিশ্বের রাজা বাদশাহ তথা শাসনকর্তাগণ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। প্রকাশ্যে তিনি ক্ষমতাধর বাদশাহ ছিলেন আর অন্যদিকে দরবেশ ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন তিনি।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাঁকে জুলকারনাইন এজন্য বলা হতো যে, তিনি পৃথিবীর প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান তিনি দেখেছিলেন। আর পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আর সূফী সাধকগণ বলেছেন, তাকে জুলকারনাইন এজন্য বলা হয়– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাহেরী এবং বাতেনী ইলম দান করেছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আসহাবে কাহাফ পৌত্তলিক জালেম রাজার অকথ্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে পাহাড়ের গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। পক্ষান্তরে জুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজের ন্যায় অশান্তি সৃষ্টিকারী জালেমদেরকে পাহাড়ের পিছনে ঠেলে দিয়ে সীসাঢালা প্রাচীর তৈরি করেছিলেন। যাতে করে জালেমর এসে অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে। আসহাবে কাহফ জালেমের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আর জুলকারনাইন জালেমদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্তে সরিয়ে দিয়েছেন। জুলকারনাইনের ঘটনায় দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমন্বয়ে ঘটেছে। একদিকে তার রাজকীয় শান-শওকত, অসাধারণ ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, শক্তি সামর্থ্য, আর অন্য দিকে তার কারামতসমূহ এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তির যে বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তা মানবজাতির ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা।

বর্ণিত আছে যে, জুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কাবা শরীফ প্রাঙ্গণে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তার সাথে মোছাফাহার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সফর তার জন্য সহজ হয়ে যায়। অনেক বিস্ময়কর ক্ষমতা তিনি লাভ করেন। হযরত খিজির (আ.) তার উজির বা সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাশাপাশি ইলম এবং হেকমতও দান করেছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। পৃথিবীর সকল রাজা বাদশাহ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তারা তাকে ভয় করতো।

ইহুদিদের পরামর্শক্রমে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করেছিল যে, কোন বাদশাহ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য ভ্রমণ করেছিল। তাঁর ঘটনা কি?

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের ঐ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে জুলকারণাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

قَوْلُهُ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ : বস্তুত জুলকারনাইনে অত্যন্ত নেককার বাদশাহ ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বাতাসের উপর নিয়ন্ত্রণ দান করেছিলেন, ঠিক তেমিনভাবে জুলকারনাইনকে জমিনের উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন। সারা পৃথিবীর পথঘাট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান দান করেছিলেন।

বর্ণিত আছে চার ব্যক্তি সারা পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে দু'জন মু'মিন আর দুজন কাফের। মু'মিন হলেন, জুলকারনাইন ও হযরত সুলায়মান (আ.)। আর কাফের দুজন হলো বখতে নসর ও নমরূদ এবং পঞ্চম ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন ইমাম মাহদী (আ.)। তিনি শেষ জমানায় আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবেন। পূর্বোল্লিখিত চারজন সাবেক উম্মতসমূহের হয়েছিলেন। আর ইমাম মাহদী (আ.) হবেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া থেকে। কোনো কোনো লোকের ধারণা রোমের ইস্কান্দরন বাদশাহের নাম ছিল জুলকারনাইন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, জুলকারনাইন অন্য একজন বাদশাহ, যিনি রোমের ইস্কান্দর থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে ছিলেন। কেননা পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে যে জুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে তিনি অত্যন্ত দীনদার, প্রকৃত অর্থে মর্দে মু'মিন, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর রোমের ইস্কান্দর ছিল কাফের মুশরিক, তার উজির ছিল আরাসতাতালীস। সে শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ তার হয়নি। সে ইয়াজুজ মাজুজকে গতিরোধ করার জন্যে কোনো প্রাচীর নির্মাণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ করেননি। পবিত্র কুরআনে জুলকারনাইনের কথা স্থান পেয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পাড়া ১৬, পৃ. ১০৬]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ : এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লামা বগভী (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো আলেমের মতে জুলকারনাইনের নাম ছিল মারজুবান বিন মারজিয়াহ। তিনি স্পেনের লোক ছিলেন এবং ইয়াফিছ বিন নূহের বংশোদ্ভুত ছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন, তিনি সিরীয় ছিলেন এবং নাম ছিল সিকান্দার বিন কিবলীস বিন ফিলকূস।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বক্তব্যটি অধিক যুক্তিসঙ্গত।

শিরাজী (র.) 'আল-আলক্বাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক ও ইবনে মুনজের এবং ইবনে আবি হাতেম ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ ইয়ামানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ ঐতিহাসিক ঘটনার বড় আলেম ছিলেন। তাঁদের মতে জুলকারনাইন রুমী ছিলেন, এক বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান ছিলেন, তার প্রকৃত নাম ছিল সেকান্দার। ইবনুল মুনজের (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকার কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন।

জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী হওয়ার ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। আবুল ফোজাইলের বর্ণনা হলো, হযরত আলী (রা.)-কে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, তিনি কি নবী ছিলেন? না বাদশাহ? হযরত আলী (রা.) বললেন, তিনি নবীও ছিলেন না বাদশাহও ছিলেন না; বরং এমন এক বান্দা ছিলেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতেন আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করতেন, আর আল্লাহ তা'আলা তাকে কল্যাণ দান করেন।

ইবনে মরদবীয়া সালেম ইবনে আবীল জোদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, জুলকারনাইন আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত অনুগত বান্দা ছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁর আন্তরিকতার কদর করতেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে জুলকারনাইন বলে ডেকেছিল। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের নামে নামকরণ করা যথেষ্ট মনে করনি এখন ফেরেশতাদের নামও ব্যবহার করতে শুরু করেছ।

নামকরণের কারণ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন যে জুলকারনাইন নামকরণ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

১. সূর্যের দু'টি প্রান্ত রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম। জুলকারনাইন উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

২. তিনি রোম এবং পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

৩. দুনিয়ার আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় অঞ্চলেই তিনি প্রবেশ করেছেন। আলোকিত অঞ্চল অর্থাৎ শেতাঙ্গ লোকদের দেশ যেমন– ইউরোপ, আর অন্ধকার কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ যেমন– আফ্রিকা।

৪. জুলকারনাইন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি সূর্যের উভয় প্রান্তকে স্পর্শ করেছেন।

৫. তাঁর দুটি অতি সুন্দর জুলফ ছিল।

৬. তার মাথায় শিং এর মতো দুটি স্থান ছিল, যা তিনি আমামা বা পাগড়ি দ্বারা ঢেকে রাখতেন।

৭. আবূ তোফাইল বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রা.) জুলকারনাইন নামকরণের এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর মাথার ডান দিকে আঘাত দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন, তিনি পুনরায় তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ দেন, তখন তারা তাঁর মাথার বা দিকে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে জীবিত করেন। কারণ শব্দটির অর্থ হলো মাথার ডান বা বা দিকের উচু স্থান।

ইমাম আহমদ (র.) 'আযজুহুদ' নামক গ্রন্থে এবং ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম ও আবুশ শায়খ 'আল আজমত' গ্রন্থে আবূল ওয়াকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইনের শিং দুটি কেমন ছিল, তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে সোনালী বা রূপালি দুটি শিং ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল না, বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর উম্মতের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তার উম্মতকে সত্যের দাওয়াত দেন, লোকেরা তার মাথার বা দিকে এমন আঘাত দেয় যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ দেন। লোকেরা তার মাথার ডান দিকে এমন আঘাত দেয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জুলকারনাইন নামকরণ করেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৬১-২৬৩]

قَوْلُهُ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا - শানে নুযূল : আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইহুদিরা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, আপনি হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করেন। তাদের নাম হয়তো আমাদের নিকট থেকেই শ্রবণ করেছেন। এখন এমন একজন নবীর সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বলুন, যার আলোচনা তাওরাতে মাত্র এক জায়গায় রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার কথা বলছো? তারা বলল, আমরা জুলকারনাইনের কথা বলছি। প্রিয়নবী ﷺ তখন ইরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার নিকট কোনো কথা এখনো পৌছেনি।

এই জবাব শ্রবণ করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো, তারা মনে করলো যে প্রিয়নবী ﷺ তাদের জবাব দিতে অপারগ হয়েছেন। [নাউজুবিল্লাহ] [তাদের এই উপলব্ধির জন্যই তারা আনন্দিত হয়] এরপর তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবার থেকে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তারা তাঁর গৃহের দুয়ার পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হলো– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا

ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে আহলে কিতাবদের কয়েকজন হাজির হলো। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো ইলম নেই। আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই গৃহের ছাদের উপর এক রকম শব্দ শ্রুত হলো। প্রিয়নবী ﷺ -এর মধ্যে ওহী নাজিল হওয়ার সময়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হলো। একটু পরেই যিনি এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে লাগলেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ الخ

এরপর তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার নিকট জুলকারনাইন সম্পর্কে খবর এসে গেছে, আপনার জন্য তা যথেষ্ট।

ইমাম সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি পাগড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন জুলকারনাইন। যেহেতু তাঁর মাথার ডানে ও বাঁয়ে কাফেরদের আঘাতের কারণে শিং এর ন্যায় উঁচু হয়েছিল। তিনি পাগড়ি পরিধান করে ঐ উঁচু স্থানটি গোপন করে রাখতেন।

قَوْلُهُ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মেঘমালাকে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মেঘমালার উপর তিনি আরোহণ করতেন। তার উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাতদিন তার জন্য ছিল সমান। আর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেওয়ার তাৎপর্য হলো, পৃথিবীতে চলাফেরা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। আর সহজ করার তাৎপর্য হলো, তার জন্য সর্বত্র সর্বপ্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রাত দিনের পরিবর্তনের বা মৌসুমের পরিবর্তনের কারণে তার গতি রোধ হতো না, তার ভ্রমণ বন্ধ হতো না।

قَوْلُهُ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا : আরবি অভিধানে سَبَبٌ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যদ্দারা লক্ষ্য অর্জনের সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –[বাহরে মুহীত]

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগের যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ فَأَتْبَعَ سَبَبًا : অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকারণাদি তাকে দান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগান।

قَوْلُهُ حَمِئَةٍ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ : حَمِئَةٍ-এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বুঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোনো বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোনো ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো পাহাড়, বৃক্ষ, দালান কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

قَوْلُهُ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا : অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে জুলকারণাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে জুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন, আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

قَوْلُهُ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ : এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, জুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। জুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোনো পয়গাম্বরের মধ্যস্ততায়ই তাকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন– রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিজির (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর জন্য কুরআন وَأَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রাসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীতে বলেন, এখানে জুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না। কাশ্‌ফ ইলহাম অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় জুলকারনাইকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে এসব সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

إِمَّا শব্দটির তাৎপর্য হলো এই যে, জুলকারনাইনকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পার। কেননা তারা কাফের। আর তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে বন্দী করে রাখতে পার অথবা তোমার মধুর ব্যবহার দ্বারা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পার। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–.... قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ অর্থাৎ জুলকারনাইন বললেন, যে কেউ অন্যায় করবে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দিব। এরপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।"

জুলকারনাইন বললেন, যে জুলুম অত্যাচার করবে আমি তাকে অবশ্যই সমুচিত শাস্তি দিব। তবে দুনিয়ার এ শাস্তিই শেষ নয়; বরং তারা যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট হাজির হবে, তখন তিনি তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দিবেন। যেহেতু তারা কাফের ছিল তাই তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হলো–

কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়, তখনই তার পাশাপাশি মু'মিন বান্দাদের পুরস্কারের কথাও ঘোষিত হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে মু'মিনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى অর্থাৎ আর যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলার বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

قَوْلُهُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا : অর্থাৎ "আর আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ দিব" অর্থাৎ কঠিন নির্দেশ দিব না। আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, উত্তম নির্দেশ দিব।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি জুলকারনাইনকে সম্বোধন করেছেন এবং ওহী প্রেরণ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জুলকারনাইন নবী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী ছিলেন না, আর তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা ওহী নয়; বরং ইলহাম যা আল্লাহর ওলীগণের প্রতি হয়ে থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হয়তো কোনো নবীর মাধ্যমে জুলকারনাইনকে এই বাণী পৌছানো হয়েছে, হতে পারে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে তাঁর সঙ্গে মোতায়েন করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرًا : জুলকারনাইনের সফর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশেষে যখন সে সূর্যের উদয়স্থলে পৌছে গেল তখন সে সূর্যকে এমন লোকদের উপর উদয় হতে দেখল, যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোনো আড়াল রাখিনি। অর্থাৎ তাদের কোনো পোষাক ছিল না, তাদের কোনো বাড়িঘরও ছিল না। যা দ্দ্বারা দারা তারা সূর্য থেকে নিজেদেরকে আড়ালে রাখতে পারতো। আর সেখানের জমিন বাড়িঘর নির্মাণের যোগ্যও ছিল না।

জুলকারনাইনের ঘটনা এমনই ছিল। অর্থাৎ জুলকারনাইনের ক্ষমতা অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য এমনই ছিল যেমন আমি বর্ণনা করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, জুলকারনাইন যেভাবে সূর্যকে চোরাবালিতে অস্ত যেতে দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে চোরাবালি থেকে উদয় হতেও দেখেছে। অথবা এর অর্থ হলো, যেভাবে প্রতীচ্যবাসীর জন্য আমি সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি, ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্যবাসীর জন্যও সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি।

قَوْلُهُ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا : জুলকারনাইনের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন, "আর জুলকারনাইনের কাছে যা কিছু ছিল তার যাবতীয় সংবাদ আমি আয়ত্ব করে রেখেছি।"

অর্থাৎ জুলকারনাইনের নিকট কত সৈন্য ছিল, কি আসবাবপত্র ছিল, আর কত যুদ্ধাস্ত্র ছিল এক কথায় জুলকারনাইনের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য, আসবাবপত্র সবকিছু সম্পর্কে আমি ওয়াকেফহাল ছিলাম। أَحَطْنَا শব্দটি দ্বারা সৈন্যবাহিনীর আধিক্য এবং তার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।

অনুবাদ :

٩٢. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا .

৯২. আবার তিনি এক পথ ধরলেন।

٩٣. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا هُنَا وَبَعْدَهُمَا جَبَلَانِ بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ سَدَّ الْاِسْكَنْدَرُ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَاْتِيْ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا اَيْ اَمَامَهُمَا قَوْمًا لا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا . اَيْ لَا يَفْهَمُوْنَهُ اِلَّا بَعْدَ بُطْوءٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ .

৯৩. চলতে চলতে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছলেন اَلسَّدَّيْنِ শব্দটির سِيْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয়টিই বৈধ রয়েছে, এখানেও এবং পরবর্তীতেও। তুর্কী সীমান্তের শেষ প্রান্তের দুটি পাহাড় বাদশাহ সিকান্দার ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সামনে তার আলোচনা আসছে। তখন তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে পেলেন অর্থাৎ তাদের সম্মুখে যারা কোনো কথা বুঝাবার মতো ছিল না। অর্থাৎ তারা দীর্ঘ বিলম্ব তথা ইশারা ইঙ্গিত ব্যতীত কোনো কিছু বুঝতা না। অপর কেরাতে يَفْقَهُوْنَ শব্দের يَاء পেশ যুক্ত ও قَافْ যের যুক্ত রয়েছে।

٩٤. قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهَا اِسْمَانِ اَعْجَمِيَّانِ لِقَبِيْلَتَيْنِ فَلَمْ يَنْصَرِفَا مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِالنَّهْبِ وَالْبَغْيِ عِنْدَ خُرُوْجِهِمْ اِلَيْنَا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا . جُعْلًا مِنَ الْمَالِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ خَرَاجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا . حَاجِزًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْنَا .

৯৪. তাঁরা বলল, হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ يَاْجُوْجَ ও مَاْجُوْجَ শব্দ দুটি হামযাসহ ও হামযা ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত হয়েছে। এটা অনারব দুটি গোত্রের নাম। عَلَمْ ও عُجْمَة -এর কারণে শব্দ দুটি غَيْر مُنْصَرِفْ হয়েছে। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের নিকট আগমন করে হত্যা, সন্ত্রাস ও ডাকাতি করার মাধ্যমে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, অর্থাৎ চাঁদার মাধ্যমে সম্পদ একত্র করে দিব। আর خَرْجًا শব্দটি অন্য কেরাতে خَرَاجًا পঠিত রয়েছে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবেন। অর্থাৎ আড়াল, যার ফলে তারা আমাদের নিকট আসতে সক্ষম হবে না।

٩٥. قَالَ مَا مَكَّنِّيْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِدْغَامٍ فِيْهِ رَبِّيْ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ خَيْرٌ مِنْ خَرْجِكُمُ الَّذِيْ تَجْعَلُوْنَهُ لِيْ فَلَا حَاجَةَ لِيْ اِلَيْهِ وَاَجْعَلُ لَكُمُ السَّدَّ تَبَرُّعًا فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ لِمَا اَطْلُبُهُ مِنْكُمْ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا . حَاجِزًا حَصِيْنًا .

৯৫. তিনি বললেন, যে ক্ষমতা দিয়েছেন অন্য কেরাতে مَكَّنِّيْ শব্দটির نُوْن দুটি ইদগামবিহীন অবস্থায় (مَكَّنَنِيْ) রয়েছে। আমার প্রতিপালক আমাকে যেই সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি দান করেছেন। তাই উৎকৃষ্ট আমার ঐ সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কোনো বিনিময় ছাড়াই তোমাদের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর যখন আমি তোমাদের থেকে তা কামনা করি। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব অর্থাৎ সুদৃঢ় আড়াল বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দেব।

অনুবাদ :

৯৬. اٰتُوْنِیْ زُبَرَ الْحَدِیْدِ ط قِطْعَةً عَلٰی قَدْرِ الْحِجَارَةِ الَّتِیْ یَبْنِیْ بِهَا فَبَنٰی بِهَا وَجُعِلَ بَیْنَهَا الْحَطَبُ وَالْفَحْمُ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ بِضَمِّ الْحَرْفَیْنِ وَفَتْحِهِمَا وَضَمِّ الْاَوَّلِ وَسُكُوْنِ الثَّانِیْ اَیْ جَانِبَیِ الْجَبَلَیْنِ بِالْبِنَاءِ وَوَضَعَ الْمَنَافِخَ وَالنَّارَ حَوْلَ ذٰلِكَ قَالَ انْفُخُوْا ط فَنَفَخُوْا حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ اَیِ الْحَدِیْدَ نَارًا لا اَیْ كَالنَّارِ . قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا . هُوَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ تَنَازَعَ فِیْهِ الْفِعْلَانِ وَحُذِفَ مِنَ الْاَوَّلِ لِاِعْمَالِ الثَّانِیْ فَاُفْرِغَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ عَلَی الْحَدِیْدِ الْمُحْمٰی فَدَخَلَ بَیْنَ زُبَرِهٖ فَصَارَا شَیْئًا وَاحِدًا .

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর। অর্থাৎ পাথরের মতো বড় বড় টুকরা যার দ্বারা দেয়াল নির্মাণ করা যায়। এবং তার মাঝে মাঝে লাকড়িও কয়লা রেখে দেওয়া হলো। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো اَلصَّدَفَيْنِ শব্দটির صَادٌ এবং دَالٌ বর্ণে পেশ হতে পারে। আবার উভয় বর্ণে যবরও হতে পারে। আর صَادٌ বর্ণে পেশ এবং دَالٌ বর্ণে সাকিনও হতে পারে। অর্থাৎ যখন পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং চতুর্পার্শ্বে ফুকযন্ত্র ও আগুনের ব্যবস্থা করা হলো। তখন তিনি বললেন তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক কাজেই লোকেরা ফুঁক দিল। যখন তা লৌহ টুকরা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো অর্থাৎ আগুনের মতো তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। قِطْرٌ হলো গলিত তাম্র। قِطْرًا -এর মধ্যে দু'ফেল تَنَازُعٌ করেছে। দ্বিতীয় ফেয়েল আমল করার কারণে প্রথম ফেয়েলের মাফউল قِطْرًا -কে উহ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং গলিত তাম্র গরম লৌহখণ্ডের উপর ঢেলে দেওয়া হলো। আর গলিত তাম্র লৌহখণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে তা একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।

৯৭. فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَیْ یَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ اَنْ یَّظْهَرُوْهُ یَعْلُوْا ظَهْرَهٗ لِاِرْتِفَاعِهٖ وَمَلَاسَتِهٖ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا . خَرْقًا لِصَلَابَتِهٖ وَسُمْكِهٖ .

৯৭. এরপর তারা সক্ষম হলো না অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় তা অতিক্রম করতে তার উচ্চতা ও মসৃণতার কারণে এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না ছিদ্র করতে, তা শক্ত ও অধিক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে।

৯৮. قَالَ ذُو الْقَرْنَیْنِ هٰذَا اَیِ السَّدُّ اَیِ الْاِقْدَارُ عَلَیْهِ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّیْ ج نِعْمَةٌ لِاَنَّهٗ مَانِعٌ مِنْ خُرُوْجِهِمْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیْ بِخُرُوْجِهِمُ الْقَرِیْبِ مِنَ الْبَعْثِ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ج مَدْكُوْكًا مَبْسُوْطًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّیْ بِخُرُوْجِهِمْ وَغَیْرِهِمْ حَقًّا . كَائِنًا .

৯৮. হযরত জুলকারনাইন তখন বললেন, এটা এই দেয়াল নির্মাণে সক্ষম হওয়া আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অর্থাৎ নিয়ামত। কেননা এটা তাদের বের হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তাদের বের হওয়ার সময় হবে। তখন তিনি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। ভেঙ্গে চুড়ে সমতল করে দিবেন আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি তাদের বের হওয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে সত্য, যা সংঘটিত হবেই হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سَدَّ : এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার অর্থ– বন্ধ করা।

قَوْلُهُ بَيْنَ السَّدَّيْنِ : এটা بَلَغَ -এর মাফউল।

قَوْلُهُ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ : এই শব্দটি অনারবীয় শব্দ। এটা দুটি সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষদের নাম। এ উভয় সম্প্রদায়ই হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান ইয়াফিসের বংশধর। عُجْمَةَ এবং عَلَمْ হওয়ার কারণে শব্দ দুটি غَيْر مُنْصَرِفْ হয়েছে।

قَوْلُهُ خَرْجًا : خَرْجًا অর্থ– কর, ট্যাক্স, শুল্ক। কেউ কেউ خَرْج এবং خَرَاجْ -এর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, خَرْج বলা হয় ফিদিয়ার অর্থকে। আর خَرَاجٌ হলো ব্যাপক যাতে ফিদিয়ার অর্থ, ট্যাক্স, কর, শুল্ক ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مَكَّنِّى : تَمْكِيْنٌ এটা মূলত ছিল مَكَّنَنِى মাযীর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। বাবে تَفْعِيْل মাসদার অর্থ– কর্তৃত্বের অধিকারী বানানো। আর نِىْ -এর মধ্যে نُوْن হলো نُوْن وِقَايَة আর يَاء হলো مُتَكَلِّمْ -এর যমীর। যা مَفْعُول بِه এরপর لَام كَلِمَة -এর نُوْن -কে সাকিন করে نُوْن وِقَايَة -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ رَدْمًا : رَدْمٌ বলা হয় মোটা ও সুদৃঢ় দেয়ালকে। আর এটা বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। অর্থ– গর্ত বন্ধ করা। তবে এখানে মাসদারটি اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ صَدَفٌ : صَدَفٌ অর্থ পাহাড়ের চূড়া।

قَوْلُهُ اِسْتَطَاعُوْا : اِسْطَاعُوْا মূলত ছিল اِسْتَطَاعُوْا - طَاء এবং تَاء নিকটবর্তী মাখরাজ হওয়ার কারণে সহজিকরণের লক্ষ্যে تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الْوَعْدُ : اَلْوَعْدُ অর্থ– সময়, অথবা এটা মাসদার বা مَوْعُوْدٌ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত।

قَوْلُهُ اٰتُوْنِىْ : অর্থ হলো– তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো!

قَوْلُهُ زُبَرَ : زُبَرٌ শব্দটি زُبْرَةٌ -এর বহুবচন, যেমন غُرَفٌ এটা غُرْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– লোহার পাত, লৌহখণ্ড, লোহার প্লেট।

قَوْلُهُ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ : এই বাক্যটি تَنَازُع فِعْلَانْ -এর অন্তর্গত। আর قِطْرًا এটা اُفْرِغْ -এর প্রথম মাফউল এবং اٰتُوْنِىْ এর উহ্য মাফউল।

قَوْلُهُ يَظْهَرُوْهُ : এটা بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে مَا اسْطَاعُوْا -এর উহ্য মাফউল।

قَوْلُهُ اَلسَّدُّ اَىِ الْاِقْدَارُ عَلَيْهِ : এর দ্বারা প্রথমে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْه নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর বলেছেন যে, দেয়াল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতা যা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার রহমত মাত্র। উদ্দেশ্য হলো– এই প্রাচীর তো সেই সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমত স্বরূপ। আর এই প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতাও জুলকারনাইনের জন্য এক বিশেষ রহমত ছিল।

قَوْلُهُ بِخُرُوْجِهِمْ : মুসান্নিফ (র.) بِخُرُوْجِهِمْ শব্দ বৃদ্ধি করে ওয়াদার مِصْدَاقْ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওয়াদা হলো কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া। আবার কেউ কেউ ওয়াদা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এই প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময়কে।

قَوْلُهُ بَيْنَ السَّدَّيْنِ : যে বস্তু কোনো কিছুর জন্য বাধ্য হয়ে যায়, তাকে سَدٌّ বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَّيْن বলে দুই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। জুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

قَوْلُهُ زُبَرَ الْحَدِيْدِ : زُبَرٌ শব্দটি زُبْرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বুঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীরে ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ الصَّدَفَيْنِ : দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক।

قَوْلُهُ قِطْرًا : অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ دَكَّاءَ : অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাদের কাছের এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই যতটুকু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোনো প্রভাব কুরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মতো তারাও হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে– وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত ও এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁরা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ–

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ভোরবেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। [উদাহরণত সে কানা হবে।] পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। [উদাহরণত জান্নাত ও জাহান্নাম তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনার ফলে [আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম] যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। [অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।] বিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরজ করলাম, আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন যাতে বুঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরো কিছু কথা বলেছেন যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার তুলনায় অন্যান্য ফিতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। [অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।] যদি

আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। [কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।] পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানদের সাহায্যকারী। [তার লক্ষণ এই যে] সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। [এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।] যদি আমি [কুৎসিত চেহারার] কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে কুত্না। [জাহেলিয়াতের আমলে কুৎসিত চেহারায় বনু খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।] যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। [এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।] দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থেকো।

আমরা আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন, সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের [পাঁচ ওয়াক্ত] নামাজই পড়ব? তিনি বললেন, না। বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম! ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন, সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। সে মাটিকে আদেশ দেবে। ফলে সে শস্যশ্যামল হয়ে যাবে। [তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চড়বে।] সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দিবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে, তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে। যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন পরিপূর্ণ যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে। যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে [জীবিত হয়ে] দাজ্জালের কাছে প্রফুল্লচিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দুটি রঙ্গিন চাদর পরে দামেস্কে মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। [মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।] তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুল্লুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। [এই জনপদটি এখনও বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।] তিনি সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শুনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। [সেমতে তিনি তাই করবেন।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাঁদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনোদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পবর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ দীনারের চেয়ে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবেন। [আল্লাহ

তা'আলা দোয়া কবুল করবেন।] তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই। এবং [মৃতদেহ পঁচে] অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। [এ অবস্থা দেখে পুনরায়] হযরত ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবেন। [যেন এ বিপদও দূর করে দেওয়া হয়] আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। [মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবেন।] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন, তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। [ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,] একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। [চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন] আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরমম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো প্রকাশ্যে অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে [যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।]

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন, আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। [একথা শুনে] দাজ্জাল বলবে, লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা, এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে, না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন, এবার আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না। -[মুসলিম]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরজ করবেন, হে পরওয়ারদিগার! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন, চিন্তা করো না। এই নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট একভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। -[রূহুল মা'আনী]

ইবনে কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়াহ' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন, এতে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না। -[মুসলিম ও আহমদ]

বুখারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে। -[মাযহারী]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ تِسْعِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব (রা.) বলেন, একথা শুনে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ ধ্বংস হতে পারে। যদি অনাচারের আধিক্য হয়। -[আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া]

ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। -[ইবনে কাছীর, আবূ হাইয়্যান]

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ জুলকারনাইনের দেয়ালটি খুড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্তসীমায় এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপর পার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে যায় যে, বাকি অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ তা'আলা থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশকে খুঁড়ে উপারে চলে যাব। [আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তৌফিক হয়ে যাবে।] অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে।

তিরমিযী এই রেওয়ায়েতটি اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে রওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, اِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَلٰكِنْ سَنَدَهُ فِىْ رَفْعِهٖ نَكَارَةٌ এই সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে কাছীর 'আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়, বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয় তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা যখন জুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার ওপার ছিদ্র বুঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার ওপার হবে। -[বিদায়া খ. ২, পৃ. ১১২]

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন, তারা সবাই হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বুখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিজা রয়েছে–

১. আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচি আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

২. আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না।

৩. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ' বলার কথা জাগ্রত হলো না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। –[আসারাতুস সারা : সৈয়দ মুহাম্মদ পৃ. ১৫৪]

কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গাম্বরদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কুরআন বলে– وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا এতে বুঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬৩৬-৬৪৩]

জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বিবরণ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে জুলকারনাইনের প্রাচীরের উল্লেখ থাকলেও তার স্থান ও অবস্থানের কোনো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিরিখে কয়েকটি বৃহদাকার প্রাচীরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নিজস্ব ধারণাপ্রসূত ও আনুমানিকভাবে সেগুলোকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী (র.) স্বীয় তাফসীরে হক্কানীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং এইসূত্রে পাঁচটি প্রাচীরের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

১. **চীনের প্রাচীর :** এই প্রাচীরকে চীনের রাজা 'ফাগফূর' হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৩৫ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিল। যার দৈর্ঘ্য ছিল বারশত হতে পনেরশত মাইল পর্যন্ত। সেই প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশে কতিপয় জঙ্গী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, যারা চীনে এসে লুটতরাজ করত। তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হয়। এই বক্তব্য শুদ্ধ নয়। কেননা এই প্রাচীর ইট ও পাথরের দ্বারা নির্মিত ছিল আর তা নির্মাণ করেছিল একজন কাফের বাদশাহ। অথচ জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল লৌহ ও তাম্র দ্বারা নির্মিত এবং তিনি ছিলেন মুসলমান। আর এই ঘটনা হযরত ঈসা (আ.) মাত্র দুশত পয়ত্রিশ বছর পূর্বের। অথচ জুলকারনাইনের ঘটনা তাঁর দুই হাজার বছর পূর্বের।

২. **সমরকন্দের প্রাচীর :** সমরকন্দের নিকট অবস্থিত প্রাচীর। এটি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর যা লোহার পাত এবং ইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত। অনেক উঁচু এবং সুদৃঢ় প্রাচীর এটি। এ প্রাচীরের মধ্যে তালাবদ্ধ একটি ফটকও রয়েছে। খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ স্বপ্নে এ প্রাচীরটিকে ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তা অনুসন্ধানের জন্য পঞ্চাশজন লোকের একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। তারা সে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করে এসে তার বিবরণ প্রদান করেছেন। 'তাঈ' পাহাড়ের গিরিপথ বন্ধ করার জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ এই প্রাচীরকেই জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে মত পেশ করেছেন। ইয়েমেনের কোনো এক হিময়ারী বাদশাহ এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কতিপয় ওলামা বলেছেন যে, এই হিময়ারী বাদশাহই জুলকারনাইন ছিলেন এবং تُبَّعٌ يَمَانِيٌّ তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার উপর তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। এ কারণেই কতিপয় আলেম সমরকন্দের প্রাচীরকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

৩. **আজারবাইজান প্রাচীর :** এ প্রাচীর আজারবাইজানের উপকণ্ঠে بَحِيْرَةُ طَرْسَنَانْ এর পাদদেশে কুবুক পাহাড়ের জেটি ও অন্য জাতির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিলো। এই প্রাচীর আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। পাথর ও সীসা ঢালাই করে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যার উচ্চতা তিনশত গজ বা হাত। বাদশাহ নওশেরওয়া এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। আজও এই প্রাচীর বিদ্যমান। কেউ কেউ এটাকে হযরত জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর বলে ধারণা করে থাকেন।

৪. **তিব্বত প্রাচীর :** তিব্বতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের মাঝে এই প্রাচীর অবস্থিত। এটা হলো খোরাসানের শেষ কিনারা। এই পাদদেশ দিয়ে তুর্কিরা লুণ্ঠন চালাতো। এ কারণে ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বরমকী একটি তোরণ নির্মাণ করে এটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটি কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইনের প্রচীর নয়। কেননা এটা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে নির্মিত হয়েছে।

৫. **এশিয়ার প্রাচীর :** পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চম বৃহত্তর প্রাচীর হলো রোম উপসাগরের পূর্বপ্রান্তরে এশিয়া মাইনরের কোনো এক ভূখণ্ডে অবস্থিত। তবে এটা জানা যায়নি যে, এ প্রাচীর কে কখন নির্মাণ করেছে এবং তা আজও বিদ্যমান রয়েছে কিনা? সর্বসম্মতিক্রমে এটাও কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইনের প্রাচীর নয়।

মোটকথা এ সবগুলোই হলো ঐতিহাসিক কিসসা কাহিনী যা কখনোই নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য হতে পারে না। এগুলোই পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পাঁচটি প্রাচীর। যা ইতিহাস ও ভূগোলের বই পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। লেখকগণ এর মধ্য হতেই কোনো কোনোটিকে স্বীয় ধারণা ও অনুমান নির্ভর করে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রাচীর সাব্যস্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে এই সবগুলো স্বীয় কল্পনাপ্রসূত দাবি। কারো নিকটেই কোনো ধরনের দলিল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তাই কুরআনে বর্ণিত প্রাচীর নির্ধারণের জন্য কুরআন ও হাদীসে এই প্রাচীরের কি কি বৈশিষ্ট বর্ণিত রয়েছে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে যাতে করে এই প্রাচীর নির্ধারণ করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো−

প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য : জুলকারনাইনের নির্মিত এ ঐতিহাসিক প্রাচীরের যে সকল বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই−

১. এই প্রাচীরের নির্মাতা আল্লাহ তা'আলার কোনো মকবুল নেককার বান্দা এবং মর্দে মু'মিন হবেন। তিনি নেক আমলকারী ঈমানদারদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফের ও জালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখাবেন।

২. এর নির্মাতা হবেন এমন এক মর্যাদাবান বাদশাহ, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবাই যার অনুগত থাকবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বপ্রকার জাহেরী ও বাতেনী উপকরণ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন− إِنَّا مَكَّنَّا فِى الْأَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সবাই তার অনুগত হবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং সমর্থনও তাঁর পক্ষে থাকবে, বিজয় ও সফলতার পতাকা তার হাতে থাকবে। তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে নীরব থাকবে।

৩. ধাতুর তৈরি সেই প্রাচীরটি তামা গলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইট অথবা পাথর দ্বারা সেই প্রাচীরের দুই প্রান্ত দুই দিকে দু'টি পাহাড়ের সাথে মিলিত আছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু এবং শক্ত ও সুগঠিত। অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ এত উঁচু প্রাচীর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লৌহ ফলক দিয়ে বানানো হয়েছে এবং যার নির্মাণের সময় এমনভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি লৌহ ফলক প্রজ্বলিত আগুন হয়ে উঠেছে। আবার তার মধ্যে হাজার হাজার টন গলানো সীসা ঢালা হয়েছে এই সকল কর্ম-কাণ্ড স্পষ্টভভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ নয়, এরূপ বিপুল আয়োজনে প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে কোনো প্রাণীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই আগুনের কাছে গিয়ে ফুঁক দিয়ে প্রজ্বলিত করা এবং গলানো তামা তার উপর ঢেলে দেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নয়। সুতরাং এই আশ্চর্যজনক প্রাচীর সম্পর্কে একথা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না যে, এটা সেই নেককার বাদশাহর একটি কারামত ছিল অথবা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে এটা ছিল তার একটি মু'জিজা। কারণ যখন এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত

লোহার প্রাচীর আগুনে পরিণত হয়ে যায় তখন কারো ক্ষমতা থাকে না যে তার নিকটে গিয়ে তার উপরে গলানো সীসা ঢালতে পারে। এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত যে তিনি এই কাজে নিয়োজিত লোকদের দেহ আগুনের প্রচণ্ড তাপ থেকে হেফাজত করেছেন এবং তারা এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. এই ধাতু নির্মিত প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ আবদ্ধ আছে। তারা এর উপর আরোহণও করতে পারে না এবং কোনো সিঁড়ি লাগিয়ে সেখান থেকে এপারে নেমেও আসতে পারে না। এই প্রাচীরে তারা কোনো ছিদ্রও করতে পারে না। তবে কিয়ামতের কাছাকাছি এক সময়ে তারা এই প্রাচীর ছিদ্র করে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ রয়েছে।

৬. হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, হুজুর পাক ﷺ -এর জমানায় এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ সামান্য ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছে।

৭. সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন বের হয়ে আসার জন্যে এই প্রাচীরটি খুঁড়তে থাকে। কিন্তু প্রাচীরটি আবার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পূর্বের ন্যায় পুরু এবং মোটা হয়ে যায়। তবে কিয়ামতের পূর্বে তারা একদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলে সেই প্রাচীরটি খুঁড়তে শুরু করবে। তখন ইনশাআল্লাহ -এর বরকতে সেই প্রাচীরে প্রশস্ত এক ছিদ্র হয়ে যাবে এবং পরের দিন তারা প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে সক্ষম হবে।

৮. ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চেয়েও তারা শক্তিতে অনেক বেশি হবে এবং সংখ্যার দিক থেকে তারা এত অধিক হবে যে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আদম সন্তানের মধ্যে সেইরূপ আনুপাতিক হার হবে যেরূপ এক হাজার এবং এক এর অনুপাত। এরা সবাই কাফের সুতরাং সবাই জাহান্নামী।

৯. ইয়াজুজ-মাজুজের বহির্গমন হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের জামানায়। সেই সময় হযরত ঈসা (আ.) তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগণকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা কোনো দূর্গ অথবা বাড়িতে হেফাজতে থাকবে।

১০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বদদোয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ অস্বাভাবিকভাবে একসঙ্গে সবাই মারা যাবে। তাদের ঘাড়ে আল্লাহ তা'আলা মহামারী স্বরূপ এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দিবেন যার কারণে তাদের মৃত্যু হবে।

এই দশটি বৈশিষ্ট্য হলো সেই প্রাচীরের। প্রথম পাঁচটি বৈশিষ্ট কুরআন পাকে উল্লেখ হয়েছে এবং পরের পাঁচটি বিখ্যাত হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। −[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪ পৃ. ৪৫৮-৪৫৯]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এবং ভূগোল বিশারদগণ একটি সন্দেহ উত্থাপন করে থাকেন যে, আমরা সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তো জুলকারনাইনের প্রাচীর দেখতে পাইনি এবং কোথাও ইয়াজুজ-মাজুজের সন্ধানও পাইনি।

এই সন্দেহের জবাবে আমাদের কিছু কিছু গ্রন্থকার যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং গবেষণায় আগ্রহী, তারা সেই প্রাচীরটির সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এর প্রকৃত জবাব তাই হবে যা, আল্লামা আলুসী (র.) তার তফসীরগ্রন্থে লিখেছেন এবং আল-হুছুনুল হামিদিয়া গ্রন্থে আল্লামা হুসাইন জসর তরাবলুসী উল্লেখ করেছেন। জবাবে বলা হয়েছে যে, যে প্রাচীর এবং যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। এ বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ। তবে প্রাচীরটির অবস্থানস্থল আমাদের জানা নেই। এটা সম্ভব যে আমাদের এবং সেই কওম ও প্রাচীরের মাঝখানে বড় বড় পাহাড় এবং বড় বড় সমুদ্রের আড়াল হয়ে রয়েছে। কথাটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর ভূগোল বিশারদগণ যে বলেছেন, আমরা সারা দুনিয়ায় তা তন্ন করে খুঁজেছি এবং আমরা দুনিয়ার স্থল-ভাগ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল কোথাও বাকি রাখিনি। কথাটি নিছক অযৌক্তিক, তাই এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সকল ভূ-পৃষ্ঠের খোঁজ করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বসবাসযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠ দেখাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল এখনও এমন আছে যেখানে আজও মানুষ পদচারণা করতে পারেনি। এখনও ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব পাহাড় এবং উপত্যকা রয়ে গেছে যেখানে এই সকল ভূ-তত্ত্ববিদ পৌঁছতে পারেননি। বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। সেখানে বরফে ঢাকা এমন সব পাহাড় বিদ্যমান আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। একথা ভূ-তত্ত্ববিদগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলেও এই জাতি থাকতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই নয়।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানচিত্র যারা দেখেছেন তারা জানেন যে, সাইবেরিয়ার পরে উত্তর দিকে যে সকল বরফের পাহাড় রয়েছে সেগুলো বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে এবং কোনো মানুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। এই সকল পাহাড়ের ওপারে মাটি বিদ্যমান রয়েছে। সেই জমিন প্রশস্ত রেখার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই সকল বরফের পাহাড়ের নীচে কোনো নীচু ভূমি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। নীচু এবং সমতল হওয়ার কারণে এই ভূমিতে বরফ এতটা কম থাকতে পারে যা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। আর সেখানেই হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি বসবাস করছে। আমাদের এবং তাদের মাঝখানে এভাবেই সমুদ্র অথবা বরফের পাহাড় আড়াল হয়ে রয়েছে। তবে জুলকারনাইনের যুগে হয়তো কোনো উপত্যকা পথে রাস্তা ছিল। আর ইয়াজুজ-মাজুজ সেই পথে পাহাড়ের দিক থেকে এসে আশেপাশের লোকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতো। আর জুলকারনাইন এই অবস্থা দেখে উপত্যকার রাস্তা প্রাচীরের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়ে পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাদেরকে ধাওয়া করে দেন। এরপর সেই প্রাচীরের কারণে তাদের এদিকে আসা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন হয়তো বায়ুমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলীয় কোনো ঘটনার কারণে বরফ গলে যাবে এবং তখন ইয়াজুজ-মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর লোকদের দিকে চলে আসবে এবং এখানে এসে উৎপাত চালাবে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কুরআন ও হাদীসে একথার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

মোটকথা কুরআন এবং হাদীসে যে বিষয়ের খবর দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং যা সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং যা সন্দেহাতীতভাবে শরিয়ত সম্মত তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যেই আমরা বিশ্বাস করি যে, কিয়ামতের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে জুলকারনাইনের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে। আর এই যে, ভূ-গোল বিশারদ এবং গবেষকদের দাবি যে তারা দুনিয়ার সমগ্র ভূ-খণ্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে পড়েছেন– এই দাবির সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন : পারা– ১৬, পৃ. ৩৫ - ৩৭]

জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরিউক্ত প্রাচীরসমূহের কোনোটিই স্বীকার করে না। তারা একথাও স্বীকার করে না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কুরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াজ ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কেনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে জুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোনো কোনো গোত্র এপারে চলে এসেছে, একথা বলাও কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থি নয়, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনো হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই, ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোনো গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ মাজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে যাবে। কুরআন ও হাদীসের কোনো অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থি নয়। জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে। এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন পাকের আয়াত فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ অর্থাৎ জুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে [অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে] তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে وَعْدُ رَبِّىْ [আমার পালনকর্তার ওয়াদা] এর অর্থ কিয়ামত নেওয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের ভাষ্য এই অর্থে অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, জুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরি নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরি নয়। সেমতে সব তাফসীরবিদই وَعْدُ رَبِّىْ -এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে– وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ اَنْ يُرَادَ بِهٖ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَاَنْ يُرَادَ بِهٖ وَقْتُ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরির তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও রক্তপাতের মাধ্যমে হবে যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে; বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামি দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসীর অনুযায়ী তারা এখন পর্যন্ত এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে مَنْقُوْل দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনই কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোনো প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীস এর পরিপন্থি নয়।

মোটকথা! কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোনো প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামূলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফায়সালা করা যায় না, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরি। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬৪৯ – ৬৫০]

অনুবাদ :

٩٩. قَالَ تَعَالٰى وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوْجِهِمْ يَمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ يَخْتَلِطُ بِهٖ لِكَثْرَتِهِمْ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ اَىِ الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ فَجَمَعْنٰهُمْ اَىِ الْخَلَائِقَ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَمْعًا .

৯৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেদিন তাদের বের হওয়ার দিন আমি তাদেরকেও এ অবস্থায় ছেড়ে দিব যে, তাদের একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। এবং সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে পুনরুত্থানের জন্য। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজীবকে কিয়ামতের দিন একইস্থানে।

١٠٠. وَعَرَضْنَا قَرَّبْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا .

১০০. এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। নিকটবর্তী করব কাফেরদের নিকট।

١٠١. اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ اَىِ الْقُرْاٰنِ فَهُمْ عُمْىٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهٖ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا . اَىْ لَا يَقْدِرُوْنَ اَنْ يَسْمَعُوْا مِنَ النَّبِيِّ مَا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ بُغْضًا لَهٗ فَلَا يُؤْمِنُوْا بِهٖ .

১০১. যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ এটা اَلْكَافِرِيْنَ হতে بَدَلٌ হয়েছে আমার নিদর্শনের প্রতি অর্থাৎ কুরআন থেকে গাফিল বা অমনোযোগী ছিল। তারা অন্ধ, কুরআন থেকে হেদায়েত অর্জন করেনি। এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে এই কুরআনের বাণীকে শুনতেও তারা প্রস্তুত ছিল না ছিল না। ফলে তারা ঈমানের মহান দৌলত লাভেও ব্যর্থ হয়েছে।

١٠٢. اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ اَىْ مَلٰٓئِكَتِىْ وَعِيْسٰى وَعُزَيْرًا مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ط اَرْبَابًا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ لِيَتَّخِذُوْا وَالْمَفْعُوْلُ الثَّانِى لِحَسِبَ مَحْذُوْفٌ الْمَعْنٰى اَظَنُّوْا اَنَّ الْاِتِّخَاذَ الْمَذْكُوْرَ لَا يُغْضِبُنِىْ وَلَا اُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ كَلَّا اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ هٰؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ نُزُلًا . اَىْ هِىَ مُعَدَّةٌ لَهُمْ كَالنُّزُلِ الْمُعَدِّ لِلضَّيْفِ .

১০২. যারা কুফরি করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার বান্দাদেরকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত উযাইর (আ.)-কে আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে اَوْلِيَآءَ শব্দটি يَتَّخِذُوْا -এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর حَسِبَ -এর মাফঊলে ছানী উহ্য রয়েছে। আর আয়াতের অর্থ হচ্ছে– কাফেররা কি আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটা মনে করছে যে, এই বিষয়টি আমাকে ক্রোধান্বিত করবে না? এবং আমি তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করব না? কক্ষনো নয়। নিশ্চয় আমি কাফেরদের এ সকল কাফের ও অন্যান্য কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি যেমনভাবে পৃথিবীতে মেহমানদের জন্য মেহমানখানা তৈরি করে প্রস্তুত রাখা হয়।

অনুবাদ :

١٠٣. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ط تَمْيِيْزٌ طَابَقَ الْمُمَيَّزَ وَبَيَّنَهُمْ بِقَوْلِهِ.

১০৩. বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? اَعْمَالًا এটা تَمْيِيْز যা مُمَيَّز -এর অনুরূপ হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পরবর্তী আয়াত اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

١٠٤. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بَطَلَ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا عَمَلًا يُجَازَوْنَ عَلَيْهِ.

১০৪. এরাই তারা পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়। তাদের আমল বাতিল ও রহিত হয়ে যায়। যদিও তারা মনে করে ধারণা করে যে, তারা সৎকর্মই করছে। এমন কাজ করছে, যার বিনিময়ে তাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে।

١٠٥. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ بِدَلَائِلِ تَوْحِيْدِهٖ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِهٖ وَلِقَائِهٖ اَىْ وَبِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ بَطَلَتْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا. اَىْ لَا نَجْعَلُ لَهُمْ قَدْرًا.

১০৫. এরাই তারা যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি কুরআন ও অন্যান্যভাবে প্রদত্ত তার একত্ববাদের প্রমাণাদি। ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয় অর্থাৎ পুনরুত্থান, হিসাব, প্রতিদান দান ও শাস্তি প্রদানকে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো ব্যবস্থা রাখব না। অর্থাৎ আমি তাদের আমলের সামান্যতম পরিমাণও মূল্যায়ন করব না। অর্থাৎ

١٠٦. ذٰلِكَ اَىِ الْاَمْرُ الَّذِىْ ذُكِرَتْ مِنْ حُبُوْطِ اَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهٖ وَابْتِدَاءُ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا اٰيَاتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا. اَىْ مَهْزُوًّا بِهِمَا.

১০৬. এটাই অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আমল রহিত হওয়া ইত্যাদি। আর جَزَاؤُهُمْ হলো جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة তাদের প্রতিফল জাহান্নাম, যেহেতু তারা কুফরি করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ। অর্থাৎ উপহাসের পাত্র বানিয়েছে।

١٠٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ هُوَ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَاهَا وَالْاِضَافَةُ اِلَيْهِ لِلْبَيَانِ نُزُلًا. مَنْزِلًا.

১০৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান। জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সকল জান্নাতের মধ্যমণি ও সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাত। আর جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ -এর মধ্যে اِضَافَت بَيَانِيَّة হয়েছে।

অনুবাদ :

١٠٨. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ يَطْلُبُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا . تَحَوُّلًا اِلٰى غَيْرِهَا .

১০৮. তারা সেথায় স্থায়ী হবে। তা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না। অর্থাৎ অন্য কোনো জায়গা খোঁজ করবে না।

١٠٩. قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ اَىْ مَاؤُهٗ مِدَادًا هُوَ مَا يُكْتَبُ بِهٖ لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ الدَّالَّةِ عَلٰى حُكْمِهٖ وَعَجَائِبِهٖ بِاَنْ تُكْتَبَ بِهٖ لَنَفِدَ الْبَحْرُ فِىْ كِتَابَتِهَا قَبْلَ اَنْ يَنْفَدَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَفْرُغَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ اَىِ الْبَحْرِ مَدَدًا . زِيَادَةً فِيْهِ لَنَفِدَ وَلَمْ تَفْرُغْ هِىَ وَ نَصْبُهٗ عَلَى التَّمْيِيْزِ .

১০৯. বলুন, সমুদ্র যদি হয় অর্থাৎ সমুদ্রের পানি কালি যার দ্বারা লিখা হয় আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য যা তাঁর প্রজ্ঞা ও عَجَائِبٌ -কে বুঝায় যে তা দ্বারা তা লিখা হবে তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি এর সাহায্যে অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও। تَنْفَدَ শব্দটি يَاء ও تَاء উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ এই সমুদ্রের সাথে যদি আরো সমুদ্রও যুক্ত করা হয় তবুও আমার প্রতিপালকের কালেমা শেষ হওয়ার পূর্বেই ঐ সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। আর আমার প্রতিপালকের কালেমা শেষ হবে না। مِدَاد শব্দটি تَمْيِيْز -এর ভিত্তিতে نَصَبْ যুক্ত হয়েছে।

١١٠. قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ اٰدَمِىٌّ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج اِنَّ الْمَكْفُوْفَةَ بِمَا بَاقِيَةٌ عَلٰى مَصْدَرِيَّتِهَا وَالْمَعْنٰى يُوْحٰى اِلَىَّ وَاحْدَانِيَّةُ الْاِلٰهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا يَاْمُلُ لِقَآءَ رَبِّهٖ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَىْ فِيْهَا بِاَنْ يُرَائِىْ اَحَدًا .

১১০. আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। اِنَّ যার উপর مَائے كَافَّة এসেছে সেটা তার مَصْدَرِيَّتْ -এর উপর অবশিষ্ট রয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রত্যাদেশ করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে পুনরুত্থান ও প্রতিদানের মাধ্যমে। সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে অর্থাৎ লৌকিকতা ও রিয়া যেন ইবাদতের মধ্যে না করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قَالَ تَعَالٰى : এ বাক্যের দ্বারা মুফাসসির (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জুলকারনাইনের আলোচনা এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। এখন وَتَرَكْنَا হতে আল্লাহ তা'আলার কালাম শুরু হচ্ছে।

قَوْلُهٗ يَوْمَئِذٍ : এর তাফসীর يَوْمَ خُرُوْجِهِمْ দ্বারা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা কতিপয় মুফাসসির يومئذ দ্বারা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার দিন উদ্দেশ্য করেছেন। যার কারণে পরস্পর ঝগড়া ঝাটিতে লেগে যায়। কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, يَوْمَئِذٍ দ্বারা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালকে হত্যার পর বের হওয়া উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ (র.)-এর নিকট যেহেতু দ্বিতীয় অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে এজন্য তিনি يَوْمَئِذٍ -এর তাফসীর يَوْمَ خُرُوْجِهِمْ দ্বারা করে স্বীয় মনোপুত মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করে দেন। যদিও প্রথম অভিমতটি মুহাক্কিকগণের নিকট অধিক অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ يَمُوْجُ : এটা বাবে نَصَرَ হতে অর্থ- ঢেউ খেলা, তরঙ্গায়িত হওয়া, ঢেউ উঠা।

এটা تَرَكْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল আর بَعْضَهُمْ হলো প্রথম মাফউল। আর تَرَكْنَا হচ্ছে جَعَلْنَا অর্থে। আর يَوْمَئِذٍ এটা يَمُوْجُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ : এর তাফসীর اَلْقَرْنِ لِلْبَعْثِ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে ফুৎকার দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। কেননা প্রথম ফুৎকারতো হবে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। আর فَجَمَعْنَا -এর فَائِى تَعْقِيْبِيَّه -ও এটাই বুঝাচ্ছে।

قَوْلُهُ غِطَاءٍ : এর অর্থ যদিও ঘোমটা; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো গাফলত, বেখেয়ালী ও অলসতা।

قَوْلُهُ عَرَضْنَا : এর তাফসীর قَرَّبْنَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো عَرَضْنَا -এর صِلَةْ -তে যে لَامْ এসেছে, এটাকে বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করা। মূলত عَرَضْنَا -এর صِلَه আসে عَلٰى

قَوْلُهُ كَانُوْا : كَانُوْا -এর আতফ كَانَتْ -এর উপর হয়েছে। এরপর পূর্ণ জুমলা اَلْكَافِرُوْنَ সিফত হয়েছে। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর উপর حَسِبَ -এর ফায়েল হয়েছে। আর فَاء হলো عَاطِفَةْ মূল ইবারত হবে اَكَفَرُوْا فَحَسِبُوْا আর এটা اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَتَّخِذُوْا : এটা حَسِبَ -এর مَفْعُوْل بِه যা দুটি মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। আর عِبَادِىْ এটা يَتَّخِذُ -এর প্রথম মাফউল। আর اَوْلِيَاءَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর مِنْ دُوْنِىْ এটা عِبَادِىْ থেকে حَالْ হয়েছে। আবার حَسِبَ -এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্যও হতে পারে যেমনটি ব্যাখ্যাকারের অভিমত।

قَوْلُهُ اَعْمَالًا : اَعْمَالًا এটা تَمْيِيْز হয়েছে। বহুবচন। হয়তো مُشَاكَلَتْ -এর ভিত্তিতে হয়েছে। অথবা আমলের প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। অথচ تَمْيِيْز -এর ক্ষেত্রে মূল হলো مُفْرَدْ বা একবচন হওয়া।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ : এটা তার সেলাহসহ উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُمُ الَّذِيْنَ এটা جُمْلَةَ مُسْتَاْنِفَةَ হয়েছে এবং مَنْ هُمْ -এর জবাবে হয়েছে। আবার اَلَّذِيْنَ এটা اَلْاَخْسَرِيْنَ -এর সিফত, বদল এবং عَطْف بَيَانْ -ও হতে পারে।

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ বাক্যটি ضَلَّ -এর ফায়েল থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : ذَالِكَ -এর পরে اَلْاَمْرُ الَّذِىْ ذُكِرَتْ الخ বৃদ্ধি করার একটি উদ্দেশ্য তো এটাও হতে পারে যে, ذَالِكَ এটা اَلْاَمْرُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ذَالِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ধারণ করা।

قَوْلُهُ ذَالِكَ جَزَائُهُمْ : এখানে তারকীবের দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. ذَالِكَ এটা اَلْاَمْرُ উহ্য মুবতাদার খবর, অর্থাৎ اَلْاَمْرُ ذَالِكَ আর جَزَائُهُمْ হলো একটি পৃথক বাক্য।

২. ذَالِكَ হলো প্রথম মুবতাদা। আর جَزَاؤُهُمْ দ্বিতীয় মুবতাদা। جَهَنَّمُ তার খবর। مُبْتَدَأ ثَانِىْ স্বীয় খবরকে নিয়ে جُمْلَةَ হয়ে خَبَرْ হলো প্রথম মুবতাদার। আর عَائِدْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَزَاؤُهُمْ بِه

৩. ذَالِكَ এটা মুবতাদা আর جَزَاؤُهُمْ হলো তার بَدْل অথবা عَطْف بَيَانْ এখন مُبْدَلْ مِنْه ও مُبْدَلْ بَدْل অথবা مُبَيَّنْ ও بَيَانْ মিলে مُبْتَدَأ আর جَهَنَّمُ হলো তার খবর।

৪. ذَالِكَ হলো মুবতাদা আর جَزَاؤُهُمْ হলো مُبْدَلْ مِنْه এবং جَهَنَّمُ তার বদল। مُبْدَلْ مِنْه এবং بَدْل মিলে جُمْلَةَ হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ نُزُلًا : এটা كَانَتْ-এর খবর হয়েছে। আর যদি لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম হয় তাহলে نُزُلًا এটা حَالٌ হবে। خَالِدِيْنَ হলো حَالٌ مُقَدَّرَة আর لَا يَبْغُوْنَ হলো দ্বিতীয় حَالٌ

قَوْلُهُ حِوَلًا : এটা حَوْلٌ থেকে اِسْم مَصْدَرْ অর্থ হলো- এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া।

قَوْلُهُ لِكَلِمَاتِ رَبِّىْ : এতে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لِكِتَابَةِ كَلِمَاتٍ

قَوْلُهُ اَنْ تَنْفَدَ : এটা بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে قَبْلَ-এর মুযাফ ইলাইহি হয়েছে।

قَوْلُهُ مَدَدًا : এটা تَمْيِيْز হয়েছে। অর্থ- বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত, সংযুক্ত করা।

قَوْلُهُ اِنَّمَا : اِنَّمَا-এর মধ্যে مَا টা হলো مَائِى كَافَّة যা শব্দের মধ্যে اِنَّ-এর আমল করাকে আটকে দিয়েছে। উভয়টি মিলে كَلِمَة حَصْر হয়ে গেছে। উভয়টির مَعْنَوِىْ আমল অবশিষ্ট রয়েছে। اِنَّ-এর আমল হলো বাক্যে তাকিদ সৃষ্টি করা। আর اِنَّ টা বাক্যের তাকিদের সাথে সাথে তার পরবর্তী অংশকে مُفْرَدْ-এর হুকুম বানিয়ে দেয়। নাহুবিদ ইবনে হিশাম [মৃত. ৭৬১ হি.] مَغْنَى اللَّبِيْب গ্রন্থে লিখেছেন মূলত اَنَّ টা اِنَّ-এর শাখা। এ কারণেই আল্লামা যমখশরী (র.)-এর দাবি اَنَّمَا টা اِنَّمَا-এর মতো حَصْر-এর ফায়দা দেয়। এটা বিশুদ্ধ। আর উল্লিখিত উভয় حَصْر-এর শব্দ উল্লিখিত আয়াতে একত্র হয়েছে। প্রথম শব্দ সিফতকে মওসূফের উপর সীমাবদ্ধ করার জন্য আর দ্বিতীয়টা এর বিপরীত।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ : এর মধ্যে সম্বোধিতগণ যেমন بَشَرِيَّتْ সিফতটি হলো مَقْصُوْد আর اَنَا মওসূফ হলো مَقْصُوْد عَلَيْه আর اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ-এর মধ্যে সত্য মা'বুদ আল্লাহ তা'আলা [মওসূফ] হলো مَقْصُوْد আর وَحْدَانِيَّةٌ তথা একত্ববাদ [সিফত] হলো مَقْصُوْد عَلَيْه এখন বাক্যের অর্থ হলো- আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ তা'আলার সকল বিষয় আমার জানা নেই। যেমন তোমরা জান না। আমি তো শুধুমাত্র ততটুকুই জানি যা আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো সত্য মা'বুদ তথা আল্লাহ তা'আলার শুধুমাত্র وَحْدَانِيَّةٌ তথা একত্ববাদের গুণই রয়েছে, تَعَدُّدْ-এর সিফত নেই। যেমনটি অংশীবাদীরা ধারণা করে।

قَوْلُهُ مِثْلُكُمْ : এটা بَشَرٌ-এর সিফত আর اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ এটা بِتَاوِيْل مُفْرَدْ হয়ে يُوْحٰى-এর نَائِب فَاعِلٌ আর لِيَعْمَلْ এটা اَمْر غَائِبْ-এর সীগাহ।

قَوْلُهُ وَلِقَائَهُ اَىْ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالثَّوَابِ : মুসান্নিফ (র.) لِقَاء-এর তাফসীরে উল্লিখিত শব্দগুলো এনে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, لِقَاء-এর অর্থ হলো اِتِّصَالٌ এবং وُصُوْلٌ আর এ অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব। কেননা اِتِّصَالٌ এবং وُصُوْلٌ হলো جِسْمَانِيَّتْ-এর সিফত। আর আল্লাহ তা'আলা جِسْم হতে পবিত্র। এ কারণেই বিজ্ঞ মুফাসসির لِقَاء-এর তাফসীরে اَلْبَعْثُ ـ اَلْحِسَابُ ـ اَلثَّوَابُ শব্দগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

قوله لَا نَجْعَلُ لَهُمْ قَدْرًا : فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ وَزْنًا দ্বারা-এর তাফসীর করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয় আয়াতে সকলের আমল ওজন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে না।

জবাবের সারকথা হলো- এখানে পরিমাপ না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের আমলের মূল্যায়ন করা হবে না। আর এই প্রশ্নকে প্রতিহত করার জন্যই কেউ কেউ وَزْنًا এর পরে نَافِعًا সিফত উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ পরিমাপ তো করা হবে কিন্তু তা উপকারী ও কল্যাণকর হবে না।

قَوْلُهُ وَابْتِدَاءٌ : মুফাসসির (র.) وَابْتِدَاءٌ শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বাক্যটি جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة অর্থাৎ جَزَاؤُهُمْ হলো মুবতাদা এবং جَهَنَّمُ হলো তার খবর। এর বিপরীতও বৈধ।

قَوْلُهُ مَهْزُوًا : মুফাসসির (র.) هُزُوًا -এর তাফসীর مَهْزُوًّا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখানে اِسْم مَفْعُوْل-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতে প্রবেশ তো হবে ভবিষ্যৎ কালে। কিন্তু এখানে مَاضِى كَانَتْ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতে প্রবেশ করে ফেলেছে। এর জবাবের সারকথা হলো– বাস্তবিক পক্ষে তো ভবিষ্যতকালেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে عِلْم اَزَلِىْ হিসেবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مَاءُهُ : مَاءُهُ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুযাফ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لَنَفِدَ : لنفد উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَوْ হলো شَرْطِيَّة আর তার জবাব হলো لَنَفِدَ

قَوْلُهُ لَمْ تَفْرُغْ : لَمْ تَفْرُغْ বৃদ্ধি করা দ্বারাও একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দেওয়া উদ্দেশ্য। আর তা হলো উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার كَلِمَات-ও এক সময় শেষ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের পরিসমাপ্তির পরেই হোক না কেন। জবাবের সারমর্ম হলো قَبْلَ শব্দটি غَيْر -এর অর্থে হয়েছে। আর তখন كَلِمَات رَبّ শেষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ : তাফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। যখন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, তখন যেহেতু তারা বের হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই ভিড়ের কারণে একজন আরেকজনের উপর পতিত হয়। অথবা এর অর্থ হলো, যখন আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিয়ামতের পূর্বে তারা জুলকারনাইন নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাচীর ভেঙ্গে বের হবে তখন তরঙ্গের ন্যায় তারা বের হবে এবং একের উপর অন্যে পতিত হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করবে, সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে, জীবজন্তু কীট-পতঙ্গ এমনকি মানুষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। শুধু মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যের আগে যেতে চাইবে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর পতিত হবে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই ঘটনা তখন ঘটবে যখন কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় আসবে, সমগ্র মানবজাতি কবর থেকে বের হয়ে আসবে। আর জিনরাও এসে মানুষের সাথে ভীড় জমাবে, আর সকলেই সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত এবং হতবাক হবে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী বাক্যে। ইরশাদ হচ্ছে– وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا
অর্থাৎ আর কবর থেকে মৃতদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর হিসাব, পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আমি সকলকে একত্র করবো। হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

–[তাফসীরে কবীর খ. ২১, পৃ. ১৭২, তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৭৬, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ২৭৭]

বর্ণিত আছে যে হযরত ইসরাফীল (আ.) সমগ্র মানবজাতিকে হাশরের ময়দানে একত্র করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে শান্তিতে বসবো? শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা মাথা নত করে শিঙ্গা মুখে ধারণ করে অপেক্ষা করছে, কখন হুকুম হবে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দিবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ অবস্থায় আমরা কি বলবো? তখন তিনি ইরশাদ করলেন– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا
আর এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা হয়েছে– وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

অর্থাৎ আর আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, একজনও বাদ থাকবে না। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর, [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ১৩]

قَوْلُهُ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا الخ : যেহেতু আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্যেই দোজখ তৈরি করা হয়েছে। তাই বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে দোজখের উল্লেখ করা হয়েছে। এ জীবনে যাদের চক্ষু ও কর্ণে পর্দা পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখেও তারা দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করার

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেনি, কিয়ামতের দিন তাদের চোখ খুলবে এবং প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দোজখ অবশ্যই তাদের সম্মুখে দেখতে পাবে।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করতো না, প্রিয়নবী ﷺ -এর অনিন্দ সুন্দর আদর্শের অনুসরণ করতো না, তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : সূরা কাহাফের প্রারম্ভে তাওহীদ, রিসালত এবং আখিরাতের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। আর এই তিনটি বিষয় দ্বারাই সূরা সমাপ্ত করা হচ্ছে। যারা জিদ, হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধান গ্রহণে বিমুখ হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৪]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন এভাবে যে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জিকির থেকে বিমুখ হয়েছে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর মহান বাণী গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

—[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৭৩]

قَوْلُهُ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْ اَوْلِيَاءَ : কাফের মুশরিক নাস্তিকরা কি এই ধারণা করে যে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে তার বান্দাদের ইবাদত করে আল্লাহ পাকের কঠিন আজাব থেকে তারা রক্ষা পাবে? কখনো তা হবে না- তথা তারা কখনো তাদের জন্য নির্ধারিত আজাব থেকে কোনো অবস্থাতেই রক্ষা পাবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عِبَادِىْ শব্দ দ্বারা ফেরেশতা, হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কোনো কাফের হযরত ঈসা (আ.)-এর আর কোনো কোনো কাফের হযরত উজাইর (আ.)-এর এবং কেউ ফেরেশতাদের উপাসনা করে মনে করতো যে, তারা এভাবে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে নাজাত পেয়ে যাবে, অথচ এটি ছিল তাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন— عِبَادِىْ -এর দ্বারা সেই শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কাফেররা যাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, কাফেররা যে মূর্তির পূজা অর্চনা করে, এই শব্দ দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে যাদের বন্দেগী করে, তারা কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে রেহাই দিতে পারবে না। যদি তারা এই ভুয়া উপাস্যদের আশায় বসে থাকে, তবে তাদের জানা উচিত যে, اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য দোজখকে প্রস্তুত করে রেখেছি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করেই نُزُلًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের আদর আপ্যায়নের জন্য দোজখের অগ্নিশিখা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাদের কুফর শিরক, নাস্তিকতা এবং নাফরমানির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তারা ভোগ করবে দোজখের কঠিন কঠোর শাস্তি। এই শাস্তি হবে চিরস্থায়ী, কখনো তারা এই শাস্তি থেকে নাজাত পাবে না। কখনো তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। কেননা শিরক ও কুফরকে ক্ষমা করা হবে না বলে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না।

قَوْلُهُ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا .... يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا - সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, এই আয়াতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক বলতে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে, এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে থাকে। অথচ এদের প্রত্যেকের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত বলতে সেই

সকল পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা তাদের নিজের ধারণায় মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে। কেননা তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে বিরত রয়েছে, অথচ ইসলামি শরিয়তকে তারা অস্বীকার করছে, এমনি অবস্থায় তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এই কথাটির তাৎপর্য হলো খারেজী ফেরকা। কেননা খারেজীরাই প্রথম দল যারা সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো এই যে, আলোচ্য আয়াতে বেদআতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর মো'তাযিলা, রাফেজী, খারেজী এবং আহলে সুন্নতের বিরোধী সকল সম্প্রদায় এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না, যারা পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করে, আর যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো দু'দিনের এ জীবনের সাফল্য লাভ করা, আর যাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দুনিয়ার এই জীবনে উপকৃত হওয়া। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

অর্থাৎ তারাই সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে তারা অস্বীকার করেছে। আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে সেসব লোকদের প্রতিও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা আখিরাতের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও দুনিয়ার কাজকে প্রাধান্য দেয়, আখিরাতের কাজকে ভুলে যায়। কেননা আখিরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য যে সম্বল সংগ্রহ করবে না সে আখিরাতের নিয়ামত থেকে মাহরুম হবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সর্বাধিক বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা করেছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ব্যাপারে গাফেল রয়েছে এবং যা ইচ্ছা জীবনে তা করেছে এবং একথা মনে করেছে যে আল্লাহ তা'আলা তো মাফ করেই দিবেন। কারণ তিনি তো রহীম, তিনিতো করীম। -[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

যদি এই আয়াত দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে- كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

বাক্যটির অর্থ হবে যদিও তারা কিয়ামতের সার্বিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে, অথবা তাদের জন্য যে আজাব আখিরাতে অপেক্ষা করছে তা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - কিয়ামতের দিন কাফেরদের আমল ওজন করা হবে না : এমন অবস্থায় তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না। কেননা নেক আমল এবং বদ আমল যদি এক সঙ্গে থাকে তবে তার ওজনের প্রয়োজন। নেক ও বদ কোন আমল অধিক তা প্রমান করার জন্যে ওজন করার প্রয়োজন। যখন তারা কোনো আমলই থাকবে না তখন তার আমল ওজনও করা হবে না। কেননা যদি তারা কোনো ভালো কাজ করেও থাকে, কিন্তু ভালো কাজ কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। অথচ তারা ছিল কাফের। আর ওজন না করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের কোনো গুরুত্বই নেই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো কোনো মোটা লোক এমন অবস্থায় হাজির হবে যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মাছির একটি ডানার সমানও তাদের ওজন হবে না। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আবূ নু'আঈম (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী মানুষকে কিয়ামতের দিন পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন একটি শস্যদানার সমানও হবে না। ফেরেশতাগণ এমনি সত্তর হাজার মানুষকে এক ধাক্কায় দোজখে ফেলে দিবেন।

অথবা এই আয়াতের অর্থ হলো তাদের আমল পরিমাপের জন্য পাল্লাই রাখা হবে না এবং তাদের আমল ওজন না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা এর অর্থ হলো, যেসব আমলকে তারা নেকী মনে করে, নেক আমলের পাল্লায় সেগুলোর কোনো ওজনই হবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন লোকেরা এমন আমল নিয়ে হাজির হবে যা তাদের ধারণায় তেহামা পাহাড়ের সমান বড় হবে। কিন্তু পাল্লায় তোলার পর তার কোনো ওজনই হবে না। আলোচ্য আয়াত– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ -এর অর্থ এটিই।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন শুধু মুমিনদের আমল পরিমাপ হবে এবং কাফেরদের আমলের পরিমাপ হবে না। এই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। যারা বলেন যে, কাফেরদের আমলের ওজন হবে না। তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। আর যারা বলেন, কাফেরদেরও আমলের ওজন হবে, তারা আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতের এই অর্থ নয় যে, কাফেরদের আমলের পরিমাপ করা হবে না; বরং এর অর্থ হলো তাদের আমলের কোনো গুরুত্ব হবে না। কেননা অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আর যাদের আমলের ওজন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো। –[সূরা আরাফ : ৯]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইমাম কুরতবী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকের আমলের ওজন হওয়া জরুরি নয়। প্রত্যেক মু'মিনেরও নয় এবং কাফেরেরও নয়। কেননা যেসব মু'মিন বে-হিসাব জান্নাতে যাবেন তাদের আমলের ওজন হবে না। [যখন হিসাবই হবে না তখন আমলের ওজনের কোনো প্রশ্ন উঠে না।] এমনিভাবে কিছু কাফেরও বিনা হিসাবে দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে তাদেরও আমলের ওজন হবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ـ

অর্থাৎ পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পাও মাথার ঝুটি ধরে।

–[সূরা আর রাহমান : ৪১]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন যে, ইমাম কুরতুবী (র.)-এর এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যাদেরকে অবিলম্বে দোজখে প্রেরণ করা হবে তাদের আমলের ওজন করা হবে না। অবশিষ্ট কাফেরদের আমলের ওজন করা হবে।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭ পৃ. ২৭৯-৮০, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৭৮]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন তাদের আমলের কোনো গুরুত্ব হবে না। তাদের কুফরি এবং নাফরমানির কারণে তাদের ভালো কাজগুলো প্রাণহীন হবে। তাদের পুণ্যকর্মে কোনো ওজন থাকবে না। যেসব কাজকে তারা অত্যন্ত দামী এবং অতি মূল্যবান মনে করতো, কিয়ামতের দিন তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে এবং তাদের কর্মের কোনো মূল্য বা গুরুত্বই হবে না, ঈমান এবং ইখলাসের অভাবে তাদের পুণ্যকর্মও প্রাণহীন হবে। এরপর তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

বস্তুত কাফেরদের পুণ্যকর্মগুলো ঈমানের অভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর তাদের আমলনামায় পাপ আর পাপই থাকবে। তাদের অবস্থা তাদেরকে বুঝাবার জন্যে পুণ্যকর্মগুলো নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার কোনো ওজন হবে না। আর মন্দ কাজগুলো মন্দ কাজের পাল্লায় রাখা হবে এভাবে তাদের কুফর ও নাফরমানির পাল্লা ভারি হবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কাফেরদের ওজন কায়েম না করার তাৎপর্য হলো, তাদের আমল পরিমাপ না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। কেননা পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। কিন্তু তাদের আমলের মধ্যে মন্দ ব্যতীত কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং তাঁর রাসূলগণকে বিদ্রূপ করতো এবং আসমানি গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করতো, তাই তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই নেই; ওজন ব্যতীতই তারা দোজখের শাস্তির জন্য বিবেচিত হবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৫]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) একথাও লিখেছেন যে, এই বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন মু'মিন কাফের সকলেরই আমলের ওজন হবে, যার উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার কায়েম করা; যেন কারো কোনো ওজর আপত্তি না থাকে। কাফেরদের আমলও পাল্লায় রেখে পরিমাপ করা হবে, কিন্তু সেগুলোর কোনো ওজন হবে না। কেননা তারা কুফর ও নাফরমানির মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে- ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا অর্থাৎ তাই তাদের শাস্তি হবে দোজখ, কেননা তারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, কুফরি ও নাফরমানি করেছে, আমার নিদর্শনসমূহের এবং আমার রাসূলগণের প্রতি বিদ্রূপ করেছে, তাই তাদের শাস্তি হলো দোজখ। তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর সত্যতার যথেষ্ঠ প্রমাণ তাদের নিকট ছিল; কিন্তু তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস করেনি, তারা চক্ষুষ্মান থাকা সত্ত্বেও যেন অন্ধ ছিল।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এই আয়াতের তাফসীরে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মক্কার জনৈক কাফের দম্ভ প্রকাশ করে প্রিয়নবী ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। তখন তিনি হযরত বুরায়দা (রা.)-কে বললেন, এই লোকটি তাদের অন্তর্ভুক্ত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট যাদের গুরুত্ব হবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দূ] পারা- ১৬, পৃ. ১৫]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا এতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখন মু'মিনদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। বস্তুত ঈমানদার ও নেককারগণ তাদের ঈমান ও নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে। বেহেশতের সুশীতল মনোরম ছায়ায় তারা চিরদিন বাস করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককার মু'মিনদের জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া কর, কেননা ফেরদাউস জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর তা অন্য জান্নাতসমূহ থেকে উচ্চতর অবস্থায় রয়েছে, আর তার উপরই করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আরশ অবস্থিত এবং ফেরদাউস থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

তিরমিযী ও হাকেম (র.) হযরত ওবায়দা ইবনে সামের (রা.)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত মা'আজ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে তফাত এতখানি যতখানি আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে। ফেরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। আর এ ফেরদাউস থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তার উপর রয়েছে আরশ। যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট বেহেশতের জন্য দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে।

বাযযার হযরত ইরবাজ ইবনে সাবিয়া (রা.)-এর সূত্রে এবং তাবারানী হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে; তা অন্য জান্নাতসমূহের উপর রয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত কাব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতসমূহের মধ্যে ফেরদাউসের চেয়ে উঁচু কোনো জান্নাত নেই। কল্যাণকর কাজের আদেশদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী ব্যক্তি জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করবেন।

মোকাতেল (র.) বলেছেন, ফেরদাউস জান্নাতের একটি উপত্যকা। অর্থাৎ তা সর্বোচ্চে অবস্থিত, সর্বোত্তম এবং সর্বপ্রকার নিয়ামতে পরিপূর্ণ।

ইমাম আহমদ, তায়ালুসী ও বায়হাকী (র.) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফেরদাউসে ৪টি জান্নাত রয়েছে তন্মধ্যে দু'টি স্বর্ণনির্মিত। ঐ জান্নাতের সবকিছুই স্বর্ণের, আর দু'টি রূপার।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'সিফাতুল জান্নাত' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফেলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস নিজের দস্ত মোবারক দ্বারা তৈরি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে স্বহস্তে তৈরি করেছেন। তাওরাতকে নিজ হাত দিয়ে লিখেছেন। আর ফেরদাউসকে নিজের হাত দ্বারা তৈরি

করেছেন। এরপর ইরশাদ করেছেন, শপথ নিজের সম্মান ও উচ্চ মরতবার! এতে [ফেরদাউসে] নিত্য মদ্যপায়ী কখনো প্রবেশ করবে না এবং দাইয়ূসও প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দাইয়ূস অর্থ কি? তিনি ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মধ্যে মন্দ কাজ দেখে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর দ্বারা মন্দ কাজ করায়।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৮৩]

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا : উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মতো মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতাই বটে। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় কারো মনে জাগবে না।

হাদীসে বর্ণিত শানে নুযূল থেকে সূরা কাহাফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য- وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বুঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করতো যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায় না।]

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বললেন, আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবূ নু'আঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন, জুনদুব ইবনে সুহাইব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরো বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ হয়ে যায়; বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজে [নামাজরত] থাকি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে, সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ হুরায়রা! আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন! এমতাবস্থায় তুমি দু'টি ছওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করেছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। [এটা রিয়া নয়]।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূ জর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শুনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ। অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ [যে, তার আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন]।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টির অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরো বাড়িয়ে দেওয়া– এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হলো সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য [আমল কবুল হওয়ার] অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণিত এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশঙ্কা করি তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। –[আহমদ]

বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃতি করে তাতে অতিরিক্ত আরো বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোনো প্রতিদান আছে কিনা?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল, শরিকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত। সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছিল। –[মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন। যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। –[আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রা.)-কে ইখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইখলাসের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ ও ভালো কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল, হে আল্লাহ! এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিযী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, هُوَ فِيْكُمْ اَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতোই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক [অর্থাৎ রিয়া] থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهٗ.

ফায়দা– ১ : قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ الخ আয়াতে একথা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ আমাদের মতোই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ অর্থাৎ হাত ও সত্তা হিসেবে তিনি মানুষ। তবে গুণাবলি ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এ কারণেই তো তাঁর মানুষ হওয়াও তাঁর জন্য গর্বের কারণ। যেরূপভাবে عَبْدِيَّتْ হলো তাঁর সর্বোত্তম গুণ, বরং তিনি মানুষ হওয়ার কারণে স্বয়ং মনুষত্ব ফেরেশতাগণের ঈর্ষার কারণ হয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে মানুষ মনে না করে কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীত সরাসরি মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কুরআনের স্পষ্ট صَرِيْحْ আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে।

ফায়দা– ২ : সীরাতের কতিপয় কিতাবে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর ছায়া পড়ত না। একথাও সঠিক নয়। রাসূল ﷺ -এর ছায়া ছিল এবং তার উপর রৌদ্রতাপও পতিত হতো। মুসনাদে আহমদের বর্ণনা দ্বারা রাসূল ﷺ -এর ছায়া প্রমাণিত হয়। আর এই রেওয়ায়েতকে মুসনাদে আহমদের তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যার মূল বক্তব্য হলো বিদায় হজের সফরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বাহন বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ হযরত যায়নব (রা.)-কে বললেন, যেহেতু তোমার নিকট একটি অতিরিক্ত বাহন আছে তাই তা সাফিয়াকে দিয়ে দাও। তিনি তাকে বাহন দিতে অস্বীকার করে সতীনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে দিলেন। এতে রাসূল ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনমাস তার থেকে দূরে থাকলেন। এক পর্যায়ে হযরত যয়নব (রা.) নিরাশ হয়ে গেলেন। রবিউল আওয়াল মাস শুরু হলে রাসূল ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর নিকট আগমন করলেন। তখন হযরত যয়নব (রা.) ছায়া দেখে ভাবতে লাগলেন, এতো কোনো মানুষের ছায়া হয়ে থাকবে। নবী করীম ﷺ তো আমার নিকট আসেন না। তাহলে এই ছায়া কার হবে? এটা ভাবছিলেন ইত্যবসরেই রাসূল ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ -এর ছায়া ছিল এবং তা মাটিতেও নিপতিত হতো।

ফায়দা– ৩ : শেষ আয়াতে যে শিরকের নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাপক। তাতে শিরকে জলী ও শিরকে খফী সবই অন্তর্ভুক্ত। শিরকে জলী হলো যা মুশরিকরা করে থাকে। আর শিরকে খফী হলো লৌকিকতা সম্বলিত ইবাদত। যেরূপভাবে শিরকে জলী দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লৌকিকতাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যা দ্বারা প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা লাভ উদ্দেশ্য হয়। আর যেটা মানুষদেরকে দেখানো ও শুনানোর জন্য করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় আমল পরকালে তার জন্য অনিষ্টই বয়ে আনবে। বহু হাদীসে এ জাতীয় বক্তব্য পাওয়া যায়।

ফায়দা– ৪ : ইখলাস এবং লৌকিকতার দিক থেকে আমল চার পর্যায়ের বা চার ধরনের। যথা–

১. শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমল পরিপূর্ণ রূপেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য হবে এবং কাজ শেষ হওয়ার পরেও কেউ সে ব্যাপারে জানতে পারবে না। এটা খুবই উঁচু পর্যায়ের আমল। কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সে সময় এ ধরনের একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া প্রদান করবেন।

২. শুরু হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র লৌকিকতা দেখানোর জন্যই হবে। এ জাতীয় আমল পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হবে; বরং এ আমল আরো বিপদের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এমন তিন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাদেরকে ফয়সালা শুনানো হবে। তারা হলেন– ১. শহীদ ২. কারী ৩. সম্পদশালী। বিস্তারিত মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে দ্রষ্টব্য।

৩. এমন আমল যা ইখলাসের সাথেই আরম্ভ করা হয়েছিল তা পূর্ণতার পূর্বেই তাতে লৌকিকতা স্থান করে নিয়েছে। এটাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।

৪. এমন আমল যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইখলাসের সাথেই হয়েছে। আর শেষ হওয়ার পরও সে নিজে তা প্রকাশ করেনি এবং প্রকাশ করার কামনাও সে করেনি; কিন্তু কোনো কারণবশত নিজে নিজেই তার আমল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আর তার নিকট এই প্রশংসা ভালো মনে হতে লাগলো। এটা আমলের জন্য ক্ষতিকর নয়। –[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ১১১ - ১১২]

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ : সূরা মারইয়াম মক্কায় অবতীর্ণ

اَوْ اِلَّا سَجْدَتُهَا فَمَدَنِيَّةٌ اَوْ اِلَّا فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفَ الْاٰيَتَيْنِ فَمَدَنِيَّتَانِ وَهِيَ ثَمَانٌ اَوْ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ اٰيَةً ـ

তবে সিজদার আয়াতটি মাদানী অথবা সিজদার আয়াতটি এবং فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفَ এ দু আয়াত মদনী, এতে সর্বমোট ৯৮ বা ৯৯ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. كٓهٰيٰعٓصٓ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

১. কাফ-হা-ইয়া 'আইন-সাদ। এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٢. هٰذَا ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ مَفْعُوْلُ رَحْمَةٍ زَكَرِيَّا ع بَيَانٌ لَهٗ ـ

২. এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ, তার বান্দা জাকারিয়ার প্রতি। عَبْدَهٗ শব্দটি رَحْمَةٍ -এর মাফউল। আর زَكَرِيَّا হলো عَبْدَهٗ -এর بَيَانٌ

٣. اِذْ مُتَعَلِّقٌ بِرَحْمَةٍ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً مُشْتَمِلًا عَلٰى دُعَاءٍ خَفِيًّا ـ سِرًّا جَوْفَ اللَّيْلِ لِاَنَّهٗ اَسْرَعُ لِلْاِجَابَةِ ـ

৩. যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে اِذْ টা رَحْمَةٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ দোয়া সম্বলিত আহ্বান, চুপে চুপে রাতের দ্বি-প্রহরে। কেননা এ পদ্ধতি দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত পন্থা।

٤. قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ ضَعُفَ الْعَظْمُ جَمِيْعُهٗ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ مِنِّيْ شَيْبًا تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ اَيْ اِنْتَشَرَ الشَّيْبُ فِيْ شَعْرِهٖ كَمَا يَنْتَشِرُ شُعَاعُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ وَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوْكَ وَلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ اَيْ بِدُعَائِيْ اِيَّاكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ اَيْ خَائِبًا فِيْمَا مَضٰى فَلَا تَجْتَنِبِيْ فِيْمَا يَأْتِيْ ـ

৪. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার সকল অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে। شَيْبًا শব্দটি فَاعِلٌ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে تَمْيِيْزٌ হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে লাকড়ির মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তেমনিভাবে শুভ্রতা আমার মাথার চুলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদ সত্ত্বেও আমি আপনার নিকট একটি আবেদন করছি যে, আর আপনাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। অর্থাৎ আমি আপনার থেকে অতীতে কোনো দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হয়নি। কাজেই ভবিষ্যতেও আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

অনুবাদ :

٥. وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ ـ اَيِ الَّذِيْنَ يَلُوْنِيْ فِي النَّسَبِ كَبَنِي الْعَمِّ مِنْ وَّرَائِيْ اَيْ بَعْدَ مَوْتِيْ عَلَى الدِّيْنِ اَنْ يُضَيِّعُوْهُ كَمَا شَاهَدْتُهُ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ تَبْدِيْلِ الدِّيْنِ وَكَانَتْ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا لَا تَلِدُ فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيًّا اِبْنًا ـ

৫. আমি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আশঙ্কা করি অর্থাৎ আমার বংশীয় আত্মীয় স্বজন যেমন- চাচাতো ভাই প্রমুখ থেকে আমার পর আমার তিরোধানে পর ধর্মীয় ব্যাপারে যে, তারা তা নষ্ট করে ফেলবে, যেমনটি আমি বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে চাক্ষুষ অবলোকন করেছি দীনের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা সন্তান জন্ম দেয় না, সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তরাধিকারী দান করুন অর্থাৎ আপনার বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা একটি পুত্র সন্তান দান করুন!

٦. يَرِثُنِيْ بِالْجَزْمِ جَوَابُ الْاَمْرِ وَبِالرَّفْعِ صِفَةُ وَلِيًّا وَيَرِثُ بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ق جَدِّي الْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ـ اَيْ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ قَالَ تَعَالٰى فِيْ اِجَابَةِ طَلَبِهِ الْاِبْنَ الْحَاصِلَ بِهَا رَحْمَتُهُ ـ

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে يَرِثُنِيْ শব্দটি ثَاء -এর جَزْم -এর সাথে হতে পারে اَمْر -এর জবাব হিসেবে। আবার رَفْع যুক্তও হতে পারে وَلِيًّا -এর সিফত হিসেবে। এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে يَرِثُ -এর মধ্যেও يَرِثُنِيْ -এর মতো দু'ধরনের ইরাব হতে পারে। আমার দাদা ইয়াকুবের বংশের ইলম ও নবুয়তের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন সন্তোষভাজন। অর্থাৎ আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.) اِجَابَتِ دُعَاء -এর কারণে রহমত স্বরূপ অর্জিত হওয়া সন্তানের দরখাস্তের জবাবে বলে দিলেন يَا زَكَرِيَّا الخ

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كٓهٰيٰعٓصٓ : এটা مُتَشَابِهَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত। যার বাস্তবজ্ঞান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর রয়েছে। উম্মতের জন্য এর অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেগুলো অনুমান নির্ভর ও ধারণাভিত্তিক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্তর্গত একটি নাম। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, এটা কুরআনের একটি নাম। কেউ কেউ এটাকে ইসমে আযমও বলেছেন।

قَوْلُهُ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ الخ : عَبْدَهُ এটা رَحْمَةِ -এর مَفْعُوْل بِهٖ আবার কেউ কেউ ذِكْر -এর مَفْعُوْل بِهٖ বলেছেন। زَكَرِيَّا এটা عَبْدَهُ থেকে بَدَل বা عَطْف بَيَانْ হয়েছে। ذِكْرُ رَحْمَتِ -এর মধ্যে ذِكْر মাসদার স্বীয় مَفْعُوْل -এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর মাসদারের فَاعِلْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذِكْرُ اللّٰهِ رَحْمَتَهُ আর رَحْمَة মাসদারের ইজাফত رَبِّ -এর দিকে মাসদারের ইজাফত ফায়েলের দিকে হয়েছে। আর এটা جُمْلَه হয়ে هٰذَا উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) هٰذَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ هٰذَا الْمَتْلُوُّ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ আরেকটি তারকীব এরূপও হতে পারে যে, ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الخ হলো মুবতাদা আর তার খবর পূর্বে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكَ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

আর ذِكْرُ رَحْمَتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রহমত বর্ষণ করা। অনুগ্রহের লেনদেন করা। যেই ذِكْر টা نِسْيَانْ -এর মোকাবিলায় আসে, এখানে সেটা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اِذْ نَادٰى : এটা رَحْمَة -এর ظَرْف হয়েছে। আবার কেউ কেউ এটাকে ذِكْر -এর ظَرْف বলেছেন। মুফাসসির (.র) اِذْ -এর পরে مُتَعَلِّقْ بِرَحْمَةٍ উল্লেখ করে এটা বলে দিয়েছেন যে, اِذْ نَادٰى যদিও ذِكْر -এর ظَرْف হতে পারে। কিন্তু মুফাসসির (র.)-এর নিকট এটাকে رَحْمَة -এর ظَرْف বানানো উত্তম। অর্থাৎ– رَحْمَةِ اللّٰهِ اِيَّاهُ وَقْتَ اَنْ نَادَاهُ

قَوْلُهُ وَهَنَ : এটা বাবে ضَرَبَ ও سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ হলো– শক্তিহীন হওয়া, দুর্বল হওয়া। হযরত জাকারিয়া (আ.) وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ বলেছেন। অথচ وَهَنَ عُظْمِىْ অধিক সংক্ষিপ্ত ছিল। এর কারণ কি?

এর জবাবে বলা হয় যে, وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ -এর মধ্যে اِجْمَالْ -এর পরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা اَلْعَظْمُ এটা جِنْسِيَّة مَقْصُوْدَه -এর উপর সুস্পষ্টভাবে বুঝায়। এভাবে যে, وَهَنَ الْعَظْمُ হলো مُطْلَقْ যাতে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের হাড় অন্তর্ভুক্ত ছিল। مِنِّىْ বলে নিজেকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনিভাবে مِنِّىْ টা اَلْعَظْمُ -এর তাকিদ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ رَبِّىْ : এই বাক্যটি نَادٰى بِهٖ -এর তাফসীর اَلْعَظْمُ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টা اِسْتِغْرَاقْ جِنْسِىْ -এর জন্য হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সকল হাড়। اَلْعَظْمُ -কে বহুবচন না এনে একবচন আনা হয়েছে। কেননা বহুবচনের প্রয়োগ সেই সুরতেও ঠিক রয়েছে যখন কিছু হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِشْتِعَالْ : মূলত اِنْتِشَارُ الشُّعَاعِ النَّارِ فِى الْحَطَبِ বলা হয় اِشْتِعَالْ তথা লাকড়ির মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়াকে। شَيْبًا এটা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে এবং فَاعِلْ হতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মূল ইবারত হলো اِنْتَشَرَ الشَّيْبُ فِىْ شَعْرِهٖ বাবে ضَرَبَ হতে মাসদার شَيْبًا অর্থ হলো– বুড়ো হওয়া, চুল শুভ্র হওয়া। কেউ কেউ شَيْبًا -কে মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب বলেছেন। এভাবে যে, اِشْتِعَالُ الرَّأْسِ এটা شَابَ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এখন ইবারত হবে شَابَ شَيْبًا আবার কেউ কেউ حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب বলেছেন এবং شَيْبًا অর্থ شَائِبًا বলেছেন। তবে শেষোক্ত দুটি উক্তি অসমর্থিত। رَأْسُ -এর পরে مِنِّىْ -কে পূর্বের উপর নির্ভর করে ছেড়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَلْمَوَالِىَ : এটা مَوْلٰى -এর বহুবচন, অর্থ হলো– নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন, চাচাতো ভাই প্রমুখ।

عَاقِرًا -এর অর্থ হলো বন্ধ্যা, যার সন্তান হয় না। عَاقِرًا -এর শেষে ة ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি حَائِضْ -এর মধ্যে হয়েছে। হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ঈশা বিনতে ফাকূর ছিল এবং ঈশার বোনের নাম ছিল হান্না। ঈশার সন্তান হযরত ইয়াহইয়া (আ.) আর হান্নার সন্তান হযরত মারইয়াম (আ.)। আর হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সন্তান হলেন হযরত ঈসা (আ.)। এভাবেই হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর খালাতো ভাগ্নে হয়েছেন।

قَوْلُهُ رَضِيًّا : এটা মাসদার اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে। অর্থ– পছন্দনীয়।

قَوْلُهُ بِدُعَائِكَ : এর তাফসীর بِدُعَائِىْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, دُعَاء হলো মাসদার যা স্বীয় مَفْعُوْل -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর তার فَاعِلْ হলো مُتَكَلِّمْ -এর যমীর ى যা উহ্য আছে।

قَوْلُهُ اَلْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীগণের মীরাস হলো ইলম বা জ্ঞান; সম্পদ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : যেহেতু এ সুরায় হযরত মাইয়াম (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্যে মারইয়াম নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন, তখন তারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব (রা.)-কে বললেন,

তোমাদের রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তন্মধ্যে আমাদেরকে কিছু শুনাও! তখন হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাজ্জাশী এত ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়ীগুলো ভিজে গেল, তার সঙ্গে ক্রন্দন করলেন খ্রিস্টান ধর্মের আলেমগণ, তাদের নয়নের অশ্রুর কারণে সম্মুখস্থ কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গলে। নাজ্জাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। এটাতো একই কেন্দ্রের আলো। -[আহমদ, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম]

এরপর নাজ্জাশী হুজুর আকরাম ﷺ -এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিছুদিন পর যখন তার ইন্তেকাল হয় তখন হুজুর ﷺ তার গায়েবানা নামাজ আদায় করলেন।

হুজুর ﷺ -এর মুজেযা : বর্ণিত আছে যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ ইন্তেকাল করেন, তখন হুজুর ﷺ -এর মুজেযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযা তার সম্মুখে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيْ تُوُفِّيَ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ اِلَّا اَنَّ جَنَازَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর ইন্তেকাল হয়েছে। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলেন। চার তাকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামাজ আদায় করা হলো। হুজুর ﷺ -এর মুজেযা স্বরূপ জানাযা তাঁর সম্মুখেই রাখা হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল। -[ফাতহুল বারী খ. ৩, পৃ. ১৫১]

গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে : এই ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা জানাযা আদায়ের কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি। তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পন্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন, ইয়াজুজ মাজুক প্রভৃতি। এই সূরায়ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা এই সূরায় স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও এই সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত, দুনিয়ার এই জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরি কথা ইরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবকে এই সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে যে, দেখ যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কত বরকত নাজিল করেন, আর কত নিয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার নেককার বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা, এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই রয়েছে নিহিত।

সূরা কাহাফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা কাহাফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাকারিয়া (আ.) সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতের কামাই ভোগ করতেন, তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অন্তরে এই আশঙ্কা ছিল যে, আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বনী ইসরাঈলে তা ইতিপূর্বেও হয়েছে। এজন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেন।

সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি তার বিশেষ রহমত নাজিল করার কথা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ كٓهٰيٰعٓصٓ : এ অক্ষরগুলোকে মুকাত্তাআত' বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ জাতীয় অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, পবিত্র কুরআনের গোপন বিষয় হলো 'হুরূফে মুকাত্তা'আত' যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে। আর হযরত আলী (রা.) বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে পবিত্র কুরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষরসমূহ। –[তাফসীরে নূরুল করআন : খ. ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪]

ইবনে মারদাবয়া কালবী (র.)-এর সূত্রে হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তাতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এই হরফে মুকাত্তাআতের অর্থ হলো– كَافٍ هَادٍ عَالِمٌ صَادِقٌ

এ বাক্যটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো كٓهٰيٰعٓصٓ। অন্য একটি বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রয়েছে যে, ك দ্বারা كَرِيْمٌ - ه দ্বারা هَادٍ - ى দ্বারা حَكِيْمٌ - ع দ্বারা عَلِيْمٌ এবং ص দ্বারা صَادِقٌ বুঝানো হয়েছে।

কালবী (র.) বলেছেন–

كَافٍ لِخَلْقِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

هَادٍ لِعِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।

يَدُهٗ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাঁর হাত তাদের [মু'মিনদের] হাতের উপর।

عَالِمٌ بِبَرِيَّتِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।

صَادِقٌ فِىْ وَعْدِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর ওয়াদায় সত্য।

দারিমী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) তার দোয়ায় বলতেন– يَا كٓهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِىْ অর্থাৎ হে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। আমাকে মাফ করুন! –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ৫৭]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে এই অক্ষরসমূহ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নাম। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরও একটি বর্ণনা রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে– هُوَ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। –[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৬২৩]

قَوْلُهُ نِدَاءً خَفِيًّا : এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِىْ অর্থাৎ অনুচ্চ জিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন জীবিকাই শ্রেষ্ঠ। [অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না]। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنِّىْ وَهَنَ عَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا : অর্থাৎ অস্থির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اِشْتِعَالٌ -এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়াকে বুঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ হলো– এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।

قَوْلُهُ مَوَالِىَ : এটা مَوْلٰى -এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাতো ভাই ও স্বজন। এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ - পয়গাম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না : অধিক সংখ্যক আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা প্রথমত হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কাছে এমন কোনো অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গাম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তব। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সংবলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থাৎ নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গাম্বরগণের ওয়ারিস। পয়গাম্বরগণ কোনো দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান রেখে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে। -[আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী]

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ আমাদের [অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের] আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ রেখে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرِثُنِىْ -এরপর وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি। কেননা যে পুত্রের জন্মলাভের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকূব (আ.)-এর বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَوَالِىَ তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া (আ.) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থি।

রূহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে-

رَوَى الْكُلَيْنِىُّ فِى الْكَافِىْ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىْ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاؤُدَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرِثَ سُلَيْمَانَ .

অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর ওয়ারিস হয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওয়ারিস হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া يَرِثُنِىْ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রার্থিত সন্তান হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও জীবিত থাকবেন। কেননা উত্তরাধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণত এটাই হয়ে থাকে। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে।

জবাব :

১. بَقَاء তথা অবশিষ্ট থাকাটা ব্যাপক। এটা بَقَاء ذَاتْ এবং بَقَاء اٰثَارْ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর সত্তা বিদ্যমান না থাকলেও তাঁর اٰثَارْ তো হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও বিদ্যমান ছিল। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

২. অথবা فَاسْتَجَبْنَا বলা হয়েছে দোয়ার কতিপয় অংশ হিসেবে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা হযরত জাকারিয়া (আ.) জীবদ্দশায় হওয়া প্রমাণিত নেই।

বালাগাত :

١. اَلْكِنَايَةُ (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ) كِنَايَةٌ عَنْ ذَهَابِ الْقُوَّةِ وَضُعْفِ الْجِسْمِ .

٢. اَلْاِسْتِعَارَةُ (اِشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) شُبِّهَ اِنْتِشَارُ الشَّيْبِ بِاشْتِعَالِ النَّارِ فِى الْحَطَبِ وَاسْتُعِيْرَ الْاِشْتِعَالُ لِلْاِنْتِشَارِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ وَاشْتَعَلَ بِمَعْنَى اِنْتَشَرَ فَفِيْهِ اِسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ .

অনুবাদ :

৭. يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ يَرِثُ كَمَا سَأَلْتَ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ـ اَىْ مُسَمًّى بِيَحْيٰى ـ

৭. হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি যে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হবে। তার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে আমি পূর্বে কারো নামকরণ করিনি। অর্থাৎ ইয়াহইয়ার মতো হুবহু নাম।

৮. قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ـ مِنْ عَتَا يَبِسَ اَىْ نِهَايَةَ السِّنِّ مِائَةً وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَبَلَغَتِ امْرَاَتُهٗ ثَمَانِىْ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً وَاَصْلُ عِتِىٍّ عُتُوْوٌ كُسِرَتِ التَّاءُ تَخْفِيْفًا وَقُلِبَتِ الْوَاوُ الْاُوْلٰى يَاءً لِمُنَاسَبَةِ الْكَسْرَةِ وَالثَّانِيَةُ يَاءً لِتُدْغَمَ فِيْهَا الْيَاءُ ـ

৮. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত عِتِيًّا শব্দটি عَتَا হতে নির্গত, অর্থ– يَبِسَ তথা জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ ১২০ বছর এবং আমার স্ত্রী বয়স ৯৮ বছর হয়ে গেছে। عِتِىٌّ মূলত ছিল عُتُوْوٌ যা قُعُوْدٌ ওজনে সহজিকরণের জন্য تَاءْ-এর পেশের পরিবর্তে যের দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম وَاوْ টিকে কাসরার মুনাসাবাতে يَاءْ দ্বারা রূপান্তর করা হয়েছে। এরপর يَاءْ এবং وَاوْ একত্রে আসায় দ্বিতীয় وَاوْ-কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করত يَاءْ-কে- يَاءْ-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এরপর عَيْن-এর পেশকে تَاءْ-এর মুনাসাবাতে كَسْرَةْ দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে, ফলে عِتِيًّا হয়েছে।

৯. قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ ج مِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِنْكُمَا قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ اَىْ بِاَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ قُوَّةَ الْجِمَاعِ وَاَفْتُقَ رَحِمَ امْرَاَتِكَ لِلْعُلُوْقِ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ـ قَبْلَ خَلْقِكَ وَلِاِظْهَارِ اللّٰهِ تَعَالٰى هٰذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِيْمَةَ اَلْهَمَهُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَلَمَّا تَاقَتْ نَفْسُهٗ اِلٰى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهٖ ـ

৯. তিনি বললেন, এরূপই হবে অর্থাৎ তোমাদের উভয় থেকে সন্তানের সৃষ্টি এই অবস্থায়ই অবশ্যই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। অর্থাৎ আমি তোমার মধ্যে সহবাসের শক্তি সৃষ্টি করে দেব এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভাশয়কে গর্ভধারণের উপযুক্ত করে দিব। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। অর্থাৎ তোমার সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ তা'আলা তার এই মহান কুদরত প্রকাশ করার জন্য হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয়ে এমন একটি প্রশ্নের সঞ্চার করে দিলেন। যাতে তার জবাবে এমন আচরণ করবে যা এই মহান কুদরতের জন্য দিক নির্দেশক হবে। আর যখন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয় দ্রুত এই সুসংবাদের প্রত্যাশী হলো।

১০. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ط اَىْ عَلَامَةً عَلٰى حَمْلِ امْرَاَتِىْ قَالَ اٰيَتُكَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ اَىْ تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ لَيَالٍ اَىْ بِاَيَّامِهَا كَمَا فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ سَوِيًّا ـ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تُكَلِّمُ اَىْ بِلَا عِلَّةٍ ـ

১০. তখন হযরত জাকারিয়া (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও অর্থাৎ আমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি কারো সাথে বাক্যালাপ করবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জিকির ব্যতীত শুধুমাত্র তাদের সাথে কথা বলতে অক্ষম থাকবে। তিন রাত অর্থাৎ দিনসহ তিনরাত। যেমনটা সূরা আলে ইমরানে এসেছে ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ তথা তিনদিন। তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও। سَوِيًّا টা تُكَلِّمَ-এর ফায়েল থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ কোনো রোগ ব্যতীতই।

অনুবাদ :

١١. فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ اَىِ الْمَسْجِدِ وَكَانُوْا يَنْتَظِرُوْنَ فَتْحَهٗ لِيُصَلُّوْا فِيْهِ بِاَمْرِهٖ عَلَى الْعَادَةِ فَاَوْحٰى اَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا صَلُّوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ـ اَوَائِلَ النَّهَارِ وَاَوَاخِرَهٗ عَلَى الْعَادَةِ فَعُلِمَ بِمَنْعِهٖ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمْلُهَا بِيَحْيٰى ـ

১১. অতঃপর তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন অর্থাৎ মসজিদ থেকে আর লোকজন মসজিদ খোলার প্রতীক্ষায় ছিলেন। যাতে করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার নির্দেশ অনুপাতে ইবাদত করতে সক্ষম হয়। এবং তিনি ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী দিনের শুরু ও শেষ ভাগে তার উপাসনায় লিপ্ত থাকো। সুতরাং লোকদের সাথে কথা বলতে না পারার কারণে হযরত জাকারিয়া (আ.) স্বীয় স্ত্রীর ইয়াহইয়াকে গর্ভধারণের বিষয়টি বুঝতে পারলেন।

١٢. وَبَعْدَ وِلَادَتِهٖ بِسَنَتَيْنِ قَالَ تَعَالٰى لَهٗ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ اَىِ التَّوْرٰةَ بِقُوَّةٍ ط بِجِدٍّ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ النُّبُوَّةَ صَبِيًّا ـ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ ـ

১২. আর হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের দু'বছর পর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়াকে বললেন, হে ইয়াহইয়া! এই কিতাবকে গ্রহণ কর। তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে। আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান। নবুয়ত, তিন বছর বয়সে।

١٣. وَحَنَانًا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا وَزَكٰوةً ط صَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَقِيًّا ـ رُوِىَ اَنَّهٗ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا ـ

১৩. এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা। এবং তাকে মানুষের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। সে ছিল মুত্তাকী বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনো কোনো অন্যায়ে জড়িত হননি এমনকি এর কল্পনাও করেননি।

١٤. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اَىْ مُحْسِنًا اِلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا عَصِيًّا ـ عَاصِيًا لِرَبِّهٖ ـ

১৪. পিতামাতার অনুগত তাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহারকারী এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য ছিলেন না।

١٥. وَسَلٰمٌ مِنَّا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ـ اَىْ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْمُخَوِّفَةِ الَّتِىْ يَرٰى فِيْهَا مَا لَمْ يَرَهٗ قَبْلَهَا فَهُوَ اٰمِنٌ فِيْهَا ـ

১৫. তাঁর প্রতি শান্তি আমার পক্ষ থেকে যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন। অর্থাৎ সেই ভয়ানক তিনদিন যাতে মানুষ এমন বিষয় দেখে থাকে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি, তখন যেন তিনি নিরাপদ থাকেন।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ يَحْيٰى : এটা বাবে سَمِعَ -এর حَيَاةٌ মাসদার হতে মুজারের সীগাহ। অর্থ– জীবিত থাকুক। ইয়াহইয়া হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান। যেহেতু হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের মাধ্যমে তার মায়ের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়েছিল এজন্য তার নাম ইয়াহইয়া রাখা হয়েছে। এটি عَلَمِيَّتْ ও عُجْمَةْ -এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اسْمُهُ يَحْيٰى : এটা غُلَامٌ -এর সিফত হয়েছে।

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ الخ : এটা হয়তো غُلَامٌ -এর দ্বিতীয় সিফত হবে অথবা غُلَامٌ থেকে حَالْ হবে।

قَوْلُهُ عِتِيًّا : এটা عَتَا يَعْتُوْ -এর মাসদার। অর্থ– শক্ত হওয়া, অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া, জোড়া হাড়সমূহে শুষ্কতার সৃষ্টি হওয়া। ১. عِتِيًّا এটা بَلَغْتُ -এর مَفْعُوْل بِهٖ ২. بَلَغْتُ -এর অর্থের মাসদারটা তাকিদ হবে। কেননা بُلُوْغُ الْكِبَرِ عِتِيًّا -এর অর্থে হয়ে থাকে। ৩. عِتِيًّا মাসদার بَلَغْتُ -এর فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ بَلَغْتُ عِتِيًّا .৪ عِتِيًّا টা تَمْيِيْز হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ هَيِّنٌ : এটা هَوْن থেকে صِفَتْ مُشَبَّةْ অর্থ– সহজ, আসান।

قَوْلُهُ اَنّٰى : এটা كَيْفَ অর্থে হয়েছে। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সন্তান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। অসম্ভব মনে করে নয়, এবং এটা اِسْتِفْهَامْ تَعَجُّبِىْ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ ثَلٰثُ لَيَالٍ : এরপরে بِاَيَّامِهَا বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কেননা সেখানে اَيَّامْ -এর উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে لَيَالْ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَاقَتْ : বাবে نَصَرَ হতে মাসদার تَوْقًا ـ تَوَقَانًا অর্থ– আগ্রহী হওয়া, আকাঙ্ক্ষী হওয়া।

قَوْلُهُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ : এটা عَلَىَّ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। আর وَلَمْ تَكُ এটা خَلَقْتُكَ -এর ك থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ سَوِيًّا : এটা لَا تُكَلِّمُ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمِحْرَابْ : অর্থ– মসজিদ, শয়তানের সাথে লড়াই করার স্থান।

قَوْلُهُ حَنَانًا : এর عَطْف হয়েছে اَلْحُكْمُ -এর উপর। حَنَانٌ অর্থ হলো– দয়া, অনুকম্পা, অনুগ্রহ, হৃদয়ের বিগলতা।

قَوْلُهُ بَعْدَ وِلَادَتِهٖ الخ : এটা উহ্য মানা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَحْيٰى শব্দটি উহ্যের উপর مُرَتَّبْ কেননা ইয়াহইয়ার বীর্য রেহেমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ইয়াহইয়াকে শক্তভাবে ধরার নির্দেশ দেওয়া হলো। অথচ এখনো ইয়াহইয়া ভূমিষ্ঠ হয়নি। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে বাক্য উহ্য রয়েছে যাকে মুফাস্সির (র.) بَعْدَ وِلَادَتِهٖ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে সম্বোধন করে সুসংবাদ দিলেন, হে জাকারিয়া! আমি সুসংবাদ দেই যে তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করবো। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। অর্থাৎ ঐ সন্তানের জন্মের পূর্বেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার নামকরণ করেছেন।

قَوْلُهُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا : তাফসীরকারগণ এই বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। ১. ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। ২. ইতিপূর্বে তাঁর কোনো নজীর বা দৃষ্টান্তও দেখা যায়নি। অর্থাৎ হে জাকারিয়া! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তোমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান করা হবে। তাঁর উচ্চ মরতবা এবং সম্মান স্বরূপ আমি নিজেই তার নামকরণ করলাম– ইয়াহইয়া। তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) এবং কালবী (র.) বলেছেন, ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। অর্থাৎ আর কাউকে ইয়াহইয়া নাম দেওয়া হয়নি।

তাফসীরকার হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের এবং আতা (র.) আলোচ্য আয়াতের سَمِيًّا শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, নজির বা দৃষ্টান্ত। এমন অবস্থায় আল্লামা বগভীর মতে অর্থ হবে যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার ন্যায় কেউ হয়নি। কেননা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কখনো কোনো গুনাহের কাজের দিকে আকৃষ্ট হননি। আর হযরত আলী ইবনে আবি তালহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পূর্বে কোনো বন্ধ্যা মাতার ঘরে এমন সন্তান কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ :

১. ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর কারণে তার মাতাকে জীবন প্রবাহ দান করেছেন। তাই তার নাম করা হয়েছে ইয়াহইয়া।

২. হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কলবকে ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা জীবিত করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাকে জীবিত এবং পাপীদেরকে মৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এমন পবিত্র জীবন তাঁকে দান করেছেন যে কোনো দিন শুধু যে তিনি গুনাহ করেননি তাই নয়; বরং তার অন্তরে কোনো দিন গুনাহের কথাও আসেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা গুনাহ হয়, অথবা সে অন্তত গুনাহের কথা চিন্তা করে; কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া দ্বারা এর কোনোটিই হয়নি।

৪. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) শাহাদাত বরণ করেছেন, আর যারা শহীদ হন, তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে জীবিত থাকেন।

৫. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাই তাঁর কলবকে আল্লাহ তা'আলা ঐ ঈমানের বরকতে জীবিত করে দিয়েছেন। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১৮৬-১৮৭]

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ الخ : হযরত জাকারিয়া (আ.) যখন এই অসাধারণ সুসংবাদ শ্রবণ করলেন তখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়ে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমি কি যৌবন লাভ করবো? অথবা এই বৃদ্ধকালেই শিশুর জন্ম হবে? তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর এই প্রশ্ন اَنّٰى [কিভাবে হবে?] অস্বীকৃতির অর্থ বুঝায় না; বরং এই প্রশ্নের অর্থ কৌতূহলবশত জানার চেষ্টা করা যে, কিভাবে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, আমাদের উভয়কে যৌবন প্রদান করা হবে অথবা আমরা উভয়ে বৃদ্ধই থাকবো, আর এভাবেই শিশু জন্মগ্রহণ করবে।

হযরত জাকারিয়া (আ.) পুত্রের সুসংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- قَالَ كَذٰلِكَ অর্থাৎ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ যেভাবে সাধারণত শিশু জন্মগ্রহণ করে ঠিক সেভাবেই। আর আল্লাহ তা'আলার জন্যে এটি কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার দয়ায় সবকিছুই সম্ভব, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

قَوْلُهُ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে ইয়াহইয়া! শক্তভাবে আসমানি কিতাব তাওরাত এবং অন্যান্য সহীফা ধারণ কর এবং বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন কর এবং মানুষকে তাওরাতের উপর আমল করার জন্যে অনুপ্রাণিত কর। তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, পিতার বার্ধক্যের সময় যুবক পুত্রের প্রতি কিতাবের ইলম প্রচার প্রসার এবং রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পাতিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কিতাব শব্দ দ্বারা তাওরাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا - একটি বিশেষ ঘটনা : শৈশবকালে একবার ছেলেরা তাকে খেলা করার জন্যে ডাকলো। তখন তিনি বললেন আমাদেরকে খেলা করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আবার কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, اَلْحُكْمَ শব্দ দ্বারা সহনশীল, সম্ভ্রান্ত এবং শান্ত বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য : মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবকালেই ইলম এবং হিকমত দান করেছেন যেন তিনি শরিয়তের আহকাম ভালোভাবে বুঝতে পারেন। এটি হলো তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি কোমল অন্তরের লোক ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার নিজের তরফ থেকেই তাকে দান করি কোমলতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং যখন নামাজ পড়তেন তখন অবিরাম ক্রন্দন করতে থাকতেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে পবিত্রতা এবং পবিত্র অন্তর দেওয়া হয়েছিল।

زَكٰوة শব্দ দ্বারা এখানে অন্তরের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে যেন গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে অন্তর পবিত্র থাকে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, زَكٰوة শব্দ দ্বারা নেক আমল বুঝানো হয়েছে।

তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সৃষ্টিগত এবং স্বভাবগতভাবে পরহেজগার ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ভয় কখনো তাঁর অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার পিতামাতার খেদমতগুজার ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার খেদমতের চেয়ে অধিক আর কোনো গুণ নেই।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হুকুম' অর্থ হলো নবুয়ত। কেননা তাঁর শৈশবকালেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আমি তাকে আমার তরফ থেকে রহমত এবং গুনাহ থেকে পবিত্র থাকার তাওফীক দিয়েছি। রহমত প্রদানের দুটি অর্থ হতে পারে–

১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজিল করেছেন।

২. তাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার প্রতি রহম করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী حَنَانٌ শব্দটির অর্থ লিখেছেন, ভয় ভীতি, সম্মান অথবা রিজিক বা বরকত।

আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ কামূসে حَنَانٌ শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে– রহমত, রিজিক, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং নম্রতা।

আর زَكٰوةٌ শব্দটির অর্থ হলো, পাপাচার থেকে পবিত্র থাকা। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং ইখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া।

বিখ্যাত তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) ও যাহহাক (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো নেক আমল। আর তাফসীরকার হযরত কালবী (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান, যা তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পিতা হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে পুত্র সন্তান প্রদানের মাধ্যমে বখশিশ করেছেন।

قَوْلُهُ وَكَانَ تَقِيًّا : আর তিনি ছিলেন পরহেজগার, পূর্ণ অনুগত। যিনি কোনোদিন গুনাহ করেননি, আর কখনো গুনাহের ইচ্ছাও করেননি। তিনি সৃষ্টিগতভাবেই পরহেজগার ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতিতেই পরহেজগারী ছিল।

অতি শৈশবেই তার মধ্যে ছিল নেক আমলের প্রেরণা, সৎকাজের উৎসাহ উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। দয়া-মায়া তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেহ মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্য। পিতা-মাতার আদরের কারণে কখনো কখনো সন্তান অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি এমন ছিলেন না।

قَوْلُهُ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ : তিনি ছিলেন পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহারকারী, তাদের পরিপূর্ণ অনুগত, তাদের সেবা-যত্নে তিনি ছিলেন রত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থাৎ "আর আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আর পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর।" আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর আদেশের পাশাপাশি পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর পরই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো পিতামাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এজন্যই প্রিয়নবী ﷺ তাগিদ করে ইরশাদ করেছেন- رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে। আর এই গুণের পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا : আর তিনি অবাধ্য নিষ্ঠুর ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি অহংকারী নাফরমান ছিলেন না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'জাব্বার' সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে রাগান্বিত অবস্থায় মানুষকে প্রহার করে এমনকি হত্যাকাণ্ডও করে।

قَوْلُهُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا : তাঁর জন্মদিনে তাকে নিরাপদ রাখা হয়েছে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ থেকে, এমনিভাবে যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন তাকে কবরের আজাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আর কিয়ামতের দিন যখন তার পুনরুত্থান হবে তখন তাকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেছেন, মানব জীবনের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা-

১. মানুষ মায়ের উদর থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসে।

২. পৃথিবী থেকে বের হয়ে মধ্যলোকে চলে যায় সেখানে সে এমন কিছু দেখে যা পৃথিবীতে কখনো দেখেনি।

৩. পুনর্জীবিত হয়ে মানুষ হাশরের ময়দানে পৌছবে, আর এমনি ময়দান ও এমনি গণ-জমায়েত সে আর কখনো দেখেনি। আর এই তিনটি অবস্থায় এবং স্থানেই নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকার বেশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে দান করেছেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৯৩]

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাম তথা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা নিশ্চয় হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার বিশেষ নিদর্শন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদিও আলোচ্য আয়াতে জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দিনের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু এতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জন্ম থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

ফায়দা : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রাপ্ত সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ-সুসংবাদ পাওয়ার ১৩ বছর পরে ঘটেছিল। কেননা যখন হযরত জাকারিয়া (আ.) তাঁর নিকট প্রতিপালিত শিশু মরিয়মের নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেলেন তখন তার দৃঢ় আশা জাগল যে, যদিও আমাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার মৌসুম ও কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে অসময়ে সন্তান দান করা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই তিনি দরবারে ইলাহীতে কায়মনো বাক্যে দোয়া করলেন। যার ফলেই তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.) জন্মের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর ছয় মাসের ছোট ছিলেন।

অনুবাদ :

١٦. وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ الْقُرْاٰنِ مَرْيَمَ ـ اَىْ خَبَرَهَا اِذْ حِيْنَ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ـ اَىْ اِعْتَزَلَتْ فِىْ مَكَانٍ نَحْوَ الشَّرْقِ مِنَ الدَّارِ ـ

১৬. বর্ণনা করুন এই কিতাবে কুরআনে মারইয়ামের কথা অর্থাৎ তাঁর বৃত্তান্ত যখন যে সময় তিনি তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে এক নিরবচ্ছিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলেন।

١٧. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ص اَرْسَلَتْ سِتْرًا تَسْتَتِرُ بِهِ لِتَفْلِىْ رَأْسَهَا اَوْ ثِيَابَهَا اَوْ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا جِبْرَئِيْلَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَعْدَ لُبْسِهَا ثِيَابَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ـ تَامَّ الْخَلْقِ ـ

১৭. অতঃপর তাদের হতে তিনি পর্দা করলেন অর্থাৎ পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন মাথা বা কাপড়ের উকুন বাছাইয়ের জন্য অথবা তার ঋতুস্রাবান্তে পবিত্রতা লাভের গোসলের জন্য আমি তার নিকট পাঠালাম আমার রূহকে হযরত জিবরীল (আ.)-কে তিনি তার নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন তার কাপড় পরিধানের পর পূর্ণ মানবাকৃতিতে।

١٨. قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ـ فَتَنْتَهِىْ عَنِّىْ بِتَعَوُّذِىْ ـ

১৮. হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর যদি তুমি মুত্তাকী হও। আমি তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিতেছি। সুতরাং তুমি আমার থেকে সরে যাও, আমার আশ্রয় গ্রহণের দরুন।

١٩. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ـ بِالنُّبُوَّةِ ـ

১৯. তিনি বললেন, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত। তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য। নবুয়তের কারণে পবিত্র।

٢٠. قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ يَتَزَوَّجُ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا ـ زَانِيَةً ـ

২০. হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন, কেমন করে আমার সন্তান হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

٢١. قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ ج مِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِّنْكَ مِنْ غَيْرِ اَبٍ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ج اَىْ بِاَنْ يَّنْفُخَ بِاَمْرِىْ جِبْرَئِيْلُ فِيْكِ فَتَحْمِلِىْ بِهِ وَلٰكِنْ مَا ذُكِرَ فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ عُطِفَ عَلَيْهِ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِلنَّاسِ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَرَحْمَةً مِّنَّا ج لِمَنْ اٰمَنَ بِهِ وَكَانَ خَلْقُهُ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ـ بِهِ فِىْ عِلْمِىْ فَنَفَخَ جِبْرَئِيْلُ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَاَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ فِىْ بَطْنِهَا مُصَوَّرًا ـ

২১. তিনি বললেন বিষয়টি এরূপই হবে অর্থাৎ আপনার থেকে পিতাবিহীন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। এভাবে যে, আমার নির্দেশে জিবরীল (আ.) তোমার মধ্যে ফুৎকার দিবে। অতঃপর সে ফুৎকারের মাধ্যমেই তুমি গর্ভবতী হবে। উল্লিখিত هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ বাক্যটি যেহেতু ইল্লতের অর্থে হয়েছে। এ কারণেই তার উপর لِنَجْعَلَهُ -এর আতফ করা হয়েছে। আর আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যাতে সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। আমার অপরিসীম ক্ষমতার ব্যাপারে। এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ যে ব্যক্তি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটা তো এক স্থিরিকৃত ব্যাপার অর্থাৎ তার সৃষ্টির ব্যাপারে আমার জ্ঞানে। এরপর হযরত জিবরীল (আ.) তার জামার বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশে ফুৎকার দিলেন। তখনই তিনি স্বীয় উদরে মানবাকৃতির গর্ভ অনুভব করলেন।

প্রশ্ন ও জবাব : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্য কিভাবে জান্নাতে পৌছল?

উত্তর : যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে, নাকি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জান্নাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে [কারো মতে ময়ূর ও সাপের সাথে যোগসাজস করে] প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর قَاسَمَهُمَا إِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান শুধু ওয়াসওয়াসা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি এবং মৌখিক কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাহির থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে প্ররোচিত করে। –[হাশিয়ায়ে জামাল– খ. ১, পৃ. ৬২]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে, হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন?

উত্তর :

১. তিনি মনে করেছিলেন, نَهِى টা ছিল نَهِى تَنْزِيْهِى তাহরীমী নয়।

২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ.১, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ اَلشَّيْطَانُ : **শয়তানের পরিচয় :** শয়তান হলো সেই দুষ্ট সত্তা, যে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে দূরে সরে গেছে।

اَلشَّيْطَانُ فَيْعَالٌ مِنْ شَطْنٍ اَىْ بَعُدَ سُمِّىَ بِهِ لِبُعْدِهِ عَنِ الْخَيْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ (مَعَالِم) شَيْطَنٌ اَىْ تُبَاعِدٌ (رَاغِب)

পূর্বোক্ত ইবলীসকেই এখানে গুণবাচক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। নাফরমানির কারণে জান্নাত থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। মানবের প্রতি রয়েছে তার সুতীব্র বিদ্বেষ। এখন তার নাম হয়েছে শয়তান। পৃথক কোনো ক্ষমতা নেই তার। মানুষকে সে বিন্দুমাত্র মজবুর বা বাধ্য করতে সক্ষম নয়। তবে প্রচারণা ও প্ররোচনা শিল্পের সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পাপকর্মে মানুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অসুন্দরকে সুন্দরের মোড়কে তুলে ধরার কাজে সে অত্যন্ত সুনিপুণ। ওয়াসওয়াসা ও চিত্তবিক্ষেপ ঘটানোর ক্ষমতা তার তীব্র। দূর ও নিকট যে কোনো স্থান থেকেই উদ্দেশ্য সাধনে সে পারঙ্গম। দূরত্ব ও ব্যবধান তার জন্য কোনো সমস্যাই নয় এবং স্থূল প্রতিবন্ধকতা যে কোনো ধরনেরই হোক, তার উদ্দেশ্যের পথে তা অন্তরায় হতে পারে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ عَنْهَا : এর মাঝে عَنْ হরফটি سَبَب বা হেতু জ্ঞাপক, অর্থ হলো– তার কারণে। আর هَا সর্বনামটি شَجَرَة -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সেই গাছের কারণে এবং মাধ্যমে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পদস্খলনে নিমজ্জিত করেছে।

কেউ কেউ هَا সর্বনামের উদ্দেশ্য জান্নাতও ধরেছেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করল। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ وَقَاسَمَهُمَا : أَىْ قَسَمَ لَهُمَا فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلٰى بَابِهَا لِلْمُبَالَغَةِ

قَوْلُهُ مِمَّا كَانَا فِيْهِ : এর দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে, যে নিয়ামতের মাঝে তাঁরা ছিলেন, তা থেকে কিংবা যে মর্যাদায় তারা ছিলেন, তা থেকে। উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। اَىْ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ. (كَشَّاف) –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ اِذِ انْتَبَذَتْ : এটা উহ্য ظَرْف -এর مُضَافٌ ব্যাখ্যাকার (র.) خَبَرَهَا বলে তা প্রকাশ করেছেন। আবার مَرْيَمْ থেকে بَدْلُ الْكُلِّ অথবা بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ -ও হতে পারে। −[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَكَانًا شَرْقِيًّا : এটা اِنْتَبَذَتْ -এর ظَرْف কিংবা مَفْعُوْلٌ بِهٖ কেননা صِفَتْ ও مَوْصُوْف মিলে اِنْتَبَذَتْ শব্দটি اَتَتْ -এর অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ اِنْتَبَذَتْ . اَتَتْ مَكَانًا অর্থ– اِبْتَعَدَتْ . وَتَنَحَّتْ অর্থাৎ দূরবর্তী হওয়া, একদিক হওয়া।

قَوْلُهُ بَعْدَ لُبْسِهَا ثِيَابًا : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর, হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে ঘরে মহিলারা নগ্ন মাথায় থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতারা আসে না। আর মারইয়াম সেখানে নগ্ন ছিলেন। কাজেই ফেরেশতা আসলেন কিভাবে?

উত্তর : دَخَلَ بَعْدَ لُبْسِهَا অর্থাৎ কাপড় পরিধানের পরে ফেরেশতা এসেছেন।

قَوْلُهُ لِتَفْلِىْ : এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ . مُضَارِعْ উকুন বাছাই করার জন্য।

قَوْلُهُ رُوْحَنَا : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)।

قَوْلُهُ لَمْ اَكُ بَغِيًّا : এখানে بَغِيَّةً বলেননি, অথচ ক্ষেত্রটির চাহিদা এটাই ছিল। এর কারণ এই যে, মহিলাদের মধ্যে ব্যভিচারের দোষটি বেশির ভাগ ঘটে থাকে। এ কারণে حَائِضْ ও عَاقِرْ -এর ন্যায় খাস এর পর্যায়ে গণ্য হওয়ার কারণে স্ত্রীলিঙ্গের ة ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ : এটা قَالَ كَذٰلِكَ -এর عِلَّتْ বা কারণ -এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ এমনভাবেই হবে। কারণ এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। এটা মূলত একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : এখানে جُمْلَةْ تَعْلِيْلِيَّةْ -এর عَطْف হয়েছে غَيْر تَعْلِيْلِيَّةْ -এর উপর। আর এটা সঙ্গত নয়।

উত্তর : এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও جُمْلَةْ تَعْلِيْلِيَّةْ অতএব لِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ -এর উপর তার عَطْف সঙ্গত হবে।

قَوْلُهُ الْمَخَاضُ : অর্থ– প্রসব বেদনা।

قَوْلُهُ فَتَنْتَهِىْ : এটা বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -এর জওয়াবের শর্ত فَتَنْتَهِىْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَتَزَوَّجْ : ব্যাখ্যাকার (র.) এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : لَمْ يَمْسَسْنِىْ -এর দ্বারা মিলন না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বুঝায়। অতএব, এটা হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে শামিল করে। কাজেই لَمْ اَكُ بَغِيًّا বলার প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর. ওরফে বৈধ মিলনকে مَسّ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর অবৈধ মিলনকে ওরফে مَسّ বলা হয় না; সুতরাং হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে নফী করার জন্য لَمْ اَكُ بَغِيًّا বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ اَجَابَهَا : এর ব্যাখ্যা جَاءَ بِهَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ এক مَفْعُوْلْ -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ বাহ্যিকভাবে প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, جَاءَ শব্দের শুরুতে হামযা বৃদ্ধি করার দ্বারা সম্ভবত দুই مَفْعُوْلْ -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়েছে। ব্যাখাকার (র.) جَاءَ بِهَا বলে তা দূর করে দিয়েছেন। এমনও বলা যেতে পারে যে, اَجَاءَ শব্দটি الْجَاءُ অর্থে। আর ব্যবহার পরিবর্তন হওয়ার কারণে এক মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী রুকুতে হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে বৃদ্ধকালে আল্লাহ তা'আলা একটি সুসন্তান দান করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত জাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ ছিলেন এবং তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও রহমত স্বরূপ

তিনি লাভ করেন পুত্র ইয়াহইয়া (আ.)। আর তার চেয়ে বিস্ময়কর হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। কেননা তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের একটি জীবন্ত নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর কোনো সৃষ্টিই মাবূদ বা উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইহুদি ও নাসারা উভয় পথহারা জাতির সংশোধনের জন্যে। কেননা ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতো আর খ্রিস্টানরা তাকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে দাবি করতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যাতে করে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং তার বিশেষ রহমত। হযরত ঈসা (আ.) জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেছেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর বন্দেগীর কথা ঘোষণা করেছেন– قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ। অর্থাৎ তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা।

এরপর তিনি তাঁর নিজের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের নবুয়তের কথা, বরকতের কথা এবং ইবাদতের কথা তথা নামাজ, জাকাত, প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নিজের বিনম্র স্বভাবের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে করে শ্রবণকারী মাত্রই একথা শ্রবণ করে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। যারা বাপ ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে আল্লাহ তা'আলার পুত্র আখ্যায়িত করে তারা অসত্য বলে থাকে। জন্মগ্রহণ করা এবং উপাস্য হওয়া একত্র হতে পারে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উপাস্য হওয়ার দলিল নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি হলো সম্মান এবং মর্যাদার প্রমাণ। হযরত ঈসা (আ.) স্তন্যপানের সময় বলেছিলেন– وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।" আর এটি একথার প্রমাণ যে হযরত ঈসা (আ.) খোদাও নন, তাঁর পুত্রও নন। কেননা যিনি খোদা হবেন তার কোনো প্রকার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ১৭৯-৮০]

তাই এ সত্য উপলব্ধির জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর এ কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন! এই কিতাব হলো পবিত্র কুরআন।

قَوْلُهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا : হযরত মারইয়াম (আ.) গোসল করার জন্যে সকলের নিকট থেকে দূরে তথা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ইবাদতের জন্যে একান্তে চলে যান। যেহেতু ঐ স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে ছিল তাই খ্রিস্টানরা পূর্ব দিককে তাদের কেবলা নির্ধারণ করেছে।

قَوْلُهُ حِجَابًا : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর তরজমা করেছেন, "লোক চক্ষুর অন্তরালে" কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তিনি দেয়ালের অন্তরালে বসেছিলেন। তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, তিনি পাহাড়ের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। তাফসীরকার ইকরামা (র.) বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) মসজিদে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি তার ঋতুকালে খালার গৃহে চলে যেতেন। ঐ সময় শেষ হলে পুনরায় মসজিদে আগমন করতেন। একদিন যখন তিনি গোসলের উদ্দেশ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) একজন পুরুষের বেশে তার সম্মুখে উপস্থিত হন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অর্থাৎ এরপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা [জিবরাঈল (আ.)]-কে প্রেরণ করি, সে তাঁর সম্মুখে মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়।

قَوْلُهُ رُوْحَنَا : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যতে রূহের সম্পর্ক নিজের সাথে করেছেন। এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ سَوِيًّا : একজন সুদর্শন যুবকরূপে অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবকরূপে হাজির হন। হযরত মরিয়ম (আ.) যখন দেখলেন যে, একজন অজানা পুরুষ হঠাৎ তার দিকে আসছে তখন তিনি বললেন–

إِنِّىٓ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

অর্থাৎ যদি তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকে, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করি।

অর্থাৎ যদি তুমি মোত্তাকী পরহেজগার হও, তবে তোমার পরহেজগারী প্রমাণ স্বরূপ তুমি এখান থেকে সরে যাও। আর যদি তুমি পরহেজগার না হও তবুও আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে মানুষ মনে করেই আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে এজন্য হাজির হয়েছেন যেন তাকে দেখে হযরত মারইয়াম (আ.) ভীত সন্ত্রস্ত না হন। কেননা যদি হযরত জিবরাঈল (আ.) আপন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন তবে হয়তো হযরত মারইয়াম (আ.) বেহুশ হয়ে পড়তেন। অথবা এর দ্বারা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৮০]

হযরত জিবরাঈল (আ.) লক্ষ্য করলেন, যে হযরত মারইয়াম (আ.) ভীত হয়েই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ـ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। তখন হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন– قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

অর্থাৎ কিভাবে আমার পুত্র হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নূরানী চেহারা দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, আগন্তুক একজন ফেরেশতা । কিন্তু তিনি বিস্মিত ছিলেন এ বিষয়ে যে বর্তমান অবস্থায় তার সন্তান কিভাবে হবে? আর আমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হইনি, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন; কিন্তু আমি তো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নই। বর্তমান অবস্থায় কিভাবে আমার সন্তান হবে?

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রদত্ত সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ এই, সাধারণত যে পন্থায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন হযরত মারইয়াম (আ.) সেই পন্থা বা পর্যায়ে পৌঁছেননি। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলা ইবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। এছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হয়। তিনি প্রচলিত পন্থায়ও মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর অজানা, অপ্রচলিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পন্থায়ও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর বিস্ময়ের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে আমার সন্তান হবে, আমাকে যে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি" তথা আমার যে বিয়ে-শাদী হয়নি। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قَالَ كَذٰلِكَ অর্থাৎ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ বিয়ে হয়নি, কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এতদসত্ত্বেও এভাবেই হবে। আল্লাহ তা'আলার মর্জি হলে সবই সম্ভব।

মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা :

১. সাধারণত পিতামাতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করেন। এটাই সাধারণ পন্থা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার ব্যতিক্রমও করতে পারেন। যেমন–

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পিতামাতা কেউ ছিল না। অর্থাৎ নরনারী ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন।

৩. এমনিভাবে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন মাতা ব্যতীত।

৪. আর হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ১৬, পৃ. ২৪]

মৃত্যুকামনার বিধান : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মৃতু কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওজর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি হযরত মারইয়াম (আ.) ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মোকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বলা হয়েছে তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে হযরত মারইয়াম (আ.) কোনো মানত করেননি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হয়ে গেছে : ইসলাম পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারো সাথে কথা না বলার রোজাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা গালি গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরি করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোনো ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েজ নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোনো ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থেও বোঝা যায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মুজেযা। মুজেযার যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে আলৌকিকতা গুণটি আরো বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরো বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনোরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বুঝা যায় যে, রিজিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। -[রূহুল মা'আনী]

মহিলা নবী হতে পারে কি? আলেম ও মুফাসসিরগণের এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হযরত মারইয়াম (আ.) নবী ছিলেন কিনা? আর মহিলারা নবী হতে পারে কিনা? কোনো কোনো আলেম এ আয়াত দ্বারা মহিলা নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে মহিলাদের নিকট ওহী আসতে পারে। তবে তা وَحْيِ رِسَالَةٌ নয়। কারণ এটা পুরুষের সাথে খাস। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল তা ছিল وَحْيِ بَشَارَتْ [সুসংবাদমূলক ওহী] ; وَحْيِ رِسَالَةٌ নয়।

বালাগাত : وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْجِمَاعِ .

٢٦. فَكُلِىْ مِنَ الرُّطَبِ وَاشْرَبِىْ مِنَ السَّرِىِّ وَقَرِّىْ عَيْنًا ج بِالْوَلَدِ تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ لِتَقَرَّ عَيْنُكِ بِهٖ اَىْ تَسْكُنَ فَلَا تَطْمَحُ اِلٰى غَيْرِهٖ فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ شَرْطِيَّةِ فِىْ مَا الْمَزِيْدَةِ تَرَيِنَّ حُذِفَتْ مِنْهُ لَامُ الْفِعْلِ وَعَيْنُهٗ وَاُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَيَسْأَلُكِ عَنْ وَلَدِكِ فَقُوْلِىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا اَىْ اِمْسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ فِىْ شَانِهٖ وَغَيْرِهٖ مَعَ الْاَنَاسِىِّ بِدَلِيْلِ فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ج اَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ :

২৬. সুতরাং আপনি আহার করুন পাকা ও তাজা খেজুর থেকে এবং পান করুন প্রবাহিত নহরের পানি থেকে এবং চক্ষু ঠাণ্ডা করুন পুত্র সন্তান দ্বারা عَيْنًا শব্দটি لِتَقَرَّ عَيْنُكِ فَاعِلْ হতে স্থানান্তরিত تَمْيِيْز অর্থাৎ بِهٖ তথা আপনি তার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করুন। অন্য বাচ্চার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। মানুষের মধ্যে কাউকে যদি আপনি দেখেন কোনো মানুষকে আপনার সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে। এখানে اِمَّا -এর মধ্যে نُوْن شَرْطِيَّةْ -কে অতিরিক্ত مَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। تَرَيِنَّ -এর মধ্যে لَامْ কَلِمَةْ عَيْن এবং عَيْن كَلِمَةْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর كَلِمَةْ -এর হরকতকে رَاءْ -এর উপর দেওয়া হয়েছে এবং يَائے ضَمِيْر -কে দু সাকিন একত্র হওয়ায় যের দেওয়া হয়েছে। তখন আপনি বলুন! আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। অর্থাৎ তার ব্যাপারে এবং অন্য কোনো ব্যাপারে মানুষের সাথে কথা না বলার মানত করেছি। এ ব্যাপারে দলিল হলো فَلَنْ اُكَلِّمَ .... সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না। অর্থাৎ এরপর।

٢٧. فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط حَالٌ فَرَأَوْهُ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ـ عَظِيْمًا حَيْثُ اَتَيْتِ بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِ اَبٍ ـ

২৭. অতঃপর তিনি সন্তান কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। تَحْمِلُهٗ বাক্যটি حَالٌ হয়েছে। তারা তাকে দেখল তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ মহা বিস্ময়কর! তুমি পিতৃহীন সন্তান নিয়ে আগমন করেছ।

٢٨. يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَىْ يَا شَبِيْهَتَهٗ فِى الْعِفَّةِ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَءَ سَوْءٍ اَىْ زَانِيًا وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ج زَانِيَةً فَمِنْ اَيْنَ لَكِ هٰذَا الْوَلَدُ ـ

২৮. হে হারুন ভগ্নি! তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ হে সতিত্বে হারুন তুল্য নারী। তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না ব্যভিচারী। তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী তাহলে এই সন্তান তুমি কোথায় পেলে।

٢٩. فَاَشَارَتْ لَهُمْ اِلَيْهِ ط اَنْ كَلِّمُوْهُ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ اَىْ وُجِدَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ـ

২৯. অতঃপর হযরত মারইয়াম (আ.) ইঙ্গিত করলেন তাদের কথার জবাবে সন্তানের প্রতি তারা যেন তার সাথে কথা বলে তারা বলল যে, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব?

অনুবাদ :

٣٠. قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ط اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ اَىِ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا .

৩০. তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন। ইঞ্জিল কিতাব আর আমাকে নবী করেছেন।

٣١. وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص اَىْ نَفَّاعًا لِلنَّاسِ اِخْبَارٌ بِمَا كُتِبَ لَهٗ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ اَمَرَنِىْ بِهِمَا مَا دُمْتُ حَيًّا ص

৩১. আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। অর্থাৎ মানুষের জন্য অতি উপকারী। এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য যা লিখা হয়েছে তার সংবাদমূলক বাক্য। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে।

٣٢. وَبَرًّا ۢ بِوَالِدَتِىْ مَنْصُوْبٌ بِجَعَلَنِىْ مُقَدَّرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا مُتَعَاظِمًا شَقِيًّا . عَاصِيًا لِرَبِّهٖ .

৩২. আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। بَرًّا শব্দটি جَعَلَنِىْ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য অহংকারী ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণকারী।

٣٣. وَالسَّلٰمُ مِنَ اللّٰهِ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا . يُقَالُ فِيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِى السَّيِّدِ يَحْيٰى قَالَ تَعَالٰى .

৩৩. আর শান্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় আমি উত্থিত হবো। এ তিন অবস্থায় পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা হবে।

٣٤. قَالَ تَعَالٰى ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلُ الْحَقِّ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ اَىْ قَوْلُ ابْنِ مَرْيَمَ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ قُلْتُ وَالْمَعْنٰى اَلْقَوْلُ الْحَقُّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ . مِنَ الْمِرْيَةِ اَىْ يَشُكُّوْنَ وَهُمُ النَّصَارٰى قَالُوْا اِنَّ عِيْسٰى اِبْنُ اللّٰهِ كَذَبُوْا .

৩৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই-ই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্যকথা قَوْلُ الْحَقِّ এটা رَفْع-এর সাথে হলে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অর্থাৎ قَوْلُ ابْنِ مَرْيَمَ। আর যদি نَصْب-এর সাথে হয় তবে উহ্য قُلْتُ ক্রিয়ার মাফ'উল হবে। অর্থ– এটি সঠিক কথা। যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে يَمْتَرُوْنَ ফে'লটি مِرْيَةٌ হতে গঠিত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ পোষণ করে। আর তারা হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারা বলে নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ছেলে। মূলত তারা মিথ্যা বলে।

٣٥. مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنْ ذٰلِكَ اِذَا قَضٰى اَمْرًا اَىْ اَرَادَ اَنْ يُّحْدِثَهٗ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ط بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ اَنْ وَمِنْ ذٰلِكَ خَلْقُ عِيْسٰى مِنْ غَيْرِ اَبٍ .

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। এর থেকে তিনি মুক্ত যখন তিনি কিছু স্থির করেন অর্থাৎ সংঘটিত করতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, হও এবং তা হয়ে যায়। فَيَكُوْنُ টি رَفْع যুক্ত হলে তা هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর হবে। আর نَصْب যুক্ত হলে اَنْ উহ্য থেকে نَصْب হবে। আর এ كُنْ فَيَكُوْنُ-এর মধ্যে একটি হলো পিতাবিহীন হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি।

٣٦. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط بِفَتْحِ اَنَّ بِتَقْدِيْرِ اُذْكُرْ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيْرِ قُلْ بِدَلِيْلِ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ هٰذَا الْمَذْكُوْرُ صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ مُؤَدٍّ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

٣٧. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ج اَىِ النَّصَارٰى فِىْ عِيْسٰى اَهُوَ ابْنُ اللّٰهِ اَوْ اِلٰهٌ مَعَهٗ اَوْ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهٖ مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ اَىْ حُضُوْرِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاَهْوَالِهٖ ـ

٣٨. اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ لا بِهِمْ صِيْغَتَا تَعَجُّبٍ بِمَعْنٰى مَا اَسْمَعَهُمْ وَمَا اَبْصَرَهُمْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا فِى الْاٰخِرَةِ لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ مِنْ اِقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ ـ الْيَوْمَ اَىْ فِى الدُّنْيَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ اَىْ بَيِّنٍ بِهٖ صَمُّوْا عَنْ سِمَاعِ الْحَقِّ وَعَمُوْا عَنْ اَبْصَارِهٖ اَىْ اَعْجَبْ مِنْهُمْ يَا مُخَاطَبًا فِىْ سَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا فِى الدُّنْيَا صُمًّا عُمْيًا ـ

٣٩. وَاَنْذِرْهُمْ خَوِّفْ يَا مُحَمَّدُ كُفَّارَ مَكَّةَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَتَحَسَّرُ فِيْهِ الْمُسِىْءُ عَلٰى تَرْكِ الْاِحْسَانِ فِى الدُّنْيَا اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ ط لَهُمْ فِيْهِ بِالْعَذَابِ وَهُمْ فِى الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةٍ عَنْهُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ بِهٖ ـ

অনুবাদ :

৩৬. আল্লাহ তা'আলাই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। اَنَّ এটা যবর যুক্ত হলে তার পূর্বে একটি اُذْكُرْ উহ্য মানতে হবে। আর اِنَّ টি যেরযুক্ত হলে পূর্বে قُلْ উহ্য মানতে হবে। শেষোক্তটির দলিল হলো সামনে مَا قُلْتُ لَهُمْ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি– আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাদেরকে তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি। আর তা হলো তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপাসনা কর। তিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আর এটাই যা উল্লেখ করা হলো সরল পথ যা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল অর্থাৎ খ্রিস্টানদের একদল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলল যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার পুত্র। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেক খোদা। আর তৃতীয় দল বলল, তিনি তিন খোদার তৃতীয় জন। [নাউযুবিল্লাহ] সুতরাং দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্য মহাদিবস আগমনকালে। অর্থাৎ কিয়ামত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতিসমূহের আগমন।

৩৮. তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে শব্দ দুটি تَعَجُّبْ তথা বিস্ময়সূচক অর্থ– তারা কতই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হবে তারা যেদিন আমার কাছে আসবে পরকালে। কিন্তু জালিমরা এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم ব্যবহার করা হয়েছে। আজ পৃথিবীতে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। প্রকাশ্য। বস্তুত সত্য শ্রবণ থেকে ও সত্য প্রত্যক্ষকরণ থেকে তারা অন্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। পৃথিবীতে তাদের বধির ও অন্ধ থাকা সত্ত্বেও পরকালে তাদের প্রতি শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ে বিস্ময় বোধ কর।

৩৯. আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কার কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে আর তা হলো কিয়ামতের দিন। পাপীরা সেদিন পৃথিবীতে সৎকাজ না করার কারণে আফসোস করবে। যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তাদের আজাবের বিষয়ে এখন তারা পৃথিবীতে গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।

অনুবাদ :

٤٠. اِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدٌ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِاِهْلَاكِهِمْ وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ـ فِيْهِ لِلْجَزَاءِ ـ

৪০. নিশ্চয় পৃথিবী ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই থাকবে। বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল কিছু ধ্বংসের। এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে। পরকালে প্রতিদানের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَرِّىْ : শব্দটি فَرِّىْ-এর ওজনে। তুমি শীতল কর। এটা قَرٌّ থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ হলো– শীতল করা। عَيْنًا শব্দটি تَمْيِيْز হয়েছে فَاعِلْ-এর অর্থে থেকে। অর্থাৎ لِتَقَرَّ عَيْنُكِ بِهٖ

قَوْلُهُ فَرِيًّا : শব্দটি فَرِىٌّ ـ فَعِيْل অর্থে مَفْعُوْلٌ-এর অন্তর্গত। তৈরি করা, বানানো, দ্রুত করা। কেউ কেউ বলেন, এটা বড় ও আশ্চর্যকর অর্থে। مَنْ كَانَ-এর মধ্যে كَانَ শব্দটি تَامَّةٌ ـ صَبِيًّا হলো كَانَ-এর যমীর থেকে حَالٌ আর যদি نَاقِصَةٌ হয় তাহলে صَبِيًّا তার খবর হবে।

قَوْلُهُ ذَالِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ : এখানে ذَالِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো উপরিউক্ত عَبْدِيَّتْ-এর স্বীকারোক্তি প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত সত্তা হযরত ঈসা (আ.), ذٰلِكَ হলো مُبْتَدَأٌ আর عِيْسٰى মাওসূফ اِبْنُ مَرْيَمَ সিফাত উভয়টি মিলে খবর। قَوْلُ الْحَقِّ উহ্য مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ অর্থাৎ قَوْلُهُ قَوْلُ الْحَقِّ আর قَوْلُ الْحَقِّ-এর মধ্যে সিফাতের প্রতি মওসূফের ইজাফত হয়েছে। অর্থাৎ এটা اَلْقَوْلُ الْحَقُّ-এর অর্থে। এটাকে যদি যবর দিয়ে বলা হয় তাহলে اَقُوْلُ উহ্য ফে'লের মাফউল হবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَهْدِ : এখানে مَهْد অর্থ দোলনাও হতে পারে এবং মায়ের কোলও উদ্দেশ্য হতে পারে। يَمْتَرُوْنَ শব্দটি اِمْتِرَاءٌ থেকে مِرْيَةٌ অর্থ– সন্দেহ। اَلَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ اَىْ يَتَرَدَّدُوْنَ وَيَتَحَيَّرُوْنَ ـ

قَوْلُهُ يَتَّخِذُ : মাসদারের তাবীরে হয়ে كَانَ-এর اِسْمٌ অর্থাৎ مَكَانَ اِتِّخَاذِ الْوَلَدِ مِنْ صِفَتِهٖ بَلْ هُوَ مَحَالٌ عَنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ اِتِّخَاذُ الْوَلَدِ مِنْ وَلَدٍ-এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ذٰلِكَ خَلَقَ عِيْسٰى : এবং كُنْ فَيَكُوْنُ-এর অন্তর্গত হলো হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতাবিহীন সৃষ্টি করা। سُبْحَانَهٗ শব্দটি মাসদার। ফে'লকে বিলোপ করে مَصْدَرٌ তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ اُسَبِّحُهٗ سُبْحَانًا এটা مُعْتَرِضَةٌ বাক্য। قُلْ উহ্য মানার ক্ষেত্রে اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি হবে। এর দলিল এই যে, হযরত ঈসা (আ.) বললেন, هٰذَا مِنْ كَلَامِ عِيْسٰى بِدَلِيْلِ مَا قُلْتُ لَهُمْ ; مَا قُلْتُهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ الخ বাক্যটি এরূপ হবে– الخ মোটকথা উভয় কেরাতের সুরতে اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি হবে।

قَوْلُهُ تَرَيِنَّ : মূলত تَرْاَيِيْنَ ছিল। এর মধ্যে رَاء হলো فَاءْ كَلِمَةٌ আর হামযা عَيْن كَلِمَةٌ এবং যেরযুক্ত لَامْ হলো يَاءْ كَلِمَةٌ পরবর্তী يَاءْ টি যমীর। শেষে نُوْن اِعْرَابِىْ যুক্ত হয়েছে। প্রথম হরকতবিশিষ্ট ى টি তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হামযা হওয়ার কারণে আলিফ হয়ে গেছে। এখন আলিফ ও যমীরের ى-এর মাঝে দু'সাকিন একত্র হয়েছে। ফলে হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। আর نُوْن اِعْرَابِىْ আমিলে জাযিম এর দরুন বিলোপ এবং নূনে তাকীদ ছকীলাহ প্রবিষ্ট হওয়ার পরে দু'সাকিন একত্র হয়েছে। এ কারণে যমীরের يَاءْ-কে কাসরা দেওয়া হয়েছে।

সারকথা : تَرَايْـنَ -এর মধ্যে মোট ছয়টি আমল হয়েছে। ১. ى -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ২. আলিফকে বিলোপ করা হয়েছে। ৩. হামযা এর হরকত رَا -কে দেওয়া হয়েছে। ৪. হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। ৫. اِنْ شَرْطِيَّةٌ -এর কারণে نُوْن اِعْرَابِىْ পতিত হয়েছে। ৬. যমীরের يَاءٌ -কে যের দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنَاسِىَّ : এটা হয়তো اِنْسِىٌّ -এর বহুবচন। অথবা اِنْسَانٌ -এর বহুবচন। শব্দটি মূলত اَنَاسِيْنَ ছিল نُوْنَ -কে ى দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ى -কে অপর ى -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ : এটা فَوَيْلٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ مِنْ شُهُوْدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ এ সময় مَشْهَدٌ মাসদারের অর্থে হবে। অথবা হাজির হওয়ার স্থান বা সময় হবে।

قَوْلُهُ لٰكِنِ الظَّالِمُوْنَ : মুশরিকদের কুকীর্তি ও কদার্যতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে لٰكِنَّهُمْ -اِسْمُ ضَمِيْرٍ-এর স্থলে ظَالِمُوْنَ প্রকাশ্য اِسْمٌ উল্লেখ করেছেন।

ফায়েদা : قَوْلُهُ اَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ এ ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন. আয়াতের মধ্যে تَنَاقُضٌ তথা পরস্পর বিরোধ ঘটেছে। কেননা উপরে বলা হয়েছে اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا এ বাক্যে কথা না বলার মানত হয়ে গেছে। এর পরে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উক্তি- فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا এটাও তো একটা কথা?

উত্তর : এখানে এর পরে কারো সাথে কথা বলব না উদ্দেশ্য। كَانَ -এর ব্যাখ্যা وُجِدَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে كَانَ হলো تَامَّةٌ আবার অতিরিক্তও হতে পারে। صَبِيًّا শব্দটি حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ فِى الْمَهْدِ حَالَ صَبَاءٍ

قَوْلُهُ اِخْبَارًا بِمَا كُتِبَ لَهُ : এর দ্বারা جَعَلَنِىْ -এর তাফসীর করে একথা বুঝিয়েছেন যে, অতীতকালীন সীগাহ দ্বারা এখানে ভবিষ্যৎকাল উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا : হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, এখন আর তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরত ও রহমতে টাটকা খেজুরের ব্যবস্থা করেছেন। খেজুরের ডালটি তোমার দিকে টেনে আনলেই তাজা টাটকা পাকা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। তুমি ঐ খেজুর খাও, আর তোমার উপত্যকার তলদেশে যে ঝরণা আল্লাহ তা'আলার রহমতে প্রবাহিত হচ্ছে তার পানি পান কর। আর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান স্বরূপ যে পুত্র লাভ করছো তাকে দেখে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত কর। ভবিষ্যতে কি হবে বা কে কি বলবে? এই বিষয়ে চিন্তা করো না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যিনি শুষ্ক মাটিতে তোমার জন্যে ঝরনা প্রবাহিত করেছেন, মৃত শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের ডালে যিনি তোমার জন্যে তাজা পাকা খেজুর দিয়েছেন, তিনি তোমাকে পিতা ব্যতীত পুত্রও দিতে পারেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- كُلِىْ وَاشْرَبِىْ ; এর কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে। বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا : হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বললেন, যদি কোনো মানুষ নবজাত শিশু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে, তখন তুমি কোনো কথার জবাব দিয়ো না; বরং ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে যে, আমি আজ আল্লাহ তা'আলার নামে রোজা মানত করেছি, কোনো ব্যাপারেই আজকে আমি কথা বলবো না।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আমাদের রোজায় যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়, তেমনি বনী ইসরাঈলের জন্যে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকার বিধান ছিল। আমাদের শরিয়তে কিন্তু এমন রোজা নিষিদ্ধ আর এমন রোজার মানত করাও বৈধ নয়। বনী ইসরাঈলরা যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতো, তেমনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো কথাও বলতো না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। আর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক সময়ে তিনি নিজেই কথা বলবেন। বর্ণিত আছে যে,হযরত মারইয়াম (আ.) ঐ সময় ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে নয়।

قَوْلُهُ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ : এরপর হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-কে কোলে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট উপস্থিত হলেন। পথে নবজাত শিশু হযরত ঈসা (আ.) বলেন, আম্মা আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং মসীহ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ছিলেন অত্যন্ত নেককার। আর এ কারণেই কুমারী মারইয়াম (আ.)-এর কোলে নবজাত শিশু দেখে তারা এত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলেন যে, সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.) যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন এ সম্পর্কে ইবনে আসাকের (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মারইয়াম (আ.) সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ شَيْئًا فَرِيًّا : আরবি ভাষায় فَرِيٌّ শব্দের আসল অর্থ- কর্তন করা ও চিলে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فَرِيٌّ বলা হয়। আবূ হাইয়্যান বলেন, প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فَرِيٌّ বলা হয়। ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

قَوْلُهُ يَا اُخْتَ هَارُوْنَ : হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ.) মারইয়াম (আ.)-এরে যুগের শত শত বছর পূর্বে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখানে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-কে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভাগিনী বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ.) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্য পয়গাম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারের সাধারণ অভ্যাস। -[মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী।]

এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে- ১. হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে। যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اَخَا تَمِيْم এবং আরবের লোককে اَخَا عَرَبْ বলে অভিহিত করে। ২. এখানে হারূন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর হারূন নবীকে বুঝানো হয়নি; বরং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

قَوْلُهُ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ : কুরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী আল্লাহ ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের, সন্তান-সন্ততি, মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশি গুনাহ হয়। কারণ এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুজুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

قَوْلُهُ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ : এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন হযরত মারইয়াম (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ.) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং

বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে একথা বলেন– انى عبد الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ.) এই ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি আলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি আল্লাহ নই, আল্লাহ তা'আলার বান্দা। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا : এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর দুগ্ধপানের জমানায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গাম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন, আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন হযরত আদম (আ.)-এর জন্মই হয়নি। তার খামির তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, তখনি নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী ﷺ -এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী বানিয়েছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী বানানোর কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালাত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোনো গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ : তাকিদ সহকারে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে وَصِيَّتٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ ও জাকাতের অসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাকিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজ ও রোজা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরিয়তে ফরজ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরিয়তে এগুলোর আকার আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তেও নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) তো কোনো সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে জাকাতের আদেশ দেওয়ার কি অর্থ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর জাকাত ফরজ এটা ছিল তাঁর শরিয়তের আইন। হযরত ঈসা (আ.)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। আর তা এভাবে যে, কোনো সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্র হলে তাঁকেও জাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থি নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ مَا دُمْتُ حَيًّا : অর্থাৎ নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বুঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর থেকে অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতিকাল।

قَوْلُهُ بَرًّا بِوَالِدَتِىْ : এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন আলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ : হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদিরা তার অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ قَوْلَ الْحَقِّ : লামের যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপে হলো এরূপ اَقُوْلُ قَوْلَ الْحَقِّ কোনো কোনো কেরাতে লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং قَوْلُ الْحَقِّ [সত্য উক্তি] যেমন তাকে كَلِمَةٌ

اَللّٰه [আল্লাহ তা'আলার উক্তি] উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তার জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার উক্তির মাধ্যমে হয়েছে। –[কুরতুবী]

يَوْمُ الْحَسْرَةِ কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎ কর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত। কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদের হবে। হযরত মু'আজ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবূ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, যেসব মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোনো পরিতাপ হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন, সৎ কর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরো বেশি সৎকর্ম কেন করলো না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তরে স্থান অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ : বর্ণিত আছে যে, শিশু হযরত ঈসা (আ.) মায়ের ইঙ্গিত পেয়ে দুগ্ধ পান ছেড়ে দিলেন এবং লোকদের দিকে ফিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, আমার মাতার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা [আমি আল্লাহর পুত্র নই।] এখানে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-ই করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ফলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভিত্তিহীন ও বাতিল মতবাদের বাতুলতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

প্রথম বৈশিষ্ট্য : إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা, আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ আমি পিতা ব্যতীত অলৌকিকভাবে সৃষ্টি হয়েছি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো তার সম্মানিত মাতার উপর যখন অপবাদের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল তা দূরীভূত করা। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা, অতএব কেউ যেন আমাকে অন্য কিছু মনে না করে। এভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে খ্রিস্টানরা যে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে আপবাদ দেয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব সম্পর্ক থেকে অনেক উর্ধ্বে, তিনি সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র। খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদের পর তিনি ইহুদিদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন– وَجَعَلَنِي نَبِيًّا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী মনোনীত করেছেন, ইহুদিরা যে দাবি করে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নবী নন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথারও প্রতিবাদ করেছেন হযরত ঈসা (আ.)। মনে রাখতে হবে যখন তিনি এসব কথা বলছিলেন তখন তিনি কোলের কচি শিশু, যার পক্ষে কোনো কথা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

এরপর তিনি তার সম্মানিত মাতা সম্পর্কে লোকেরা যে অপবাদ দিয়েছিল তার প্রতিবাদ করে বলেছেন– وَجَعَلَنِي مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকতময় করেছেন। আমার মাতা তোমাদের আরোপিত অপবাধ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি সতী, সাধ্বী, তিনি পুণ্যের প্রতীক।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল দান করেছেন, যা আমার নবুয়তের প্রমাণ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী বানিয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তিনি আমাকে নবী বানাবেন এবং আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করবেন। আর যেহেতু এই সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত, তাই এর নির্দিষ্ট সময়ে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : وَ جَعَلَنِىْ مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকি বা যেখানেই গমন করি, বরকত আমার সঙ্গে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন। আর তা এ কথার প্রমাণ যে, আমি আল্লাহ তা'আলার একজন মুবারক বান্দা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যারা সর্বদা নামাজ আদায় করে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ সর্বক্ষণ নামাজই আদায় করবে; বরং যথা সময়ে নামাজ কায়েম করবে। এ নির্দেশই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ যতক্ষণ আমি পৃথিবীতে জীবিত থাকি। এর কারণ এই যে, পৃথিবী থেকে আসমানে উত্তোলনের পর শরিয়তের বিধান পালন করা জরুরি থাকে না। কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি যথানিয়মে শরিয়তের বিধান পালন করবেন। এর তাৎপর্য হলো এই, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের আদেশ দিয়েছেন। আর নামাজ এবং জাকাত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। ইবাদত এবং বন্দেগী প্রমাণ হলো বান্দা হওয়ার। আর বান্দা হওয়ার এবং মা'বুদ বা উপাস্য হওয়া কখনো একত্র হতে পারে না। অতএব খ্রিস্টানরা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বা অন্য কিছু বলে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অলীক কল্পনা মাত্র।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার মাতার খেদমতগুজার বানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সেবাযত্ন করা এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব আমার প্রতি অর্জিত হয়েছে। একথাটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে আমি পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার মাতা সতী সাধ্বী এবং পূর্ণ পবিত্র, তার সম্মান এবং তাজীম করা আমার কর্তব্য।

যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর কোনো পিতা থাকতেন। তবে খেদমত এবং তাজীমের ব্যাপারে শুধু মাতার উল্লেখ থাকতো না; বরং পিতার কথাও উল্লেখ করা হতো। যেমন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে– وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ অর্থাৎ হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাঁর পিতামাতা উভয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য : وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষ্ঠুর হতভাগা করেননি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করবো; বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে নেককার এবং বিনয়ী করেছেন। কেননা যার মধ্যে বিনয় থাকে না, যে অহংকারী হয় তার ধ্বংস অনিবার্য। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা নামাজ কায়েম করে না এবং জাকাত আদায় করে না এবং মাতার অবাধ্য হয় তারা নিঃসন্দেহে অহংকারী এবং বদনসীব হয়। আর বিনয়ী এবং নেককার হওয়া এ কথার প্রমাণ যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ছিলেন। কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমি যদি আমার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার বা কোনো সৃষ্টির হক যথাযথভাবে পালনে বিরত থাকি তবে তা হবে আমার দুর্ভাগ্য এবং বদনসিবী।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য : বস্তুত এটি হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর অষ্টম বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি স্তরের জন্যে রহমত, শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর এ কথাটিও তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার অতি পছন্দনীয় বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ তা'আলার রহমতেই তিনি লাভ করেছেন এসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি। অতএব, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং রাসূলও। খ্রিস্টানরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা সত্য নয়, আর ইহুদিরা তার সম্পর্কে যা বলে তাও অসত্য।

অনুবাদ :

٤١. وَاذْكُرْ لَهُمْ فِى الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ ط اَىْ خَبَرَهُ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا مُبَالِغًا فِى الصِّدْقِ نَبِيًّا - وَيُبْدَلُ مِنْ خَبَرِهِ -

৪১. উল্লেখ করুন মক্কার কাফেরদের নিকট এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা অর্থাৎ তাঁর কাহিনী বর্ণনা করুন! তিনি ছিলেন সত্য নিষ্ঠ নবী। অতিশয় সত্যাশ্রয়ী। আর اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ এটা خَبَرُهُ থেকে بَدْل হয়েছে। অর্থাৎ সে সময়ের কাহিনী বর্ণনা করুন।

٤٢. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ يٰاَبَتِ التَّاءُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَعْبُدُ الْاَصْنَامَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ لَا يَكْفِيْكَ شَيْئًا - مِنْ نَفْعٍ اَوْ ضَرٍّ -

৪২. যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! اَبَتِ-এর تَاءْ টি ইজাফতের يَاءْ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়টি একত্র হয় না। তার পিতার নাম ছিল আযর। সে মূর্তিপূজক ছিল। তুমি তার ইবাদত কর কেন? যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনোই কাজে আসে না। অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিষয়ে তোমার কোনো কাজে আসে না।

٤٣. يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاۤءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا طَرِيْقًا سَوِيًّا - مُسْتَقِيْمًا -

৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন! আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। সোজা রাস্তা।

٤٤. يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ط بِطَاعَتِكَ اِيَّاهُ فِىْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا - كَثِيْرَ الْعِصْيَانِ -

৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। মূর্তি পূজার মাধ্যমে তার অনুসরণ করে। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। অতিশয় বিরুদ্ধাচরণকারী নাফরমান।

٤٥. يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ اِنْ لَمْ تَتُبْ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا - نَاصِرًا وَقَرِيْنًا فِى النَّارِ -

৪৫. হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করি যে, দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। যদি আপনি তওবা না করেন, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু। সাহায্যকারী ও দোজখের সঙ্গী।

٤٦. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ ج فَتَعِيْبُهَا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهَا لَاَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ اَوْ بِالْكَلَامِ الْقَبِيْحِ فَاحْذَرْنِىْ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا - دَهْرًا طَوِيْلًا -

৪৬. পিতা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেবদেবী হতে বিমুখ? যার ফলে তুমি তাদের দুর্নাম করছ। যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তার সমালোচনা হতে। তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব? পাথর মেরে অথবা কটুবাক্য ব্যবহার করে। কাজেই তুমি আমার থেকে সতর্ক হও। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। অর্থাৎ সুদীর্ঘ কাল।

অনুবাদ :

٤٧. قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج مِنِّىْ اَىْ لَا اُصِيْبُكَ بِمَكْرُوْهٍ وَسَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ مِنْ حَفِيٍّ اَىْ بَارًّا فَيَجِبُ دُعَائِىْ وَ قَدْ وَفٰى بِوَعْدِهٖ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُوْرِ فِى الشُّعَرَاءِ وَاغْفِرْ لِاَبِىْ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ بَرَاءَةٍ ـ

৪৭. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপনার প্রতি সালাম। আমার পক্ষ হতে অর্থাৎ আপনার নিকট কোনো অনিষ্ট পৌঁছবে না। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। حَفِيًّا শব্দটি حَفِىٌّ থেকে নির্গত অর্থ– দয়াময়, স্নেহপরায়ণ। ফলে তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করবেন। সূরা শু'আরায় উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তা হলো– وَاغْفِرْ لِاَبِىْ [আপনি আমার পিতাকে ক্ষমা করুন! এ আবেদন ছিল সে আল্লাহ তা'আলার শত্রু এটা প্রতীয়মান হওয়ার পূর্বে। যেমনটি সূরা বারাআতে উল্লিখিত হয়েছে।

٤٨. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَادْعُوْا اَعْبُدُ رَبِّىْ ز عَسٰى اَنْ لَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ بِعِبَادَتِهٖ شَقِيًّا ـ كَمَا شَقِيْتُمْ بِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ ـ

৪৮. আমি তোমাদেরকে হতে ও তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের আহ্বান কর। উপাসনা কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি। আমি আহ্বান করি। ইবাদত করি আমার প্রতিপালককে। আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে তাঁর ইবাদত করে ব্যর্থ হবো না। যেমনিভাবে তোমরা মূর্তি পূজা করে ব্যর্থ হয়েছো।

٤٩. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لا بِاَنْ ذَهَبَ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهَبْنَا لَهٗ اِبْنَيْنِ يَاْنَسُ بِهِمَا اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط وَكُلًّا مِّنْهُمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا ـ

৪৯. অতঃপর তিনি যখন তাদের হতে এবং তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের ইবাদত করত সে সকল হতে পৃথক হয়ে গেলেন। এভাবে যে, তিনি পবিত্র ভূমিতে চলে গেলেন। তখন আমি তাকে দান করলাম। দুজন পুত্র সন্তান। যাদের মাধ্যমে তিনি শক্তি সামর্থ্য ও সৌহার্দ্য অনুভব করবেন। ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম।

٥٠. وَوَهَبْنَا لَهُمْ الثَّلَاثَةَ مِنْ رَّحْمَتِنَا الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ـ رَفِيْعًا وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِىْ جَمِيْعِ اَهْلِ الْاَدْيَانِ ـ

৫০. আর দান করলাম তাদেরকে তাদের তিনজনকে আমার অনুগ্রহ দ্বারা সম্পদ ও সন্তান এবং তাদের নাম যশ সমুচ্চ করলাম। উঁচু করলাম আর তা হলো উত্তম প্রশংসা ও গুণকীর্তন সকল ধর্মাবলম্বীগণের মাঝে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ : এর আতফ হলো وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ-এর উপর। আর এর আতফ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ-এর উপর হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهٗ خَبَرَهٗ : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِبْرَاهِيْمَ-এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। কেননা খবর দেওয়া হয় অবস্থা সম্পর্কে, ব্যক্তি সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهُ صِدِّيْقًا : শব্দটি ইসমে মুবালাগার সীগাহ। অর্থ অতিশয় সত্যবাদী নবী। আর সিদ্দীকের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَقْ-এর সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ সকল নবীই সিদ্দীক ছিলেন। কিন্তু সকল সিদ্দীক নবী হওয়া জরুরি নয়। এভাবে ওলী এবং সিদ্দীক এর মাঝেও عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَقْ-এর সম্বন্ধ রয়েছে। সকল সিদ্দীক ওলী হয়ে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক ওলী সিদ্দীক হওয়া জরুরি নয়। صِدِّيْقِيَّتْ-এর স্তর নবুয়তের স্তরের তুলনায় নিম্নমানের।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ : এটা خَبَرَهٗ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ

قَوْلُهُ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا : এটা পূর্বের কথার عِلَّتْ বা কারণ। আর بَدْل ও مُبْدَلْ مِنْهُ-এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ। صِدِّيْقًا হলো كَانَ-এর প্রথম خَبَرْ আর نَبِيًّا হলো দ্বিতীয় খবর। কোনো কোনো আলেম বলেন, যে আযর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃত পিতা ছিলেন। কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা এটাই বুঝা যায়। আর কেউ কেউ বলেন, আযর ছিলেন তাঁর চাচা। রূপকার্থে ওরফ হিসেবে চাচাকে পিতা বলা হয়েছে। আর তার নাম ছিল তারেক।

قَوْلُهُ اَرَاغِبٌ : এটা মুবতাদা, আর اَنْتَ শব্দটি فَاعِلْ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে خَبَرْ হয়েছে। জিজ্ঞাসাটি আশ্চর্যসূচক। যেহেতু رَاغِبٌ শব্দটি هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامْ-এর পরে উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণে নাকেরা হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আবার اَرَاغِبٌ-কে خَبَرْ مُقَدَّمْ এবং اَنْتَ-কে مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ-ও বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ لَئِنْ : এর লামটি قَسَمِيَّةٌ তথা শপথ বুঝানোর জন্য। মূলত وَاللّٰهِ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ-এর অর্থে।

قَوْلُهُ الْعَصِيُّ وَالْعَاصِيْ : উভয়টি একই অর্থের। عَصِيٌّ মূলত عَصُوِيٌّ ছিল। وَاوْ-কে ى দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ى-কে অপর ى-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর ى-এর চাহিদা অনুযায়ী পূর্বে যের দেওয়া হয়েছে। ফলে عَصِيٌّ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا : এর আতফ হলো উহ্য وَاحْذَرْنِيْ-এর উপর। لَاَرْجُمَنَّكَ শব্দটি এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে। আর এর দ্বারা উভয় বাক্য اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে যায়। مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف-এর মধ্যে মিল থাকা ইমাম সীবওয়াইহে এর মতে জরুরি নয়। مَلِيًّا অর্থ– দীর্ঘ সময়। এর অপর অর্থ হলো সুস্থ ও নিরাপদ। এর উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘকালের জন্য তুমি আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে তুমি আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমাকে বিরক্ত করো না। অন্যথায় কোনো এক সময় আমার দ্বারা তোমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলতে আমাকে বাধ্য করো না। مَلِيًّا শব্দটি ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) دَهْرًا طَوِيْلًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা وَاهْجُرْنِيْ-এর فَاعِلْ-এর যমীর থেকে حَالْ-ও হতে পারে।

قَوْلُهُ نَاصِرًا وَقَرِيْنًا : এখানে قَرِيْنًا বলে ক্ষ্যান্ত করা উচিত ছিল। দোজখে প্রবেশ করার পরে কেউ কারো সহায়তাকারী হবে না।

قَوْلُهُ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا : এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই মনে হচ্ছে যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব আজাব বা শাস্তি লাভের কারণ হবে। অর্থাৎ আজাব স্পর্শের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব হবে। অথচ বাস্তবতা এই যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্বের কারণে আজাবের সম্মুখীন হবে। মুফাসসির (র.) قَرِيْنًا فِى النَّارِ বলে এর উত্তর দিয়েছেন।

قَوْلُهُ حَفِيًّا : এটা صِفَتْ مُشَبَّهٌ-এর সীগাহ। অর্থ– বড় দয়ালু, অতি করুণাময়।

قَوْلُهُ كُلًّا : এটা جَعَلْنَا-এর প্রথম মাফঊল। খাস করার উদ্দেশ্যে ফেলের পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কত সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন আর কিভাবে তিনি তার পিতাকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন, আর কিভাবে শিরক ও মূর্তিপূজার বাতুলতা প্রকাশ করেছেন। তাওহীদের দাওয়াতের সময় কিভাবে পিতার প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন এবং

কিভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের পিতাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এমনকি স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মরতবা বুলন্দ করেছেন, তাঁকে নেককার সন্তান-সন্ততি দান করেছেন, এসব কিছুর বিবরণই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ.)-এর দুহাজার বছর পর এবং হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত মারইয়াম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনায় সেসব বিভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে যারা কোনো জীবিত, জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মনে করতো, আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘটনায় সেই মুশরিকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা প্রাণহীন মূর্তির পূজা করতো এবং সেই মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতো। কিয়ামতের দিন তারা সর্বাধিক আক্ষেপ করবে।
–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০০]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরায় মূলত তিনটি বিষয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ১. তাওহীদ ২. নবুয়ত এবং ৩. হাশর। যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে তারা দু'ভাবে বিভক্ত। একদল যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো জীবিত বুদ্ধিমান মানুষকে মাবুদ বা উপাস্য মনে করে যেমন খ্রিস্টানরা। আর দ্বিতীয় দল হলো যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রাণহীন কোনো কিছুকে উপাস্য মনে করে। যেমন– যারা মূর্তিপূজা করে।

হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের প্রথম দলের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের দ্বিতীয় দলের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

এখানে উল্লিখিত ঘটনাটি আলোচ্য সূরার তৃতীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত শুরু করা হয়েছে এভাবে– وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ

অর্থাৎ হে রাসূল! যেভাবে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ২২২]

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম : আলেমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম কি ছিল–

১. তাওরাত এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তার পিতার নাম ছিল তারেক। ২. তবে পবিত্র কুরআনে তাঁর পিতার নাম আযর বলা হয়েছে। যেমন– ইরশাদ হয়েছে– وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

কোনো কোনো মুফাসসির এ মতানৈক্য নিরসন করার চেষ্টা করেছেন এবং তারা মন্তব্য করেছেন যে, **ক.** উভয়টি একই ব্যক্তির নাম। তার মূল নাম হলো তারেক, আর গুণগত নাম হলো আযর। কেউ এভাবে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন যে, ইবরানী ভাষায় আযর অর্থ হলো দেবতাপ্রেমিক।

আর তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরি ও মূর্তিপূজা উভয়ই করতো, এ কারণে আযর নামে তার উপাধি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। **খ.** কারো মতে আযর অর্থ اَعْوَجُ তথা নির্বোধ বা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। আর তারেকের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়টি বিদ্যমান ছিল, এ কারণেই সে এ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর পবিত্র কুরআনে এই নামই বর্ণিত হয়েছে।

২. অন্য একদল আলেমের বিশ্লেষণ এই যে, তারেক যে দেবতার পূজা-অর্চনা করতো তার নাম ছিল আযর। হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اَتَتَّخِذُ اٰزَرَ اِلٰهًا اَىْ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً অর্থাৎ তুমি কি আযরকে দেবতা মান? অর্থাৎ মূর্তিদেরকে আল্লাহ জ্ঞান কর। মোটকথা তাদের মতে اٰزَرَ শব্দটি اَبِيْهِ-এর بَدْل নয়; বরং এটি একটি দেবতার নাম। এ হিসেবে কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম উল্লেখ নেই।

৩. এক প্রসিদ্ধ উক্তি মতে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক। আর চাচার নাম ছিল আযর। আর আযরই যেহেতু তাঁকে সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করেছিল, এ কারণে কুরআনে আযরকে পিতা বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْعَمُّ صِنْوُ اَبِيْهِ অর্থাৎ চাচা বাপের মতোই।

আব্দুল ওহহাব নাজ্জার এর বর্ণনা মতে উপরিউক্ত উক্তিসমূহের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ মিসরের প্রাচীন দেবতাসমূহের মধ্যে একটির নাম ছিল أَزُورِيْس [আযরীস] এর অর্থ হলো ক্ষমতার ঈশ্বর ও সাহায্যকারী। আর মূর্তিপূজক জাতির মধ্যে শুরু থেকে এ প্রচলন চলে আসছিল যে, প্রাচীন দেবতাদের নামে নতুন দেবতাদের নাম রাখতো। এ কারণে মিশরের প্রাচীন দেবতাদের নামানুসারে এ দেবতার নাম রাখা হয়েছিল আযর। অন্যথতায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক।

আমাদের মতে এ সকল উক্তি ও মন্তব্য অহেতুক ও অসার। কেননা কুরআন যেহেতু স্পষ্টভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম আযর বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং আলেমগণের জন্য বাইবেল ও প্রাচীন পুস্তকাদির বর্ণনা ও যুক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাকে রূপক আখ্যা দেওয়া কিংবা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে কুরআনের আয়াতে ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণে শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব রাখে না।

মোদ্দাকথা এই যে, কালদী ভাষায় আদার (اَدَارٌ) বিশেষ উপাসককে বলা হয়। আর আরবি ভাষায় এটা আযর নামে পরিবর্তিত হয়েছে। তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরিকারী এবং বিশিষ্ট মূর্তিপূজক ছিল, এ কারণে সে আযর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অর্থাৎ এটা তার নাম নয়; বরং উপাধি। আর নামের স্থলে উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কুরআন মাজীদে সেটাই উল্লিখিত হয়েছে। –[কাসাসুল কুরআন খ. ১, পৃ. ১৫১]

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি মক্কাবাসীকে ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী শুনান। কারণ তারা দাবি করে থাকে যে, তারা তার বংশীয় সন্তান। যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনী এবং মূর্তিপূজার প্রতি অসন্তুষ্টির কথা শ্রবণ করে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদায় বিশ্বাসী হয়। তিনি নিজ কথা ও কর্মে বড়ই সত্যবাদী ও বিশিষ্ট নবী ছিলেন। তার যে কাহিনী আমি বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন তিনি তাঁর পিতার নিকট বলেছিল আব্বাজান! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা করেন কেন? যারা কিছুই শুনে না, কিছুই দেখে না এবং আপনার কোনো কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে না। আব্বাজান! আমার নিকট এমন ইলম ও জ্ঞান পৌঁছেছে যা আপনার নিকট নেই। আপনি আমার কথা মেনে চলুন। আমি আপনাকে সোজা রাস্তা বলে দিব। আপনি শয়তানের আনুগত্য করবেন না। অর্থাৎ তাকে এবং তার উপাসনাকে আপনি নিজেও অপছন্দ করেন। অথচ মূর্তিপূজার মধ্যে নিশ্চিতভাবে শয়তান পূজা অনিবার্য হয়। কেননা শয়তানই এসব কাজ করিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে শয়তান আল্লাহ তা'আলার বড় নাফরমান। সে কিভাবে আনুগত্যের যোগ্য হতে পারে? আব্বাজান! আমার খুবই আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনার উপর না জানি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আজাব এসে পড়ে। তখন আপনি নিজেও শয়তানের সাথে আজাবে লিপ্ত হবেন।

পিতা আযর পুত্র ইবরাহীম (আ.)-এর এসব কথা শুনে বলল, ব্যাপার কি? তুমি কি আমার দেবতাদের থেকে দূরে সরে গেছ? তুমি যদি তাদের সমালোচনা করা এবং অপমান করা, আর আমাকে তাদের উপাসনা করতে বারণ করা থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিব।

হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার আদব ও সম্মান পূর্ণভাবে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও মহব্বতের সাথে পিতাকে তাওহীদের উপদেশ শোনালেন। কিন্তু যতোই নম্র ও কোমলভাবে বর্ণনা করা হোক না কেন? মুশরিকদের জন্য তা গ্রহণ করা কঠিন বিষয়। সুতরাং মুশরিক পিতা পুত্রের এ বিনম্র আকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত কঠিনভাবে বলল, তুমি যদি আমার উপাস্যদের সমালোচনা থেকে বিরত না হও তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলব। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনাকে সালাম। আপনাকে আর কোনো কিছু বলতে চাই না। কারণ তা অনর্থ হবে। অতএব আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার মাগফেরাতে জন্য দোয়া করব। তিনি যেন আপনাকে হেদায়েত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আর আপনি যেহেতু আমার কথা মানতে প্রস্তুত নন, কাজেই আপনার নিকট আমার অবস্থান করা উচিত নয়। অতএব আমি আপনার এবং আপনার দেবতাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি শান্তভাবে আমার প্রভুর উপাসনা করব। মোটকথা এ কথার পরে তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাম দেশে হিজরত করলেন। আমি তাকে পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকুব দান করলাম। ইসমাঈল (আ.) যেহেতু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যে এখানে তার নাম উল্লেখ নেই। আর একটি কারণ এই যে, সামান্য পরে ভিন্নভাবে বিশেষ বৈশিষ্টসহ তাঁর আলোচনা আসছে। এ কারণে এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا - সিদ্দীক কাকে বলে? صِدِّيْق শব্দটি কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস করে মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠাবসা এই বিশ্বাসের প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছ। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীত যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরি নয়। বরং নবী নয় এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদকের স্তর অর্জন করতে পারেন তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়াম (আ.)-কে স্বয়ং কুরআনে পাক 'সিদ্দীকা' (اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোনো নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দের নসিহত করার পন্থা ও আদব : يَا اَبَتِ আরবি অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্বও ভালোবাসা। এ দুটি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَا اَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোনো বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত। অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গাম্বরসুলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহপ্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে সতর্ক করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) يَا اَبَتِ বলে মিষ্টভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَا بُنَيَّ [হে বৎস] শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তার নাম ধরে يَا اِبْرَاهِيْمُ বলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ ﷺ -এর কি জবাব দেন, তা শুনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন–

سَلَامٌ عَلَيْكَ এখানে سَلَامٌ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। যথা–

১. বয়কটের সালাম। অর্থাৎ কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কুরআন পাক আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে– وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।

২. এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়েছে। এতে আইনগত জটিলতা এই যে, কোনো কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোনো কোনো হাদীসে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফেরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারো কারো কথা ও কার্য দ্বারা এর অবৈধতা বুঝা যায়। ইমাম কুরতুবী (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নাখায়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোনো কাফের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ : এখানেও উপরিউক্ত জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোনো কাফেরের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালেবকে বলেছিলেন- وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচার জন্য ইস্তেগফার পরিত্যাগ করেন।

উপরিউক্ত জটিলতা নিরসনকারী জবাব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার সাথে এ ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব, এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন- اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ সূরা তাওবার مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে-

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ

এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহ তা'আলার শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

قَوْلُهُ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ : একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে সত্য প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেননি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, "আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।"

قَوْلُهُ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ : পূর্ববর্তী বাক্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হবো না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বুঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকূব' [পৌত্র] শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ.) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চেয়ে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

বালাগাত :

اَلْكِنَايَةُ اللَّطِيْفَةُ "لِسَانُ صِدْقٍ" كِنَايَةٌ عَنِ الذِّكْرِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيْلِ بِاللِّسَانِ لِاَنَّ الثَّنَاءَ يَكُوْنُ بِاللِّسَانِ كَمَا يُكَنّٰى عَنِ الْعَطَاءِ بِالْيَدِ ـ

অনুবাদ :

٥١. وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا مِنْ اَخْلَصَ فِىْ عِبَادَتِهٖ اَخْلَصَهُ اللّٰهُ مِنَ الدَّنَسِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ـ

৫১. স্মরণ করুন, এই কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা। তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত। مُخْلَصًا শব্দটি لَامْ বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। مُخْلِصٌ [যেরসহ] বলা হয় مَنْ اَخْلَصَ فِىْ عِبَادَتِهٖ তথা যে ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগীতে একনিষ্ঠ হয়েছে। আর مُخْلَصٌ [যবরসহ] বলা হয় مَنْ اَخْلَصَهُ اللّٰهُ مِنَ الدَّنَسِ তথা যাকে আল্লাহ তা'আলা পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। এবং তিনি ছিলেন রাসূল নবী।

٥٢. وَنَادَيْنَاهُ بِقَوْلِ يَا مُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ اِسْمُ جَبَلٍ الْاَيْمَنِ اَىِ الَّذِىْ يَلِىْ يَمِيْنَ مُوْسٰى حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ مَدْيَنَ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ـ مُنَاجِيًا بِاَنْ اَسْمَعَهٗ تَعَالٰى كَلَامَهٗ ـ

৫২. আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম "হে মূসা নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ" এ উক্তি দ্বারা। তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে طُوْر একটি পাহাড়ের নাম। অর্থাৎ যে পাহাড়টি হযরত মূসা (আ.)-এর মাদায়েন থেকে আগমনকালে তার ডান দিকে অবস্থিত ছিল। আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁকে স্বীয় বাণী শুনিয়েছিলেন।

٥٣. وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا نِعْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ نَبِيًّا ـ حَالٌ هِىَ الْمَقْصُوْدَةُ بِالْهِبَةِ اِجَابَةً لِسُؤَالِهٖ اَنْ يُّرْسِلَ اَخَاهُ مَعَهٗ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْهُ ـ

৫৩. আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দিলাম তাঁর ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে এখানে هَارُوْنَ শব্দটি اَخَاهُ থেকে بَدَلٌ অথবা عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে। আর نَبِيًّا শব্দটি هَارُوْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। আর وَهَبْنَا দ্বারা নবুয়ত দান করে তাঁর সাথে তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ.)-কেও নবী বানিয়ে দিয়েছেন। আর হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

٥٤. وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ لَمْ يَعِدْ شَيْئًا اِلَّا وَفٰى بِهٖ وَانْتَظَرَ مَنْ وَعَدَهٗ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ حَوْلًا حَتّٰى رَجَعَ اِلَيْهِ فِىْ مَكَانِهٖ وَكَانَ رَسُوْلًا اِلٰى جُرْهُمَ نَبِيًّا ـ

৫৪. স্মরণ কর! এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। তিনি যে অঙ্গীকারই করতেন তা পূর্ণ করে ছাড়তেন। একদা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে তিন দিন কিংবা একবছর যাবত তার অপেক্ষায় থাকেন। যতক্ষণ না সে লোকটি অপেক্ষাস্থলে এসেছে। এবং তিনি ছিলেন রাসূল জুরহুম গোত্রের প্রতি প্রেরিত নবী।

٥٥. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ اَىْ قَوْمَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ـ اَصْلُهٗ مَرْضُوْوٌ قُلِبَتِ الْوَاوَ اِنِ يَائَيْنِ وَالضَّمَّةُ كَسْرَةً ـ

৫৫. তিনি নির্দেশ দিতেন তাঁর পরিবারবর্গকে স্বীয় সম্প্রদায়কে সালাত ও জাকাতের এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের সন্তোষভাজন ছিলেন। مَرْضِيًّا এটা মূলে ছিল مَرْضُوْوًا দুটি وَاوْ-কে দুটি يَاءْ-তে রূপান্তরিত করে পূর্বে ضَادْ-এর ضَمَّةْ-কে كَسْرَةْ দ্বারা পরিবর্তন করায় مَرْضِيًّا হয়েছে।

অনুবাদ :

٥٦. وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز هُوَ جَدُّ اَبِى نُوْحٍ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا لا .

৫৬. স্মরণ করুন এই কিতাবে ইদরীসের কথা তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী।

٥٧. وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا . هُوَ حَىٌّ فِى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ اَوِالسَّادِسَةِ اَوِ السَّابِعَةِ اَوْ فِى الْجَنَّةِ اُدْخِلَهَا بَعْدَ اَنْ اُذِيْقَ الْمَوْتَ وَاُحْيِىَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا .

৫৭. এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যদায়। তিনি চতুর্থ, বা ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে জীবিত রয়েছেন। অথবা তাঁকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর জীবিত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর তিনি তা থেকে বের হননি।

٥٨. اُولٰۤئِكَ مُبْتَدَأٌ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ صِفَةٌ لَّهٗ مِنَ النَّبِيّٖنَ بَيَانٌ لَهُمْ وَهُوَ فِى مَعْنَى الصِّفَةِ وَمَا بَعْدَهٗ اِلٰى جُمْلَةِ الشَّرْطِ صِفَةٌ لِلنَّبِيّٖنَ فَقَوْلُهٗ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق اَىْ اِدْرِيْسَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز فِى السَّفِيْنَةِ اَىْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنَ اِبْنِهٖ سَامٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اَىْ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِسْرَآءِيْلَ ز وَهُوَ يَعْقُوْبُ اَىْ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اَىْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَخَبَرُ اُولٰۤئِكَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا . جَمْعُ سَاجِدٍ وَبَاكٍ اَىْ فَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ وَاَصْلُ بُكِيٍّ بُكُوْىٌ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَالضَّمَّةُ كَسْرَةً .

৫৮. এঁরাই তাঁরা, নবীগণের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। اُولٰۤئِكَ হলো মুবতাদা اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ হলো اُولٰۤئِكَ -এর সিফত। আর مِنَ النَّبِيّٖنَ এটা اَلَّذِيْنَ -এর بَيَانٌ যা সিফতের অর্থে হয়েছে। আর তার পরবর্তী অংশ তথা مِنَ النَّبِيّٖنَ থেকে اِذَا تُتْلٰى এ শর্তিয়া বাক্য পর্যন্ত نَبِيّٖنَ -এর সিফত হয়েছে। আদমের বংশ হতে অর্থাৎ হযরত ইদরীস (আ.) আর যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়ে ছিলাম নৌকায়। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি তাঁর পুত্র 'সাম'-এর পুত্র ছিলেন। এবং ইবরাহীমের বংশধর থেকে অর্থাৎ ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব ও ইসরাঈলের বংশধর হতে আর ইসরাঈল হলেন হযরত ইয়াকূব (আ.) তথা হযরত মূসা, হারূন, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.) ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম তাদের সকলের মধ্য থেকে। আর اُولٰۤئِكَ -এর খবর হলো। তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। سُجَّدًا শব্দটি سَاجِدٌ এর এবং بُكِيًّا শব্দটি بَاكٍ -এর বহুবচন। অর্থাৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাও। بُكِيٌّ মূলত بُكُوْىٌ ছিল। وَاوْ টি يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে كَافْ -এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় بُكِيٌّ হয়েছে।

٥٩. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ بِتَرْكِهَا كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ مِنَ الْمَعَاصِىْ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . هُوَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ اَىْ يَقَعُوْنَ فِيْهِ .

৫৯. তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করল ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো সালাত পরিত্যাগ করে ও লালসাপরবশ হলো নানা পাপকার্যের শিকার হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর তা হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা অর্থাৎ তারা তথায় নিপতিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى : এর আতফ হলো وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ -এর উপর। অতএব এটা **عَطْف الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ** তথা ঘটনার উপর অপর ঘটনার **عَطْف** -এর অন্তর্গত। সূরা মারইয়ামে দশজন নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কিছু না কিছু বিশেষ গুণাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের ইজ্জত ও সম্মান জ্ঞাপন করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত নবীগণ হলেন– ১. হযরত জাকারিয়া (আ.) ২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৪. হযরত ঈসা (আ.) ৫. হযরত ইসহাক (আ.) ৬. হযরত ইয়াকূব (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত মূসা (আ.) ৯. হযরত হারূন (আ.) ও ১০. হযরত ইদ্রীস (আ.)।

قَوْلُهُ مُخْلِصًا اَىْ مُوَحِّدًا : অর্থাৎ একত্ববাদী অর্থে, যিনি স্বীয় ইবাদতকে শিরক থেকে মুক্ত রেখেছেন। শব্দটি ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউল যে কোনোটি হতে পারে। মাফঊলের ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাছাই করে নিয়েছেন বা মনোনীত করেছেন।

قَوْلُهُ اَلدَّنَسُ : শব্দটি একবচন বহুবচনে হলো اَدْنَاسٌ অর্থ– ময়লা।

قَوْلُهُ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا : রাসূল নবী ছিলেন। رَسُوْلٌ শব্দটি كَانَ -এর প্রথম خَبَرٌ আর نَبِيًّا হলো দ্বিতীয় خَبَرٌ; এখানে রাসূলের শাব্দিক অর্থ এবং নবী এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। رَسُوْلًا، نَبِيًّا -এর মধ্যে উচিত ছিল عَامٌ শব্দকে আগেও خَاصٌ শব্দকে পরে উল্লেখ করা। কিন্তু আয়াতের শেষের মিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিপরীত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– সূরা ত্বা-হা এর মধ্যে رَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى উল্লিখিত হয়েছে। আর কেউ কেউ রাসূলের পারিভাষিক অর্থ এবং নবী-এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ উন্নত মর্যাদাবান রাসূল। এ সময় নবী শব্দটি نُبُوَّةٌ থেকে নিষ্পন্ন হবে। এর অর্থ হলো– উচ্চতা, শ্রেষ্ঠত্ব।

قَوْلُهُ اَلطُّوْرُ : মাদইয়ান ও মিশরের মধ্যবর্তী এক প্রসিদ্ধ পাহাড়। এর অপর নাম জাবালে যুবায়ের।

قَوْلُهُ اَيْمَنْ : এটা قَارَنَا -এর মাফউল অথবা ফায়েলের যমীর থেকে حَالٌ আর اَلْاَيْمَانُ হলো جَانِبٌ -এর সিফত। এ কারণে ইরাবের ক্ষেত্রে তার অনুগামী হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, اَلْاَيْمَانُ শব্দটি يَمِيْنٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এ সময় এটা طُوْرٌ -এর সিফত হতে পারে। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড়ের দিক থেকে মূসাকে আহ্বান করলেন।

قَوْلُهُ مِنْ رَحْمَتِنَا : এখানে مِنْ হলো تَعْلِيْلِيَّةٌ اَىْ مِنْ اَجْلِ رَحْمَتِنَا "আমার রহমতের কারণে।" اَخَاهُ এ সময় وَهَبْنَاهُ -এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ হবে। আর هَارُوْنَ শব্দটি اخاه থেকে বদল কিংবা আতফে বয়ান অথবা اَعْنِىْ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبٌ হবে نَبِيًّا এটা هَارُوْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। جُرْهُمْ ইয়েমেনের একটি গোত্র, যারা পানি প্রাপ্তির সহজলভ্যতা দেখে মক্কা উপত্যকায় হযরত হাজেরা (আ.)-এর পাশে আবাসন গ্রহণ করছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) যুবক হয়ে এ গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর প্রকৃত নাম اَخْنُوْخٌ; তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ।

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا : কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে উঁচু মর্যাদাবান হওয়া উদ্দেশ্য। কারো মতে আকাশে উত্থিত হওয়া উদ্দেশ্য। আমাদের মুফাসসির (র.)-এর অভিমত এটিই।

قَوْلُهُ خَلْفٌ : এখানে لَامٌ বর্ণটি সাকিনযোগে, অর্থ হলো অযোগ্য। আর যবরযোগে হলে তার অর্থ হবে যোগ্য উত্তরসূরি।

قَوْلُهُ يَلْقَوْنَ : শব্দটি (س) جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ ـ مُضَارِعٌ তারা পতিত হবে, সাক্ষাৎ করবে।

قَوْلُهُ غَيًّا : এটা ইসমে ফায়েল। অর্থ– পথভ্রষ্টতা, শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর আলোচনা ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর কথা শুরু হয়েছে। এটি এই সূরার চতুর্থ ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান আদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর উম্মত হওয়ার দাবিদার ইহুদিদেরকে সাবধান করা হয়েছে। যদি ইহুদিরা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বলে দাবি করে তবে তাদের কর্তব্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। ইরশাদ হয়েছে– وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا অর্থাৎ হে রাসূল! এই কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর উল্লেখ করুন! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, পছন্দনীয়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

قَوْلُهُ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا : যার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসে তিনি আল্লাহ তা'আলার নবী, নবীদের মধ্যে যাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, যার নিকট কিতাব আসে, যিনি শরিয়ত রাখেন, তিনি হন নবী এবং রাসূল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নবী ও রাসূল ছিলেন এবং পাঁচজন বিশিষ্ট নবীও রাসূলের মধ্যে ছিলেন তিনি অন্যতম। তারা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ৩৬]

এ আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. مُخْلَصًا অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিলেন।

২. তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন।

৩. তাঁর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈকট্যধন্য করেছেন।

৫. হযরত মূসা (আ.)-এর আরজি কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাই হারূন (আ.)-কে নবী মনোনীত করেছেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০৩]

قَوْلُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ : এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিশর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

قَوْلُهُ الْاَيْمَنِ : তূর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ.)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

قَوْلُهُ نَجِيًّا : কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مُنَاجَاتٌ এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نَجِىٌّ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ : هِبَةٌ শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হযরত হারূন (আ.)-কেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وَهَبْنَا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারূন' দান করেছি। এ কারণেই হযরত হারূন (আ.)-কে هِبَةُ اللّٰهِ [আল্লাহর দান]-ও বলা হয়। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ : বাহ্যত এখানে হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ভ্রাতা হযরত ইসহাক (আ.)-এর সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের

ক্রম অনুসারে পয়গাম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ.)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে ছিলেন।

قَوْلُهُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ : ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরি মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গাম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে উক্ত গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তার মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ, এ গুণটিও সব নবীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ স্বতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন, তাই তার আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কিংবা কোনো বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাইয়ের জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদা পালনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু লোকটি সময়মতো আগমন না করায় তিনি সেখানে তিনদিন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। -[মাযহারী]

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী ﷺ প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মরতবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ ওয়াদা একটি ঋণ। তাই ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, মু'মিনের ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, ওয়াদা ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গুনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা গায়ের জোরে আদায় করা যায়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মমতে ওয়াজিব, বিচারে ওয়াজিব নয়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ - পরিবার পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য : হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আরো একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের দায়িত্ব তথা ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে- قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জবাব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সার্বিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যেমন মহানবী ﷺ -এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে- وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে একটি বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গাম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ

কি? জবাব এই যে, পয়গাম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়াত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশুনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোনো বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভালো অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চেয়ে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ : হযরত ইদরীস (আ.) হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তার পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। -[মুস্তাদরাকে হাকিম] হযরত আদম (আ.)-এরপর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাজিল করেন। -[যামাখশারী] হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিজা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। -[বাহরে মুহীত] তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণ পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। -[বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا : অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ.)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মরতবা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইদরীস (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর (র.) বলেন- هٰذَا مِنْ اَخْبَارِ كَعْبِ الْاَحْبَارِ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ وَفِىْ بَعْضِهٖ نِكَارَةٌ অর্থাৎ এটা কাবে আহবারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোনো কোনোটি অপরিচিত। কুরআন পাকের আলাচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় না যে, এখানে মরতবা উচ্চ করা বুঝানো হয়েছে, নাকি জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বুঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কুরআনের তাফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক : এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরিয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল এখন শরিয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন- তাওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন- ইসমাঈল (আ.)-এর শরিয়ত। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন শরিয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তারা এ শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়। যেমন ফেরেশতাগণ রাসূল; কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ বলা হয়েছে। অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে তিনি নবী। তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরিয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চেয়ে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চেয়ে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُوْلًا نَبِيًّا বলা হয়েছে, সেখানো কোনো খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থে হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরিয়ত প্রচার করেন। -[বয়ানুল কুরআন]

বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি গোত্র ছিল এবং লাথির ভূত কথায় মান্য করত না। তাই কঠোর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি তওবা সত্ত্বেও "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন قَتْلِ عَمْدٍ-এর শাস্তি قِصَاص আর কোনো কোনো অবস্থায় জিনার শাস্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

এ শাস্তির রহস্য এটা ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই এর শাস্তি স্বরূপ নিজ দুনিয়াবী জীবনকে বিলীন করে দাও।

লাত্বায়েফ-এর মধ্যে ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ উম্মতের ওলীগণ বর্তমানেও 'মন' কে বিসর্জন এবং নফসে আম্মারাকে বিলীন করতেছেন।

ষষ্ঠ নিয়ামত : ষষ্ঠ নিয়ামত সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ম'তভেদ রয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যিনি সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, তার অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হুকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন ওলী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন যে, 'কতলে তওবা'র হুকুম প্রয়োগের পর হযরত মূসা (আ.) ওলীগণের সে জামাতকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সকলে মিলে আল্লাহর কালাম শুনেছেন- إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِيَدٍ شَدِيْدَةٍ فَاعْبُدُوْنِيْ وَلَا تَعْبُدُوْا غَيْرِيْ এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সকলে একমত হয়ে প্রার্থনা করেছে لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

قَوْلُهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً :

ওজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবি : এটা বাছুর পূজার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে ওজরখাহী করার জন্য। হযরত মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্য তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনে তারা সত্তরজনেই বলল, হে মূসা! আড়াল থেকে শুনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা এখানে قَائِل হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নির্বাচিত সত্তরজন ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَاخْتَارَ مُوْسٰى سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَا

قَوْلُهُ «فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ» الصَّيْحَةُ فَمِتُّمْ : اَلصَّيْحَةُ অর্থ ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, তারা اَلرَّجْفَةُ তথা ভূ-কম্পনে মারা গিয়েছে। উভয়টির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, হয়তো বিকট শব্দ ও ভূ-কম্পন উভয়টিই হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : অর্থাৎ বজ্র পতিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাসমূহ দেখছিলো। কিংবা তোমরা একজন অপরজনের দিকে দেখছিলে যে, কিভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে। এরপর তোমাদের সকলেই মারা যায়।

কেউ কেউ أَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা বেহুঁশ হওয়া মুরাদ নিয়েছেন। তারা فَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। কেননা اَفَاقَة তো غَشِي থেকেই হয়ে থাকে, মৃত্যু থেকে নয়। মুফাসসির (র.) أَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং পরে উল্লিখিত ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ-কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। এটিই রাজেহ বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত।

قَوْلُهُ «ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ» أَحْيَيْنَاكُمْ «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ» :

বজ্রাহতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানিপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! তাই আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরো বেশি নষ্ট করবে। -[মুয়াত্তা মালেক]

হযরত হুযায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজের আদব ও রোকন ঠিকমতো পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবে থেকে এভাবে নামাজ পড়ছ? লোকটি বলল, চল্লিশ বছর ধরে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, তুমি একটি নামাজও পড়নি। যদি এ ধরনের নামাজ পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ ﷺ -এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না, যে নামাজে 'ইকামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকুও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামাজ হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি অজুতে ত্রুটি করে অথবা নামাজের রুকু সিজদায় তড়িঘড়ি করে ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাজকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামাজ নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন, লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন, আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাজের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু উঠাবসা করে। এটা ছিল হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাজীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে-

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ.

قَوْلُهُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ : شَهَوَاتْ [কুপ্রবৃত্তি] বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا : আরবি ভাষায় غَيٌّ শব্দটি رَشَادْ -এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رَشَادْ -এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غَيْ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, 'গাই জাহান্নামের একটি গর্তের নাম।' এতে সমগ্র জাহান্নামের চেয়ে অধিক নানা রকম আজাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নামে। জাহান্নামও -এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে- যে জিনাকার জিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে পদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়। -[কুরতুবী]

অনুবাদ :

٦٠. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ يَنْقُصُوْنَ شَيْئًا ـ مِنْ ثَوَابِهِمْ ـ

৬০. কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ তাদের পুণ্যের ঘাটতি হবে না।

٦١. جَنّٰتِ عَدْنِ اِقَامَةٍ بَدَلٌ مِنَ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ط حَالٌ اَىْ غَائِبِيْنَ عَنْهَا اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ اَىْ مَوْعُوْدُهٗ مَأْتِيًّا ـ بِمَعْنٰى اٰتِيًا وَاَصْلُهٗ مَاتُوْىٌ اَوْ مَوْعُوْدُهٗ هُنَا الْجَنَّةُ يَاْتِيْهِ اَهْلُهٗ ـ

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত جَنّٰتِ عَدْنٍ এটা اَلْجَنَّةَ থেকে بَدَل হয়েছে। যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় প্রভু তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন। اَلْغَيْبُ এটা عِبَاده থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তারা উক্ত জান্নাতকে দেখেনি তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। مَاْتِيًّا শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْل হলেও এখানে اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে ব্যবহৃত। মূলে ছিল مَاْتُوْىٌ অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতিশ্রুত বিষয় জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٦٢. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا مِنَ الْكَلَامِ اِلَّا لٰكِنْ يَسْمَعُوْنَ سَلٰمًا ط مِنَ الْمَلٰئِكَةِ عَلَيْهِمْ اَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ـ اَىْ عَلٰى قَدْرِهِمَا فِى الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِى الْجَنَّةِ نَهَارٌ وَلَا لَيْلٌ بَلْ ضَوْءٌ وَنُوْرٌ اَبَدًا ـ

৬২. সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোনো অসার বাক্য শুনবে না। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর অথবা তাদের একজন অন্যজনের উপর। এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ অর্থাৎ পৃথিবীর অনুপাতে জান্নাতে দিনরাত বলতে কিছুই থাকবে না। সেখানে সর্বদা শুধুমাত্র নূর ও আলো বিরাজ করবে।

٦٣. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ نُعْطِىْ وَنُنْزِلُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ـ بِطَاعَتِهٖ ـ

৬৩. এই সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি দান করব ও আতিথেয়তা প্রদান করব আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকীগণকে। যারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করত।

٦٤. وَنَزَلَ لَمَّا تَاَخَّرَ الْوَحْىُ اَيَّامًا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا

৬৪. যখন ওহী আগমনে কিছুকাল বিলম্বিত হলো এবং নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে যতটুকু সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বারণ করে? তখন অবতীর্ণ হয়। আমি আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমার সম্মুখে আছে।

অনুবাদ :

اَىْ اَمَامَنَا مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَمَا خَلْفَنَا مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج اَىْ مَا يَكُوْنُ مِنْ هٰذَا الْوَقْتِ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اَىْ لَهٗ عِلْمُ ذٰلِكَ جَمِيْعِهٖ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ج بِمَعْنٰى نَاسِيًا اَىْ تَارِكًا لَكَ بِتَاخِيْرِ الْوَحْيِ عَنْكَ هُوَ ـ

অর্থাৎ পরজীবনের যেসব জিনিস আমার সামনে আছে আর যা পশ্চাতে আছে পার্থিব বিষয়াবলি থেকে এবং যা এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই অর্থাৎ এখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছুর জ্ঞানই তাঁর রয়েছে। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন। نَسِيًّا শব্দটি نَاسِيًا অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ওহী বিলম্বিত করার কারণে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।

٦٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط اَىْ اِصْبِرْ عَلَيْهَا هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ـ اَىْ مُسَمًّى بِذٰلِكَ ـ

৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকুন! অর্থাৎ এর উপর ধৈর্যধারণ কর। আপনি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকেও জানেন? অর্থাৎ তাঁর গুণসম্পন্ন আর কেউ নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لٰكِنْ : لٰكِنْ দ্বারা اِلَّا -এর ব্যাখ্যা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; কেননা এখানে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর সমজাতীয় নয়। কারণ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো কাফের সম্প্রদায়। আর مُسْتَثْنٰى হলো মু'মিনগণ।

قَوْلُهٗ كَانَ وَعْدُهٗ : এখানে وَعْد শব্দটি مَوْعُوْدٌ তথা প্রতিশ্রুত অর্থে। আর তা হলো বেহেশত اَىْ يَاْتِيْهِ وَيَدْخُلُهٗ مَنْ وُعِدَ لَهٗ بِهَا لَا مَحَالَةَ এ সময় مَاْتِيًّا শব্দটি اِتْيَانٌ থেকে اِسْمُ مَفْعُوْلٌ হবে। অথবা اِسْمُ مَفْعُوْلٌ টি اِسْمُ فَاعِلٌ তথা اٰتِيًا অর্থে হবে। অবশ্য وَعْد শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٌ -ও হতে পারে। অর্থ হলো প্রতিশ্রুত বিষয় এবং مَصْدَرٌ অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ ওয়াদা করা। ব্যাখ্যাকার (র.) اَوْ مَوْعُوْدُهٗ উল্লেখ করে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর এর দ্বারা বেহেশত উদ্দেশ্য হবে এবং مَاْتِيًّا নিজ অবস্থায় থাকবে।

قَوْلُهٗ وَعْدًا : শব্দটি مَصْدَرٌ অর্থে হলে, مَاْتِيًّا শব্দটি اٰتِيًا অর্থে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে– বেহেশতের অধিকারীগণ যাদের সাথে দয়াময় আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। অবশ্যই তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাগণের সাথে যে ওয়াদা করেছেন অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلَّا مَنْ تَابَ الخ - পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্বে সে সকল লোকের আলোচনা ছিল কুফরির উপর যাদের মৃত্যু হয়েছে। আর এখন اِلَّا مَنْ تَابَ থেকে সে সকল ভাগ্যবানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেক আমল করেছে। এ ধরনের ব্যক্তিগণ আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'আদন' বেহেশতে প্রবেশ করবে, যা উৎকৃষ্টতম বেহেশত।

قَوْلُهٗ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا : لَغْو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বুঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবেন। কোনোরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

قَوْلُهُ اِلَّا سَلَامًا : এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শুনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا : জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাপ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবেন। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে- وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল। হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয় সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বুঝানো হয়েছে, যেমন- দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ - শানে নুযূল : বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, আপনি একটু বেশি বেশি আগমন করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আমি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারি না। আমার অগ্রে পশ্চাতে এবং তার মাঝের সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার প্রতিপালক ওহী প্রেরণে বিলম্ব ঘটিয়ে আপনাকে বর্জনকারী নন। সকলের প্রতিপালক তিনি। কাজেই তাঁর উপাসনা করুন এবং তাঁর উপর অটল থাকুন। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হন তাহলে তাকে সবর ও ধৈর্যের সাথে বরদাশত করুন। আপনার জানা মতে কি তাঁর কোনো সমকক্ষ আছে? যদি না থাকে আর অবশ্যই নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কে আছে?

قَوْلُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ : اِصْطِبَارٌ শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষে। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

قَوْلُهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا : سَمِىٌّ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে ইলাহ তথা উপাস্য বলত। কিন্তু কেউ কোনোদিন কোনো মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোনো মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ তা'আলার নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে যুবায়ের, কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এস্থলে سَمِيًّا শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

বালাগাত :

١. اَلطِّبَاقُ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَبَيْنَ بُكْرَةً .... عَشِيًّا) .

٢. اَلسَّجْعُ الْحَسَنُ الرَّصِيْصُ (عَلِيًّا حَفِيًّا وَنَبِيًّا)

অনুবাদ :

٦٦. وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ الْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ اُبَىُّ بْنُ خَلْفٍ اَوِ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ النَّازِل فِيْهِ الْاٰيَةُ ءَاِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَ تَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ الْاُخْرٰى مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا . مِنَ الْقَبْرِ كَمَا يَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَا اُحْيٰى بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ وَكَذَا اللَّامُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى .

৬৬. মানুষ বলে পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী যেমন উবাই ইবনে খালফ অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। যার সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মৃত্যু হলো এখানে إِذَا -এর দ্বিতীয় হামযাটি স্পষ্ট করে কিংবা লঘু আকারে এবং উভয় হামজার মাঝে اَلِفٌ বৃদ্ধি করে প্রথমোক্ত উভয় সুরতে অর্থাৎ تَسْهِيْل এবং تَحْقِيْق -এর সূরতে পাঠ করা যায়। আমি কি জীবিতাবস্থায় উত্থিত হবো? কবর হতে। যেমনটি মুহাম্মদ ﷺ বলছেন। এখানে اِسْتِفْهَامْ টা نَفِىْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর জীবিত হবো না। مَا مِتُّ -এর مَا টি তাকিদের জন্য বর্ধিত। অনুরূপভাবে لَسَوْفَ -এর ل টিও। সামনের উক্তি- اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ দ্বারা তার এ উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

٦٧. اَوَلَا يَذَّكَّرُ الْاِنْسَانُ اَصْلُهُ يَتَذَكَّرُ اُبْدِلَتِ التَّاءُ ذَالًا وَاُدْغِمَتْ فِى الذَّالِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَرْكِهَا وَسُكُوْنِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا . فَيَسْتَدِلُّ بِالْاِبْتِدَاءِ عَلَى الْاِعَادَةِ .

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, يَذَّكَّرُ মূলত ছিল يَتَذَكَّرُ -এর تَاءٌ -কে ذَالٌ দ্বারা পরিবর্তন করে ذَالٌ -কে ذَالٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। অন্য কেরাতে تَاءٌ -বিহীন ذَالٌ -কে সাকিন করে كَافٌ -এ পেশ দিয়ে পঠিত রয়েছে। আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না এখানে প্রথম সৃষ্টি দ্বারা পুনরুত্থানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে।

٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اَىِ الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ وَالشَّيٰطِيْنَ اَىْ نَجْمَعُ كُلًّا مِنْهُمْ وَشَيْطَانَهُ فِىْ سِلْسِلَةٍ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مِنْ خَارِجِهَا جِثِيًّا . عَلَى الرُّكَبِ جَمْعُ جَاثٍ اَصْلُهُ جُثُوْوٌ اَوْ جُثُوْىٌ مِنْ جَثٰى يَجْثُوْ اَوْ يَجْثِىْ لُغَتَانِ .

৬৮. সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের! আমি তাদেরকে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীগণকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্র করবই। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের শয়তানকে একই জিঞ্জিরে। এবং পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। অর্থাৎ বহিঃপার্শ্বে নতজানু অবস্থায় جِثِيًّا শব্দটি جَاثٍ -এর বহুবচন। মূলত ছিল جُثُوْوٌ বা جُثُوْىٌ আর এ শব্দটি جَثٰى يَجْثُوْ বাবে نَصَرَ এবং جَثٰى يَجْثِىْ বাবে ضَرَبَ উভয় থেকেই ব্যবহৃত।

৬৯. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا - جُرْءَةً -

অনুবাদ :

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময় প্রভুর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই। عِتِيًّا শব্দের অর্থ– দুঃসাহস।

৭০. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا اَحَقُّ بِجَهَنَّمَ الْاَشَدُّ وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ صِلِيًّا دُخُوْلًا وَاحْتِرَاقًا فَنَبْدَأُ بِهِمْ وَاَصْلُهُ صُلُوْىٌ مِنْ صَلِىَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا -

৭০. এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে ভালো জানি। অর্থাৎ অবাধ্যতায় তাদের মধ্যে কে বেশি কঠোর আর কে কঠোর নয়। صِلِيًّا অর্থ প্রবেশ করা ও দগ্ধিভূত হওয়ার বিবেচনায়। অতএব তাদের মাধ্যমে আমি শুরু করব। صِلِيًّا মূলত ছিল صُلُوْىٌ যা صَلِىَ [لام বর্ণে যবর ও যেরসহ] থেকে পঠিত।

৭১. وَاِنْ اَىْ مَا مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا وَارِدُهَا ج اَىْ دَاخِلُ جَهَنَّمَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ج حَتَمَهُ وَقَضٰى بِهِ لَا يَتْرُكُهُ -

৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। حَتَمَهُ وَقَضٰى بِهِ -এর অর্থ হলো ছাড়বে না।

৭২. ثُمَّ نُنَجِّى مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ مِنْهَا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ بِالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ فِيْهَا جِثِيًّا - عَلَى الرُّكَبِ -

৭২. পরে আমি উদ্ধার করব نُنَجِّى শব্দের ج বর্ণ তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। মুত্তাকিদেরকে শিরক ও কুফর থেকে এবং জালিমদেরকে রেখে দিব শিরক ও কুফরের দরুন সেথায় নতজানু অবস্থায়।

৭৩. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ اَنْتُمْ خَيْرٌ مَّقَامًا مَنْزِلًا وَمَسْكَنًا بِالْفَتْحِ مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِّ مِنْ اَقَامَ وَاَحْسَنُ نَدِيًّا - بِمَعْنَى النَّادِىْ وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُوْنَ فِيْهِ يَعْنُوْنَ نَحْنُ فَنَكُوْنُ خَيْرًا مِنْكُمْ -

৭৩. তাদের নিকট আবৃত্ত হলো অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত কুরআন থেকে। بَيِّنَاتٍ এটা اٰيَاتٌ থেকে حَالٌ হয়েছে। কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে দুই দলের মধ্যে কোনটি আমরা নাকি তোমরা মর্যাদায় উত্তম অর্থাৎ অবস্থানগত ভাবে। مَقَامً শব্দের مِيْم বর্ণটি যবরযুক্ত হলে قَامَ থেকে হবে আর পেশ যুক্ত হলে اَقَامَ বা বাবে اِفْعَالٌ থেকে হবে। এবং মজলিস হিসেবে উত্তম ও শ্রেয়তর نَدِيًّا অর্থ اَلنَّادِىْ সমাবেশস্থল, মজলিস, যেখানে লোকজন বসে আলাপ আলোচনা করে। তারা উদ্দেশ্য করে যে, আমরা! কাজেই তোমাদের চেয়ে আমরাই উত্তম।

অনুবাদ :

٧٤. قَالَ تَعَالٰى وَكَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اَىْ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا مَالاً وَمَتَاعًا وَرِئْيًا ـ مَنْظَرًا مِنَ الرُّؤْيَةِ فَلَمَّا اَهْلَكْنَاهُمْ لِكُفْرِهِمْ نُهْلِكُ هٰؤُلَاءِ ـ

৭৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি তাদের পূর্বে কত অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ সাধন করেছি। অর্থাৎ অতীতকালের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে। যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। اَثَاثٌ শব্দের অর্থ– ধন সম্পদ, উপকরণ, আসবাবপত্র। আর رِئْيًا শব্দটি اَلرُّؤْيَةَ থেকে এসেছে। সুতরাং যখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরির কারণে ধ্বংস করেছি, তখন এদেরকেও বিনাশ করব।

٧٥. قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ شَرْطٌ جَوَابُهُ فَلْيَمْدُدْ بِمَعْنَى الْخَبَرِ اَىْ يَمُدُّ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ج فِى الدُّنْيَا يَسْتَدْرِجُهُ حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَاِمَّا السَّاعَةَ ط اَلْمُشْتَمِلَةَ عَلٰى جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ـ اَعْوَانًا اَهُمْ اَمِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَجُنْدُهُمُ الشَّيَاطِيْنُ وَجُنْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

৭৫. বলুন, যারা বিভ্রান্তিতে আছে এ বাক্যটি শর্ত। আর এর জবাব হচ্ছে দয়াময় প্রভু তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন। পৃথিবীতে তাদেরকে অবকাশ দিবেন। যতক্ষণ তারা প্রত্যক্ষ না করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তা শাস্তি হোক। যেমন– হত্যা ও বন্দীত্ব অথবা কিয়ামতই হোক যা দোজখ সম্বলিত। ফলে তারা তাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল তারা নাকি মু'মিনগণ। এখানে তাদের দলবল দ্বারা উদ্দেশ্য শয়তানরা আর তাদের বিপক্ষে মু'মিনগণের দলবল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ : এর তাফসীর اَلْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِنْسَانٌ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর সে ব্যক্তি হলো উবাই ইবনে খালফ অথবা ওলীদ ইবনে মুগীরা।

قَوْلُهُ اِذَا مَامِتُّ : এখানে مَا অতিরিক্ত। আর مِتُّ শব্দটি مَاضِى مَعْرُوْف ـ وَاحِد مُتَكَلِّمْ এটা مَوْتٌ মাসদার থেকে গঠিত। হরফে শর্ত এর কারণে ভবিষ্যতকালের অর্থ দিচ্ছে।

قَوْلُهُ لَسَوْفَ : এর মধ্যকার لَامْ বর্ণটি অতিরিক্ত। اَلْاِنْسَانُ-এর اَلْ টি عَهْدِىْ

প্রশ্ন : لَامْ تَاكِيْد-এর পরের অংশটি তার পূর্বের অংশের মধ্যে আমল করে না। সুতরাং এখানে اُخْرَجُ শব্দটি কিভাবে আমল করবে?

উত্তর : এই নীতিটি لَامْ اِبْتِدَاءْ-এর জন্য। আর لَامْ টি অতিরিক্ত।

প্রশ্ন : মুযারের উপর যে لَامٌ প্রবিষ্ট হয় তা মুযারে'কে حَالٌ -এর অর্থে পরিণত করে দেয়। আর سَوْفَ মুযারে'কে ভবিষ্যৎকালের অর্থের সাথে খাস করে দেয়। সুতরাং উভয়ের চাহিদার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে।

উত্তর : এ لَامٌ টি শুধু তাকিদের জন্য। মুজারেকে حَالٌ তথা বর্তমানকালের অর্থের সাথে খাস করে দেওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, إِذَا -এর মধ্যে أُبْعَثُ উহ্য ফে'লটি আমল করেছে। এ ব্যাপারে أُخْرَجُ শব্দটি প্রমাণ বহন করে। কাজেই أُخْرَجُ -এর ظَرْفٌ বানানো ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ لَمْ يَكُ : শব্দটি মূলত لَمْ يَكُنْ ছিল। অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে نُوْن -কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ شِيْعَةٌ : অর্থ– দল, জামাত, সাহায্যকারী প্রভৃতি। এর বহুবচন হলো شِيَعٌ শব্দটির মধ্যে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন সব একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ جِثِيًّا : এটা جَاثٌ -এর বহুবচন। ভয়ে মুখ থুবড়ে পতিত ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, جِثِيًّا শব্দটি جَثْوَةٌ -এর বহুবচন। ব্যাখ্যাকার (র.) وَارِدُهَا -এর ব্যাখ্যা দোজখে প্রবেশ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَارِدٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ এর অর্থ উপস্থিত হওয়া, কেউ অতিক্রম করা, কেউ প্রবেশ করা এবং কেউ হেঁটে চলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) دُخُوْلٌ অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব এ ব্যাখ্যাটি মর্ম নির্ধারণের জন্য বুঝতে হবে।

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ : এটা ইসমে মাওসূল। এর صَدْرِ صِلَةٌ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ هُوَ اَشَدُّ এখানে اِسْمَ مَوْصُوْلُ الَّذِىْ টি অর্থে এটা ইজাফতের কারণে পেশের উপর মবনী হয়েছে। এর صَدْرِ صِلَةٌ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ هُوَ اَشَدُّ ছিল। هُوَ মুবতাদা। আর اَشَدُّ হলো তার খবর مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ মিলে صِلَةٌ আর صِلَةٌ এবং مَوْصُوْلٌ মিলে نَنْزِعَنَّ -এর مَفْعُوْلٌ - غَيًّا হলো تَمْيِيْز উহ্য মুবতাদা থেকে পরিবর্তিত হয়ে অর্থাৎ عَتْوَهُ اَشَدُّ

قَوْلُهُ وَارِدٌ : অর্থ– অবতরণকারী, এখানে পুলসিরাত অতিক্রম করা উদ্দেশ্য। আল্লামা নববী (র.) এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল ইনসান' শব্দটি দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর কারো কারো মতে আবূ জেহেল। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সকল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। বর্ণিত আছে যে, আবূ জেহেল কিংবা উবাই ইবনে খালফ একটি হাড়খণ্ড হাতে নিয়েছিল এবং তাকে ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলেছিল। এরপর সে বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ -এর ধারণা হলো আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে, অথবা এর অর্থ হলো মৃত্যুর অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে আমাদের পুনরুত্থান হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো। তারা বলতো, আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাব, তখন পুনর্জীবন লাভ করা কি করে সম্ভব হবে? তাদের এ প্রশ্নের জবাবেই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

অর্থাৎ মানুষ যখন কিয়ামতকে অস্বীকার করে, মানুষ যখন তার পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে, তখন কি সে তার অতীতকে ভুলে যায়। সে কি জানে না যে, একদিন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়– هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

অর্থাৎ কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

قَوْلُهُ اِنَّا خَلَقْنٰهُ : বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে তাঁর বিশেষ কুদরতে নাস্তিকের শূন্যলোক থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। যার কোনো অস্তিত্ব জানা ছিল না। তাকে অস্তিত্ব দান করা যদি কঠিন না হয়, তবে কোনো মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান কেন কঠিন হবে? যিনি প্রথমবার তাকে অস্তিত্বদান করেছেন, মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবন দান করা তার পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনর্জীবন দান করা স্বাভাবিকভাবেই সহজ হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে অথচ তার জন্যে এ কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এ কাজ তার জন্যে আদৌ উচিত নয়। মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই, আদম সন্তানেরা বলে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, পরে পুনরুত্থান করবেন না। অথচ পুনরুত্থানের তুলনায় প্রথম সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন হয়। আর আমাকে বনী আদমের কষ্ট দেওয়া হলো এই যে, সে বলে আমার সন্তান সন্ততি অছে অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয়; আমার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, আমার পিতামাতা নেই, আমার কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই। আমি আমার নিজের শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকে একত্র করবো। আর যে শয়তানের তারা পূজা অর্চনা করতো, আমি তাদেরকে একত্র করবো। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে হাজির করবো, যেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ৪৪]

قَوْلُهُ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ : এখানে وَالشَّيَاطِيْنَ-এর وَاوْ - مَعَ [সহ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদের সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই, আর মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবেন। ফলে সবার সাথে শয়তানের সহঅবস্থান হয়ে যাবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا : হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীত বিহ্বল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ : شِيْعَةٌ শব্দের আসল অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোনো বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোনো কেনো তাফসীরবিদ বলেন, অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا : অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোনো মু'মিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয় অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে مُرُوْرٌ [অতিক্রম করা] শব্দ বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেওয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহেজগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়্যা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের

পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তা-ই। এই বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে যে وُرُودٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেওয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই কোনো বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ خَيْرٌ مَقَامًا وَاحْسَنُ نَدِيًّا : এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফেররা মুসলমানদের সামনে দুটি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। যথা– ১. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং ২. চাকর-নওকর, দলবল ও পরিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশি ছিল। এদু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভালো ভালো জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না। সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোনো সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গাম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত দাঊদ (আ.) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কুরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোনো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চেয়েও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণে তো বটেই, বরং এর চেয়েও বেশি ধন-দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পরিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে। অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কোনো কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : মক্কায় কাফেররা শুধু যে সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলো তাই নয়; বরং প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে চরম নির্যাতনও করছিলো, এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, [হে রাসূল ﷺ! যারা হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজি নয়, যারা পথভ্রষ্ট থাকতে চায়, তাদেরকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিবেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে আজাব আসবে, অথবা মৃত্যুর পর তারা কিয়ামতের কঠিন দিনের আজাব ভোগ করবে আর তখন তারা প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাবে।

قَوْلُهُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا - কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : যেহেতু কাফেররা মুসলমানদেরকে বলেছিল, তোমরা দেখো কার বাড়ি ঘর উত্তম? আর কাফেরদের এ কথারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে কার বাড়ি ঘর মন্দ এবং কার দলবল দুর্বল? কেননা কাফেররা সেদিন দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়াতে ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই ছিলো কাফেরদের সাহায্যকারী। কিয়ামতের দিন তারাও হবে কোপগ্রস্ত, অতএব, তাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবে না, কাফেররা সেদিন থাকবে চরম বিপদে।

অনুবাদ :

٧٦. وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا بِالْاِيْمَانِ هُدًى ط بِمَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ هِيَ الطَّاعَاتُ تَبْقٰى لِصَاحِبِهَا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا . اَىْ مَا يُرَدُّ اِلَيْهِ وَيَرْجِعُ بِخِلَافِ اَعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَّةُ هُنَا فِيْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِمْ اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا .

৭৬. যারা ঈমানের মাধ্যমে সৎপথে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অধিক হেদায়েত দান করেন। তাদের প্রতি বিভিন্ন নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে। এবং স্থায়ী সৎকর্ম আনুগত্য তথা ইবাদত বন্দেগী তার আমলকারীর জন্য স্থায়ী থাকবে। আপনার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। কাফেরদের আমল এর বিপরীত। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব তাদের এ উক্তির বিবেচনায় যে, কোন দল মান মর্যাদায় উত্তম?

٧٧. اَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ وَقَالَ لِخَبَّابِ ابْنِ الْاَرَتِّ الْقَائِلِ لَهُ تُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُطَالِبِ لَهُ بِمَالٍ لَاُوْتَيَنَّ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْبَعْثِ مَالًا وَّ وَلَدًا . فَاَقْضِيْكَ .

৭৭. আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন যে, আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ আস ইবনে ওয়ায়েল আর বলেছে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.)-কে, যিনি তাকে বলেছিলেন যে, মৃত্যুর পর তোমার পুনরুত্থান করা হবে। লোকটির নিকট তিনি স্বীয় পাওনা মাল উসূলের জন্য তাগাদা করছিলেন। আমাকে দেওয়া হবেই। পুনরুত্থান মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি তখন আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব।

٧٨. قَالَ تَعَالٰى اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَىْ اَعَلِمَهُ وَاَنْ يُّؤْتٰى مَا قَالَهُ وَاسْتُغْنِىَ بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فَحُذِفَتْ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا . بِاَنْ يُّؤْتٰى مَا قَالَهُ .

৭৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন– সে কি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে? অর্থাৎ সে কি জেনেছে যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে? اَطَّلَعَ -এর মধ্যে هَمْزَةُ وَصْلٍ -এর هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٍ -এর কারণে প্রয়োজন না থাকায় সেটা পড়ে গেছে। অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে। যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে।

٧٩. كَلَّا ط اَىْ لَا يُؤْتٰى ذٰلِكَ سَنَكْتُبُ نَأْمُرُ بِكَتْبِ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا . نَزِيْدُهُ بِذٰلِكَ عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِ كُفْرِهِ

৭৯. কখনোই নয় অর্থাৎ তাকে তা দেওয়া হবে না। তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব। অর্থাৎ লিখে রাখতে নির্দেশ দিব। এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। এ কথার কারণে আমি তার কুফরের শাস্তির উপর আরো শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

অনুবাদ :

٨٠. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيَأْتِيْنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ـ لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ ـ

৮০. সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে। অর্থাৎ সম্পদ ও সন্তানাদি। এবং সে আমার নিকট আসবে। কিয়ামতের দিন একা তার সাথে তার সম্পদও থাকবে না এবং সন্তানাদিও থাকবে না।

٨١. وَاتَّخَذُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الْاَوْثَانَ اٰلِهَةً يَعْبُدُوْنَهُمْ لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ـ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ بِاَنْ لَّا يُعَذَّبُوْا ـ

৮১. তারা গ্রহণ করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহকে অন্য ইলাহ অর্থাৎ তারা তাদের উপাসনা করবে। যাতে তারা তাদের সহায় হয় অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য যেন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী হয়।

٨٢. كَلَّا ط اَىْ لَا مَانِعَ مِنْ عَذَابِهِمْ سَيَكْفُرُوْنَ اَىِ الْاٰلِهَةُ بِعِبَادَتِهِمْ اَىْ يَنْفُوْنَهَا كَمَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ـ اَعْوَانًا وَاَعْدَاءً ـ

৮২. কখনোই নয় অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া থেকে কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক হবে না। তারা তো অস্বীকার করবে অর্থাৎ বাতিল ইলাহরা তাদের ইবাদতকে অর্থাৎ তাদের পূজা করাকে অস্বীকার করবে। অন্য আয়াতে এসেছে যে, مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তারা তো আমাদের ইবাদতই করত না। এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তাদের শত্রুতে পরিণত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَزِيْدُ : অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এর আতফ হলো فَلْيَمْدُدْ-এর উপর। وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الخ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ-ও হতে পারে। اَفَرَاَيْتَ-এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ تَعَجُّبِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ : মিসর বিজেতা হযরত ওমর (রা.)-এর পিতা ছিলেন। আর ওমর হলেন আব্দুল্লাহ এর পিতা তিনি عَبَادِلَةَ اَرْبَعَةَ তথা প্রসিদ্ধ চার আব্দুল্লাহ এর অন্যতম। তার বংশধারা এরূপ– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে খাব্বাব ইবনে আরত বদরী। তিনি দরিদ্র সাহাবীগণের অন্তর্গত ছিলেন। اُوْتَيَنَّ শব্দটি اِيْتَاءٌ থেকে মুযারে' মাজহুলের وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। অবশ্যই আমাকে দেওয়া হবে। এখানে لَامْ টি শপথের জন্য। اَطَّلَعَ الْغَيْبَ মূলত اَاِطَّلَعَ ছিল। প্রথম হামযাটি اِسْتِفْهَامْ-এর জন্য। আর দ্বিতীয়টি هَمْزَةُ وَصْلْ সহজিকরণের লক্ষ্যে هَمْزَةُ وَصْلْ-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَلَّا : নাহুবিদগণের এ ব্যাপারে ছয়টি উক্তি রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এ শব্দটি হুমকি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ৩৩ স্থানে এটি উল্লিখিত হয়েছে। আর সবগুলোই শেষার্ধের মধ্যে।

قَوْلُهُ وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ : অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে অহঙ্কার করে আমি তা ছিনিয়ে নেবো। দুনিয়া থেকে শূন্যহাতে গমন করবে। وَاتَّخَذُوا الْاَوْثَانَ এখানে اَلْاَوْثَانَ হলো প্রথম মাফউল, আর اٰلِهَةً দ্বিতীয় মাফউল। ضِدًّا অর্থ اَضْدَادٌ অথবা মাসদারটি বহুবচন অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى - হেদায়েত বৃদ্ধি করার তাৎপর্য : যেভাবে আল্লাহ তা'আলা গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সুদীর্ঘ অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনিভাবে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা সজ্ঞানে নিজের বিচার বুদ্ধিতে সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিচার বুদ্ধি আরো বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তারা অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা আল্লাহ তা'আলা ও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। তাদেরকে নৈকট্যধন্য করেন। দুনিয়াতে কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো অনেক নিয়ামত দান করেন, আর মু'মিনগণ কখনো থাকে দারিদ্রপীড়িত। কিন্তু এর এই অর্থ নয় যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আর মু'মিনগণ অপ্রিয়, বরং মু'মিনদেরকে এই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ কম দিয়ে তাকে হেদায়েত অধিক পরিমাণে দান করে থাকেন এবং তাকে নৈকট্যধন্য হওয়ার একটি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর কাফেরদেরকে যে ধন সম্পদ দেওয়া হয় তা এই কারণে যে, তাদেরকে ঢিল দেওয়া হয় এবং তাদের গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "যারা স্বেচ্ছায় হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত আরো বৃদ্ধি করে দেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর : [উর্দু] পারা- ১৬, পৃ. ৪৮]

ইমাম রাযী (র.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, যারা নেককার আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন **এর তাৎপর্য হলো ঈমানের পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইখলাস দান করেন অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৪৪-৪৫]**

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন- মু'মিনগণের প্রকৃত সম্পদ হলো হেদায়েত। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের এই হেদায়েতের পুঁজি বৃদ্ধি করে দেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ২৪৮]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এর জন্য ঈমান বৃদ্ধির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ. ৬১৪]

قَوْلُهُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا : بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ-এর তাফসীর সম্পর্কে নানা জনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহাফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে যেসব ইবাদত ও সৎকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বুঝানো হয়েছে। مَرَدًّا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মই আসল সম্পদ। সৎকর্মের ছওয়াব বিরাট এবং এর পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

قَوْلُهُ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا - শানে নুযূল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) বর্ণনা করেছেন, যে আমি কামারের কাজ করতাম, আস ইবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির কিছু কাজ আমি করেছিলাম। আমার পারিশ্রমিক তার কাছে বাকি ছিল। একদিন আমি তাকে আমার প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা করলাম। আস জবাব দিল, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবো না। তখন আমি বললাম, খুব ভালো করে শ্রবণ কর, যখন তুমি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করবে তখনো আমি কুফরি করবো না। আস বলল, মৃত্যুর পর কি পুনরায় আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ উঠানো হবে। তখন আস বলল, তবে সেখানেও আমি ধন সম্পদ লাভ করবো আর সেখানেই তোমার পাওনা আদায় করবো। তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত খাব্বাব (রা.) বলেছেন, আমি মক্কায় আস ইবনে ওয়ায়েলের জন্য একটি তরবারি তৈরি করেছিলাম, এর পারিশ্রমিক তার নিকট আমার পাওনা ছিল। তার নিকট পারিশ্রমিক দাবি করলে সে এসব কথা বলে।

قَوْلُهُ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার প্রারম্ভে হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ব্যতীত জন্ম হওয়ার এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিষ্পাপ-নিষ্কলংক হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) এবং তার সম্মানিত মাতা সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তাই এ ঘোষণা দ্বারা তাদের অন্যায় অযৌক্তিক কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াত থেকে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো। [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক]

এতদ্ব্যতীত পূর্বের কয়েকটি আয়াতে কিয়ামতের অবস্থা এবং নেককারদের নেক আমল ও তার পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে মুশরিক বা পৌত্তলিকদের পথভ্রষ্টতা ও ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলার যে ধৃষ্টতা দেখায়, তা একান্ত অমার্জনীয় অপরাধ। যদি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সহ্য না করতেন, তবে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের মূর্খতা এবং আখিরাতে তাদের যে কঠিন শাস্তি হবে, তার বিবরণ রয়েছে। এ সূরার শেষ দিকে নেককার মু'মিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে মানুষের অন্তরে মু'মিনদের জন্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহওয়ালাগণ মানুষের মধ্যে প্রিয় এবং পছন্দনীয় ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হন।

সূরার শেষের দিকে এ নসিহত করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর। অবশেষে প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির হতে হবে, এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে, অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা।

قَوْلُهُ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا : বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাব্বাব (রা.) জবাব দিলেন এরূপ করা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। চাই তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল, ভালো তো আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান সন্ততি থাকবে। -[কুরতুবী]

কুরআন পাক এই আহম্মক কাফেরের জবাবে বলেছে, সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে? اَطَّلَعَ الْغَيْبَ অর্থাৎ সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অর্থাৎ অথবা সে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলা বাহুল্য এরূপ কোনো কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ অর্থাৎ সে যে ধন দৌলত ও সন্তান সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান সন্তুতি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আমার কাছেই ফিরে যাবে।

وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান সন্তুতি এবং না থাকবে ধন দৌলত।

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করতো, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে, হে আল্লাহ! এদেরকে শাস্তি দিন! কেননা এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য বানিয়েছিল।

অনুবাদ :

٨٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ سَلَّطْنَاهُمْ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ تُهَيِّجُهُمْ اِلَى الْمَعَاصِىْ اَزًّا .

৮৩. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। চাপিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য সে তাদেরকে গুনাহ ও নাফরমানির প্রতি উৎসাহিত করে।

٨٤. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط بِطَلَبِ الْعَذَابِ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ الْاَيَّامَ وَاللَّيَالِىَ اَوِ الْاَنْفَاسَ عَدًّا . اِلٰى وَقْتِ عَذَابِهِمْ .

৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না শাস্তি কামনা করে। আমি তো তাদের জন্য গণণা করছি দিন রাত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ধারিত কাল তাদের শাস্তিকাল পর্যন্ত।

٨٥. اُذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ بِاِيْمَانِهِمْ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا . جَمْعُ وَافِدٍ بِمَعْنَى رَاكِبٍ .

৮৫. স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যেদিন মুত্তাকীদেরকে সমবেত করব তাদের ঈমানের কারণে দয়াময়ের সামনে মেহমানরূপে وَفْدًا শব্দটি وَافِدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আরোহী।

٨٦. وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ بِكُفْرِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا . جَمْعُ وَارِدٍ بِمَعْنَى مَاشٍ عَطْشَانَ .

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাব তাদের কুফরির কারণে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নাম পানে وِرْدًا শব্দটি وَارِدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পদব্রজে চলন্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি।

٨٧. لَا يَمْلِكُوْنَ اَىِ النَّاسُ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا . اَىْ شَهَادَةَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

৮৭. অন্য কারো ক্ষমতা থাকবে না অর্থাৎ কোনো মানুষের সুপারিশ করার, তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলার মাধ্যম ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।

٨٨. وَقَالُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا .

৮৮. তারা বলে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা এবং যারা ধারণা করে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা। যে, দয়াময় প্রভু সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٨٩. قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا . اَىْ مُنْكَرًا عَظِيْمًا .

৮৯. আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন– তোমরা তো এমন এক বিভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ অর্থাৎ চরম জঘন্য।

অনুবাদ :

٩٠. يَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ بِالنُّوْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ وَ تَشْدِيْدِ الطَّاءِ بِالْاِنْشِقَاقِ مِنْهُ مِنْ عَظْمِ هٰذَا الْقَوْلِ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . اَىْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجَلٍ .

৯০. যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে। يَكَادُ শব্দটি يَاءٌ এবং تَاءٌ উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। يَنْفَطِرْنَ শব্দটি نُوْنَ -এর সাথে। অপর কেরাতে يَتَفَطَّرْنَ অর্থাৎ تَاءٌ দিয়ে এবং طَاءٌ বর্ণটি তাশদীদসহ। অর্থ- বিদীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ কথার জঘন্যতার কারণে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। অর্থাৎ এ কারণে তাদের উপর আপতিত হবে।

٩١. اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ج

৯১. যেহেতু তারা দয়াময় প্রভুর প্রতি সন্তান আরোপ করে।

٩٢. قَالَ تَعَالٰى وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ط اَىْ مَا يَلِيْقُ بِهٖ ذٰلِكَ .

৯২. আল্লাহ তা'আলা বলেন- অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় প্রভুর জন্য শোভনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এটা সমীচীন নয়।

٩٣. اِنْ اَىْ مَا كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا . ذَلِيْلًا خَاضِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْهُمْ عُزَيْرٌ وَعِيْسٰى .

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময় প্রভুর নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও বিনীত হয়ে কিয়ামতের দিন। তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-ও থাকবেন।

٩٤. لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . فَلَا يَخْفٰى عَلَيْهِ مَبْلَغُ جَمِيْعِهِمْ وَلَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ .

৯৪. তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কাজেই তাঁর নিকট তাদের সকলের পরিধি গোপন নয় এবং তাদের কোনো একজনেরও নয়।

٩٥. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا . بِلَا مَالٍ وَلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُهُ .

৯৫. এবং কিয়ামত দিবসে তাদের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে। সম্পদশূন্য ও শাস্তি প্রতিহতকারী সাহায্যকারী ব্যতিরেকে।

٩٦. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا . فِيْمَا بَيْنَهُمْ يَتَوَادُّوْنَ وَيَتَحَابُّوْنَ وَيُحِبُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৯৬. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় প্রভু অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা তারা পরস্পর একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভালোবাসবেন।

٩٧. فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ الْعَرَبِىِّ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ النَّارَ بِالْاِيْمَانِ وَتُنْذِرَ تُخَوِّفَ بِهٖ قَوْمًا لُدًّا . جَمْعُ اَلَدَّ اَىْ ذُوْ جَدَلٍ بِالْبَاطِلِ وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ .

৯৭. আমি তো একে সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ কুরআনকে আপনার ভাষায় আরবি ভাষায় যাতে আপনি খোদাভীরুদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের ঈমান আনার মাধ্যমে এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন। لُدٌّ শব্দটি اَلَدّ -এর বহুবচন অর্থ- ভ্রান্ত বিষয়ে বিতণ্ডাকারী আর তারা হলো মক্কার কাফেররা।

٩٨. وَكَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ط اَىْ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِهِمْ الرُّسُلَ هَلْ تُحِسُّ تَجِدُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ـ صَوْتًا خَفِيًّا ؟ لَا ـ فَكَمَا اَهْلَكْنَا اُولٰئِكَ نُهْلِكُ هٰؤُلَاءِ ـ

অনুবাদ :

৯৮. তাদের পূর্বে আমি কত অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি অর্থাৎ অতীত কালের অনেক জাতিকে তাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে। আপনি কি অনুভব করেন দেখতে পান তাদের কাউকে, অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পান কি? না। رِكْزًا অর্থ- মৃদু আওয়াজ। কাজেই তাদেরকে আমি যেভাবে ধ্বংস করেছি এদেরকেও সেভাবেই ধ্বংস করব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَؤُزُّ : শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে مُضَارِعْ ـ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ আর اَزًّا হলো -এর মাফউলে মুতলাক। অর্থ- সশব্দে নড়াচড়া করা। এটা اَزِيْزُ الْقِدْرِ তথা হাঁড়িতে কোনো বস্তু টগবগ করা থেকে গৃহীত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের বিভিন্নরূপ উক্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিস্ময় প্রকাশ।

قَوْلُهُ اَوِ الْاَنْفَاس : এটা نَعُدُّ لَهُمْ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। আর اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ হলো فَلَا تَعْجَلْ-এর عِلَّتْ বা কারণ। عَدًّا হলো نَعُدُّ-এর মাফউলে মুতলাক। يَوْمَ نَحْشُرُ হলো اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের ظَرْف , এর আমেল হলো لَا يَمْلِكُوْنَ অথবা نَعُدُّ

قَوْلُهُ وِرْدًا : এটা وَارِدْ-এর اِسْمُ جَمْع অর্থ- তৃষ্ণার্ত, ঘাটে আগমনকারী। لَا يَمْلِكُوْنَ বাক্য হয়ে اَلْمُجْرِمُوْنَ থেকে حَالْ আর اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ এটা لَا يَمْلِكُوْنَ-এর যমীর থেকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ

قَوْلُهُ يَتَفَطَّرْنَ : এটা تَفَطُّرْ থেকে مُضَارِعْ ـ جَمْعُ مُؤَنَّثْ غَائِبْ ; অর্থ- তা ফেটে যাবে। هَدًّا শব্দটি تَخِرُّ -এর ভিন্ন শব্দ দ্বারা مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ অর্থাৎ تَهُدُّ هَدًّا অর্থে। আর هَدًّا শব্দটি اَلْجِبَالُ থেকে حَالْ -ও হতে পারে। ব্যাখ্যাকার (র.) مِنْ اَجَلِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا হলো تَخِرُّ ও تَنْشَقُّ-এর مَفْعُوْلْ لَهُ স্থানগতভাবে اَنْ ـ مَنْصُوْبْ -এর পূর্বে اِسْمْ উহ্য হলে বাক্যটি স্থানগতভাবে মাজরূরও হতে পারে। আবার মা'রফূও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে اَنْ مَصْدَرِيَّةْ হবে। বাক্যটি হবে এরূপ- اَلْمُوْجِبُ لِذٰلِكَ دُعَائُهم لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

قَوْلُهُ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ : এর মধ্যে مَنْ হলো نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ আর فِى السَّمٰوَاتِ হলো তার সিফত। উভয়টি মিলে مُبْتَدَأْ আর اِلَّا اٰتِىْ হলো তার খবর। كُلٌّ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে اٰتِىْ -কে একবচন নেওয়া হয়েছে। (س) وُدًّا অর্থ- ভালোবাসা, বন্ধুত্ব।

قَوْلُهُ لُدًّا : لُدًّا শব্দটি اَلَدُّ-এর বহুবচন। ঝগড়াকারী, বিতর্ককারী। এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الْعَرَبِىْ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে لِسَانْ দ্বারা আরবি শব্দ উদ্দেশ্য, ভাষা উদ্দেশ্য নয়। رِكْزًا শব্দটি اِسْمْ অর্থ- শব্দ, স্বর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ الخ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের পথভ্রষ্টতা এবং আখিরাতে তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে কাফেরদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, শয়তানের উস্কানী এবং প্ররোচনাতেই তারা কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাই শয়তানের ইঙ্গিতেই তারা নাচতে থাকে।

قَوْلُهُ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا : আরবি অভিধানে حَضَّ - فَزَّ - اَزَّ - هَزَّ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। اَزٌّ শব্দের অর্থ- পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং এর অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

قَوْلُهُ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا : উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপরে আজাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফিকহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন! ইবনে সামমাক আরজ করলেন, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুণতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন- حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تَعُدُّ فَكُلَّمَا ‎* مَضٰى نَفَسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصَ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। -[কুরতুবী]

জনৈক বুজুর্গ বলেছেন- وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا ‎* فَتًى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفَسُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا : যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে- তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন, তাদের সৎকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا : وِرْد -এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وِرْدًا -এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

قَوْلُهُ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, عَهْد [অঙ্গীকার] বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর সাক্ষ্য বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, عَهْد বলে কুরআনের হিফজ বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا : এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার নামের তাসবীহ পাঠ করে। যেমন কুরআন বলে- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করে না, এমন কোনো বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনার কথাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করলে বিশেষত আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ তা'আলার কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশি হতে পারে না।

قَوْلُهُ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا : অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর এই ভালোবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তিনি আরো বলেন, কুরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا -[রূহুল মা'আনী]

হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। -[কুরতুবী]

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন- فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ "হে আল্লাহ! আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি লোকজনের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কাণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : বোধ্যগম্য নয় এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয়, যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে সব রাজ্যাধিপতি জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শুনা যায় না।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, আর এ আয়াতসমূহে রয়েছে মু'মিনদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সৃষ্টি করবেন সকলের অন্তরে ভালোবাসা।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا - শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আমি যখন মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলাম তখন মক্কাবাসী কিছু বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হলো। তাদের প্রীতি-ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। ঐ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ছিল শয়বা ইবনে রবীয়া, উৎবা ইবনে রবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৫]

তাবারানী (র.) 'আল আউসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতখানি হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে মরদবিয়া এবং দায়লামী (র.) হযরত বারা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, হে আলী! তুমি বল- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهْدًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো প্রতিশ্রুতি এবং তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো ভালোবাসা এবং আমার জন্যে মু'মিনদের অন্তরেও রেখে দিও ভালোবাসা। তখন আয়াত নাজিল হয়। তাবারানী ও ইবনে মারদবিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ : সূরা ত্বা-হা মক্কায় অবতীর্ণ

مِأَةٌ وَّخَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعُوْنَ وَثِنْتَانِ

১৩৫/১৪২ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. طٰهٰ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

১. ত্বা-হা আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত।

٢. مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ يَا مُحَمَّدُ لِتَشْقٰى ـ لِتَتْعَبَ بِمَا فَعَلْتَ بَعْدَ نُزُوْلِهٖ مِنْ طُوْلِ قِيَامِكَ بِصَلٰوةِ اللَّيْلِ اَىْ خَفِّفْ عَنْ نَفْسِكَ ـ

২. হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি ক্লেশ পাবেন এজন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। অর্থাৎ আপনি কষ্টে নিপতিত হবেন। যা আপনি করেছেন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর। সালাতুত তাহাজ্জুদ দীর্ঘ কিয়াম করে। অর্থাৎ নিজের উপর থেকে বোঝা লাঘব থেকে করুন!

٣. اِلَّا لٰكِنْ اَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً بِهٖ لِّمَنْ يَّخْشٰى ـ يَخَافُ اللّٰهَ ـ

৩. বরং আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যে ভয় করে কেবল তার উপদেশার্থে অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে।

٤. تَنْزِيْلًا بَدْلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ النَّاصِبِ لَهٗ مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ـ جَمْعُ عَلِيًّا كَكُبْرٰى وَكِبَرٍ ـ

৪. এটা তার নিকট হতে অবতীর্ণ تَنْزِيْلًا শব্দটি উহ্য اَنْزَلْنَاهُ -এর পরিবর্তে এসেছে। عَامِلِ نَاصِبٌ তথা যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। اَلْعُلٰى শব্দটি عَلِيًّا -এর বহুবচন। যেমন كِبَرٌ শব্দটি كُبْرٰى -এর বহুবচন।

٥. هُوَ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ وَهُوَ فِى اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمُلْكِ اسْتَوٰى ـ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ ـ

৫. দয়াময় প্রভু আরশে সমাসীন অভিধানে 'আরশ' বলা হয় রাজ সিংহাসনকে, সমাসীন হওয়া আল্লাহ তা'আলার শান অনুপাতে যেমনটি উচিত তেমনটি উদ্দেশ্য।

٦. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ـ هُوَ التُّرَابُ النَّدِىْ وَالْمُرَادُ الْاَرْضُوْنَ السَّبْعُ لِاَنَّهَا تَحْتَهٗ ـ

৬. তা তাঁরই যা আছে আকাশমণ্ডলীতে পৃথিবীতে, এই দুয়ের অন্তবর্তী স্থানে যত সৃষ্টি রয়েছে এবং ভূগর্ভে আর তা হলো লোনা মাটি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সপ্ত জমিন। কেননা তা সব এর নিচে রয়েছে।

অনুবাদ :

٧. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فِىْ ذِكْرٍ اَوْ دُعَاءٍ فَاللّٰهُ غَنِىٌّ عَنِ الْجَهْرِ بِهٖ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ـ مِنْهُ اَىْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ النَّفْسُ وَمَا خَطَرَ وَلَمْ تُحَدِّثْ بِهٖ فَلَا تَجْهَدْ نَفْسَكَ بِالْجَهْرِ ـ

৭. যদি আপনি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেন জিকিরে কিংবা দোয়ায়, তবে আল্লাহ তা'আলা উচ্চৈঃস্বরে বলা থেকে অমুখাপেক্ষী তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। তার থেকে অর্থাৎ যা মনে মনে বলে এবং হৃদয়ের গহীনে কল্পনা করে অথচ এখনও তা ব্যক্ত করেনি। কাজেই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার জন্য নিজেকে কষ্টে নিপতিত করবেন না।

٨. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ اَلتِّسْعَةُ وَالتِّسْعُوْنَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسْنٰى مُؤَنَّثُ الْاَحْسَنِ ـ

৮. আল্লাহ তা'আলা তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই হাদীসে নিরানব্বই নামের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর اَلْحُسْنٰى শব্দটি اَلْاَحْسَنُ -এর مُؤَنَّثٌ।

٩. وَهَلْ قَدْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ـ

৯. আপনার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

١٠. اِذْ رَاٰى نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهٖ لِاِمْرَأَتِهٖ امْكُثُوْٓا هُنَا وَذٰلِكَ فِىْ مَسِيْرِهٖ مِنْ مَدْيَنَ طَالِبًا مِصْرَ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ اَبْصَرْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ شُعْلَةٍ فِىْ رَأْسِ فَتِيْلَةٍ اَوْ عُوْدٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ـ اَىْ هَادِيًا يَدُلُّنِىْ عَلَى الطَّرِيْقِ وَكَانَ اَخْطَأَهَا لِظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَقَالَ لَعَلَّ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِوَفَاءِ الْوَعْدِ ـ

১০. তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন তার স্ত্রীকে তোমরা এখানে থাক এটা ছিল মাদায়েন থেকে মিশরের যাত্রাপথে। আমি অনুভব করছি দেখছি আগুন। সম্ভবত আমি তা হতে তোমাদের জন্য জ্বলন্ত আঙ্গার আনতে পারব। কোনো প্রদীপের সলতের মাথায় করে কিংবা কোনো ডালের সাহায্যে। অথবা আমি আগুনের নিকটে কোনো পথনির্দেশ পাব অর্থাৎ কোনো পথপ্রদর্শককে যিনি আমাকে রাস্তা বাতলে দিবেন। তিনি রাত্রির অন্ধকারের কারণে রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন। আর তিনি لَعَلَّ তথা সম্ভবত বলেছেন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকার কারণে।

١١. فَلَمَّآ اَتٰىهَا وَهِىَ شَجَرَةُ عَوْسَجٍ نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ـ

১১. অতঃপর যখন তিনি আগুনের নিকট আসলেন তা ছিল আউসজ বৃক্ষ তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!

অনুবাদ :

١٢. إِنِّيْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِتَاوِيْلِ نُوْدِيَ بِقِيْلَ وَبِفَتْحِهَا بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ أَنَا تَوْكِيْدٌ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ الْمُطَهَّرِ أَوِ الْمُبَارَكِ طُوًى . بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ بِالتَّنْوِيْنِ وَتَرْكِهِ مَصْرُوْفٌ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَغَيْرَ مَصْرُوْفٍ لِلتَّانِيْثِ بِاعْتِبَارِ الْبُقْعَةِ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ .

১২. আমিই আপনার প্রতিপালক! অতএব আপনার পাদুকা খুলে ফেলুন এখানে إِنِّيْ-এর হামযা যের যুক্ত তখন نُوْدِيَ-কে قِيْلَ অর্থে ধরা হবে। আর إِنِّيْ-এর হামযা যদি যবরযুক্ত ধরা হয় তবে পূর্বে একটি بَاء উহ্য মানতে হবে অর্থাৎ بِأَنِّيْ আর أَنَا টা يَائے مُتَكَلِّمْ-এর তাকিদ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। مُقَدَّسٌ শব্দের অর্থ পবিত্র অথবা বরকতময়। طُوًى শব্দটি اَلْمُقَدَّسِ হতে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانْ হয়েছে। আর طُوًى শব্দটি تَنْوِيْن সহও হতে পারে তখন এটা مُنْصَرِفْ হবে مَكَانٌ তথা সাধারণ স্থান হিসেবে। আবার তানভীনবিহীনও হতে পারে। তখন এটা غَيْر مُنْصَرِفْ হবে بُقْعَة-এর অর্থের হিসেবে আর তাতে تَانِيْث এবং عَلَمِيَّتْ পাওয়া গেছে।

١٣. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ مِنْ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى . إِلَيْكَ مِنِّيْ .

১৩. আমি আপনাকে মনোনীত করেছি আপনার সম্প্রদায় থেকে। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করুন। আমার পক্ষ হতে আপনার প্রতি।

١٤. إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ لا وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ . فِيْهَا .

১৪. আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন!

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتَشْقٰى اَىْ لِتَتْعَبَ : অর্থ হচ্ছে- আমি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি নিজেকে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কষ্টে নিপতিত করবেন।

قَوْلُهُ قَبَسٌ : অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, জ্বলন্ত কয়লা।

قَوْلُهُ طُوًى : এটা সিরিয়ার অন্তর্গত একটি উপত্যকার নাম।

قَوْلُهُ طٰهٰ : ব্যাখ্যাকার (র.) اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা حُرُوْف مُقَطَّعَة-এর অন্তর্গত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক জ্ঞান রাখেন।

قَوْلُهُ إِلَّا لٰكِنْ : ব্যাখ্যাকার (র.) إِلَّا-এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ অর্থাৎ لٰكِنْ اَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً অর্থে। কেননা تَذْكِرَة শব্দটি تَشْقٰى . مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর সমজাতীয় নয়।

قَوْلُهُ تَنْزِيْلًا : এটা উহ্য نَزَّلْنَا ফে'লের মাসদার। ফে'লকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে মাসদার উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ ধরনের বিলোপ সাধন করা ওয়াজিব। কারণ মাসদার অর্থ ও আমলের ক্ষেত্রে ফে'লের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে বদল দ্বারা পারিভাষিক বদল উদ্দেশ্য নয়; বরং শাব্দিক বদল তথা পরিবর্তে আসা উদ্দেশ্য। بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ-এর অর্থ হলো, تَنْزِيْلًا

শব্দটি উচ্চারণ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তার নসব দানকারী ফে'ল, তথা উহ্য نَزَّلْنَا -এর স্থলাভিষিক্ত। مِمَّنْ خَلَقَ হলো تَنْزِيْلًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى : এর মধ্যে জিনসের আতফ জিনসের উপর ঘটেছে। মুফরাদের উপর বহুবচনের আতফ নয়। সুতরাং এখন অনুচিত হওয়ার প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। هُوَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি উহ্য هُوَ মুবতাদা-এর خَبَرٌ হওয়ার কারণেও مَرْفُوْع হবে।

قَوْلُهُ وَهَلْ اَتَاكَ : এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা। এখানে আল্লাহ তা'আলার নবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো মূলত উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। هَلْ অব্যয়টি قَدْ অর্থে। اِذْ رَاٰى হলো حَدِيْثُ مُوْسٰى -এর যরফ। اُمْكُثُوْا বহুবচন ও পুরুষলিঙ্গ। অথচ এর দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর প্রতি এর সম্বোধন করা হয়েছে। এর উত্তর এই যে, اَهْل শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচনের সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা সম্মান অর্থে অথবা খাদেম ও সঙ্গে থাকা সন্তানাদির প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচনের সীগাহ উল্লিখিত হয়েছে। اٰنَسْتُ -এর ব্যাখ্যা اَبْصَرْتُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِيْنَاس -এর অর্থ হলো কোনো পন্থায় অনুভব করা। আর এখানে بَصَرٌ দ্বারা অনুভব করার অর্থ উদ্দেশ্য। فَتِيْلَة অর্থ- বাতি, সলতা প্রভৃতি। هُدًى শব্দটি هَادٍ অর্থে। عوسج এক ধরনের কাটা বিশিষ্ট গাছ, বনকুল। কেউ কেউ আঙ্গুর ও কেউ কেউ বনকুল উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এটাকে হিন্দী ভাষায় আকাশবেল ও বাংলায় আলোকলতা বলা হয়। মাটিতে কোনো গোড়া থাকে না। বরং গাছ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে এবং যে গাছের উপর বিস্তার লাভ করে তাকে শুকিয়ে ফেলে। طُوٰى শব্দটি وَادٍ থেকে বদল কিংবা আতফে বয়ান। এটাকে غَيْر مُنْصَرِفْ ও مُنْصَرِفْ উভয়রূপে পড়া যায়। স্থান অর্থ হলে তখন مُنْصَرِفْ হবে। আর بُقْعَة -এর অর্থ হলে নামবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গের কারণ غَيْر مُنْصَرِفْ হবে।

قَوْلُهُ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ : এটা مِمَّا يُوْحٰى থেকে বদল হয়েছে। فِيْهَا অর্থাৎ নামাজে اَللّٰهُ শব্দ বিলুপ্ত মুবতাদার খবর। অর্থাৎ بِمَا ذُكِرَ مِنَ النُّعُوْتِ الْجَلِيْلَةِ اللّٰهُ . اَلْمَنْعُوْتُ সে সত্তা যিনি উল্লিখিত উত্তম গুণাবলি সম্বলিত। তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ শব্দটি مُبْتَدَا আর لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তার খবরও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ط . ه এ দু'টি অক্ষরকে মুকাত্তায়াত বলা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, طٰهٰ আল্লাহ তা'আলার নাম। এক্ষেত্রে এ শব্দটি শপথের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- হা মীম। প্রিয়নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন- حٰمٓ . لَا يُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ "হা মীমের শপথ! এ কাফেরদেরকে সাহায্য করা হবে না এবং তারা সফল হবে না।"

মুকাতেল ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'তোয়াহা'র অর্থ হলো উভয় পা জমিনে রাখো, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমিনে স্থাপন কর। ইবনে মারদবিয়া (র.) তাঁর তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, যখন সূরা মুযযাম্মিল-এর আয়াত- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ হে কম্বলওয়ালা, রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ সারারাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান থাকতেন ফলে তার কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং বললেন, তোয়াহা। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ উভয় পা মাটিতে রাখুন।

তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.) আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, তোয়াহা অর্থ হলো, হে ব্যক্তি। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় তোয়া হা অর্থ হলো- হে ব্যক্তি। কালবী (র.) ও আলোচ্য শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বুঝা যায়।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৮-৫৯]

ইমাম রাযী (র.) এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন। যথা–

১. ط অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বুঝানো হয়েছে। [দোজখের একটি নাম] এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা জান্নাত এবং দোজখের শপথ করেছেন।

২. বর্ণিত আছে যে ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলতেন– 'তোয়া' দ্বারা আহলে বাইতের তাহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'হা' অক্ষর দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন 'তোয়া' দ্বারা পবিত্রতা আর 'হা' দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি যিনি গায়েবী বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ يَا رَجُلُ [হে ব্যক্তি] এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে يَا حَبِيْبِى [হে আমার বন্ধু] বর্ণিত আছে। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, طٰهٰ ও يٰسٓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, কুরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الٓمٓ -এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো مُتَشَابِهَاتٌ অর্থাৎ গোপন ভেদ, যার মর্ম আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ জানে না। طٰهٰ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى : لِتَشْقٰى শব্দটি شَقَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোনো রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কুরআনের দাওয়াত কবুল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে– আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। এ কাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না? তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। –[কুরতুবী সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى : ইবনে কাছীর (র.) বলেন, কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কুরআন তো নয় সাক্ষাৎ বিপদ নাজিল হয়েছে। রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর।, হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কুরআন ও কুরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাছীর (র.) অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা (রা.) কর্তৃক ইবনে হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ لِقَضَاءِ عِبَادِهٖ اِنِّىْ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِىْ وَحِكْمَتِىْ فِيْكُمْ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَغْفِرَ لَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا اُبَالِىْ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তার সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন, আমি আমার ইলম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গুনাহ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোনো পরওয়া করি না।

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআন বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِمَنْ يَّخْشٰى শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى : اِسْتِوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ [আরশের উপর সমাসীন হওয়া।] সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারো জানা নেই। এটা مُتَشَابِهَاتُ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ তা'আলার মান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

قَوْلُهُ وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى : আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثَرٰى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثَرٰى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপারে থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سِرّ পক্ষান্তরে اَخْفٰى বলে সে কথা বুঝানো হয়েছে যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোনো সময় আসবে। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোনো মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

قَوْلُهُ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী ﷺ -এর জানা থাকা দরকার, যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ আমি পয়গাম্বরগণের এমন সব কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তাফসীরে বাহরে মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আরজ করলেন, এখন আমি আমার জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকি ছিল না। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তার প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোনো সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে

গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই এর স্থলে চকমকি পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। হযরত মূসা (আ.) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা? সম্ভবত আগুনের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি। যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোনো খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল। কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। -[বাহরে মুহীত।]

قَوْلُهُ فَلَمَّا اَتَاهَا : অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন। মুসনাদে আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের কাছে পৌঁছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোনো ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বেড়ে গেছে। হযরত মূসা (আ.) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোনো স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্র করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হলো। -[রূহুল মা'আনী] হযরত মূসা (আ.) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তার ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তোয়া'।

قَوْلُهُ نُوْدِيَ يَا مُوْسٰى اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ : বাহরে মুহীত রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ.) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোনো দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে। শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মুজেযার মতোই। আওয়াজের সারমর্ম এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ তা আগুন নয়, আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, "আমিই তোমার পালনকর্তা।" হযরত মূসা (আ.) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া হযরত মূসা (আ.) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবের্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরিক আছে। এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলারই।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রূহুল মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেওয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বাইক' [আমি হাজির আছি] বলে জবাব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হলো, আমি আপনার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, নাকি আপনার প্রেরিত কোনো ফেরেশতার কথা শুনছি? জবাব হলো, আমি নিজেই আপনার সাথে কথা বলছি। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম

নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয় তার জবাব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শুনা যায়। হযরত মূসা (আ.) কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকেও কালাম শুনেননি এবং শুধু কানেই শুনেননি, বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। -

قَوْلُهُ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী (রা.), হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন, বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন, إِذَا كُنْتَ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও। **জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া সব ফিকহবিদের মতে জায়েজ।** রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে **পাকজুতা পরিধান করে নামাজ পড়া প্রমাণিতও রয়েছে।** কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামাজ পড়া **হতো। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী।** -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন। যেমন বায়তুল্লাহ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى - কুরআন শ্রবণের আদব : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কুরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোনে অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বুঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বুঝারও তৌফিক দান করেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ : এই কালামে হযরত মূসা (আ.)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى বলে রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِيْ -এর অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর, আমা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। এটা তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ বলে পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِيْ এই নির্দেশে নামাজের কথাও রয়েছে।

কিন্তু নামাজকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজ সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামাজ বর্জন কাফেরদের আলামত।

قَوْلُهُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ : উদ্দেশ্য এই যে, নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। নামাজ আদ্যোপান্ত জিকিরই জিকির; মুখে, অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে জিকির। তাই নামাজে জিকির তথা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِيْ শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারো নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাজের কথা ভুলে গেলে এবং নামাজের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামাজ পড়ে নিতে হবে।

অনুবাদ :

١٥. اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا عَنِ النَّاسِ وَيَظْهَرُ لَهُمْ قُرْبُهَا بِعَلَامَاتِهَا لِتُجْزٰى فِيْهَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ـ بِهِ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ ـ

১৫. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই। মানুষ থেকে। তবে বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দ্বারা এর নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে। যাতে ফল লাভ করতে পারে সেদিন প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী এর দ্বারা ভালো ও মন্দের।

١٦. فَلَا يَصُدَّنَّكَ يُصْرِفَنَّكَ عَنْهَا اَىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰيهُ فِىْ اِنْكَارِهَا فَتَرْدٰى ـ فَتَهْلِكَ اِنْ صُدِدْتَّ عَنْهَا ـ

১৬. সুতরাং সে যেন আপনাকে নিবৃত্ত না রাখে ফিরিয়ে না রাখে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপনে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তা অস্বীকারের ব্যাপারে। নিবৃত্ত হলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন যদি তা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতেন।

١٧. وَمَا تِلْكَ كَائِنَةٌ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ـ اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الْمُعْجِزَةَ فِيْهَا ـ

১৭. হে মূসা! আপনার ডান হস্তে এটা কি? এখানে اِسْتِفْهَامْ টা تَقْرِيْر-এর জন্য এসেছে। যাতে তার মধ্যে মুজেযা প্রতিফলিত হতে পারে।

١٨. قَالَ هِىَ عَصَاىَ ج اَتَوَكَّؤُا اَعْتَمِدُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْوُثُوْبِ وَالْمَشْىِ وَاَهُشُّ اَخْبِطُ وَرَقَ الشَّجَرِ بِهَا لِيَسْقُطَ عَلٰى غَنَمِىْ فَتَاْكُلُهُ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ جَمْعُ مَارِبَةٍ مُثَلَّثُ الرَّاءِ اَىْ حَوَائِجُ اُخْرٰى ـ كَحَمْلِ الزَّادِ وَالسَّقَاءِ وَطَرْدِ الْهَوَامِّ زَادَ فِى الْجَوَابِ بَيَانَ حَاجَاتِهِ بِهَا ـ

১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর দেই ঠেস লাগাই। ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এবং চলার সময়। এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি। গাছের পাতা ঝরাই। ফলে তারা তা ভক্ষণ করে। এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে مَاٰرِبُ এটা مَارِبَةٌ-এর বহুবচন। এর رَاء বর্ণে তিন প্রকারের হরকতই প্রযোজ্য। অর্থ- প্রয়োজনসমূহ। যেমন- খানা ও পানি বহন করা। কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। জবাবের পরিমাণে তিনি প্রয়োজনের বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করেছেন।

١٩. قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ـ

১৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা আপনি এটা নিক্ষেপ করুন!

٢٠. فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ ثُعْبَانٌ عَظِيْمٌ تَسْعٰى ـ تَمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهَا سَرِيْعًا كَسُرْعَةِ الثُّعْبَانِ الصَّغِيْرِ الْمُسَمّٰى بِالْجَانِّ الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنْهَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى ـ

২০. অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। উপুড় হয়ে দ্রুত বেগে جَانٌّ নামক ছোট সর্পের ন্যায় চলতে আরম্ভ করল। যাকে অন্য আয়াতে এ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢١. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ مِنْهَا سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَيْ اِلٰى حَالَتِهَا الْاُوْلٰى ـ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ فَمِهَا فَعَادَتْ عَصًا وَتَبَيَّنَ اَنَّ مَوْضِعَ الْاِدْخَالِ مَوْضِعُ مَسْكِهَا بَيْنَ شُعْبَتَيْهَا وَاُرِيَ ذٰلِكَ السَّيِّدُ مُوْسٰى لِئَلَّا يَجْزَعَ اِذَا انْقَلَبَتْ حَيَّةً لَدٰى فِرْعَوْنَ ـ

২১. তিনি বললেন, আপনি একে ধরুন, ভয় করবেন না। এটা থেকে আমি একে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব। سِيْرَتَهَا শব্দটি مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে। তিনি তার মুখে হাত প্রবেশ করালেন। ফলে তা লাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রবেশ করানোর জায়গা উভয় শাখার মাঝে ধরার জায়গা ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-কে এ কারণে এটা দেখানো হয়েছে যে, যখন ফেরাউনের এই লাঠি সর্পে রূপান্তরিত হবে তখন যেন তিনি ভয় পেয়ে না যান।

٢٢. وَاضْمُمْ يَدَكَ الْيُمْنٰى بِمَعْنَى الْكَفِّ اِلٰى جَنَاحِكَ اَيْ جَنْبِكَ الْاَيْسَرِ تَحْتَ الْعَضُدِ اِلَى الْاِبِطِ وَاَخْرِجْهَا تَخْرُجْ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اَيْ بَرَصٍ تَضِيْٓءُ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ تَغْشَى الْبَصَرَ اٰيَةً اُخْرٰى ـ وَهِيَ وَبَيْضَاءُ حَالَانِ مِنْ ضَمِيْرِ تَخْرُجْ ـ

২২. আপনার হাত রাখুন ডান হাত অর্থাৎ হাতের তালু, আপনার বগল তলে অর্থাৎ বাম পার্শ্বের বাহু থেকে বগল পর্যন্ত এবং তা বের করুন। এটা বের হয়ে আসবে পূর্বের বাদামী রংয়ের বিপরীত নির্মল উজ্জ্বল হয়ে কোনো রোগ ছাড়াই। যেমন শ্বেত রোগ যা সূর্যের ন্যায় আলোকময় হয়ে চোখ ঝলসে দেয়। অপর একটি নিদর্শন স্বরূপ اٰيَةً اُخْرٰى এবং بَيْضَاءُ উভয়টি تَخْرُجْ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

٢٣. لِنُرِيَكَ بِهَا اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ لِاِظْهَارِهَا مِنْ اٰيٰتِنَا الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى ـ اَيِ الْعُظْمٰى عَلٰى رِسَالَتِكَ وَاِذَا اَرَادَ عَوْدَهَا اِلٰى حَالَتِهَا الْاُوْلٰى ضَمَّهَا اِلٰى جَنَاحِهٖ كَمَا تَقَدَّمَ اَخْرَجَهَا ـ

২৩. এটা এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাব এর দ্বারা যখন এমনটি করবেন আমার মহা নিদর্শনগুলোর কিছু আপনার রিসালতের ব্যাপারে। আর যখন তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চান তখন প্রথমবারের মতো পার্শ্বদেশে হাত মিলাবেন এবং বের করে আনবেন।

٢٤. اِذْهَبْ رَسُوْلًا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَّعَهٗ اِنَّهٗ طَغٰى ـ جَاوَزَ الْحَدَّ فِيْ كُفْرِهٖ اِلَى ادِّعَاءِ الْاِلٰهِيَّةِ ـ

২৪. আপনি যান রাসূল হয়ে ফেরআউনের নিকট এবং যারা তার সাথে রয়েছে অর্থাৎ তার মন্ত্রী পরিষদের নিকট সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে অর্থাৎ সে খোদায়ী দাবি করে কুফরিতে সীমালঙ্ঘন করেছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا : অর্থাৎ আমি তার সময় গোপন রাখার ইচ্ছা করেছি। এটা আরবদের পরিভাষা অনুযায়ী। আরবরা যখন কোনো বিষয়কে খুবই গোপন রাখতে ইচ্ছা করত, তখন বলতো (كَتَمْتُهُ حَتّٰى مِنْ نَفْسِهِ) অর্থাৎ আমি কাউকেই জানাইনি। لِتُجْزٰى শব্দটি اُخْفِيْهَا -এর সাথে কিংবা اٰتِيَةٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে مُتَعَلِّقْ ও مُتَعَلَّقْ -এর মাঝে اَكَادُ اُخْفِيْهَا বাক্যটি مُعْتَرِضَةٌ

قَوْلُهُ بِهِ: এটা উহ্য মানার কারণ হলো صِلَة যদি বাক্য হয় তখন তার মধ্যে عَائِدٌ তথা যমীর থাকা জরুরি হয়।

قَوْلُهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ : এর মধ্যে مِنْ হলো مَا -এর বর্ণনা।

قَوْلُهُ يَصُدَّنَّكَ : শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ . نَهْىٌ بَا نُوْنِ ثَقِيْلَةٍ মূল অক্ষর হলো ص . د . د -এর ك যমীরটি مَفْعُوْل অর্থ– তোমাকে যেন আদৌ বিরত রাখতে না পারে।

قَوْلُهُ فَتَرْدٰى : এটা মূলত فَاَنْ تَرْدٰى ছিল। এটা হলো جَوَاب نَهْى

قَوْلُهُ وَمَا تِلْكَ : এর মধ্যকার مَا হলো مُبْتَدَأٌ اِسْمِ اِسْتِفْهَامْ আর اِسْمِ اِشَارَةٍ خَبَر تِلْكَ . بِيَمِيْنِكَ এটা উহ্য كَائِنَةٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَال হয়েছে। اِسْمِ اِشَارَةٍ তথা اُشِيْرَ এর যমীর থেকে। مَا تِلْكَ -এর مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ নয়। কেননা, এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব; বরং এটা কোনো বিষয়কে দৃঢ় করার জন্য আসে। অর্থাৎ ভালোভাবে দেখে নাও যে, এটা কি? যাতে ভুল ধারণা না হয়। কেননা অচিরেই তা সাপের আকৃতিতে মুজেযাস্বরূপ প্রকাশ লাভ করবে। حَيَّةٌ শব্দটি ছোট বড় সব ধরনের সাপকে বলা হয়। আর جَانٌّ বলা হয় ছোট সাপকে। ثُعْبَانٌ বলা হয় বড় সাপ বা অজগরকে। পবিত্র কুরআনে কোথাও جَانٌّ বলা হয়েছে। আবার কোথাও ثُعْبَانٌ বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, শরীরের গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে তা ثُعْبَانٌ ছিল এবং নড়াচড়া ও দ্রুতগতিতে جَانٌّ ছিল। অথবা প্রথমে جَانٌّ ছিল এবং পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ثُعْبَانٌ হয়েছে। فَاِذَا هِىَ تَسْعٰى এখানে اِذَا হলো مُفَاجَاتِيَّة তথা আকস্মিকতাজ্ঞাপক। هِىَ مُبْتَدَأٌ আর حَيَّةٌ প্রথম খবর। আর تَسْعٰى দ্বিতীয় খবর। এটা বাক্য হয়ে حَيَّةٌ -এর حَال কিংবা صِفَتْ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ سِيْرَتَهَا : মূলত اِلٰى سِيْرَتِهَا الْاُوْلٰى ছিল। اِلٰى বিলুপ্ত করার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى এটা سَنُعِيْدُهَا -এর মাফউলের যমীর থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ -ও হতে পারে। مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ এটা تَخْرُجْ -এর مُتَعَلِّقْ।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْكَفِّ : এটা বৃদ্ধি করে এ প্রশ্ন নিরসন করেছেন যে, আরবিতে يَدٌ শব্দটি আঙ্গুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। আর তাকে বগলে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। এর উত্তর এই যে, এখানে كُلْ বলে جُزْء উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاٰيَةِ : এটা বিলুপ্ত মেনে ইশারা করেছেন যে, اَلْكُبْرٰى হলো উহ্য مَوْصُوْف -এর صِفَتْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا : অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই। এমন কি পয়গাম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। اَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে– একথাও প্রকাশ করতাম না।

قَوْلُهُ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى : [যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়।] এই বাক্যটি اٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়, একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি اَكَادُ اُخْفِيْهَا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ হবে যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময় তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ مِنْهَا : এতে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিবেন না। তাহলে তা আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশঙ্কা নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শুনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বরদেরকেও যখন এমনভাবে তাগিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

قَوْلُهُ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى : অর্থাৎ হে মূসা! আপনার হাতে ওটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানির সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলি দেখা ও আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনার কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরো একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মুজেযা প্রদর্শন করা হলো। নতুবা হযরত মূসা (আ.)-এর মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَوْلُهُ قَالَ هِيَ عَصَايَ : হযরত মূসা (আ.)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জবাবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এখানে আসল জবাবের অতিরিক্ত আরো তিনটি বিষয় আরজ করেছেন। ১. এই লাঠি আমার। ২. আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই, দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগলপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং ৩. এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জবাবে ইশক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক ও মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত। যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন- وَلِيَ فِيْهَا مَآرِبُ اُخْرٰى অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরো অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জবাবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েজ।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিকক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى : হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এ সাপ সম্পর্কে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে- كَاَنَّهَا جَآنٌّ ; আরবি অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে- فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ; অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। এসব আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল। কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে এটাকে جَانٌّ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে كَاَنَّهَا শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে جَانٌّ -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ : جناح আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ -এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ : স্বীয় রাসূলকে দু'টি বিরাট মুজেযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যান।

অনুবাদ :

٢٥. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ . وَسِّعْهُ لِتَحَمُّلِ الرِّسَالَةِ .

২৫. হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন! প্রশস্ত করে দিন রিসালাতের দায়িত্ব বহন করার জন্য।

٢٦. وَيَسِّرْ سَهِّلْ لِيْ أَمْرِيْ . لِأُبَلِّغَهَا .

২৬. এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন! যাতে আমি তা প্রচার করতে পারি।

٢٧. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ . حَدَثَتْ مِنْ اِحْتِرَاقِهِ بِجَمْرَةٍ وَضَعَهَا بِفِيْهِ وَهُوَ صَغِيْرٌ .

২৭. আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন! যে জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল, শিশুকালে মুখে আঙ্গার দিয়ে জিহ্বা পুড়ে ফেলার কারণে।

٢٨. يَفْقَهُوْا يَفْهَمُوْا قَوْلِيْ . عِنْدَ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ .

২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে যাতে রিসালাতের প্রচারকালে তারা আমার কথা অনুধাবন করতে পারে।

٢٩. وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مُعِيْنًا عَلَيْهَا مِّنْ أَهْلِيْ .

২৯. আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে!

٣٠. هٰرُوْنَ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ أَخِيْ . عَطْفُ بَيَانٍ .

৩০. আমার ভ্রাতা হারূনকে هَارُوْنَ হলো দ্বিতীয় মাফঊল اِجْعَلْ-এর আর أَخِيْ হলো عَطْفُ بَيَانٍ

٣١. اشْدُدْ بِهٖٓ أَزْرِيْ . ظَهْرِيْ .

৩১. তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন! অর্থাৎ আমার পিঠকে।

٣٢. وَأَشْرِكْهُ فِيْٓ أَمْرِيْ . أَيِ الرِّسَالَةِ وَالْفِعْلَانِ بِصِيْغَتَيِ الْأَمْرِ وَالْمُضَارِعِ الْمَجْزُوْمِ وَهُوَ جَوَابٌ لِلطَّلَبِ .

৩২. এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করুন! অর্থাৎ রিসালাতে أُشْدُدْ এবং أَشْرِكْ শব্দ দুটি أَمْر -এর সীগাহ কিংবা مُضَارِع مَجْزُوْم -এর সীগাহ। এটা হলো তার প্রার্থনার জবাব।

٣٣. كَيْ نُسَبِّحَكَ تَسْبِيْحًا كَثِيْرًا .

৩৩. যাতে আমরা বেশি বেশি পরিমাণে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি।

٣٤. وَّنَذْكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا .

৩৪. এবং আপনাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে পারি।

٣٥. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا . عَالِمًا فَأَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ .

৩৫. আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা অবহিত। সুতরাং আপনি আমাদের উপর রিসালাতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন।

٣٦. قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى . مَنًّا عَلَيْكَ .

৩৬. তিনি বললেন, আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেওয়া হলো। আপনার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ।

٣٧. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰى .

৩৭. আমি তো আপনার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

٣٨. اِذْ لِلتَّعْلِيْلِ اَوْحَيْنَآ اِلَى اُمِّكَ مَنَامًا اَوْ اِلْهَامًا لِمَا وَلَدْتُكَ وَخَافَتْ اَنْ يَّقْتُلَكَ فِرْعَوْنُ فِىْ جُمْلَةِ مَنْ يُّوْلَدْ مَا يُوْحٰى ـ فِىْ اَمْرِكَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ ـ

٣٩. اَنِ اقْذِ فِيْهِ اَلْقِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِ فِيْهِ بِالتَّابُوْتِ فِى الْيَمِّ بَحْرِ النِّيْلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ اَىْ شَاطِئِهِ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ط وَهُوَ فِرْعَوْنُ وَاَلْقَيْتُ بَعْدَ اَنْ اَخَذَكَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ج لِتُحَبَّ مِنَ النَّاسِ فَاَحَبَّكَ فِرْعَوْنُ وَكُلُّ مَنْ رَاٰكَ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ م تُرَبّٰى عَلٰى رِعَايَتِىْ وَحِفْظِىْ لَكَ ـ

٤٠. اِذْ لِلتَّعْلِيْلِ تَمْشِىٓ اُخْتُكَ مَرْيَمُ لِتَعْرِفَ خَبَرَكَ وَقَدْ اَحْضَرُوْا مَرَاضِعَ وَاَنْتَ لَا تَقْبَلُ ثَدْىَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ط فَاُجِيْبَتْ فَجَاءَتْ بِاُمِّهٖ فَقَبِلَ ثَدْيَهَا فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِكَ وَلَا تَحْزَنَ ط حِيْنَئِذٍ وَقَتَلْتَ نَفْسًا هُوَ الْقِبْطِىُّ بِمِصْرَ فَاغْتَمَمْتَ لِقَتْلِهٖ مِنْ جِهَةِ فِرْعَوْنَ ـ

অনুবাদ :

৩৮. যখন اِذْ টা تَعْلِيْل -এর জন্য এসেছে। আমি আপনার মাতাকে জানিয়ে ছিলাম স্বপ্নযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানদের সাথে আপনাকেও ফেরাউন হত্যা করবে এ আশঙ্কা করছিলেন। যা জানবার আপনার ব্যাপারে। সামনে আগত اَنِ اقْذِ فِيْهِ বাক্যটি مَا يُوْحٰى থেকে بَدْل হয়েছে।

৩৯. যে আপনি তাকে রাখুন সিন্দুকে। এরপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দিন নীলনদে যাতে নদী তাকে তীরে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ নদীর পাড়ে। আর এখানে اَمْر টি خَبَر -এর অর্থে হয়েছে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে। সে হলো ফেরাউন আর আমি ঢেলে দিলাম আপনাকে গ্রহণ করার পর আমার নিকট হতে আপনার প্রতি ভালোবাসা যাতে আপনি মানুষের নিকট প্রিয়পাত্র হন। ফলে ফেরাউন ও যে কেউ দেখত যে আপনাকে ভালোবাসত। যাতে আপনি আমার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে আপনি লালিত পালিত হন।

৪০. যখন আপনার বোন হাঁটছিল। মারইয়াম, আপনার সংবাদ জানার জন্য। আর লোকজন অনেক ধাত্রী উপস্থিত করেছিল। আর আপনি এদের কোনো একজনেরও স্তন্য গ্রহণ করেননি। তখন সে বলল, আমি তোমাদেরকে বলে দিব, কে এই শিশুর ভার নিবে? তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো, তখন তিনি তার মাকে নিয়ে এলেন। আর তিনি তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। আমি আপনাকে আপনার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় আপনার সাক্ষাৎ দ্বারা এবং তিনি যেন দুঃখ না পান তখন এবং আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন লোকটি মিশরের কিবতী বংশের অন্তর্গত ছিল। তাকে হত্যা করার কারণে আপনি ফেরাউনের দিক থেকে চিন্তিত হলেন।

	অনুবাদ :
فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا تف اِخْتَبَرْنَاكَ بِالْاِيْقَاعِ فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ وَخَلَّصْنَاكَ مِنْهُ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ عَشْرًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ لا بَعْدَ مَجِيْئِكَ اِلَيْهَا مِنْ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِيِّ وَتَزَوُّجِكَ بِابْنَتِهٖ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ فِيْ عِلْمِيْ بِالرِّسَالَةِ وَهُوَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً مِنْ عُمْرِكَ يٰمُوْسٰى -	অতঃপর আমি আপনাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই, আমি আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত করে আমি আপনাকে পরীক্ষা করেছি এবং তা থেকে আপনাকে মুক্ত করেছি। এরপর আপনি অবস্থান করলেন কিছু বছর দশ বছর মাদায়েন বাসীগণের নিকট মিশর হতে মাদায়েনে গমনের পর হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট এবং তাঁর কন্যার সাথে আপনার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর। এরপর আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন আমার জ্ঞানে রেসালাতের ব্যাপারে। আর তা হলো আপনার বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়া। হে মূসা
٤١. وَاصْطَنَعْتُكَ اَخْتَرْتُكَ لِنَفْسِيْ ج بِالرِّسَالَةِ -	৪১. এবং আমি আপনাকে প্রস্তুত করে নিয়েছি নির্বাচন করেছি আমার নিজের জন্য রেসালাতের জন্য।
٤٢. اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ اِلَى النَّاسِ بِاٰيٰتِيْ التِّسْعِ وَلَا تَنِيَا تَفْتُرَا فِيْ ذِكْرِيْ ج بِتَسْبِيْحٍ وَغَيْرِهٖ -	৪২. আপনি ও আপনার ভ্রাতা যাত্রা করুন মানুষের নিকট আমার নিদর্শনসহ নয়টি আর আপনারা আমার স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَفْقَهُوْا : দোয়ার জবাবে আসার কারণে এটা مَجْزُوْم হয়েছে। وَزِيْرًا শব্দটি وَزْرٌ-এর صِيْغَة صِفَتْ অর্থ- সাহায্যকারী, সহায়ক, সহযোগিতাকারী। মুফাসসির (র.)-এর উক্তি মতে وَزِيْرًا শব্দটি اِجْعَلْ-এর প্রথম مَفْعُوْل আর هَارُوْنَ হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل তবে এর বিপরীতটি উত্তম। কেননা নিয়ম আছে যে যদি দুটি مَفْعُوْل একত্র হয়, এবং তার একটি مَعْرِفَة ও অপরটি نَكِرَة হয়, তাহলে مَعْرِفَة-কে প্রথম مَفْعُوْل বানানো হয়। কেননা প্রথম مَفْعُوْل টি مُبْتَدَأ হয়ে থাকে। অতএব তা مَعْرِفَة হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل টি خَبَرْ হয়। আর এর জন্য نَكِرَة হওয়া উপযোগী। এখানে هَارُوْنَ হলো مَعْرِفَة আর وَزِيْرًا হলো نَكِرَة তবে وَزِيْرًا শব্দটি এখানে মূল লক্ষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তারকীব : وَزِيْرًا প্রথম مَفْعُوْل আর لِيْ হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل এবং هَارُوْنَ বদল কিংবা আতফে বয়ান হবে। اُشْدُدْ ও اَشْرِكْ উভয়টি مُضَارِعْ - وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ হলে হামযাটি যবর বিশিষ্ট হবে। আর اَشْرِكْهُ-এর হামযাটি পেশ বিশিষ্ট হবে। দোয়ার জবাবে আসার কারণে দ্বিতীয় دَالْ এবং كَافْ সাকিন হবে। এ ক্ষেত্রে উভয় ফে'লের সম্বন্ধ হবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি। উদ্দেশ্য এই হবে যে, যাতে আমি তার মাধ্যমে আমার পিঠ সুদৃঢ় করতে পারি এবং তাকে আমার কাজের শরিক বানাতে পারি। আর উভয়টি যদি আমরের সীগাহ হয়, তাহলে اُشْدُدْ-এর হামযাটি পেশ বিশিষ্ট হবে। আর اَشْرِكْ

-এর হামযাটি হবে যবর বিশিষ্ট। এ সময় উভয় ফে'লের সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমার পিঠকে সুদৃঢ় কর এবং তাকে আমার কাজের শরিক বানাও। এখানে أَشْدُدْ ক্রিয়াটিকে أَخِيْ -এর সাথে মিলিয়ে পড়লে হামযাটি বিলুপ্ত হবে।

قَوْلُهُ أَزْرِيْ : اَلْأَزْرُ অর্থ শক্তি, পিঠ। سُؤْلٌ ـ سُؤْلَكَ শব্দটি فِعْل -এর ছন্দে। যেমন– خُبْزٌ শব্দটি مَخْبُوْزٌ -এর অর্থে তদ্রূপ এটিও مَفْعُوْل অর্থে। كَافْ -এর প্রতি مُضَافٌ হয়েছে। অর্থ– আবেদন, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা। إِذْ أَوْحَيْنَا হলো مَنَنَّا -এর যরফ। আর إِذْ أَوْحَيْنَا এটা مَرَّةً থেকে বদলও হতে পারে। এবং إِذْ تَعْلِيْلِيَّةٌ -ও হতে পারে। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি إِلْهَامًا ও مَنَامًا বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা وَحْيُ رِسَالَةٍ নয়; বরং শাব্দিক অর্থে وَحْي উদ্দেশ্য। اِقْذِفِيْ শব্দটি (ض) قَذَفَ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। এর শেষের ه হলো -এর যমীর مَفْعُوْل অর্থ– তুমি তাকে নিক্ষেপ কর, ফেলে দাও। اَلْيَمُّ অর্থ– সমুদ্র। এর দ্বারা নীল নদ উদ্দেশ্য। يَأْخُذْهُ হলো জওয়াবে আমর। مِنِّيْ এটা اَلْقَيْتُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ এবং كَائِنَةٌ উহ্য এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে مَحَبَّةٌ -এর সিফতও হতে পারে।

قَوْلُهُ لِتُحَبَّ : এটা اَلْقَيْتُ -এর علت এটাকে বিলুপ্ত মানার কারণ হলো যাতে لِتُصْنَعَ -এর আতফ শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ لِتُحَبَّ وَتُصْنَعَ

إِذْ تَمْشِيْ -এর সম্পর্ক উল্লিখিত দুটি ফেলের যে কোনো একটির সাথে হতে পারে। আবার প্রথম إِذْ -এর বদলও হতে পারে। কেননা ভগ্নি সাথে সাথে চলাও একটি ইহসান বা দয়া। এখানে أُذْكُرْ উহ্য মানলে বাক্যটি এমনও হতে পারে أُذْكُرْ إِذْ تَمْشِيْ

قَوْلُهُ مَرَاضِعَ : এ শব্দটি مُرْضِعَةٌ -এর বহুবচন, দুগ্ধদানকারিণী। فُتُوْنًا এটা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ অর্থাৎ اِبْتَلَيْنَاكَ فَتَنَّاكَ بِفُتُوْنٍ كَثِيْرَةٍ আবার فِتْنَةٌ ,اِبْتِلَاءٌ -এর বহুবচনও হতে পারে। যেমন– بَدْرَةٌ -এর বহুবচন بُدُوْرٌ আসে। অর্থাৎ (اِفْتِعَالٌ) اِصْطِنَاعٌ এটা اِصْطَنَعْتُكَ। ব্যাখ্যাকার (র.) فَاُجِبْتَ বিলুপ্ত মেনেছেন যাতে فَرَجَعْنَاكَ -এর আতফ বৈধ হয়। নির্বাচন করা, মনোনীত করা থেকে গৃহীত। সঠিকতার ক্ষেত্রে জোর দান করা। تَنِيَا শব্দটি وَنٰى يَنِيْ وَنْيًا থেকে, অর্থ– অলসতা করা। لَا تَنِيَا অর্থ– তোমরা উভয়ে অলসতা করো না। إِلَى النَّاسِ এখানে সামনের উপর অনুমান করে ফেরাউনকে বিলোপ করা হয়েছে। যেভাবে সেখানে اٰيَاتِيْ -কে তার উপর অনুমান করে বিলোপ করা হয়েছে। এটাকে صَنْعَت اِحْتِبَاكٌ বলা হয়। অর্থাৎ এক নজিরকে অপর নজিরের উপর কিয়াস করে বিলোপ করা।

قَوْلُهُ التِّسْعِ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর স্থলে اَلْعَصٰى وَالْيَدُ বললে তা মুনাসিব হতো। কারণ প্রথমত এ দুটি মুজেযা দান করা হয়েছিল। অবশিষ্টগুলো বিভিন্ন সময় সাপেক্ষে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো দুটি মুজেযার ব্যাপারে বহুবচন শব্দ উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : এ দু'টি মু'জেযা যেহেতু অনেকগুলো মুজেযা সম্বলিত ছিল। এ কারণে বহুবচন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ الخ : হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলা দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِيْ অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নবুয়তের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটুকথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোনো কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেওয়া আপনার পক্ষে সহজ।

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ অর্থাৎ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ.) দুগ্ধ পান করার জমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মূসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করেছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন, রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনো ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য আছিয়া একটি পাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো হয় না। এতে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ তা'আলার ভাবী রাসূল ছিলেন। যার স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্য অসাধারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তার হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তার জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই হযরত মূসা (আ.)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআনে একেই عُقْدَةً বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন। -[মাযহারী, কুরতুবী]

প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরি বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا অর্থাৎ হারূন আমার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামি প্রভাব কিছুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম এর উত্তরে বলেন, হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং তার দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু দূর হলে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থি নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির নির্ধারণ করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আ.) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বুঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজিরও তার বাদশাহর বুঝা দায়িত্ব

সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোনো সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কেনো ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভালো কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোনো জরুরি কাজ ভুল গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাকে সাহায্য করেন। -[নাসায়ী]

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ.) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে مِنْ اَهْلِىْ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিল মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চেয়ে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোনো শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোনো সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোনো উচ্চপদ দান করা দোষের কিছু নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছিলেন, যারা নবী পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

হযরত মূসা (আ.) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারূন, যাতে রেসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। হযরত মূসা (আ.) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গাম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত মূসা (আ.)-কে যখন মিশরে ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারূন (আ.)-কে মিশরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। -[কুরতুবী]

পঞ্চম দোয়া : وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতে শরিক করতে চাইলেন। কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালাতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেন- كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا

অর্থাৎ হযরত হারূন (আ.) কে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার জিকির ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাসবীহ ও জিকির মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তাসবীহ ও জিকিরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিকিরে মশগুল থাকতে চায় তার উপযুক্ত পরিবেশ তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে- قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ অর্থাৎ হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ : হযরত মূসা (আ.)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতি যুগে তার জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَىٰ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তী কালের; বরং أُخْرَىٰ শব্দটি কোনো সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বুঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোনো অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ : অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাজতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وَحْي শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে, অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারো বিশেষ গুণ নয়। নবী, রাসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ আয়াতের আভিধানিক অর্থে ওহী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে হযরত মূসা (আ.) জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরি নয়। যেমন মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে কোনো বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই। ওলীআল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন; বরং আবূ হাইয়্যান ও আরো কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই হলো জনসংস্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা। যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো বুজুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী তাশরীয়ী' ও 'গায়র তাশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোনো কোনো বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা মুফতি শফী (র.) রচিত পুস্তক 'খতমে নবুয়ত'-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর নাম : রূহুল মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

قَوْلُهُ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ : এখানে يَمٌّ শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত এর দ্বারা নীলনদ বুঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে দেওয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেওয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বুঝানো হয়নি। বরং খবর দেওয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলেমদের মতে এখানে আদেশই বুঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোনো সৃষ্টবস্তু [বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত] চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন-

خاک وباد واب واتش بنده اند * با من وتو مرده باحق زنده اند

অর্থাৎ মৃত্তিকা, বাতাস, পানি ও অগ্নি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা জীবিত।

قَوْلُهُ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهُ : অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে যে, আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু। অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহ তা'আলার দুশমন তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তখন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন ছিল না; বরং তার লালন পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু বলা শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আছিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ : এখানে مَحَبَّةٌ ধাতু শব্দটি আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সেই আদর করতে বাধ্য হতো। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা (রা.) থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ : صَنْعَتْ শব্দ বলে এখানে উত্তম লালন-পালন বুঝানো হয়েছে। আরবে صَنَعْتُ فَرَسِيْ বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন পালন করেছি। عَلٰى عَيْنِيْ বলে عَلٰى حِفْظِيْ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিশরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্যে এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করেছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ : হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا অর্থাৎ বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি। -[ইবনে আব্বাস]। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি। -[যাহ্হাক]। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মা'রিফুল কুরআন [ই. ফা. বা.] ৬ষ্ঠ খণ্ডের পৃষ্ঠা নং- ৭৮ - ১১০ দ্রষ্টব্য।]

অনুবাদ :

٤٣. اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ج بِادِّعَاءِ الرُّبُوْبِيَّةِ ـ

৪৩. আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। রবুবিয়্যত দাবি করার মাধ্যমে।

٤٤. فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا فِىْ رُجُوْعِهٖ عَنْ ذٰلِكَ لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ اَوْ يَخْشٰى ـ اللّٰهَ فَيَرْجِعُ وَالتَّرَجِّىْ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِمَا لِعِلْمِهٖ تَعَالٰى بِاَنَّهٗ لَا يَرْجِعُ ـ

৪৪. আপনারা তার সাথে নম্র কথা বলবেন। তার উক্ত দাবি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। আল্লাহ তা'আলাকে, ফলে সে ফিরে আসবে। এখানে تَرَجِّىْ -এর শব্দ হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার তো জানা আছে যে, ফিরে আসবে না।

٤٥. قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَىْ يُعَجِّلَ بِالْعُقُوْبَةِ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ـ عَلَيْنَا اَىْ يَتَكَبَّرَ ـ

৪৫. তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করবে। অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। আমাদের উপর। অর্থাৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে।

٤٦. قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا بِعَوْنِىْ اَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ وَاَرٰى ـ مَا يَفْعَلُ ـ

৪৬. তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমার সাহায্য আমি শুনি সে যা বলে ও আমি দেখি সে যা করে।

٤٧. فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ لا اِلَى الشَّامِ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ط اَىْ خَلِّ عَنْهُمْ مِنْ اِسْتِعْمَالِكَ اِيَّاهُمْ فِىْ اَشْغَالِكَ الشَّاقَّةِ كَالْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ وَحَمْلِ الثَّقِيْلِ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ بِحُجَّةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ط عَلٰى صِدْقِنَا بِالرِّسَالَةِ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ اَىِ السَّلَامَةُ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ ـ

৪৭. সুতরাং আপনারা তার নিকট যান এবং বলুন, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও। সিরিয়ায় আর তাদেরকে কষ্ট দিও না। অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টদায়ক কাজে নিয়োগ করা বন্ধ করে দাও। যেমন– খনন, নির্মাণ, বোঝাবহন ইত্যাদি কার্যে। আমরা তো তোমার নিকট এনেছি নিদর্শন দলিল প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের রাসূল হওয়ার সত্যতার ব্যাপারে। আর শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ অর্থাৎ শাস্তি হতে তার জন্য নিরাপত্তা থাকবে।

٤٨. اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ بِمَا جِئْنَا بِهٖ وَتَوَلّٰى ـ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاَتَيَاهُ وَقَالَا لَهٗ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ ـ

৪৮. আমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে। যা আমরা নিয়ে এসেছি সে ব্যাপারে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা থেকে। তাঁরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে এসে তাকে এসব বললেন।

অনুবাদ :

٤٩. قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ـ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ الْاَصْلُ وَلِاِدْلَالِهٖ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ ـ

৪৯. ফেরাউন বলল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক শুধুমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সম্বোধনে ক্ষান্ত করা হয়েছে। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে মূলত রেসালাত ছিল। আর ফেরাউন তার উপর তার করুণা প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল।

٥٠. قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ ـ مِنَ الْخَلْقِ خَلْقَهُ الَّذِيْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَمَيِّزٌ بِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ ثُمَّ هَدٰى ـ الْحَيَوَانَ مِنْهُ اِلٰى مَطْعَمِهٖ وَمَشْرَبِهٖ وَمَنْكَحِهٖ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ـ

৫০. হযরত মূসা (আ.) জবাব দিলেন– হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। যার দ্বারা তা অন্যের থেকে পৃথক করা হয়। অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ প্রাণীকে তার পানাহার, বিয়ে শাদী ইত্যাদির প্রতি।

٥١. قَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ حَالُ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ الْاُوْلٰى ـ كَقَوْمِ نُوْحٍ وَهُوْدٍ وَلُوْطٍ وَصَالِحٍ فِيْ عِبَادَتِهِمُ الْاَوْثَانَ ـ

৫১. ফেরাউন বলল, তাহলে অতীত লোকদের উম্মতদের কি অবস্থা? যেমন– হযরত নূহ, হুদ, সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা, যারা মূর্তি পূজা করত।

٥٢. قَالَ مُوْسٰى عِلْمُهَا اَيْ عِلْمُ حَالِهِمْ مَحْفُوْظٌ عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ج هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ يُجَازِيْهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يَضِلُّ يَغِيْبُ رَبِّيْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسٰى ـ رَبِّيْ شَيْئًا ـ

৫২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, এর জ্ঞান তাদের অবস্থার জ্ঞান সংরক্ষিত। আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে। আর তা হলো লাওহে মাহফুজ। কিয়ামতে তিনি তাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না। অর্থাৎ কোনো বস্তু তাঁর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং বিস্মৃতও হন না। আমার প্রতিপালক কোনো কিছুকে।

٥٣. هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ فِيْ جُمْلَةِ الْخَلْقِ الْاَرْضَ مَهْدًا ـ فِرَاشًا وَّسَلَكَ سَهَّلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا طُرُقًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط مَطَرًا قَالَ تَعَالٰى تَتْمِيْمًا لِمَا وَصَفَهُ بِهٖ مُوْسٰى وَخِطَابًا لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا اَصْنَافًا مَا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ط صِفَةُ اَزْوَاجًا اَيْ مُخْتَلِفَةَ الْاَلْوَانِ وَالطُّعُوْمِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتّٰى جَمْعُ شَتِيْتٍ كَمَرِيْضٍ وَمَرْضٰى مِنْ شَتَّ الْاَمْرُ تَفَرَّقَ ـ

৫৩. তিনি তোমাদের জন্য করেছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য। পৃথিবীকে বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে চলার পথ করে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন। আর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর কথার পরিসমাপ্তিকল্পে মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এখানে شَتّٰى হলো اَزْوَاجًا-এর সিফত। অর্থাৎ রং, স্বাদ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের। আর شَتّٰى হলো شَتِيْتٌ-এর বহুবচন। যেমন– مَرِيْضٌ-এর বহুবচন হলো مَرْضٰى আর এটা شَتَّ الْاَمْرُ হতে নির্গত। অর্থ– প্রভেদ হওয়া।

٥٤. كُلُوْا مِنْهَا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط فِيْهَا جَمْعُ نِعَمٍ هِىَ الْاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يُقَالُ رَعَتِ الْاَنْعَامُ وَرَعَيْتُهَا وَالْاَمْرُ لِلْاِبَاحَةِ وَتَذْكِيْرِ النِّعْمَةِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ اَخْرَجْنَا اَىْ مُبِيْحِيْنَ لَكُمُ الْاَكْلَ وَرَعَى الْاَنْعَامَ . اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَّا لَاٰيٰتٍ لَعِبَرًا لِّاُولِى النُّهٰى . لِاَصْحَابِ الْعُقُوْلِ جَمْعُ نُهْيَةٍ كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ سُمِّىَ بِهِ الْعَقْلُ لِاَنَّهُ يَنْهٰى صَاحِبَهُ عَنِ الْاِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ .

অনুবাদ :

৫৪. তোমরা আহার কর তা হতে এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও এতে; اَنْعَامٌ শব্দটি نِعَمٌ -এর বহুবচন, তা হলো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। বলা হয়- رَعَتِ الْاَنْعَامُ এবং رَعَيْتُهَا অর্থাৎ গবাদি পশু চরেছে ও চরিয়েছি। আর وَارْعَوْا -এর اَمْر বা নির্দেশ اِبَاحَتْ তথা বৈধতামূলক। অনুগ্রহ স্মরণ করানোর জন্য। আর পূর্ণ বাক্যটি اَخْرَجْنَا -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য আহার করা ও পশু চরানোকে বৈধকারী। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্য। اَلنُّهٰى শব্দটি نُهْيَةٌ -এর বহুবচন। যেমন غُرْفَةٌ -এর বহুবচন غُرَفٌ ; বিবেককে نُهٰى বলার কারণ হলো এটা বিবেকের অধিকারীকে ঘৃণিত বিষয়ে জড়িত হতে নিষেধ করে।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ উভয়কে একই শব্দে একত্র করার মধ্যে বিশেষ কী উপকারিতা রয়েছে? অথচ এর দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এসময় হযরত হারূন (আ.) ছিলেন মিশরে।

উত্তর : ১. حَاضِرْ তথা মধ্যম পুরুষকে غَائِبْ তথা নাম পুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এমন করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা মধ্যবর্তী আবরণ অপসারিত করেছিলেন। যার ফলে হযরত হারূন (আ.) আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী শ্রবণ করেছিলেন যা হযরত মূসা (আ.) শ্রবণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) কোনো মাধ্যমবিহীন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শুনছিলেন। আর হযরত হারূন (আ.) শুনেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে।

قَوْلُهُ فِىْ رُجُوْعِهِ عَنْ ذٰلِكَ : অর্থাৎ রবুবিয়্যাতের দাবি থেকে ফেরাউনের রুজু করা।

قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ : এটা تَرَجِّىْ -এর জবাবে আসার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। وَالتَّرَجِّىْ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِمَا একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা تَرَجِّىْ তথা সন্দেহসূচক শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের মধ্যে ফেরাউনের ঈমান না আনার বিষয়টি নির্ধারিত ছিল?

উত্তর. تَرَجِّىْ -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে, নিজ সত্তার প্রতি লক্ষ্য করে নয়। يَفْرُطُ (ن) فَرْطًا فَرَطًا অর্থ- তাড়াহুড়া করা, আগে যাওয়া, পূর্ণ কথা না শুনে কারো সাজায় দ্রুততা অবলম্বন করা। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَاْتِيَاهُ وَقَالَ لَهُ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ : এ অংশটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফেরাউনের এ উক্তি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

قَوْلُهُ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. فَمَنْ رَبُّكُمَا -এর মধ্যে হারূন এবং মূসা (আ.) উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর يَا مُوْسٰى -এর শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

উত্তর.

১. উভয়ের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) যেহেতু প্রধান ছিলেন আর হযরত হারূন (আ.) ছিলেন তার অনুগামী ও সহায়তাকারী। এ কারণে আহ্বান করার ক্ষেত্রে প্রধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২. ব্যাখ্যাকার (র.) لِاِدْلَالِهِ থেকে দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন। এর সারমর্ম এই যে, হে মূসা! শৈশব থেকে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালক তো আমি। তুমি অন্য কাকে আমার প্রতিপালক বলছ? যেন তার অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে বলছে, তোমার জন্য এটা সমীচীন নয়, যে তুমি অন্য কাউকে আমার প্রতিপালক স্থির করবে। কারণ তোমার প্রতিপালক হলাম আমি। পক্ষান্তরে হযরত হারূন (আ.) এর উপর ফেরাউনের কোনো অনুগ্রহ ছিল না।

قَوْلُهُ اِدْلَالٌ : অর্থ অনুগ্রহ প্রকাশ করা, খোটা দেওয়া, গর্ব করা। رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى الخ -এর মধ্যে رَبُّنَا হলো مُبْتَدَأٌ আর اَلَّذِيْ الخ হলো خَبَرٌ অথবা এখানে هُوَ مُبْتَدَأٌ উহ্য রয়েছে। আর رَبُّنَا হলো তার خَبَرٌ উভয়টি মিলে مَوْصُوْف আর اَلَّذِيْ الخ হলো তার صِفَتٌ - সিফত ও মওসূফ মিলে مَقُوْلَهٗ - اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ -এর মধ্যে اَعْطٰى -এর شَيْءٍ হলো প্রথম মাফঊল। আর خَلْقَهٗ দ্বিতীয় مَفْعُوْل অথবা এর বিপরীতও হতে পারে। গুরুত্বের জন্য দ্বিতীয় مَفْعُوْل -কে আগে আনা হয়েছে। অর্থাৎ اَعْطٰى خَلْقَهٗ كُلَّ شَيْءٍ ছিল।

قَوْلُهُ قَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ الخ : যখন ফেরাউনের নিকট হযরত মূসা (আ.) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজে বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন এমন কথাবার্তা বলল, যার সাথে রিসালতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে কথার গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করল। যাতে তার রাজত্বে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। হযরত মূসা (আ.) তার চালবাজি বুঝে ফেললেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিয়ে মূল বিষয়বস্তুর উপর অটল রইলেন। তিনি ফেরাউনকে আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন না। কারণ এটাই হলো বিতর্কের একটা বিশেষ নীতি। সাধারণত বিরুদ্ধবাদীর নিকট যখন কোনো দলিল প্রমাণ থাকে না। তখন সে আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এদিক সেদিকের কথা বলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ : এটা ফেরাউনের প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ لَا يَضِلُّ اَيْ لَا يُخْطِئُ اِبْتِدَاءً : অর্থাৎ কোনো বস্তু তার থেকে ছুটতে পারে না।

قَوْلُهُ لَا يَنْسٰى : অর্থাৎ কোনো বিষয়ের জ্ঞান লাভের পরে বিস্মৃতি ঘটে না। اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا ثُمَّ এবং هدى -এর মধ্যকার مَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى الخ বাক্যটি معترضة

قَوْلُهُ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِي الْكِتَابِ اَيْ عِلْمُ حَالِهِمْ مَحْفُوْظٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, هَا ضَمِيْر হলো মুযাফ ইলাইহি এর পূর্বে حَال مُضَاف উহ্য রয়েছে। কেননা কারো জ্ঞান দ্বারা উক্ত বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তার সত্তা উদ্দেশ্য হয় না। مَحْفُوْظٌ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, عِلْمُهَا হলো مُبْتَدَأٌ আর خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। عِلْمُهَا مُرَكَّبٌ اِضَافِيٌّ হয়ে مُبْتَدَأٌ আর عِنْدَ رَبِّيْ হলো প্রথম خَبَرٌ - فِي الْكِتَابِ দ্বিতীয় خَبَرٌ অথবা এটাও বৈধ আছে যে, هٰذَا حُلْوٌ حَامِضٌ -এর মতো উভয়টি একই خَبَرٌ অথবা عِنْدَ رَبِّيْ হলো خَبَرٌ আর فِي الْكِتَابِ যরফের যমীর থেকে حَالٌ হবে।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى - تَتْمِيْمًا لِمَا وَصَفَهُ الخ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, فَاَخْرَجْنَا بِهِ الخ এটা ঘটনা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার বাণী যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-কে পূর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদেরকে আহ্বান করেছেন এবং তাদের উপর নিজ করুণা প্রকাশ করেছেন। এ বাক্যটি تَارَةً اُخْرٰى পর্যন্ত শেষ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَتّٰى : شَتّٰى হলো شَتِيْتٌ-এর বহুবচন। যেমন- مَرِيْضٌ-এর বহুবচন আসে مَرْضٰى এবং اَزْوَاجًا উহ্য মুবাহিন-এর সিফত। আবার نَبَاتٍ-এর সিফতও হতে পারে। كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ এটা اَخْرَجْنَ-এর যমীর থেকে حَال অর্থাৎ قَائِلِيْنَ-ও উহ্য মানা যেতে পারে। اَخْرَجْنَا اَصْنَافَ النَّبَاتِ مُبِيْحِيْنَ لَكُمُ الْاَكْلَ وَرَعْىَ الْاَنْعَامِ এর স্থলে مُبِيْحِيْنَ।

قَوْلُهُ رَعَتِ الْاَنْعَامُ وَرَعَيْتُهَا : বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, رَعْىٌ শব্দটি لَازِمٌ ও مُتَعَدِّىْ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ : তোমরা উভয়ে ফিরাউনের নিকট যাও। সে রবুবিয়্যাতের দাবী করে সীমালঙ্ঘন করেছে। তার সঙ্গে বিনম্র কথা বলবে, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তার কৃতকর্ম থেকে আনন্দ চিত্তে বিরত থাকে। অথবা আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করে রবুবিয়্যাতের দাবী থেকে ফিরে আসে। এ আয়াতে দ্বীনের আহ্বানকারীগণের জন্যে এক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ জরুরি উসূল বর্ণিত হয়েছে। ফিরাউন যেহেতু খোদা দাবীদার জালেম, অত্যাচারী এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্যে শত সহস্র নিষ্পাপ বনি ইসরাঈলী শিশুদেরকে হত্যার দায়ে দায়ী ছিল। তার নিকট যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট নবীকে প্রেরণ করলেন সে সময় তাঁকে হেদায়াত তথা নির্দেশনা দান করেছিলেন যে, তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। যাতে করে সে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়, অথবা আল্লাহ তা'আলার ইলম ছিল যে, ফিরাউন তার অহংকার ও গোমরাহী থেকে ফিরে আসার নয়। তথাপি তিনি তাঁর নবীগণকে এ উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয়। ফেরাউন হেদায়েত লাভ করুক কিংবা না করুক উসূল বা মূলনীতি এমন হওয়া উচিত যা হেদায়েত ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম হতে পারে। বর্তমান অনেক আলেম তাদের মতবিরোধের মধ্যে একজন অপরজনের বিপরীতে অতিশয়োক্তি করা এবং বিভিন্নরূপে দোষক্রটি তালাশ করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে বসে আছেন। তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

হযরত মূসা (আ.) কেন ভয় পেলেন? اِنَّنَا نَخَافُ হযরত মূসা ও হারূন (আ.) এখানে আল্লাহ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يَّفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে।

দ্বিতীয় ভয় اَنْ يَّطْغٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে হযরত মূসা (আ.)-কে নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হলে তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে তার সাথে শরিক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলে দেন- سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَوْلُهُ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى : এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হলে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে

পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শুনা ও মুজেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শুনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরি নয়।

দ্বিতীয়ত ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গাম্বরের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন- لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا . فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ এবং فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। সত্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু মানুষের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ভয় পয়গাম্বরদের মধ্যে দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى : আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে।

হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান। এ থেকে জানা গেল যে, গয়গাম্বরগণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কুরআন পাকে হযরত মূসা (আ.) -এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছে : এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গাম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্টজগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি,পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি ও মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হ্যাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনো অগ্নিও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনো পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا অর্থাৎ তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত-গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল? এটাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্টজীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকে কারো শিক্ষা ব্যতীতই প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্টজীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টজীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল ছিল ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন ছওয়াব অথবা আজাবের অধিকারী হয়।

قَوْلُهُ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى : আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টজগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোনো জবাব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জবাব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রার্থনা, পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রশ্ন উত্তরে হযরত মূসা (আ.) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গুমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেকুফ, গুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى : ফেরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গুমরাহ ও জাহান্নামী, তবে ফেবাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। হযরত মূসা (আ.) এমন বিজ্ঞজনোচিত জবাব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' তিনি বললেন, তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করা অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। আর ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

قَوْلُهُ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى : ازواج শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتّٰى শব্দটি شَتِيْتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুল্ম, ফলফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى অর্থাৎ এতে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য।

نُهٰى শব্দটি نَهْيَةٌ -এর বহুবচন। বিবেককে نَهْيَةٌ [নিষেধকারক] বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

অনুবাদ :

৫৫. مِنْهَا اَيِ الْاَرْضِ خَلَقْنٰكُمْ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهَا وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ مَقْبُوْرِيْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ تَارَةً مَرَّةً اُخْرٰى - كَمَا اَخْرَجْنَاكُمْ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ خَلْقِكُمْ -

৫৫. আমি এখান থেকে পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব মৃত্যুর পর কবরস্থ করার মাধ্যমে। আর তা হতেই তোমাদেরকে বের করব পুনরুত্থানকালে পুনর্বার যেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টির সময় বের করেছি।

৫৬. وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اَيْ اَبْصَرْنَا فِرْعَوْنَ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا التِّسْعَ فَكَذَّبَ بِهَا وَزَعَمَ اَنَّهَا سِحْرٌ وَاَبٰى - اَنْ يُوَحِّدَ اللّٰهَ تَعَالٰى -

৫৬. আমি তো তাকে দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ ফেরাউনকে দেখিয়েছি আমার সমস্ত নিদর্শন নয়টি নিদর্শন কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এগুলোকে। আর মনে করেছে যে এগুলো জাদু। ও অমান্য করেছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষণাকে।

৫৭. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا مِصْرَ وَيَكُوْنَ لَكَ الْمُلْكُ فِيْهَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى -

৫৭. সে বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ আমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য মিশর থেকে। আর এখানে তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার জাদু দ্বারা হে মূসা!

৫৮. فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ يُعَارِضُهٗ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لِذٰلِكَ لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ فِيْ سُوًى - بِكَسْرِ اَوَّلِهٖ وَضَمِّهٖ اَيْ وَسَطًا يَسْتَوِيْ اِلَيْهِ مَسَافَةَ الْجَائِيْ مِنَ الطَّرَفَيْنِ -

৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু যা তার মোকাবিলা করবে। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মাঝে নির্ধারণ কর নির্দিষ্ট সময় এই কারণে যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তোমরাও করবে না এক মধ্যবর্তী স্থানে مَكَانًا এটা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার ফেলে দেওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। سُوًى শব্দটির سِيْن বর্ণে যের ও পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থ– মধ্যবর্তী স্থান যা উভয় দিক থেকে আগমনকারীর জন্য সমান দূরত্বের হবে।

৫৯. قَالَ مُوْسٰى مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ يَوْمُ عِيْدٍ لَهُمْ يَتَزَيَّنُوْنَ فِيْهِ وَيَجْتَمِعُوْنَ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ يَجْمَعُ اَهْلَ مِصْرَ ضُحًى - وَقْتَهٗ لِلنَّظَرِ فِيْمَا يَقَعُ -

৫৯. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন অর্থাৎ ঈদের দিন। যেদিন তারা সাজসজ্জা গ্রহণ করে ও ময়দানে একত্র হয়। এবং যেদিন জনগণকে সমবেত করা হবে মিশরবাসীকে জমায়েত করা হবে। পূর্বাহ্নে সেদিন যা সংঘটিত হবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

অনুবাদ :

٦٠. فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ اَدْبَرَ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ اَىْ ذَوِىْ كَيْدِهٖ مِنَ السَّحَرَةِ ثُمَّ اَتٰى ـ بِهِمُ الْمَوْعِدَ ـ

৬০. অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, অতঃপর তার কৌশলসমূহ একত্র করল অর্থাৎ জাদু বিদ্যায় পারদর্শীদেরকে একত্র করল অতঃপর আসল তাদেরকে নিয়ে নির্ধারিত দিনে।

٦١. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَهُمْ اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ اَلْفًا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ حَبْلٌ وَعَصًا وَيْلَكُمْ اَىْ اَلْزَمَكُمُ اللّٰهُ تَعَالَى الْوَيْلَ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِاِشْرَاكِ اَحَدٍ مَعَهٗ فَيُسْحِتَكُمْ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا اَىْ يُهْلِكَكُمْ بِعَذَابٍ ج مِنْ عِنْدِهٖ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنِ افْتَرٰى ـ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ ـ

৬১. হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তারা ছিল বাহাত্তর হাজার আর তাদের প্রত্যেকের সাথেই ছিল রশি এবং লাঠি। দুর্ভোগ তোমাদের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর দুর্ভোগ চাপিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে করলে তিনি তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। فَيُسْحِتَكُمْ -এর يَاء বর্ণটি পেশযুক্ত আর حَاء বর্ণটি যের যুক্ত। অর্থাৎ বিনাশ করবেন। শাস্তি দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করে।

٦٢. فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ فِىْ مُوْسٰى وَاَخِيْهِ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ـ اَىِ الْكَلَامَ بَيْنَهُمْ فِيْهِمَا ـ

৬২. তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে বিতর্ক করল। হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে এবং তাঁরা গোপনে পরামর্শ করল অর্থাৎ তাদের দু'জনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল।

٦٣. قَالُوْآ لِاَنْفُسِهِمْ اِنْ هٰذٰىنِ لِاَبِىْ عَمْرٍو وَلِغَيْرِهٖ هٰذَانِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلُغَةِ مَنْ يَأْتِىْ فِى الْمُثَنّٰى بِالْاَلِفِ فِىْ اَحْوَالِهِ الثَّلَاثِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ـ مُؤَنَّثُ اَمْثَل بِمَعْنٰى اَشْرَفَ اَىْ بِاَشْرَافِكُمْ بِمَيْلِهِمْ اِلَيْهِمَا لِغَلَبَتِهِمَا ـ

৬৩. তারা বলল নিজেদেরকে লক্ষ্য করে এই দুজন অবশ্যই আবূ আমর ও অন্যান্যের মতে هٰذَانِ এটা তাদের ভাষ্য মতে, যাদের নিকট দ্বিবচনের শব্দ তিন অবস্থাতেই اَلِفْ সহ ব্যবহৃত হয়। যাদুকর! তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করতে اَلْمُثْلٰى শব্দটি اَمْثَلُ -এর مُؤَنَّثْ ; অর্থ– উৎকৃষ্ট, উত্তম, উন্নত। অর্থাৎ তোমাদের উৎকৃষ্টদেরকে স্বীয় আয়ত্তে নিয়ে নিবে। তাদের এই উভয় ভ্রাতার প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার কারণে তাদের উভয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে।

অনুবাদ :

٦٤. فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ مِنَ السِّحْرِ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَفَتْحِ الْمِيْمِ مِنْ جَمَعَ اَىْ لَمَّ وَبِهَمْزَةِ قَطْعٍ وَكَسْرِ الْمِيْمِ مِنْ اَجْمَعَ اَحْكَمَ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ج حَالٌ اَىْ مُصْطَفِّيْنَ وَقَدْ اَفْلَحَ فَازَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى . غَلَبَ .

৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল সুসংহত কর অর্থাৎ জাদু ক্রিয়া। اَجْمِعُوْا শব্দটি هَمْزَةُ الْوَصْلِ এবং مِيْم বর্ণে যবরযোগে جَمَعَ একত্র করা হতে। আর هَمْزَةِ قَطْعِىْ সহ مِيْم বর্ণে যেরযোগে হলে اَجْمَعَ হতে, অর্থ- সুদৃঢ় করা, সুসংহত করা। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও صَفًّا শব্দটি اِئْتُوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। এবং যে আজ বিজয়ী হবে সেই সফল হবে اِسْتَعْلٰى শব্দটি غَلَبَ [বিজয়লাভ করা] অর্থে হয়েছে।

٦٥. قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِخْتَرْ اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ عَصَاكَ اَىْ اَوَّلًا وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى . عَصَاهُ .

৬৫. তারা বলল, হে মূসা! আপনি পছন্দ করুন হয় আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি অর্থাৎ প্রথমে অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

٦٦. قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ج فَاَلْقَوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ اَصْلُهُ عَصُوُوْ قُلِبَتِ الْوَاوَانِ يَائَيْنِ وَكُسِرَتِ الْعَيْنُ وَالصَّادُ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسْعٰى . عَلٰى بُطُوْنِهَا .

৬৬. হযরত মূসা (আ.) বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তখন তারা নিক্ষেপ করল। আকস্মাৎ তাদের লাঠি ও রশিগুলো عِصِيٌّ মূলত ছিল عَصُوُوْ দুটি وَاوْ -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে عَيْن ও صَادْ -এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর মনে হলো জাদুর প্রভাবে ছুটাছুটি করছে সাপ হয়ে তাদের পেটে ভর করে।

٦٧. فَاَوْجَسَ اَحَسَّ فِىْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسٰى . اَىْ خَافَ مِنْ جِهَةِ اَنَّ سِحْرَهُمْ مِنْ جِنْسِ مُعْجِزَتِهِ اَنْ يَلْتَبِسَ اَمْرُهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يُؤْمِنُوْا بِهِ .

৬৭. হযরত মূসা (আ.) তাঁর অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন অর্থাৎ তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তাদের জাদুসমূহ মুজেযা জাতীয় হওয়ায় মানুষের নিকট বিষয়টি ধাঁ-ধার সৃষ্টি করবে। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।

٦٨. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى . عَلَيْهِمْ بِالْغَلَبَةِ .

৬৮. আমি বললাম, ভয় করবেন না। আপনিই প্রবল বিজয়ের দ্বারা তাদের উপরে থাকবেন।

٦٩. وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ وَهِىَ عَصَاهُ تَلْقَفْ تَبْتَلِعْ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّ مَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط اَىْ جِنْسِهِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى . بِسِحْرِهِ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَتَلَقَّفَتْ كُلَّ مَا صَنَعُوْا .

৬৯. আপনার দক্ষিণ হস্তে যা রয়েছে তা নিক্ষেপ করুন আর তা হলো তাঁর লাঠি এরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে গিলে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। অর্থাৎ সে জাতীয় জাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হবে না তার জাদু দ্বারা। হযরত মূসা (আ.) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তারা যা বানিয়েছিল তা গিলে ফেলল।

٧٠. فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا خَرُّوْا سَاجِدِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى . قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى .

৭০. অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হলো অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জন্য সিজদায় লুটে পড়ল। তারা বলল, আমরা হযরত হারূন ও মূসা (আ.)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ الخ : এর দ্বারা সে প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে প্রথমত দুটি মুজেযা লাঠি ও শুভ্রহস্ত দান করা হয়েছিল। কাজেই ফেরাউনের নিকট গমনের সাথে সাথে নয়টি মুজেযা তাকে কিভাবে দেখালেন। উল্লিখিত বাক্য দ্বারা এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ে তিনি মোট নয়টি মুজেযা দেখিয়েছেন। কেননা لَقَدْ اَرَيْنَاهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا এটা خَبَرِيَّةٌ বাক্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, দাওয়াতের পূর্ণ সময় আমি ফেরাউনকে সকল মুজেযা দেখিয়েছি। অতএব প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اَرَيْنَا : اَرَيْنَا-এর ব্যাখ্যা اَبْصَرْنَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে رُؤْيَةٌ তথা দর্শন দ্বারা رُؤْيَة بَصَرِىْ তথা চর্মচোখে দেখা উদ্দেশ্য। فَلَنَأْتِيَنَّكَ-এর মধ্যে لَامْ বর্ণটি جَوَاب قَسْم-এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। এখানে কসম উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি এমন ছিল وَعِزَّتِىْ وَكِبْرِيَائِىْ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِىْ এখানে بِسِحْرِىْ শব্দটি فَلَنَأْتِيَنَّكَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে, আর فَا বর্ণটি ক্রমধারাজ্ঞাপক।

قَوْلُهُ مَوْعِدًا : এটা যরফে জামান, اِجْعَلْ-এর প্রথম مَفْعُوْل পরে এসেছে। بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ দ্বিতীয় মাফঊলটি আগে এসেছে। سُوًى-এর মধ্যে سِيْن বর্ণে পেশ বা যের যে কোনোটি হতে পারে। مَوْعِدُكُمْ হলো مُبْتَدَأ আর يَوْمُ الزِّيْنَةِ হলো خَبَرْ।

قَوْلُهُ اَىْ ذَوِىْ كَيْدِهٖ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বাক্যে مُضَافٌ বিলুপ্ত রয়েছে। এর দ্বারা জাদুকর উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَيْلَكُمْ : এর ব্যাখ্যা اَلْزَمَكُمُ اللّٰهُ الْوَيْلَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَيْلَكُمْ শব্দটি বিলুপ্ত আমেলের কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَشْرَافِكُمْ : এটা طَرِيْقَتِكُمْ-এর ব্যাখ্যা। طَرِيْقَةٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে আসে। তার একটি অর্থ হলো সম্ভ্রান্ত জাতি।

قَوْلُهُ اِنْ هٰذَيْنِ لَسٰحِرَانِ : জাদুকরদের এ উক্তি اَسَرُّوا النَّجْوٰى-এর ফলশ্রুতি অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে তাঁরা উভয়েই জাদুকর।

هٰذَيْنِ হলো اِنْ-এর ইসম, আর لَسٰحِرَانِ হলো এর খবর। অন্য একটি قِرَاءَة-এ هٰذَانِ রয়েছে। আবুল হারেস ইবনে কা'আবের ভাষায় هٰذَانِ হলো اِنْ-এর ইসম। এ সকল লোক تَثْنِيَة বা দ্বিবচনকে তিনো অবস্থায় আলিফ সহকারে পড়ে থাকে এবং اِعْرَابْ-কে تَقْدِيْرِىْ মেনে থাকে। কেউ বলেন اِنْ-এর ইসম হলো ضَمِيْر شَانْ অর্থাৎ اِنَّهُ আর هٰذَانِ لَسٰحِرَانِ হলো اِنْ-এর خَبَرْ - فَاَجْمِعُ শব্দটি هَمْزَة وَصْل ও مِيْم যবর সহকারে, অর্থ হলো– তুমি তোমার সকল কৌশল ও চেষ্টা ব্যয় কর বা একত্র কর। আর যদি فَاَجْمِعُ এর হামযাটি قَطْعِىْ এবং مِيْم বর্ণে যের সহকারে হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে তুমি তোমার সকল কৌশল ও চেষ্টাকে সুদৃঢ় ও মজবুত কর।

قَوْلُهُ صَفًّا : এটা اِيْتُوْا-এর যমীর থেকে حَالْ আর صَفًّا শব্দটি যেহেতু مَصْدَرْ এ কারণে বহুবচনের যমীর থেকে حَالْ হওয়া বৈধ। অর্থ হলো– مُصْطَفِيْنَا

قَوْلُهُ اِخْتَرْ : এটা উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ তার পরবর্তী অংশসহ مُفْرَدْ-এর তাবীলে হয়ে উহ্য اِخْتَرْ ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ : এখানে বাক্যে শব্দ উহ্য রয়েছে। মূলত فَاَلْقَوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ ছিল। عِصِىٌّ শব্দটি মূলত عَصُوْوٌ ছিল। প্রথমত দ্বিতীয় وَاوْ-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন وَاوْ এবং يَاء একত্র হওয়ায় প্রথম

وَاوْ টিকে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর এক يَاء -কে অপর يَاء -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এবং صَادْ ও عَيْن বর্ণের পেশকে যের দেওয়া হয়েছে। حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ হলো مُبْتَدَأ আর يُخَيَّلُ اِلَيْهِ হলো خَبَرْ - فَاِذَا এটা مُفَاجَاتِيَّة خَبَر مُقَدَّم আর حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এ সময় يُخَيَّلُ اِلَيْهِ হবে। এর সম্বন্ধ হবে تَسْعٰى -এর প্রতি এবং حِبَالُ -এর যমীরের প্রতি সম্বন্ধ হওয়াও বৈধ হবে। حِبَالُ যেহেতু مُؤَنَّث غَيْر حَقِيْقِىْ এ কারণে فِعْل টি مُذَكَّرْ ব্যবহার করা বৈধ। اِنَّهَا تَسْعٰى এটা يُخَيَّلُ -এর بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ

قَوْلُهُ اَىْ خَافَ مِنْ جِهَةِ الخ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : কথোপকথনকালে আল্লাহ তা'আলা লাঠি এবং শুভ্রহস্তের ন্যায় স্পষ্ট মুজেযা দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা ও সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলেন। তথাপি হযরত মূসা (আ.) ভয় পেলেন কেন?

উত্তর : এ ভয় মূলত সাপ থেকে নয়, বরং জাদুকরদের জাদু যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার অনুরূপ ছিল, কারণ তারাও তাদের রশি এবং লাঠি দ্বারা সাপ বানিয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, উপস্থিত জনতা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাকে জাদু না ভেবে বসে। ফলে তারা ঈমান থেকে বিরত থাকবে।

قَوْلُهُ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ : সাধারণত কেরাতে كَيْدُ শব্দটি رَفْع -এর সাথে রয়েছে। এ সময় اِنَّ -এর خَبَرٌ হবে। আর مَا مَوْصُوْلَه এবং صَنَعُوْا হলো صِلَه এ সময় عَائِدْ বিলুপ্ত থাকবে। বাক্যটি এমন হবে। اِنَّ الَّذِىْ صَنَعُوْهُ كَيْدُ سَاحِرٍ আর যদি اِنَّ مَصْدَرِيَّة হয়, তাহলে বাক্য যেভাবে আছে উক্ত অবস্থায় বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা لَا يُفْلِحُ السَّحَرَةُ বললেন না কেন? কারণ জাদুকর তো অনেকজন ছিল। মুফাসসির (র.) سَاحِرٍ শব্দের ব্যাখ্যা جِنْسِه দ্বারা করে এর উত্তর দিয়েছেন যে, এর দ্বারা একজন জাদুকর উদ্দেশ্য নয়, বরং জাদুকর শ্রেণি উদ্দেশ্য। বহুবচন ব্যবহার করলে সন্দেহ থাকত যে, এখানে সংখ্যা উদ্দেশ্য। অথচ তা ঠিক নয়। فَاُلْقِىَ এটা اِلْقَاءٌ থেকে مَاضِىْ مَجْهُوْل -এর সীগাহ। অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে লাঠি ও রশি ইত্যাদি নিক্ষেপের কাজ শুরু হলো এবং যা কিছু ঘটল তা উপস্থিত জনতা প্রত্যক্ষ করল। এরপর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। سُجَّدًا শব্দটি سَاجِدِيْنَ অর্থে। اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى এখানে বাক্যের শেষাংশের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য হারূনকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ - প্রত্যেক মানুষের খমিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : مِنْهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ এক হযরত আদম (আ.) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ.), তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন, সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারো কারো মতে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজন প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কুরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীস এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবূ নু'আঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাজকিরা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَوْنٍ لَمْ نَكْتُبْهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ نَبِيْلٍ وَهُوَ اَحَدُ الثِّقَاتِ الْاَعْلَامِ مِنْ اَهْلِ الصَّدْرَةِ ـ

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী (র.) বলেন, যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা (র.) এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ -[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খমিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আমি হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হবো। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি গরীব। হযরত ইবনে জাওযী (র.) একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (র.) বলেন, এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান [লিগায়রিহি]-এর চেয়ে কম নয়। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَكَانًا سُوًى : অর্থাৎ ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) ও জাদুকরদের মোকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত, যাতে কোনো পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন- مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য হলো ঈদ অথবা কোনো মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন দিন ছিল? এতে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন, এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারো মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য : হযরত মূসা (আ.) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণির লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়ই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

যাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান : এই বিষয়বস্তুটি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাকারায় হারূত ও মারূতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

জাদুকরদের সংখ্যা : ইমাম রাযী (র.) এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কাসেম ইবনে সালাম (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার এবং প্রত্যেকের

হাতে একটি লাঠি ও একটি দড়ি ছিল। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার, আর প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটি লাঠি ও একটি রশি। আর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেছেন, জাদুকরের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার। আর ইবনে জুরায়েজ ও ইকরামা (রা.) বলেছেন, তারা ছিল নয়শ। তিনশ জাদুকর আনা হয়েছিল পারস্য থেকে, তিনশত রোম থেকে, আর তিনশত ইস্কান্দরিয়া [মিশর] থেকে।

قَوْلُهُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলার কৌশল হিসেবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশত থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমতো কাজ করতো। কথিত আছে যে, তাদের সরদার একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিল। –[কুরতুবী]

জাদুকরদের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ ভাষণ : মুজেযা দ্বারা জাদুর মোকাবিলা করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই- وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না। অর্থাৎ তার সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরিক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আজাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলা বাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানি শক্তি ও লোক লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্য সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গাম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও জাঁকজমক থাকে। তাদের সাদাসিধে ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। হযরত মূসা (আ.)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো জাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন, এদের মোকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ -এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্য তারা গোপন পরামর্শ করতে লাগল

قَوْلُهُ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى : কিন্তু অবশেষে মোকাবিলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল–

اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

অর্থাৎ তারা উভয়ে জাদুকর। তারা তাদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দিতে চায়। উদ্দেশ্য এই যে, জাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ দখল করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। مُثْلٰى শব্দটি اَمْثَلُ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ হলো উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফেরাউনকে আল্লাহ ও ক্ষমতাশালী মান্য কর– এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম। এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোনো কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও কওমের 'তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) থেকে তরিকার এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও।

قَوْلُهُ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا : সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করল।

জাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, নাকি আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) জবাবে বললেন, بَلْ اَلْقُوْا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই জবাবে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জবাব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জবাব ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে আরো অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তাঁর মুজেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মতো ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল।

قَوْلُهُ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى : এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى : অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো। কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন, প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জবাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে- لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى এতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে পারবে না। আপনিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবেন। এভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর উপরিউক্ত আশঙ্কা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, আপনার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ করুন! এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোনো মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করবেন না এবং আপনার হাতে যা-ই আছে, তা-ই নিক্ষেপ করুন! এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল : হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মুজেযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল, আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোনো হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোজখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। -[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

৭১. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ط اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمْ مُعَلِّمُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ حَالٌ بِمَعْنٰى مُخْتَلِفَةٍ ط اَىِ الْاَيْدِى الْيُمْنٰى وَالْاَرْجُلَ الْيُسْرٰى وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ط اَىْ عَلَيْهَا وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا يَعْنِىْ نَفْسَهُ وَرَبُّ مُوْسٰى اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ـ اَدْوَمُ عَلٰى مُخَالِفَتِهٖ ـ

৭১. ফেরাউন বলল, কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করলে أَأَمَنْتُمْ -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে তাঁর প্রতি, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই, সে তো দেখছি তোমাদের প্রধান তোমাদের শিক্ষক সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, সুতরাং আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব مِنْ خِلَافٍ হলো اَيْدِيَكُمْ যা مَفْعُوْل -এর حَالٌ অর্থ مُخْتَلِفَةً তথা ডান হাত এবং বাম পা এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের উপর আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর রবের শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী তার বিরুদ্ধাচরণে।

৭২. قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ نَخْتَارَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ الدَّالَّةِ عَلٰى صِدْقِ مُوْسٰى وَالَّذِىْ فَطَرَنَا خَلَقَنَا قَسَمٌ اَوْ عَطْفٌ عَلٰى مَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ط اَىْ اِصْنَعْ مَا قُلْتَهُ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ط اَلنَّصَبُ عَلَى الْاِتِّسَاعِ اَىْ فِيْهَا وَتُجْزٰى عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৭২. তারা বলল, তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না তোমাকে নির্বাচন করব না আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর যা হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতার উপর প্রমাণ বহন করে আর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর وَالَّذِىْ অংশটি কসম/শপথ অথবা তার আতফ হলো فَاقْضِ -এর উপর তুমি যা চাও তা কর অর্থাৎ তুমি যা বলেছ তা কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার اَلْحَيٰوةَ -এর نَصَبْ টি ظَرْف তথা مَفْعُوْل فِيْه হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের মধ্যে। আর পরকালে এর প্রতিদান দেওয়া হবে।

৭৩. اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا مِنَ الْاِشْرَاكِ وَغَيْرِهٖ وَمَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط تَعَلُّمًا وَعَمَلًا لِمُعَارَضَةِ مُوْسٰى وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِنْكَ ثَوَابًا اِذَا اُطِيْعَ وَّاَبْقٰى ـ مِنْكَ عَذَابًا اِذَا عُصِىَ ـ

৭৩. আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ শিরক ইত্যাদি হতে এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ শিক্ষা করতে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ তোমার থেকে প্রতিদান দানে যখন তার অনুগত করা হয় ও স্থায়ী তোমার থেকে শাস্তি দানে যখন তার নাফরমানি করা হয়।

অনুবাদ :

٧٤. قَالَ تَعَالٰى إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا كَافِرًا كَفِرْعَوْنَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوْتُ فِيْهَا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيٰى - حَيَاةً تَنْفَعُهُ -

৭৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে তার প্রতিপালকের প্রতি অপরাধী হয়ে ফেরাউনের ন্যায় কাফের হয়ে তার জন্য আছে জাহান্নাম। সে সেথায় মরবেও না যে স্বস্তি পাবে বাঁচবেও না এমন জীবন যা তাকে উপকৃত করবে।

٧٥. وَمَنْ يَّأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَأُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى - جَمْعُ عُلْيَا مُؤَنَّثُ أَعْلٰى -

৭৫. যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল কর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা اَلْعُلٰى শব্দটি عُلْيَا -এর বহুবচন যা اَعْلٰى -এর مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গ।

٧٦. جَنّٰتُ عَدْنٍ أَيْ إِقَامَةٍ بَيَانٌ لَهُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰؤُا مَنْ تَزَكّٰى - تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوْبِ -

৭৬. স্থায়ী জান্নাত عَدْنٌ শব্দের অর্থ হলো অবস্থানযোগ্য তার বিবরণ হলো যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র। গুনাহ থেকে পবিত্র থাকবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اٰمَنْتُمْ لَهُ : এর هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامْ টি অস্বীকার ও হুমকিমূলক, হযরত হাফস (র.)-এর মতে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। أَاٰمَنْتُمْ -এর সিলাহ لَامْ আনা হয়েছে। কারণ أَاٰمَنْتُمْ শব্দটি اِتَّبَعْتُمْ -এর অর্থ বিশিষ্ট। أَاٰمَنْتُمْ উভয় হামযা স্বঅবস্থায় বহাল রয়েছে। প্রথমটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ দ্বিতীয়টি فَا كَلِمَة , শব্দটি جَمْعُ مُذَكَّرٍ حَاضِرْ - أَكْرَمْتُمْ -এর ছন্দে। দ্বিতীয় হামযাটিকে নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامْ প্রবিষ্ট হয়েছে। এখন শব্দটিতে দুই হামযা অপরিবর্তিত অবস্থায় একত্র হয়েছে। উভয় হামযাকে স্বঅবস্থায় বহাল রেখে অথবা হামযা اِسْتِفْهَامْ-কে বিলোপ করে পড়া যায়। মুফাসসির (র.)-এর وَاِبْدَالُ الثَّانِيَةِ اَلِفًا বলাটা অস্পষ্ট। কারণ দ্বিতীয়টি তো কেরাতের মধ্যে পরিবর্তনবিহীন বহাল রয়েছে। অবশ্য اِبْدَالُ الثَّالِثَةِ বললে তা সঙ্গত হতো।

قَوْلُهُ مِنْ خِلَافٍ : এর হলো مِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ আর خِلَافٍ শব্দটি مُخْتَلِفَةٍ অর্থে হয়ে حَالْ অর্থাৎ أُقَطِّعُهَا مُخْتَلِفَاتٍ

قَوْلُهُ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ اَيْ عَلَيْهَا : অর্থাৎ فِيْ অব্যয়টি عَلٰى অর্থে– اَيُّنَا হলো مُبْتَدَأ আর اَشَدُّ وَاَبْقٰى হলো خَبَرْ ك – مُبْتَدَأ মিলে لَتَعْلَمُنَّ -এর مَفْعُوْل যা দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। عَلٰى مُخَالَفَتِهِ -এর সম্পর্ক হলো اَشَدُّ وَاَبْقٰى -এর সাথে। وَالَّذِيْ فَطَرَنَا -এর وَاوْ টি যদি কসমিয়্যাহ হয় তাহলে مَوْصُوْلْ صِلَةٌ মিলে قَسَمْ এবং لَا تُؤْثِرُكَ عَلَى الْحَقِّ - جَوَاب قَسَمْ উহ্য ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ وَحَقُّ الَّذِيْ فَطَرَنَا لَا تُؤْثِرُكَ عَلَى الْحَقِّ হবে। আর وَاوْ টি عَاطِفَةٌ হলে হবে مَعْطُوْف عَلَيْهِ مَا جَاءَنَا অর্থাৎ لَا تُؤْثِرُكَ عَلَى الَّذِيْ جَاءَنَا وَلَا الَّذِيْ فَطَرَنَا হবে।

قَوْلُهُ فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ : এটা হুমকির জবাব। هٰذِهِ حَيَاةَ الدُّنْيَا -এর মধ্যে هٰذِهِ হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ আর اَلْحَيٰوةَ হলো بَدَلْ এটা হরফে জর বিলুপ্তির কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। বাক্যটি এমন ছিল اِنَّمَا تَقْضِيْ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ; এর মধ্যকার فِيْ অব্যয়টি বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে তা مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّمَا : এর مَا -এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা– ১. مَا অব্যয়টি فِعْل -এর উপর اِنَّ -এর প্রবেশকে বৈধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا হলো تَقْضِىْ -এর ظَرْف আর تَقْضِىْ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত রয়েছে। ২. مَا শব্দটি اَلَّذِىْ অর্থে اِنَّ -এর اِسْم আর تَقْضِيْهِ -এর صِلَة বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ اَلَّذِىْ تَقْضِىْ غَرْضَكَ تَقْضِيْهِ كَائِنٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا . (جَمَل)

وَمَا اَكْرَهْتَنَا -এর আতফ হলো خَطَايَانَا -এর উপর অর্থাৎ যাতে আমাদের অন্যায় এবং জাদুকর্মকে ক্ষমা করে দেন। যার ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলেন। مِنَ السِّحْرِ হলো عَلَيْهِ -এর যমীর থেকে অথবা مَا مَوْصُوْلَة থেকেও حَالٌ হতে পারে। আর مِنْ হলো جِنْس বা শ্রেণি বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنَّهٗ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهٗ জুমলায়ে মুস্তানিফা। এর পূর্বে জাদুকরদের উক্তি ছিল। আর এটা হলো আল্লাহ তা'আলার উক্তি। خَالِدِيْنَ শব্দটিকে مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগল, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনো কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মুজেযা দেখার পর কারো অনুমতির আবশ্যকতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

قَوْلُهُ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ : এখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল। অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শুলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَوْلُهُ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূববর্তী আয়াতে জাদুকরদের প্রতি ফেরাউনের ধমকের উল্লেখ ছিল। জাদুকররা যখন ইসলাম কবুল করলেন, তখন ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে অনুমতি লাভের পূর্বেই মূসার প্রতি ঈমান আনলে? আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব। তার প্রতিউত্তরে মু'মিনগণ যা বলেছেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৮৯]

জাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বলল, আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোনো কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মুজেযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল, এসব নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। –[কুরতুবী]

এবং জগৎ স্রষ্টা আসমান জমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফায়সালা কর এবং যে সাজা দেবার ইচ্ছা দাও।

قَوْلُهُ إِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا : অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তার শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ : জাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এই পাপকাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবিলার জন্য দর কষাকষিও ফেরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মুজেযার মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। -[রূহুল মা'আনী]

ফেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া প্রতিযোগিতার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উপগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর বিজয়ের সংবাদ শুনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন, আমিও মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল, একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তার প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তার মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

ফেরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন : إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে ذٰلِكَ جَزَاۤؤُ مَنْ تَزَكّٰى এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য, যা খাঁটি ইসলামি বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের কোনো শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ.)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বিলায়েতের [ওলীত্বের] ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে শহীদ হয়ে গেলেন। -[ইবনে কাছীর]

৭৭. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مِنْ أَسْرَى أَوْ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَكَسْرِ النُّوْنِ مِنْ سَرَى لُغَتَانِ أَيْ سِرْ بِهِمْ لَيْلاً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فَاضْرِبْ اجْعَلْ لَهُمْ بِالضَّرْبِ بِعَصَاكَ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا أَيْ يَابِسًا فَامْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَأَيْبَسَ اللّٰهُ الْأَرْضَ فَمَرُّوْا فِيْهَا لَا تَخَافُ دَرَكًا أَيْ أَنْ يُدْرِكَكَ فِرْعَوْنُ وَلَا تَخْشَى ـ غَرَقًا ـ

অনুবাদ :

৭৭. আমি অবশ্যই মূসার নিকট প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাগণকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও ফে'লটি أَسْرِ হতে অথবা أَسْرَى যোগে هَمْزَةِ قَطْعِيْ হতে অথবা سَرَى যোগে এবং তখন ن বর্ণটি যেরযুক্ত হবে هَمْزَةِ وَصْل হতে। উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় মিশর হতে বেরিয়ে পড়ুন। এবং তাদের জন্য বানিয়ে দিন লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ يَبَسًا অর্থ يَابِسًا হযরত মূসা (আ.)-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তিনি পালন করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা মাটি শুষ্ক করলেন। ফলে তারা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে গেল। পশ্চাৎ দিক হতে এসে আপনাকে ধরে ফেলবে এই আশঙ্কা করবেন না। অর্থাৎ ফেরাউন আপনার নাগাল পেয়ে যাবে। এবং ভয়ও করবেন না ডুবে যাওয়ার।

৭৮. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ أَيِ الْبَحْرِ مَا غَشِيَهُمْ ـ مَا غَرَقَهُمْ ـ

৭৮. অতঃপর তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। আর সে ফেরাউন তাদের সাথেই ছিল অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলল। নিমজ্জিত করল।

৭৯. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ بِدُعَائِهِمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَمَا هَدَى ـ بَلْ أَوْقَعَهُمْ فِي الْهَلَاكِ خِلَافَ قَوْلِهِ وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ـ

৭৯. আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদেরকে তার উপসনার প্রতি আহ্বান করে। এবং সে সৎপথ দেখায়নি; বরং তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করেছে তার উক্তি– "আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করছি" -এর বিপরীতে।

৮০. يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فِرْعَوْنَ بِإِغْرَاقِهِ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ فَنُؤْتِيْ مُوْسَى التَّوْرٰيةَ لِلْعَمَلِ بِهَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ هُمَا التُّرَنْجَبِيْنُ وَالطَّيْرُ السُّمَانٰى بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَالْمُنَادٰى مَنْ وُجِدَ مِنَ الْيَهُوْدِ زَمَنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَخُوْطِبُوْا بِمَا أُنْعِمَ بِهِ عَلٰى أَجْدَادِهِمْ زَمَنَ النَّبِيِّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ تَعَالٰى لَهُمْ ـ

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে। আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে সেখানে আমি মূসাকে [হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে] তাওরাত দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। এবং তোমাদের নিকট মান্না সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। মান্না ও সালওয়া হলো সুমিষ্ট খাদ্য ও তিতির জাতীয় পাখি। اَلسُّمَانٰى শব্দটি مِيْم বর্ণটি তাশদীদবিহীন এবং শেষে اَلِف مَقْصُوْرَة যোগে। এখানে রাসূল ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে তাদের পূর্বসূরী বংশধরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল, তা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। [আর এটা হচ্ছে] আল্লাহ তা'আলার সামনের বাণীর ভূমিকা স্বরূপ–

অনুবাদ :

٨١. كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ اَيِ الْمُنْعَمِ بِهٖ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ بِاَنْ تَكْفُرُوا الْمُنْعِمَ بِهٖ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ج بِكَسْرِ الْحَاءِ اَيْ يَجِبُ وَبِضَمِّهَا يَنْزِلُ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا فَقَدْ هَوٰى - سَقَطَ فِي النَّارِ -

৮১. তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভালো ভালো বস্তু আহার কর তোমাদের উপর কৃত অনুগ্রহ থেকে এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না। এভাবে যে, আমার অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করবে করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত فَيَحِلَّ -এর ح বর্ণে যের দিয়ে অর্থাৎ অবধারিত হবে। আর ح বর্ণে পেশ হলে অর্থ হবে অবতীর্ণ হবে। এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। জাহান্নামে পতিত হয়।

٨٢. وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ وَاٰمَنَ وَحَّدَ اللّٰهَ وَعَمِلَ صَالِحًا يُصَدِّقُ بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ثُمَّ اهْتَدٰى - بِاسْتِمْرَارِهٖ عَلٰى مَا ذُكِرَ اِلٰى مَوْتِهٖ -

৮২. এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে শিরক হতে ঈমান আনে আল্লাহ তা'আলাকে এক বলে স্বীকার করে সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল সবই এর অন্তর্ভুক্ত। ও সৎপথে অবিচলিত থাকে উল্লিখিত বিষয়াদিতে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার মাধ্যমে।

٨٣. وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمَجِيْءِ مِيْعَادِ اَخْذِ التَّوْرٰىةِ يٰمُوْسٰى -

৮৩. কিসে আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে ত্বরা করতে বাধ্য করল নির্ধারিত সময়ে তাওরাত গ্রহণ করার জন্য আগমন করতে। হে মূসা!

٨٤. قَالَ هُمْ اُولَآءِ اَيْ بِالْقُرْبِ مِنِّيْ يَاْتُوْنَ عَلٰى اَثَرِيْ ج وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى - عَنِّيْ اَيْ زِيَادَةً عَلٰى رِضَاكَ وَقَبْلَ الْجَوَابِ اَتٰى بِالْاِعْتِذَارِ بِحَسْبِ ظَنِّهٖ وَتَخَلَّفِ الْمَظْنُوْنِ لَمَّا -

৮৪. তিনি বললেন, এই তো তারা আমার নিকটেই আছে। আমার পশ্চাতে আসছে এবং হে আমার প্রতিপালক আমি ত্বরায় আপনার নিকট আসলাম আপনি সন্তুষ্ট হবেন এজন্য। অর্থাৎ আপনার সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য। জবাবের পূর্বেই তিনি নিজ ধারণা মতে ওজর পেশ করলেন এবং ধারণাটি বাস্তবতার বিপরীত প্রমাণিত হলো।

٨٥. قَالَ تَعَالٰى فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ اَيْ بَعْدَ فِرَاقِكَ لَهُمْ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ - فَعَبَدُوا الْعِجْلَ -

৮৫. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তো আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, আপনি চলে আসার পর অর্থাৎ তাদের থেকে আপনি পৃথক হওয়ার পর। এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে ফলে তারা গো-বৎস পূজা করেছে।

অনুবাদ :

٨٦. فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ مِنْ جِهَتِهِمْ اَسِفًا ج شَدِيْدِ الْحُزْنِ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ط اَىْ صِدْقًا اَنَّهٗ يُعْطِيْكُمُ التَّوْرٰىةَ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ مُدَّةُ مُفَارَقَتِىْ اِيَّاكُمْ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ يَجِبَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ بِعِبَادَتِكُمُ الْعِجْلَ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ـ وَتَرَكْتُمُ الْمَجِيْئَ بَعْدِىْ ـ

৮৬. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি ভীষণ মর্মাহত ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? সত্য প্রতিশ্রুতি যে, তিনি তোমাদেরকে তাওরাত দান করবেন তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে তোমাদের নিকট হতে আমার পৃথক হওয়ার সময়? নাকি তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের গো-বৎস উপাসনার কারণে যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এবং আমার পশ্চাতে আগমন থেকে বিরত থাকলে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا الخ : এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ তথা ঘটনার উপর ঘটনার عَطْف -এর অন্তর্গত। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রথমত হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট রাসূল বানিয়ে প্রেরণের কাহিনী এবং তার বিশেষ মুজেযা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ফেরাউন এবং তার বাহিনীর শিক্ষণীয় পরিণতির কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কাজেই এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত হলো।

قَوْلُهٗ طَرِيْقًا : এটা اِضْرِبْ -এর মাফউলেবিহী। কেননা اِضْرِبْ শব্দটি اِجْعَلْ -এর অর্থ বিশিষ্ট। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন। আবার اِضْرِبْ -এর মাফউলেবিহী যদি লুপ্ত হয়, তাহলে বাক্যটি এমন হবে- اِضْرِبْ مَوْضِعَ طَرِيْقٍ এ ক্ষেত্রে طَرِيْق -এর দিকে اِضْرِبْ -এর সম্বন্ধ রূপকার্থে হবে। مَوْضِع শব্দকে বিলোপ করে طَرِيْق -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। ফলে اِضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا হয়েছে। এখানে طَرِيْق দ্বারা جِنْس طَرِيْق উদ্দেশ্য। কেননা বনী ইসরাঈলের গোত্রের সংখ্যানুপাতে বারোটি রাস্তা বানিয়েছিলেন। يَبَسًا শব্দটি মাসদার, طَرِيْق -এর উপর এটা মুবালাগা স্বরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা মাসদারের পূর্বে ذَاتَ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَاتَ يَابِسٍ ছিল। আর যদি بَا বর্ণকে সাকিন দিয়ে পড়া হয় তাহলে এটা يَابِسًا অর্থে সিফাতের সীগাহ হবে। لَا تَخَافُ শব্দটি হামযা (র.) ছাড়া বাকি সকল ক্বারীগণের মতে রফা যোগে পঠিত। এ সময় এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা হবে। আর এর কোনো مَحَلِّ اِعْرَابْ হবে না। অথবা اِضْرِبْ -এর فَاعِلْ -এর যমীর থেকে حَالْ হবে। অর্থাৎ اِضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا حَالَ كَوْنِكَ غَيْرَ خَائِفٍ আর হামযা (র.) জযমযোগে পড়েছেন। কারণ তার মতে لَا হলো نَاهِيَة এ কারণে تَخَفْ জযমযোগে হবে।

قَوْلُهٗ وَلَا تَخْشٰى : এটা সকল কারীগণের মতে اَلِفْ সহ পঠিত হয়েছে। رَفْع -এর ক্ষেত্রে لَا تَخَافُ -এর উপর এর আতফ হওয়াটি স্পষ্ট। আর জযমের ক্ষেত্রে এর عَطْف ـ لَا تَخَفْ -এর উপর হবে। আর لَا تَخْشٰى -এর মধ্যে জযমের

আলামত হবে اَلِفْ বিলুপ্ত হওয়া। আর বর্তমান যে আলিফ রয়েছে সেটি اِشْبَاعْ-এর আলিফ হবে। فَاصْلَةْ তথা বাক্যের শেষাংশের ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে এটা আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِجُنُوْدِهِ : এটা হালের স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَهُمْ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, جَارْ টি اَتْبَعَهُمْ-এর صِلَةْ নয়; বরং حَالْ-এর স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। আর اَتْبَعَهُمْ-এর দ্বিতীয় মাফউল লুপ্ত রয়েছে। অর্থ হলো- اَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نَفْسَهُ مَعَ جُنُوْدِهِ আর বায়যাবিতে উল্লেখ আছে যে, وَالْمَعْنٰى فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نَفْسَهُ وَمَعَهُ جُنُوْدُهُ ـ فَحُذِفَ مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ কেউ বলেন, بِجُنُوْدِهِ-এর بَا অতিরিক্ত। فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ সমুদ্রের তরঙ্গমালার ধ্বংসাত্মক অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত তরঙ্গমালার ধ্বংসাত্মক অবস্থা এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তার প্রকৃত অবস্থা কেউ জানে না।

قَوْلُهُ فَنُؤْتِيْ مُوْسَى التَّوْرٰةَ لِلْعَمَلِ بِهَا : এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে- প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তার কওমকে নয়। সুতরাং وَوَاعَدْنَاكُمْ-এর মধ্যে কওমের প্রতি প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ করা হলো কেন?

উত্তর : যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করার উদ্দেশ্যই ছিল যে, তাঁর কওম তার উপর আমল করবে। এর মধ্যেই ছিল তাদের সফলতা। এ কারণেই তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তর : এই হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি সত্তর জন সর্দারকে তূর পর্বতে নিয়ে আসবেন। এদিক দিয়েও কওমের প্রতি প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধ করা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَنَّ : এটা শিশির বিন্দুর ন্যায় বস্তু। হালুয়া বা মিষ্টান্নের আকৃতির ছিল। তীহ প্রান্তরে পথহারা ইসরাইলীদের আহারের জন্য প্রতিদিন গাছের পাতার উপর আল্লাহ তা'আলা তা অবতীর্ণ করতেন। سَلْوٰى এটা এক প্রকারের পাখি বিশেষ। উর্দু ভাষায় এটাকে বটের বলা হয়। কামূস অভিধানে এর একবচন سَلْوٰةٌ লিখিত আছে। আখফাশ (র.) বলেন, এর কোনো একবচন শব্দ শোনা যায় না। هَوٰى শব্দটি مَاضِيْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বাবে ضَرَبَ এটা هَوًى মাসদার থেকে গঠিত। অর্থ- পড়ে যাওয়া।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّحْلِلْ : এর لام বর্ণে যের বা পেশ উভয়টি শুদ্ধ। ثُمَّ اهْتَدٰى-এর ব্যাখ্যা بِاِسْتِمْرَارِ عَلٰى مَا ذُكِرَهُ اِلٰى مَوْتِهِ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন. اِهْتَدٰى উল্লেখ করার রহস্য কি? কেননা اٰمَنَ-এর ব্যাপকতায় তো اِهْتَدٰى অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উত্তর : এখানে ঈমানের উপর সদা অটল থাকা উদ্দেশ্য। কেননা এর উপরই পূর্ণ নাজাত মওকুফ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ : এর مَا অব্যয়টি اِسْتِفْهَامِيَّةْ মুবতাদা, আর اَعْجَلَكَ হলো خَبَرْ ; বস্তুত এখানে জিজ্ঞাসাটি বুঝার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার এর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এটা বলা উদ্দেশ্য যে, তুমি তাড়াহুড়া করে নিজ গোত্রকে ছেড়ে এখানে চলে এলে। আমি তো তোমার গোত্রকে এক ফেৎনায় লিপ্ত করে দিয়েছি।

قَوْلُهُ هُمْ اُولَاءِ : এখানে هُمْ হলো مُبْتَدَأْ আর اُولَاءِ শব্দটি اَلَّذِيْ অর্থে عَلٰى اَثَرِيْ হলো তার صِلَةْ

قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلٰى رِضَاكَ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর আগে চলে যাওয়াটা অধিক সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল, মূল সন্তুষ্টির জন্য নয়। কেননা নবীগণের উপর আল্লাহ তা'আলা তো সন্তুষ্ট আছেনই। অবশ্য আধিক্য কাম্য হতে পারে।

قَوْلُهُ وَقَبْلَ جَوَابِ اَتٰى بِاعْتِذَارٍ الخ : এর সারমর্ম এই যে, مَا اَعْجَلَكَ -এর উত্তর হলো عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى হযরত মূসা (আ.) আসল উত্তরের পূর্বে هُمْ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىْ দ্বারা এর ওজর বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাদেরকে ছেড়ে আসেনি; বরং তারা নিকটেই আমার সঙ্গে রয়েছে। এটা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা (আ.) বুঝেছিলেন যে, বাস্তবিকই তারা তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। কিন্তু তারা পথে থেমে গিয়েছিল। ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর ধারণা বাস্তবের পরিপন্থি হলো। আর এটা তখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যখন আল্লাহ তা'আলা فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ বললেন। لِمَا-এর লামটি تَعْلِيْلِيَّة ; যেন এটা ধারণার বিপরীত হওয়ার عِلَّتْ

قَوْلُهُ السَّامِرِىُّ : লোকটি বনী ইসরাঈলের সামেরা গোত্রের ছিল। কেউ বলেন, সামেরা হলো ইহুদিদের একটি দল। যারা কোনো কোনো বিষয়ে অন্যান্য ইহুদিদের থেকে ভিন্ন মতবালম্বী ছিল। কেউ বলেন, কিরমানের এক গ্রাম্য কাফের ছিল। তার নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। লোকটি ছিল মুনাফিক। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা গাভীর পূজা করত। মূসা সামেরী এর লালন পালন করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। ফেরাউন কর্তৃক তাকে হত্যা করার আশঙ্কায় তার মা তাকে গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তাঁর আঙ্গুল চোষণ করাতেন। এক আঙ্গুল থেকে দুধ, আর এক আঙ্গুল থেকে মধু এবং তৃতীয় আরেকটি আঙ্গুল থেকে ঘি বের হতো। জনৈক কবির ভাষায়–

مُوْسَى الَّذِىْ رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ

অর্থাৎ ফেরাউন যে মূসাকে প্রতিপালন করল তিনি হলেন নবী, আর হযরত জিবরাঈল (রা.) যে মূসাকে প্রতিপালক করলেন সে হলো কাফের।

তাফসীরে কুরতুবী -এর প্রান্তটীকায় লিখিত আছে যে, সামেরী ছিল হিন্দুস্তানের অধিবাসী। সে গাভীর পূজা করতো। [বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন– লুগাতুল কুরআন তৃতীয় খণ্ড, রচনায় : মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী।]

مُوْسٰى শব্দটি مَعْرِفَة ও নামবাচক শব্দ। বনী ইসরাঈলের বিখ্যাত নবী ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল يُوْحَانِذْ পিতার নাম ছিল عِمْرَان ; বলা হয় যে, ইবরানি ভাষায় مُوْ অর্থ পানি। شٰى অর্থ হলো গাছ। আরবি ভাষায় شِيْن কে سِيْن দ্বারা কখনো কখনো পরিবর্তন করা হয়। হযরত মূসা (আ.) কে জন্মগ্রহণের পরে এটি কাঠের বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য তার নাম হয়েছে মূসা।

قَوْلُهُ اَنَّهُ يُعْطِيْكُمُ التَّوْرَاةَ : এ বাক্যটি يَعِدُكُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল, আর كُمْ হলো প্রথম মাফউল। وَعْدًا حَسَنًا হলো মাফউলে মুতলাক। اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ অর্থাৎ গো-বৎস পূজা এবং আমার বিরুদ্ধাচারণে তোমাদেরকে কে উৎসাহিত করল? নাকি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার বিচ্ছিন্নতায় তোমরা এরূপ করলে? অথচ এমনটি হয়নি। নাকি তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ তা'আলা গজব ও রোষানলকে দাওয়াত দেওয়া। আর এটাও অনুচিত। কেননা কোনো বিবেকবানের জন্য আল্লাহ তা'আলার গজবকে ডেকে আনা মুনাসিব হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَاَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِىْ : হযরত মূসা (আ.) নিজ কওমের নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে তুর পর্বতে আসবে। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى : যখন সত্য ও মিথ্যা, মুজেযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর নেতৃত্বে নবী ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার

আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.)-কে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল ফুতূনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারোটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে- فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলতো। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল। -[কুরতুবী]

মিশর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাঈলের কিছু অবস্থা, তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে ভূমধ্য সাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাঈল ইতিপূর্বে মিশরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিশরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিশর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, إِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল, এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে তার পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ -বাক্যের সারমর্ম তাই। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ : অর্থাৎ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

قَوْلُهُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى : এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন

সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশাযও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদেরকে আহারের জন্য দেওয়া হতো।

যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাঈল বলতে লাগল– তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো আল্লাহ বানিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জবাবে বললেন–

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তাওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশদিন ও ত্রিশরাত অবিরাম রোজা রাখতে হবে। এরপর দশদিন আরো বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে হযরত মূসা (আ.)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোজা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারা অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তাদের হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা বললেন, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسٰى অর্থাৎ হে মূসা! তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে?

ত্বরা করা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য : হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরিউক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য। –[ইবনে কাসীর]

রূহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, এই প্রশ্নের কারণ ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুঁশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গাম্বরগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 'ইনতিসাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, এতে হযরত মূসা (আ.)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত। যেমন হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাকো।

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে হযরত মূসা (আ.) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরজ করলেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি। কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক

সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলেল মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন, তখন সেও পথে রওয়ানা হয়। কারো কারো মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) বলেন, এই পারস্য বংশোদ্ভুত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনোরূপে মিশরে পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মের দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। -[কুরতুবী]

কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে, সে ছিল ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু। সে গো-পূজা করত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা সে প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করেছিল।

জনশ্রুতি এই, সামেরীর নাম ছিল হযরত মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউন সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীত জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তার এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর এক অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন-

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ * عُقُولُ مُرَبِّيَةٍ وَخَابَ الْمُؤَمِّلُ .

فَمُوسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنٌ .

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) লালন পালন করেছেন, সে তো কাফের হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফেরাউন লালন পালন করেছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا : হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

قَوْلُهُ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

قَوْلُهُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ : অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গজব ডেকে আনছ।

অনুবাদ :

٨٧. قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا مُثَلَّثُ الْمِيْمِ اَىْ بِقُدْرَتِنَا اَوْ بِاَمْرِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ بِفَتْحِ الْحَاءِ مُخَفَّفًا بِضَمِّهَا وَكَسْرِ الْمِيْمِ مُشَدَّدًا اَوْزَارًا اَثْقَالًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ اَىْ حُلِيِّ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِسْتَعَارَهَا مِنْهُمْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ بِعِلَّةِ عُرْسٍ فَبَقِيَتْ عِنْدَهُمْ فَقَذَفْنٰهَا طَرَحْنَاهَا فِى النَّارِ بِاَمْرِ السَّامِرِيِّ فَكَذٰلِكَ كَمَا اَلْقَيْنَا اَلْقَى السَّامِرِيُّ. مَا مَعَهُ مِنْ حُلِيِّهِمْ وَمِنَ التُّرَابِ الَّذِىْ اَخَذَهُ مِنْ اَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرَئِيْلَ عَلَى الْوَجْهِ الْاٰتِىْ.

৮৭. তারা বলল, আমরা আপনার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। بِمَلْكِنَا-এর مِيْم বর্ণে যবর, যের ও পেশ তিনো হরকত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা বলে বা আমাদের নির্দেশে তথা স্বেচ্ছায় তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল حُمِّلْنَا-এর দুটি কেরাত রয়েছে। ১. ح বর্ণে যবর ও مِيْم বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর। ২. ح বর্ণে পেশ ও مِيْم বর্ণে তাশদীদসহ যের। লোকদের অলঙ্কারের বোঝা অর্থাৎ ফেরাউন সম্প্রদায়ের অলঙ্কার সমূহ যা তাদের থেকে বনী ইসরাঈলীরা ধার নিয়েছিল উৎসবের কারণে ফলে তাদের নিকট তা থেকে যায়। আমরা তা নিক্ষেপ করি অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেই সামেরীর নির্দেশে। অনুরূপভাবে আমরা যেভাবে নিক্ষেপ করেছি সামেরীও নিক্ষেপ করে তার সাথে যেই অলঙ্কার ছিল তা এবং সেই মাটি যা সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন থেকে সংগ্রহ করেছে। যেমনটি সামনে বিবরণ আসছে।

٨٨. فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا صَاغَهُ لَهُمْ مِنَ الْحُلِيِّ جَسَدًا لَحْمًا وَدَمًا لَّهُ خُوَارٌ اَىْ صَوْتٌ يُسْمَعُ اَىْ اِنْقَلَبَ كَذٰلِكَ بِسَبَبِ التُّرَابِ الَّذِىْ اَثَرُهُ الْحَيَاةُ فِيْمَا يُوْضَعُ فِيْهِ وَوَضَعَهُ بَعْدَ صَوْغِهِ فِىْ فَمِهِ فَقَالُوْا اَىِ السَّامِرِيُّ وَاَتْبَاعُهُ هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ. مُوْسٰى رَبَّهُ هُنَا وَذَهَبَ يَطْلُبُهُ.

৮৮. অতঃপর সে তাদের জন্য গড়ল এক গো-বৎস অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা তৈরি করল এক অবয়ব রক্ত মাংসের যা হাম্বা রব করত অর্থাৎ এমন শব্দ করত যা শোনা যেত। অর্থাৎ এরূপে সে মাটির কারণে রূপান্তরিত হলো যে মাটিতে জীবনের প্রভাব ছিল। সে তা গো-বৎসের মুখাভ্যন্তরে স্থাপন করেছিল। তারা বলল অর্থাৎ সামেরী ও তার অনুসারীরা। এটা তোমাদের ইলাহ এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ইলাহ। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন হযরত মূসা (আ.), তাঁর প্রভুকে এখানে এবং তিনি তাকে খোঁজতে গেছেন।

٨٩. قَالَ تَعَالٰى اَفَلَا يَرَوْنَ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْعِجْلُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا لا اَىْ لَا يَرُدُّ لَهُمْ جَوَابًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا اَىْ دَفْعَهُ وَّلَا نَفْعًا. اَىْ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ اِلٰهًا.

৮৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে এখানে اَنْ অব্যয়টি ثَقِيْلَة থেকে خَفِيْفَة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তার اِسْم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَنَّهُ সাড়া দেয় না গো-বৎস তাদের কথায় অর্থাৎ তাদের কথায় কোনো প্রতিউত্তর করে না। এবং ক্ষমতা রাখে না তাদের কোনো ক্ষতি করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ অতএব তাকে কিভাবে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى وَجْهِ الْاٰتِىْ : এ বাক্যের সম্পর্ক وَمِنَ التُّرَابِ -এর সাথে। অর্থাৎ اَلْقَى التُّرَابَ عَلٰى وَجْهِ الْاٰتِىْ আর وَاَلْقٰى فِيْهَا اَنْ اَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ وَجْهِ الْاٰتِىْ হলো এই

فَاَخْرَجَ -এর আতফ হলো وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ -এর উপর। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী।

قَوْلُهُ جَسَدًا : এটা اَلْعِجْلَ -এর حَالٌ অর্থাৎ اَخْرَجَ لَهُمْ صُوْرَةَ عِجْلٍ حَالَ كَوْنِهَا جَسَدًا

قَوْلُهُ لَحْمًا وَدَمًا : এটা বৃদ্ধি করে বলতে চেয়েছেন যে, রক্ত মাংসে গঠিত দেহকে جَسَدٌ বলা হয়। خُوَارٌ গরুর হাম্বা রবকে বলা হয়। অর্থাৎ সত্তা বা প্রকৃতির এ পরিবর্তন উক্ত মাটি ভিতরে প্রবিষ্ট করার কারণে ঘটেছিল।

قَوْلُهُ بِسَبَبِ التُّرَابِ اَىْ بِسَبَبِ وَضْعِ التُّرَابِ : এখানে مُضَافٌ লুপ্ত রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) وَضْعَهُ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছে যে, سَبَبٌ -এর পূর্বে وَضْع مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فَنَسِىَ : এর ফায়েল হযরত মূসা (আ.)-ও হতে পারে। যেমন– ব্যাখ্যাকার (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব এটা সামেরীর উক্তি হবে। এ সময় উদ্দেশ্য এই হবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে এখানে ভুলে গিয়েছিলেন। তাকে খোঁজ করার জন্য তূর পর্বতে গিয়েছিলেন। আবার نَسِىَ -এর ফায়েল সামিরীও হতে পারে। এ সময় এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, সামেরী তার প্রতিপালককে ভুলে গেল। যার দরুন সে এ ধরনের কীর্তি করল। আবার এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, সামেরী এ বিষয়ের উপর দলিল পেশ করতে ভুলে গেল যে, গো-বৎস কোনোদিন উপাস্য হতে পারে না। এর দলিল হলো সামনের উক্তি।

قَوْلُهُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا : এখানে اَلَّا মূলত اَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ছিল اَنَّ -কে تَخْفِيْف করে اَنْ করা হয়েছে এবং ه যমীরকে বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর নূনকে লামের মধ্যে ইদগাম করায় اَلَّا হয়েছে। কেউ কেউ يَرْجِعُ -কে نَصْب দিয়ে পড়েছেন। তবে এটি দুর্বল। কেননা اَفْعَال يَقِيْن -এর পরে اَنْ نَاصِبَة হতে পারে না। আর رُؤْيَته দ্বারা প্রথম ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চোখ দ্বারা দৃষ্টি উদ্দেশ্য। دَفْعَهُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ جَلْبَهُ : এর দ্বারাও مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا : এর আতফ হলো لَا يَرْجِعُ -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : مُلْكٌ শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি; বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ : اَوْزَارٌ শব্দটি وِزْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বোঝা। মানুষের পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وِزْر এবং পাপরাশিকে اَوْزَارٌ বলা হয়। زِيْنَتٌ শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে اَوْزَارٌ তথা পাপের বোঝা বলার কারণে এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেওয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা

হয়েছে। 'হাদীসুল ফুতুন' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে এগুলো যে পাপ সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিল, এসব অলংকার, অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিও হয়নি, ফিকহবিদদের পরিভাষায় যাদেরকে কাফেরে হরবী বলা হয়। তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হযরত হারূন (আ.) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জবাব বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল। কিন্তু তা গনিমতের মালের [যুদ্ধলব্ধ মালের] মতোই বিধান রাখে। ইসলাম পূর্বকালে গনিমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েজ ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহৃত করা ও ভোগ করা জায়েজ নয়; বরং গনিমতের মাল একত্র করে কোনো টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন [বজ্র ইত্যাদি] এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনিমতের মালকে আসমানি আগুন গ্রাস করতো না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে কারীম ﷺ -এর শরিয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলো গনিমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে اوزار [পাপরাশি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরি জ্ঞাতব্য : কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানিপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফের হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনিমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। এ কারণেই সুরখসী গ্রন্থে مُغَالَبَةٌ بِالْمُحَارَبَةِ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফের হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনিমতের মাল নয়; বরং একে مَال فَيْئ অর্থাৎ অনায়াসালব্ধ মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফেরদের সম্মতি ও অনুমতি শর্ত। যেমন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র কাফেরদের উপর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোনো জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালালরূপে গণ্য।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোনো জিহাদ ও যুদ্ধ হয়নি। আর এগুলো অনায়াসলব্ধ মালও নয়। কারণ এগুলো তাদের কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফেরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করতো এবং তাঁকে 'আল-আমীন' [বিশ্বস্ত] বলে সম্বোধন করতো। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সমগ্র তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মালকে গনিমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেননি। এরূপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশ্নই উঠত না। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَقَذَفْنَاهَا : অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ.)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

قَوْلُهُ فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ : হাদীসে ফুতূনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূন (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আমিও নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতেও হয়তো কোনো অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব, নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হযরত হারূন (আ.)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হোক, অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের পর এবং হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাঈলকে অলংকারাদির গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরিউক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। [এসব রেওয়ায়েত তাফসীরে কুরতুবী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোনো প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ : অর্থাৎ সামেরী অলংকার দ্বারা একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جَسَدٌ [অবয়ব] শব্দ দৃষ্টে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল। তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

قَوْلُهُ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰـهُكُمْ وَاِلٰـهُ مُوْسٰى فَنَسِيَ : অর্থাৎ আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল, এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের অসার উজর বর্ণিত হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওজর পেশ করেছিল। এরপর اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মতো আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহ তা'আলার কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোনো জবাব দিতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি?

অনুবাদ :

٩٠. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلِ اَنْ يَّرْجِعَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ج وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ فِىْ عِبَادَتِهٖ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ـ فِيْهَا ـ

৯০. হযরত হারুন (আ.) তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার আগেই হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর তাঁর ইবাদতে এবং আমার আদেশ মেনে চলো এক্ষেত্রে।

٩١. قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ نَزَالُ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ عَلٰى عِبَادَتِهٖ مُقِيْمِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ـ

৯১. তারা বলেছিল, আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হবো না। এর উপাসনায় সর্বদা অনড় থাকব। আমাদের নিকট হযরত মূসা (আ.) ফিরে না আসা পর্যন্ত

٩٢. قَالَ مُوْسٰى بَعْدَ رُجُوْعِهٖ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ـ بِعِبَادَتِهٖ ـ

৯২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, ফিরে আসার পর হে হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এর উপাসনার কারণে তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল?

٩٣. اَلَّا تَتَّبِعَنِ ط لَا زَائِدَةٌ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ـ بِاِقَامَتِكَ بَيْنَ مَنْ يَّعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ ـ

৯৩. আমার পদাংক অনুসরণ করা হতে এখানে لا টি অতিরিক্ত তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? যারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে তাদের মাঝে তোমার অবস্থান দ্বারা।

٩٤. قَالَ يَبْنَؤُمَّ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَرَادَ اُمِّىْ وَذِكْرُهَا اَعْطَفُ لِقَلْبِهٖ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَكَانَ اَخَذَهَا بِشِمَالِهٖ وَلَا بِرَأْسِىْ ج وَكَانَ اَخَذَ شَعْرَهُ بِيَمِيْنِهٖ غَضَبًا اِنِّىْ خَشِيْتُ لَوْ اتَّبَعْتُكَ وَلَا بُدَّ اَنْ يَّتَّبِعَنِىْ جَمْعٌ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ وَتَغْضَبَ عَلَىَّ وَلَمْ تَرْقُبْ تَنْتَظِرْ قَوْلِىْ ـ فِيْمَا رَاَيْتَهُ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৯৪. তিনি বললেন হযরত হারুন (আ.) হে আমার সহোদর! اُمَّ শব্দের مِيْم বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো اُمِّىْ বা আমার মা। হযরত মূসা (আ.)-এর মনে অধিক দয়া সঞ্চারিত করার জন্য এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরো না হযরত মূসা (আ.) ক্রোধবশত বাম হাতে তার দাড়ি এবং ডান হাতে তার চুল ধরেছিলেন আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, যদি আমি তোমার পানে চলে আসতাম তবে অবশ্যই আমার সাথে সে দলটিও চলে আসত যারা গো-বৎস পূজা করেনি। তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ফলে তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত হতে। আর তুমি যত্নবান হওনি অপেক্ষা করনি আমার বাক্য পালনে তাদের বিষয়ে যা দেখেছ সে ব্যাপারে।

٩٥. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ شَأْنُكَ الدَّاعِىْ اِلٰى مَا صَنَعْتَ يٰسَامِرِىُّ ـ

৯৫. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমার ব্যাপার কি? তুমি যা করেছ সে ব্যাপারে কি কারণ কাজ করেছে। হে সামেরী!

অনুবাদ :

٩٦. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوْهُ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ اَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُوْلِ جِبْرَئِيْلَ فَنَبَذْتُهَا اَلْقَيْتُهَا فِىْ صُوْرَةِ الْعِجْلِ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لِىْ نَفْسِىْ ـ وَاُلْقِىَ فِيْهَا اَنْ اٰخُذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ مَا ذُكِرَ وَاُلْقِيَهَا عَلٰى مَا لَا رُوْحَ لَهٗ يَصِيْرُ لَهٗ رُوْحٌ وَرَاَيْتُ قَوْمَكَ طَلَبُوْا مِنْكَ اَنْ تَعْجَلَ لَهُمْ اِلٰهًا فَحَدَّثَتْنِىْ نَفْسِىْ اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ الْعِجْلُ اِلٰهَهُمْ ـ

৯৬. সে বলল আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি এখানে يَبْصُرُوْا টি ى এবং تَاءْ উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি যা জেনেছি তারা তা জানতে পারেনি। আমি নিয়েছিলাম একমুষ্ঠি মাটি পদচিহ্ন হতে ঘোড়ার খুরের সেই দূতের হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর। আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম আমি তা নির্মিত গো-বৎসের আকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম। আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল আর হৃদয়ে একথা জাগ্রত হয়েছে যে, আমি তীর পদচিহ্ন হতে একমুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে নেই যেমনটি উল্লেখ করা হলো এবং তা নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে দিব। ফলে তাতে প্রাণের সঞ্চার হবে। আর আমি দেখেছি যে, আপনার সম্প্রদায় আপনার নিকট একজন ইলাহ বানিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। তাই আমি মনে মনে ভাবলাম যে, উক্ত উপাস্যটি তাদের ইলাহ হোক।

٩٧. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى فَاذْهَبْ مِنْ بَيْنِنَا فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَىْ مُدَّةِ حَيَاتِكَ اَنْ تَقُوْلَ لِمَنْ رَاَيْتَهٗ لَا مِسَاسَ ص اَىْ لَا تَقْرَبْنِىْ فَكَانَ يَهِيْمُ فِى الْبَرِّيَّةِ وَاِذَا مَسَّ اَحَدًا اَوْ مَسَّهٗ اَحَدٌ حُمَّا جَمِيْعًا وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ لَّنْ تُخْلَفَهٗ ج بِكَسْرِ اللَّامِ اَىْ لَنْ تَغِيْبَ عَنْهُ وَبِفَتْحِهَا اَىْ بَلْ تُبْعَثُ اِلَيْهِ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ اَصْلُهٗ ظَلِلْتَ بِلَامَيْنِ اُوْلٰهُمَا مَكْسُوْرَةٌ وَحُذِفَتْ تَخْفِيْفًا اَىْ دُمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ط اَىْ مُقِيْمًا تَعْبُدُهٗ لَنُحَرِّقَنَّهٗ بِالنَّارِ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا لَنُذْرِيَنَّهٗ فِىْ هَوَاءِ الْبَحْرِ وَفَعَلَ مُوْسٰى بَعْدَ ذَبْحِهٖ مَا ذَكَرَهٗ ـ

৯৭. হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, দূর হও আমাদের থেকে তোমার জন্য রইল তোমার জীবদ্দশায় অর্থাৎ তোমার সারা জীবন যে, তুমি বলবে যাকে তুমি দেখবে তাকেই আমি অস্পৃশ্য অর্থাৎ তুমি আমার নিকটবর্তী হয়ো না। সে মাঠে ময়দানে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত। যখন সে কাউকে স্পর্শ করতো অথবা কেউ তাকে স্পর্শ করতো তখন তারা উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল তোমার শাস্তির জন্য তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। تُخْلَفَهٗ শব্দের لَامْ বর্ণটি যেরযুক্ত হবে। অর্থাৎ তুমি তার থেকে অদৃশ্য থাকবে না। আর لَامْ বর্ণটি যবরযুক্ত হলে অর্থ হবে তোমাকে সেই শাস্তি পর্যন্ত অবশ্যই পৌছানো হবে। তুমি তোমার সেই ইলাহ এর প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে ظَلْتَ মূলত ظَلِلْتَ ছিল। প্রথম لَامْ টি যেরযুক্ত হওয়ায় সহজ করার জন্য তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা তার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিবই আগুন দ্বারা এরপর তাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সাগরের বাতাসে ছড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) তাকে জবাই করার পর এরূপই করেছিলেন।

৯৮. إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا - تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَىْءٍ -

৯৯. كَذٰلِكَ اَىْ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ اَخْبَارِ مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْاُمَمِ ج وَقَدْ اٰتَيْنَاكَ اَعْطَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرًا - قُرْاٰنًا -

১০০. مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهٖ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا - حِمْلًا ثَقِيْلًا مِنَ الْاِثْمِ -

১০১. خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ط اَىْ فِىْ عَذَابِ الْوِزْرِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا لا تَمْيِيْزٌ مُفَسِّرٌ لِلضَّمِيْرِ فِىْ سَاءَ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوْفٌ تَقْدِيْرُهٗ وِزْرُهُمْ وَاللَّامُ لِلْبَيَانِ وَيُبْدَلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

১০২. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ الْكٰفِرِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا لا عُيُوْنُهُمْ مَعَ سَوَادِ وُجُوْهِهِمْ -

১০৩. يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ يَتَسَارُّوْنَ اِنْ مَا لَبِثْتُمْ فِى الدُّنْيَا اِلَّا عَشْرًا - مِنَ اللَّيَالِىْ بِاَيَّامِهَا -

অনুবাদ :

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ তা'আলাই যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত। عِلْمًا শব্দটি فَاعِلٌ হতে পরিবর্তিত حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَىْءٍ তথা তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

৯৯. এভাবেই যেমনিভাবে আমি আপনার নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি আপনার নিকট বিবৃত করি পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাসমূহ। আর আমি আমার নিকট হতে আপনাকে প্রদান করেছি উপদেশ কুরআন।

১০০. এটা থেকে যে বিমুখ হবে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে পাপের ভারি বোঝা।

১০১. তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ পাপের শাস্তিতে কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য হবে কত মন্দ حِمْلًا শব্দটি تَمْيِيْز যা سَاءَ-এর যমীরের ব্যাখ্যা করছে। আর مَخْصُوْص بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। এর মূল ইবারত হলো وِزْرُهُمْ আর لَامْ টা হলো بَيَانْ-এর জন্য। আর يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এটা يَوْمَ الْقِيٰمَةِ হতে বদল হয়েছে।

১০২. যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকাব দেওয়া হবে صُوْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সিঙ্গা। আর ফুৎকার বলতে দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব কাফেরদেরকে সেদিন দৃষ্টিহীন অবস্থায় অর্থাৎ তাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করার সাথে সাথে তাদের চোখগুলোও নীল বর্ণের হয়ে যাবে।

১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। পৃথিবীতে, দশ দিবারাত্রি।

১০৪. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ لَيْسَ كَمَا قَالُوْا اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ اَعْدَلُهُمْ طَرِيْقَةً فِيْهِ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا . يَسْتَقِلُّوْنَ لُبْثَهُمْ فِى الدُّنْيَا جِدًّا لِمَا يُعَايِنُوْنَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا .

অনুবাদ :

১০৪. আমি ভালো জানি তারা কি বলবে? তাতে ঐ ব্যাপারে! অর্থাৎ এমনটি নয় যেমনটি তারা বলেছে। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করে ছিলে। অর্থাৎ তারা আখিরাতের ভয়ানক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পার্থিব জীবনের অবস্থাকে একেবারেই নগণ্য মনে করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْنُ : এখানে وَلَقَدْ-এর لَامْ অব্যয়টি قَسْمِيَّةٌ অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَصَحَ هٰرُوْنُ وَنَبَّهَ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْاَمْرِ مِنْ قَبْلِ رُجُوْعِ مُوْسٰى اِلَيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শপথ! অবশ্যই হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তাদের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উক্তি বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছিলেন।

قَوْلُهُ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ : অর্থাৎ তোমাদেরকে গো-বৎসের কারণে ফেতনায় লিপ্ত করা হয়েছে। اِنَّمَا হলো حَصَرْ তথা সীমিতকরণ অব্যয়। উদ্দেশ্য এই যে, গো-বৎসটি তোমাদের ফেতনার কারণ হয়েছে, হেদায়েতের কারণ নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা গো-বৎসের কারণেই ফেতনায় লিপ্ত হয়েছ, অন্য কোনো কারণে নয়। رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ এখানে বিশেষভাবে رَحْمٰنْ শব্দ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য আনা হয়েছে যাতে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, যদি খাঁটিভাবে তওবা করে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি তাওবা কবুল করেন। কারণ তিনি অতি দয়াময়।

قَوْلُهُ اَلَّا تَتَّبِعَنِىْ : এখানে لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। যেমন- اَلَّا تَسْجُدَ-এর মধ্যে لَا টি অতিরিক্ত, কেবল তাকিদ বা গুরুত্বের জন্য এসেছে। اَلَّا تَتَّبِعَنِىْ টি مَنَعَ-এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَنْصُوْبٌ-এর স্থলে পতিত হয়েছে। আর مَنَعَكَ-এর كَافْ টি প্রথম মাফউল। اِذَا رَاَيْتَهُمْ হলো مَنَعَ-এর ظَرْف অর্থাৎ اَىُّ شَيْءٍ مَنَعَكَ حِيْنَ رُؤْيَتِكَ لِضَلَالِهِمْ مِنْ اِتِّبَاعِىْ অর্থাৎ তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে যখন তুমি অবগত হলে, তখন কিসে তোমাদেরকে বিরত রাখল আমার অনুসরণ থেকে?

قَوْلُهُ اَفَ عَصَيْتَ : এর মধ্যকার হামযাটি অস্বীকার ও হুমকিস্বরূপ জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর فَاءْ বর্ণটি উহ্য শব্দের উপর আতফ করার জন্য যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَانَ اَخَذَ شَعْرَهُ : এখানে ، দ্বারা رَأْس তথা মাথার চুল উদ্দেশ্য। وَلَمْ تَرْقُبْ-এর আতফ হলো تَقُوْلَ-এর উপর। অর্থাৎ এ ভয়ে যে, তুমি বলবে আমি গোত্রের মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছি এবং এ ভয়ে যে, তুমি বলবে তুমি আমার কথার আদৌ লক্ষ্য রাখনি।

قَوْلُهُ بِالْيَاءِ : অর্থাৎ لَمْ يَبْصُرُوْا-এর দ্বারা বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য। وَبِالتَّاءِ অর্থাৎ তুমি ও তোমার সম্প্রদায়।

قَوْلُهُ اَلْمُصَاغُ : বিশুদ্ধ হলো اَلْمَصُوْغُ যেমনটা কোনো কোনো কপিতে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَبَضْتُ قَبْضًا : এর অর্থ হলো মুষ্টি পূর্ণ করা এবং কোনো কোনো কপিতে نَقَبَصْتُ قَبْصًا অর্থাৎ صَاد বর্ণযোগে এসেছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ اَىْ مِنْ مَحَلِّ اَثَرِ حَافِرِ الرَّسُوْلِ : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পদচিহ্নের স্থান থেকে।

قَوْلُهُ وَالْقٰى فِيْهَا : এর আতফ হলো سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ আমাকে একথা বুঝিয়েছে এবং আমার অন্তরে এ বিষয়টি উদ্ভব করা হয়েছে যে, এ মাটি থেকে এক মুষ্ঠি তার মধ্যে নিক্ষেপ করি। এতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

قَوْلُهُ لَا مِسَاس : এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, মানসূব। অর্থাৎ কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না এবং তুমিও কাউকে স্পর্শ করবে না।

قَوْلُهُ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا : এখানে مَوْعِدًا মাসদার وَعْدًا অর্থে।

قَوْلُهُ نَنْسِفَنَّهُ : এটা جَمْعُ مُتَكَلِّمْ مُضَارِعْ بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَةْ -এর সীগাহ। অর্থ– আমি তাকে অবশ্যই বাতাসে উড়িয়ে দেব।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الخ : এটা جُمْلَةْ مُسْتَأْنِفَةْ হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সমাপ্তি।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الخ : এটা جُمْلَةْ مُسْتَأْنِفَةْ রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা এবং মু'জিজা এর আধিক্যের জন্য বলা হয়েছে।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ : এটা লুপ্ত মাসদারের সিফাত। অর্থাৎ نَقُصُّ قَصَصًا كَذٰلِكَ

قَوْلُهُ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ : এর ব্যাখ্যা فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِعْرَاضْ তথা বিমুখ হওয়ার দ্বারা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ فِيْهِ اَىْ فِىْ عَذَابِ الْوِزْرِ : এখানে مُضَافْ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ : এটা يَحْمِلُ -এর যমীর থেকে حَالْ যা مَن -এর দিকে ফিরেছে। يَحْمِلُ -এর মধ্যে শব্দ এবং خَالِدِيْنَ -এর মধ্যে مِنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ زُرْقًا : এটা اَلْمُجْرِمِيْنَ থেকে حَالْ - اَزْرَقْ -এর বহুবচন, صِفَتْ مُشَبَّهْ -এর সীগাহ। অর্থ– বিড়াল চোখা। অর্থাৎ নীল চক্ষুবিশিষ্ট। يَتَخَافَتُوْنَ এটা زُرْقًا -এর যমীর থেকে حَالْ

قَوْلُهُ اَعْدَلُهُمْ : اَعْدَلُ অর্থ– সর্বাধিক সঠিক মন্তব্যের অধিকারী। এটা অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে বলা হয়নি; বরং اَقْرَبُ اِلَى الْهَوْلِ তথা ভয়াবহতার প্রতি অধিক নিকটবর্তী। এদিক দিয়ে اَعْدَلْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার উক্তির মধ্যে সে দিনের ভয়াবহতার অধিক প্রকাশ ঘটেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। **একদল** হযরত হারূন (আ.)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার ছিল বলে বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে **নিষেধ করলে** আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-ও ফিরে এসে **গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে** গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে

হযরত হারূন (আ.) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হযরত হারূন (আ.)-কে সম্বোধন করে তার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্মশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গুমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

قَوْلُهُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْآ اَلَّا تَتَّبِعَنِ : এখানে অনুসরণের এক অর্থ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে তুর পর্বতে চলে যাওয়া। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হযরত হারূন (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তো তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান হযরত মূসা (আ.)-এর মতে ভ্রান্তি ও অন্যায় ছিল। হযরত হারূন (আ.) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে হযরত মূসা (আ.)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওজর শুনে নাও। অতঃপর হযরত হারূন (আ.) এরূপে ওজর বর্ণনা করলেন, আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اُخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। [কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে।] কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত হারূন (আ.)-এর ওজরের মধ্যে একথাও রয়েছে- اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মোকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওজরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত। অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওজর শুনে হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গাতা সামেরীর খবর নিলেন। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়গাম্বরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক : এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত হারূন (আ.) ও তার সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হযরত হারূন (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা

পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তাওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতাকে এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকেও উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী মনে করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তা-ভাবনার পাত্র। কোনো এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গুনাহগার অথবা নাফরমান বলা যায় না। হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক হযরত হারূন (আ.)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে প্রকাশ্যে ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওজর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

قَوْلُهُ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ : অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি। এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযায় ভূমধ্য সাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ.)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শুনানোর জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। –[বয়ানুল কুরআন]

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ : রাসূল বলে এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে– اُلْقِيَ فِيْ رُوْعِهٖ اَنَّهٗ لَا يُلْقِيْهَا عَلٰى شَيْءٍ فَيَقُوْلُ كُنْ كَذَا اِلَّا كَانَ অর্থাৎ সামেরীর মনে আপনা আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। –[কামালাইন]

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ তাফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত বলা হয়েছে। অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। فَجَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ –[বয়ানুল কুরআন]

এরপর বনী ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি 'হাম্বা' রব করতে লাগল। হাদীসে ফুতূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলেছিল, আমি মুঠির ভিতরের বস্তু নিক্ষেপ করব। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হযরত হারূন (আ.) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিশরে পৌঁছে সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ : হযরত মূসা (আ.) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারো গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তার মাঝে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়ের জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। -[মা'আলিম]

এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত, لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক : রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ : [অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।] এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা স্বর্ণ রৌপ্য গলিত ধাতু দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণরৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া। -[দুররে মানসূর] অলৌকিকককভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ قَدْ اٰتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا : বিশিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذِكْرٌ বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপবোঝা বহন করবে। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা কুরআন তেলাওয়াত না করা, কুরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কুরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কুরআনের বিধানাবলির বুঝার চেষ্টা না করাও কুরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বুঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলির বিরুদ্ধাচারণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কুরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গুনাহ। কিয়ামতের দিন এই গুনাহ ভারি বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গুনাহকে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

قَوْلُهُ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করল, صُوْرٌ [ছুর] কি? তিনি বললেন, শিং। এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صُوْرٌ শিং এর মতোই কোনো বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

অনুবাদ :

١٠٥. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَيْفَ تَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقُلْ لَهُمْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ـ بِاَنْ يُّفَتِّتَهَا كَالرَّمْلِ السَّائِلِ ثُمَّ يُطِيْرُهَا بِالرِّيَاحِ ـ

১০৫. তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কিয়ামতের দিন সেগুলোর অবস্থা কি হবে? আপনি বলে দিন তাদেরকে আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র করে তাকে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন।

١٠٦. فَيَذَرُهَا قَاعًا مُنْبَسِطًا صَفْصَفًا ـ مُسْتَوِيًا ـ

১০৬. অতঃপর তিনি একে পরিণত করবেবন মসৃণ সমতল ময়দানে।

١٠٧. لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا اِنْخِفَاضًا وَّلَا اَمْتًا ـ اِرْتِفَاعًا ـ

১০৭. যাতে আপনি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেন না। নিচুতা ও উচ্চতা।

١٠٨. يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ اِذَا نُسِفَتِ الْجِبَالُ يَّتَّبِعُوْنَ اَىِ النَّاسُ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُبُوْرِ الدَّاعِىَ اِلَى الْمَحْشَرِ بِصَوْتِهٖ وَهُوَ اِسْرَافِيْلُ يَقُوْلُ هَلُمُّوْآ اِلٰى عَرْضِ الرَّحْمٰنِ لَا عِوَجَ لَهٗ ج اَىْ لِاِتِّبَاعِهِمْ اَىْ لَا يَقْدِرُوْنَ اَنْ لَّا يَتَّبِعُوْا وَخَشَعَتِ سَكَنَتْ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ـ صَوْتَ وَطْءِ الْاَقْدَامِ فِىْ نَقْلِهَا اِلَى الْمَحْشَرِ كَصَوْتِ اَخْفَافِ الْاِبِلِ فِىْ مَشْيَتِهَا ـ

১০৮. সেদিন অর্থাৎ যেদিন পর্বতসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে উড়বে তারা অনুসরণ করবে অর্থাৎ মানুষেরা কবর থেকে বের হওয়ার পর আহ্বানকারীর তার আহ্বানের শব্দের কারণে হাশরের ময়দানের প্রতি। আর তিনি হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি বলবেন, হে লোক সকল! তোমরা দয়াময়ের সম্মুখে উপস্থিত হও! এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না অর্থাৎ তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারা অনুসরণ না করার কোনোই ক্ষমতা রাখবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত আপনি কিছুই শুনবেন না। অর্থাৎ পায়ের চলার শব্দ, হাশরের ময়দানে যাওয়ার সময়। হাঁটার সময় উটের ক্ষুরের শব্দের মতো।

١٠٩. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ اَنْ يَّشْفَعَ لَهٗ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا ـ بِاَنْ يَّقُوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

১০৯. সেদিন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না। তবে যাকে দয়াময় অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত তার জন্য সুপারিশ করার ও যার কথা তিনি পছন্দ করতেন। তা এভাবে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে।

অনুবাদ :

١١٠. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا . لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। পরকালীন বিষয়াদি সম্পর্কে এবং পার্থিব কার্যাবলি সম্পর্কে। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। তা তারা জানে না।

١١١. وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ خَضَعَتْ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ط اَىِ اللّٰهِ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا . شِرْكًا .

১১১. এবং মুখমণ্ডলসমূহ অবনমিত হবে অধোবদন চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারকের নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সমীপে এবং ব্যর্থ সেই হবে ক্ষতিগ্রস্ত যে জুলুমের ভারবহন করবে শিরকের।

١١٢. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ الطَّاعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيَادَةٍ فِىْ سَيِّاٰتِهٖ وَلَا هَضْمًا . بِنَقْصٍ مِنْ حَسَنَاتِهٖ .

১১২. এবং যে সৎকর্ম করে আনুগত্য করবে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। মু'মিন হয়ে তার কোনো আশঙ্কা নেই অবিচারের তার পাপ বৃদ্ধির দ্বারা এবং অন্য কোনো ক্ষতির পুণ্য স্বল্প লাভের।

١١٣. وَكَذٰلِكَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى كَذٰلِكَ نَقُصُّ اَىْ مِثْلَ اِنْزَالِ مَا ذُكِرَ اَنْزَلْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا كَرَّرْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الشِّرْكَ اَوْ يُحْدِثُ الْقُرْاٰنُ لَهُمْ ذِكْرًا . بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْاُمَمِ فَيَعْتَبِرُوْنَ .

১১৩. এরূপেই এ বাক্যের আতফ পূর্বের كَذٰلِكَ نَقُصُّ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়াদি অবতীর্ণ করার ন্যায় আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিবৃত করেছি বারবার উল্লেখ করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে শিরক থেকে বিরত থাকে। অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ পূর্বের বিভিন্ন জাতির বিনাশের বিবরণ। যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

١١٤. فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج عَمَّا يَقُوْلُ الْمُشْرِكُوْنَ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ اَىْ بِقِرَاءَتِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ز اَىْ يَفْرُغَ جِبْرِيْلُ مِنْ اِبْلَاغِهٖ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا . اَىْ بِالْقُرْاٰنِ فَكُلَّمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ زَادَ بِهٖ عِلْمًا .

১১৪. আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি মুশরিকরা যা বলে তা থেকে পবিত্র। আপনি কুরআন পাঠে ত্বরা করবেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী পৌঁছানো থেকে অবসর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান সমৃদ্ধ কর। অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে সুতরাং যখনই তার উপর কুরআন থেকে কোনো কিছু অবতীর্ণ হতো এর দ্বারা তার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটত।

অনুবাদ :

١١٥. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَصَّيْنَاهُ أَنْ لَّا يَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ أَكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِيَ تَرَكَ عَهْدَنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ـ جَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ ـ

১১৫. আমি তো আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম সে যেন বৃক্ষ হতে না খায়। ইতিপূর্বে অর্থাৎ তা থেকে খাওয়ার পূর্বে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমার নির্দেশকে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে সুদৃঢ় পাইনি। অনড় ও আমার নিষিদ্ধ বিষয়ে সংবরণকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَفْسًا : এটা মাসদার (ض) অর্থ– ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেওয়া। صَفْصَفًا ধূ ধূ প্রান্তর, সমতল ভূমি। أَمْتًا টিলা, উঁচুনিচু জায়গা।

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ : অর্থাৎ পাহাড় পর্বতের অবস্থা। এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) كَيْفَ تَكُوْنُ দ্বারা مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন নয়; বরং তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি ঠাট্টাবিদ্রূপ স্বরূপ নবী করীম ﷺ -এর নিকট কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যেমন ইবনে মুনযির ও ইবনে জুরাইজ (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো কুরাইশী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামতের দিবসে এ সকল পাহাড় পর্বতের কি অবস্থা হবে? তখন তার উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَقُلْ -এর মধ্যে ف উহ্য শর্তের জবাবে এসেছে। اَىْ اِنْ سَأَلُوْكَ فَقُلْ এ ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর হবে না।

فَيَذَرُهَا -এর যমীরের মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. এটা جِبَالٌ -এর প্রতি ফিরেছে, এ সময় مُضَافٌ বিলুপ্ত হবে অর্থাৎ وَيَذَرُ مَرَاكِزَ الْجِبَالِ ২. এটা اَرْض -এর প্রতি ফিরেছে, যা স্পষ্টাকারে পূর্বে উল্লেখ নেই। তবে বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা তাকে উহ্য বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ بِقَاعًا এটা يَذَرُهَا -এর দ্বিতীয় মাফঊল হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর يَذَرُ تَصْيِيْرُ -এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে দুই মাফঊলের প্রতি মুতাআদ্দী হবে। هَا যমীরটি প্রথম মাফঊল। আর قَاعًا শব্দটি হাল হওয়ার কারণেও মানসূব হতে পারে। এ সময় صَفْصَفًا শব্দটি قَاعًا -এর প্রথম সিফত হবে। এবং لَا تَرَىٰ فِيْهَا عِوَجًا দ্বিতীয় সিফত হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে মানসূব হবে।

قَوْلُهُ اَلدَّاهِيْ : কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এর দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.) উদ্দেশ্য। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আহ্বানকারী হবেন হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং এটাই প্রাধান্যযোগ্য। তবে সিঙ্গায় ফুৎকারকারী হবেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। لَا عِوَجَا لَهُ এখানে لَهُ -এর যমীরের মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. এখানে اِتِّبَاعٌ মাসদার উহ্য রয়েছে। يَتَّبِعُوْنَ -এর দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ২. এটা دَاعِيَ -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থাৎ আহ্বানকারীর আহ্বানে কোনো ত্রুটি থাকবে না; বরং সকল মাখলুক অতি সহজে তা শ্রবণ করবে। ৩. বাক্যে قَلْبٌ তথা স্থানান্তর ঘটেছে। আসলে বাক্যটি ছিল এরূপ– لَا عِوَجَ لَهُمْ عَنْهُ

قَوْلُهُ هَمْسًا : এর অর্থ হলো ক্ষীণস্বর, মৃদু আওয়াজ।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ : এ বাক্যাংশে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. مَنْ হলো مَنْصُوْبٌ ; কারণ এটা تَنْفَعُ -এর مَفْعُوْل لَهٗ

২. এটা رَفْع -এর স্থানে পতিত হয়েছে। এটা شَفَاعَةٌ থেকে বদল হয়েছে। এ সময় অবশ্যকীয়ভাবে مُضَافٌ বিলুপ্ত গণ্য হবে। বাক্যটি এরূপ হবে لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا شَفَاعَةَ مَنْ اَذِنَ لَهٗ

৩. এটা شَفَاعَةٌ থেকে ইসতেসনা হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর তখন মুসতাসনা মুত্তাসিল ও মুনকাতি যে কোনোটি হতে পারে।

قَوْلُهُ لَا يَعْلَمُوْنَ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, عِلْمًا শব্দটি মাফউলে মুতলাক এবং يُحِيْطُوْنَ শব্দটি يَعْلَمُوْنَ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ لَا يَعْلَمُوْنَ عِلْمًا আর যদি يُحِيْطُوْنَ ক্রিয়াটি নিজ অর্থে হয় তাহলে عِلْمًا বাক্যের সম্বন্ধ থেকে تَمْيِيْز -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَعَنَتْ (ن) عُنُوًا : অর্থ– অপমানিত হওয়া, হেয় হওয়া।

قَوْلُهُ وَقَدْ خَابَ : এটা حَالٌ -ও হতে পারে অথবা মুসতানিফা বাক্যও হতে পারে।

قَوْلُهُ هَضْمًا (ض) : ভেঙ্গে ফেলা, হ্রাস করা।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهَا : এখানে كَافٌ শব্দের মাসদার এর সিফত অর্থাৎ اَنْزَلْنٰهَا اِنْزَالًا مِثْلَ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ عَزْمًا : অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প। عَزْمًا শব্দটি نَجِدْ তথা نَعْلَمْ অর্থের মাফউল।

قَوْلُهُ لَهٗ : এটা হয়তো عَزْمًا থেকে حَالٌ হয়েছে অথবা نَجِدْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন– لَمْ نَجِدْ لَهٗ قَصْدًا -এর অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাপূর্বক খাননি; বরং ভুলবশত খেয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৭, পৃ. ৪২২]

ইবনে মুনজির ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ গোত্রের কিছু লোক কিয়ামত সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলল, যে কিয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, সে কিয়ামতের দিন এ পাহাড়গুলোর কি হবে? তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ২৬১]

তাফসীরকার জাহহাক (র.)-ও এ কথাই বলেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী একটি আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, যদি কিয়ামতের পরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় আর একথা সত্য হয় তবে এ বিশাল বিস্তৃত সুদৃঢ় পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই কিয়ামতের উল্লেখের পরই কাফেরদের পাহাড় সম্পর্কীয় একথাটি স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ الخ

অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপহাস করে বলে, আচ্ছা কিয়ামতের পূর্বে তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে বলছেন এমন অবস্থায় এই পাহাড়গুলোর কি অবস্থা হবে? এগুলো কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

হে রাসূল! আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক এই সব পাহাড় পর্বতকে বাতাসে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবেন। আর তখন পৃথিবীর কোথাও আঁকাবাঁকা বা উঁচুনিচু কোনো কিছুই থাকবে না। সেদিন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ফেরেশতা মানুষকে যেদিকে ডাকবে সেদিকেই তারা পতঙ্গের মতো ছুটবে, যেদিক থেকে ফেরেশতার ডাক শুনবে সেদিকেই ছুটবে, এদিক সেদিক যাবে না, আকাবাকা পথে চলবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি কাফেররা দুনিয়াতে নবী রাসূলগণের ডাকে সাড়া দিতো আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনে নেক আমল করতো তবে এমনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতো না।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াাতে دَاعِىْ বা আহ্বায়ক যাকে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করবেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একত্র হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন, অতএব সকলে হাজির হও।

হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর ডাকের পর কেউ আর এদিক সেদিক যাবে না। যেদিক থেকে ডাক শ্রবণ করবে সেদিকেই ছুটবে।

قَوْلُهُ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا : অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সকলের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, কারো মুখে কথা থাকবে না, সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তুমি তখন কারো কোনো কথা শুনতে পাবে না, পদধ্বনি ব্যতীত। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের দিকে মানুষের ছুটে চলার শব্দ ব্যতীত কেউ আর কোনো কথা শুনবে না।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, هَمْسًا শব্দটির অর্থ হলো উষ্ট্রের চলার শব্দ। আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, هَمْسًا শব্দটির অর্থ হলো চুপিচুপি কথা বলা। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই শব্দটির অর্থ হলো– কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে রসনা নাড়ানো।

خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ অর্থ হলো, সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটি হলো কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার একটি লক্ষণ। আর هَمْس অর্থ হলো পদধ্বনি। অর্থাৎ ঐ কঠিন সংকটময় দিনে মানুষের চলার সময় যে শব্দ হয়, তাছাড়া কোনো শব্দ শ্রুত হবে না। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেদিন সকলেই থাকবে মুহ্যমান।

قَوْلُهُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ يَقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ : সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুনাতেন, তখন তিনি তার সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হতো। আয়াতকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে শুনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামার لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয় এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে আপনি তা পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কুরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কুরআন বুঝার তৌফিকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল ﷺ -এর বিশেষ দোয়াসমূহের মধ্যে এটাও একটি–

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ بِمَايَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ . (ابن ماجة)

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ الخ – পূর্বাপর সম্পর্ক : এখান থেকে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলিসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে, আপনার নবুয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোনো কোনো দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ মর্মে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে,

শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারি হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেলে তিনি রিসালাত ও নবুয়তের উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তাই শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াতে عَهِدْنَا শব্দটি أَمَرْنَا অথবা وَصَّيْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -[বাহরে মুহীত]

উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল ফুল অথবা কোনো অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরো বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু হযরত আদম (আ.) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে نِسْيَانٌ ও عَزْم লক্ষণীয় نِسْيَانٌ শব্দের অর্থ- ভুলে যাওয়া, অনুবধান হওয়া এবং عَزْم-এর শাব্দিক অর্থ কোনো কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এই শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গাম্বরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গাম্বর গুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِىْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ অর্থাৎ আমার উম্মতের ভুলক্রটি মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন না। কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গাম্বরগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন, حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের আনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহরূপে গণ্য করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালাতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গাম্বরদের কাছ থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল যা গুনাহ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عِصْيَانٌ [অবাধ্যতা] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عَزْم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে عَزْم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোনো কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

ফায়েদা : হযরত আলী (রা.) বলেন, ১০টি বস্তু ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যথা- ১. অধিক চিন্তা-ভাবনা। ২. ঘাড়ে সিঙ্গা লাগানো। ৩. দাঁড়িয়ে পানিতে প্রশ্রাব করা। ৪. টক আপেল ভক্ষণ করা। ৫. বেশি পরিমাণ ধনিয়া ব্যবহার করা। ৬. ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা। ৭. কবরে লিখিত নাম ফলক ইত্যাদি পড়া। ৮. ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে দেখা। ৯. আলকাতরা লাগানো দুটি উটের মধ্যখান দিয়ে চলা। ১০. উঁকুনকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া। -[রূহুল বয়ান]

অনুবাদ :

١١٦. وَاذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط وَهُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ يَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةَ وَيَعْبُدُ اللّٰهَ مَعَهُمْ اَبٰى ـ عَنِ السُّجُوْدِ لِاٰدَمَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ـ

১১৬. স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাগণকে বললাম আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল সে ছিল জিনদের আদি পিতা। সে ফেরেশতাগণের সাথে অবস্থান করত এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত। সে অস্বীকার করল আদমকে সিজদা করতে এবং বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম।

١١٧. فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ حَوَّاءَ بِالْمَدِّ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى لا تَتْعَبُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَالْحَصْدِ وَالطَّحْنِ وَالْخَبْزِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلٰى شَقَاهُ لِاَنَّ الرَّجُلَ يَسْعٰى عَلٰى زَوْجَتِهِ ـ

১১৭. অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) -এর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, ফলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে। চাষাবাদ করা, তা কর্তন করা, তা পেষণ করা, রুটি বানানো ইত্যাদির দরুন কষ্ট ভোগ করবে। আর কষ্টের ক্ষেত্রে কেবল হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করেছেন। কেননা পুরুষরা তার স্ত্রীর জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

١١٨. اِنَّ لَكَ اَنْ لَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ـ

১১৮. তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগ্নও হবে না।

١١٩. وَاَنَّكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا عَطْفًا عَلٰى اِسْمِ اِنَّ وَجُمْلَتِهَا لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا تَعْطَشُ وَلَا تَضْحٰى ـ لَا يَحْصُلُ لَكَ حَرُّ شَمْسِ الضُّحٰى لِاِنْتِفَاءِ الشَّمْسِ فِى الْجَنَّةِ ـ

১১৯. নিশ্চয় তুমি اَنَّكَ -এর هَمْزَةٌ টি যবরযুক্তও হতে পারে আবার যেরযুক্তও হতে পারে। যেরযুক্ত হলে এটি পূর্বের اِنّ ও তার বাক্যের উপর আতফ হবে। তথায় পিপাসার্তও হবে না। তৃষ্ণার্ত ও রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না। অর্থাৎ জান্নাতে সূর্য না থাকার কারণে তথায় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করবে না।

١٢٠. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ اَىِ الَّتِىْ يَخْلُدُ مَنْ يَّأْكُلُ مِنْهَا وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ـ لَا يَفْنٰى وَهُوَ لَازِمُ الْخُلُوْدِ ـ

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা অর্থাৎ যে ব্যক্তি তা হতে ভক্ষণ করবে সে জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা যা ধ্বংস হবে না। আর তা চিরস্থায়ী হওয়া অনিবার্য।

অনুবাদ :

١٢١. فَأَكَلَا اٰدَمُ وَحَوَّاءُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا اَىْ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاٰخَرِ وَدُبُرُهُ وَسَمَّى كُلٌّ مِّنْهُمَا سَوْءَةً لِاَنَّ اِنْكِشَافَهُ يَسُوْءُ صَاحِبَهُ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اَخَذَا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ز لِيَسْتَتِرَا بِهِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى ص بِالْاَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ.

১২১. অতঃপর তারা উভয়ে ভক্ষণ করলেন হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) তা হতে, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল অর্থাৎ তাদের উভয়ের প্রত্যেকের সম্মুখে তার নিজের সম্মুখস্থ লজ্জাস্থান ও অপরের সম্মুখস্থ ও পশ্চাতের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থানকে سَوْءَةٌ বলার কারণ হলো লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া লজ্জাস্থান বিশিষ্টের পাপের কারণ ঘটে। এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত্ত করতে লাগলেন। তারা তা শরীরে জড়িয়ে রাখতে লাগলেন এর দ্বারা ঢেকে রাখার উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি ভ্রমে পতিত হলেন। বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করার কারণে।

١٢٢. ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ قَرَّبَهُ فَتَابَ عَلَيْهِ قَبِلَ تَوْبَتَهُ وَهَدٰى . اَىْ هَدٰهُ اِلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ.

১২২. এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন নৈকট্য দান করলেন। এবং তাঁকে পথনির্দেশ করলেন অর্থাৎ তওবার উপর অবিচল থাকার প্রতি হেদায়েত দিলেন।

١٢٣. قَالَ اهْبِطَا اَىْ اٰدَمُ وَحَوَّاءُ بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى ط فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ اَىِ الْقُرْاٰنَ فَلَا يَضِلُّ فِى الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰى . فِى الْاٰخِرَةِ.

১২৩. তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নেমে যাও অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)। তোমাদের যেসব সন্তানাদি সন্নিবেশিত রয়েছে তা সহ। এখান থেকে জান্নাত থেকে একই সঙ্গে, তোমরা পরস্পর কতিপয় সন্তান পরস্পরের শত্রু একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করার কারণে। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে فَاِمَّا-এর মধ্যে শর্তিয়ার نُوْنٌ টা অতিরিক্ত مَا-এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। যে আমার পথ অর্থাৎ কুরআন অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না পৃথিবীতে এবং দুঃখ কষ্টও পাবে না পরকালে।

অনুবাদ :

١٢٤. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ اَىِ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهٖ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا بِالتَّنْوِيْنِ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى ضَيِّقَةٍ وَفُسِّرَتْ فِىْ حَدِيْثٍ بِعَذَابِ الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَحْشُرُهٗ اَىِ الْمُعْرِضَ عَنِ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى - اَىْ اَعْمَى الْبَصَرِ اَوِ الْقَلْبِ -

১২৪. যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে। অর্থাৎ কুরআন থেকে ফলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তার জীবন হবে সংকুচিত ضَنْكًا শব্দটি তানভীন সহকারে মাসদার ضَيِّقَةً অর্থে। হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে কাফেরের কবরের শাস্তি দ্বারা তাকে আমি উত্থিত করব অর্থাৎ কুরআনবিমুখ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় অর্থাৎ চোখের অন্ধত্ব বা অন্তরের অন্ধত্ব যে কোনোটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

١٢٥. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا - فِى الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْبَعْثِ -

১২৫. সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। দুনিয়ায় এবং পুনরুত্থানকালে।

١٢٦. قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج تَرَكْتَهَا وَلَمْ تُؤْمِنْ بِهَا وَكَذٰلِكَ مِثْلَ نِسْيَانِكَ اٰيٰتِنَا الْيَوْمَ تُنْسٰى - تُتْرَكُ فِى النَّارِ -

১২৬. তিনি বলবেন বিষয়টি এরূপই আমার নিদর্শনাবলি তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে। তুমি সেগুলো পরিত্যাগ করেছিলে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করনি এবং সেইভাবে তোমার পক্ষে আমার নিদর্শনাবলি ভুলে যাওয়ার ন্যায়। তুমিও বিস্মৃত হলে তোমাকে জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হবে।

١٢٧. وَكَذٰلِكَ وَمِثْلَ جَزَائِنَا مَنْ اَعْرَضَ عَنِ الْقُرْاٰنِ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ اَشْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاَبْقٰى - اَدْوَمُ -

১২৭. এবং এভাবেই আমার প্রতিফল দানের ন্যায়, যে কুরআন থেকে বিমুখ থাকে আমি প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে শিরক করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো কঠিনতর। পৃথিবীর শাস্তি থেকে ও কবরের আজাব থেকে। ও অধিক স্থায়ী চিরন্তন।

১২٨. اَفَلَمْ يَهْدِ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ كَمْ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ اَهْلَكْنَا اَىْ كَثِيْرًا اِهْلَاكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَىِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ يَمْشُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ لَهُمْ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط فِىْ سَفَرِهِمْ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوْا وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَخْذِ اِهْلَاكٍ مِنْ فِعْلِهِ الْخَالِىْ عَنْ حَرْفٍ مَصْدَرِيٍّ لِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى لَا مَانِعَ مِنْهُ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لَعِبْرًا لِاُولِى النُّهٰى ـ لِذَوِى الْعُقُوْلِ ـ

অনুবাদ :

১২৮. এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না মক্কার কাফেরদের নিকট স্পষ্ট হলো না। কত كَمْ টি হলো خَبَرِيَّةٌ যা পূর্ববর্তী اَهْلَكْنَا -এর মাফঊল ধ্বংস করেছি অনেককে বিনাশ সাধন করেছি। তাদের পূর্বে মানবগোষ্ঠী হতে অর্থাৎ অতীতের বহু জনগোষ্ঠীকে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে এরা বিচরণ করে থাকে। এটা পূর্ববর্তী لَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। যাদের বাসভূমিতে সিরিয়া ইত্যাদি দেশে তাদের ভ্রমণকালে। সুতরাং তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। اَهْلَكْنَا ক্রিয়া দ্বারা কোনো حَرْفٌ مَصْدَرِىْ -বিহীন مَصْدَرْ তথা اِهْلَاكٌ উদ্দেশ্য নেওয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোনো দূষণীয় নয়। অবশ্যই এতে আছে নিদর্শন শিক্ষণীয় বিষয় বিবেকসম্পন্নদের জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا : এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের ৭টি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের কথার উপর এ কাহিনীর عَطْف হলো عَطْفُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ -এর অন্তর্গত। কেননা এ ঘটনাটি ইবলীসের শত্রুতার কারণ হয়েছিল।

قَوْلُهُ اِلَّا اِبْلِيْسَ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভ্যাস যে, যেখানে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয় সেখানে اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِن দ্বারা করেন। কিন্তু এখানে যেহেতু উভয়টি সম্ভাবনা রয়েছে এ কারণে এ ব্যাখ্যা করেননি। বরং كَانَ يَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ ও হতে পারে। কেননা এসময় অর্থ হবে উপস্থিতগণ সাজদা করল, তবে তাদের মধ্য থেকে ইবলীস সেজদা করেনি। আর وَهُوَ اَبُو الْجِنِّ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ কেননা, জিন ফেরেশতাদের অন্তর্গত নয়।

قَوْلُهُ اَبٰى عَنِ السُّجُوْدِ : এর পূর্বের কথার তাকিদ স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ইবলীসের অস্বীকার করাটা اِسْتِثْنَاءْ দ্বারাই বুঝা গেছে। আবার এটা اِسْتِثْنَاءْ -এর ইল্লতও হতে পারে। অর্থাৎ ইবলীসের সিজদা না করার কারণ ছিল তার অহংকার। এ সময় اَبٰى -এর মাফঊল বিলুপ্ত মানা বৈধ হবে না। কেননা এক্ষেত্রে تَعْلِيْلُ الشَّئِ بِنَفْسِهٖ অনিবার্য হয়; বরং এক্ষেত্রে اَبٰى ক্রিয়াটি لَازِمٌ হবে এবং অর্থ হবে- اَظْهَرَ الْاِبَاءَ عَنِ الْمُطَاوَعَةِ অর্থাৎ আনুগত্য করা থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল।

قَوْلُهُ فَقُلْنَا : এর عَطْف হলো উহ্য একটি বাক্যের উপর, আর তা হলো- اَدْخَلْنَا اٰدَمَ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا لَهٗ يَا اٰدَمُ

قَوْلُهُ حَوَّاءْ : এটা اَحْوٰى সিফত এর সীগাহ -এর স্ত্রী লিঙ্গ অর্থ- সবুজতা কিংবা লালিমার প্রতি ধাবিত।

قَوْلُهُ فَتَشْقٰى : এটা نَهْى -এর জবাব। (س) شَقَاوَةْ হলো এর মাসদার। অর্থ- হতভাগা হওয়া। এটা سَعَادَتْ তথা সৌভাগ্যের বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট। সৌভাগ্য যেরূপ দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিকক। তদ্রূপ হতভাগ্যতা ও দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিক। ইহলৌকিক হতভাগ্যতা আবার কয়েক প্রকার। তন্মধ্য থেকে এখানে দুঃখ-কষ্টে পড়ার অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ عَلٰى شَقَاهُ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন.** গাছের নিকটবর্তী গমন থেকে উভয়কে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে فَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ তোমরা উভয়ে এ গাছের নিকটবর্তী হবে না। সুতরাং হতভাগ্যতার সম্বন্ধ উভয়ের প্রতি হওয়া উচিত। অথচ فَيَشْقٰى -এর মধ্যে কেবল হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি হতভাগ্যতার সম্বন্ধ করা হয়েছে।

উত্তর. ১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। কষ্ট-পরিশ্রম করে উপার্জন করা স্বামীর দায়িত্ব; স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। এ কারণেই হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি হতভাগ্যতার সম্বন্ধ করা হয়েছে। ২. বাক্যের শেষাংশের ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ করা হয়েছে। সুতরাং উভয়ে উদ্দেশ্য। প্রাধান্য স্বরূপ স্ত্রীকে পুরুষের অনুগামী করা হয়েছে। -[রূহুল বয়ান]

قَوْلُهُ لَهُ ضَنْكًا : (ك) ضَنْكًا অর্থ- সংকীর্ণ হওয়া। এ শব্দটি مَعِيْشَةً -এর সিফত। আধিক্য প্রকাশার্থে মাসদারকে সিফতরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন. এখানে তো মওসূফ ও সিফতের মধ্যে مُطَابَقَتْ তথা সামঞ্জস্য ঘটেনি।

উত্তর. ضَنْكًا শব্দটি যেহেতু মাসদার, আর মাসদারের মধ্যে পুরুষলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং ضَنْكَةً বলার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ : ব্যাখ্যাকার (র.) عَنِ الْقُرْاٰنِ -এর স্থলে عَنِ الْهِدَايَةِ উল্লেখ করতেন তাহলে তা বেশি উপযুক্ত হতো।

قَوْلُهُ وَنَحْشُرُهُ : এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা, আর যদি رَاءْ বর্ণ সাকিন হয়ে থাকে তাহলে শর্তের জবাবের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তা مَجْزُوْمْ হবে। আবার একাধারে কয়েকটি হরকত আসার কারণেও مَجْزُوْمْ হতে পারে। عَمٰى এটা نَحْشُرُهٗ -এর যমীর থেকে حَالْ।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ : এখানে হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের পূর্বে এসেছে। ف হলো আতেফা, এর দ্বারা বিলুপ্ত বাক্যের উপর **عطف** করা হয়েছে। আসল বাক্যটি এরূপ ছিল اَعَمُوْا فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ আল্লামা মহল্লী (র.) يَهْدِ -এর তাফসীর يَتَبَيَّنُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَهْدِ হলো فِعْل لَازِمْ অর্থ এই যে, তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে? ফলে আমার ধ্বংসলীলা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়নি। اَهْلَكْنَا -এর মাফউলেবিহী হলো পূর্বোল্লিখিত كَمْ আর كَمْ -এর تَمْيِيْز উহ্য রয়েছে। مِنَ الْقُرُوْنِ এটা تَمْيِيْز -এর সিফত হওয়ার কারণে নসবের স্থলে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ كَمْ اَهْلَكْنَا كَائِنًا مِنَ الْقُرُوْنِ

قَوْلُهُ يَمْشُوْنَ : আল্লামা মহল্লী (র.) يَمْشُوْنَ -কে قَبْلَهُمْ -এর যমীর-এর حَالْ সাব্যস্ত করেছেন। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার اَهْلَكْنَا -এর هُمْ যমীর থেকে حَالْ বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, তারা নিজ নিজ ঘরে চলাফেরা করছিল।

قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَ : এটা হলো মুবতাদা, আর مِنَ الْاَخْذِ হলো তার বিবরণ। আর لِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى উল্লিখিত اَخْذَ তথা পাকড়াও করার ইল্লত বা কারণ। لَا مَانِعَ مِنْهُ হলো খবর। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত اَهْلَكْنَا ক্রিয়া থেকে মাসদারের অর্থের বর্ণ ছাড়াই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে اَخْذٌ মাসদার গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। একথাটিকে প্রশ্নোত্তরাকারে এভাবে বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন. اَهْلَكْنَا দ্বারা اِهْلَاكٌ মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া কিভাবে বৈধ হতে পারে? কারণ فِعْل -এর পূর্বে এমন কোনো হরফ উল্লেখ নেই যা তাকে মাসদারের অর্থে পরিণত করবে।

উত্তর. অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ রাখার জন্য فِعْل -কে মাসদার অর্থে পরিণতকারী حَرْف ছাড়াই তার দ্বারা মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া দূষণীয় নয়।

قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ : এখানে ذٰلِكَ দ্বারা اَلْاِهْلَاكُ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ نُهٰى : এটা نُهْيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বিবেক বুদ্ধি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে হযরত আদম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে

একত্রে বাস করতো। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল, আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। আর অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সেখানকার সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে [অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে] আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হযরত আদম (আ.)-কে বললেন, দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের [অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর] শত্রু। সে যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تَشْقٰى শব্দটি شَقَاوَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ; একটি হচ্ছে পারলৌকিক কষ্ট আর অপরটি হলো ইহলৌকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা প্রথম অর্থে কোনো পয়গাম্বর দূরের কথা, কোনো সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানদের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র.) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন– هُوَ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ كَدِّ يَدَيْهِ অর্থাৎ এখানে شَقَاوَتْ-এর অর্থ– হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। –[কুরতুবী]

এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্ন, পানীয় ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فَتَشْقٰى শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী (র.) এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন, যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসব কাজের পদ্ধতিও হযরত আদম (আ.)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে হযরত আদম (আ.) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। হযরত আদম (আ.) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আদম আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিজিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরি ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব : আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সাথে হযরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরিক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فَتَشْقِيَا বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। এ কারণেই فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে তা হযরত আদম (আ.)-কেই করতে হবে। কেননা হযরত হাওয়া (আ.)-এর ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে : কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ– আহার্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ; অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরো জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারো ভরণ-পোষণ শরিয়ত কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরিউক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে। যেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকহগ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى : জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না"– এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ থেকে **وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى** এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যাতে সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গাম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গুনাহ। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গুনাহ কিরূপে করলেন? অথচ সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ প্রত্যেক ছোট বড় গুনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জবাব সূরা বাকারার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে প্রথমে عَصٰى ও পরে غَوٰى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরিয়তের আইনে হযরত আদম (আ.)-এর এই কর্ম গুনাহ ছিল না। কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غَوٰى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং ২. পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী ও কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করেছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গাম্বরগণ সম্পর্কে একটি জরুরি নির্দেশ, তাদের সম্মানের হেফাজত : কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে عَصٰى ইত্যাদি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই–

لَا يَجُوْزُ لِاَحَدِنَا الْيَوْمَ اَنْ يُّخْبِرَ بِذٰلِكَ عَنْ اٰدَمَ اِلَّا اِذَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ اَثْنَاءِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَنْهُ اَوْ قَوْلِ نَبِيِّهٖ فَاَمَّا اَنْ يَّبْتَدِئَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهٖ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِيْ اٰبَائِنَا الادينن اِلَيْنَا الْمُمَاثِلِيْنَ لَنَا فَكَيْفَ فِيْ اَبِيْنَا الْاَقْوَمِ الْاَعْظَمِ الْاَكْرَمِ النَّبِيِّ الْمُقَدَّمِ الَّذِيْ عَذَرَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهٗ.

অর্থাৎ আজ আমাদের কারো জন্য হযরত আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েজ নয়। তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত পয়গাম্বর, আল্লাহ তা'আলা যার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েজ নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবূ নছর বলেন, কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে হযরত আদম (আ.)-কে গুনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েজ নয়। কুরআন পাকের যেখানেই কোনো নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত পূর্ববর্তী বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআনের আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا : অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়ই। এই সম্বোধন হযরত আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরিক করা অবান্তর। তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান সন্তুতির পারস্পরিক শত্রুতা। বলা বাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ : এখানে জিকির এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَسُوْلًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন অথবা রাসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত ও বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পরিণাম এই فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আজাব কিয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গাম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীসগ্রন্থে সা'দ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পয়গাম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালা মসিবত সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে– দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জবাব এই যে, এখানে দুনিয়ার আজাব বলে কবরের আজাব বুঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বুঝানো হয়েছে। –[মাযহারী]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। –[মাযহারী]

এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিণামে সঞ্চিত হয়। কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জুটে না। কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : يَهْدِ ক্রিয়াপদের فَاعِلْ -এর ضَمِيْر - هُدٰى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هُدٰى দ্বারা কুরআন অথবা রাসূল ﷺ বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানির কারণে আল্লাহ তা'আলার আজাবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فَاعِلْ -এর ضَمِيْر আল্লাহ তা'আলার দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কি তাদেরকে হেদায়েত দেননি?

অনুবাদ :

١٢٩. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ لَكَانَ الْإِهْلَاكُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاَجَلٌ مُّسَمًّى . مَضْرُوْبٌ لَهُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِيْ كَانَ وَقَامَ الْفَصْلُ بِخَبَرِهَا مَقَامَ التَّاكِيْدِ .

১২৯. আপনার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের শাস্তি পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবী হতো পৃথিবীতে তাদের ধ্বংস এবং একটা কাল নির্ধারিত না থাকলে اَجَلٌ مُّسَمًّى -এর আতফ হয়েছে كَانَ -এর মধ্যস্থ উহ্য যমীরের উপর। আর كَانَ -এর ইসিম ও খবরের মধ্যে فَصْل টা তাকিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

١٣٠. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ . وَسَبِّحْ صَلِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَالٌ أَيْ مُتَلَبِّسًا بِهِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ط صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَمِنْ اٰنَآئِ اللَّيْلِ سَاعَاتِهِ فَسَبِّحْ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ عَطْفٌ عَلٰى مَحَلِّ مِنْ اٰنَاءِ الْمَنْصُوْبِ اَيْ صَلِّ الظُّهْرَ لِاَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ فَهُوَ طَرَفُ النِّصْفِ الْاَوَّلِ وَطَرَفُ النِّصْفِ الثَّانِيْ لَعَلَّكَ تَرْضٰى . بِمَا تُعْطٰى مِنَ الثَّوَابِ .

১৩০. সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন! এটা জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন بِحَمْدِ رَبِّكَ এটা سَبِّحْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত তাসবীহ আদায় করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ ফজরের নামাজ ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ আসরের নামাজ এবং রাত্রিকালে সময়ে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করুন। এবং দিবসের প্রান্তসমূহে এর আতফ হলো مِنْ اٰنَاءِ -এর উপর যা মূলত سَبِّحْ ফে'লের মাফউল বা মানসূব। অর্থাৎ জোহরের নামাজ আদায় করুন। কেননা তার সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আরম্ভ হয়। কাজেই এটা হলো প্রথমার্ধের প্রান্ত এবং দ্বিতীয়ার্ধেরও প্রান্ত। যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আপনাকে প্রদত্ত ছওয়াব দ্বারা।

١٣١. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا اَصْنَافًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا زِيْنَتَهَا وَبَهْجَتَهَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ بِاَنْ يَطْغَوْا وَرِزْقُ رَبِّكَ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا اُوْتُوْهُ فِى الدُّنْيَا وَاَبْقٰى اَدْوَمُ .

১৩১. আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। তার সৌন্দর্য চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য। তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তা এভাবে যে, তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। আপনার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ জান্নাতে উত্তম পৃথিবীতে প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে এবং অধিক স্থায়ী সর্বদা বিদ্যমান।

অনুবাদ :

١٣٢. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ اصْبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْأَلُكَ نُكَلِّفُكَ رِزْقًا ط لِنَفْسِكَ وَلَا لِغَيْرِكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ الْجَنَّةُ لِلتَّقْوٰى لِأَهْلِهَا ـ

১৩২. আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে অবিচলিত থাকুন। আমি আপনার নিকট চাই না। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না জীবনোপকরণ আপনার নিজের ও অন্যের ব্যাপারে। আমিই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম জান্নাত মুত্তাকীজের জন্য অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য।

١٣٣. وَقَالُوْا أَيِ الْمُشْرِكُوْنَ لَوْلَا هَلَّا يَأْتِيْنَا مُحَمَّدٌ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط مِمَّا يَقْتَرِحُوْنَهٗ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَيِّنَةُ بَيَانُ مَا فِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ـ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ مِنْ اَنْبَاءِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَاِهْلَاكِهِمْ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ ـ

১৩৩. তারা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা [তিনি কেন] হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন আনয়ন করেন না। যা তারা কামনা করে। তাদের নিকট কি আসেনি। تَأْتِيْهِمْ শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়ভাবে পঠিত। সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে কুরআন সেসব পূর্ববর্তী উম্মতের সংবাদসমূহে এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দরুন তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী সম্বলিত।

١٣٤. وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ قَبْلِ مُحَمَّدٍ الرَّسُوْلِ لَقَالُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَبَّنَا لَوْلَا هَلَّا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ الْمُرْسَلَ بِهَا مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ فِى الْقِيٰمَةِ وَنَخْزٰى ـ فِىْ جَهَنَّمَ ـ

১৩৪. যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বে। তবে তারা বলত কিয়ামতের দিন হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম যা সহ তিনি প্রেরিত হতেন। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও দোজখে অপমানিত হওয়ার পূর্বে।

١٣٥. قُلْ لَهُمْ كُلٌّ مِّنَّا وَمِنْكُمْ مُّتَرَبِّصٌ مُنْتَظِرٌ مَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ الْاَمْرُ فَتَرَبَّصُوْا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ فِى الْقِيٰمَةِ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ الطَّرِيْقِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ وَمَنِ اهْتَدٰى ـ مِنَ الضَّلَالَةِ اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ ـ

১৩৫. আপনি বলুন তাদেরকে প্রত্যেকে আমাদেরও তোমাদের মধ্যে অপেক্ষমাণ ব্যাপারটি যেদিকে গড়াচ্ছে তার প্রতি অপেক্ষাকৃত সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কিয়ামতের দিন কারা রয়েছে সরল সোজা পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে ভ্রষ্টতা থেকে, আমরা নাকি তোমরা?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ الخ : আল্লাহ তা'আলার যদি তাঁর চিরন্তন জ্ঞান অনুযায়ী মহানবী ﷺ-এর সম্মানের ক্ষেত্রে তার উম্মত থেকে সর্বগ্রাসী আজাবকে বিলম্বিত করার বিষয়টি সুনিশ্চিত না হতো তাহলে পূর্বের উম্মতসমূহের ন্যায় এ উম্মতের উপরও সর্বগ্রাসী আজাব নাজিল হতো। কাজেই এ বিলম্ব কেবল অবকাশ প্রদান মাত্র। যাতে কাফেররা তাদের পূর্বের স্বভাব পরিবর্তন করার সুযোগ লাভ করে।

قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِيْ كَانَ : এর উদ্দেশ্য এই যে, وَاَجَلٌ مُسَمًّى -এর আতফ হলো كَانَ -এর গুপ্ত যমীরের উপর। বাক্যটি এমন হবে كَانَ الْاِهْلَاكُ وَالْاَجَلُ الْمُعَيَّنُ لَهُ لِزَامًا আর এখানে لِزَامًا মাসদারটি لَازِمًا অর্থে।

প্রশ্ন. اِهْلَاكٌ এবং اَجَلٌ مُسَمًّى উভয়টি كَانَ -এর اِسْم সুতরাং এর খবরও দ্বিবচন হওয়া উচিত। সুতরাং لِزَامًا -এর স্থলে لَازِمَيْنِ হওয়া উচিত।

উত্তর. لِزَامًا যদিও এখানে لَازِمًا -এর অর্থে, কিন্তু মূলত এটা মাসদার। সুতরাং তাকে দ্বিবচনের অর্থে ব্যবহার করা বৈধ।

قَوْلُهُ قَالَ قَامَ الْفَصْلُ : এটাও একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ -এর উপর যখন আতফ হয় তখন ضَمِيْر مَرْفُوْع -এর তাকিদ স্বরূপ ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِلْ উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। এখানে كَانَ -এর ضَمِيْر উহ্য হয়েছে। اِهْلَاكٌ -এর উপর اَجَلٌ مُسَمًّى -এর عَطْف হচ্ছে। অথচ এখানে তার কোনো তাকীদস্বরূপ যমীরে মুনফাসিল আনা হয়নি।

উত্তর : عَطْف বৈধ হওয়ার জন্য আরো একটি উপায় আছে। তা এই যে, ضَمِيْر مُنْفَصِلْ ছাড়া যদি অন্য কোনো বস্তু দ্বারাও মাঝে ব্যবধান ঘটে তাহলেও عَطْف বৈধ হয়ে যায়। এখানে كَانَ -এর খবর لِزَامًا -এর ব্যবধান আসার কারণে عَطْف বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَجَلٌ مُسَمًّى : اَجَل শব্দটি مَرْفُوْع হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। ১. كَانَ -এর ضَمِيْر -এর عَطْف হলো -এর উপর। এটাই ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এর عَطْف হলো كَلِمَةٌ -এর উপর। مُسْتَتَرْ আর এটা لَوْلَا -এর অধীনে উল্লিখিত হয়েছে। আসল বাক্যটি এরূপ لَوْلَا كَلِمَةٌ وَاَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ الْعَذَابُ لَازِمًا لَهُمْ

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ : فَاصْبِرْ -এর মধ্যকার فَاءْ হলো جَزَاءْ নির্দেশক। এখানে শর্ত উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ مِنْ كَلِمَاتِ الْكُفْرِ হবে।

فِىْ اٰنَاءِ الَّيْلِ এখানে اٰنَاءْ শব্দটি اَنَا -এর বহুবচন। অর্থ– সময়, আর مِنْ অব্যয়টি فِىْ অর্থে। অর্থাৎ مِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ

قَوْلُهُ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ : অর্থাৎ صَلِّ اَطْرَافَ النَّهَارِ এটা مِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ اَزْوَاجًا : এটা مَتَّعْنَا -এর মাফ'উলেবিহী হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। আর بِهٖ -এর ضَمِيْر مَجْرُوْر যা مَا -এর প্রতি ফিরেছে, তা حَالْ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا : زَهْرَةَ শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।

১. مَتَّعْنَا -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হওয়ার কারণে। আর প্রথম مَفْعُوْل হলো اَزْوَاجًا আর مَتَّعْنَا যেহেতু اَعْطَيْنَا -এর অর্থ বিশিষ্ট, এ কারণে দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে।

২. اَزْوَاجًا থেকে بَدَلْ হওয়ার কারণে। অথবা مُضَافْ বিলুপ্ত থাকার কারণে অর্থাৎ ذَوِىْ زَهْرَةَ অথবা مُبَالَغَةْ স্বরূপ।

৩. উহ্য فِعْلْ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এ ব্যাপারে مَتَّعْنَا প্রমাণ বহন করছে। অর্থাৎ جَعَلْنَا زَهْرَةَ

৪. ذَمْ -এর উপর ভিত্তি করে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ اَذُمُّ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এছাড়া مَنْصُوْبْ হওয়ার আরো ৫টি কারণ থাকতে পারে। সংক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য করে তা বর্জন করা হলো।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَّطْغَوْا : بَاءٌ হলো سَبَبِيَّةٌ অর্থাৎ আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে ফেতনায় লিপ্ত করেছি বা পরীক্ষায় ফেলেছি। بَهْجَةٌ অর্থ সৌন্দর্য, চাকচিক্য। يَقْتَرِحُوْنَهٗ এটা اِقْتِرَاحٌ মাসদার থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ– কামনা করা, সিদ্ধান্ত পেশ করা, দাবি করা।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَاْتِيْهِمْ : হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর وَاوْ টি আতেফা। অর্থাৎ اَعَمُوْا وَلَمْ تَأْتِيْهِمْ

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ : এটা জুমলায়ে মুসতানিফা। পূর্বের কথার তাকিদস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَنَتَّبِعَ : এটা لَوْلَا-এর জবাব। উহ্য اَنْ-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে অর্থাৎ فَاَنْ نَتَّبِعَ

قَوْلُهُ مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ : এটা মুবতাদা ও খবর। আল্লামা মহল্লী (র.) مَنِ اهْتَدٰى-এর ব্যাখ্যা مِنَ الضَّلَالَةِ দ্বারা করে اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ এবং مَنِ اهْتَدٰى-এর মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। اَصْحَابُ الصِّرَاطِ দ্বারা সে সকল লোক উদ্দেশ্য যারা শুরু থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন– রাসূল ﷺ এবং সে সকল সাহাবী যারা ইসলাম অবস্থায় বালেগ হয়েছেন। যেমন– হযরত আলী (রা.) প্রমুখ। আর وَمَنِ اهْتَدٰى দ্বারা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা পূর্বে কাফের ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে مَنْ হলো জিজ্ঞাসামূলক। আবার খবরের স্থলেও হতে পারে। এ সময় اَلصِّرَاطُ-এর উপর عَطْفٌ হবে। অর্থাৎ اَصْحَابُ مَنِ اهْتَدٰى

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ : মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। তাঁকে কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলতো। কুরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। ১. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। ২. আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ বাক্যে একথাই বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট-বড়, ভালোমন্দ কোনো মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোনো না কোনো শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়ে। যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কুরআন পাক দুটি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১. সবর। অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। ২. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আজাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো কোনো রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোনো না কোনো রহস্য আছে। তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– لَعَلَّكَ تَرْضٰى অর্থাৎ উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়ার অথবা ইবাদত করার তাওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তাওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَبِّحْ بِحَمْدِ শব্দটি সাধারণ জিকির ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাজের অর্থেও হতে পারে। তাফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তারা নামাজের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামাজ, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' বলে জোহর ও আসরের নামাজ

এবং مِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ বলে রাত্রিকালীন সব নামাজ তথা মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জুদ প্রভৃতিতে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর اَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরো তাকিদ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ الخ : শানে নুযূল : ইবনে আবি শায়বা, ইবনে মারদবিয়া, বাজ্জার এবং আবূ ইয়ালা হযরত আবূ রাফে (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার প্রিয়নবী ﷺ -এর একজন মেহমান আসলেন। তিনি আমাকে জনৈক ইহুদির নিকট থেকে আটা বাকিতে আনার জন্য প্রেরণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, রজব মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত [এর মূল্য বাকি থাকবে] ইহুদি বলল, কোনো বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি দেব না। আমি হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে ইহুদির কথা আরজ করলাম। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, যদি সে আমার নিকট এভাবে আটা বিক্রয় করতো তবে আমি তার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতাম, নিঃসন্দেহে আমি আসমানেও আমানতদার, জমিনেও আমানতদার। যাও আমার লৌহ বর্মটি তার নিকট নিয়ে যাও। আমি হুজুর ﷺ -এর দরবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মু'মিনের জন্য আশঙ্কার বস্তু : وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ – আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে উম্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের বিলাস বৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমকতা সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন? হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মতো মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতায় দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা.) কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আর আপনি সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে খাত্তাব তনয়! তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছ? এসব ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোনো অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আজাবই আজাব। মুমিনের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তার ছিল। কোনো সময় পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকির মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং নিজের আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَنْ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-বাসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশঙ্কার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তার বিধানাবলি থেকে গাফেল হয়ে যেতে পার।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য : وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দেন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে। ১. পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ এবং ২. নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে,

নিজের নামাজ পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যও নিজের পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাজী হওয়া আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তানসন্তুতি ও সম্পর্কশীল সবাই اَهْل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ ফজরের নামাজের সময় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে গমন করে اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ [নামাজ পড়, নামাজ পড়] বলতেন। -[কুরতুবী]

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে জুবায়েরের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামাজ পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। -[কুরতুবী]

যে ব্যক্তি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন : لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিজিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন; বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিজিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে সর্বোচ্চ মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বীজের ভেতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোনো হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাজত ও আল্লাহ সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বুঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কার্যব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব না। [অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ-লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে।]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি-

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمَ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَةٍ هَلَكَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয় সে এসব চিন্তার যে কোনো জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। -[ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى : অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

قَوْلُهُ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى : অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরিকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরিকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনটি বিশুদ্ধ তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِقْتَرَبَ قَرُبَ لِلنَّاسِ اَهْلِ مَكَّةَ مُنْكِرِي الْبَعْثِ حِسَابُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ . عَنِ التَّاَهُّبِ لَهٗ بِالْاِيْمَانِ .

১. আসন্ন নিকটবর্তী হয়েছে মানুষের মক্কাবাসীর যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো। হিসাব-নিকাশের সময় কিয়ামতের দিন। কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে ঈমানের মাধ্যমে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে।

٢. مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ شَيْئًا فَشَيْئًا اَيْ لَفْظِ قُرْاٰنٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لا يَسْتَهْزِءُوْنَ .

২. যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে অর্থাৎ কুরআনের শব্দ তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। বিদ্রূপ করে খেলাচ্ছলে।

٣. لَاهِيَةً غَافِلَةً قُلُوْبُهُمْ ط عَنْ مَعْنَاهُ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ق اَيِ الْكَلَامَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بَدَلٌ مِنْ وَاوِ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى هَلْ هٰذَا اَيْ مُحَمَّدٌ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج فَمَا يَأْتِيْ بِهٖ سِحْرٌ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ تَتَّبِعُوْنَهُ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ . تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ سِحْرٌ .

৩. তাদের অন্তর অমনোযোগী উদাসীন তার মর্মের ব্যাপারে। তারা গোপন পরামর্শ করে আলাপ করে যারা জালেম তারা اَلَّذِيْنَ হলো اَسَرُّوْا-এর وَاوْ যমীর হতে بَدَل হয়েছে। এতো হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মতো একজন মানুষই। সুতরাং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন এগুলো সবই জাদু। তবুও কি তোমরা জাদুর কবলে পড়বে অর্থাৎ তাঁর অনুসরণ করবে দেখে শুনে তোমরা জান যে, এটা জাদু।

٤. قُلْ لَهُمْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ كَائِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا اَسَرُّوْهُ الْعَلِيْمُ . بِهٖ .

৪. সে বলল তাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন। তিনিই সর্বশ্রোতা। তারা যা গোপন করে ও সর্বজ্ঞ সে বিষয়ে।

অনুবাদ :

٥. بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ اِلٰى اٰخَرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ قَالُوْا فِيْمَا اُتِىَ بِهٖ مِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ اَخْلَاطٌ رَاٰهَا فِى النَّوْمِ بَلِ افْتَرٰىهُ اِخْتَلَقَهٗ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ـ فَمَا اُتِىَ بِهٖ شِعْرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ـ كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ ـ

৫. বরং بَلْ হরফটি এ আয়াতে তিনো স্থানে উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলে কুরআন সম্পর্কে যা কিছু আনীত হয়েছে তা সব অলীক কল্পনা স্বপ্নে দেখা অলীক বিষয়াবলি হয় তিনি তা উদ্ভাবন করেছেন রচনা করেছেন না হয় তিনি একজন কবি। সুতরাং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এগুলো সব কবিতা সুতরাং তিনি আনয়ন করুন আমাদের নিকট এমন এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তীগণ। যেমন, উট, লাঠি, হাত শুভ্র হওয়া।

٦. قَالَ تَعَالٰى مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَىْ اَهْلِهَا اَهْلَكْنٰهَا ج بِتَكْذِيْبِهَا مَا اَتَاهَا مِنَ الْاٰيَاتِ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ لا ـ

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন– এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি তাদের নিকট আনীত নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তবে কি এরা ঈমান আনবে? না, তারা ঈমান আনবে না।

٧. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا يُّوْحٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ اِلَيْهِمْ لَا مَلَائِكَةً فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ الْعُلَمَاءِ بِالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ ذٰلِكَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُوْنَهٗ وَاَنْتُمْ اِلٰى تَصْدِيْقِهِمْ اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ـ

৭. আপনার পূর্বেও আমি ওহীসহ মানুষ পাঠিয়েছিলাম। ফেরেশতা নয়। يُوْحٰى শব্দটি অন্য কেরাতে يَاءْ -এর পরিবর্তে نُوْن এবং حَاءْ বর্ণে যেরসহ। তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলেমগণকে। যদি তোমরা না জান উক্ত বিষয়টি। কেননা তারা এ বিষয়ে জানে। আর তোমরা তাদের সত্যায়নে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সত্যায়নের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।

٨. وَمَا جَعَلْنٰهُمْ اَىِ الرُّسُلَ جَسَدًا بِمَعْنٰى اَجْسَادٍ لَا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ بَلْ يَاْكُلُوْنَهٗ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ـ فِى الدُّنْيَا ـ

৮. আমি তাদেরকে করিনি। রাসূলগণকে এমন দেহ বিশিষ্ট, যে তারা আহার্য গ্রহণ করতেন না; বরং তারা খাবার গ্রহণ করতেন। আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলেন না। পৃথিবীতে।

অনুবাদ :

৯. ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ بِاِنْجَائِهِمْ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ اَىِ الْمُصَدِّقِيْنَ لَهُمْ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ـ الْمُكَذِّبِيْنَ لَهُمْ ـ

৯. অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। তাদেরকে মুক্তি দান করার মাধ্যমে। যথা আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম অর্থাৎ নবীগণের সত্যায়নকারীদেরকে। এবং জালেমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। অর্থাৎ নবীগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে।

১০. لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ط لِاَنَّهٗ بِلُغَتِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ فَتُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

১০. আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি হে কুরাইশ সম্প্রদায়! কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ কেননা এটাতো তোমাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না। ফলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِقْتَرَبَ قَرُبَ : اِقْتَرَبَ-এর তাফসীরে قَرُبَ শব্দ এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, قَرُبَ এবং اِقْتَرَبَ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهٗ لِلنَّاسِ : لِلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যায় اَهْلُ مَكَّةَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি اِطْلَاقُ الْجِنْسِ عَلَى الْبَعْضِ-এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রমাণ হলো এই যে, সামনে যে বিবরণ ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে তা মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অন্যথায় হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিকটবর্তী।

قَوْلُهٗ حِسَابُهُمْ : اَىْ وَقْتُ حِسَابِهِمْ অর্থাৎ مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ : এটি جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ তার মর্ম হলো– قَرُبَ وَقْتُ حِسَابِهِمْ وَالْحَالُ اَنَّهُمْ غَافِلُوْنَ مُعْرِضُوْنَ

قَوْلُهٗ هُمْ : এটি মুবতাদা আর مُعْرِضُوْنَ হলো তার খবর।

قَوْلُهٗ فِىْ غَفْلَةٍ : এটি مُعْرِضُوْنَ-এর ضَمِيْر থেকে حَال-ও হতে পারে اَىْ اَعْرَضُوْا غَافِلِيْنَ এবং মুবতাদার خَبَرْ ثَانِىْ-ও হতে পারে।

قَوْلُهٗ تَاَهَّبَ : اَهَبَّ وَ تَاَهَّبَ-এর অর্থ হলো তৈরি হওয়া, উদ্বুদ্ধ হওয়া।

قَوْلُهٗ مَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ : এটি পূর্বের বক্তব্যের عِلَّتْ বা কারণ।

قَوْلُهٗ ذِكْرٍ : এখানে مِنْ হরফটি فَاعِلْ-এর উপর অতিরিক্ত এসেছে।

قَوْلُهٗ لَفْظُ الْقُرْاٰنِ : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) لَفْظُ الْقُرْاٰنِ বৃদ্ধি করে এ সংশয় বিদূরিত করেছেন যে, এখানে ذِكْرٌ দ্বারা কুরআন মাজীদ উদ্দেশ্য। আর কুরআন মাজীদ হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং তার বিশেষ সিফত। আর আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তার মতো তাঁর কালামও কাদীম বা অবিনশ্বর। তথাপিও তাঁর কালামকে مُحْدَثٌ কেন বলা হলো?

উত্তর. পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ শব্দাবলির দিক দিয়ে حَادِثٌ এবং স্বীয় মর্ম ও অর্থের দিক দিয়ে قَدِيْم বা অবিনশ্বর।

قَوْلُهٗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا : এখানে اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا বাক্যটি اَسَرُّوْا ফে'লের ضَمِيْر থেকে بَدْل হয়েছে এবং মহল হিসেবে رفع আর اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অংশটি هُمْ উহ্য মুবতাদার খবরও হতে পারে। اَىْ هُمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর যদি عَنٰى উহ্য ধরে নেওয়া হয় তাহলে اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا মহল হিসেবে مَنْصُوْبٌ হবে। اَىْ اَعْنِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

قَوْلُهُ هَلْ هٰذَا الخ : এটি اَلنَّجْوٰى থেকে بَدَل অর্থাৎ ঐসব জালেমদের গোপন কথাবার্তা এই ছিল যে, এ নবী তো আমাদের মতো মানুষ।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ الْقَوْلَ كَائِنًا فِى السَّمَاءِ : আল্লামা মহল্লী (র.) اَلْقَوْلَ -এর পরে كَائِنًا বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ হলো اَلْقَوْلَ থেকে حَالٌ

قَوْلُهُ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ : এটি هٰذَا অথবা هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর। যেমন– আল্লামা মহল্লী (র.) هُوَ উহ্য ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে এটি قَالُوْا -এর مَفْعُوْل بِهٖ হওয়ার কারণে মহল হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

اَضْغَاثٌ শব্দটি ضِغْثٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ঐ বিচ্ছিন্ন এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা যা মানুষ স্বপ্নে দেখতে পায়।

قَوْلُهُ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ : এটি উহ্য شَرْط -এর جَزَاءٌ যা পূর্বাপর থেকে বুঝা যাচ্ছে। اَىْ كَاَنَّهٗ قِيْلَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قُلْنَا بَلْ كَانَ رَسُوْلًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ.

قَوْلُهُ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ : এটি اٰيَةٌ -এর সিফত। اَىْ اِئْتِنَا بِاٰيَةٍ كَائِنَةٍ مِثْلَ الْاٰيَةِ الَّتِىْ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

قَوْلُهُ اَهْلَكْنٰهَا : এটি قَرْيَةٌ -এর সিফত।

قَوْلُهُ لَا : اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ এরপর لا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَفَهُمْ -এর হামযাটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ বা অস্বীকারমূলক হামযা।

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এটি جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ তার جَزَاءٌ হলো فَاسْئَلُوْهُمْ যা উহ্য রয়েছে। তার পূর্বের বাক্য উক্ত جَزَاءٌ টি উহ্য থাকার প্রতি দালালত করে। অর্থাৎ তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের কথার চেয়ে আহলে কিতাবদের কথাকে অধিক সত্য মেনে কর। কেননা আহলে কিতাব ইসলামের দুশমনির ক্ষেত্রে তোমাদের সমপর্যায়ের।

قَوْلُهُ اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ : মূলত বাক্যটি হবে এমন– اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ

قَوْلُهُ جَسَدًا بِمَعْنٰى اَجْسَادًا : جَسَدًا এরপরে بِمَعْنٰى اَجْسَادًا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جَسَدًا একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অর্থগতভাবে এটি বহুবচনের। অথবা তার পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। اَىْ ذَوِىْ جَسَدٍ جَسَدًا কিংবা এ কারণে মানসূব হয়েছে যে, এটি جَعَلْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল। যদি جَعَلَ শব্দটি صَيَّرَ -এর অর্থে হয় তখন উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি خَلَقَ -এর অর্থে হয়, তাহলে جَعَلْنَاهُمْ -এর যমীরে هُمْ থেকে حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূব হবে।

قَوْلُهُ لَا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ : বাহ্যিকভাবে এটি جَسَدًا -এর সিফত। মূলত এতে মুশরিকদের একটি কথার খণ্ডন করা হয়েছে। তা হলো তারা বলত– مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ অর্থাৎ এ কেমন রাসূল যিনি খাবার গ্রহণ করেন!

قَوْلُهُ لَقَدْ اَنْزَلْنَا : لَقَدْ -এর لَامْ টি হলো কসমের অর্থে। اَىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, এর আয়াত সংখ্যা ১১২, রুকু-৭। এ সূরায় সতের জন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাদের তাবলীগের, কিভাবে তারা মানুষকে তাওহীদের জন্যে আহ্বান করেছেন। আর কিভাবে কাফেররা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়ন সবর করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অবশেষে তাদেরকে সফলকাম করেছেন, তাদের শত্রুদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তাওহীদ ও রিসালতের অনেক অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এসবই হলো দীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরাতুল আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) এবং ইবনে মারদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে আদদুরুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৪, পৃ. ৬০৭]

এ সূরার ফজিলত : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল : যার নিদ্রা হয় না, যে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কোনো রোগ চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখিরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখিরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখিরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

قَوْلُهُ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ : অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপক হিসেবে ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ : যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যতো দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গুনাহের ভিত্তি।

قَوْلُهُ مَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ : অর্থাৎ যারা পরকাল ও কবরের আজাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কুরআনের কোনো নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কুরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধূলায় লিপ্ত থাকে, কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কুরআনের আয়াতের সাথেই তারা রং তামাশা করতে থাকে।

قَوْلُهُ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ : অর্থাৎ তারা পরস্পর আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে, এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতোই মানুষ, কোনো ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তাঁর কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোনো কাফের অস্বীকার করতে পারতো না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদের বলতো যে, তোমরা জান যে, এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

قَوْلُهُ بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ : যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে احلام বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ 'অলীক কল্পনা' করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরো অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

قَوْلُهُ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ : অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রাসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। প্রার্থিত মুজেযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ তা'আলার আইন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে আজাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রার্থিক মুজেযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা হয় না।

مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا - শানে নুযূল : ইবনে জারীর (র.) কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট বলেছিল, যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্য হন, তবে সাফা নামক পাহাড়টিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। কাফেরদের এ উক্তির পর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পৌঁছিয়ে দেন, "হে রাসূল! যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার জাতি যা চায়, তা করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ অনতিবিলম্বে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে, কিন্তু এরপরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করা হবে, কোনো প্রকার অবকাশ দেওয়া হবে না। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আপনার জাতিকে অবকাশ দেওয়া হোক এবং তাদেরকে আরো চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হোক, তবে তাও দেওয়া যেতে পারে। এর জবাবে প্রিয়নবী ﷺ বলেন, আমি আমার জাতির জন্যে আরো অবকাশ প্রদানের আরজি পেশ করি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ [যাদের স্মরণ আছে] বলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল; তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গাম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান অর্থ নিলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই ঐ বিষয়টির সাক্ষ্যদাতা।

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি-বিধান জানে না এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলেমদের অনুসরণ করা। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করবে।

قَوْلُهُ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ - কুরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু : কিতাব অর্থ কুরআন এবং জিকির অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে কুরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং শুধু কুরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কুরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

১১. وَكَمْ قَصَمْنَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اَىْ اَهْلِهَا كَانَتْ ظَالِمَةً كَافِرَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ .

১২. فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اَىْ شَعَرَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ بِالْاِهْلَاكِ اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ ط يَهْرُبُوْنَ مُسْرِعِيْنَ فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلَآئِكَةُ اِسْتِهْزَاءً .

১৩. لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْآ اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ نَعِمْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ . شَيْئًا مِنْ دُنْيَاكُمْ عَلَى الْعَادَةِ .

১৪. قَالُوْا يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ . بِالْكُفْرِ .

১৫. فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ الْكَلِمَاتُ دَعْوٰىهُمْ يَدْعُوْنَ بِهَا وَيُرَدِّدُوْنَهَا حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا اَىْ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ بِاَنْ قُتِلُوْا بِالسَّيْفِ خٰمِدِيْنَ . مَيِّتِيْنَ كَخُمُوْدِ النَّارِ اِذَا طُفِئَتْ .

১৬. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ . عَابِثِيْنَ بَلْ دَالِّيْنَ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَنَافِعِيْنَ عِبَادَنَا .

অনুবাদ :

১১. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে যার অধিবাসীরা ছিল জালেম কাফের এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।

১২. যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল অর্থাৎ জনপদবাসীরা যখন ধ্বংসের বিষয়টি বুঝতে পারল। তখনই তারা জনপদ হতে সরে যেতে লাগল দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। ফেরেশতাগণ তাদেরকে উপহাসের স্বরে বললেন–

১৩. তোমরা পলায়ন করো না। ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট তোমাদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে তার নিকট। এবং তোমাদের আবাসস্থলে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। স্বভাবত তোমাদের পার্থিব কোনো বিষয়ে।

১৪. তারা বলল, হায় يَا টা تَنْبِيْه -এর জন্য দুর্ভোগ আমাদের আমাদের ধ্বংস আমরা তো ছিলাম জালিম কুফরির কারণে।

১৫. তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে তারা বারবার এমন আর্তনাদ করতে থাকবে। আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য অর্থাৎ কাঁচি দ্বারা কর্তিত শস্যের ন্যায়। তাদেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হবে। ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করা পর্যন্ত মৃত। নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় যখন তাকে নিভিয়ে ফেলা হয়।

১৬. আকাশ ও পৃথিবী এবং যা তাদের অন্তবর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। অহেতুক বা উদ্দেশ্যহীনভাবে; বরং তা আমার কুদরতের পরিচায়ক এবং আমার বান্দাদের জন্য উপকারী।

অনুবাদ :

١٧. لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا مَا يُلْهٰى بِهٖ مِنْ زَوْجَةٍ اَوْ وَلَدٍ لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ مِنْ عِنْدِنَا مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ ذٰلِكَ لٰكِنَّا لَمْ نَفْعَلْهُ فَلَمْ نُرِدْهُ ـ

১৭. যদি আমি ক্রীড়া গ্রহণের ইচ্ছা করতাম ক্রীড়া-উপকরণ যথা– স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে তবে আমি আমার নিকট যা আছে, তা নিয়ে তা করতাম। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও ফেরেশতা যদি আমার করার প্রয়োজন হতো এসব বিষয়ের। কিন্তু আমি তার প্রয়োজন অনুভব করিনি। তাই তার ইচ্ছাও করিনি।

١٨. بَلْ نَقْذِفُ نَرْمِىْ بِالْحَقِّ الْاِيْمَانِ عَلَى الْبَاطِلِ الْكُفْرِ فَيَدْمَغُهٗ يَذْهَبُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط ذَاهِبٌ وَدَمَغَهٗ فِى الْاَصْلِ اَصَابَ دِمَاغَهٗ بِالضَّرْبِ وَهُوَ مَقْتَلٌ وَلَكُمُ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ الْوَيْلُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ـ اللّٰهَ بِهٖ مِنَ الزَّوْجَهِ اَوِ الْوَلَدِ ـ

১৮. বরং আমি আঘাত হানি নিক্ষেপ করি সত্য দ্বারা ঈমান দ্বারা মিথ্যার উপর কুফরের উপর। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় নিঃশেষ করে দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিলীন হয়ে যায়। دَمَغَهٗ -এর মূল অর্থ হলো– মস্তিষ্কে আঘাত পৌঁছা যা মৃত্যুর কারণ হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে হে মক্কার কাফেররা! দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি। তোমরা যা বলছ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যে তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে।

١٩. وَلَهٗ تَعَالٰى مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مِلْكًا وَمَنْ عِنْدَهٗ اَىِ الْمَلَاۤئِكَةُ مُبْتَدأٌ خَبَرُهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ـ لَا يَعْيَوْنَ ـ

১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা রয়েছে সব তাঁরই মালিকানা সূত্রে। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। এটা মুবতাদা, তার খবর হলো তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তি ও বোধ করে না। থমকে যায় না।

٢٠. يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ـ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهُمْ كَالنَّفْسِ مِنَّا لَا يُشْغِلُنَا عَنْهُ شَاغِلٌ ـ

২০. তারা দিবারাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না তা থেকে। ফেরেশতাদের তাসবীহ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যা কোনো কাজ কর্মে বাধাগ্রস্ত হয় না।

٢١. اَمْ بِمَعْنٰى بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ وَهَمْزَةُ الْاِنْكَارِ اِتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً كَائِنَةً مِنَ الْاَرْضِ كَحَجَرٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ اَهُمْ اَىِ الْاٰلِهَةُ يُنْشِرُوْنَ ـ اَىْ يُحْيُوْنَ الْمَوْتٰى لَا وَلَا يَكُوْنُ اِلٰهًا اِلَّا مَنْ يُّحْيِى الْمَوْتٰى ـ

২১. এখানে اَمْ টি بَلْ অর্থে। কথার ধরন পরিবর্তনের জন্য। হামযাটি অস্বীকারব্যাঞ্জক। তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে যেমন– পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? অর্থাৎ মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পারে কি? না পারে না। আর যে মৃতকে জীবিত করতে পারে না সে ইলাহ হতে পারে না।

অনুবাদ :

٢٢. لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اَىْ اَلسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ اَىْ غَيْرُهُ لَفَسَدَتَا ج خَرَجَتَا عَنْ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهِدِ لِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ بَيْنَهُمْ عَلٰى وُفْقِ الْعَادَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنَ التَّمَانُعِ فِى الشَّىْءِ وَعَدَمِ الْاِتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَسُبْحٰنَ تَنْزِيْهَ اللّٰهِ رَبِّ خَالِقِ الْعَرْشِ الْكُرْسِيِّ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ اَىْ الْكُفَّارُ اللّٰهَ بِهٖ مِنَ الشَّرِيْكِ لَهٗ وَغَيْرِهٖ ـ

২২. যদি থাকত এতদুভয়ের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু ইলাহ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তিনি বিনে অন্য কেউ তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ উভয়টি বর্তমানে যে, সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তা অক্ষুণ্ন থাকত না। তাদের মাঝে স্বভাবগত কলহ দ্বন্দ্ব থাকার কারণে। যেমননি একাধিক শাসন ক্ষমতাধরগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে অনৈক্য ও সংঘর্ষ দেখা যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অতএব আল্লাহ মহান পবিত্র, মুক্ত প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আরশের কুরসীর তারা যা বলে তা হতে অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাঁর অংশীদার থাকার ও অন্যান্য ব্যাপারে।

٢٣. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ـ عَنْ اَفْعَالِهِمْ ـ

২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। তাদের কর্মের ব্যাপারে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ كَمْ قَصَمْنَا : كَمْ হলো خَبَرِيَّةٌ আর مِنْ قَرْيَةٍ হলো كَمْ خَبَرِيَّةٌ -এর অগ্রগামী مَفْعُوْل আর قَصَمْنَا -এর **تَمْيِيْز** . (ض) قَصَمْنَا হলো اَلْقَصْمُ থেকে مَاضِىْ -এর সীগাহ। অর্থ– ভেঙ্গে ফেলা, খণ্ড বিখণ্ড করা। قَرْيَةٌ দ্বারা ইয়ামানের একটি গ্রাম বা জনপদ উদ্দেশ্য। তার নাম ছিল হাজুরা, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ.)-কে নবী বানিয়ে উক্ত জনপদে প্রেরণ করেছিলেন। কেউ কেউ পূর্বের উম্মত তথা– নূহ, লুত ও সালেহ (আ.) প্রমুখ নবীগণের উম্মত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্যযোগ্য।

قَوْلُهٗ كَانَتْ ظَالِمَةً : كَانَتْ ظَالِمَةً এটা قَرْيَةٌ -এর সিফত।

قَوْلُهٗ اَحَسُّوْا : اَىْ اَدْرَكُوْا بِالْحَوَاسِّ অর্থাৎ তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করল।

قَوْلُهٗ اِذَا هُمْ يَرْكُضُوْنَ : এর اِذَا টি مُفَاجَاتِيَّةٌ আর هُمْ হলো مُبْتَدَأٌ এবং يَرْكُضُوْنَ হলো خَبَرٌ - يَرْكُضُوْنَ অর্থ– পায়ের দ্বারা সওয়ারীকে আঘাত করা। এখানে দ্রুত পলায়ন করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ اِسْتِهْزَاءً : এর দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন. ফেরেশতাগণ মিথ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। সুতরাং তারা বাস্তবতার পরিপন্থি কথা বললেন কেন? যে, তোমরা তোমাদের বিলাসসামগ্রী ও ঘরবাড়ির দিকে ফিরে যাও। অথচ ফেরেশতারা জানতেন তাদের কেউ রেহাই পাবে না।

উত্তর. এটা মূলত বিদ্রূপমূলক বলেছিলেন। যেমন অপর জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ তুমি আস্বাদন কর। অবশ্যই তুমি সম্মানিত ও মর্যাদান্বিত হবে।

قَوْلُهُ مَسَاكِنُكُمْ : এর আতফ হলো مَا -এর উপর تِلْكَ الْكَلِمَاتُ দ্বারা তাদের উক্তি يَاوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لَاعِبِيْنَ : এটা خَلَقْنَا -এর ফায়েলের যমীর থেকে حَالٌ

قَوْلُهُ دَعْوَاهُمْ : অর্থাৎ তাদের আহ্বান ও ডাক। مَنَاحِلٌ শব্দটি مَنْحَلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কাঁচি, ফসল কাটার যন্ত্রবিশেষ। حَصِيْدًا শব্দটি মাসদার, مَحْصُوْدٌ অর্থে, কর্তিত ফসল। মাসদার যেহেতু একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে حَصِيْدًا একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ خَامِدِيْنَ : جَعَلْنَاهُمْ -এর هُمْ যমীর থেকে حَالٌ . حَصِيْدًا وَخَامِدِيْنَ উভয়টি মিলিতভাবে এক মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। অতএব এ প্রশ্ন আরোপিত হবে না যে, جَعَلَ শব্দ তিন মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয় না। অথচ এখানে তা হয়েছে। خَامِدِيْنَ এটা خَمَدَتِ النَّارُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ– অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যাওয়া। এ থেকে خَمَدَتُ الْحُمّٰى নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ জ্বরের তীব্রতা কমে যাওয়া। আর خَمَدَتِ النَّارُ ঐ সময় বলা হয়, তখন আগুন একেবারে নিভে ছাই হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَاعِبِيْنَ : مَا خَلَقْنَا -এর মধ্যে নফী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لَاعِبِيْنَ শব্দটি। কেননা نَفِىْ যখন مُقَيَّدٌ -এর উপর প্রবিষ্ট হয় তখন قَيْد -এর نَفِىْ উদ্দেশ্য হয়। কাজেই مَا خَلَقْنَا দ্বারা সৃষ্টির نَفِىْ উদ্দেশ্য নয়; বরং لَاعِبِيْنَ তথা অহেতুক সৃষ্টি -এর نَفِىْ করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا : এখানে لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا -এর জবাব। কায়দা আছে যে, تَالِىْ -এর نَقِيْض -এর اِسْتِثْنَاءٌ টি مُقَدَّمٌ -এর نَقِيْض -এর نَتِيْجَةٌ বা ফলাফল দান করে। অতএব বাক্যটি এমন হবে–

لَوْ تَعَلَّقَتْ اِرَادَتُنَا بِاتِّخَاذِ اللَّهْوِ لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا لٰكِنَّا لَمْ نَتَّخِذْهُ فَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ اِرَادَتُنَا .

قَوْلُهُ اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ : اِنْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর جَوَابُ شَرْط লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ اَرَدْنَاهُ ব্যাখ্যাকার (র.) لٰكِنَّا لَمْ نَفْعَلْهُ দ্বারা نَقِيْضُ تَالِىْ -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর فَلَمْ يُرِدْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ شَرْطِيَّةٌ আবার قَوْلُهُ اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ -এর মধ্যে اِنْ نَافِيَةٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ مَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ

قَوْلُهُ مِمَّا تَصِفُوْنَ : ব্যাখ্যাকার (র.) بِهِ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِمَّا -এর مَا مَوْصُوْلَهْ আর يَصِفُوْنَ বাক্য হয়ে তার صِلَةٌ এখানে عَائِدْ লুপ্ত রয়েছে। আবার مَا مَصْدَرِيَّةٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ وَلَكُمْ وَيْلٌ مِنْ اَجَلِ

قَوْلُهُ وَصْفُكُمْ اِيَّاهُ بِمَا لَا يَلِيْقُ : مِمَّا تَصِفُوْنَ এটা اِسْتِقْرَاءٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ اِسْتَقَرَّ لَكُمْ الْوَيْلُ مِنْ اَجَلِ مَا يَتَّصِفُوْنَ اللّٰهَ بِهِ مِمَّا لَا يَلِيْقُ بِعِزَّتِهِ

قَوْلُهُ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : এটা جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ . مُنْفِىْ তারা ক্লান্ত হয় না।

قَوْلُهُ لَا يَفْتُرُوْنَ (ن) : অর্থ– তারা অলসতা করে না। ব্যাখ্যাকার (র.) اِتَّخَذُوْا اٰلِهَةً كَائِنَةً مِنَ الْاَرْضِ এ كَائِنَةٌ مِنْ الْاَرْضِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنَ الْاَرْضِ এটা كَائِنَةٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে اٰلِهَةٌ -এর صِفَتٌ হয়েছে। অথবা اِتَّخَذُوْا -এর দ্বিতীয় মাফউলও হতে পারে। আবার مِنَ الْاَرْضِ টা اِتَّخَذُوْا -এর مُتَعَلِّقٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا : لَوْ হলো হরফে শর্ত। আর كَانَ হলো تَامَّةٌ এটা শর্ত اٰلِهَةٌ হলো এর ফায়েল এবং فِيْهِمَا مُتَعَلِّقٌ হয়েছে كَانَ -এর সাথে। اِلَّا এখানে غَيْر অর্থে اٰلِهَةٌ -এর সিফত। এর اِعْرَابٌ পরবর্তীতে শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। لَفَسَدَتَا হলো جَوَابُ شَرْط শর্তের ফে'লকে مُقَدَّمٌ এবং جَوَابُ شَرْط -কে تَالِىْ বলা হয়। تَالِىْ -এর نَقِيْض -এর اِسْتِثْنَاءٌ টা مُقَدَّمٌ -এর نَقِيْض -এর نَتِيْجَةٌ বা ফল দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, وَلٰكِنْ هُمَا لَمْ يُفْسِدَا فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا اٰلِهَة غَيْر اللّٰهِ .

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ : কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মীশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুয়াইব বলা হয়েছে। শুয়াইব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শুয়াইব (আ.) নন, অন্য কেউ। তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন- ফিলিস্তীনে বনী ইসরাঈল বিপদগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কুরআন কোনো বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামেনের উপরিউক্ত জনপদও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বহু জালেম সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং এরপর তাদের স্থলে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি। আলোচ্য আয়াতে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ অর্থাৎ যখন ঐ দুরাত্মা কাফেররা আল্লাহ তা'আলার আজাবের আভাস পায়, এমনকি আজাবকে স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন আত্মরক্ষার নিমিত্তে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ : অর্থাৎ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না এবং বুঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি?

لَاعِبِيْنَ শব্দটি لَعْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে لَعْبٌ বলা হয়। -[রাগিব]

যে কাজের পেছনে কোনো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لَهْوٌ বলা হয়। ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাওহীদকে অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যাবে সৃষ্টজগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

قَوْلُهُ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ : অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোনো কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবি ভাষায় لَوْ শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لَوْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা ঊর্ধ্বজগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোনো কাজ কোনো ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক ঊর্ধ্বে।

لَهْوٌ শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরিউক্ত তাফসীর করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, لَهْوٌ শব্দটি কোনো সময় স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ : قَذْفٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يَدْمَغُ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زَاهِقٌ-এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টজগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ ফেরেশতা] তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক. কারো ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থি মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। **দুই.** ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা। কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীভানে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোনো সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাতদিন তাসবীহ পাঠ করে এবং কোনো সময় অলসতা করে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন, আমি কা'বে আহবারকে প্রশ্ন করলাম, তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোনো কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তাসবীহ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কোনো কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দুটি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোনো কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। –[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ اَمِ اتَّخَذُوْا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ : এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যথা– ১. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য নির্ধারণ করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য নির্ধারণ করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও নগণ্য। ২. যাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করেছে, তারা কি তাদেরকে কোনো সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। অথচ সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরি।

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ : এটা তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই আল্লাহ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সে নির্দেশ দেবে এবং একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই আল্লাহর নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ চাইবেন যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ চাইবেন এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবেন বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবেন বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়ে পরামর্শের অধীনে হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরি হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থি।

২৪. أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ تَعَالٰى اَىْ سِوَاهُ اٰلِهَةً ط فِيْهِ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ج عَلٰى ذٰلِكَ وَلَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ اَىْ اُمَّتِىْ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ط مِنَ الْاُمَمِ وَهُوَ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ لَيْسَ فِىْ وَاحِدٍ مِنْهَا اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا مِمَّا قَالُوْا تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ اَىْ تَوْحِيْدَ اللّٰهِ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - عَنِ النَّظَرِ الْمُوْصِلِ اِلَيْهِ -

অনুবাদ :

২৪. তাঁরা কি তাকে ব্যতীত বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? এখানে اِسْتِفْهَامُ তথা প্রশ্নটা ধমকিস্বরূপ। আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এ বিষয়ে। অথচ এ ব্যাপারে তারা অপারগ। এটাই আমার সঙ্গে যারা আছেন তাদের জন্য উপদেশ। অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য। আর উক্ত উপদেশ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। বিভিন্ন উম্মত। তা হলো তাওরাত, ইঞ্জীল ও আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য কিতাব। এগুলোর কোনোটিতেই এ কথা নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে। যেমনটি তারা বলে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এর থেকে ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ একত্ববাদ সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার প্রতি সত্যে উপনীতকারী প্রমাণ থেকে।

২৫. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا يُوْحٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ - اَىْ وَحِّدُوْنِىْ -

২৫. আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি এবং তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, অন্য কেরাতে يُوْحٰى শব্দটি প্রথমে نُوْن ও حَاءْ-এর নিচে যেরসহ نُوْحِىْ পঠিত রয়েছে। আমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। অর্থাৎ আমার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।

২৬. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ هُمْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لا عِنْدَهٗ وَالْعُبُوْدِيَّةُ تُنَافِى الْوِلَادَةَ -

২৬. তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। ফেরেশতাদের থেকে। তিনি পবিত্র মহান; বরং তারা তো সম্মানিত বান্দা। তাঁর নিকট। আর দাসত্ব জন্মদানের পরিপন্থি।

২৭. لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ لَا يَأْتُوْنَ بِقَوْلِهِمْ اِلَّا بَعْدَ قَوْلِهٖ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ - اَىْ بَعْدَهٗ -

২৭. তারা আগে বেড়ে কথা বলে না। আল্লাহ তা'আলা কথা বলার পরেই তারা কথা বলে। তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের পরে।

২৮. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اَىْ مَا عَمِلُوْا وَمَا هُمْ عَامِلُوْنَ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى تَعَالٰى اَنْ يَّشْفَعَ لَهٗ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ تَعَالٰى مُشْفِقُوْنَ - اَىْ خَائِفُوْنَ -

২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত অর্থাৎ তারা যা আমল করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে। তারা তো কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ। যে, তাদের জন্য সুপারিশ করা হোক। আর তারা তাঁর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। অর্থাৎ শঙ্কিত।

অনুবাদ :

২৯. وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ اَىِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَهُوَ اِبْلِيْسُ دَعَا اِلٰى عِبَادَةِ نَفْسِهٖ وَاَمَرَ بِطَاعَتِهَا فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ كَمَا نَجْزِيْهِ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ـ اَىِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে, আমি ইলাহ তিনি ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া। আর সে হলো ইবলিস। সে তার উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম। এভাবেই যেভাবে আমি তাকে প্রতিফল দিব জালেমদেরকেও প্রতিফল দিব। অর্থাৎ মুশরিকদেরকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ : اَمْ অব্যয়টি اِسْتِفْهَامْ تَوْبِيْخِىْ তথা হুমকিস্বরূপ জিজ্ঞাসার জন্য। এটা بَلْ অর্থে এবং এক বিষয়বস্তু থেকে অপর বিষয়বস্তুর প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য। অর্থাৎ একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব না থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে একাধিক উপাস্য অবলম্বন করা ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন।

قَوْلُهٗ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ : এখানে هٰذَا হলো মুবতাদা। এর দ্বারা আসমানি কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য। এর দুটি খবর উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ : এটা পূর্বের বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ قَالُوْا : এর ضَمِيْر فَاعِلِىْ আরবের কতিপয় দলের প্রতি ফিরেছে। যারা ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কন্যা হওয়ার প্রবক্তা ছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, খুজাআ, জোহাইনা, বনু সালামা ও বনু মালীহ গোত্র।

قَوْلُهٗ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ : ফেরেশতাদের এ উক্তি মূলত অনুমানমূলক বা মেনে নেওয়া স্বরূপ। অন্যথায় ফেরেশতাদের মধ্যে নাফরমানির কোনো যোগ্যতাই নেই। আর যদি يَقُلْ-এর فَاعِلْ ইবলীসকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অসুবিধা সৃষ্টি হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, ইবলীস কখনো উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি; বরং সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক উপাসনাকারী ছিল। তবে সে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়েছিল। وَاَمَرَ بِطَاعَتِهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেন তাঁর কথা না মানে এবং তাওহীদের বিশ্বাসী না হয়ে মূর্তিপূজা অবলম্বন করে। এটাই ছিল তার নিজের উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করা।

قَوْلُهٗ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ : এখানে ذٰلِكَ মুবতাদা হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর نَجْزِيْهِ হলো তার খবর। পূর্ণ বাক্যটি শর্তের জবাব হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَجْزُوْمٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ : এর এক অর্থ হলো- ذِكْرُ مَنْ مَعِىَ বলে কুরআন এবং ذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ বলে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কুরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিতাবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তাওরাত ও ইঞ্জীল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কুরআন আমার সঙ্গীদের জন্যও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলি ব্যাখ্যার দিক দিয়ে এই কুরআন উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এদিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজ কারবার ও কিসসা কাহিনী সংরক্ষিত আছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতেও তাওহীদেরই বিবরণ রয়েছে এভাবে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন তারা সকলেই তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। সকল নবী রাসূলের একই কথা, তা হলো নিরঙ্কুশ তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে– হে রাসূল! ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী প্রেরিত হয়েছে সকলের নিকট আমি এ প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর। যেমন অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ আর আমি প্রত্যেক উম্মতেই আমার রাসূল প্রেরণ করেছি, যারা মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করেছে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী কর। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ১৭, পৃ. ৮]

قَوْلُهُ وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ الخ : শানে নুযূল : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে খাজাআ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, শুধু খাজাআ গোত্রই নয়, বরং এতে রয়েছে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ। কেননা খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র মনে করতো। [নাউযুবিল্লাহ]। আর ইহুদিরা হযরত উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো [নাউজুবিল্লাহ]। আর মুশরিকদের আকীদা ছিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। [নাউজুবিল্লাহ]

আলোচ্য আয়াতে এসব বাতিল এবং ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

অর্থাৎ পাপীষ্ঠরা বলে, "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন"। তিনি পবিত্র, মহান তাঁর শান সন্তান-সন্ততি গ্রহণের দুর্বলতা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর সম্পর্কে এমন কথা ভাবাও মহা পাপ। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তার অনুগত বান্দা, তাঁর গোলাম। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে مُكْرَمُوْنَ অর্থ مُقَرَّبُوْنَ عِنْدَهُ تَعَالٰى অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যধন্য বান্দা।

قَوْلُهُ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোনো কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনো কোনো কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরো জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থি।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ : এখানে مَنْ দ্বারা যদি ফেরেশতাদের একক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ তথা মেনে নেওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে হবে তার বাস্তবায়ন জরুরি নয়। অর্থাৎ মেনে নেওয়া স্বরূপ যদি ফেরেশতারা এরূপ কথা বলে তাহলে আমি তাদেরকেও দোজখের সাজা দিব। তবে এখানে ইবলিস উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল। তবে এ সময় প্রশ্ন জাগে যে, ইবলিস তো কখনো মা'বূদ বা উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি এবং তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানায়নি। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি যে, ইবলিস লোকদেরকে তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, তা কিভাবে যথার্থ হয়?

এর উত্তর এই যে, এখানে তার নিজের ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার অনুসরণ ও কথা মানার প্রতি আহ্বান জানানো। এটাই শয়তানের ইবাদত বলে অবহিত হয়েছে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে বলেছিলেন يَآ اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ অর্থাৎ আব্বাজান! তুমি শয়তানের ইবাদত করো না। অথচ আজর শয়তানের ইবাদত করতো না; বরং শয়তানের কথা ও প্ররোচনায় মূর্তিপূজা করত। চিন্তাভাবনাহীন শয়তানের কথা মেনে নেওয়াকে তার ইবাদত বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٣٠. اَوَلَمْ بِوَاوٍ وَتَرْكِهَا يَرَ يَعْلَمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا اَىْ سَدًّا بِمَعْنٰى مَسْدُوْدَةً فَفَتَقْنٰهُمَا ط اَىْ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَبْعًا وَالْاَرْضَ سَبْعًا اَوْ فَتْقُ السَّمَاءِ اَنْ كَانَتْ لَا تَمْطُرُ فَاَمْطَرَتْ وَفَتْقُ الْاَرْضِ اَنْ كَانَتْ لَا تُنْبِتُ فَاَنْبَتَتْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ النَّابِعِ مِنَ الْاَرْضِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط نَبَاتٍ وَغَيْرِهِ فَالْمَاءُ سَبَبٌ لِحَيٰوتِهِ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ - بِتَوْحِيْدِىْ -

৩০. اَوَلَمْ শব্দটি وَاوْ ছাড়া এবং وَاوْ -সহ উভয় কেরাত জায়েজ আছে। তারা কি ভেবে দেখে না? জানে না যারা কুফরি করে, যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল। ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীকে সাতটি এবং পৃথিবীকে সাতটি স্তর বানালাম। অথবা আকাশকে পৃথক করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা বৃষ্টিপাতহীন ছিল এখন তা বৃষ্টি বর্ষণকারী হয়েছে। আর পৃথিবীকে পৃথক করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা উৎপাদনহীন ছিল এখন তা উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। আর পানি হতে সৃষ্টি করলাম আকাশ থেকে বর্ষিত হয় কিংবা মাটি থেকে উৎসারিত হয়। প্রাণবান সমস্ত কিছু তরুলতা উদ্ভিদ ইত্যাদি। অর্থাৎ পানিই হলো সকল বস্তুর জীবন ধারণের উৎস। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না। আমার একত্ববাদের উপর।

٣١. وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ لِ اَنْ لَّا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا اَىِ الرَّوَاسِىْ فِجَاجًا مَسَالِكَ سُبُلًا بَدْلٌ اَىْ طُرُقًا نَافِذَةً وَاسِعَةً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ - اِلٰى مَقَاصِدِهِمْ فِى الْاَسْفَارِ -

৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। নড়াচড়া না করে। এখানে اَنْ لَّا تَمِيْدَ -এর পূর্বে একটি لِ উহ্য রয়েছে। এ ফে'লটি اَنْ -এর কারণে মাসদারের অর্থে হয়েছে। আমি করে দিয়েছি তাতে পাহাড়ে প্রশস্ত পথ গিরিপথ। سُبُلًا শব্দটি فِجَاجًا -এর بدل হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ও বিস্তৃত বিভিন্ন পথ। যাতে তারা পথ পায়। অর্থাৎ সফরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

٣٢. وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا لِلْاَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ مَحْفُوْظًا ج عَنِ الْوُقُوْعِ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ مُعْرِضُوْنَ - لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ خَالِقَهَا لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

৩২. এবং আকাশকে করেছি ছাদ পৃথিবীর জন্য যেমন ঘরের জন্য ছাদ যা সুরক্ষিত পতিত হওয়া থেকে। কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলি হতে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এতে তারা চিন্তা গবেষণা করে না। ফলে তারা জানত যে, এর সৃষ্টিকর্তা তিনিই, যাঁর কোনো অংশীদার নেই।

অনুবাদ :

٣٣. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتَابِعِهِ وَهُوَ النُّجُوْمُ فِىْ فَلَكٍ اَىْ مُسْتَدِيْرٍ كَالطَّاحُوْنَةِ فِى السَّمَاءِ يَّسْبَحُوْنَ ـ يَسِيْرُوْنَ بِسُرْعَةٍ كَالسَّابِحِ فِى الْمَاءِ وَلِلتَّشْبِيْهِ بِهِ اَتٰى بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنْ يَعْقِلُ ـ

৩৩. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই كُلٌّ -এর تَنْوِيْن টি হলো تَنْوِيْن عِوَضْ যা মুজাফ ইলাইহি -এর পরিবর্তে এসেছে। আর তা হলো পূর্বোক্ত اَلْقَمَرُ ـ اَلشَّمْسُ এবং তৎপরবর্তী তথা اَلنُّجُوْمُ নিজ নিজ কক্ষপথে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃত্তে বা চক্রে যাঁতার ন্যায় আকাশে বিচরণ করে দ্রুত বেগে পরিভ্রমণ করে। পানিতে সন্তরণের ন্যায়। সাতারুর সাথে তুলনা করার কারণেই يَسْبَحُوْنَ -কে وَاو যোগে বহুবচন আনা হয়েছে।

٣٤. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ اَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوْتُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط اَىْ اَلْبَقَاءَ فِى الدُّنْيَا اَفَاِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ـ فِيْهَا ؟ لَا ـ فَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ ـ

৩৪. কাফেররা যখন বলল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ অচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন। তখন অবতীর্ণ হলো– আমি আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করিনি। আপনি মৃত্যুবরণ করলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে পৃথিবীতে। না তারা চিরজীবি হয়ে থাকবে না। শেষ বাক্যটি তথা فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ বাক্যটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ তথা অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসার পর্যায়ে।

٣٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط فِى الدُّنْيَا وَنَبْلُوْكُمْ نَخْتَبِرُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ كَفَقْرٍ وَغِنًى وَسَقَمٍ وَصِحَّةٍ فِتْنَةً ط مَفْعُوْلٌ لَهُ اَىْ لِنَنْظُرَ اَتَصْبِرُوْنَ وَتَشْكُرُوْنَ اَوْ لَا وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ ـ

৩৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে পৃথিবীত আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। যাচাই বাছাই করে থাকি। ভালো ও মন্দ দ্বারা যেমন দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, অসুস্থতা, সুস্থতা। পরীক্ষা স্বরূপ فِتْنَةً শব্দটি نَبْلُوْ -এর مَفْعُوْل لَهٗ অর্থাৎ এটা প্রত্যক্ষ করার জন্য যে, তোমরা কি ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, নাকি কর না। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দিবেন।

٣٦. وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ مَا يَتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَىْ مَهْزُوًّا بِهِ يَقُوْلُوْنَ اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج اَىْ يَعِيْبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ لَهُمْ هُمْ تَاكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ ـ بِهِ اِذْ قَالُوْا مَا نَعْرِفُهُ ـ

৩৬. কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে অর্থাৎ আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানায় এবং তারা পরস্পর বলে এই কি সেই? যে তোমাদের দেব -দেবীগুলোর সমালোচনা করে। অর্থাৎ কটূক্তি করে। অথচ এরাই তো রহমানের আলোচনার বিরোধিতা করে। তারা বলে আমরা রহমানকে চিনি না।

অনুবাদ :

٣٧. وَنَزَلَ فِى اِسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ - خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط اَىْ اَنَّهُ لِكَثْرَةِ عَجَلِهِ فِىْ اَحْوَالِهِ كَاَنَّهُ خُلِقَ مِنْهُ سَاُرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ مَوَاعِيْدِىْ بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ - فِيْهِ فَاَرَاهُمُ الْقَتْلَ بِبَدْرٍ -

৩৭. তাদের দ্রুত শাস্তি বাস্তবায়ন কামনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়– মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষ নিজেদের ব্যাপারে দ্রুততা পছন্দের কারণে যেন দ্রুততা দ্বারাই সৃজিত হয়েছে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। আজাব প্রসঙ্গে আমার কৃত অঙ্গীকারাবলি। সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না। সে ব্যাপারে বস্তুত বদর ময়দানে তাদেরকে হত্যার শাস্তি দেখানো হয়েছে।

٣٨. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فِيْهِ -

৩৮. তারা বলে, বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? কিয়ামত প্রসঙ্গে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এ ব্যাপারে।

٣٩. قَالَ تَعَالٰى لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ يَدْفَعُوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ - يُمْنَعُوْنَ مِنْهَا فِى الْقِيٰمَةِ وَجَوَابُ لَوْ مَا قَالُوْا ذٰلِكَ -

৩৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন– হায় যদি কাফেররা সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা প্রতিরোধ করতে বাধা দিতে পারবে না তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। কিয়ামতে তাদের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে না। এখানে لَوْ-এর জবাব হলো مَا قَالُوْا ذٰلِكَ

٤٠. بَلْ تَأْتِيْهِمُ الْقِيٰمَةُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ تُحَيِّرُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ - يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ اَوْ مَعْذِرَةٍ -

৪০. বস্তুত তা তাদের উপর আসবে। কিয়ামত অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে হতবিহ্বল করে ফেলবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। তাদেরক তওবা করার অথবা ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

٤١. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ - وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْقُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ -

৪১. আপনার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। এতে রাসূল ﷺ -এর সান্ত্বনা রয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তা হলো শাস্তি। সুতরাং তাদেরকেও আজাব স্বরূপ বেষ্টন করে নিবে। যারা আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَ : এখানে হামযাটি বিলুপ্ত فِعْل -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে এবং وَاوْ -এর মাধ্যমে يَرَ -এর আতফ হয়েছে বিলুপ্ত ক্রিয়ার উপর। বাক্যটি এরূপ হবে– اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا وَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

كَانَتَا হলো تَثْنِيَةْ -এর সীগাহ। অথচ এর যমীরটি سَمٰوٰتْ وَالْاَرْضْ -এর প্রতি ফিরেছে, আর এটা বহুবচন। সুতরাং مَرْجِعْ এবং ضَمِيْر -এর মধ্যে সামঞ্জস্য হলো না।

উত্তর. এখানে দুই শ্রেণি বা দুই জাতি উদ্দেশ্য। কেননা আসমান এক শ্রেণির বস্তু এবং পৃথিবী ভিন্ন শ্রেণির বস্তু। رُؤْيَتَهُ দ্বারা আত্মিক দর্শন উদ্দেশ্য। শব্দটি وَاوْ যোগে এবং وَاوْ বিহীন উভয়রূপে পঠিত আছে।

قَوْلُهُ رَتْقًا : এটা كَانَتَا -এর খবর। মাসদার হওয়ার কারণে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা মুবালাগা স্বরূপ এর প্রয়োগ বৈধ হতে পারে আবার মুযাফ উহ্য মেনেও প্রয়োগ বৈধ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ذَا رَتْقٍ اَىْ كَانَتَا شَيْئًا وَاحِدًا ব্যাখ্যাকার (র.) بِمَعْنٰى مَسْدُوْدَةٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখানে مَفْعُوْل অর্থে। আর رَتْقًا (ن) এটা মাসদার। অর্থ– মুখ বন্ধ হওয়া, মিলিত হওয়া। এখানে মাসদারটি اِسْمُ مَفْعُوْل অথবা اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে। فَتْقًا (ن - ض) অর্থ– বিদীর্ণ করা, বিচ্ছিন্ন করা, পৃথক করা।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : جَعَلَ ক্রিয়াটি যদি صَيَّرَ অর্থে হয় তাহলে এটা দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে এবং جَارْ مَجْرُوْرْ তার مُتَعَلِّقْ উহ্য نَاشِيًا অথবা مُتَسَبِّبًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অগ্রগামী দ্বিতীয় مَفْعُوْل হবে। আর كُلَّ شَيْءٍ প্রথম مَفْعُوْل হবে। বাক্যটি এরূপ হবে– وَجَعَلْنَا نَاشِيًا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ আর যদি خَلَقَ অর্থে হয়, তাহলে مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل হবে। আর তা হলো– كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ আর مِنَ الْمَاءِ এটা جَارْ ও مَجْرُوْرْ মিলে مُتَعَلِّقْ হবে جَعَلْنَا -এর সাথে।

قَوْلُهُ رَوَاسِىَ : এটা رَاسِيَةٌ অথবা رَاسِىْ -এর বহুবচন। অর্থ দৃঢ় মজবুত। مُخْتَارْ গ্রন্থে আছে যে, কোনো অবস্থিত পাহাড়কে رَاسِيَةٌ বলা হয়। এটা رَسَا الشَّيْءُ থেকে গৃহীত। যখন বস্তুটি দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকার (র.) لَا উহ্য মেনেছেন এ কারণে, যাতে اَنْ تَمِيْدَ بِهَا -এর ইল্লত বা কারণ হওয়া শুদ্ধ হয়। কেননা পাহাড়ের সৃষ্টিই হলো নড়াচড়া না করার জন্য; নড়াচড়ার জন্য নয়। فِجَاجًا অর্থ– দুই পাহাড়ের মধ্যকার প্রশস্ত রাস্তা। فِجَاجٌ -এর একবচন হলো فَجٌّ যেমন سِهَامٌ -এর একবচন আসে سَهْمٌ

قَوْلُهُ وَلِلتَّشْبِيْهِ بِهِ اَتٰى بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنْ يَعْقِلُ : এ পূর্ণ বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন. يَسْبَحُوْنَ -এর فَاعِلْ হলো সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি। আর এসবগুলো নির্জীব বস্তু। কাজেই جَمْعُ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর নয়। কেননা ون বোধশক্তি সম্পন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর. যেহেতু شَمْس وَقَمَر তথা সূর্য-চন্দ্রের প্রতি يُسَبِّحُوْنَ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে, আর سَبَحَ অর্থ– সন্তরণ করা বা সাঁতার কাটা। অতএব, এটা বোধসম্পন্ন বস্তুর ক্রিয়া। এ সম্বন্ধের দরুন ون দ্বারা বহুবচন উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন. عَدَمُ الْخُلْدِ তথা চিরস্থায়ী না হওয়া অর্থ মানুষের সাথে সীমিত করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য প্রাণী বিশ্বের কোনো বস্তুর জন্য দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ নেই; বরং সবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং মানুষের জন্য বিশেষিত করা হলো কেন?

উত্তর. তাদের প্রশ্ন ছিল মহানবী ﷺ -এর জন্য মানুষ হিসেবে মৃত্যুর সম্ভাবনার উপরে ভিত্তি করে।

قَوْلُهُ فَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ : এ বাক্য দ্বারাও একটি প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে।

প্রশ্ন. প্রশ্নবোধক হামযাটি فَإِنْ مُتَّ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, যা মহানবী ﷺ -এর মৃত্যু এবং তার চিরস্থায়ী হওয়ারও অস্বীকার বুঝায়। অথচ এখানে কেবল চিরস্থায়ী হওয়াকেই অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

উত্তর. প্রশ্নবোধক হামযাটি মূলত শেষ বাক্যের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, তবে এটা যেহেতু বাক্যের সূচনা কামনা করে, এ কারণেই তাকে বাক্যের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় বাক্যটি এমন ছিল- أَفَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ إِنْ مِتَّ

قَوْلُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : এখানে نَفْس দ্বারা نَفْس نَاطِقَةٌ তথা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী এবং مَوْت দ্বারা জীবনশক্তি তিরোহিত হওয়া এবং দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য এবং ذَائِقَةٌ দ্বারা এখানে إِدْرَاكٌ بِالْقُوَّةِ الذَّائِقَةِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণযোগ্য বস্তুর অন্তর্গত নয়; বরং এখানে স্বাভাবিক উপলব্ধি উদ্দেশ্য। আর উপলব্ধি করার দ্বারাও মৃত্যুর প্রাথমিক পরিস্থিতিসমূহ যেমন- কষ্ট-যাতনা ইত্যাদি অনুভব করা উদ্দেশ্য। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ শরীরে মৃত্যুর প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সম্ভব নয়, আর তখন মানুষ মরে যায়। কাজেই তখন উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না।

قَوْلُهُ فِتْنَةً : এটা مَنْصُوْب হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে- ১. نَبْلُوْكُمْ -এর مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে। ২. حَالْ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ نَبْلُوكُمْ فَاتِنِيْنَ ৩. ভিন্ন শব্দ দ্বারা مَفْعُوْل مُطْلَقْ হওয়ার কারণে। কেননা نَبْلُوْ -এর সাথে مَصْدَرْ এবং فِتْنَةً উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ বাক্যের আতফ হলো পূর্বের وَأَسَرُّوا النَّجْوٰى -এর উপর এবং এটি শর্ত আর إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا হলো এর جَزَاءْ ; جَزَا -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য রয়েছে। أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ হলো شَرْط ও جَزَاءْ -এর মধ্যে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ আর هُزُوًا মাসদারটি مَفْعُوْل অর্থে।

قَوْلُهُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُوْنَ : এর প্রথম هُمْ মুবতাদা। আর দ্বিতীয়টি তার তাকীদস্বরূপ। كَافِرُوْنَ হলো খবর। بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ এটা সংশ্লিষ্ট হয়েছে كَافِرُوْنَ -এর সাথে। বাক্যটি এরূপ ছিল- هُمْ كَافِرُوْنَ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ ; ব্যাখ্যাকার (র.) لَهُمْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ الخ এটা حَالِيَةٌ বাক্য হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَنْصُوْب ; ذِكْرٌ ইজাফত رَحْمٰنٌ -এর প্রতি। এটা اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ -এর অন্তর্গত। কেউ কেউ مَفْعُوْل -এর প্রতি ইজাফত বলেছেন। তখন বাক্য হবে وَذِكْرُهُمُ الرَّحْمٰنَ بِالتَّوْحِيْدِ

قَوْلُهُ خُلِقَ مِنْ عَجَلٍ : এটা خَلَقَ مِنْ طِيْنٍ বাক্যের ন্যায়। প্রত্যেক মানুষ যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক কাজে তাড়াহুড়া করে, তাই বলা হয়েছে তাড়াহুড়ার উপাদান থেকেই যেন মানুষ সৃজিত।

قَوْلُهُ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ : এখানে لَوْ হলো শর্তজ্ঞাপক। এর জবাব লুপ্ত রয়েছে। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ لَوْ يَعْلَمُ مَا قَالُوْا ذٰلِكَ (اَيْ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ)

قَوْلُهُ حِيْنَ يَعْلَمُ : এটা মাফউলেবিহী। অর্থ- এ কাফেররা যদি ঐ সময়কে জেনে নেয় যে, যখন তারা এ শাস্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

قَوْلُهُ مَا كَانُوْا بِهٖ : এটা خَاقَ -এর فَاعِلْ আর هُوَ الْعَذَابُ -এর মধ্যকার هُوَ -এর مَرْجِعْ হলো مَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের একত্ববাদের এবং তার সর্বময় ক্ষমতার কয়েকটি দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الخ - শানে নুযূল : ইবনুল মুনজির ইবনে জুরায়েজের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত করানো হয়, তখন প্রিয়নবী ﷺ আরজ করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পরে আমার উম্মতের দিকে কে লক্ষ্য রাখবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করিনি।" সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا - শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ জেহেল এবং আবূ সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। আবূ জেহেল তাঁকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসলো এবং আবূ সুফিয়ানকে বলল, ইনি হলেন বনী আবদে মানাফের নবী। আবূ জেহেলের এ বিদ্রূপাত্মক কথা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ান রাগান্বিত হলো এবং বলল, বনী আবদে মানাফে নবী হওয়া তোমার এত অপছন্দ কেন? হুজুর ﷺ এ কথাগুলো শ্রবণ করলেন এবং আবূ জেহেলকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ করলেন, "মনে হয় তুমি সে পর্যন্ত বিরত হবে না, যে পর্যন্ত তোমার উপর দিয়ে সেই বিপদ আপতিত না হয় যা তোমার পিতৃব্যের উপর আপতিত হয়েছিল। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا : এখানে رُؤْيَتٌ [দেখা] অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

قَوْلُهُ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا : رَتْقٌ শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فَتْقٌ -এর অর্থ খুলে দেওয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رَتْقٌ ও فَتْقٌ কোনো কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া ও খুলে দেওয়ার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ তাফসীরবিদগণ যে উক্তি গ্রহণ করেছেন তা হলো- বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেওয়ার অর্থ হলো এতদুভয়কে খুলে দেওয়া।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَتْقًا বলে কি বুঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করতো না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হতো না। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তাফসীর নিয়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাফসীর শুনে বললেন, এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কুরআনের বুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি رَتْقٌ ও فَتْقٌ -এর নির্ভুল তাফসীর করেছেন।

রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনজির, আবূ নু'আঈম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন।

ইবনে আতিয়া আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, এই তাফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তাওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ বলা হয়েছে এর সাথে উপরিউক্ত তাফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে ইকরিমার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ; ইমাম তাবারী (র.)-ও এই তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলা বাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাছীর (র.) ইমাম আহমদ (র.)-এর সনদ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন! জবাবে তিনি বললেন, "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে" এরপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, "আমাকে এমন কাজ বলে দিন যা করে আমি জান্নাতে পৌঁছে যাই। তিনি বললেন- اَفْشِ السَّلَامَ وَاَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْاَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
অর্থাৎ ব্যাপক হারে সালাম কর। [যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়] আহার করাও [হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফের ফাসেক প্রত্যেককে আহার করালেও ছওয়াব পাওয়া যাবে।] আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়। এরূপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ : আরবি ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে مَيْد বলা হয়। আয়াতের এই অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি? এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে সূরা নামলের তাফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ : প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فَلَكٌ বলা হয়। এ কারণেই সুতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فَلْكَةُ الْمِغْزَلِ বলা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

এবং এ কারণেই আকাশকে فَلَكٌ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বুঝানো হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরো জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আ.) অথবা হযরত উজায়ের (আ.) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্রুত মৃত্যু কামনা করত। যেমন কোনো কোনো আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ [আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি।] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দুটি জবাব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না। তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেননি? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাদের নবুয়তের ও রিসালাতের কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধ অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তার শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারো মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে- اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست * کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

অর্থাৎ শত্রু মারা গেলে খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের জীবনও অমর নয়।

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نَفْس বলে পৃথিবীর জীব বুঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের মৃত্যু হবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। -[রূহুল মা'আনী]

আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল প্রাণবিশিষ্ট সুক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যিম (র.) আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং আনন্দ প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা মৃত্যুর যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। কারণ কোনো বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে- از محبت تلخها شيرين شوند অর্থাৎ ভালোবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভালো বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শুকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুজুর্গগণ বলেন, বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাসব্যাসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন- بُلِيْنَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِيْنَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয় : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ : عَجَلٍ শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌঁছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তার প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে ভালো কাজে অগ্রগামী থাকাকে প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্বরাপ্রবণতা নয়। কারণ এটা সময়ের পূর্বে কোনো কাজ করা নয়, বরং এ হচ্ছে যথাসময়ে অধিক পুণ্যকাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জার যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারো স্বভাব ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

قَوْلُهُ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ : এখানে اٰيٰتٌ [নিদর্শনাবলি] বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মুজেযা ও অবস্থা বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী]

যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

অনুবাদ :

٤٢. قُلْ لَهُمْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ يَحْفَظُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ط مِنْ عَذَابِهٖ اَنْ نَزَلَ بِكُمْ اَىْ لَا اَحَدُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَالْمُخَاطَبُوْنَ لَا يَخَافُوْنَ عَذَابَ اللّٰهِ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ اَيِ الْقُرْاٰنِ مُعْرِضُوْنَ ـ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهِ ـ

৪২. আপনি বলুন তাদেরকে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে হেফাজত করবে রহমত হতে রাত্রিতে ও দিবসে তাঁর শাস্তি হতে, যদি তোমাদের উপর তা আপতিত হয়। অর্থাৎ, এরূপ করার মতো [রক্ষা করার মতো] কেউ নেই। আর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করত না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাই করত না।

٤٣. اَمْ فِيْهَا مَعْنَى الْهَمْزَةِ الْاِنْكَارِىْ اَىْ اَلَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِمَّا يَسُوْؤُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا ط اَىْ اَلَهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ غَيْرُنَا لَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَيِ الْاٰلِهَةُ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ فَلَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَا هُمْ اَيِ الْكُفَّارُ مِنَّا مِنْ عَذَابِنَا يُصْحَبُوْنَ ـ يُجَارُوْنَ يُقَالُ صَحِبَكَ اللّٰهُ اَىْ حَفِظَكَ وَاَجَارَكَ ـ

৪৩. اَمْ শব্দটিতে অস্বীকারসূচক হামযার অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ, তবে কি তাদের এমন কোনো দেব-দেবীও রয়েছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে যা তাদের ক্ষতি করে তা থেকে আমাকে ব্যতীত অর্থাৎ তাদের কি এমন কেউ রয়েছে যে, তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে আমি ছাড়া? না কেউ নেই। এরা তো পারবে না দেবতাগণ নিজেরদেরকেই সাহায্য করতে কাজেই তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করবে না আর না তাদেরকে কাফেরদেরকে আমার থেকে আমার শাস্তি থেকে আশ্রয় দেওয়া হবে রক্ষা করা হবে। বলা হয় صَحِبَكَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

٤٤. بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَاۤءِ وَاٰبَاۤءَهُمْ بِمَا اَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط فَاغْتَرُّوْا بِذٰلِكَ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَقْصِدُ اَرْضَهُمْ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط بِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِىِّ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ـ لَا بَلِ النَّبِىُّ وَاَصْحَابُهٗ ـ

৪৪. বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম তার মাধ্যমে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম। অধিকন্তু তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। ফলে তারা প্রবঞ্চনার স্বীকার হয়। তারা কি দেখছে না যে, আমি আনছি পৃথিবীকে তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে রাসূল ﷺ -এর বিজয়ের মাধ্যমে তবুও কি তারা বিজয়ী হবে না, বরং নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণই বিজয়ী হবেন।

অনুবাদ :

٤٥. قُلْ لَهُمْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ز مِنَ اللّٰهِ لَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِيْ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ إِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ مَا يُنْذَرُوْنَ . اَيْ هُمْ لِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ بِمَا سَمِعُوْهُ مِنَ الْإِنْذَارِ كَالصُّمِّ .

৪৫. আপনি বলুন তাদেরকে আমি তো কেবল তোমাদেরকে ওহী দ্বারাই সতর্ক করি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিজের থেকে নয়। কিন্তু যারা বধির তারা তখন সতর্ক বাণী শোনে না যখন এখানে উভয় হামযা ঠিক রেখে অথবা হামযাটি تَخْفِيْف আকারে হামযা ও يَاء এর মাঝামাঝি ভাবে পাঠ করা যায়। তাদেরকে সতর্ক করা হয় অর্থাৎ, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তার উপর আমল বর্জনের কারণে তারা বধীরের ন্যায়।

٤٦. وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ وَقْعَةٌ خَفِيْفَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَآ هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ . بِالْإِشْرَاكِ وَتَكْذِيْبِ مُحَمَّدٍ .

৪৬. যদি তাদেরকে স্পর্শ করে সামান্য বাতাস হালকা লেশ আপনার প্রতিপালকের শাস্তির তবে তারা নিশ্চয় বলে উঠবে- হায়! يَا সতর্কীকরণের জন্য। আমাদের দুর্ভোগ আমাদের ধ্বংস আমারা তো ছিলাম জালিম। আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে।

٤٧. وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ ذَوَاتَ الْعَدْلِ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَيْ فِيْهِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط مِنْ نَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ زِنَةَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط اَيْ بِمَوْزُوْنِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ . مُحْصِيْنَ كُلَّ شَيْءٍ .

৪৭. এবং আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সঠিক তুলাদণ্ড। কিয়ামত দিবসের জন্য অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না পুণ্য হ্রাস কিংবা পাপ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা যদিও তা হয় আমল সরিষা দানা পরিমাণ ওজনের তবুও আমি তা উপস্থিত করব অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তুকে। আর হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করার ক্ষেত্রে।

٤٨. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ اَيِ التَّوْرٰىةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَضِيَآءً بِهَا وَّذِكْرًا اَيْ عِظَةً بِهَا لِّلْمُتَّقِيْنَ لا .

৪৮. আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান অর্থাৎ, তাওরাত যা সত্য মিথ্যা এবং হালাল হারামের মাঝে পার্থক্যকারী ছিল। এবং জ্যোতি এর দ্বারা এবং উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

অনুবাদ :

৪৯. اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ عَنِ النَّاسِ اَىْ فِى الْخَلَاءِ عَنْهُمْ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ اَىْ اَهْوَالِهَا مُشْفِقُوْنَ اَىْ خَائِفُوْنَ .

৪৯. যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে লোকদের থেকে অর্থাৎ, অপরাপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আর তারা কিয়ামত সম্পর্কে অর্থাৎ তার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত অর্থাৎ, শঙ্কিত।

৫০. وَهٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنُ ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ . اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّوْبِيْخِ .

৫০. এটা অর্থাৎ, কুরআন কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে? এখানে জিজ্ঞাসাটি অস্বীকারমূলক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَكْلَؤُكُمْ : এটা বাবে (س . ف) হতে মুযারে' -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। মাসদার كَلَأً كَلَاءَةً অর্থ- হেফাজত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা। اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا এখানে اٰلِهَةٌ مِنْ دُوْنِنَا হলো اٰلِهَةٌ -এর সিফত, বাক্যে অগ্রপশ্চাৎ ঘটেছে। মূলত বাক্যটি ছিল- اٰلِهَةٌ مِنْ دُوْنِنَا تَمْنَعُهُمْ

قَوْلُهٗ مِمَّا يَسُوْءُهُمْ : তাদের কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ থেকে। (س) لَا يُصْحَبُوْنَ তাদের সঙ্গ দেওয়া হবে না, তাদেরকে রক্ষা করা হবে না।

قَوْلُهٗ اَلْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ : مَوَازِيْنُ শব্দটি বহুবচন, বড়ত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যথায় তুলাদণ্ড বা মিজান একটি হবে অথবা مَا يُوْزَنُ তথা ওজনযোগ্য বস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ, আমল যেহেতু বহু এবং তার বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণি রয়েছে। এর কারণ হলো এটা মাসদার। আর মাসদার একবচন ও বহুবচনের উপর সমভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকার (র.) لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যা فِيْهِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ل অব্যায়টি فِىْ অর্থে।

قَوْلُهٗ شَيْئًا : এটা হয়ত দ্বিতীয় مَفْعُوْل অথবা تُظْلَمُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ -এর সিফত। অর্থাৎ لَا تُظْلَمُ ظُلْمًا شَيْئًا

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ : এর পরে اَلْعَمَلُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, كَانَ قِصَّةً -এর যমীর হলো كَانَ -এর اِسْم আর তা হলো عَمَلْ আর مِثْقَالْ হলো খবর, নাফে (র.) مِثْقَالْ -কে مَرْفُوْع পড়েছেন। এ সময় كَانَ تَامَّةً হবে।

قَوْلُهٗ بِالْغَيْبِ : এটা يَخْشَوْنَ -এর ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ, يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ غَائِبِيْنَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ, যখন তারা নির্জনে থাকে তখনও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। مِنَ السَّاعَةِ এর পরে اَهْوَالِهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَافْ লুপ্ত রয়েছে। আর কিয়ামত থেকে ভয় করার উদ্দেশ্য হলো তার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভীত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ الخ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আখিরাতে যখন তাদের চতুর্দিকে দোজখের অগ্নি থাকবে তখন তারা সেই কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- শুধু আখেরাতে নয়, যদি দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, দিনে বা রাতে যদি তাদের উপর আজাব আপতিত হয় তবে কে তাদেরকে রক্ষা করবে? তাই ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ

অর্থাৎ, হে রাসূল! যারা আপনাকে বিদ্রূপ করে বা পবিত্র কুরআনকে বিদ্রূপ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সেই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি রহমান তোমাদেরকে আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন তবে তাঁর আক্রোশ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের দেব-দবীরা কি এ পর্যায়ে কোনো প্রকার উপকার করতে পারবে? কখনও নয়; বরং রহমান রহীম আল্লাহ পাকই তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের কারণে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। অথচ কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করে না। তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের নিয়ামত নিয়ে মত্ত রয়েছেন, আর যখন তাদের প্রতি তাঁর আজাব আসবে তখন তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ عَذَابِهَا الخ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ! আপনি জানিয়ে দিন যে আমার নিকট আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যে ওহী আসে তার আলোকেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু মক্কার কাফেররা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন। যে, হে রাসূল! এরা প্রকৃতপক্ষে বধির, তাই তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন যে, হে রাসূল! যদি আপনার প্রতিপালকের আজাবের বিন্দুমাত্র তাপ তাদেরকে সম্পর্শ করে তবে তাদের বধিরতা, অবচেতনতা, গাফলত ও অবহেলা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে তখন তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হবে। তাদের বন্ধ চোখ-কান খুলে যাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা হতভাগ্য, নিশ্চয় আমরা জালেম, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আল্লাহ পাকের সাথে অন্যকে শরিক করে আমরা সীমালজ্ঞন করেছি। আমরা আল্লাহকে ভয় করিনি তাই আমাদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের نَفْحَةٌ শব্দটির তরজমা করেছেন 'একপার্শ্ব'। আর কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো- 'সামান্য'। ইবনে জুবায়েজ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো- একাংশ।

আয়াতের মর্মকথা : ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাফেররা বলতো, আমাদেরকে আজাবের ব্যাপারে যে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে তা এখনই আসে না কেন? তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! পূর্ণ আজাব তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; যদি তারা সামান্যতম আজাব স্পর্শ করে তবে তাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হবে, তাদের হুঁশ বহাল হয়ে যাবে এবং তাদের সকাল গাফলত, অবচেতনা এবং অহংকার সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে বলবে 'আমরা ছিলাম অপরাধী।'

قَوْلُهُ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা : مَوَازِيْنُ শব্দটি مِيْزَانٌ-এর বহুবচন। অর্থ- ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قِسْطٌ শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে, সাম্যন্যও বেশ কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে। -[মাযহারী]

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীসগ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারি হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনো দিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারি হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কেনোদিন কামিয়াব হবে না। উপরিউক্ত হাফেজ হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নন, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী (র.) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপনার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। যথা- ১. যখন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারো কথা কারো স্মরণে আসবে না। ২. যখন আমলনামাসমূহ উড্ডীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাত আসে এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারো কথাই কারো মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আজাবের লক্ষণ হবে। ৩. ফুলসিরাতে উঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا : অর্থাৎ, হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভালো-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কিরূপে ওজন করা হবে? হাদীসে বেতাকাহ -এর ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কুরআনের وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এটাই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে বসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁদের নাফরমানি, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তোমার শাস্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অপরের তুলনায় তা বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করনি- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ লোকটি আরজ করল, এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের বর্ণনা ছিল। এরপর যারা নবুয়ত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তাদের শাস্তির কথা ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনাবলির বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

মানুষকে তার পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করার লক্ষ্যে এবং এ জীবনকে সরল সঠিকভাবে যাপনের পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যেভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাব হয়েছে, ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক ইতিপূর্বেও যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে আল্লাহ পাক তাওরাতের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ দান করেছেন, যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে ছিল পার্থক্যকারী; জীবন সমস্যার সমাধানে, গোমরাহীর অন্ধকারে আলো পরিবেশনে এবং উপদেশ ও নসিহত বিতরণে তাওরাতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তাওরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. اَلْفُرْقَانُ হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।

২. ضِيَاءٌ গোমরাহীর অন্ধকারে যাদের মন আচ্ছন্ন, তাদের জন্যে ছিল তাওরাত আলো পরিবেশনকারী।

৩. ذِكْرٌ উপদেশ, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা মোত্তাকী পরহেজগার, যারা পরিণামদর্শী, তাদের জন্যে তাওরাত হলো উপদেশ। হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের আলোকে মানুষকে উপদেশ দিতেন। অবশ্য এ নসিহত তারাই লাভ করতে পারতো যারা আল্লাহ পাককে ভয় করতো । তাই ইরশাদ হয়েছে– اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

অর্থাৎ "যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং যারা কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত সন্ত্রস্ত"।

যাদের অন্তরে আখিরাতের ভয়, পরকালের চিন্তা, পরিণামের আশঙ্কা থাকে, তাদের জন্যে এ নসিহত উপকারী হয়। যারা **পরহেজগার নয়, তারা আল্লাহকে** ভয় **করে** না, আখিরাতের চিন্তাও করে না, তাই তারা নসিহত গ্রহণ করে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ : পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য : এ কুরআন হলো অত্যন্ত বরকতময়, বিস্ময়কর, অদ্বিতীয়, মহান, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ, তাওরাত ও অন্যান্য সমস্ত আসমানি গ্রন্থের সারগর্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি আমিই নাজিল করেছি, আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি।" মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের পথনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। এর বরকত সীমাহীন, এর ভাষা প্রাঞ্জল, এর বক্তব্য সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। এ কিতাব হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে রচনা করেননি; বরং আমিই তা তাঁর নিকট নাজিল করেছি।

قَوْلُهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ : اَنْتُمْ শব্দ দ্বারা মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এতবড় উপকারী আলোকময়, বরকতময় মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাওয়ার পরও তোমরা তা অস্বীকার কর? তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না? অবশ্য এর দ্বারা তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী।

অনুবাদ :

٥١. وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ اَىْ هُدَاهُ قَبْلَ بُلُوْغِهٖ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ اَىْ بِاَنَّهٗ اَهْلٌ لِذٰلِكَ ـ

৫১. আমি তো এরপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে হেদায়েত দিয়েছিলেন। এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ, তিনি এর উপযুক্ত।

٥٢. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الْاَصْنَامُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ـ اَىْ عَلٰى عِبَادَتِهَا مُقِيْمُوْنَ ـ

৫২. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কি? প্রতিমাগুলো যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছে। অর্থাৎ, যাদের উপাসনার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

٥٣. قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ فَقْتَدَيْنَا بِهِمْ ـ

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূঁজা করতে দেখেছি। ফলে আমরা তাদের অনুকরণ করেছি।

٥٤. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ لِعِبَادَتِهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ بَيِّنٍ ـ

৫৪. তিনি বললেন, তাদেরকে তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রয়েছে প্রতিমা ভক্তির/ উপাসনার কারণে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে প্রকাশ্য।

٥٥. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ فِىْ قَوْلِكَ هٰذَا اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ـ فِيْهِ ـ

৫৫. তারা বলল, আপনি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছেন আপনার এই কথায় না আপনি কৌতুক করছেন এ বিষয়ে।

٥٦. قَالَ بَلْ رَّبُّكُمُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ رَبُّ مَالِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ ز خَلَقَهُنَّ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ الَّذِىْ قُلْتُهٗ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ بِهٖ ـ

৫৬. তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিপালক তো যিনি ইবাদতের যোগ্যও উপযুক্ত প্রতিপালক অধিপতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এদের সৃষ্টিপূর্ব কোনো নমুনা ছাড়াই। এবং এই বিষয়ে আমি যা আমি বলছি অন্যতম সাক্ষী।

٥٧. وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ

৫৭. শপথ আল্লাহর ! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।

٥٨. فَجَعَلَهُمْ بَعْدَ ذَهَابِهِمْ اِلٰى مُجْتَمَعِهِمْ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ لَهُمْ جُذٰذًا بِضَمِّ الْجِيْمِ وَكَسْرِهَا فُتَاتًا بِفَاسٍ اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ عَلَّقَ الْفَاسَ فِىْ عُنُقِهٖ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ اَىِ الْكَبِيْرِ يَرْجِعُوْنَ ـ فَيَرَوْنَ مَا فَعَلَ بِغَيْرِهٖ ـ

৫৮. অতঃপর তিনি মূর্তিগুলো করেছিলেন তাদের ঈদের দিন তাদের মেলায়, যাওয়ার পর চূর্ণ-বিচূর্ণ جُذَاذًا শব্দটির جِيْم বর্ণের পেশ ও যের উভয়টিই হতে পারে, অর্থাৎ, কুড়াল দ্বারা টুকরো টুকরো করে ফেললেন, তাদের প্রধানটি ব্যতীত কুড়ালকে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। যাতে তারা তার দিকে বড়টির দিকে ফিরে আসে অতঃপর তারা দেখবে যে, সে অন্য মূর্তিগুলোর সাথে কি আচরণ করেছে?

অনুবাদ :

٥٩. قَالُوا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ مَا فَعَلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ - فِيْهِ -

৫৯. তারা বলল তাদের ফিরে আসার পর এবং সে যা করেছে তা দেখার পর আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি কে এরূপ করল? সে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী এ ব্যাপারে।

٦٠. قَالُوْا اَىْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ اَىْ يَعِيْبُهُمْ يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْمُ ط

৬০. তারা বলল অর্থাৎ, তারা একে অপরকে বলল এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি অর্থাৎ তিনি তাদের দোষ বলেন। তাকে বলা হয় ইবরাহীম।

٦١. قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ اَىْ ظَاهِرًا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ - عَلَيْهِ اَنَّهُ الْفَاعِلُ -

৬১. তাকে উপস্থিত কর জনসম্মুখে অর্থাৎ প্রকাশ্যে যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে তার বিপক্ষে যে. তিনিই এটা করেছেন।

٦٢. قَالُوْا لَهٗ بَعْدَ اِتْيَانِهٖ ءَاَنْتَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ط -

৬২. তারা বলল তাঁকে উপস্থিত করার পর তুমিই কি এখানে ءَاَنْتَ এর দুটি হামযাকে নিজ অবস্থায় রেখে অথবা দ্বিতীয় হামযাকে আলিফদ্বারা পরিবর্তন করে এবং تَسْهِيْل তথা লঘুস্বরে এবং تَسْهِيْل কৃত বা লঘুকৃত ও দ্বিতীয়টির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে এবং আলিফ বৃদ্ধি ছাড়াই পাঠ করা যায়। আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ? হে ইবরাহীম!

٦٣. قَالَ سَاكِتًا عَنْ فِعْلِهٖ بَلْ فَعَلَهٗ ق كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ عَنْ فَاعِلِهٖ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ - فِيْهِ تَقْدِيْمُ جَوَابِ الشَّرْطِ وَفِيْمَا قَبْلَهٗ تَعْرِيْضٌ لَهُمْ بِاَنَّ الصَّنَمَ الْمَعْلُوْمَ عِجْزُهٗ عَنِ الْفِعْلِ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا -

৬৩. তিনি বললেন, নিজ কর্মের ব্যাপারে চুপ থেকে বরং এদের প্রধান, সেই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর তার কর্তার ব্যাপারে যদি এরা কথা বলতে পারে। এ বাক্যে شرط -এর জবাবকে অগ্রগামী করা হয়েছে। পূর্বে মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্তি, যার কর্মের অক্ষমতা সকলেরই জানা, সে কখনো উপাস্য হতে পারে না।

٦٤. فَرَجَعُوْۤا اِلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالتَّفَكُّرِ فَقَالُوْۤا لِاَنْفُسِهِمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ - اَىْ بِعِبَادَتِكُمْ مَنْ لَا يَنْطِقُ -

৬৪. তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরল চিন্তার মাধ্যমে অর্থাৎ তারা মনে মনে চিন্তা করল। এরপর বলল, নিজেদেরকে তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী অর্থাৎ তাদের উপাসনার মাধ্যমে যারা কথা বলতে পারে না।

অনুবাদ :

٦٥. ثُمَّ نُكِسُوْا مِنَ اللّٰهِ عَلٰى رُؤُسِهِمْ ج اَىْ رُدُّوْا اِلٰى كُفْرِهِمْ وَقَالُوْا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَاۤءِ يَنْطِقُوْنَ ـ اَىْ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا بِسُؤَالِهِمْ ـ

৬৫. অতঃপর অবনত হয়ে গেল আল্লাহ থেকে তাদের মস্তক অর্থাৎ তারা নিজেদের কুফরির প্রতি ফিরে গেল এবং বলল, আল্লাহর কসম! তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না। অর্থাৎ, তবে কিভাবে তুমি আমাদেরকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বল।

٦٦. قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ بَدْلَهٗ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا مِنْ رِزْقٍ وَغَيْرِهٖ وَّلَا يَضُرُّكُمْ ـ شَيْئًا اِنْ لَمْ تَعْبُدُوْهُ ـ

৬৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না জীবনোপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে এবং ক্ষতিও করতে পারে না কোনোরূপ, যদি তোমরা তার উপাসনা না কর।

٦٧. اُفٍّ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا بِمَعْنٰى مَصْدَرٍ اَىْ تَبًّا وَقُبْحًا لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ اَىْ هٰذِهِ الْاَصْنَامُ لَا تَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَلَا تَصْلُحُ لَهَا وَاِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

৬৭. ধিক اُفٍّ শব্দটি فَا বর্ণে যের ও যবর উভয়টিই বৈধ। মাসদার অর্থে। অর্থ– ধ্বংস ও আক্ষেপ, নিকৃষ্টতা তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না? অর্থাৎ, এই মূর্তিগুলো উপাসনার অধিকারী নয় এবং তার যোগ্যও নয়। ইবাদতের একমাত্র অধিকারী ও যোগ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ : এখানে وَاوْ টি قَسَمِيَّة অর্থাৎ وَعِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ অর্থে। رُشْد অর্থ শুভবোধ, সচেতনতা, হেদায়েত, সুকৌশল। مِنْ قَبْلُ এখানে مُضَاف اِلَيْه লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ– قَبْلَ بُلُوْغِه ছিল। قَبْلَهٗ-এর ضَمِيْر দ্বারা হযরত মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ ﷺ ও উদ্দেশ্যে হতে পারে। اَلتَّمَاثِيْلُ এটা تِمْثَالٌ-এর বহুবচন। পাথর বা অন্য কোনো ধাতব মূর্তি। عَاكِفُوْنَ শব্দটি عَاكِفٌ-এর বহুবচন, অর্থ– কর্মচারী, ই'তেকাফকারী, প্রতিবেশী।

قَوْلُهٗ لَهَا عَاكِفُوْنَ : এর صِلَه আসে عَلٰى ; কিন্তু এখানে ل এসেছে। ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, ل টি عَلٰى অর্থে। আর যদি এটা عَابِدْ এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তখন ل আসা বৈধ হবে। এভাবে যদি تَعْدِيَة-এর পরিবর্তে اِخْتِصَاص এর জন্য গণ্য করা হয়, তখনও ل আসা বৈধ হবে। যেমন قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَائَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ-এর মধ্যে عَابِدِيْنَ-এর صِلَة স্বরূপ ل ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَجَعَلَهُمْ : এর মধ্যে هُمْ যমীরটি مُذَكَّرٌ ذُو الْعُقُوْلِ-এর জন্য মুশরিকদের ধারণা অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ جُذَاذًا : এটা মাসদার হওয়ার কারণে বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। কেউ কেউ এটাকে جُذَاذَةٌ-এর বহুবচন বলেছেন। যেমন– زُجَاجٌ শব্দটি زُجَاجَةٌ-এর বহুবচন। কেউ কেউ جُذَاذٌ মাসদারকে مَجْذُوْذٌ তথা مَفْعُوْل অর্থে বলেছেন।

قَوْلُهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا : এর مَنْ হলো مُبْتَدَأ আর فَعَلَ هٰذَا হলো এর খবর এবং إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ হলো جُمْلَة مُسْتَانِفَة; আবার এটাও হতে পারে যে, مَنْ مَوْصُوْلَة তার صِلَة এর সাথে মিলে مُبْتَدَأ আর إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُ : سَمِعْنَا যেহেতু এমন বিষয়ের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে যা শোনা যায় না। আর তা হলো فَتًى তথা যুবক। কেননা মানুষ দর্শনীয় বস্তু, শ্রবণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে سَمِعَ দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে। অতএব, فَتًى হলো প্রথম مَفْعُوْل আর يَذْكُرُ হলো বাক্য হয়ে দ্বিতীয় مَفْعُوْل আর سَمِعَ যদি শ্রবণযোগ্য বস্তুর উপর প্রবিষ্ট হয় তখন সেটি এক مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়। যেমন سَمِعْتُ كَلَامَ زَيْدٍ

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ : এটা فَتًى -এর দ্বিতীয় সিফত। إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি مَرْفُوْع হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন- ১. يُقَالُ -এর نَائِب فَاعِلْ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ أَىْ يُسَمّٰى لَهُ إِبْرَاهِيْمُ এ সময় إِبْرَاهِيْمُ দ্বারা উক্ত শব্দ উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তি নয়। ২. إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি উহ্য মুবতাদা এর খবর। অর্থাৎ يُقَالُ لَهُ هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ অথবা إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি মুবতাদা হবে। আর তার খবরটি লুপ্ত হবে। অর্থাৎ, يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ فَاعِلُ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا : এখানে هٰذَا হলো كَبِيْرُهُمْ থেকে بَدَل কিংবা صِفَتْ

قَوْلُهُ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ : জুমহুরের কেরাত মতে نُكِسُوْا শব্দটি مَجْهُوْل -এর সীগাহ। অর্থাৎ, তাদের মাথার খুলি উল্টে দেয়া হলো। আর এটা করেছিলেন আল্লাহ তা'আলা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাষণ দ্বারা মূর্তিদের অক্ষমতা এবং অসহায়ত্ব পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা সত্য ধর্মের প্রতি রুজু করার উপক্রম ছিল। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। ফলে তারা কুফরির দিকে ধাবিত হলো। ব্যাখ্যাকার (র.) مِنَ اللّٰهِ বৃদ্ধি করে এ কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অপর বিরল এক কেরাতে نَكَّسُوْا -এর ن বর্ণ যবর এবং ك তাশদীদ সহ مَعْرُوْف রূপে পঠিত হয়েছে। এ সময় এর فَاعِلْ হবে মুশরিকরা। উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুশরিকরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দলিল প্রমাণ ও যুক্তপূর্ণ ভাষণ শুনে লজ্জা ও অনুতাপে মাথা নিচু করে ফেলল। কিন্তু সামান্য কিছু পরে তারা কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

قَوْلُهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَقَدْ عَلِمْتَ হলো উহ্য শপথের জবাব।

قَوْلُهُ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : এর মধ্যকার ف হলো عَاطِفَة -এর مَعْطُوْف عَلَيْه উহ্য রয়েছে। হামযাটি তার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। বাক্যটি এমন হবে। أَجَهِلْتُمْ فَلَا تَعْقِلُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-এর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সমগ্র আরব জাহানে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। শিরক ও মূর্তি পূজাকে তিনি ঘৃণা করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন, 'খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু' এবং বিশেষ মর্যদাসম্পন্ন নবী রাসূলগণের অন্যতম। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ إِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ

'আর নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সুপথের জ্ঞান দান করেছিলাম'।

অর্থাৎ, হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর পূর্বে অথবা মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বে ইবরাহীম (আ.)-কে যথাযোগ্য মর্যাদা, সুপথ, হেদায়েত এবং জ্ঞান দান করেছিলাম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের رُشْد শব্দটির অর্থ হলো তাওহীদে বিশ্বাস অর্জন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা বর্জন। আয়াতের অর্থ হলো, আমি যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ওহী অবতরণ করেছি এবং তাকে মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, এটি কোনো নতুন ঘটনা বা নতুন কথা নয়; কেননা ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লামা সয়ূতী (র.) ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হোমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেমের সূত্র উল্লেখ করে তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো- فِىْ صِغَرِهٖ অর্থাৎ, আমি ইব্রাহীমকে তাঁর বাল্যকালেই হেদায়েত দান করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, নবী মনোনীত করার পূর্বেই আমি ইবরাহীমকে হেদায়েত দান করেছি।

قَوْلُهٗ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়ের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তারা ঐ মূর্তিগুলোর সম্মান করতো এবং রাত দিন সেগুলোর পূজা করতো। যে মূর্তিগুলো তাদের কোনো উপকার করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, এতদসত্ত্বেও তোমরা কোন যুক্তিতে এ প্রাণহীন জড় পদার্থের সম্মুখে মাথা নত কর? তারা জবাব দিল- وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি'।

অর্থাৎ, এদের পূজা করার কোনো যৌক্তিকতা বা এর পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি। তাই আমরা তাদের অনুসরণেই আমাদের নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে সম্মান দিচ্ছি। এটি কোনো যুক্তি বুদ্ধির কাজ নয়; বরং যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করেছে আমরাও তাই করছি।

قَوْلُهٗ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ : আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কাছে اِنِّىْ سَقِيْمٌ [আমি অসুস্থ] এর ওজর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধান রত হলো যে, কাজটি কে করল? যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিতে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই এ কাজ করেছেন। এর জবাব হিসেবে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোনো শক্তি ছিল না, একথা ভেবেই সম্ভবত তার কথার দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং ভুলেও যায়। -[বয়ানুল কোরআন]

এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু' এজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবারাহ করে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কথিত উপাস্য তথা মূর্তিগুলো সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি কথার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিলেন, আমি এগুলোর একটি ব্যবস্থা করবো তথা এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবো। আলোচ্য আয়াত মুশরিকদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে।

جُذٰذًا শব্দটি جُذٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ- খণ্ড। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ অর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চেয়ে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

قَوْلُهٗ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ : اِلَيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে।

১. এই সর্বনাম দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে? এরপর হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজায় যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কলবী (র.) বলেন, সর্বনাম দ্বারা كَبِيْرٌ [প্রধান মূর্তি]-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো? সে যখন কোনো উত্তর দেবে না, তখন তার অক্ষমতা ও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

قَوْلُهُ قَالَ ال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয়, রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজে করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য তাফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ, তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়া পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না : যেমন কুরআনে আছে- اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান তথা আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন উত্তর বাহরে মুহীত , কুরতুবী, রূহুল আ'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اِسْنَاد مَجَازِىْ তথা রূপক ভঙ্গিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ.)-কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোনো বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি- اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ [অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।] এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরিক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরিকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরিকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হতো, তাহলে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় উপকারিতা এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে একথা বুঝা যাবে যে, যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ

মোটকথা , কোনরূপ দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনোরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ : প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْذِبْ غَيْرَ ثَلَاثٍ : অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) তিন জায়গা ব্যতীত কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। –[বুখারী, মুসলিম]

অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহর জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওজর পেশ করে إِنِّي سَقِيمٌ [আমি অসুস্থ] বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হযরত সারাহ্‌সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোনো ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোনো কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগ্নি স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন, সে আমার ভগ্নি। [এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা] কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহকে গ্রেফতার করা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সারাহকেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ ইসলামি সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নি। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। [এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ]। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া'। এর অর্থ হলো দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বুঝা ও বক্তার নিয়ত অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগ্নি বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামি সম্পর্কে দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নি। বলা বাহুল্য, এটাই তাওরিয়া। এই তাওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তাওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে। যেমন– ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নি হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তাওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنِّي سَقِيمٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা سَقِيمٌ [অসুস্থ] শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন; কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহর জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গুনাহের কাজ আল্লাহর জন্য করার কোনো অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কুরআন পরিপন্থি। এরপর তারা এ থেকে এটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কুরআনের পরিপন্থি হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা যায়! বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কুরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কুরআন বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তাওরিয়া বুঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তাওরিয়া বুঝাতে গিয়ে كَذَبَاتٌ [মিথ্যা] শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এ কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ.)-এর ভুলকে عَصٰى ও غَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা যায় না। কুরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গাম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ প্রার্থনা করবে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্র হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গাম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর কোনো ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) হাদীসে বর্ণিত ঐ তাওরিয়া ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كَذَبَاتٌ তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এরূপ করার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েজ হবে না। সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে মুহীতের বরাত দিয়েই পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তেলাওয়াতে, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীসে রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা : হাদীসে ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু হযরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তাফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎ কর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল; কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হেফাজত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِى اللّٰهِ [আল্লাহর মধ্যে] এবং لِلّٰهِ [আল্লাহর জন্য] এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ [খাঁটি ইবাদত আল্লাহর জন্যই] স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারো হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরিউক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গাম্বরদের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থি মনে করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ : যারা মুজেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলি অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোনো বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোনো সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না- দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনো বস্তুর সত্তার জন্য কোনো গুণ অপরিহার্য নয়; বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরি। পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরি; কিন্তু এই জরুরি অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ- এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোনো যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন, অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে। তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহ তা'আলা যেসব মুজেযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا [শীতল] শব্দের আগে وَسَلَامًا [নিরাপদ] শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। হযরত নূহ (আ.)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

قَوْلُهُ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে কাফের-মুশরিকরা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। তাদের উপাস্য বা দেবতারা তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না দেখে তারাও লা-জবাব হয়ে গেল। এই সুযোগে হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবানের লক্ষ্যে যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ

"হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করছো যারা তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না"।

অর্থাৎ, একথা জানার পর যে তোমাদের উপাস্যরা কোনো কথা বলতে পারে না, তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, এমনকি আত্মরক্ষা করতে পারে না, যে তাদেরকে ধ্বংস করলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না এবং সে অপরাধীর সন্ধানও দিতে পারে না; এরপরও তোমরা কোন যুক্তিতে তাদের উপসনা কর? ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের বাতিল উপাস্যদের প্রতি। তোমরা এসব অসহায় জড় পদার্থের উপাসনা করে নিজেদেরকে অপমানিত করছ এবং আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হচ্ছো।

তবুও কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর না যে এসব জড় পদার্থ আদৌ মানুষের ইবাদতের যোগ্য নয়, মানবজাতির ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়।

আলোচ্য আয়াতের أُفٍّ শব্দটি কোনো বিষয়ের উপর ঘৃণা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো বস্তুকে ছোট করার নিমিত্তে অথবা কোনো দুর্গন্ধ উপলব্ধি করলেও এই শব্দটি বিরক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন একবার হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে أُفٍّ বলেছেন এবং তাঁর নাক মোবারকে কাপড় ব্যবহার করেছেন। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তথা প্রতীমা-পূজার বাতুলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও যেহেতু তারা এই অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল, তাই এই পর্যায়ে নিন্দা প্রকাশার্থে أُفٍّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যখন তারা তাদের অন্যায় আচরণের পক্ষে কোনো যুক্তি বা দলিল প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলো এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যুক্তি প্রমাণে হেরে গেল, তখন তারা শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিল; যা সাধারণত মূর্খ লোকেরা করে থাকে। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিদগ্ধ করে শেষ করার ইচ্ছা করলো।

অনুবাদ :

٦٨. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ اَىْ اِبْرَاهِيْمَ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اَىْ بِتَحْرِيْقِهٖ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ نُصْرَتَهَا فَجَمَعُوْا لَهُ الْحَطَبَ الْكَثِيْرَ وَاَضْرَمُوا النَّارَ فِىْ جَمِيْعِهٖ وَاَوْثَقُوْا اِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلُوْهُ فِىْ مِنْجَنِيْقٍ وَرَمَوْهُ فِى النَّارِ ـ

৬৮. তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এবং তোমাদের দেবতাগুলোকে সাহায্য কর অর্থাৎ তাকে পুড়িয়ে হত্যা করার মাধ্যমে। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। দেবতাদের সাহায্য করতে চাও। তাকে পোড়ানোর জন্য তারা প্রচুর জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করল এবং সবগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে রশি দিয়ে বেঁধে মিনজানীক তথা নিক্ষেপযন্ত্রে রেখে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল।

٦٩. قَالَ تَعَالٰى قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۙ فَلَمْ تَحْرِقْ مِنْهُ غَيْرَ وِثَاقِهٖ وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا وَبَقِيَتْ اِضَاءَتُهَا وَبِقَوْلِهٖ سَلٰمًا سَلِمَ مِنَ الْمَوْتِ بِبَرْدِهَا ـ

৬৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। সে আগুন তার রশি ছাড়া আর কিছুই পোড়ায়নি। তার দাহনশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর তার ঔজ্জ্বল্যতা অবশিষ্ট থেকে গেল। আর তার উক্তি سَلٰمًا শান্তিদায়ক এর কারণে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে তিনি নিরাপদ থাকলেন।

٧٠. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا وَهُوَ التَّحْرِيْقُ فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ فِىْ مُرَادِهِمْ ـ

৭০. তারা তাঁর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল আর তা হলো জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরিবর্তে।

٧١. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا ابْنَ اَخِيْهِ هَارَانَ مِنَ الْعِرَاقِ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ـ بِكَثْرَةِ الْاَنْهَارِ وَالْاَشْجَارِ وَهِىَ الشَّامُ نَزَلَ اِبْرَاهِيْمُ بِفِلَسْطِيْنَ وَلُوْطٌ بِالْمُؤْتَفِكَةِ وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ ـ

৭১. আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম। হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা ছিলেন, হারানের পুত্র। ইরাক থেকে সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য। নদ-নদী ও বৃক্ষরাজির প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। সে দেশ হলো শাম বা সিরিয়া। হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তীনে অবতরণ করেন, আর হযরত লূত (আ.) মু'তাফিকাতে অবতরণ করেন। তাদের উভয়ের মাঝে একদিনের পথের দূরত্ব ছিল।

٧٢. وَوَهَبْنَا لَهٗ لِاِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ سَاَلَ وَلَدًا كَمَا ذُكِرَ فِى الصّٰفّٰتِ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط اَىْ زِيَادَةً عَلَى الْمَسْئُوْلِ اَوْ هُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَكُلًّا اَىْ هُوَ وَوَلَدَاهُ جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ـ اَنْبِيَاءَ ـ

৭২. আমি তাকে দান করে ছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। যেমনটা সূরা আস সাফফাতে উল্লেখ রয়েছে। ইসহাক এবং আরো অতিরিক্ত ইয়াকূব অর্থাৎ, প্রার্থনার চেয়ে অধিক অথবা ইয়াকূব ও তার প্রপৌত্র। এবং প্রত্যেককেই অর্থাৎ তিনি ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ, নবী বানিয়েছিলাম।

অনুবাদ :

٧٣. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِىْ بِهِمْ فِى الْخَيْرِ يَهْدُوْنَ النَّاسَ بِاَمْرِنَا اِلٰى دِيْنِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج اَىْ اَنْ تَفْعَلَ وَتُقَامَ وَتُؤْتِىَ مِنْهُمْ وَمِنْ اَتْبَاعِهِمْ وَحُذِفَ هَاءُ اِقَامَةٍ تَخْفِيْفًا وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ .

৭৩. এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা اَئِمَّةً-এর উভয় হামযা ঠিক রেখে অথবা দ্বিতীয় হামযাকে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করা যায়। তা এভাবে যে, সৎকর্মে তারা অনুকরণীয় হবে। তাঁরা পথ প্রদর্শন করতেন মানুষকে আমার নির্দেশ অনুসারে আমার ধর্মের প্রতি। আমি তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামাজ কায়েম করতে এবং জাকাত প্রদান করতে অর্থাৎ তারা ও তাদের অনুসারীরা যেন সৎকর্ম করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত প্রদান করে। এখানে اِقَامَ-এর ة কে সহজীকরণার্থে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারা আমারই ইবাদত করতো।

٧٤. وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا فَصْلًا بَيْنَ الْخُصُوْمِ وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ اَىْ اَهْلُهَا الْاَعْمَالَ الْخَبٰۤئِثَ ط مِنَ اللِّوَاطَةِ وَالرَّمْىِ بِالْبُنْدُقَةِ وَاللَّعْبِ بِالطُّيُوْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ مَصْدَرُ سَاءَهُ نَقِيْضُ سَرَّهُ فٰسِقِيْنَ .

৭৪. এবং আমি হযরত লূত (আ.)-কে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা বাদী বিবাদীর মামলা নিরসন প্রজ্ঞা। জ্ঞান, এবং আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যে, অর্থাৎ যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে। পুংমৈথুন, পথচারীদেরকে পাথর বর্ষণ, পাখপাখালী নিয়ে খেল-তামাশা ইত্যাদি। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় سَوْءٍ শব্দটি سَاءَ-এর মাসদার এটা سَرَّهُ -এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। সত্যত্যাগী।

٧٥. وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا بِاَنْ اَنْجَيْنَا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

৭৫. এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম এভাবে যে, তাকে তার সম্প্রদায় হতে নিষ্কৃতি দিয়েছি। তিনি ছিলেন সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ نُصْرَتَهَا : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَاعِلِيْنَ-এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। اِنْ كُنْتُمْ এটা হলো شَرْط এটা جَزَاء-এর মুখাপেক্ষী নয়। কারণ পূর্বে তার উল্লেখ রয়েছে। كُوْنِىْ بَرْدًا اَىْ ذَاتَ بَرْدٍ অর্থাৎ, শীতলতা বিশিষ্ট। سَلَامًا হলো উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل مُطْلَقٌ অর্থাৎ, سَلَّمْنَا سَلَامًا আর سَلَامًا-এর পূর্বেও مُضَاف উহ্য থাকতে পারে। অর্থাৎ- ذَاتَ سَلَامٍ . بَرْدًا وَّسَلَامًا-এর মধ্যে مُضَافٌ-কে বিলাপ করে مُضَافُ اِلَيْهِ-কে তার স্থলে রাখা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنَ الْعِرَاقِ : এটা লুপ্ত فِعْل-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। نَافِلَةً শব্দটি عَافِيَةٌ-এর ছন্দে مَصْدَر ; এটা يَعْقُوْب থেকে حَال আর وَهَبْنَا فِعْل-এর ভিন্ন শব্দে مَفْعُوْل مُطْلَقٌ-ও হতে পারে। اَئِمَّةً এ দ্বিতীয় হামযার মধ্যে জমহুরের মতে

تَسْهِيْل বৈধ। যদিও اِبْدَالْ তথা পরিবর্তন করে পড়াও বৈধ। ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ تَفْعَلَ ইত্যাদি দ্বারা فِعْلَ الْخَيْرَاتِ-এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল তারকীব হলো– اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَاتِ وَاَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ وَاَنْ تُؤْتِيَ الزَّكٰوةُ ; কেননা مُوْحٰى তথা আদিষ্ট বিষয় আমরের সীগাহ দ্বারা হয়ে থাকে, মাসদার নয়। اِقَامَ الصَّلٰوةِ এখানে اِقَامَةَ الصَّلٰوةِ-এর স্থলে সহজার্থে اِقَامَ الصَّلٰوةِ বলেছেন।

قَوْلُهُ لُوْطًا : এটা লুপ্ত فِعْل-এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى التَّفْسِيْرِ-এর অন্তর্গত। বাক্যটি এরূপ ছিল– اٰتَيْنَاهُ لُوْطًا اٰتَيْنَا ; مِنَ الْقَرْيَةِ এ জনপদের নাম হলো সাদুম। এটা মুতাফিকা এলাকার একটা বিশেষ জনপদ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَرِّقُوْهُ : অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক! ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ.)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। শয়তান হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'মিনজানিকে' [এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র] রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চিৎকার করে উঠল, হে প্রভু! আপনার দোস্তের এ কি বিপদ ! আল্লাহ তাদের সবাইকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো, প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না: বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ.) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন। এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ : অর্থাৎ, ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ [অর্থাৎ, ইরাক] থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বাবাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের স্থান। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গাম্বরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গাম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً : অর্থাৎ, আমি তাঁকে [দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী] পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَة বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসহাক (আ.) এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকুব (আ.)-এর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি তাদেরকে জাতির অগ্রনায়ক এবং নেতা মনোনীত করি এবং তারা মানুষকে আমার নির্দেশ মোতাবেক হেদায়েত করতেন। সরল সঠিক, পুণ্য পন্থার পথনির্দেশ করতেন। সত্যের দিকে মানুষকে আহবান করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। তাই ইরশাদ হয়েছে–

قَوْلُهُ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا : তাঁরা ছিলেন জাতির নেতা : কোনো কোনো তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা শুধু যে নিজেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সকল মঞ্জিল অতিক্রম করেছেন, তাই নয়; বরং তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক অন্য মানুষকেও হেদায়েত করতেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করতেন অর্থাৎ,. তাঁরা শুধু হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন পথপ্রদর্শক। –[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৬৮]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ইমামতের কথা রয়েছে, তার তাৎপর্য হলো নবুয়ত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবুয়ত দান করেছেন। ইমাম রাজী (র.) একথাও লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি কথা হলো, এই সত্যের প্রতি আহবান এবং বাতিল থেকে বিরত থাকার কাজ আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত বৈধ নয়। এজন্যে بِاَمْرِنَا শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ১৯১]

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ : এ আয়াতেও তাঁদেরকে যে নবুয়ত দান করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজ হলো শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ্ পাকের জিকিরের লক্ষ্যেই এর বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে জাকাত হলো আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই জাকাত আদায়েরও নির্দেশ রয়েছে। নামাজ ও জাকাত উভয় ইবাদতের লক্ষ্য হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্ পাকের বান্দাদের প্রতি ইহসান করা। এর দ্বারা হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ আদায়ের তাগিদ রয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হলো– তাঁরা নেককার। বস্তুত এটি হলো আল্লাহ্ পাকের পথের সাধকদের প্রথম গুণ। এরপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে তাঁদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর নবুয়ত ও রিসালত প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ : "আর তারা আমারই ইবাদত করতো" অর্থাৎ তারা শুধু আমরই বন্দেগী করতো; অন্য কারো নয়। আমার বন্দেগীর যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। অথবা এর অর্থ হলো তাঁরা ছিল খাঁটি তাওহীদবাদী। আর আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে তারা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে. হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্র, পৌত্র ইতিপূর্বে যাদের উল্লেখ হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতেন। তাঁরা যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা যেমন ছিলেন ইলমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তেমনি আমলের ব্যাপারেও ছিলেন পরিপূর্ণ আন্তরিক। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন : পৃ. ৬৪৫]

قَوْلُهُ تَعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ : خَبَائِثُ শব্দটি خَبِيْثَةٌ-এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خَبَائِثُ বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটি মাত্র অভ্যাসকেই خَبَائِثُ বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خَبَائِثُ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

٧٦. وَ اذْكُرْ نُوحًا وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ مِنْهُ اِذْ نَادٰى اَىْ دَعَا عَلٰى قَوْمِهٖ بِقَوْلِهٖ رَبِّ لَا تَذَرْ الخ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ اِبْرَاهِيْمَ وَلُوْطٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ الَّذِيْنَ فِى سَفِيْنَتِهٖ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ـ اَىْ الْغَرَقِ وَتَكْذِيْبِ قَوْمِهٖ لَهٗ ـ

অনুবাদ :

৭৬. স্মরণ করুন নূহকে এর পরবর্তী অংশ হলো তার থেকে بدل যখন তিনি আহবান করেছিলেন অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন– হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের বসতিকে ছাড়বেন না– এ উক্তি দ্বারা। এর পূর্বে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্বে। তখন আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম যারা তার নৌকায় ছিল মহা সংকট হতে অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়া ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা থেকে।

٧٧. وَنَصَرْنٰهُ مَنَعْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط الدَّالَّةِ عَلٰى رِسَالَتِهٖ اَنْ لَّا يَصِلُوْا اِلَيْهِ بِسُوْءٍ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

৭৭. এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম তাকে রক্ষা করেছি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করেছিল যা তাঁর রিসালতের প্রমাণবহ যাতে তারা কুমতলবে তাঁর নিকট পৌঁছতে না পারে। নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এজন্য তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

٧٨. وَاذْكُرْ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اَىْ قِصَّتَهُمَا وَيُبْدَلُ مِنْهُمَا اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ هُوَ زَرْعٌ اَوْ كَرْمٌ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج اَىْ رَعَتْهُ لَيْلًا بِلَا رَاعٍ بِاَنْ اِنْفَلَتَتْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ـ فِيْهِ اِسْتِعْمَالُ ضَمِيْرِ الْجَمْعِ لِاِثْنَيْنِ قَالَ دَاوٗدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابَ الْغَنَمِ وَقَالَ سُلَيْمٰنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوْفِهَا اِلٰى اَنْ يَّعُوْدَ الْحَرْثُ كَمَا كَانَ بِاِصْلَاحِ صَاحِبِهَا فَيَرُدُّهَا اِلَيْهِ ـ

৭৮. এবং আপনি স্মরণ করুন হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর কথা অর্থাৎ তাদের কাহিনীকে। সামনের অংশ এর থেকে بدل হয়েছে। যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। আর তা ছিল ফসলের ক্ষেত বা আঙ্গুরের বাগান যখন তাতে প্রবেশ করেছিল রাত্রিকালে কোনো সম্প্রদায়ের মেষ। অর্থাৎ, রাখালবিহীন তাতে মেষ চরেছিল, ফলে তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর আমি তাদের বিচার কার্য প্রত্যক্ষ করছিলাম এতে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের যমীর ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) শস্যের মালিকের জন্য মেষের মালিকানার সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন আর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, শস্যের মালিক মেষের দুধ, বাচ্চা ও পশম দ্বারা উপকৃত হবেন যতদিন না মেষ-মালিকের পরিচর্যা দ্বারা ফসল তার পূর্বৎ অবস্থায় ফিরে না আসে। এরপর সে মেষের মলিকের নিকট মেষ পাল ফিরিয়ে দিবে।

অনুবাদ :

٧٩. فَفَهَّمْنٰهَا اَىِ الْحُكُوْمَةَ سُلَيْمٰنَ وَحُكْمُهُمَا بِاجْتِهَادٍ وَرَجَعَ دَاوٗدُ اِلٰى سُلَيْمَانَ وَقِيْلَ بِوَحْيٍ وَالثَّانِىْ نَاسِخٌ لِلْاَوَّلِ وَكُلًّا مِنْهُمَا اٰتَيْنَا حُكْمًا نُبُوَّةً وَّعِلْمًا بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لِلتَّسْبِيْحِ مَعَهٗ لِاَمْرِهٖ بِهٖ اِذَا وَجَدَ فَتْرَةً لِيَنْشَطَ لَهٗ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ تَسْخِيْرَ تَسْبِيْحِهِمَا مَعَهٗ وَاِنْ كَانَ عَجَبًا عِنْدَكُمْ اَىْ مُجَاوِبَتَهٗ لِلسَّيِّدِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

৭৯. আমি এ বিষয়ে মীমাংসায় হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। উভয়ের বিচার ছিল গবেষণা ভিত্তিক। হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়ের প্রতি নিজে ফিরে আসেন। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল ওহীর মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির জন্য নাসিখ বা রহিতকারী। এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা নবুয়ত ও জ্ঞান দীন বিষয়ক। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত অনুরূপভাবে অধীন করে দিয়েছিলাম তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠের জন্য তার এ আদেশের কারণে যে, যখন তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন তখন তারা যেন সাথে সাথেই তাসবীহ পাঠ করে যাতে তাঁর প্রফুল্লতা লাভ হয়। আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা তার সাথে তাদের তাসবীহ পাঠের জন্য অধীনস্ত করার বিষয়ে। যদিও তা তোমাদের নিকট অতি আশ্চর্যজনক মনে হয়। অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.)-এর আহনবানে তাদের সাড়া দেওয়া।

٨٠. وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ وَهِىَ الدِّرْعُ لِاَنَّهَا تُلْبَسُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ صَنَعَهَا وَكَانَتْ قَبْلَهَا صَفَائِحَ لَّكُمْ فِىْ جُمْلَةِ النَّاسِ لِتُحْصِنَكُمْ بِالنُّوْنِ لِلّٰهِ وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ لِدَاوٗدَ وَبِالْفَوْقَانِيَّةِ لِلَّبُوْسِ مِنْۢ بَاْسِكُمْ ج حَرْبِكُمْ مَعَ اَعْدَاءِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ شٰكِرُوْنَ ـ نِعَمِىْ بِتَصْدِيْقِ الرُّسُلِ اَىْ اشْكُرُوْنِىْ بِذٰلِكَ ـ

৮০. আমি তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছি। আর তা হলো লৌহবর্ম, কারণ তা শরীরে পবিধান করা হয়। আর তিনি এর সর্বপ্রথম প্রস্তুতকারক ও নির্মাতা। এর পূর্বে ছিল লৌহ নির্মিত ঢাল। তোমাদের জন্য সকল মানুষের যাতে তা তোমাদেরকে রক্ষা করে لِتُحْصِنَكُمْ শব্দটি যদি نُوْن যোগে হয় তবে এর যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরবে। আর যদি يَاءْ দ্বারা হয় তবে যমীর ফিরবে হযরত দাউদ (আ.)-এর দিকে। আর যদি تَاءْ যোগে হয় তবে যমীর ফিরবে لَبُوْس তথা লৌহবর্মের দিকে। তোমাদের যুদ্ধে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে সুতরাং তোমরা কি হে মক্কাবাসীরা কৃতজ্ঞ হবে না আমার নিয়ামতসমূহের। রাসূলগণকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ এর মাধ্যমে তোমরা আমার কৃতজ্ঞা প্রকাশ করো।

অনুবাদ :

٨١. وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى رُخَاءً اَىْ شَدِيْدَةَ الْهُبُوْبِ وَخَفِيْفَتَهُ بِحَسْبِ اِرَادَتِهٖ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَهِىَ الشَّامُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ - مِنْ ذٰلِكَ عِلْمُهُ تَعَالٰى بِاَنَّ مَا يُعْطِيْهِ سُلَيْمَانَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْخُضُوْعِ لِرَبِّهٖ فَفَعَلَهُ تَعَالٰى عَلٰى مُقْتَضٰى عِلْمِهٖ -

৮১. এবং আমি বশীভূত করে দিয়েছি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য উদ্দাম বায়ুকে। অপর কেরাতে رخاء এসেছে, অর্থাৎ গতির প্রচণ্ডতা ও ধীরস্থিরতাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করে দিয়েছি। তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আর তা হলো শামদেশ বা সিরিয়া। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। এর মধ্যে আল্লাহর এ জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

٨٢. وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ يَدْخُلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَيُخْرِجُوْنَ مِنْهُ الْجَوَاهِرَ لِسُلَيْمَانَ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ج اَىْ سِوَى الْغَوْصِ مِنَ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهٖ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ - مِنْ اَنْ يُّفْسِدُوْا مَا عَمِلُوْا لِاَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا فَرَغُوْا مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ اللَّيْلِ اَفْسَدُوْهُ اِنْ لَّمْ يُشْتَغَلُوْا بِغَيْرِهٖ -

৮২. এবং আমি বশীভূত করে দিয়েছি শয়তানদের মধ্য থেকে কতককে যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত তারা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য মণিমুক্তা আহরণ করত। এটা ব্যতীত তারা অন্যান্য কাজও করত অর্থাৎ ডুবুরির কাজ ব্যতীতও যেমন– প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি। আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম। তারা যা নির্মাণ করত তা বিনষ্ট করা হতে। কেননা যখন তারা কোনো কাজ সমাপ্তি ঘটাতো, যদি তাদেরকে অন্য কাজে ব্যাপৃত না করা হতো তবে রাতের আগমনের পূর্বেই তারা তা বিনষ্ট করে ফেলত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نُوْحًا : এ শব্দটি مَنْصُوْبٌ হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে। ১. তাঁর আতফ হলো لُوْطًا -এর উপর। এর নসবের আমিল হবে لُوْطًا -এর আমিলটিই। তা হলো উহ্য اٰتَيْنَا ; আর উল্লিখিত اٰتَيْنَاهُ বাক্যটি এর প্রমাণ বহন করছে। এভাবে دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ শব্দেও। বাক্যটি এরূপ হবে– وَنُوْحًا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ اٰتَيْنَاهُمَا حُكْمًا এ সময় اِذْ نَادٰى শব্দটি نُوْحًا থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَال হবে। ২. اُذْكُرْ উহ্য ফে'লটি এর নাসিব হবে। যেমন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন। نُوْحًا -এর পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اُذْكُرْ قِصَّتَهٗ এ সময় উহ্য মুযাফের কারণে اِذْ نَادٰى মানসূব হবে। অর্থাৎ– خَبَرُهُمُ الْوَاقِعُ فِىْ وَقْتٍ كَانَ كَيْتَ كَيْتَ

قَوْلُهٗ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ هٰؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ : হযরত নূহ (আ.) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছেন আর ৯৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তাবলীগ করেছেন এবং তুফানের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর পূর্ণ বয়স হলো ১০৫০ [এক হাজার পঞ্চাশ] বছর।

قَوْلُهٗ اِذْ نَادٰى : শব্দটি نُوْحًا থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَال - دَعَا عَلٰى قَوْمِهٖ দ্বারা এর তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, نَادٰى শব্দটি دَعٰى عَلَيْهِ তথা বদ দোয়া অর্থে।

قوله ونصرناه : এর ব্যাখ্যা مَنَعْنَاهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مَنَعَ -এর অর্থ বিশিষ্ট। আর এ কারণেই এর স্বরূপ مِنْ صِلَةٌ এসেছে। নতুবা نَصَرَ -এর صِلَةٌ আসে عَلٰى

قَوْلُهُ اَنْ لَا يَصِلَ اِلَيْهِ اَىْ لَئِلَّا يَصِلَ اِلَيْهِ بِسُوْءٍ : এটা হলো مَنَعْنَاهُ -এর ইল্লত وَاذْكُرْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
হযরত দাউদ (আ.) ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত দাউদ ও মূসা (আ.)-এর মাঝে ৫৬৯ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) ৫৬৮ বছর বেঁচেছিলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মাঝে ১৭০০ [এক হাজার সাতশত বছরের ব্যবধান ছিল। –[হাশিয়াতুল জুমাল]

قَوْلُهُ زَرْعٌ : زَرْعٌ অর্থ– ফসলের চাষাবাদ, كَرْمٌ অর্থ– আঙ্গুর।

قَوْلُهُ نَفَشَتْ النَّفْشُ الرَّعْىُ بِاللَّيْلِ بِلَا رَاعٍ : রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা। এটা (ن، ض، س،) نَفْشًا থেকে গৃহীত। আর هَمْلٌ বলা হয় দিনের বেলা রাখালবিহীন ফসলকে মাড়িয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেওয়াকে। لِحُكْمِهِمْ -এর মধ্যে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের যমীরটি হয়তো রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে। رِقَابُ الْغَنَمِ অর্থাৎ, ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ।

قَوْلُهُ يُسَبِّحْنَ : এটা اَلْجِبَالُ থেকে حَالٌ অর্থাৎ, مُسَبِّحَةٌ অর্থে। কেউ কেউ এটাকে جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ বলেছেন। যেন কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে যে, كَيْفَ سَخَّرَهُنَّ ؟ فَقَالَ يُسَبِّحْنَ

قَوْلُهُ وَالطَّيْرَ : اَلْجِبَالُ এর উপর عَطْف -এর কারণে এটা مَنْصُوْبٌ হতে পারে এবং مَفْعُوْلٌ مَعَهُ -এর কারণেও হতে পারে। কোনো কোনো কেরাতে وَالطَّيْرُ মারফূ'-ও রয়েছে। এ সময় হয়তো এটা مُبْتَدَأٌ হবে এবং তার خَبَرٌ বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ, وَالطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٌ اَيْضًا অথবা يُسَبِّحْنَ -এর যমীরের উপর عَطْفٌ হবে। কিন্তু এ সময় একটি ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ -এর মাধ্যমে تَاكِيْدٌ কিংবা فَصْلٌ জরুরি হবে। এটা বসরার নাহবীগণের মতে। আর কূফীগণের মতে এটা জরুরি নয়।

قَوْلُهُ لِاَمْرِهِ بِهِ : এটা مَصْدَرٌ যা তার فَاعِلٌ -এর প্রতি মুযাফ হয়েছে। তার مَفْعُوْلٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, لِاَمْرِ دَاوُدَ لَهُمَا بِهِ اَىْ بِالتَّسْبِيْحِ اِذَا وَجَدَ دَاوُدُ فَتْرَةً অর্থাৎ, দাউদ (আ.) যখন জিকির ও তাসবীহে ক্লান্তি অনুভব করতেন তখন পাহাড় ও পাখিদেরকে তাসবীহ আদায়ের নির্দেশ দিতেন। যাতে জিকির ও তাসবীহের পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এর দরুন তার ভিতরে আনন্দ জাগরিত থাকে। সাথে সাথে এর দ্বারা তাঁর ক্লান্তিরও অবসান ঘটে। صَفَائِحٌ শব্দটি صَفِيْحَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রত্যেক চওড়া বস্তু : চাই তা পাথরের হোক কিংবা লোহার। لَكُمْ এটা عَلَّمْنَا -এর সাথে মুতাআল্লিক। আর لَامٌ টি تَعْلِيْلٌ -এর জন্য হবে। অর্থাৎ, عَلَّمْنَا لِاَجْلِكُمْ আর لِيُحْصِنَكُمْ এটা حَرْف جَارٌ -এর পুনরুক্তিসহ بَدَلٌ হবে অর্থাৎ لَكُمْ لِاِحْصَانِكُمْ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে عَلَّمْنَا -এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে।

قَوْلُهُ فِىْ جُمْلَةِ النَّاسِ اَىْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ : এর দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, لَكُمْ -এর দ্বারা মক্কাবাসী উদ্দেশ্য। অথচ তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে উপস্থিত ছিল না। এর উত্তর এই যে, এটা এমনই এক নিয়ামত যা পরবর্তীতে অন্যান্য লোকদের মধ্য হতে মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছেছে।

قَوْلُهُ بِحَسْبِ اِرَادَتِهِ : এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এখানে رِيْحٌ -এর صِفَتْ আনা হয়েছে عَاصِفَةٌ -কে। এর অর্থ হলো প্রবল বায়ু ঝড়। অপর আয়াতে رُخَاءٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর অর্থ হলো মৃদু হাওয়া। কাজেই উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা দেখা যায়।

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইচ্ছা অনুপাতে বাতাসের বেগের মধ্যে তারতম্য হতো। তিনি যেমন বলতেন, তেমন বেগেই তা প্রবাহিত হতো। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই।

قَوْلُهُ مِنْ ذٰلِكَ عَلِمَهُ تَعَالٰى : এটা হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর عَلِمَهُ بِاَنَّ مَا يُعْطِيْهِ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهُ مَنْ يَغُوْصُوْنَ : مَنْ টি মাওসূলাহ ও مَوْصُوْفَةٌ উভয় হতে পারে। আর اَلرِّيْحُ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে বাক্য হয়ে স্থানগতভাবে مَنْصُوْبٌ হবে। অর্থাৎ– سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَمَنْ يَغُوْصُوْنَ لَهُ আর مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে يَغُوْصُوْنَ -কে বহুবচনে আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ : مِنْ قَبْلُ-এর অর্থ হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর যে আহবানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন- رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার! পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন কোনোরূপেই তার উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন- اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ, আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছে থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

قَوْلُهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ : كَرْبٍ عَظِيْمٍ [মহা সংকট] বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

قَوْلُهُ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই পর্যায়ের পঞ্চম ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। নবুয়ত এবং রাজত্ব উভয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দান করেছিলেন। আমিরী এবং ফকিরী একত্র হয়েছিল তাঁদের মাঝে। হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের একটি নমুনা ছিল। হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.) নবী ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আর হযরত ওমর (রা.) নবী ছিলেন না তবে শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মোহাম্মদ ﷺ -এর খলীফা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের উভয়কে অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। বিশেষত হযরত সুলায়মান (আ.)-কে অতি শৈশবেই যে সুতীক্ষ্ম প্রতিভা দান করেছেন তা তখনই মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ

"আর স্মরণ কর দাউদ এবং সুলায়মানের কথা যখন তাঁরা বিচার করছিলেন একটি শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হলো ঐ ক্ষেত্রটি ছিল আঙ্গুরের। আর কাতাদা (রা.) বলেছেন, তা ছিল শস্যক্ষেত্র।

قَوْلُهُ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ : فَفَهَّمْنَاهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝিয়ে দিলেন। মকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালাও শরিয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের সুবিধানজনক ছাড় ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। [সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই] হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। [কেননা, ফিকহের পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যর সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।] বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালত থেকে বের হয়ে আসলে [দরজায় তাঁর পুত্র] হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি রায় দিলে তা

ভিন্নরূপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ.) বললেন, এই রায় থেকে যা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য উপকারী সেই রায়টা কি? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন! সে এগুলোর দুধ পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন শস্যক্ষেত্রে শস্যক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন! হযরত দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেন, বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্ত করা যায় কি? এখানে প্রশ্ন হয়, হযরত দাউদ (আ.) যখন একটি রায় দিয়েছিলেন, তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? আর যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোনো বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনা? অর্থাৎ, রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করার অধিকার আছে কিনা?

কুরতুবী (র.) এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোনো বিচারক শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোনো বিচারকের রায় শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। কেননা এই রীতি প্রবর্তিত হলে প্রত্যেহ হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিককোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) হযরত আবূ মূসা আশাআরী (রা.)-এর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেওয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী (র.) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুবী সংক্ষেপিত] শামসুল আয়িম্মা সুরখসী (র.) মবসুতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) উভয়ের রায় স্ব স্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং হযরত সুলায়মান (আ.) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মকদ্দমার রায় ছিল না: বরং এটা ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কুরআনে وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [অর্থাৎ, আপস করা উত্তম] বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। -[মাযহারী]

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয় তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে শরিয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। -[মাঈনুল হুক্কাম]

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, নাকি কোনো একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে : এ স্থলে কুরতুবী (র.) বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পর বিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا এতে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কোনোরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় সত্য ছিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর

রায়ও। তবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয়, তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য, অর্থাৎ, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক ছওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দ্বিতীয় ছওয়াব সে পাবে না [অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে]। এই হাদীস থেকে আলেমগণের উপরিউক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতোই। কেননা উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্তার দিকে দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম ছওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহগার হবে এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তাফসীর কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারো জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত : হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর শরিয়তের ফয়সালা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারো জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদ (র.)-এর ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেতের হেফাজত করা মালিকদের দায়িত্ব। হেফাজত সত্ত্বেও যদি রাত্রি বেলায় কারো জন্তু ক্ষতিসাধন করে তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও কূফার ফিকহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হেফাজতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হেফাজতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ অর্থাৎ, জন্তু কারো ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না [অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্যে মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত]। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়; বরং জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঘটনা যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবিলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ : পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ : হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যাবূর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তাসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মুজেযা। মুজেযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা

থাকা জরুরি নয়; বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মুজেযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। হযরত আবূ মূসা (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন তখন আরজ করলেন, আপনি শুনছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। -[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালের কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা তো শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য গায়েব হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ : বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لِبَاسٌ বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটাসরু করতে পারতেন। **দুই.** লোহা আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গাম্বরগণের কাজ : আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প হযরত দাউদ (আ.)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ অর্থাৎ, যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ম তরবারির বিপদ থেকে হেফাজত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ছওয়াবের কাজ তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গাম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে। যেমন- হযরত দাউদ (আ.) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার ছওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসরের নামাজ ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চেয়ে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ-এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যেমন দাউদ (আ.)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তাসবীহ পাঠ করত, তেমনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বশীকরণের মধ্যে مَعَ [সাথে] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে لِ [জন্য] অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সুক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। হযরত দাউদ (আ.) যখন তেলাওয়াত করতেন তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তাসবীহ পাঠ শুরু

করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতো না। পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। -[রূহুল মা'আনী, বায়যাভী]

তাফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করতো। অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এ সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌঁছিয়ে দিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে হযরত সুলায়মান (আ) মাথা নত করে আল্লাহর জিকির ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। -[ইবনে কাসীর]

عَاصِفَةً -এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رُخَاءً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ- মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধূলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোনো পাখীরও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

সুলায়মান (আ.)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ অর্থাৎ, আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত। যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে- يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ অর্থাৎ, তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। হযরত সুলায়মান (আ.) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيَاطِيْنُ তথা শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝানোর জন্য আসলে جِنٌّ অথবা جِنَّاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয় কাফের, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল। কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শনাবলি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيَاطِيْنُ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব : হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন। যথা- পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য দেখাও যায় না, এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন। যেমন- বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। -[তাফসীরে কবীর]

অনুবাদ :

٨٣. وَ اذْكُرْ اَيُّوْبَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ لَمَّا ابْتُلِيَ بِفَقْدِ جَمِيْعِ مَالِهٖ وَوَلَدِهٖ وَتَمْزِيْقِ جَسَدِهٖ وَهَجْرِ جَمِيْعِ النَّاسِ لَهٗ اِلَّا زَوْجَتَهٗ سِنِيْنَ ثَلَاثًا اَوْ سَبْعًا اَوْ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ وَضُيِّقَ عَيْشُهٗ اَنِّىْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ مَسَّنِىَ الضُّرُّ اَىِ الشِّدَّةُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

৮৩. এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা এ থেকে بَدْل হচ্ছে যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহবান করে বলছিলেন যখন তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন সকল ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিলীন হয়ে যাওয়ায়। রোগের কারণে শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, স্ত্রী ব্যতীত সকল মানুষ তাকে পরিত্যাগ করার পর সুদীর্ঘ তিন, সাত বা আঠারো বছর দুর্বিষহ জীবন যাপন করার মাধ্যমে নিশ্চয় আমি اَنِّىْ এর হামযাটি بَاءْ উহ্য থাকার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٨٤. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ نِدَاءَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ اَوْلَادَهُ الذُّكُوْرَ وَالْاِنَاثَ بِاَنْ اُحْيُوْا لَهٗ وَكُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ ثَلَاثٌ اَوْ سَبْعٌ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ مِنْ زَوْجَتِهٖ وَزِيْدَ فِىْ شَبَابِهَا وَكَانَ لَهٗ اَنْدَرٌ لِلْقَمْحِ وَاَنْدَرٌ لِلشَّعِيْرِ فَبَعَثَ اللّٰهُ سَحَابَتَيْنِ اَفْرَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلٰى اَنْدَرِ الْقَمْحِ الذَّهَبَ وَالْاُخْرٰى عَلٰى اَنْدَرِ الشَّعِيْرِ الْوَرِقَ حَتّٰى فَاضَ رَحْمَةً مَفْعُوْلٌ لَهٗ مِّنْ عِنْدِنَا صِفَةٌ وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ . لِيَصْبِرُوْا فَيُثَابُوْا .

৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি তার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিলাম। এভাবে যে, তার পুত্র-কন্যাগণকে জীবিত করা হলো। উভয় প্রকারের সন্তান তিনজন বা সাতজন করে ছিল। এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিলাম তার স্ত্রী হতে, তাঁর যৌবন বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো, তার এক উঠান পূর্ণ ছিল গম দ্বারা। অপর উঠান পূর্ণ ছিল যব দ্বারা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'টি মেঘ প্রেরণ করলেন, এক মেঘ গমের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং অপরটি যবের পরিবর্তে রৌপ্য বর্ষণ করল এমন কি তা গড়িয়ে পড়ল। বিশেষ রহমত রূপে رَحْمَةً টি مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে আমার পক্ষ থেকে رَحْمَةً টা كَائِنَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে عِنْدَنَا -এর সিফত হয়েছে। এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। যাতে তারা ধৈর্য ধারণ করে, ফলে পুণ্যপ্রাপ্ত হবে।

٨٥. وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ . عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ وَعَنْ مَعَاصِيْهِ .

৮৫. এবং স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল কিফল (আ.)-এর কথা। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল আল্লাহর আনুগত্য ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٨٦. وَادْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ط مِنَ النُّبُوَّةِ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . لَهَا وَسُمِّيَ ذَا الْكِفْلِ لِاَنَّهُ تَكَفَّلَ بِصِيَامِ جَمِيْعِ نَهَارِهِ وَبِقِيَامِ جَمِيْعِ لَيْلِهِ وَاَنْ يَّقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَغْضَبَ فَوَفٰى بِذٰلِكَ وَقِيْلَ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا .

৮৬. আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম নবুয়ত দান করে তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ নবুয়তের জন্য। আর যুল কিফলকে এ নামে নামকরণের কারণ হচ্ছে যে, তিনি সারা দিন সিয়াম সাধনা করা, সারা রাত ইবাদত করা, মানুষের মাঝে বিচার মীমাংসা করা ও কারো প্রতি ক্রোধান্বিত না হওয়াকে তিনি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে,. তিনি নবী ছিলেন না।

٨٧. وَ اذْكُرْ ذَا النُّوْنِ صَاحِبَ الْحُوْتِ وَهُوَ يُوْنُسُ بْنُ مَتّٰى وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ اَيْ غَضْبَانَ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَاسٰى مِنْهُمْ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَيْ نَقْضِيَ عَلَيْهِ مَا قَضَيْنَا مِنْ حَبْسِهِ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ اَوْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوْتِ اَنْ اَيْ بِاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ . فِيْ ذَهَابِيْ مِنْ بَيْنِ قَوْمِيْ بِلَا اِذْنٍ .

৮৭. এবং স্মরণ করুন যুননূন এর কথা মৎস্যজীবি। শিকারী, আর তিনি হলেন হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)। আগত অংশ এর থেকে بَدْل হয়েছে। যখন তিনি ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি। তাঁর প্রতি তাদের মন্দ আচরণের কারণে। অথচ তাকে চলে যেতে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এবং তিনি মনে করেছিলেন আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না অর্থাৎ মাছের পেটে তাকে বন্দী রাখার যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম তা করব না, অথবা এ কারণে আমি তার উপর সংকীর্ণতা আরোপ করব না। অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে আহবান করেছিলেন রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার ও মৎস-উদরের অন্ধকার। এভাবে যে, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান, আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী বিনা অনুমতিতে আমার সম্প্রদায় হতে চলে আসার কারণে।

٨٨. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط بِتِلْكَ الْكَلِمٰتِ وَكَذٰلِكَ كَمَا اَنْجَيْنٰهُ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ . مِنْ كَرْبِهِمْ اِذَا اسْتَغَاثُوْا بِنَا دَاعِيْنَ .

৮৮. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। এবং এভাবেই যেমনিভাবে আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি আমি মুমিনগণকে উদ্ধার করে থাকি। তাদের বিপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে যখন তারা আমাকে ডেকে ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

অনুবাদ :

٨٩. وَ اذْكُرْ زَكَرِيَّا وَيُبْدَلُ مِنْهُ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ بِقَوْلِهٖ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا اَىْ بِلَا وَلَدٍ يَرِثُنِىْ وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ـ اَلْبَاقِىْ بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِكَ ـ

৮৯. এবং স্মরণ করুন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কথা পরবর্তী অংশ এর থেকে بَدَلْ হয়েছে। তিনি যখন তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন তাঁর এ উক্তি দ্বারা হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না অর্থাৎ সন্তানহীন, যে আমার ওয়ারিশ হবে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী স্থায়ী আপন সৃষ্টি বিনাশ সাধনের পর।

٩٠. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ز نِدَاءَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَلَدًا وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط فَاَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ عُقْمِهَا اِنَّهُمْ اَىْ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ يُبَادِرُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ الطَّاعَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا فِىْ رَحْمَتِنَا وَرَهَبًا ط مِنْ عَذَابِنَا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ـ مُتَوَاضِعِيْنَ فِىْ عِبَادَتِهِمْ ـ

৯০. অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম। তার ডাকে এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া সন্তান এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। সুতরাং সে বন্ধ্যাত্বের পর সন্তান প্রসব করল। নিশ্চয় তাঁরা অর্থাৎ যে সকল নবীগণের আলোচনা করা হলো। তাঁরা প্রতিযোগিতা করতেন সৎকর্মে আনুগত্যে ও ইবাদতে তাঁরা আমাকে ডাকতেন আশা নিয়ে আমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার ও ভয়ের সাথে আমার শাস্তির এবং তাঁরা ছিলেন আমার নিকট বিনীত। তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে বিনয়ী।

٩١. وَ اذْكُرْ مَرْيَمَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا حَفِظَتْهُ مِنْ اَنْ يُّنَالَ فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا اَىْ جِبْرِيْلَ حَيْثُ نَفَخَ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيْسٰى وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ اَلْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ حَيْثُ وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ ـ

৯১. এবং মরিয়মকে স্মরণ করুন সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল তার পর্যন্ত পৌঁছানো থেকে তাকে রক্ষা করছিল। অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ জিবরীলকে, সে তার গ্রীবা দেশে ফুৎকার দিল। ফলে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে গর্ভধারণ করলেন। এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। মানব, দানব ও ফেরেশতাগণের জন্য। কেননা তিনি পুরুষ বিনে সন্তান প্রসব করেছেন।

٩٢. اِنَّ هٰذِهٖٓ اَىْ مِلَّةَ الْاِسْلَامِ اُمَّتُكُمْ دِيْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُخَاطَبُوْنَ اَىْ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنُوْا عَلَيْهَا اُمَّةً وَّاحِدَةً ز حَالٌ لَازِمَةٌ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ - وَحِّدُوْنِ -

٩٣. وَتَقَطَّعُوْٓا اَىْ بَعْضُ الْمُخَاطَبِيْنَ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط اَىْ تَفَرَّقُوْا اَمْرَ دِيْنِهِمْ مُتَخَالِفِيْنَ فِيْهِ وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى قَالَ تَعَالٰى كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ - اَىْ فَنُجَازِيْهِ بِعَمَلِهٖ -

অনুবাদ :

৯২. নিশ্চয় এটা ইসলাম ধর্ম তোমাদের জাতি তোমাদের ধর্ম। হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা একান্তই আবশ্যক একই জাতি এটা حال لازمه হয়েছে امة -এর এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমার ইবাদত কর। আমার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর।

৯৩. তারা ভেদ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ সম্বোধিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ তারা দীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কয়েকটি গ্রুপ বা দল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যানীত হবে। অর্থাৎ, তখন আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَاذْكُرْ اَيُّوْبَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ : এখানে اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ বাক্যাংশটি اَيُّوْبَ অর্থাৎ, বিলুপ্ত মুজাফ থেকে بَدَل হয়েছে। অর্থাৎ, خَبَرَ اَيُّوْبَ থেকে।

قَوْلُهٗ لَمَّا ابْتُلِىَ : এটা نَادٰى -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَضِيْقُ عَيْشِهٖ : ضِيْق শব্দটি মাজহুলরূপে পড়লে এর عَطْف হবে اُبْتُلِىَ -এর উপর। আর ضِيْقٌ মাসদার পড়লে তখন فَقْدٌ -এর উপর عَطْف হবে এবং بَا -এর অধীনে হবে। অর্থাৎ, اُبْتُلِىَ بِضِيْقِ عَيْشِهٖ হবে।

قَوْلُهٗ سِنِيْنَ ثَلَاثًا : এটা হলো اُبْتُلِىَ -এর ظَرْف

قَوْلُهٗ اَنْدَرُ : এটা بُنْدَرٌ এর ছন্দে। অর্থ– উঠান, আর এর বহুবচন হলো اَنَادِرُ ; সেই স্থানকে শামবাসীদের ভাষায় بَيْدَرٌ সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে খাদ্যশস্য মাড়াই করা হয়।

قَوْلُهٗ رَحْمَةً : এটা اٰتَيْنَاهُ -এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ আর উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ– رَحِمْنَاهُ رَحْمَةً তবে প্রথমটিই অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهٗ مِنْ عِنْدِنَا : এটা رَحْمَةً -এর صِفَتْ অর্থাৎ رَحْمَةً كَائِنَةً مِنْ عِنْدِنَا আর ذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ -এর মধ্যে عَابِدِيْنَ -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা আবেদগণই বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন।

قَوْلُهٗ لِيَصْبِرُوْا : অর্থাৎ, যেভাবে আইয়ূব (আ.) ধৈর্যধারণ করেছিলেন তদ্রূপ।

قَوْلُهٗ وَاَدْخَلْنٰهُمْ : এর عَطْف হলো উহ্য فِعْل -এর উপর অর্থাৎ–

فَاَعْطَيْنَاهُمْ ثَوَابَ الصَّابِرِيْنَ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا -

قَوْلُهُ وَذَا الْكِفْلِ : এর নাম ছিল বিশর ইবনে আইয়ূব, আর যুল কিফল তার উপাধি। ذُو النُّوْنِ এটাও উপাধি। আসল নাম হলো ইউনুস ইবনে মাত্তা। মাত্তা শব্দটি شَتّٰى -এর ছন্দে। যেহেতু হযরত ইউনুস (আ.) কয়েকদিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন, এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল জুননূন তথা মাছওয়ালা।

قَوْلُهُ مُغَاضِبًا : এটা ذَهَبَ -এর যমীর থেকে حَالٌ- بَابُ مُفَاعَلَةٌ থেকে। অধিকাংশ সময় এটা দুপক্ষের অংশীদারিত্ব কামনা করে। তবে এখানে অংশীদারিত্ব নেই; বরং عَاقَبْتُ اللِّصَّ -এর অন্তর্গত তথা একপক্ষ থেকে হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তিনি তার সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। ব্যাখ্যাকার (র.) اَىْ غَضْبَانَ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা অংশীদারিত্ব উদ্দেশ্যে হতে পারে। অর্থাৎ, তিনি তার কওমের উপর নারাজ হলেন এবং তার কওমও তার উপর নারাজ ছিল। এ কারণে শুরুতে কওমের লোকেরা তার উপর ঈমান আনেনি।

قَوْلُهُ نَقْضِىْ عَلَيْهِ الخ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এটা قَدَرٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, لَنْ قُدْرَةٌ থেকে নয়। قَدْرٌ এর অর্থ হলো সিদ্ধান্ত দেওয়া বা কঠোরতা করা। অতএব لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ -এর অর্থ হয়তো نَقْضِىَ عَلَيْهِ হবে। অর্থাৎ আমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি তা বাস্তবায়ন করব না। এ ব্যাপারে ক্ষমতা রাখি না– এটা কুফরি আকিদা হবে। একজন সাধারণ মুসলমানও এ ধরনের আকিদা রাখতে পারে না, নবী তো দূরের কথা।

قَوْلُهُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ : এর দুটি তারকীব হতে পারে। যথা– ১. اِنْ টি مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ হবে। আর এর اِسْم বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ اِنَّهٗ আর পরের অংশটি এর خَبَرْ হবে। ২. এটি تَفْسِيْرِيَّةٌ হবে। কেননা এটা قَوْل কিংবা তার সমর্থক কোনো শব্দের পরে উল্লিখিত হয়। আর এখানে এর পূর্বে نَادٰى এসেছে। এটা قَوْل -এর অর্থে। অর্থাৎ, এ তারকীবও যথার্থ হবে।

قَوْلُهُ يَرِثُنِىْ : এখানে নবুয়ত, ইলম ও হিকমত -এ উত্তরাধিকারী হওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ : এটা উহ্য শব্দের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। অর্থাৎ, فَارْزُقْنِىْ وَارِثًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

قَوْلُهُ عَقْمٌ اَىْ اِنْسِدَادُ الرَّحْمِ عَنِ الْوِلَادَةِ : অর্থাৎ, বন্ধ্যা, শব্দটি পেশ বা যবরযোগে। অথাৎ যে নারী সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা রাখে না।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ : এটা উহ্য বাক্যের ইল্লত অর্থাৎ نَالُوْا مَا نَالُوْا لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ এ সকল মনীষীগণকে যেসব ফজিলত ও মর্যাদা দান করা হয়েছিল তার কারণ ছিল কল্যাণকর সকল বিষয়ের প্রতি তাঁদের অগ্রগামী হওয়া। يُسَارِعُوْنَ -এর صِلَةٌ টি اِلٰى -এর স্থলে فِىْ আনার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ رَغَبًا وَرَهَبًا : এটা يَدْعُوْنَ -এর مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হতে পারে। আবার حَالٌ -এর স্থলে উল্লিখিত হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ– يَدْعُوْنَ رَاغِبِيْنَ وَرَاهِبِيْنَ

قَوْلُهُ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا : এটা বিলুপ্ত مَوْصُوْف -এর صِفَتْ যা উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের مَعْمُوْل অর্থাৎ– اُذْكُرْ مَرْيَمَ الَّتِىْ الخ

قَوْلُهُ اٰيَةً : বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, اٰيَتَيْنِ বলা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু মা ও সন্তান উভয়ে সম্মিলিতভাবে একটি নিদর্শন ছিল। এজন্য اٰيَةً -কে একবচন আনা হয়েছে। আবার একটার উপর অনুমান করে অন্যটিকে বিলুপ্ত করারও সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত وَجَعَلْنَهَا اٰيَةً وَابْنَهَا اٰيَةً ছিল।

قَوْلُهُ اُمَّتُكُمْ : এটা مَرْفُوْعٌ হলে اِنَّ-এর خَبَرْ হবে। আর مَنْصُوْب হলে بَدَلٌ কিংবা عَطْف بَيَانٌ হবে।

قَوْلُهُ اُمَّةً وَاحِدَةً : এটা اُمَّتُكُمْ থেকে حَالٌ لَازِمَةٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা اُمَّتْ শব্দের মধ্যে একবচন ও বহুবচনের অর্থ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى : এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা মুসলমানদের মধ্যেও ৭৩টি ফেরকা হবে।

قَوْلُهُ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ : এখানে تَقَطَّعُوْا ক্রিয়াটি قَطَعُوْا অর্থে। আর اَمْرَهُمْ হলো এর مَفْعُوْل بِهٖ ; اَمْرَهُمْ -এর অর্থ হলো فِىْ اَمْرِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী : আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কুরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায়, যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোনো কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন বরং তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন–

আল্লাহ,তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গাম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এসব বস্তু তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে, জিহবা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহবা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ.)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মিশা ইবনে ইউসুফ (আ.)। –[ইবনে কাসীর]

সহায় সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। হযরত আইয়ূব (আ.)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, পয়গাম্বরগণ সবচেয়ে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত, তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় [যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়]। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পয়গাম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ.)-কে শোকরের এমনি স্বতন্ত্র দান করা হয়েছিল।] বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে হযরত আইয়ূব (আ.) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন, আল্লাহ যখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোনো অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থি নয় : হযরত আইয়ূব (আ.) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। এতে কোনো সময় হাহুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরজও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপতি করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গাম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না, যেন কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় [অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট

পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়]। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল, বেসবরী ছিল না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন- انا وجدناه صابرا [আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি]। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়ূব (আ.) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্য রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইয়ূব (আ.)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকেতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হযরত আইয়ূব (আ.) বললেন, আমিই আইয়ূব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? হযরত আইয়ূব (আ.) আবার বললেন, লক্ষ্য করে দেখ আমিই আইয়ূব। আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমাকে নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। -[ইবনে কাসীর]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তান এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআনে ومثله معهم বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী (র.) বলেন, এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। -[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন, পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মতো সন্তান বলে সন্তানের সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস (আ.) যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুল কিফল। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, তাঁর নাম দু'জন পয়গাম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গাম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং তিনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা [যিনি পয়গাম্বর ছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে] বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাহাবীকে একত্র করে বললেন, আমি আমার খলিফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই- সদাসর্বদা রোজা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোনো সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্যে থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল, আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সদাসর্বদা রোজা রাখো, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্‌সা কর না? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মতো তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুল কিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল, যাও, কোনোরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল, তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুল কিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপরে এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুল কিফল বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুল কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মকদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল, হুযুর আমার শত্রু পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার কোনো হাদীস পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনেও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুল কিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভিতরে ঢুকলে কিভাবে? তখন যুল কিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সবচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনোরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুল কিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুল কিফল' শব্দের অর্থ– অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুল কিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। –[ইবনে কাসীর]

মসনদে আহমদে আরো একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুল কিফলের পরিবর্তে 'আল-কিফল' নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে আয়াতে বর্ণিত যুল কিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন– বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোনো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর কোনো জোর জবরদস্তি করছি? মহিলাটি বলল, না, জবরদস্তি করনি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনোদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল, যাও এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনোদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল– غَفَرَ اللّٰهُ لِلْكِفْلِ অর্থাৎ, আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্ সিত্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেওয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে; যুল কিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোনো ব্যক্তি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুল কিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা ও সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ কোনো পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গাম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَذَا النُّوْنِ : হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)-এর কাহিনী কুরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহিবুল হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হুত' উভয় শব্দের অর্থ– মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহিবুল হুতের অর্থ– মাছওয়ালা। হযরত ইউনুস (আ.)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহিবুল হুত শব্দের মাধ্যমে ও তা ব্যক্ত করা হয়।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী : তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মূসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস (আ.) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উক্ত জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আজাব এসেই যাবে [কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল।] অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সকল আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব হটিয়ে দেন। এ দিকে হযরত ইউনুস (আ.) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন তো আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। –[মাযহারী]

এর ফলে হযরত ইউনুস (আ)–এর প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলো। ঘটনাক্রমে এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম বের হল। [আরোহীরা] বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই] তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হলো। এবারও হযরত ইউনুস (আ.)-এ নামই বের হলো। আরোহীরা তখনো দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লাটারি করা হলো; কিন্তু নাম হযরত ইউনুস (আ.)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ অর্থাৎ, লটারির ব্যবস্থা করা হলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ সাগরের এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগপতিতে সেখানে পৌঁছে যায় [ইবনে মাসউদের উক্তি] এবং সে হযরত ইউনুস (আ.)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ.)-এর অস্থি মাংসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। –[ইবনে কাসীর]

কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্র মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আজাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গাম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোনো ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু

আল্লাহ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আজাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণনাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ ছিল না। কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গাম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই হযরত ইউনূস (আ.) আল্লাহর রোষে পতিত হন।

তাফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব হটে যাওয়ার পরই হযরত ইউনূস (আ.)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আজাব দানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন– পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদানরূপে গণ্য হয়ে থাকে। যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا : অর্থাৎ, ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। رَبِّ শব্দটিকে যারা مُغَاضِبًا -এর مَفْعُوْلٌ বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও مُغَاضِبًا لِرَبِّهِ অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। আর কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত। –[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ : অভিধানের দিকে দিয়ে نَقْدِرْ শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১. যদি قُدْرَتٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোনো পয়গাম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না। কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফরি। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। ২. এটা قَدْر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা যেমন এক আয়াতে রয়েছে– اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী প্রমুখ তাফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউনুস (আ.) মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনোরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। ৩. এটা তাফসীরের অর্থে قَدْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, হযরত ইউনুস (আ.) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদা, মুজাহিদ ও ফাররা (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ : ইউনুস (আ.)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল : অর্থাৎ, আমি যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি, যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোবিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ মাছের পেটে কৃত হযরত ইউনুস (আ.)-এর এই দোয়াটি যদি কোনো মুসলমান কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউনূস (আ.) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহিয়া (আ.) -এর আলোচনা করা হয়েছে। এটি এ পর্যায়ের নবম ঘটনা। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি যখন তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একলা ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ, আমাদেরকে লা-ওয়ারিশ এবং নিঃসন্তান রেখো না, আমাকে সন্তান দান কর; যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ : 'তুমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী'। অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা দিতে পার। অথবা এর অর্থ হলো– প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীগণ সকলেই শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু হে আল্লাহ! তুমি সর্বকালে থাকবে। তুমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চির বিরাজমান।

قَوْلُهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ : আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে পুত্র সন্তান ইয়াহইয়াকে দান করেছিলেন। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা। আর এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আল্লাহ পাক তাঁকে সন্তানবতী হওয়ার যোগ্য করে দিলেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন বন্ধ্যা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত করে দিলেন।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ : 'এই নবীগণ সৎ কাজ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা করতো'। অর্থাৎ কে কত বেশি নেক আমল করতে পারে, তার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো । আর আমাকে ডাকতো আশা এবং ভয় নিয়ে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের নৈকট্যধন্য হওয়ার আশা, ছওয়াব লাভের আশা এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতো। আর ভয় হলো আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ভয়; তথা তাকে ভুলে থাকার ভয় অথবা গুনাহের ভয় অথবা আজাবের ভয়। অর্থাৎ, আশা এবং ভয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁরা দোয়া করতেন

قَوْلُهُ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ : তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্যের কারণে মানব মনে যে ভয়ের সৃষ্টি হয় তাকেই 'খুশু' বলা হয়। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফ হতেন, তাই তাঁরা তাঁদের অন্তরের গভীরে আল্লাহ পাকের ভয় পোষণ করতেন। আর ঐ ভয় থেকে সৃষ্টি হয় বিনয়ের। তাই তাঁরা হতেন অত্যন্ত বিনয়ী।

কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন এভাবে যে, তাঁরা আমার হুকুমের তাবেদার হতো অত্যন্ত বেশি।

–[তাফসীরে মাযহারী খ.৭, পৃ. ৫২২]

বর্ণিত আছে যে একবার হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো, তাঁর 'হামদ' পেশ করতে থাকো এবং আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকো; আর বিনীতভাবে তাঁর দরবারে দোয়া করো। মনে রেখে, আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর এই সব গুণের উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআনে।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৭, পৃ. ৩২]

قَوْلُهُ وَالَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে সাধারণত হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর আলোচনার পরই হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। কেননা, উভয় ঘটনার মধ্যে এক বিস্ময়কর মিল দেখতে পাওয়া যায়। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ মানুষ এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা। এই অবস্থায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে ঐ অবস্থায় একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, যার নামকরণ করা হয়েছে ইয়াহইয়া। এ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা মারইয়ামের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা। কেননা মারইয়াম (আ.) ছিলেন কুমারী। অথচ আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা হিসেবে তাঁর ঘরেই আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন হযরত ঈসা (আ.)-কে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি পিতা ব্যতীতও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন– হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামে স্থান পেয়েছে।

মূলত এসবই পাকের বিস্ময়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। বিশ্ববাসীর জন্যে এসব হলো চিরস্মরণীয় নমুনা; যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্যে।

অনুবাদ :

٩٤. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ اَىْ جُحُوْدَ لِسَعْيِهٖ ج وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ـ بِاَنْ نَأْمُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِهٖ فَنُجَازِيْهِ عَلَيْهِ ـ

৯৪. সুতরাং যদি কেউ মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না অস্বীকার করা হবে না। এবং আমি তা লিখে রাখি এভাবে যে, রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দেই, তারই ভিত্তিতে আমি তাকে প্রতিফল দিব।

٩٥. وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اُرِيْدُ اَهْلَهَا اَنَّهُمْ لَا زَائِدَةٌ يَرْجِعُوْنَ ـ اَىْ مُمْتَنِعٌ رُجُوْعُهُمْ اِلَى الدُّنْيَا ـ

৯৫. যে, জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তার অধিবাসীরা উদ্দেশ্য। তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব। এখানে لَا টা অতিরিক্ত।

٩٦. حَتّٰى غَايَةٌ لِاِمْتِنَاعِ رُجُوْعِهِمْ اِذَا فُتِحَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهٖ اِسْمَانِ اَعْجَمِيَانِ لِقَبِيْلَتَيْنِ وَيُقَدَّرُ قَبْلَهٗ مُضَافٌ اَىْ سَدُّهُمَا وَذٰلِكَ قُرْبَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْاَرْضِ يَّنْسِلُوْنَ ـ يُسْرِعُوْنَ ـ

৯৬. এমনকি এখানে حَتّٰى টি তাদের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হওয়ার সীমাকে বুঝিয়েছে। যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে فُتِحَتْ শব্দের تَاء বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। আর يَاْجُوْز، مَاْجُوْز শব্দ দুটি হামযাবিহীন ও হামযাসহ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এটা অনারবি দুটি গোত্রের নাম। এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে আর তা হলো سَدُّهُمَا [তাদের প্রাচীর] এটা কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে তারা প্রত্যেক টিলা হতে উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসবে।

٩٧. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا هِىَ اَىِ الْقِصَّةُ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهٖ يَقُوْلُوْنَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكُنَا قَدْ كُنَّا فِى الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا الْيَوْمِ بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ـ اَنْفُسَنَا بِتَكْذِيْبِنَا الرُّسُلَ ـ

৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। তখন অকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। সেদিনের কঠোরতার কারণে তারা বলবে হায় দুর্ভোগ আমাদের ধ্বংস আমাদের! এখানে يَاء টি সতর্কীকরণের জন্য আমরা তো ছিলাম পৃথিবীতে এ বিষয়ে উদাসীন এ দিন সম্পর্কে; বরং আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম আমাদের নিজেদের প্রতি রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

٩٨. اِنَّكُمْ يَاَهْلَ مَكَّةَ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنَ الْاَوْثَانِ حَصَبُ جَهَنَّمَ وُقُوْدُهَا اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ـ دَاخِلُوْنَ فِيْهَا ـ

৯৮. তোমরা হে মক্কাবাসীরা! এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত অন্যান্য মূর্তির সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।

অনুবাদ :

٩٩. لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ الْاَوْثَانُ اٰلِهَةً كَمَا زَعَمْتُمْ مَّا وَرَدُوْهَا ط دَخَلُوْهَا وَكُلٌّ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَالْمَعْبُوْدِيْنَ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

৯৯. যদি হতো এরা মূর্তিগুলো ইলাহ যেমনটি তোমরা ধারণা করেছ তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, এবং তাদের সকলেই উপাসনাকারী ও উপাস্যদের তাতে স্থায়ী হতো।

١٠٠. لَهُمْ لِلْعَابِدِيْنَ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ـ شَيْئًا لِشِدَّةِ غَلْيَانِهَا ـ

১০০. তাদের জন্য রয়েছে উপাসকদের জন্য সেথায় আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে না। কোনো কিছুই আগুনের তীব্রতার কারণে।

١٠١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرٰى عُبِدَ عُزَيْرٌ وَالْمَسِيْحُ وَالْمَلَائِكَةُ فَهُمْ فِي النَّارِ عَلٰى مُقْتَضٰى مَا تَقَدَّمَ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْمَنْزِلَةُ الْحُسْنٰى وَمِنْهُمْ مَنْ ذُكِرَ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ـ

১০১. যখন ইবনে যিবা'রা বলল যে, হযরত উযাইর ও ঈসা (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও উপাসনা করা হয়েছে কাজেই তোমাদের কথার চাহিদানুপাতে তারাও দোজখে যাবে, তখন অবতীর্ণ হলো- যাদের জন্য আমার নিকট হতে পূর্ব থেকেই কল্যাণ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে এবং তন্মধ্য হতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে।

١٠٢. لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ج صَوْتَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ مِنَ النَّعِيْمِ خٰلِدُوْنَ ج ـ

১০২. তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেন না তার আওয়াজ তারা সেথায় তাদের মন যা চাইবে ভোগ বিলাস হতে চিরকাল তা ভোগ করবেন।

١٠٣. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَهُوَ اَنْ يُّؤْمَرَ بِالْعَبْدِ اِلَى النَّارِ وَتَتَلَقّٰهُمُ تَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط عِنْدَ خُرُوْجِهِمْ مِنَ الْقُبُوْرِ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ فِي الدُّنْيَا ـ

১০৩. মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবে না আর এটা সে সময় হবে যখন মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে। এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন কবর থেকে বের হওয়ার সময়। তারা তাদেরকে বলবেন, এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীতে।

অনুবাদ :

١٠٤. يَوْمَ مَنْصُوبٌ بِاذْكُرْ مُقَدَّرًا قَبْلَهُ ـ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ اِسْمُ مَلَكٍ لِلْكُتُبِ صَحِيْفَةُ ابْنِ اٰدَمَ عِنْدَ مَوْتِهٖ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ اَوِ السِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ وَالْكِتَابُ بِمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ بِهٖ وَاللَّامُ بِمَعْنٰى عَلٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِلْكُتُبِ جَمْعًا كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ عَنْ عَدَمٍ نُّعِيْدُهٗ ط بَعْدَ اِعْدَامِهٖ فَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُعِيْدُ وَضَمِيْرُهٗ عَائِدٌ اِلٰى اَوَّلَ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَعْدًا عَلَيْنَا ط مَنْصُوبٌ بِوَعَدْنَا مُقَدَّرًا قَبْلَهٗ وَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ مَا قَبْلَهٗ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ مَا وَعَدْنَا ـ

১০৪. সেদিন يَوْمَ শব্দটি তার পূর্বে اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوب হয়েছে। আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেমনিভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর سِجِلّ হলো একজন ফেরেশতার নাম। অর্থাৎ মৃত্যুকালে মানুষের আমলনামা। আর ل টি অতিরিক্ত। অথবা اَلسِّجِلُّ অর্থ আমলনামা। আর اَلْكِتَابُ এটা مَكْتُوْبٌ [লিখিত] অর্থে। আর ل টি عَلٰى অর্থে হয়েছে। অপর এক কেরাতে لِلْكُتُبِ বহুবচন রূপে এসেছে। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনস্তিত্ব থেকে সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব তার অস্তিত্ব বিনাশ করার পর। كَمَا -এর كَاف টি نُعِيْدُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর نُعِيْدُهٗ -এর যমীর اَوَّلَ -এর দিকে ফিরেছে। আর مَا হলো মাসদারিয়া। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য ।وَعْدًا শব্দের পূর্বে بِوَعَدْنَا উহ্য থেকে এটা نَصَب দিয়েছে। এটা তার পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্তুর জন্য তাকিদ স্বরূপ আমি এটা পালন করবই। যা আমি অঙ্গীকার করেছি।

١٠٥. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ بِمَعْنَى الْكِتَابِ اَىْ كُتُبِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ بِمَعْنٰى اُمِّ الْكِتٰبِ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ـ عَامٌّ فِىْ كُلِّ صَالِحٍ ـ

১০৫. আমি যাবূরে লিখে দিয়েছি যাবূর অর্থ হলো কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব। উপদেশের পর ذِكْر এটা উম্মুল কিতাব অর্থে। অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে লেখার পর যা আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রয়েছে। নিশ্চয় ভূমির জান্নাতের ভূমির অধিকারী হবে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ। এখানে اَلصّٰلِحُوْنَ শব্দটি عَامْ বা ব্যাপক যা প্রত্যেক সৎকর্মশীলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

١٠٦. اِنَّ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَبَلٰغًا كِفَايَةً فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ عَامِلِيْنَ بِهٖ ـ

১০৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে কুরআনে উপদেশবাণী যা জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ইবাদত করে। সে অনুপাতে আমলকারীদের জন্য।

١٠٧. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَحْمَةً اَىْ لِلرَّحْمَةِ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ بِكَ ـ

১০৭. আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি। হে মুহাম্মদ ﷺ কেবল রহমত স্বরূপ অর্থাৎ করুণার জন্য বিশ্ব জগতের প্রতি মানুষ এবং জিনের জন্য আপনার মাধ্যমে।

অনুবাদ :

١٠٨. قُلْ إِنَّمَا يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج أَيْ مَا يُوْحَى إِلَيَّ فِيْ أَمْرِ الْإِلٰهِ إِلَّا وَحْدَانِيَّتُهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ مُنْقَادُوْنَ لِمَا يُوْحَى إِلَيَّ مِنْ وَحْدَانِيَّتِهِ وَالْإِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ.

১০৮. বলুন, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ অর্থাৎ, আমার নিকট ইলাহ এর ব্যাপারে এটা ছাড়া আর কোনো প্রত্যাদেশ করা হয়নি যে, তিনি একসত্তা। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাও আমার নিকট প্রত্যাদেশকৃত তার একত্ববাদের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে যাও। এখানে اِسْتِفْهَامٌ মূলত নির্দেশসূচক।

١٠٩. فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ أَعْلَمْتُكُمْ بِالْحَرْبِ عَلٰى سَوَاءٍ ط حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ أَيْ مُسْتَوِيْنَ فِيْ عِلْمِهِ لَا أَسْتَبِدُّ بِهِ دُوْنَكُمْ لِتَتَأَهَّبُوْا وَإِنْ مَا أَدْرِيْ أَقَرِيْبٌ أَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ . مِنَ الْعَذَابِ أَوِ الْقِيٰمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ اللّٰهُ.

১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে এটা হতে আপনি বলুন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যুদ্ধের ব্যাপারে অবহিত করেছি। যথাযথভাবে এটা فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ উভয় থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক জ্ঞানের ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমপর্যায়ের। শুধুমাত্র আমিই সে বিষয়ে অবহিত এমন নয়। যাতে তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমি জানি না তা আসন্ন না দূরস্থিত। শাস্তি অথবা কিয়ামত যা শাস্তি সংশ্লিষ্ট। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

١١٠. إِنَّهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ . أَنْتُمْ وَغَيْرُكُمْ مِنَ السِّرِّ.

১১০. তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত ও কর্মের ব্যাপারে তোমাদের থেকে ও অন্যদের থেকে। এবং যা তোমরা গোপন কর। তোমরা ও অন্যরা গোপন বিষয় থেকে।

١١١. وَإِنْ مَا أَدْرِيْ لَعَلَّهُ أَيْ مَا أَعْلَمْتُكُمْ بِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ وَقْتُهُ فِتْنَةٌ إِخْتِبَارٌ لَّكُمْ لِيَرٰى كَيْفَ صُنْعُكُمْ وَمَتَاعٌ تَمْتِيْعٌ إِلٰى حِيْنٍ أَيْ اِنْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ وَهٰذَا مُقَابِلٌ لِلْأَوَّلِ الْمُتَرَجّٰى بِلَعَلَّ وَلَيْسَ الثَّانِيْ مَحِلًّا لِلتَّرَجِّيْ.

১১১. আমি জানি না হয়তো এটা অর্থাৎ যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করলাম অথচ তার সময় জানা যায়নি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা স্বরূপ যাতে তোমরা কিরূপ আমল কর তা জানা যায়। এবং কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত। এটা অর্থাৎ مَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ প্রথমটি তথা لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ-এর বিপরীত; لَعَلَّ দ্বারা যে আশা পোষণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি নিশ্চিত বিষয় হওয়া এটা لَعَلَّ-এর ক্ষেত্র নয়।

অনুবাদ :

١١٢. قُلْ وَفِى قِرَاءَةٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بَيْنِى وَبَيْنَ مُكَذِّبِى بِالْحَقِّ ط بِالْعَذَابِ لَهُمْ أَوِ النَّصْرِ عَلَيْهِمْ فَعُذِّبُوا بِبَدْرٍ وَاُحُدٍ وَالْاَحْزَابِ وَحُنَيْنٍ وَالْخَنْدَقِ وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ـ مِنْ كِذْبِكُمْ عَلَى اللّٰهِ فِى قَوْلِكُمْ اِتَّخَذَ وَلَدًا وَ وَعَلَىَّ فِى قَوْلِكُمْ سَاحِرٌ وَعَلَى الْقُرْاٰنِ فِى قَوْلِكُمْ شِعْرٌ ـ

১১২. আপনি বলুন! অন্য কেরাতে রয়েছে قَالَ তথা তিনি বললেন। হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফয়সালা করে দিন। আমার ও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মাঝে ন্যায়ের সাথে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে অথবা তাদের বিপক্ষে সাহায্য করে। সুতরাং তাদেরকে বদর ও ওহুদ আহযাব, হুনায়ন এবং খন্দকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের বিপক্ষে সাহায্য করা হয়েছে। আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের এ মিথ্যারোপের ব্যাপারে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের এ উক্তিতে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন যাদুকর এবং কুরআনের ব্যাপারে তোমাদের এ কথায় যে, তা স্বরচিত কবিতা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ : এখানে مِنْ অতিরিক্ত বা تَبْعِيْضِيَّة তথা অংশজ্ঞাপক। كُفْرَانَ শব্দটি مَصْدَرْ এটা কুফর অর্থে।

قَوْلُهُ لَهُ اَىْ لِلسَّعْىِ : এখানে ة যমীর দ্বারা سَعْى উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এটা مَنْ -এর প্রতি ফিরেছে।

قَوْلُهُ حَرَامٌ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ আর اِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ হলো مُبْتَدَاْ مُؤَخَّرْ উদ্দেশ্য এই যে, যে গ্রামবাসীকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, তাদের দ্বিতীয়বার দুনিয়ার ফিরে আসা অসম্ভব। কেউ কেউ এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তাদের ঈমানের প্রতি ফিরে আসা অসম্ভব। কারণ তাদের ব্যাপারে হতভাগ্যতার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখানে لا অতিরিক্ত, যদি حَرَامٌ শব্দটি وَاجِبٌ অর্থে হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে তাদের দুনিয়ায় ফিরে না আসা অবশ্যম্ভাবী। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো প্রতিদানের জন্য ফিরে আসা অসম্ভব।

قَوْلُهُ حَتّٰى : এটা لَا يَرْجِعُوْنَ -এর غَايَتٌ অর্থাৎ, প্রান্তসীমা, উদ্দেশ্য হলো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ফিরে আসা অসম্ভব। আর حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّه -ও হতে পারে। এ সময় বাক্যটি مُسْتَانِفَة হবে। فَاِذَا هِىَ এটা اِذَا فُتِحَتْ -এর جَزَاء এখানে اِسْنَادْ مَجَازِىّ হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বিজিত বস্তু হলো ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর; ইয়াজুজ মাজুজ নয়।

قَوْلُهُ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ : এ দুটো ভিন্ন দল। উভয়টি অনারবি শব্দ। যাহহাক -এর উক্তি মতে এরা হলো তুর্কীদের বংশধর। সকল ঐতিহাসিক তাদেরকে ইয়াফিস ইবনে নূহ -এর বংশধর বলেছেন। কারো কারো মতে, এরা হলো তুরস্কের তাতারি সম্প্রদায়। তাওরাতের জন্মধ্যায় ২ : ১০ পরিচ্ছেদে ইয়াফিস এর এক পুত্রের নাম মাগুগ (مَا غُوْغ) উল্লিখিত হয়েছে। ইবরানী ভাষায় غ এর উচ্চারণ گ দ্বারা করা হয়। এর কারণে مَاغُوْغ শব্দটি مَاگُوگ হয়ে গেছে। আর আরবিতে گ কে ج দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। ফলে আরবি উচ্চারণে এটি মাজুজ হয়েছে। -[লুগাতুল কুরআন]

ইয়াজুজ মাজুজ খুলে যাওয়ার দ্বারা এখানে বাদশাহ সিকান্দর নির্মিত প্রাচীর খুলে যাওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ حَدَبٍ : এর অর্থ হলো টিলা, উঁচু ভূমি, বহুবচনে اَحْدَابٌ

قَوْلُهُ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ : এর عَطْف হলো فُتِحَتْ -এর উপর। يَاوَيْلَنَا -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, حَصَبُ مَا يُحْصَبُ بِهِ - اَىْ يُرْمٰى بِهِ অর্থ- জ্বালানী, ইন্ধন।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة -ও হতে পারে এবং بَدَل -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ فِى الزَّبُوْرِ : এখানে ال টি جِنْس-এর জন্য। অর্থাৎ, كُتُبَ اللّٰهِ লিখে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যাবুর দ্বারা এখানে স্বাভাবিক আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য। হযরত দাউদ (আ.)-এর উপরে অবতারিত যাবূর কিতাব উদ্দেশ্যে নয়। زَبُوْرٌ -এর বহুবচন হলো زُبُرٌ আর لِلْكُتُبِ এটা হয়ত اَلسِّجِلِّ থেকে حَال অর্থাৎ- اَلسِّجِلِّ كَائِنًا لِلْكُتُبِ অথবা صِفَتْ তথা اَلسِّجِلِّ الْكَائِنِ لِلْكُتُبِ

قَوْلُهُ كَمَا بَدَأْنَا : আসল বাক্যটি এমন ছিল كَمَا بَدَأْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِىْ اَوَّلِ خَلْقِهِ كَذٰلِكَ نُعِيْدُ كُلَّ شَيْءٍ এখানে كُلَّ شَيْءٍ-এর উহ্য مَفْعُوْل আর اَوَّلِ خلق হলো ظَرْف আর نُعِيْدُ -এর ضَمِيْر টি كُلَّ شَيْءٍ-এর প্রতি ফিরেছে।

قَوْلُهُ لِلرَّحْمَةِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা হলো مَفْعُوْل لَهُ আবার مُبَالَغَةً স্বরূপ حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْخَنْدَقِ : এখানে خَنْدَقٌ শব্দটি ভুলবশত লিখিত হয়েছে। কেননা আহযাব এবং খন্দক উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ : এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরিয়তগত অসম্ভব'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'

قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُوْنَ : এ বাক্যে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে لَا টি অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোনো কোনো তাফসীরবিদ حَرَامٌ শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরি অর্থে ধরে لَا -কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আজাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরি। -[কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰىٓ اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ : এখানে حَتّٰى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেওয়া হবে। কুরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

قَوْلُهُ حَدَبٍ : শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি, বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তর দিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তর দিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়া পড়তে দেখা যাবে।

قَوْلُهُ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ : অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে। এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযাইর (আ.) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তাফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জবাব তাদের জানা থাকার কারণে তারা জিজ্ঞাসা করে না, নাকি তারা সন্দেহ ও জবাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না! লোকেরা আরজ করল, আপনি কোন আয়াতের কথা বলেছেন? তিনি বললেন, আয়াতটি হলো এই– اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিতৃষ্ণার সীমা থাকেনি। তারা বলতে থাকে, এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা [কিতাবী আলেম] ইবনে যিবা'রার কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জবাব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জবাব দিতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর এবং ইহুদিরা হযরত উযায়র (আ.)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে [হে মুহাম্মদ] আপনি কি বলেন? [নাউযুবিল্লাহ] তাঁরা কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ ﷺ এ কথার কোনো জবাব দিতে পারবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন– اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰۤئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

অর্থাৎ, যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যিবা'রা সম্পর্কেই কুরআন পাকের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল– وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ অর্থাৎ, যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

قَوْلُهُ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দোজখের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাবেন না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– কিয়ামতের সেই মহা বিপদেও নেককার মুমিনগণ চিন্তিত হবেন না এবং ভীত সন্ত্রস্তও হবেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– فَزَعِ اَكْبَرُ [মহাত্রাস] বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফূঁৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فَزَعِ اَكْبَرُ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফূঁৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুঁৎকার। এতে সবকিছু জীবিত হয়ে যাবে। এ বক্তব্যের সমর্থনে বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবূ হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। –[মাযহারী] وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاۤءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) سِجِلّ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) প্রমুখও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كُتُبٌ শব্দের অর্থ এখানে مَكْتُوْبٌ অর্থাৎ, লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। –[ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী]

سِجِلّ সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোনো ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্র করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ : زَبُوْرٌ শব্দটি زُبُرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাঊদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زَبُوْر বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذِكْر বলে তাওরাত এবং زَبُوْر বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে। যথা– ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন। –[ইবনে জরীর] যাহ্হাক থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন, ذِكْر বলে লওহে মাহফূজ এবং زَبُوْر বলে পয়গাম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর সকল গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ (র.) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

اَلْاَرْضُ সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এখানে اَرْض [পৃথিবী] বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবাইর, ইকরিমা , সুদ্দী আবুল আলিয়া (র.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন কুরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, اَرْض -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী অর্থাৎ, দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। [জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবেন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে– اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে– وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। অপর এক আয়াতে আছে– اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম্বরগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামানার আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ : عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ -এর বহুবচন। মানব, জিন জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর জিকির ও ইবাদত সব বস্তুর রূহ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে, সব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল! কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। –[ইবনে আসাকির]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন– اَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ بِرَفْعِ قَوْمٍ وَخَفْضِ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রেরিত রহমত, যাতে [আল্লাহর আদেশ পালনকারী] এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং [আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী] অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। –[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ : সূরা হাজ্জ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ الْاٰيَتَيْنِ اَوْ اِلَّا هٰذَانِ خَصْمَانِ اَلسِّتَّ اٰيَاتٍ فَمَدَنِيَّاتٌ وَهِىَ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ اَوْ ثَمَانٌ وَسَبْعُوْنَ اٰيَةً .

তবে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ দু'আয়াত [১১ ও ১২নং আয়াত] কিংবা هٰذَانِ خَصْمَانِ [১৯ – ২৪নং আয়াত] এ ছয় আয়াত মাদানী। এতে ৭৪/৭৫/ ৭৬/ ৭৭ বা ৭৮ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اَىْ عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ اَىِ الْحَرَكَةَ الشَّدِيْدَةَ لِلْاَرْضِ الَّتِىْ يَكُوْنُ بَعْدَهَا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِىْ هُوَ قُرْبُ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ . فِىْ اِزْعَاجِ النَّاسِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعِقَابِ .

১. হে মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীও অন্যান্যরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে। এভাবে যে, তোমরা তার অনুসরণ করবে নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার পর সংঘটিত হবে। এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার মানুষকে হতবিহবল করার ক্ষেত্রে এটাও এক ধরনের শাস্তি।

٢. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ بِسَبَبِهَا كُلُّ مُرْضِعَةٍ بِالْفِعْلِ عَمَّا اَرْضَعَتْ اَىْ تَنْسَاهُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ اَىْ حُبْلٰى حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى مِنَ الشَّرَابِ وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ . فَهُمْ يَخَافُوْنَهُ .

২. যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন বিস্মৃত হবে তার কারণে প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী কর্মের মাধ্যমে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে অর্থাৎ, ভুলে যাবে তাকে। এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে অর্থাৎ গর্ভধারিণী নারী তার গর্ভকে, আর মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ অতিশয় ভয়ের কারণে যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয় মদপানের কারণে বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সে শাস্তিতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

অনুবাদ :

٣. وَنَزَلَ فِى النَّضْرِبْنِ الْحَارِثِ وَجَمَاعَةٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَالُوْا اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ وَ الْقُرْاٰنُ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَاَنْكَرُوا الْبَعْثَ وَاِحْيَاءَ مَنْ صَارَ تُرَابًا وَّيَتَّبِعُ فِى جِدَالِهٖ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ اَىْ مُتَمَرِّدٍ ـ

৩. নযর ইবনে হারেছ ও একদলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে– মানুষের মধ্যে কতেক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে তারা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। আর পবিত্র কুরআন হলো পূর্বকালের কিসসা কাহিনী। আর তারা পুনরুত্থান ও মাটিতে পরিণত হওয়া ব্যক্তিবর্গকে জীবিতকরণকে অস্বীকার করে। এবং সে অনুসরণ করে বাকবিতণ্ডায় প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

٤. كُتِبَ عَلَيْهِ قُضِىَ عَلَى الشَّيْطَانِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ اَىِ اتَّبَعَهٗ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ يَدْعُوْهُ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ اَىِ النَّارِ ـ

৪. তার সমন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, শয়তানের ব্যাপারে এই ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তার অনুসরণ করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে আহবান করবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে। অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে।

٥. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ شَكٍّ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ اَىْ اَصْلَكُمْ اٰدَمَ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِىٍّ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ وَهِىَ الدَّمُ الْجَامِدُ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ وَهِىَ لَحْمَةٌ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ مُّخَلَّقَةٍ مُصَوَّرَةٍ تَامَّةِ الْخَلْقِ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ اَىْ غَيْرِ تَامَّةِ الْخَلْقِ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط كَمَالَ قُدْرَتِنَا لِتَسْتَدِلُّوْا بِهَا فِىْ اِبْتِدَاءِ الْخَلْقِ عَلٰى اِعَادَتِهٖ وَنُقِرُّ مُسْتَانِفٌ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَقْتَ خُرُوْجِهٖ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ طِفْلًا بِمَعْنٰى اَطْفَالًا ـ

৫. হে মানুষ অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও সংশয় পোষণ কর পুনরুত্থান সম্পর্কে তবে জেনে রেখো! আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের মূল তথা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা হতে অতঃপর আমি তাঁর সন্তানাদিকে সৃষ্টি করেছি তার শুক্র হতে অতঃপর আলাক হতে আর আলাক হলো জমাট রক্ত। অতঃপর মাংসপিণ্ড হতে আর তা হলো চিবানো পরিমাণ গোশতের টুকরা পূর্ণাকৃতি সৃষ্টির পূর্ণ অবয়ব এবং অপূর্ণাকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অপূর্ণাঙ্গ অবয়ব তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, যাতে তোমরা সৃষ্টির সূচনা দ্বারা তাকে পুনরুত্থানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করতে পার। আমি স্থিত রাখি এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য গর্ভাশয় হতে বহির্গমনকাল পর্যন্ত তারপর আমি তোমাদেরকে বের করি মায়ের উদর হতে শিশু রূপে طِفْلًا শব্দটি اَطْفَالًا অর্থে হয়েছে।

ثُمَّ نُعَمِّرُكُمْ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج اَيِ الْكَمَالَ وَالْقُوَّةَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِيْنَ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى يَمُوْتُ قَبْلَ بُلُوْغِ الْاَشُدِّ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ اَخَسِّهِ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرَفِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا قَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَصِرْ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً يَابِسَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ تَحَرَّكَتْ وَرَبَتْ اِرْتَفَعَتْ وَزَادَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ زَائِدَةٌ كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيْجٍ حَسَنٍ ـ

অনুবাদ :

অতঃপর তোমাদেরকে জীবনকাল দান করি যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। অর্থাৎ বয়সের পূর্ণতায় ও শক্তিতে। আর তা হলো ত্রিশ হতে চল্লিশ বছরের মাঝামাঝি সময়। এবং তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটানো হয় পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে বার্ধক্যের বয়সের হীনতম পর্যায়ে এবং বিবেকশূন্যতার স্তরে উপনীত হয়। যার ফলে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। ইকরিমা (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে সে এ অবস্থায় উপনীত হবে না। আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি পানি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হয় নড়চড়া করে ও স্ফীত হয় উঁচু হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ সুন্দর এখানে مِنْ টি অতিরিক্ত।

٦. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ بَدْأِ خَلْقِ الْاِنْسَانِ اِلٰى اٰخِرِ اِحْيَاءِ الْاَرْضِ ـ بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَاَنَّهٗ يُحْيِى الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৬. এটা উল্লিখিত মানবসৃষ্টির সূচনা হতে নিয়ে ভূমি উজ্জীবিতকরণ পর্যন্ত সবকিছু এ জন্য এ কারণে যে আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧. وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا ط وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ

৭. কিয়ামত আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই সংশয় নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ উত্থিত করবেন।

٨. وَنَزَلَ فِىْ اَبِىْ جَهْلٍ ـ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى مَعَهٗ وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ـ لَهٗ نُوْرٌ مَعَهٗ ـ

৮. আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে– মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ তার সাথে। না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব।

অনুবাদ :

৯. ثَانِىَ عِطْفِهٖ حَالٌ اَىْ لَاوِىْ عُنُقَهٗ تَكَبُّرًا عَنِ الْاِيْمَانِ وَالْعِطْفُ الْجَانِبُ عَنْ يَمِيْنٍ اَوْ شِمَالٍ لِيُضِلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا ـ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط دِيْنِهٖ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ عَذَابٌ فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ اَىِ الْاِحْرَاقِ بِالنَّارِ ـ

৯. ঘাড় বাকিয়ে এ বাক্যটি حَالٌ হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের বিষয়ে অহংকারবশত ঘাড় বাঁকা করে বিতণ্ডা করে, আর عِطْفٌ হলো ডান বা বাম দিক, ভ্রষ্ট করার জন্য لِيُضِلَّ-এর يَاء বর্ণে যবর ও পেশ উভয় হরকতই হতে পারে আল্লাহর পথ হতে তাঁর দীন হতে। তার জন্য আছে ইহলোকে লাঞ্ছনা শাস্তি। সুতরাং তাকে বদর যুদ্ধের দিনে হত্যা করা হয়। এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা। অর্থাৎ আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেওয়া।

১০. وَيُقَالُ لَهٗ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ اَىْ قَدَّمْتَهٗ عُبِّرَ عَنْهُ بِهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوِلُ بِهِمَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ ـ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ـ

১০. তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল অর্থাৎ তুমি পূর্বে যা প্রেরণ করেছ তার। এখানে ব্যক্তিকে হাত দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নয়। কেননা হাত দ্বারাই মানুষের অধিকাংশ কাজের সমাপ্তি ঘটে থাকে। কারণ আল্লাহ জুলুম করেন না অর্থাৎ অত্যাচারী নন, বান্দাদের প্রতি যে, তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ বিনেই শাস্তি দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ : কিয়ামতের দিনের ভূকম্পন, এখানে اِضَافَتْ اِلَى الظَّرْفِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন. يَا سَارِقَ اللَّيْلِ-এর মধ্যে হয়েছে। আর যরফের ক্ষেত্রে এটা বৈধ।

قَوْلُهٗ اَلَّتِىْ يَكُوْنُ بَعْدَهَا طُلُوْعُ الشَّمْسِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দ্বারা উদ্দেশ্যে নিয়েছেন যে, এ কম্পন দুনিয়াতেই হবে এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পরে হবে। এই উক্তির সমর্থন হয় আল্লাহ তা'আলার বাণী- تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ দ্বারা।

قَوْلُهٗ بِالْفِعْلِ : এর উদ্দেশ্য হলো, দুধ পান করানোর অবস্থা। যখন মা সন্তানের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয় এমন অবস্থায় সে তীব্র ভূকম্পন দেখে তার সন্তান থেকে বেখবর হয়ে যাবে। عَمَّآ اَرْضَعَتْ-এর مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ, عَنْ اِرْضَاعِهَا আবার مَوْصُوْلَة-ও হতে পারে। অর্থাৎ- عَنِ الَّذِىْ اَرْضَعَتْهُ

قَوْلُهٗ يَوْمَ تَرَوْنَهَا : এখানে يَوْمَ-এর নসবের কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যথা- ১. تَذْهَلُ-এর কারণে। ২. উহ্য فِعْل اُذْكُرْ-এর কারণে। ৩. اَلسَّاعَةَ থেকে বদল হওয়ার কারণে। ৪. عَظِيْمٌ-এর কারণে।

قَوْلُهٗ تَذْهَلُ : এটা تَرَوْنَهَا-এর ضَمِيْر থেকে حَالٌ, এর দ্বারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ : এখানে لٰكِنَّ-এর পরবর্তী অংশ তার নীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী অংশের বিপরীত উদ্দেশ্য।

কিবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ৫. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সুদৃষ্টি রয়েছে, দিল যেন সেদিকেই নিমগ্ন থাকে এবং ৬. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকিদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। -[তাফসীরে মাজেদী]

৩. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচি ও কুরআনবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন-

* কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজির মন খুশি করার জন্যে, দ্বিতীয়বার সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্যে।

* কেউ বলেন, প্রথমবার হরমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্যে এবং তৃতীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে।-[মা'আরিফুল করআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) খ. ১, পৃ. ২৪৫]

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কিবলা ছিল কা'বা এবং শেষ নবীকেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইহুদিরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা ছিল কা'বা আর এই নবী ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের দাবি করেন অথচ কিবলার ক্ষেত্রে করেন তাঁর বিরোধিতা। এখন তাদের কারোরই কথা বলার সুযোগ থাকল না।

তবে বেয়াড়া স্বভাব উল্টোরথীদের কথা আলাদা। ওরা এ প্রাঞ্জলতার পরেও প্রশ্নের ঝড় তুলে গোঁয়ার্তুমি করবে। যেমন কুরাইশরা বলবে- তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে- আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেচকদের মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।

-[তাফসীরে উসমানী ও মাজেদী]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ : ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসম্মত জীবন বিধান। এর কিবলা স্থিরীকরণ ও কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। لَعَلَّكُمْ -এর لَعَلَّ অব্যয় كَيْ [যাতে করে] অব্যয়ের সমার্থক, সন্দেহ বা দ্বিধাবোধক নয়। এর অর্থ হবে- 'যাতে' বা 'যেন'। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, যারা আগে হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কে আবার হেদায়েতপ্রাপ্তিতে ধন্য হওয়ার কথা বলা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তরসমূহ অসীম ও অপরিসীম।

অনুবাদ :

١٥١. كَمَا اَرْسَلْنَا مُتَعَلِّقٌ بِاُتِمَّ اَىْ اِتْمَامًا كَاِتْمَامِهَا بِاِرْسَالِنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنَ وَيُزَكِّيْكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

১৫১. যেমন আমি প্রেরণ করেছি كَمَا اَرْسَلْنَا পূর্বের لِاُتِمَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা যুক্ত। তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে, যাতে আমার অন্যান্য অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের মতো তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আমি আমার এই অনুগ্রহেরও পূর্ণতা বিধান করতে পারি। যে আমার আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে অর্থাৎ শিরক হতে তোমাদেরকে পাক করে এবং কিতাব আল-কুরআন ও হিকমত তাঁর আহকাম ও বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জনতে না তা শিক্ষা দেয়।

١٥٢. فَاذْكُرُوْنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْبِيْحِ وَنَحْوِهٖ اَذْكُرْكُمْ قِيْلَ مَعْنَاهُ اُجَازِيْكُمْ وَفِى الْحَدِيْثِ عَنِ اللّٰهِ مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَمَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْ مَلَئِهٖ وَاشْكُرُوْا لِىْ نِعْمَتِىْ بِالطَّاعَةِ وَلَا تَكْفُرُوْنِ بِالْمَعْصِيَةِ.

১৫২. সালাত, তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসে [হাদীসে কুদসীতে] আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করবে। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করবে আমিও তাকে তা হতে উৎকৃষ্টতর সমাবেশে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তাহকীক ও তারকীব

اِتْمَامٌ : পূরিপূর্ণ করা। يُزَكِّيْكُمْ : تَزْكِيَةٌ (تفعيل) زَكّٰى অর্থ– শুদ্ধ করা, পবিত্র করা।
اُجَازِيْكُمْ : তোমাদেরকে প্রতিদান দেব। مَلَاٌ : সমাবেশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কিবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে : কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, নাকি এর আগেই হবে? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিমতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যথা ১. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ২. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ৩. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ইত্যাদি। কেউ কেউ হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই, যে উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যধাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ الخ : শানে নুযূল : এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এ লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়। সে ছিল ইসলামের দুশমন, সত্যের দুশমন, মানবতার দুশমন। সে বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা, পবিত্র কুরআন পূর্বকালের লোকদের রচনা। [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক] সে পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করতো এবং বলতো, মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এরপর তার পুনর্জীবন সম্ভব নয়। -[ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৮]

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো কারো মতে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে উবাই ইবনে খালফ সম্পর্কে। -[রূহুল মা'আনী- খ. ১৭, পৃ. ১১৪]

আর আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এই দুরাত্মা বলেছিল, "তোমরা যে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বল তিনি কি স্বর্ণের নাকি রৌপ্যের, নাকি তামার"? তার এই প্রশ্নে আসমান প্রকম্পিত হয়ে উঠলো এবং তার মাথার খুলি উড়ে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এক ইহুদি এমন প্রশ্ন করেছিল, ফলে আসমান থেকে বজ্রপাত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিল। -[তাফসীরে তাবারী খ. ১৭, পৃ. ৮৯]

আল্লামা শওকানী (র.) লিখেছেন, নজর ইবনে হারেস লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়, মূর্খ ও অহংকারী। সে আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করতো। তার ধারণা তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) আর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও উতবা ইবনে রাবিয়া সম্পর্কে। -[তাফসীরে ফতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ৪৩৯]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নুযূলের বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াত নজর ইবনে হারেছ অথবা আবূ জাহল বা উবাই ইবনে খালাফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; কিন্তু আধুনিক যুগে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের অনুরূপ ভ্রান্ত মত পোষণকারী দেখা যায় অনেককে, বিশেষত যারা ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদেরকে দেখা যায় এমন অযৌক্তিক,অবান্তর এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য করতে। -[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৭৬]

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী দুরাত্মা কাফের নজর ইবনে হারেসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সন্দিহান হয় তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে এবং মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে প্রথমবার যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করবেন বরং দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হবে প্রথম বারের তুলনায় সহজ। তাই ইরশাদ হয়েছে–

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

"হে মানবজাতি! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর তবে একথা জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে।"

قَوْلُهُ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ : মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা : এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয়। ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিজিক পাবে. ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, নাকি হতভাগা। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় তখন মানবসৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করে : يَا رَبِّ مُخَلَّقَةٌ اَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ, এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কিনা? যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে مُخَلَّقَة বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, ছেলে নাকি কন্যা? হতভাগা নাকি ভাগ্যবান? তখনই ফেরেশতাকে সবকিছু বলে দেওয়া হয়। –[ইবনে কাসীর]

غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَة শব্দদ্বয়ের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ : উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তাফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مُخَلَّقَة এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غَيْرُ مُخَلَّقَة ; কোনো কোনো তাফসীরকারক مُخَلَّقَة ও غَيْرُ مُخَلَّقَة -এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয় সে مُخَلَّقَة অর্থাৎ, পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে مُخَلَّقَة বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا : অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ -এর অর্থ তাই। اَشُدَّ শব্দটি شِدَّةٌ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

قَوْلُهُ اَرْذَلِ الْعُمُرِ : اَرْذَلِ الْعُمُرِ সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রাসূলে কারীম ﷺ এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং হযরত সা'দ (রা.)–ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

মানবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা : মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুই জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌঁছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তার অগ্রপশ্চাতের সব গুনাহ মাফ করে দেন; তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন এবং তার শাফায়াত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায়, 'আমিনুল্লাহ ও আমিরুল্লাহ ফিল আরয' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। [কেননা এই বয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে] অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌঁছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গোনাহ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন- هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا وَفِيْهِ وَمَعَ هٰذَا رَوَاهُ نَكَارَةٌ شَدِيْدَةٌ অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন- الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِىْ سَنَدِهٖ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হাদীসটিকে 'মওকুফ ও মারফূ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর (র.) মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ثَانِىَ عِطْفِهٖ শব্দের অর্থ- পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী! এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দলিল প্রমাণ ও মানবজাতির পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا অর্থাৎ "আর কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই"।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে মানুষের পুনরুত্থানের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হওয়ার পর পূববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে শক্তিশালী। অতএব, যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের পুরুত্থানেও সক্ষম। আর আলোচ্য আয়াতে তারই ঘোষণা রয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছে- وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا

অনুবাদ :

١١. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج اَىْ شَكٍّ فِىْ عِبَادَتِهٖ شَبَّهَ بِالْحَالِ عَلٰى حَرْفِ جَبَلٍ فِىْ عَدَمِ ثُبَاتِهٖ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ صِحَّةٌ وَسَلَامَةٌ فِىْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِحْنَةٌ وَسُقْمٌ فِىْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ وقف اَىْ رَجَعَ اِلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّنْيَا بِفَوَاتِ مَا اَمَلَهٗ مِنْهَا وَالْاٰخِرَةَ ط بِالْكُفْرِ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ .

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে অর্থাৎ সংশয়ের সাথে ইবাদত করে। এখানে সংশয়ের সাথে ইবাদত করার অবস্থানকে পাহাড়ের কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির সাথে উপমা দিয়েছেন। তার মঙ্গল হলে অর্থাৎ তার জীবনের সুস্থতা ও মালের নিরাপত্তা লাভ হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে তার জীবন ও সম্পদে কোনো কষ্ট বা অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ কুফরিতে ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে তার আশা বঞ্চিত হওয়ার কারণে ও পরকালে কুফরির কারণে এটাই তো স্পষ্ট ক্ষতি প্রকাশ্য।

١٢. يَدْعُوْا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنَ الصَّنَمِ مَا لَا يَضُرُّهٗ اِنْ لَّمْ يَعْبُدْهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ اِنْ عَبَدَهٗ ذٰلِكَ الدُّعَاءُ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ . عَنِ الْحَقِّ .

১২. সে ডাকে উপাসনা করে আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে মূর্তিগুলো থেকে যা তার কোনো অপকার করতে পারে না যদি সে তার উপাসনা না করে আর উপকারও করতে পারে না যদি তার উপাসনা করে। এটাই এ আহবান করা চরম বিভ্রান্তি সত্য হতে।

١٣. يَدْعُوْا لَمَنْ اللَّامُ زَائِدَةٌ ضَرُّهٗ لِعِبَادَتِهٖ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ط اِنْ نَفَعَ بِتَخَيُّلِهٖ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى هُوَ اَىِ النَّاصِرُ وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ اَىِ الصَّاحِبُ هُوَ .

১৩. সে ডাকে এমন কিছুকে যার لَمَنْ -এর ل বর্ণটি অতিরিক্ত ক্ষতিই তার উপাসনার কারণে উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটতর তার ধারণা অনুপাতে সে উপকার করলেও কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক সে অর্থাৎ সাহায্যকারী, কত নিকৃষ্ট এই সহচর অর্থাৎ উক্ত সাথী।

١٤. وَعُقِبَ ذِكْرُ الشَّاكِّ بِالْخُسْرَانِ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالثَّوَابِ فِىْ . اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّوَافِلِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ مِنْ اِكْرَامِ مَنْ يُطِيْعُهٗ وَاِهَانَةِ مَنْ يَعْصِيْهِ .

১৪. اِنَّ اللّٰهَ الخ আয়াতে সংশয়কারীর ক্ষতি উল্লেখের পর মুমিনগণের প্রতিদানের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রাবাহিত, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করবেন যে তার আনুগত্য করে তাকে সম্মানিত করবেন আর যে তার নাফরমানি করে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

অনুবাদ :

١٥. مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ اَىْ مُحَمَّدًا نَبِيَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ بِحَبْلٍ اِلَى السَّمَاۤءِ اَىْ سَقْفِ بَيْتِهٖ يَشُدُّ فِيْهِ وَفِىْ عُنُقِهٖ ثُمَّ لْيَقْطَعْ اَىْ لِيَخْتَنِقْ بِهٖ بِاَنْ يَقْطَعَ نَفَسَهُ مِنَ الْاَرْضِ كَمَا فِى الصِّحَاحِ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ فِىْ عَدَمِ نُصْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ مَا يَغِيْظُ ـ مِنْهَا الْمَعْنٰى فَلْيَخْتَنِقْ غَيْظًا فَلَا بُدَّ مِنْهَا ـ

১৫. যে কেউ ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই তাঁকে সাহায্য করবেন না অর্থাৎ তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে দুনিয়া ও আখিরাতে, সে উচুঁ আকাশ পানে একটি রজ্জু প্রলম্বিত করুক অর্থাৎ ঘরের ছাদের দিকে। তাতে এবং তার কাঁধের সাথে তা বাধুক। পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক অর্থাৎ তার সাথে গলায় ফাঁস লাগানোর জন্য। অর্থাৎ দুনিয়া থেকেই সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলুক। যেমন সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা? নবী করীম ﷺ -কে সাহায্য না করার বিষয়ে। আয়াতের মর্ম হচ্ছে তার সাহায্যের কারণে তাকে আত্মহত্যা করা উচিত। আর রাসূল ﷺ এর সাহায্য সহায়তা করা অবশ্যই কর্তব্য।

١٦. وَكَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِنْزَالِنَا الْاٰيٰتِ السَّابِقَةَ اَنْزَلْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ الْبَاقِىَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ـ هُدَاهُ مَعْطُوْفٌ عَلٰى هَاءِ اَنْزَلْنَاهُ ـ

১৬. এভাবেই অর্থাৎ, পূর্বের নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার ন্যায় আমি তা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ অবশিষ্ট কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে প্রকাশ্যে। এটা اَنْزَلْنٰهُ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তার হেদায়েত। اِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ الخ-এর আতফ হয়েছে। اَنْزَلْنَاهُ -এর ه যমীরের উপর। মূল ইবারত হবে اَنْزَلْنَا الْقُرْاٰنَ وَاَنْزَلْنَا اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ

١٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالصّٰبِئِيْنَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ق اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِاِدْخَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ وَغَيْرَهُمُ النَّارَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مِنْ عَمَلِهِمْ شَهِيْدٌ ـ عَالِمٌ بِهٖ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ ـ

১৭. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি হয়েছে তারা হলো ইহুদি এবং যারা সাবেয়ী ইহুদিদের একটি সম্প্রদায়। খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে এবং অন্যান্যদেরকে জাহান্নামে দিয়ে। আল্লাহ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী। অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে চাক্ষুষ দর্শক।

অনুবাদ :

١٨. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ اَىْ يَخْضَعُ لَهٗ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْخُضُوْعِ فِىْ سُجُوْدِ الصَّلَاةِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَهُمُ الْكَافِرُوْنَ لِاَنَّهُمْ اَبَوُا السُّجُوْدَ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ يَشْقِهٖ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط مُسْعِدٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ـ مِنَ الْاِهَانَةِ وَالْاِكْرَامِ ـ

১৮. তুমি কি দেখ না জান না যে, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু আল্লাহকে সিজদা করে। অর্থাৎ তাদের থেকে যে উদ্দেশ্য কামনা করা হয় সে বিষয়ে তারা তার সমীপে নত হয়। এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে আর তারা হলেন মুমিন সম্প্রদায়, নামাজের সিজদায় অতিরিক্ত অবনত হওয়া দ্বারা। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি তারা হলো কাফের সম্প্রদায়। কেননা তারা সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অথচ ঈমান সিজদার উপর মওকূফ। আল্লাহ যাকে হেয় করেন দুর্ভাগা করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। অর্থাৎ তার জন্য সৌভাগ্য আনয়নকারী কেউ নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। অপদস্থ করার ক্ষেত্রে ও সম্মান দানের ক্ষেত্রে।

١٩. هٰذَانِ خَصْمَانِ اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ خَصْمٌ وَالْكُفَّارُ الْخَمْسَةُ خَصْمٌ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ اَىْ فِىْ دِيْنِهٖ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يَلْبَسُوْنَهَا يَعْنِىْ اُحِيْطَتْ بِهِمُ النَّارُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ـ اَلْمَاءُ الْبَالِغُ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ ـ

১৯. এরা দুটি বিবদমান পক্ষ, অর্থাৎ মুমিনগণ হলেন এক পক্ষ, আর পাঁচ প্রকারের কাফেররা হলো অপর পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে অর্থাৎ তার দীন সম্পর্কে। যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক তারা তো পরিধান করবে অর্থাৎ অগ্নি তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। অতিশয় উত্তপ্ত পানি।

٢٠. يُصْهَرُ بِهٖ يُذَابُ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ مِنْ شُحُوْمٍ وَغَيْرِهَا وَ تَشْوِىْ بِهِ الْجُلُوْدُ ـ

২০. যা দ্বারা বিগলিত করা হবে তাদের উদরে যা আছে তা যেমন চর্বি ইত্যাদি। এবং এ দ্বারা ভুনা হবে চর্ম।

অনুবাদ :

٢١. وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ - لِضَرْبِ رُؤُسِهِمْ -

২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। তাদের মাথায় আঘাত করার জন্য।

٢٢. كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اَيِ النَّارِ مِنْ غَمٍّ يَلْحَقُهُمْ بِهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا رُدُّوْا اِلَيْهَا بِالْمَقَامِعِ وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ - اَيِ الْبَالِغِ نِهَايَةَ الْاِحْرَاقِ -

২২. যখনই তারা তথা হতে বের হতে চাইবে অর্থাৎ দোযখ হতে চিন্তাকাতর হয়ে দোযখে যা তাদের উদ্রেক হবে তখনই তাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মুগুর দ্বারা পিটিয়ে তাদেরকে তাতে ফেরত পাঠানো হবে। তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা অর্থাৎ যা আগুনে পোড়ানোর চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى حَرْفٍ : এটা يَعْبُدُ -এর فَاعِلْ -এর ضَمِيْر থেকে حَالْ অর্থাৎ يَعْبُدُ مُتَزَلْزِلًا

قَوْلُهُ شَبَّهَ بِالْحَالِ عَلٰى حَرْفِ جَبَلٍ فِيْ عَدَمِ ثُبَاتٍ : এর মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতে اِسْتِعَارَة تَمْثِيْلِيَّة হয়েছে। তা এভাবে যে, আয়াতে তার অবস্থাকে যে ব্যক্তি একীন ও বিশ্বাসবিহীন ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছে সে নড়বড়তা ও দৃঢ়পদ না হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকে, এমন ব্যক্তি সব সময় আশঙ্কিত ও চিন্তিত অবস্থায় থাকে।

قَوْلُهُ مَا اَمَلَهُ : এটা مَاضِىْ -এর সীগাহও হতে পারে। আবার اَمَلٌ অর্থ আশাও হতে পারে।

قَوْلُهُ اَللَّامُ زَائِدَةٌ : অর্থাৎ لَمَنْ -এর ل বর্ণটি অতিরিক্ত এবং مَنْ হলো يَدْعُوْا -এর مَفْعُوْل ; ضَرُّهٗ হলো مُبْتَدَأ আর اَقْرَبُ তার خَبَرٌ অতঃপর বাক্য হয়ে مَنْ -এর صِلَة ; صِلَة ও مَوْصُوْلَه মিলে يَدْعُوْا -এর مَفْعُوْل بِهٖ -এর সাথে মিলিত হয়ে مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهُ بِعِبَادَتِهٖ : এর ب অব্যয়টি سَبَبِيَّةٌ অর্থাৎ بِسَبَبِ عِبَادَتِهٖ,

قَوْلُهُ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى هُوَ : এখানে هُوَ হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ আর اَلنَّاصِرُ হলো مَوْلٰى -এর তাফসীর। এভাবে اَلصَّاحِبُ হলো اَلْعَشِيْرُ -এর তাফসীর। ব্যাখ্যাকারের উক্তি- بِالْخُسْرَانِ উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে شَاكٌّ থেকে حَالْ -এর পরেও এরূপ তারকীব হবে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি- بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ এটা عُقِبَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ ; আর আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ الخ এটা দ্বিতীয় ذِكْر -এর সিফত। অর্থাৎ اَلذِّكْرُ الْكَائِنُ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ মুফাসসির (র.)-এর উক্তি- مِنْ اِكْرَامِ مَنْ يُطِيْعُهٗ الخ -এর মধ্যে لَفٌّ نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ তথা ক্রমধারার ব্যতিক্রম ঘটেছে। يَنْصُرُهٗ -এর মধ্যে ضَمِيْر টি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ফিরেছে। কারণ তিনিই হলেন مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ আর اَلسَّمَاءُ মাথার উপরের বস্তুকে বলা হয়। যেমন প্রসিদ্ধ আছে- كُلُّ مَا هُوَ عَلٰى رَاْسِهٖ فَهُوَ سَمَاءٌ

قَوْلُهُ فَلْيَمْدُدْ مَنْ كَانَ : এখানে مَنْ যদি شَرْطِيَّة হয় তাহলে فَلْيَمْدُدْ তার جَزَاء হবে। আর যদি مَوْصُوْلَة হয় তাহলে فَلْيَمْدُدْ -এর ف অব্যয়টি جَزَاء -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণে হবে।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَقْطَعَ نَفْسَهٗ : نَفْسَهٗ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لِيَقْطَعْ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত রয়েছে। مِنَ الْاَرْضِ -এর দ্বারা পার্থিব জীবন উদ্দেশ্য। এটা ঐ সময় হবে যখন ف বর্ণটি যবরযোগে হবে। আর যদি জযমযোগে হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে এবং اَرْض দ্বারা পৃথিবী উদ্দেশ্য হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, ছাদ ইত্যাদিতে একটি রশি বেঁধে তার অপর প্রান্ত সে তার গলায় বেঁধে নিক এবং কোনো বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবী থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে নিক, যাতে শ্বাসরুদ্ধ

হয়ে তখনই মৃত্যুবরণ করে। مَا يَغِيْظُ مِنْهَا এখানে مِنْهَا হলো مَا -এর বর্ণনা। এর দ্বারা সাহায্য উদ্দেশ্য। আর مَا হলো مَوْصُوْلَة - يَغِيْظُ হলো তার صِلَة -এর মধ্যে عَائِدْ বা যমীর বিলুপ্ত রয়েছে। مَوْصُوْل , صِلَة মিলে يُذْهِبَنَّ -এর مَفْعُوْل বাক্যটি এরূপ ছিল هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ الشَّئَ الَّذِى يَغِيْظُهُ وَهُوَ نُصْرَةُ النَّبِىِّ ﷺ

قَوْلُهُ غَيْظًا مِنْهَا : এর অর্থ হলো مِنْ اَجْلِهَا

قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا : অর্থাৎ. فَلْيَخْتَنِقْ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ النُّصْرَةِ বাক্যটি এরূপ ছিল مِنَ النُّصْرَةِ

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ, اٰيَاتٍ শব্দটি اَنْزَلْنَاهُ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে, আর بَيِّنَاتٍ হলো اٰيَاتٍ -এর صِفَتْ

قَوْلُهُ هَدَاهُ : দ্বারা يُرِيْدُ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ : এর عَطْف হলো اَنْزَلْنَاهُ এর যমীর উপর।

قَوْلُهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : এর عَطْف হলো يَسْجُدُ -এর فَاعِلْ অর্থাৎ, مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ -এর উপর অর্থাৎ আল্লাহগপ্রদত্ত এবং বাধ্যগত বিনয় ছাড়া কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছাক্রমে সিজদা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করে থাকে।

قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ : উপরে ৬ ধরনের মানুষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে একটি দল হলো মু'মিন,. আর বাকি পাঁচটি দল কাফের। এদিক দিয়ে মোট দুটি দল হলো একদল মু'মিন আর একদল কাফের। এ কারণে خَصْمَانِ দ্বিবাচনিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মু'মিনদের বিপরীতে পাঁচটি দলকে এক পক্ষের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর خَصْمٌ শব্দটি مَصْدَرْ এটা এক ও একাধিক সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ اِخْتَصَمُوْا : এখানে বহুবচনের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মু'মিনদের বিপরীত পক্ষটি কয়েক ধরনের মানুষ সম্বলিত। সুতরাং فَرِيْقٌ শব্দটি শাব্দিক বিচারে একবচন এবং অর্থের বিচারে বহুবচন। যেমন- قَوْمٌ وَرَهْطٌ শব্দদ্বয়।

قَوْلُهُ وَتَشْوِىْ بِهِ الْجُلُوْدَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, جُلُوْدَ শব্দটি উহ্য فِعْل -এর কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। কেননা مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ -এর উপর عَطْف বৈধ নয়। কারণ جِلْد তথা চর্ম বিগলিত হওয়ার বস্তু নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَهُمْ مَقَامِعُ : এখানে لَهُمْ -এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর প্রতি ফিরেছে। এ সময় لْ টি اِسْتِحْقَاقْ তথা অধিকারজ্ঞাপক হবে। ২. এটা যাবানিয়া ফেরেশতার প্রতি ফিরেছে, বাক্যের ধরন দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

قَوْلُهُ اَلْمَقَامِعُ : এটা مَقْمَعَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ- হাতুড়ি, মুগুর, গদা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে দীন ইসলামের বিরোধিতা করতো, কিয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সেই সব লোকদের আলোচনা স্থান পেয়েছে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতো না; বরং প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করলেও অন্তরে সন্দেহ পোষণ করতো। যদি জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ হতো, তাহলে দীন ইসলামে থাকতো, পক্ষান্তরে যদি তাদের কোনো স্বার্থ বিনষ্ট হতো, তবে ইসলাম ছেড়ে দিত।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ الْاَصْنَامَ الخ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কিছু লোক মদীনা মুনাওয়ারায় আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি এরপর তাদের আর্থিক উন্নতি হত এবং তাদের পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো, তবে বলতো, এ ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণের পর কোনো প্রকার আর্থিক অসুবিধা দেখা দিত, তখন বলতো, এ ধর্ম ঠিক নয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম ও আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে গ্রামীণ লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল যাযাবর। তারা মদীনা শরীফে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, এরপর যদি তাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হতো, তারা আর্থিক উন্নতি লাভ

করতো, তখন বলতো, এই ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে, যদি তাদের অবস্থা ভালো না হতো, তখন তারা বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করার পরই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এরপর তারা মুরতাদ হয়ে যেতো। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়–
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ـ

حَرْف-এর অর্থ হলো কিনারা, পাড়, তীর। যেভাবে কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; বরং তার মধ্যে টলটলায়মাণ অবস্থা থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ ও নড়বড়তার শিকার হয় তারও একই অবস্থা হয়। এ ধরনের মানুষ ধর্মের উপর অটল থাকতে পারে না। কেননা তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভ করা। যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে উক্ত ধর্মে বহাল থাকে, অন্যথায় পূর্বপুরুষের ধর্ম তথা শিরক ও কুফরের প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যারা খাঁটি মুসলমান হয়, তারা ঈমান ও একীনের উপর অবিচল থাকে। তারা দুঃখ-কষ্টের কোনো পরওয়ানা না করে ধর্মের উপর অটল অবিচল থাকে। তারা আল্লাহর মহান অনুগ্রহে ধন্য হলে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর দুঃখ কষ্টের শিকার হলে ধৈর্যধারণ করে।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা যত চেষ্টাই করুক এবং যত হিংসা করুক প্রিয়নবী ﷺ -কে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের সাহায্য বন্ধ করতে পারবে না এবং পবিত্র কুরআন অবতরণেও বাধা দিতে পারবে না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক কত সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং সত্যকে কত যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন! কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ভাগ্যাহত লোকের বোঝে না। শুধু তাই নয়; বরং তারা বুঝতে চায়ও না। বস্তুত হেদায়েত এবং গোমরাহী আল্লাহ পাকেরই হাতে।

قَوْلُهٗ مَنْ كَانَ يَظُنُّ : সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপে শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনোরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারো পক্ষে আকাশে যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তাফসীর হুবহু দুররে মনসুর গ্রন্থে ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তাফসীর। –[বয়ানুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবী (র.) এই তাফসীরকেই আবূ জাফর নাহহাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, এটা সবচেয়ে সুন্দর তাফসীর। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তাফসীর করেছেন যে, এখানে سَمَاءٌ বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো– যদি কোনো মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক। –[মাযহারী]

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফের অতঃপর কাফেরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দিবেন।

তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কুরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সুস্পষ্ট বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সিজদা'র শিরোনামে ব্যক্ত করে মানবজাতির দুইটি শ্রেণি বর্ণনা করা হয়েছে। ১. আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরিক। ২. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিনয়াবনত হওয়া। ফলে সৃষ্টজগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা

তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। ১. সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন বিশ্ব-চরাচরের কোনো কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। ২. সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্বইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে, তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোনো সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণিও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানবজাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়; কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কুরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আদেশ করলেন তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামুলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও জমিন আরজ করল, আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কুরআন বলে وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে গড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও [জিনসহ] সব সৃষ্ট বস্তু স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১. মুমিন তথা আনুগত্য ও সিজদাকারী এবং ২. কাফের তথা অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তাওফীক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে দু'দল লোকেরা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. যারা আল্লাহ পাককে সেজদা করে, তাঁর প্রতি অনুগত এবং কৃতজ্ঞ হয়। ২. যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, যাদের শাস্তি অবধারিত। আর আলোচ্য আয়াতে উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا الخ : শানে নুযূল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত হামযা (রা.), হযরত ওবায়দা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং ওতবা, শায়বা এবং ওলীদ ইবনে ওতবা সম্পর্কে। প্রথম তিনজন মুমিন ছিলেন, আর শেষ তিনজন কাফের।

ইমাম বুখারী এবং হাকেম (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের সম্পর্কে। হাকেম (র.) অন্য এক সূত্রে হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে যে দু'দল লোক যুদ্ধরত ছিল,

তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। একদিকে হযরত আলী (রা.) হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত ওবায়দা (রা.) ছিলেন। তাঁদের মোকাবিলায় কাফেরদের পক্ষ থেকে ছিল শায়বা ইবনে রাবীয়া, ওতবা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে ওতবা।

আল্লামা বগভী (র.) কায়েস ইবনে ওবাদের সূত্রে লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের সঙ্গে বিতর্ক করবার জন্যে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ পাকের রহমতের সম্মুখে বিনীত হয়ে হাজির হবো।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, বদরের দিন রণাঙ্গনে ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া এবং ওয়ালীদ ইবনে ওতবা বেরিয়ে আসে এবং তাদের মোকাবিলার জন্য হুঙ্কার দেয়। তখন তাদের মোকাবিলার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এবং তিজন আনসারী যুবক আওফ, মাআজ এবং মোয়াওয়াজ বের হয়ে আসেন। এই তিন জন যুবক হারেসের পুত্র ছিলেন। কাফেররা তাদের নাম জিজ্ঞাসা করে এবং এরপর হযরত রাসূলে করীম ﷺ -কে ডাক দিয়ে বলে, আমাদের মোকাবিলায় তাদেরকে প্রেরণ করুন যারা আমাদের নিকট থেকে বের হয়ে গেছে। তখন হযরত ওবাদা ইবনে হারেস (রা.), হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) এবং হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) বের হয়ে আসলেন। হযরত আলী (রা.) ওয়ালীদ ইবনে ওতবার মোকাবিলা করে তাকে শেষ করে দিলেন। আর হযরত হামযা কাল বিলম্ব না করে তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাবে খতম করলেন, অবশ্য হযরত ওবাদা (রা.) এবং ওতবার মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। এই অবস্থা দেখে হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) ওতবার উপর হামলা করে তাকে খতম করলেন। আর হযরত ওবাদা (রা.)-কে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর পা কেটে গিয়েছিল। যখন হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হযরত ওবাদা (রা.)-কে হাজির করা হলো, তখন তিনি আরজ করলেন, আমি কি শহীদ হবো না? হুজুর ﷺ -ইরশাদ করলেন, কেন নয়!

আয়াতের শানে নযূল সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ দিয়েছেন উফির সূত্রে ইবনে জারীর। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম কাতাদা (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে, মুসলমান ও আহলে কিতাবদের সম্পর্কে। আহলে কিতাব অর্থাৎ, ইহুদি নাসারারা বলেছে, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহ পাকের নিকট অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী। কেননা আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাজিল হয়েছে এবং আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করেছে। আহলে কিতাবদের এ কথার জবাবে মুসলমানগণ বলেছেন, আমরা আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী। কেননা, আমরা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি, তোমাদের নবীর প্রতি এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত আসমানি গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছি, আর তোমরা আমাদের নবীর পরিচয় পেয়েছো এবং আমাদের কিতাব সম্পর্কেও অবগত হয়েছো; কিন্তু শুধু হিংসার কারণেই তোমরা অস্বীকার করছো। মুসলমান ও আহলে কিতাবদের মধ্যে এ বিষয়েই বিতর্ক ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তৃতীয় অভিমত হলো, ইতিপূর্বে إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا আয়াতে ছয়টি ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে জান্নাতী আর বাকি পাঁচটিকে দোজখী ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা যদিও উপরিউক্ত আয়াতে, ছয়টি ধর্মের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু তাদেরকে হক ও বাতিল বা সত্য ও মিথ্যা এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. মুমিন : যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, মনে প্রাণে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মানে। ২. যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করে না। যেমন, ইহুদি খ্রিস্টান মজুসি, মুশরিক প্রভৃতি। এই দুই দল চিন্তা ও কর্মে তথা জীবনধারায় একে অন্যের প্রতিপক্ষ। বদরের রণাঙ্গনে এই দুই দলের মধ্যেই হয়েছিল সংঘর্ষ । হক ও বাতিলের মধ্যে হয়েছিল সেদিন যুদ্ধ, সেদিন আল্লাহ পাক সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হককে করেছিলেন বিজয়ী, যদিও সত্যের অনুসারীদের সংখ্যা ছিল কম। বাতিল বা মিথ্যাকে করেছিলেন পরাজিত, যদিও তাদের সামরিক শক্তি ছিল অধিকতর।

অনুবাদ :

٢٣. وَقَالَ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط بِالْجَرِّ اَيْ مِنْهُمَا بِاَنْ يُّرَصَّعَ اللُّؤْلُؤُ بِالذَّهَبِ وَبِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ مِنْ اَسَاوِرَ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ هُوَ الْمُحَرَّمُ لُبْسُهٗ عَلَى الرِّجَالِ فِي الدُّنْيَا ـ

২৩. আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তাদেরকে অলঙ্কৃত করা হবে স্বর্ণ কঙ্কণ, স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা لُؤْلُؤٍ শব্দটি যেরযোগে। অর্থাৎ কঙ্কণ, স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা প্রস্তুতকৃত হবে। আবার এটা لُؤْلُؤًا নসবযোগেও হতে পারে। তখন এটা مِنْ اَسَاوِرَ -এর مَحَلْ -এর উপর عَطْف হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের আর এটা পৃথিবীতে পুরুষের জন্য পরিধান করা হারাম।

٢٤. وَهُدُوْا فِي الدُّنْيَا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُدُوْآ اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ـ اَيْ طَرِيْقِ الْمَحْمُوْدِ وَدِيْنِهٖ ـ

২৪. তাদেরকে অনুগামী করা হয়েছিল পৃথিবীতে পবিত্র বাক্যের আর তা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসিত পথ ও দীনের উপর।

٢٥. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَاعَتِهٖ وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ مَنْسَكًا وَّمُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ الْمُقِيْمُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط الطَّارِيْ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ الْبَاءُ زَائِدَةٌ بِظُلْمٍ اَيْ بِسَبَبِهٖ بِاَنْ اِرْتَكَبَ مَنْهِيًّا وَلَوْ شَتَمَ الْخَادِمَ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ مُؤْلِمٍ اَيْ بَعْضَهٗ وَمِنْ هٰذَا يُؤْخَذُ خَبَرُ اِنَّ اَيْ نُذِيْقُهُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

২৫. যারা কুফরি করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে তাঁর আনুগত্য হতে ও মসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি হজের স্থান রূপে ও ইবাদতগাহ হিসেবে স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান রূপে, আর যে ইচ্ছা করে তাতে পাপকার্যের এখানে بَاءٌ টি অতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনের কারণে যেমন কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো যদিও তাকে নিজ সেবক বা ভৃত্যকে গালাগালের কারণেই হোক না কেন আমি তাকে আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তি। পীড়াদায়ক। অর্থাৎ তার কিছু অংশ। আর نُذِقْهُ হলো পূর্বোক্ত اِنَّ -এর خَبَرْ বা বিধেয়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির কিয়দংশ আস্বাদন করাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مِنْ اَسَاوِرَ : مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ بَعْضُ الْاَسَاوِرَ আবার بَيَانِيَّةٌ এবং زَائِدَةٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ الْاَسَاوِرْ : শব্দটি اَسْوِرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- চুড়ি। আর سُوَارٌ পেশ বা যবরসহকারেও হতে পারে। لُؤْلُؤٌ শব্দটি مَجْرُوْرٌ হলে اَسَاوِرُ -এর উপর عَطْف হবে, আর مَنْصُوْبٌ হলে اَسَاوِرْ -এর مَحَلْ এরূপে عَطْف হবে অর্থাৎ يُحَلَّوْنَ لُؤْلُؤًا হবে। লেখন পদ্ধতিটি যেহেতু আলিফসহকারে, কাজেই নীতি অনুযায়ী এটি مَنْصُوْبٌ

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ : يَصُدُّوْنَ -এর ই'রাবের তিনটি ধরন হতে পারে। যথা-

১. এর عَطْف হলো كَفَرُوْا -এর উপর। এ সময় প্রশ্ন হতে পারে যে, মুযারের উপর مَاضِىْ -এর عَطْف ঠিক নয়। এর তিনটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। ক. কখনও কখনও مُضَارِعْ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হয় না, বরং সার্বক্ষণিকতা উদ্দেশ্য হয়। আর এর মধ্যে مَاضِىْ -ও শামিল থাকে। খ. مُضَارِعْ -এর সীগাহটি مَاضِىْ -এর ব্যাখ্যায় হবে। গ. সীগাহটি নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। অবশ্য مَاضِىْ দ্বারা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হবে।

২. يَصُدُّوْنَ শব্দটি كَفَرُوْا -এর فَاعِلْ -এর ضَمِيْر থেকে حَالْ , অবশ্য এটা স্পষ্টরূপে ভ্রান্ত। কেননা হ্যাঁ-বাচক مُضَارِعْ যদি حَالْ হয়, তাহলে তার উপর وَاوْ প্রবিষ্ট হয় না। অথচ এখানে তা উল্লেখ রয়েছে।

৩. يَصُدُّوْنَ -এর মধ্যে اِنَّ -এর خَبَرْ -এর উপর وَاوْ টি অতিরিক্ত। মূল বাক্য এরূপ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَصُدُّوْنَ এটা কুফীগণের মাযহাব মতে।

قَوْلُهُ مَنْسَكًا : এটা جَعَلْنَاهُ -এর مَفْعُوْلْ فِيْهِ তথা কালের প্রতি ইঙ্গিত।

قَوْلُهُ سَوَاءَ جَعَلْنَا : এর দ্বিতীয় مَفْعُوْلْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর سَوَاءً শব্দটি مُسْتَوِيًا -এর অর্থে হবে। এটা اَلْعَاكِفُ -এর কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর سَوَاءً শব্দটি حَالْ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْبٌ হতে পারে। অধিকাংশ আলেমগণ سَوَاءٌ -কে مُبْتَدَأٌ হিসেবে مَرْفُوْعٌ পড়েছেন। এর خَبَرْ হলো عَاكِفْ অথবা এর বিপরীত হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ : ব্যাপকতার উদ্দেশ্যে يُرِدْ -এর مَفْعُوْلْ উল্লিখিত হয়নি। মূলত এমন ছিল وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ مُرَادًا অভিধানে اِلْحَادٌ অর্থ সত্য ও ন্যায়-বিচ্যুত হওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ هٰذَا اَىْ نُذِقْهُ : অর্থাৎ نُذِقْهُ -এর শব্দ দ্বারা اِنَّ -এর বিলুপ্ত خَبَرْ বুঝা যেতে পারে। আর তা হলো- نُذِقْهُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا الخ : জান্নাতীদেরকে কংকণ পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কঙ্কণ পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কঙ্কণ পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি স্বতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিসরার কঙ্কণ যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কঙ্কণ অন্যান্য মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হয়, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসেন এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের

মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই; বরং এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কঙ্কণ পরিধান করাকেও রাকজীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কঙ্কণ পরিধান করানো হবে। কঙ্কণ সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে ; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কঙ্কণ পরানো হবে স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। −[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ : রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। −[মাযহারী]

ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন−

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبَاسُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاٰنِيَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। −[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমন− হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। −[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে : কিন্তু সে তা পরিধান করতে পারবে না। −[কুরতুবী]

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোনো বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পতিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারো মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোনো উপকারিতা নেই। কুরতুবী (র.) এর চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভব করবে; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোনো কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতবাসীদের বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে জান্নাতের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভের কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসী ভাগ্যবান লোকেরা দুনিয়াতে পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করার তাওফীক পেয়েছিল। আল্লাহ

পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ্ পাঠের, তাঁর প্রশংসা করার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল, মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল। এমনিভাবে তারা লাভ করেছিল সর্বগুণাকর চির প্রশংসিত মহান আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথের সন্ধান। মূলত এ কারণেই তারা আখিরাতে ফেরেশতাদের সালাম লাভ করবে এবং বেহেশতবাসীগণ একে অন্যকে সালাম দিবেন। পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভ করে তারা শোকরগুজার হবেন।

قَوْلُهُ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কলেমায়ে তাইয়োবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী] বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

পূববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোনো কোনো কাফের এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানা ছিল না। ফলে কোনো রকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না; বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদের-হারামে [অর্থাৎ, গোটা হেরেম শরীফে] কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করবে, যেমন– মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া অথবা অন্য কোনো ধর্ম বিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে। বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ, শিরকও মিলিত থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম চূড়ান্ত অপরাধ ও শাস্তির কারণ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : سَبِيْلِ اللّٰهِ [আল্লাহর পথ] বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

قَوْلُهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : এটা তাদের দ্বিতীয় গুনাহ। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয় যা বায়তুল্লাহর চতুস্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো সময় মসজিদে হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়। যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি: বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে– وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তাফসীরে দুররে-মনসূরে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য : মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়। যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোনো ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকহবিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোনো কোনো ফিকহবিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা

হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েজ। হযরত ওমর ফারূক (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ ব্যাপারে উপরিউক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী। -[রূহুল মা'আনী]

ফিকহ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ : অভিধানে اِلْحَادٌ-এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'ইলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদহর মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তাফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা (র.) বলেন : 'হেরেমে ইলহাদ' বলে ইহরাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ- এমন কোনো কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোনো বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গুনাহ এবং আজাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ হলো- মক্কার হেরেমে সৎকাজের ছওয়াব যেমন অনেক বেশি হয়, তেমনি পাপকাজের আজাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।
-[মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই আয়াতের এক তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপকাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়; কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গুনাহ লিখা হয়। কুরতুবী (র.) এই তাফসীরই হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ করতে গেলে দুটি তাঁবু স্থাপন করতেন; একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর নওকরদের মধ্যে কোনো কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে গিয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আমাদেরকে এটা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় كَلَّا وَاللّٰهِ অথবা بَلٰى وَاللّٰهِ ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'ইলহাদ' করার শামিল। -[মাযহারী]

٢٦. وَ اذْكُرْ اِذْ بَوَّأْنَا بَيَّنَّا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَهُ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ زَمَنَ الطُّوفَانِ وَاَمَرْنَاهُ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ مِنَ الْاَوْثَانِ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ الْمُقِيْمِيْنَ بِهٖ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ . جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ اَىْ الْمُصَلِّيْنَ .

অনুবাদ :

২৬. এবং স্মরণ করুন যখন আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম বর্ণনা করেছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সেই গৃহের স্থান তাকে নির্মাণের জন্য। কেননা হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের সময় কাবাগৃহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কোনো শরিক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো মূর্তি থেকে তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায় তাতে সালাতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। এবং রুকু' করে ও সিজদা করে رُكَّعٌ শব্দটি رَاكِعٌ -এর বহুবচন, আর اَلسُّجُوْدُ শব্দটি سَاجِدٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ, নামাজিগণ।

٢٧. وَاَذِّنْ نَادِ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فَنَادٰى عَلٰى جَبَلِ اَبِىْ قُبَيْسٍ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَبَّكُمْ بَنٰى بَيْتًا وَاَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ اِلَيْهِ فَاَجِيْبُوْا رَبَّكُمْ وَالْتَفَتَ بِوَجْهِهٖ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا فَاَجَابَهُ كُلُّ مَنْ كُتِبَ لَهٗ اَنْ يَّحُجَّ مِنْ اَصْلَابِ الرِّجَالِ وَاَرْحَامِ الْاُمَّهَاتِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَجَوَابُ الْاَمْرِ يَاْتُوْكَ رِجَالًا مُشَاةً جَمْعُ رَاجِلٍ كَقَائِمٍ وَقِيَامٍ وَ رُكْبَانًا عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ اَىْ بَعِيْرٍ مَهْزُوْلٍ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى يَاْتِيْنَ اَىْ الضَّوَامِرُ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنٰى مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ . طَرِيْقٍ بَعِيْدٍ .

২৭. এবং ঘোষণা দিন আহবান করুন মানুষের নিকট হজের তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জাবালে কুবাইসে দাঁড়িয়ে আহবান করলেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক একটি ঘর নির্মাণ করেছেন। তোমাদের উপর তার হজ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। এবং তিনি স্বীয় চেহারাকে ডানে বামে পূর্বে পশ্চিমে ঘুরালেন। তখন যাদের ভাগ্যে হজ লিখা ছিল তাদের আত্মা পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং নারীদের গর্ভাশয় থেকে জবাব দিয়েছিল "লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'। আয়াতে اَمْرٌ -এর জবাব হচ্ছে يَاْتُوْكَ رِجَالًا তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে পায়ে হেঁটে رِجَالًا শব্দটি رَاجِلٌ -এর বহুবচন যেমন قِيَامٌ শব্দটি قَائِمٌ -এর বহুবচন। এবং আরোহণ করে সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে। অর্থাৎ, দুর্বল উট, আর এটা নর-মাদী উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তারা আসবে يَاْتِيْنَ -কে ضَامِرٌ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে দূরের পথ।

অনুবাদ :

২৮. لِيَشْهَدُوْا اَىْ يَحْضُرُوْا . مَنَافِعَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا بِالتِّجَارَةِ اَوْ فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ فِيْهِمَا اَقْوَالٌ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ اَىْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ اَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ اَوْ يَوْمِ النَّحْرِ اِلٰى اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَقْوَالٌ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ج اَلْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الَّتِىْ تُنْحَرُ فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا فَكُلُوْا مِنْهَا اِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبَّةً وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ . اَىْ اَلشَّدِيْدَ الْفَقْرِ .

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অথবা পরকালে কিংবা উভয় স্থানে। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এবং তারা যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অর্থাৎ, জিলহজ্জের দশদিন, অথবা আরাফার দিন অথবা কুরবানির ঈদের দিন হতে আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর উট, গরু, বকরি যা কুরবানির দিনে জবাই করা হয় ও তার পরে সকল 'হাদী'সমূহ ও কুরবানির পশু হতে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর। এটা মোস্তাহাব এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও অর্থাৎ, অতিশয় দরিদ্রকে।

২৯. ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ اَىْ يُزِيْلُوْا اَوْسَاخَهُمْ وَشَعَثَهُمْ كَطُوْلِ الظُّفُرِ وَلْيُوْفُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ نُذُوْرَهُمْ مِنَ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَلْيَطَّوَّفُوْا طَوَافَ الْاِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ . اَىْ اَلْقَدِيْمِ لِاَنَّهُ اَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ .

২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে অর্থাৎ তাদের ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি যেমন– লম্বা নখ দূরীভূত করতে পারে। এবং তাদের মানত পূর্ণ করে হাদী ও কুরবানির পশু জবাইয়ের মাধ্যমে। وَلْيُوْفُوْا শব্দের فَ বর্ণটি সাকিনযোগে ও তাশদীদযোগে উভয়ভাবে পঠিত হয়েছে। এবং তারা তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের অর্থাৎ পুরাতন বা প্রাচীন ঘর। কেননা এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর। আর এখানে তওয়াফ দ্বারা তওয়াফে ইফাযাহ উদ্দেশ্য।

৩০. ذٰلِكَ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ اَىْ اَلْاَمْرُ اَوِ الشَّاْنُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ هِىَ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ فَهُوَ اَىْ تَعْظِيْمُهَا خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهٖ فِى الْاٰخِرَةِ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اَكْلًا بَعْدَ الذَّبْحِ .

৩০. এটাই বিধান এটা হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ বাক্যটি এরূপ ছিল– اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ অথবা اَلشَّاْنُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে তা পূর্ণ হয়েছে এবং কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে আর তা হলো সে সকল বস্তু যার মর্যাদাহানি করা জায়েজ নয়। এটাই অর্থাৎ তার সম্মান করা তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম। পরকালে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। জবাই করার পর ভক্ষণ করা।

اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ تَحْرِيْمُهٗ فِىْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْاٰيَةَ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَّصِلًا وَالتَّحْرِيْمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهٖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ مِنْ لِلْبَيَانِ اَىِ الَّذِىْ هُوَ الْاَوْثَانُ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ - اَىِ الشِّرْكَ فِىْ تَلْبِيَتِكُمْ اَوْشَهَادَةَ الزُّوْرِ -

অনুবাদ :

এইগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। যার নিষিদ্ধতা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الخ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِثْنَاءٌ টি مُنْقَطِعٌ হয়েছে, আবার এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ -ও হতে পারে। আর হারাম হওয়াটা মৃত্যু ইত্যাদি জনিত কারণে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এখানে مِنْ টি بَيَانٌ -এর জন্য এসেছে। অর্থাৎ, অপবিত্রতা হলো মূর্তিসমূহ। এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে অর্থাৎ তালবিয়া পাঠে তাদের শিরক থেকে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে।

৩১. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ مُسْلِمِيْنَ عَادِلِيْنَ عَنْ كُلِّ سِوٰى دِيْنِهٖ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهٗ وَهُمَا حَالَانِ مِنَ الْوَاوِ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ سَقَطَ - مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَىْ تَاْخُذُهٗ بِسُرْعَةٍ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ اَىْ تُسْقِطُهٗ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ بَعِيْدٍ اَىْ فَهُوَ لَا يُرْجٰى خَلَاصُهٗ -

৩১. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে মুসলমান/ অনুগত হয়ে তাঁর মনোনীত ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে। এবং তার কোনো শরিক না করে এটা পূর্বের বক্তব্যের তাকিদ স্বরূপ। حُنَفَاءَ এবং غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ উভয়টি فَاجْتَنِبُوْا -এর وَاوْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। এবং যে কেউ আল্লাহর শরিক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছো-মেরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ দ্রুত নিয়ে গেল। কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। দূরবর্তী। অর্থাৎ তার নিষ্কৃতি লাভের আশা করা যায় না।

৩২. ذٰلِكَ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ الْاَمْرُ مُبْتَدَاً وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا اَىْ فَاِنَّ تَعْظِيْمَهَا وَهِىَ الْبُدْنُ الَّتِىْ تُهْدٰى لِلْحَرَمِ بِاَنْ تُسْتَحْسَنَ وَتُسْتَسْمَنَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ مِنْهُمْ وَسُمِّيَتْ شَعَائِرُ لِاِشْعَارِهَا بِمَا يُعْرَفُ بِهٖ اَنَّهَا هَدْىٌ كَطَعْنٍ حَدِيْدَةٍ بِسَنَامِهَا -

৩২. এটাই আল্লাহর বিধান এর পূর্বে اَلْاَمْرُ মুবতাদা উহ্য রয়েছে। এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটাতো অর্থাৎ উট যেগুলোকে হরমে হাদী স্বরূপ কুরবানির জন্য প্রেরণ করা হয়। আর সেগুলোর সম্মান এভাবে যে, সেগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রেখে মোটাতাজা করবে। তার হৃদয়ের তাকওয়ার নিদর্শন তাদের থেকে। এগুলোকে شَعَائِرُ বলার কারণ হলো এ জাতীয় পশুতে এমন চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে এগুলো চেনা যায়। যেমন– পশুর কুঁজে বর্শা দ্বারা আঘাত করে ক্ষত করে দেওয়া।

৩৩. لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَرُكُوْبِهَا وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا مَا لَا يَضُرُّهَا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَقْتَ نَحْرِهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا اَىْ مَكَانَ حِلِّ نَحْرِهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - اَىْ عِنْدَهٗ وَالْمُرَادُ الْحَرَمُ جَمِيْعُهٗ -

৩৩. এই সমস্ত আনআমে তোমাদের জন্য নানাবিধি উপকার রয়েছে। যেমন তাতে আরোহণ করা, বোঝা বহন করা যা তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কুরবানি করার সময় পর্যন্ত। অতঃপর তাদের কুরবানির স্থান অর্থাৎ এগুলোকে কুরবানি করা হালাল হওয়ার স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট অর্থাৎ তার পার্শ্বে। আর হরম দ্বারা সমগ্র হরম উদ্দেশ্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَوَّأْنَا : এ শব্দটি بَوَّأَ تَبْوِئَةً থেকে جَمْعُ مُتَكَلِّمْ - مَاضِىْ مُطْلَقْ-এর সীগাহ। অর্থ– আমি স্থান দিয়েছি। যুজাজ (র.) বলেন بَوَّأْنَا -এর অর্থ بَيَّنَّا لَهُ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَهُ وَيَكُوْنُ مُبَاءَةً لَهُ ব্যাখ্যাকার (র.) بَوَّأْنَا-এর ব্যাখ্যা بَيَّنَّا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لِإِبْرَاهِيْمَ-এর মধ্যকার لَامْ অতিরিক্ত নয়; বরং صِلَةْ স্বরূপ مُتَعَدِّىْ-এর জন্য। আর যদি اَنْزَلْنَا অর্থে হয় তাহলে لَامْ-কে অতিরিক্ত মানতে হবে। কেননা এ সময় بَوَّأْنَا নিজেই مُتَعَدِّىْ হবে।

قَوْلُهُ اَمَرْنَاهُ : শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِهٖ-এর مَعْمُوْل আর এ বিলুপ্ত ক্রিয়াটির عَطْف হয়েছে بَوَّأْنَا-এর উপর। وَطَهِّرْ بَيْتِىَ-এর পূর্বে اَمَرْنَا অথবা قُلْنَا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَاْتُوْكَ : এখানে حَاضِرْ-এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে যে, হাজীগণ বায়তুল্লাহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে হাজির হয়ে থাকেন। অথবা এখানে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَاْتُوْ بَيْتَكَ এখানে كَافْ-এর প্রতি بَيْتْ-এর সম্বন্ধ মূলত নির্মাণের কারণেই করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ضَامِرٌ : এর অর্থ হলো দুর্বল, যার কোমর চিকন হয়, শব্দটি ضُمُوْر থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। تَضْمِيْر বলা হয় ঘোড়াকে মোটা করার পরে তাকে দৌড়িয়ে দুর্বল করাকে, যাতে সে দ্রুতগামী ও তেজস্বী হয়।

قَوْلُهُ يَاْتِيْنَ : এটা বহুবচনের সীগাহ। ضَامِرْ-এর সিফত। অথচ ضَامِرْ হলো مُفْرَدْ আর كُلِّ ضَامِرٍ বহুবচনের অর্থে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে يَاْتِيْنَ-কে বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যাথায় يَاْتِىْ আনা উচিত ছিল।

قَوْلُهُ لِيَشْهَدُوْا : এর সম্বন্ধ اَذِّنْ এবং يَاْتُوْكَ উভয়ের সাথে হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট। اِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبَّةً ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট যেহেতু ওয়াজিব কুরবানির গোশত ধনীদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়, এজন্য ব্যাখ্যাকার اِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبَّةً বৃদ্ধি করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, জেনায়েতের দম তথা কোনো অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পশু জবাই করা হয় তা ছাড়া অন্যান্য কুরবানী ধনীদের জন্য খাওয়া জায়েজ আছে। যেমন তামাত্তু ও কিরান হজের কুরবানি বা দম খাওয়া জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ طَوَافُ الْاِفَاضَةِ : এটা হলো তওয়াফের রোকন। এটাকে তওয়াফে জিয়ারতও বলা হয়। মুফাসসির (র.) এটাকে ইফাদা (اِفَاضَةٌ) বলেছেন। এ সময়টি হলো আরাফাত থেকে বিদায় হওয়ার সময়।

قَوْلُهُ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : عَتِيْق-এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা– **ক.** প্রাচীন, যেহেতু ইবাদতখানা স্বরূপ পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর হলো বায়তুল্লাহ, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। **খ.** স্বাধীন, মুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এ ঘরকে জালিম শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রেখেছেন, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হস্তক্ষেপ বা বিধ্বস্ত করার ঘটনাটি মূলত হযরত জুবায়ের (রা.)-কে বায়তুল্লাহ থেকে বের করার জন্য ছিল, বায়তুল্লাহকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছিল না। এ কারণেই তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বাতুল্লাহকে পুনরায় নির্মাণ করে দেন। কেউ কেউ আতীক অর্থ সম্মানিত বলেছেন। –[হাশিয়াতুল জুমাল]

قَوْلُهُ تَحْرِيْمُهْ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يُتْلٰى-এর নায়েবে ফায়েল উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যদি تَحْرِيْمُهٗ উহ্য মানার পরিবর্তে اٰيَتُ التَّحْرِيْمِ বিলুপ্ত মানতেন তাহলে তা আরো উত্তম হতো। কেননা তেলাওয়াতকৃত বিষয় হলো আয়াতে তাহরীম, মূল তাহরীম নয়।

قَوْلُهُ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ ; কেননা اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এটা مُسْتَثْنٰى তথা اَلْاَنْعَامْ-এর সমজাতীয় নয়। আবার مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হলো وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ الْاٰيَةَ

-ও হতে পারে। তা এভাবে যে, إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর মধ্যকার مَا দ্বারা ঐ সকল মৃত জন্তু উদ্দেশ্য যা মৃত্যুর কোনো কারণ সাপেক্ষে মরে গেছে। অথবা গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে। সুতরাং এ সময় مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টা مُسْتَثْنٰى -এর শ্রেণিগত হবে। সুতরাং مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে।

قَوْلُهُ حُنَفَاءَ : এটা اِجْتَنِبُوْا -এর وَاوْ যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَعَائِرَ اللّٰهِ : شَعَائِرْ বলা হয় হজের কার্যাবলিকে। এর একবচন হলো شَعِيْرَةٌ বা شِعَارَةٌ আর مَشَاعِرْ শব্দটি হজ আদায়ের জায়গাসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ هِيَ الْبُدْنُ : পূর্বের বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে شَعَائِرْ -এর ব্যাখ্যা করেছেন بُدْنْ দ্বারা। তবে এটাকে ব্যাপক অর্থে রাখলেই ভালো হতো। তাহলে হজের অন্যান্য কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হতো।

قَوْلُهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ مِنْهُمْ : مِنْهُمْ বৃদ্ধি করে ইশারা করেছেন যে, مَنْ يُعَظِّمْ -এর মধ্যকার مَنْ مَوْصُوْلَةٌ আর مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ বাক্য হয়ে صِلَةٌ , এর মধ্যে একটি ضَمِيْر থাকা আবশ্যক, আর তা হলো مِنْهُمْ

قَوْلُهُ طَعْنٌ : এর অর্থ হলো বর্শা দ্বারা আঘাত করা। سِنَامْ অর্থ উটের পিঠের উঁচু অংশ তথা কুঁজ।

قَوْلُهُ كَرُكُوْبِهَا : এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে। আর হানাফীগণের মতে অপারগতা ছাড়া সওয়ার হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ الْحَرَمُ : এখানে নিকটবর্তী বস্তুকে হুবহু বস্তুর বিধান দান করা হয়েছে। কেননা হাদী বায়তুল্লাহে জবাই করা হয় না; বরং হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হেরেমের সীমারেখার মধ্যে জবাই করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : অর্থাৎ কুরবানীর পশু জবাই করার জায়গা হলো বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী স্থান, অর্থাৎ, হেরেমের অভ্যন্তরে, চাই মক্কায় হোক বা মীনায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ : বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা : আভিধানে بَوَّأَ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই– একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল্লাহর অবস্থানস্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাতুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) ও তৎপরবর্তী পয়গাম্বরগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জায়গার মাঝেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয়– اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিদের মোকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাবলি পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে এরূপ সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয়– وَطَهِّرْ بَيْتِيَ অর্থাৎ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। –[কুরতুবী]

এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ হলো কুফর ও শিরক থেকেও পবিত্র রাখা বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হজ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। -[বগভী] ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয় তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মতো কেউ নেই যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবূ কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন, 'লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ ফরজ করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল তাদের সবার কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়া হয়, যার যার ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আওয়াজের জবাবই হচ্ছে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। -[কুরতুবী, মাযহারী]

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে- يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ অর্থাৎ, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গাম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে বর্ণিত ছিল।

قَوْلُهُ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ : অর্থাৎ দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে مَنَافِعَ শব্দটি نَكِرَةٌ ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই, উপরন্তু পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোনো ব্যক্তি হজ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন- বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকির হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ তা'আলা হজ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোনো ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না; বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ ও ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোনো অংশে কম নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গুনাহের কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সেও তদ্রূপই হয়ে যায়। -[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

বায়তুল্লাহর কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে– وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরি কথা এই যে, কুরবানির গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর জিকির, যা এই দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কুরবানির গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা জায়েজ। অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ -এর অর্থ ব্যাপক ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব– সব রকম কুরবানি এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ فَكُلُوْا مِنْهَا : এখানে كُلُوْا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়: বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা। যেমন– কুরআনের وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতি দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসআলা : হজের মওসুমে মক্কা মুয়ায্যমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু জবাই করা হয়। কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোনো জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোনো জন্তুর পরিবর্তে কোন ধরনের জন্তু কুরবানি করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোনো কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এরূপ কুরবানিকে 'দমে-জিনায়াত' [ত্রুটিজনিত কুরবানি] বলা হয়। কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কুরবানি করা জরুরি হয়, কোনো কোনো কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। 'আহকামুল হজ' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকিনদের হক। অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত। কুরবানির অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর গোশত কুরবানিকারী নিজে, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে 'তামাত্তু' ও 'কেরানে'র কুরবানিও ওয়াজিব কুরবানির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কুরবানিই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কুরবানি এবং হজের কুরবানিসমূহের কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাব আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

بَائِسٌ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فَقِيْرٌ -এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কুরবানির গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মোস্তাহাব ও কাম্য।

قَوْلُهُ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ : تَفَثٌ এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো, চুল কাটা , উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজের কুরবানি সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নিজের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কুরবানি ও পরে ইহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কুরবানির পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ত্রুটিজনিত কুরবানি করতে হবে।

হজের ক্রিয়াকর্মে ক্রমধারার গুরুত্ব : হজের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রমধারা কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকহবিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রমধারা অনুযায়ী হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রতে সুন্নত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ত্রুটিজনিত কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে ছওয়াব হ্রাস পায়,

কুরবানি ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে আছে- مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهٖ اَوْ اَخَّرَهٗ فَلْيُهْرِقْ دَمًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনোটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভী (র.)-ও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছে এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, নাখায়ী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাযহাবও তাই। তাফসীরে হজের অন্যান্য মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ : نُذُوْرٌ শব্দটি نَذْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরিয়তের আইনে যে কাজ কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাম করব অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জন্য এই কাজ করা জরুরি, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ ও নাজায়েজ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোনো গুনাহের কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহের কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ ফিকহবিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত। যেমন নামাজ, রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এই আয়াতে পূর্বেও হজের ক্রিয়াকর্ম, তথা কুরবানি ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে- যিয়ারত এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে ; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ ছাড়াও হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোনো দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজের দিন, হজের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজের ক্রিয়া কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কুরবানির মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে মানতের অর্থ কুরবানির মানতই করেছেন। হজের বিধানের সাথে মানতের আরো একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েজ নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায় তেমনিভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরজ হয় কিন্তু হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরজ হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায় এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুণ্ডানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েজ কাজ নয়; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরিমা (রা.) এ স্থলে মানতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো হজের কারণে তার উপর জরুরি হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে যিয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানির পর করা হয়। এই তওয়াফ হজের দ্বিতীয় রোকন ও ফরজ। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরো পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে যিয়ারতের পর ইহরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহরাম খুলে যায়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ : عَتِيْق শব্দের অর্থ- মুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাঁর গৃহের নাম بَيْت عَتِيْق রেখেছেন কারণ আল্লাহ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। -[রূহুল মা'আনী] কোনো কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে ফীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ حُرُمَاتِ اللّٰهِ : حُرُمَاتِ اللّٰهِ বলে আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরিয়তের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

قَوْلُهُ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : اَنْعَامْ বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যে যেসব জন্তুর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ, মৃত জন্তু যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহরামের বাইরে।

قَوْلُهُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ : رِجْسٌ শব্দের অর্থ– অপবিত্রতা, ময়লা। اَوْثَانٌ শব্দটি وَثَنٌ -এর বহুবচন; অর্থ– মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপিবত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

قَوْلُهُ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ : قَوْلُ زُوْرٍ -এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থি, তাই বাতিলও মিথ্যাভুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বৃহত্তম কবীরা গুনাহ হচ্ছে এগুলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلُ الزُّوْرِ -কে বার বার উচ্চারণ করেন। –[বুখারী]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ : شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোনো বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শায়ায়েরে ইসলাম' বলা হয়। হজের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

قَوْلُهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ : অর্থাৎ, আল্লাহর আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

قَوْلُهُ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى : অর্থাৎ চতুস্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হেরেম শরীফে জবাই করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি জবাই করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোনো জন্তুকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোনো উপকার লাভ করা বিশেষ কোনো অপারগতা ছাড়া জায়েজ নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোনো জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

قَوْلُهُ ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানের اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ [সম্মানিত গৃহ] বলে সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম হলো বায়তুল্লাহরই বিশেষ আঙ্গিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। مَحِلٌ অর্থাৎ, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে জবাই করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু জবাই করার স্থান বায়তুল্লাহর সন্নিকট অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী জবাই করা জরুরি, হেরেমের বাইরে জায়েজ নয়। হেরেম মিনার কুরবানিগাহও হতে পারে, মক্কা মুকাররমার অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٣٤. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَیْ جَمَاعَةٍ مُّؤْمِنَةٍ سَلَفَتْ قَبْلَكُمْ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْحِ السِّيْنِ مَصْدَرٌ وَبِكَسْرِهَا اِسْمُ مَكَانٍ اَیْ ذَبْحًا قُرْبَانًا اَوْ مَكَانَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ط عِنْدَ ذَبْحِهَا فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا ط اِنْقَادُوْا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ . اَلْمُطِيْعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ .

৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত মুমিন দলের জন্য। আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি। مَنْسَكًا শব্দটির سِيْن বর্ণে যবর তখন এটা মাসদার হবে। আর س বর্ণে যের হলে এটা ظَرْف مَكَانْ অর্থাৎ কুরবানির পশু জবাই করা তা বা জবাই করার স্থান। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেগুলো জবাই করার সময়। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্। সুতরাং তোমরা তারই নিকট আত্ম সমর্পণ কর। অনুগত হও। এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে। অনুগত ও বিনয়ীগণকে।

٣٥. الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ خَافَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ فِيْ اَوْقَاتِهَا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ . يَتَصَدَّقُوْنَ .

৩৫. আল্লাহর নাম স্মরণ হলে যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় ভীত হয়। যারা তাদের আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে তার নির্দিষ্ট সময়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে দান-খয়রাত করে।

٣٦. وَالْبُدْنَ جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ الْاِبِلُ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ اَعْلَامِ دِيْنِهٖ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ نَفْعٌ فِي الدُّنْيَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَجْرٌ فِي الْعُقْبٰى فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا عِنْدَ نَحْرِهَا صَوَآفَّ ج قَائِمَةً عَلٰى ثَلٰثٍ مَعْقُوْلَةَ الْيَدِ الْيُسْرٰى فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا سَقَطَتْ اِلَى الْاَرْضِ بَعْدَ النَّحْرِ وَهُوَ وَقْتُ الْاَكْلِ مِنْهَا فَكُلُوْا مِنْهَا اِنْ شِئْتُمْ . وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ الَّذِيْ يَقْنَعُ بِمَا يُعْطٰى وَلَا يَسْاَلُ وَلَا يَتَعَرَّضُ وَالْمُعْتَرَّ ط اَلسَّائِلَ اَوِ الْمُتَعَرِّضَ كَذٰلِكَ اَیْ مِثْلَ ذٰلِكَ التَّسْخِيْرِ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ بِاَنْ تُنْحَرَ وَ تُرْكَبَ وَاِلَّا لَمْ تُطِقْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . اِنْعَامِيْ عَلَيْكُمْ .

৩৬. এবং উষ্ট্রকে এটা بَدَنَةٌ -এর বহুবচন অর্থ উট আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তার দীনের বিভিন্ন আলামত। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। পৃথিবীতে কল্যাণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরকালে প্রতিদান। সুতরাং তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর জবাই করার সময় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় অর্থাৎ সেগুলো তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ানো অবস্থায় ও বাম পা বাঁধা অবস্থায়। যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় নহর করার পর মাটিতে ভূপাতিত হয় তখন তা হতে ভক্ষণ করার সময়। তখন তোমরা তা হতে আহার কর যদি তোমরা খেতে চাও। এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে তাকে যা প্রদান করা হয় তাতেই সে তুষ্ট থাকে এবং কারো নিকট যাচ্ঞা করে না ও কারো নিকট যায় না। ও যাচ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক। এভাবেই অর্থাৎ এরূপ বাধ্যগত করার ন্যায় আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি এভাবে যে, যাতে নহর করতে ও আরোহণ করতে পার। অন্যথায় তোমরা সক্ষম হতে না যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমাদের উপর প্রদত্ত আমার অনুগ্রহের।

অনুবাদ :

٣٧. لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اَىْ لَا يُرْفَعَانِ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط اَىْ يُرْفَعُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْخَالِصُ لَهٗ مَعَ الْاِيْمَانِ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ اَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهٖ وَمَنَاسِكِ حَجِّهٖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ . اَىِ الْمُوَحِّدِيْنَ .

৩৭. আল্লাহর নিকট পৌঁছে না তাদের গোশত এবং রক্ত অর্থাৎ তাঁর নিকট এগুলোকে উঠানো হয় না। তবে পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া অর্থাৎ, তাঁর নিকট উঠানো হয় ঈমানের সাথে খাঁটি সৎকর্মসমূহ এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তোমাদেরকে তার দীনের নিদর্শনাবলি আঞ্জাম দেওয়ার এবং নিজেদের হজ পালন করার তৌফিক দান করেছেন। সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসীগণকে।

٣٨. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط غَوَائِلَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ فِىْ اَمَانَتِهٖ كَفُوْرٍ . لِنِعْمَتِهٖ وَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ الْمَعْنٰى اَنَّهٗ يُعَاقِبُهُمْ .

৩৮. আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে মুশরিকদের বিপদাপদকে প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো বিশ্বাসঘাতককে তার আমানতের ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞকে তাঁর নিয়ামতের। আর এরা হলো মুশরিকরা। অর্থ হচ্ছে– তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مَنْسَكًا : এ শব্দটির س বর্ণে যবর হলে এটি মাসদার হবে। অর্থ কুরবানি করা, আর যেরযোগে হলে তা হবে اِسْمِ ظَرْف অর্থাৎ, কুরবানি করার স্থানে। نُسُكٌ এবং مَنْسَكٌ আরবি ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– ১. পশু কুরবানি করা। ২. হজের সকল কার্যকলাপ। ৩. স্বাভাবিক ইবাদত-বন্দেগী। এখানে তিনোটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে مَنْسَكٌ দ্বারা কুরবানির অর্থ নিয়েছেন। এ সময় অর্থ হবে কুরবানির বিধান যা এ উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো নতুন বিধান নয়, বরং পূর্বের উম্মতদেরকেও এমন বিধান দেওয়া হয়েছিল। হযরত কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ সময় এর উদ্দেশ্য হবে হজের কার্যাবলি যেভাবে এ উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, পূর্বের উম্মতের উপরও তদ্রূপ এ বিধান আরোপিত ছিল। অর্থাৎ তাদের উপরও হজ ফরজ ছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অর্থাৎ আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্বের উম্মতসমূহের উপরও ফরজ করেছিলাম।

قَوْلُهٗ ذَبْحًا قُرْبَانًا : এটা মাসদারের অর্থকে স্পষ্টকারী। قُرْبَانًا শব্দটি ذَبْحًا মাসদারের مَفْعُوْل بِهٖ ; اَوْ مَكَانَهٗ এটা দ্বিতীয় অর্থ তথা اِسْمُ ظَرْف-এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ الْمُطِيْعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ : مُطِيْعِيْنَ দ্বারা مُخْبِتِيْنَ-এর لَازِمْ مَعْنٰى তথা আবশ্যিক অর্থের বর্ণনা। আর مُتَوَاضِعِيْنَ এটা মূল অর্থের বর্ণনা। কেননা اِخْبَاتٌ বলা হয় নিম্নভূমিতে অবতরণ করাকে।

قَوْلُهٗ وَهِىَ الْاِبِلُ : এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উট এবং গরু উভয়ের উপর بَدَنَة শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং এ উক্তিটি অভিধান এবং শরিয়তের অনুকূলে। কামূস অভিধানে আছে যে– اَلْبَدَنَةُ مِنَ الْاِبِلِ

وَالْبَقَرْ আবূ দাঊদ ও নাসায়ী শরীফে হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, তিনি আমাদেরকে গরু এবং উটের মধ্য থেকে প্রত্যেক বুদনায় (بُدْنَةٌ) সাতজনকে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আমরা বুদনাকে সাতজনের পক্ষ থেকে জবাই করতাম। জিজ্ঞেস করা হলো গরুর মধ্যে? তিনি বললেন, গরুও বুদনার অন্তর্গত। -[জালালাইনের প্রান্তটীকা]

قَوْلُهُ صَوَآفَّ : শব্দটি صَافٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। وَجَبَتْ অর্থ سَقَطَتْ অর্থাৎ, পতিত হলো, এটা وَجَبَ الْحَائِطُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থ দেয়াল বিধ্বস্ত হয়েছে। এখানে অর্থ হলো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থির হওয়া।

قَوْلُهُ فَكُلُوْا مِنْهَا اِنْ شِئْتُمْ : اِنْ شِئْتُمْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, كُلُوْا আমরের সীগাটি وُجُوْبٌ -এর জন্য নয় বরং اِبَاحَتٌ তথা বৈধতা বর্ণনার জন্য।

قَوْلُهُ غَوَائِلُ : এ শব্দটি বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, يُدَافِعُ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ : এর মধ্যে مَا مَصْدَرِيَّةٌ -ও হতে পারে। আবার مَوْصُوْلَةٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ, عَلٰى مَا هَدَاكُمْ اِلَيْهِ এখানে عَلٰى -এর সম্বন্ধ হলো لِتُكَبِّرُوْا -এর সাথে, আর تَكَبُّراً ক্রিয়াটি تَشْكُرُوْا -এর অর্থ বিশিষ্ট, যাতে তার صِلَةٌ টা عَلٰى -এর সাথে ব্যবহার করা বৈধ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : আরবি ভাষায় نُسُكٌ ও مَنْسَكٌ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- ১. জন্তু কুরবানি করা। ২. হজের ক্রিয়াকর্ম এবং ৩. ইবাদত। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিনোটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিনোটি অর্থেই হতে পারে। এ কারণেই তাফসীরকারক মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে مَنْسَكٌ -এর অর্থ কুরবানি নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কুরবানির যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোনো নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কুরববানির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজে ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ ফরজ করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা (র.) তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

قَوْلُهُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ : আরবি ভাষায় خَبْتٌ শব্দর অর্থ- নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خَبِيْتٌ বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.) مُخْبِتِيْنَ -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে আউস (র.) বলেন, এমন লোকদেরকে مُخْبِتِيْنَ বলা হয় যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান (র.) বলেন, যারা সুখে দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব অনটনে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مُخْبِتِيْنَ

قَوْلُهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ : وَجَلٌ -এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি , যা কারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شَعَآئِرُ বলা হয়। কুরবানিও এমন বিধানাবলির অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ : صَوَافّ শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.)-এর এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কুরবানি করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় জবাই করা সুন্নত।

قَوْلُهُ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا : এখানে وَجَبَتْ এর অর্থ سَقَطَتْ যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় وَجَبَتِ الشَّمْسُ অর্থাৎ, সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : যাদেরকে কুরবানির গোশত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بَائِسَ فَقِيْر বলা হয়েছে। এর অর্থ– দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে قَانِعْ وَمُعْتَرّ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। قَانِعْ ঐ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাচ্ঞা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে مُعْتَرّ ঐ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। –[মাযহারী]

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য: لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানি একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌছে না এবং কুরবানির উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাজে উঠাবসা করা এবং রোজার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীণ কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরিয়ত সম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে হজের বিধান এবং দুনিয়া আখিরাতে হজের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদেরকে পবিত্র কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে।

মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা : আর এ আয়াতে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের বাড়াবাড়ি বেশি দিন আর চলবে না। অদূর ভবিষ্যতেই এমন অবস্থা হবে যে, মুসলমানদেরকে হজ ও ওমরা পালনে কোনো শত্রুই বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের বিষ দাত ভেঙ্গে দিবেন, আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করবেন যে, কাফেররা মুসলমানদের গায়ে আচড় পর্যন্ত দিতে পারবে না। তাই ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুমিনগণ থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিবেন এবং কাফেরদের অন্যায়-অনাচার বন্ধ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, পছন্দ না করার তাৎপর্য হলো, ঘৃণা করা। অর্থাৎ যারা অবাধ্য কাফের এবং যারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ তাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করে অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ পাক কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? আর অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ "আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।" অতএব মুমিন মাত্রেরই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না।

তাফসীরকার জুরায়েজ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম স্মরণ করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নামে কুরবানি করে এবং তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তাকেই আলোচ্য আয়াতে خَوَّانٍ كَفُوْر বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারাই হলো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। আর এমন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না। অতএব যারা মুমিন, যারা সত্যপরায়ণ, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত এবং কাফেরদের পরাজয় অবধারিত।

অনুবাদ :

٣٩. أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ اَىْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يُّقَاتِلُوْا وَهٰذِهٖ اَوَّلُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ فِى الْجِهَادِ بِاَنَّهُمْ اَىْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ ظُلِمُوْا بِظُلْمِ الْكَافِرِيْنَ اِيَّاهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ـ

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণকে যুদ্ধ করার আর এটাই হলো জিহাদ সংক্রান্ত অবতীর্ণ প্রথম আয়াত কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাদের উপর কাফেরদের অত্যাচারের কারণে। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

٤٠. الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ فِى الْاِخْرَاجِ مَا اُخْرِجُوْا اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا اَىْ بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَهٰذَا الْقَوْلُ حَقٌّ وَالْاِخْرَاجُ بِهٖ اِخْرَاجٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَدَلٌ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ بِالتَّشْدِيْدِ لِلتَّكْثِيْرِ وَبِالتَّخْفِيْفِ صَوَامِعُ لِلرُّهْبَانِ وَبِيَعٌ كَنَائِسُ لِلنَّصَارٰى وَصَلَوٰتٌ كَنَائِسُ لِلْيَهُوْدِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَمَسٰجِدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ يُذْكَرُ فِيْهَا اَىِ الْمَوَاضِعُ الْمَذْكُوْرَةُ اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ بِخَرَابِهَا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اَىْ يَنْصُرُ دِيْنَهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَلٰى خَلْقِهٖ عَزِيْزٌ ـ مَنِيْعٌ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَقُدْرَتِهٖ ـ

৪০. তাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের বহিষ্কারের কোনোই কারণ ছিল না। শুধু এ কারণে যে, তারা বলে তাদের এ কথার কারণে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তিনি একক সত্তা। আর একথা সঠিক। আর এ কারণে বহিষ্কার করা অন্যায় বহিষ্কারই। আল্লাহ যদি মানব দলের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন بَعْضَهُمْ এটা مِنَ النَّاسِ থেকে بَدَلٌ الْبَعْضِ হয়েছে। তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত لَهُدِّمَتْ -এর دال বর্ণে তাশদীদসহ অধিক বর্ণনা করার জন্য এবং তাশদীদবিহীনও পঠিত রয়েছে। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনার স্থান, গীর্জা খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। ইহুদিদের উপাসনালয় ইবরানী ভাষায় صَلَوٰتٌ বলা হয় ইহুদিদের كَنِيْسَه -কে। এবং মসজিদসমূহ মুসলমানদের যাতে স্মরণ করা হয় অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানসমূহে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে সে সকল স্থানসমূহ বিরান হওয়ার ফলে ইবাদতও বন্ধ হয়ে যেত। আর আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে, তাঁকে সাহায্য করে অর্থাৎ যে তাঁর দীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয় শক্তিমান তাঁর সৃষ্টির উপর। পরাক্রমশালী স্বীয় শক্তি ও রাজত্বে অন্যকে প্রতিহতকারী।

অনুবাদ :

٤١. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ بِنَصْرِهِمْ عَلٰى عَدُوِّهِمْ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَهُوَ وَجَوَابُهُ صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ وَيُقَدَّرُ قَبْلَهُ هُمْ مُبْتَدأً وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ . اَىْ اِلَيْهِ مَرْجِعُهَا فِى الْاٰخِرَةِ .

৪১. আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তাদের শত্রুর মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে এরা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। এটা হলো شَرْط -এর জবাব। আর شَرْط এবং جَوَابٌ শَرْط মিলে اَلَّذِيْنَ মওসুল-এর সেলাহ। এর পূর্বে هُمْ মুবতাদা উহ্য রয়েছে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পরকালে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٤٢. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ تَانِيْثُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنٰى وَعَادٌ قَوْمُ هُوْدٍ وَّثَمُوْدُ . قَوْمُ صَالِحٍ .

৪২. লোকেরা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে এ বাক্যে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হচ্ছে। তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ সম্প্রদায় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে قَوْم -কে স্ত্রীলিঙ্গ ধরে كَذَّبَتْ ফে'লটিকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। এবং আদ হযরত হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায় ও সামূদ হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়।

٤٣. وَقَوْمُ اِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ .

৪৩. হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়।

٤٤. وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبٍ وَكُذِّبَ مُوْسٰى كَذَّبَهُ الْقِبْطُ لَا قَوْمُهُ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ اَىْ كَذَّبَ هٰؤُلَاءِ رُسُلَهُمْ فَلَكَ اُسْوَةٌ بِهِمْ فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِقَابِ لَهُمْ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ بِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ . اَىْ اِنْكَارِىْ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ بِاِهْلَاكِهِمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَىْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ .

৪৪. এবং মাদইয়ানবাসীরা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়। আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-কেও। তাঁকে অস্বীকার করেছিল কিবতীরা। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলরা নয়। অর্থাৎ এরা নিজেদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুতরাং তাদের সাথে আপনার জন্য নমুনা রয়েছে। আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছি। তাদের জন্য শাস্তি বিলম্ব করে তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম শাস্তি দ্বারা। অতএব, কেমন ছিল শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে ধ্বংসের ব্যাপারে আমার পাকাড়াও বা শস্তি প্রদান। এখানে اِسْتِفْهَام টি تَقْرِيْر -এর জন্য হয়েছে অর্থাৎ তা যথার্থ বাস্তবায়ন হয়েছে।

অনুবাদ :

٤٥. فَكَأَيِّنْ اَىْ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْتُهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ اَىْ اَهْلُهَا بِكُفْرِهِمْ فَهِىَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا سُقُوْفِهَا وَ كَمْ مِنْ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ مَتْرُوْكَةٍ بِمَوْتِ اَهْلِهَا وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ـ رَفِيْعٍ خَالٍ بِمَوْتِ اَهْلِهِ ـ

৪৫. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এক কেরাতে اَهْلَكْنَاهَا রয়েছে। যেগুলোর অধিবাসী ছিল জালিম অর্থাৎ তার বাসিন্দারা কুফরির কারণে। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল তাদের অধিবাসীদের মৃত্যুর কারণে। ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। উচ্চ প্রাসাদ। তার অধিবাসীদের মৃত্যুর ফলে।

٤٦. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ مَا نَزَلَ بِالْمُكَذِّبِيْنَ قَبْلَهُمْ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج اَخْبَارَهُمْ بِالْاِهْلَاكِ وَخَرَابِ الدِّيَارِ فَيَعْتَبِرُوْا فَاِنَّهَا اَىِ الْقِصَّةُ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ـ تَاكِيْدٌ ـ

৪৬. তারা কি ভ্রমণ করেনি অর্থাৎ মক্কার কাফেররা পৃথিবীতে, তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের অধিকারী। যার দ্বারা তাদের পূর্বে অস্বীকারকারীদের উপর কি আপতিত হয়েছে তা বুঝতে পারত। অথবা শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারত যা দ্বারা তারা শুনত তাদের ধ্বংস ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হওয়ার কাহিনী, ফলে তারা উপদেশ গ্রহণ করত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। এটা قُلُوْبُ-এর তাকীদ।

٤٧. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ بِاِنْزَالِ الْعَذَابِ فَاَنْجَزَهٗ يَوْمَ بَدْرٍ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ مِنْ اَيَّامِ الْاٰخِرَةِ بِسَبَبِ الْعَذَابِ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الدُّنْيَا ـ

৪৭. তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না। শাস্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে। তিনি তা বদরের ময়দানে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট একদিন অর্থাৎ পরকালের শাস্তির একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান تَعُدُّوْنَ শব্দটি تَاد এবং يَا উভয়ভাবেই পঠিত। পৃথিবীতে।

٤٨. وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا اَلْمُرَادُ اَهْلُهَا وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ اَلْمَرْجِعُ

৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল জালিম, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ : এখানে مَاذُوْن فِيْه তথা যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ يُقَاتِلُوْا বলে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর يُقَاتَلُوْنَ শব্দটি তার আলামত বহন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সত্তরের অধিক আয়াতে জিহাদ না করে বরং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দানের পর এটাই সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যাতে জিহাদের অনুমতি দান করা হয়েছে। এ দিনটি যেন সাহাবায়ে কেরামের জন্য ঈদের দিন ছিল। এক কেরাতে يُقَاتِلُوْنَ শব্দটি مَا يُسَمَّ فَاعِلُهُ / مَعْرُوْف তথা কর্তৃবাচ্য পঠিত হয়েছে। জিহাদের পূর্বেই মুমিনদেরকে মুকাতিল বা মুজাহিদ বলা হয়েছে হয়তো مَا يَئُوْلُ তথা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করে কিংবা তাঁরা জিহাদের যে সংকল্প করেছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا : এর মধ্যকার بَاء বর্ণটি سَبَبِيَّة তথা কারণজ্ঞাপক। যেন এর দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, মু'মিনদেরকে জিহাদের অনুমতি দানের কারণ হলো তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করা । ইমাম রাযী (র.) বলেন- اَنْ يُقَاتِلُوْا -এর উদ্দেশ্য হলো اَنْ يُقَاتِلُوْا فِى الْمُسْتَقْبِلِ অর্থাৎ ভবিষ্যতে জিহাদ করা। এ সময় এ প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে যাবে যে, এ সূরাটি হলো মক্কী, আর জিহাদের অনুমতি লাভ হয়েছে মদীনায়। সুতরাং তা কিভাবে হলো? وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ এ বাক্যটি مُسْتَانِفَة এ আয়াতে ইঙ্গিতস্বরূপ গায়েবী সাহায্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هُمُ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا : ব্যাখ্যাকার (র.) هُمْ মেনে ইশারা করেছেন যে, اِسْم مَوْصُوْل টি مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর সিফাত। এ ছাড়া আরো কতিপয় ই'রাবের ধরন হতে পারে। যথা-

১. প্রথম مَوْصُوْل -এর সিফাত বা বয়ান কিংবা বদল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَجْرُوْر হতে পারে।

২. اَعْنِىْ অথবা اَمْدَحُ ইত্যাদি কোনো একটি উহ্য ক্রিয়াসহ বাক্য হয়ে مَنْصُوْب -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا : ব্যাখ্যাকার (র.) مَا اُخْرِجُوْا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা হলো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ অর্থাৎ مَا اُخْرِجُوْا بِشَيْئٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللّٰهُ অর্থাৎ মক্কা থেকে মুমিনদেরকে বহিষ্কার করার কোনো কারণ ছিল না, যা তাদের বহিষ্কার করাকে অনিবার্য করে। কেবল এটাই তাদের দোষ ছিল যে, তারা বলতো আল্লাহ আমাদের রব। এ কারণটি বস্তুত দোষের কোনো বিষয়ই নয়; বরং এটা তাদের আরো উত্তমরূপে স্থিতি ও অবস্থানের কারণ। এ কথাটি مَدْحٌ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ তথা দূষণীয় আকারে প্রশংসা করার অন্তর্গত। অর্থাৎ যে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার কারণ সেটাই তাদের নিকট দোষের কারণ ছিল। যেমনটা কবি নাবিগা -এর কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে-

لَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

উর্দূতে এ ধরনের একটি ছন্দ রয়েছে- مجھ میں ایک عیب ہے * بڑا کہ وفادار ہوں میں

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا : এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ -ও হতে পারে। কেননা, اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا হলো مُسْتَثْنٰى আর এটা بِغَيْرِ حَقٍّ তথা مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর সমজাতীয় নয়। তবে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ মানা সঙ্গত নয়। কেননা যদি বলা হয় اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ তাহলে এটা ঠিক হয় না। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) আমিল বিলুপ্ত মেনে এটাকে। مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ বানিয়েছেন। অর্থাৎ مَا اُخْرِجُوْا بِشَيْئٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللّٰهُ আর اَنْ -এর সীগাটি مُضَارِعْ ماضى অর্থে। ব্যাখ্যাকার بِقَوْلِهِمْ দ্বারা اَنْ يَقُوْلُوْا -এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ مَصْدَرِيَّة আর اَنْ يَقُوْلُوْا শব্দটি قَوْل মাসদার অর্থে بِقَوْلِهِمْ -এর بَاء হলো সববিয়া।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ : এখানে لَوْلَا হলো اِمْتِنَاعِيَّة আর لَهُدِّمَتْ হলো لَوْلَا -এর জবাব। دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ মুবতাদা, আর مَوْجُوْدٌ উহ্য, এটা হলো খবর دَفْعُ اللّٰهِ -এর মধ্যে فَاعِلْ -এর প্রতি মাসদারের ইযাফত ঘটেছে। অর্থাৎ বাক্যটি ছিল- لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مَوْجُوْدٌ لَهُدِّمَتْ

قَوْلُهُ صَوَامِعُ : صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো গীর্জা, যেখানে পাদ্রীগণ নির্জনে বসে ইবাদত ও সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। আর بِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ -এর বহুবচন, খ্রিস্টানরা যেখানে সমবেত আকারে উপাসনা করে। صَلَوٰتٌ শব্দটি صَلٰوةٌ -এর বহুবচন। ইবরানী ভাষায় ইহুদীদের উপাসনালয়কে صَلَوٰتٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ : এর عَطْف হলো لَهُدِمَتْ -এর উপর।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ : পূর্বোল্লিখিত مَوْصُوْل -এর মধ্যে যে কয়টি সূরত বা বাক্যের ধরন উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও সেগুলো প্রযোজ্য। তবে আরো একটি পদ্ধতি এখানে বৈধ তা এই যে, مَنْ يَّنْصُرُهٗ থেকে বদল হবে। اِنْ مَّكَّنَّا هُمْ فِى الْاَرْضِ হলো শর্ত। আর اَقَامُوا الصَّلٰوةَ তার مَعْطُوْف সমূহ মিলে جَزَاء অতঃপর شَرْط جَزَاء মিলে صِلَة আর صِلَة . مَوْصُوْل মিলে উহ্য مُبْتَدَأ هُمْ -এর خَبَرْ , কেননা এ আয়াতে মুহাজিরদের সেসব গুণাবলির সংবাদ দেওয়া হয়েছে যেসব গুণাবলির অধিকারী হওয়ার দ্বারা তারা পৃথিবীর কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। الَّذِيْنَ -এর وَكُذِّبَ مُوْسٰى এখানে পূর্বের বিপরীতে বাক্যের ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে। তা এভাবে যে, مَعْرُوْف -এর সীগার পরিবর্তে مَجْهُوْل -এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর কওমের লোকেরা মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়নি; বরং ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিবতীরা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সকল নবীগণকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকেরাই মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল।

قَوْلُهُ فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ : এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে স্পষ্ট আকারে তাদের কুফরি প্রকাশ হয়ে যায়, অন্যথায় فَاَمْلَيْتُهُمْ -ও বলা যেত। نَكِيْر অর্থ– আজাব, এটা মাসদার, অস্বীকার করা অর্থে। যেমন نَذِيْر শব্দটি কখনো কখনো اِنْذَارْ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ : এটা হলো مَفْعُوْل আর بِاَهْلَاكِهِمْ এটা اِنْكَارِىْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সম্বোধিত লোকদেরকে আমার আজাব সময়মতো হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করা উচিত।

قَوْلُهُ فَكَاَيِّنْ : এর মধ্যে اَيِّنْ হলো كَمْ অর্থে, এটা مُبْتَدَأ আর مِنْ قَرْيَةٍ হলো تَمْيِيْز - اَهْلَكْتُهَا হলো তার খবর। كَاَيِّنْ মূলত كَاَيٍّ ছিল। কুরআনী লেখন পদ্ধতিতে তানভীনকে ن আকারে লেখা হয়েছে। كَاَيِّنْ সব সময় সংবাদমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। অস্পষ্ট আকারে এটা আধিক্য বুঝায়। অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য এরপরে تَمْيِيْز স্বরূপ অবশ্যই কোনো শব্দ উল্লিখিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টি مِنْ সহ আসে। যেমন– كَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ আর كَاَيِّنْ টা সব সময় বাক্যের শুরুতে আসে, আর তার خَبَرْ সর্বদা مُرَكَّبْ হয়। কখনো কখনো এটা জিজ্ঞাসার জন্যও আসে। অন্য এক কেরাতে اَهْلَكْتُهَا -এর স্থলে اَهْلَكْنَا এসেছে। আর كَاَيِّنْ শব্দটি স্থানগতভাবে مَنْصُوْب -ও হতে পারে। এ ব্যাপারে اَهْلَكْنَا তার প্রমাণ বহন করে। وَهِىَ ظَالِمَةٌ হলো حَالِيَة বাক্য। অর্থাৎ اَهْلُهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَمْ مِنْ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ : ব্যাখ্যাকার (র.) كَمْ বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِئْرٍ -এর عَطْف হলো قَرْيَةٍ -এর উপর। اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا -এর হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর فَا হলো عَاطِفَةْ বাক্যটি এরূপ ছিল اَغَفَلُوْا فَلَمْ يَسِيْرُوْا ; وَكَاَيِّنْ এখানে وَاوْ সহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পূর্বে فَا যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ পূর্বেরটিতে فَا আনাই উচিত ছিল। কেননা তার পূর্বে فَكَيْفَ كَانَ -এর মধ্যে فَا ছিল, আর এখানে وَاوْ আনাই যথার্থ। কেননা এর পূর্বে وَاوْ রয়েছে। যেমন– وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতো, অকথ্য নির্যাতন করতো, এমনকি তারা মুসলমানদেরকে মক্কা শরীফ থেকে বহিষ্কার করেছে। মুসলমানগণ কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মক্কা মোয়াজ্জামায় জিহাদের অনুমতি দেননি; বরং বিপদে ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার আদেশ দিতেন। এভাবে মুসলমানদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এমন একটি পবিত্র দল তৈরি হয়েছে, যারা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছেন, এদিকে কাফেরদের অত্যাচারও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে তিনি কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করার আর সুযোগ দিবেন না এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন দূরীভূত করবেন। আর এ অবস্থা শুধু জিহাদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا
অর্থাৎ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا : শানে নুযূল : আল্লামা সয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজের, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, যখন প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছিলেন, اَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ অর্থাৎ, এরা তাদের পয়গাম্বরকে বহিষ্কার করেছে এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। -[কুরতুবী]

হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম যে কাফেরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, সর্বপ্রথম জেহাদ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহেদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কয়েকজন মুমিন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মূলত তখনই কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সে সময়ই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াত হিজরতের পূর্বক্ষণে তথা মক্কার জীবনের শেষ দিকে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ : মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোনো দিন যেত না যে, কোনো-না কোনো মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ জবাবে বলতেন, সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। -[কুরতুবী]

যখন রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্যগুলো উচ্চারিত হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ : জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গাম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

قَوْلُهُ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوَاتٌ وَّمَسَاجِدُ : বিগত জমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা স্ব স্ব জমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরজ ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোনো সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন– অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোনো সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ-এর বহুবচন। এটা খ্রিস্টানদের সংসারত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ-এর বহুবচন। খ্রিস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بِيْعَة বলা হয়। صَلَوٰتٌ শব্দটি صَلٰوةٌ-এর বহুবচন। ইহুদিদের ইবাদতখানাকে صَلَوٰتٌ এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে صَلَوٰتٌ, হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ এবং শেষ নবী ﷺ-এর জমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ : খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ : এই আয়াতে তাদের বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গণী (রা.) বলেন ثَنَاءٌ قَبْلَ بَلَاءٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটি কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসাকীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করছে। চারজন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন।

তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, জাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এই কারণেই আলেমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল। –[রূহুল মা'আনী]

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহহাক (র.) বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আঞ্জাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের জমানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য : اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ

এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা

শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশে দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়। –[রূহুল মা'আনী]

এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

قَوْلُهُ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফের মুশরিকরা হলো মনের অন্ধ, তাদের অন্তর্দৃষ্টি বলতে কিছুই নেই, তারা পরিণামদর্শী নয়। আর আলোচ্য আয়াতে এ কথারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের আজাবকে তরান্বিত করার জন্যে তথা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি করছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ الخ : শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেসের সম্পর্কে। সে দোয়া করেছিলো, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা যদি তোমার তরফ থেকে সত্য হয়, আর তিনি যদি সত্যবাদী হন [যা আমরা অস্বীকার করি] তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

অর্থাৎ আর কাফেররা আপনার নিকট আজাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে, অথচ ঐ আজাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কি মনে করে তাদের উপর থেকে আজাব চলে যাবে? অথবা তারা কি এই ধারণা করে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং যে ওয়াদা করেছেন তার বরখেলাফ করবেন? এমনটি কখনও হবে না, আজাব অবশ্যই আসবে। আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা কখনও বরখেলাফ করেন না। তিনি আজাব সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

قَوْلُهُ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ : পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য : অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি। আরো বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[মাযহারী]

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা মা'আরিজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ এতেও উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জবাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

অনুবাদ :

٤٩. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ . بَيِّنُ الْاِنْذَارِ وَاَنَا بَشِيْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

৪৯. বলুন, হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসী আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী সুস্পষ্টরূপে সাবধানকারী। আমি মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী।

٥٠. فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنَ الذُّنُوْبِ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ .

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা গুনাহ থেকে ও সম্মানজনক জীবিকা আর তা হলো জান্নাত।

٥١. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْٓ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِاِبْطَالِهَا مُعَجِّزِيْنَ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِىَّ اَىْ يَنْسِبُوْنَهُمْ اِلَى الْعِجْزِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ اَوْ مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا عَنْهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ مُعٰجِزِيْنَ مُسَابِقِيْنَ لَنَا يَظُنُّوْنَ اَنْ يَفُوْتُوْنَا بِاِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ وَالْعِقَابَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ . النَّارِ .

৫১. যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতকে কুরআনকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যর্থ করার যারা মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদেরকে ব্যর্থতার প্রতি সম্বন্ধ করে এবং তাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অথবা আমাকে তাদের পাকড়াও-এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। مُعَجِّزِيْنَ শব্দটি অপর এক কেরাতে مُعٰجِزِيْنَ রয়েছে, যার অর্থ হলো مُسَابِقِيْنَ তথা আমাদের উপর বিজয় লাভকারী। তারা মনে করে যে, পুনরুত্থান ও শাস্তিকে তার অস্বীকার করে পার পেয়ে যাবে। তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী আগুনের অধিবাসী।

٥٢. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ هُوَ نَبِىٌّ اُمِرَ بِالتَّبْلِيْغِ وَّلَا نَبِىٍّ اَىْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيْغِ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى قَرَاَ اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ج قِرَاءَتِهٖ مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِمَّا يَرْضَاهُ الْمُرْسَلُ اِلَيْهِمْ . وَقَدْ قَرَاَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُوْرَةِ النَّجْمِ بِمَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى بِاِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ . "تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى" . فَفَرِحُوْا بِذٰلِكَ .

৫২. আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল তিনি হলেন এমন নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিংবা নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে পড়েছে/ পড়তে চেয়েছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তার পাঠে যা কুরআন নয় এমন কিছু। যাতে যাদের নিকট তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা আনন্দিত হয়। একদা রাসূল ﷺ কুরাইশদের কোনো এক মজলিসে সূরা নাজমের এ আয়াত- اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى পাঠ করার পর শয়তানের প্রক্ষেপণে পবিত্র রসনা থেকে একথা বেরিয়ে পড়ে যে- تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى [এ সকল উচ্চ মর্যাদাবান দেবতা অবশ্যই এদের সুপারিশের আশা করা যায়।] এতদ শ্রবণে কাফেররা খুবই আনন্দিত হয়।

ثُمَّ اَخْبَرَهُ جِبْرَئِيْلُ بِمَا اَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلٰى لِسَانِهٖ مِنْ ذٰلِكَ فَحَزِنَ فَسُلِّىَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لِيَطْمَئِنَّ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ يُبْطِلُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط يُثْبِتُهَا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْقَاءِ الشَّيْطَانِ مَا ذُكِرَ حَكِيْمٌ ـ فِىْ تَمْكِيْنِهٖ مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ـ

অনুবাদ :

অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) তাঁকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে, শয়তান আপনার অজান্তে মুখে একথা উচ্চারিত করে দিয়েছে। ফলে তিনি খবুই বিষণ্ন হলেন। তখন তাঁকে পরবর্তী এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করা হয়।, যেন তিনি শান্ত হন। আল্লাহ তা বিদূরিত করেন রহিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুদৃঢ় করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে যা উল্লেখ করা হলো। প্রজ্ঞাময় নিজের পক্ষ থেকে শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

٥٣. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً مِحْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ شَكٌّ وَنِفَاقٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ اَىِ الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ قَبُوْلِ الْحَقِّ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ـ خِلَافٍ طَوِيْلٍ مَعَ النَّبِىِّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ جَرٰى عَلٰى لِسَانِهٖ ذِكْرُ اٰلِهَتِهِمْ بِمَا يُرْضِيْهِمْ ثُمَّ اَبْطَلَ ذٰلِكَ ـ

৫৩. এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে নেফাক ও সংশয় যারা পাষাণ হৃদয় অর্থাৎ, মুশরিকরা সত্য গ্রহণ করা থেকে। নিশ্চয় জালিমরা কাফেররা দুস্তর মতভেদের মাঝে রয়েছে নবী ও মুমিনগণের সাথে মতভেদ রয়েছে, তাঁর পবিত্র মুখে কাফেরদের দেবতাদের পূর্বোক্ত কথা উচ্চারণের কারণে। যা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। অতঃপর তা বাতিল ও রহিত করেছেন।

٥٤. وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ التَّوْحِيْدَ وَالْقُرْاٰنَ اَنَّهُ اَىِ الْقُرْاٰنُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ تَطْمَئِنَّ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ اَىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

৫৪. এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে তাওহীদ ও কুরআন সংক্রান্ত যে, তা অর্থাৎ কুরআন আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। প্রশান্তি লাভ করে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সরল পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর।

٥٥. وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْهُ اَىِ الْقُرْاٰنِ بِمَا اَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَبْطَلَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَىْ سَاعَةُ مَوْتِهِمْ اَوِ الْقِيٰمَةُ فُجَاءَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ـ هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ لَا خَيْرَ فِيْهِ لِلْكُفَّارِ كَالرِّيْحِ الْعَقِيْمِ الَّتِىْ لَا تَاْتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَا لَيْلَ لَهٗ ـ

৫৫. যারা কুফরি করেছে তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবে না অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে। নবী করীম ﷺ -এর পবিত্র মুখে শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করেছিল। অতঃপর তিনি তা রহিত করেছেন। যতক্ষণ না তাদের নিকট আকস্মিকভাবে নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর সময় অথবা আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে। অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। তা হলো বদরের দিন, তাতে কাফেরদের জন্য কোনোই কল্যাণ থাকবে না। যেমন বন্ধ্যা বায়ু বা অকল্যাণকর বায়ু যা কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। অথবা তা হলো কিয়ামতের দিন যাতে রাতের কোনোই অস্তিত্ব থাকবে না।

অনুবাদ :

٥٦. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِّلّٰهِ ط وَحْدَهُ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْاِسْتِقْرَارِ نَاصِبٌ لِلظَّرْفِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ بِمَا بُيِّنَ بَعْدَهُ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ ـ

৫৬. সেদিনের কিয়ামতের দিনের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যই এ বাক্যটি যে اِسْتِقْرَار -এর অর্থ বিশিষ্ট, সেটিই يَوْمَئِذٍ -এর نَصْب দানকারী। তিনিই তাদের বিচার করবেন মুমিন ও কাফেদের মাঝে, পরে যা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখ-কাননে। আল্লাহর অনুগ্রহে।

٥٧. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ شَدِيْدٌ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ ـ

৫৭. আর যারা কুফরি করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কঠিন শাস্তি, তাদের কুফরির কারণে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِاِبْطَالِهَا : এটা বৃদ্ধি করে مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, মূলত سَعَوْا فِىْ اِبْطَالِ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِىَّ ছিল بِاِبْطَالِهَا اٰيٰتِنَا -এর মধ্যে بَا অর্থ فِىْ আর مُعٰجِزِيْنَ হলো سَعَوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ এবং হলো مُعٰجِزِيْنَ -এর مَفْعُوْل অথবা এর مَفْعُوْل হলো اَللّٰهُ , উদ্দেশ্য এই যে, আমার আয়াতসমূহকে বাতিল করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার পাকড়াও -এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। অন্য এক কেরাতে مُعَاجِزِيْنَ এসেছে। এর অর্থ হলো سَابِقِيْنَ তারা ধারণা করে, যে, তারা আমার পাকড়াও থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আর مُسَابَقَتْ -এর উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আল্লাহর আজাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আজাব নাজিল করা এবং তাদের পলায়ন করতে না দেওয়ায় প্রতিযোগিতা করেন।

قَوْلُهُ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ : وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ -এর পরে এটা রাসূল ﷺ কে দ্বিতীয় সান্ত্বনা। مِنْ قَبْلِكَ -এর মধ্যে مِنْ اِبْتِدَاء غَايَتْ তথা সীমারেখার শুরু বুঝানোর জন্য। আর مِنْ رَّسُوْلٍ -এর মধ্যকার مِنْ হল অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ : اِذَا تَمَنّٰى হলো শর্ত। আর جَزَاء হলো اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ শর্তিয়া বাক্য হয়ে نَبِىٍّ থেকে حَالٌ হয়েছে। বাক্যটি এরূপ ছিল- وَمَا اَرْسَلْنَا نَبِيًّا اِلَّا حَالُهٗ هٰذِهٖ ; এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْبٌ হতে পারে।

قَوْلُهُ اَلْغَرَانِيْقُ : এর একবচন হলো غِرْنَوْقٌ এটা فِرْدَوْسٌ -এর ছন্দে। কেউ কেউ عُصْفُوْرٌ -এর ছন্দে غُرْنُوْقٌ বলেছেন। এর অর্থ হলো পাতি হাঁস। فَيَنْسَخُ اللّٰهُ এখানে نَسْخ দ্বারা শাব্দিক নস্‌খ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, এর অর্থ হলো দূরীভূত করা, মুছে ফেলা।

قَوْلُهُ لِيَجْعَلَ : এর ل -এর মধ্যে এটা স্পষ্ট যে, এটা يُحْكِمُ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِيَجْعَلَ আর وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ হলো جُمْلَة مُعْتَرِضَة আবার لِيَجْعَلَ ফে'লটি يَنْسَخُ -এর সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْقَاسِيَةِ : অর্থ কঠিন হৃদয়, এর ال টি مَوْصُوْل , এর عَطْف হলো اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ -এর উপর।

قَوْلُهُ وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ : এখানে অতিরিক্ত জঘন্যতা বুঝানোর জন্য ضَمِيْر -এর স্থলে প্রকাশ্য اِسْم আনা হয়েছে। মূলত اِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ-এর আমিলে নাসিব হলো اِسْتَقَرَّ অথবা এর সমার্থবোধক কোনো উহ্য ক্রিয়া।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَة এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, مَاذَا يَصْنَعُ بِهِمْ এর উত্তরে বলা হয়েছে- يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ; এটা আবার جُمْلَه حَالِيَه -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ بِمَا بَيَّنَ بَعْدَهُ : অর্থাৎ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ : হলো مُبْتَدَأ আর فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ হলো خَبَرْ এভাবে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا হলো مُبْتَدَأ আর فَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ বাক্য হয়ে خَبَرْ , প্রথম খবরের উপর فَاء উল্লেখ না করা এবং পরবর্তী খবরের উপর তা উল্লেখ করা এ কথা বুঝানোর জন্য যে, বেহেশতে প্রবেশ আমলের কারণে হবে না; বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কারণে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু দোজখের আজাব এর বিপরীত। তা কেবল আমলের উপরই নির্ভর করে হবে। এ কারণে فَاُولٰئِكَ -এর উপর فَا جَزَائِيَّة প্রবিষ্ট হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ : হে মুহাম্মদ! আপনি আজাব কামনায় যারা তাড়াহুড়া করেছে তাদেরকে বলে দিন, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী এবং সুসংবাদ দানকারী। আজাব ত্বরান্বিত করার কিংবা বিলম্বিত করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ : আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি সম্পষ্ট ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ, আজাব দেওয়া না দেওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ব্যাপার। এ সম্পর্কে তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অকৃতজ্ঞ হয় এবং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য বা নাফরমান হয়, যারা নিজেদের অন্যায় অনাচারের মাধ্যমে এই সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করে তোলে- তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ পাকই করেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের ভক্ত অনুরক্ত বান্দা, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে জীবন যাপন করেন- তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন এবং বেহেশতের অনন্ত অসীম নিয়ামত তারা লাভ করবেন, শুধু তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ অতএব, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে তার পূর্বের কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। -[মুসলিম শরীফ]

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন, আমিতো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, তোমাদের হিসাব লওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়, কার কিসমতে হেদায়েত রয়েছে, আর কার অদৃষ্টে আজাব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই জানেন। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দিয়েছেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর দু'টি দায়িত্ব কাফেরকে ভয় প্রদর্শন করা এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করা। তাই মুমিনদের জন্য এ আয়াতে দু'টি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ১. যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদেরকে মাগফেরাত দান করা হবে এবং উত্তম ও সম্মানজনক রিজিক দান করা হবে, যা হবে স্থায়ী এবং যেহেতু সেখানে রোজগার করার কোনো প্রয়োজন হবে না, তাই এই রিজিক হবে অত্যন্ত সম্মানজনক।

قَوْلُهُ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ : এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয়; বরং দুটি পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে তাঁকে

কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হোক বা কোনো পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তাফা ﷺ -প্রমুখ আর যাঁকে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত হারূন (আ.)। তিনি মূসা (আ.)-এর কিতাব তাওরাত ও তাঁরই শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। অতএব 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরি কিন্তু যিনি নবী হবেন ,তাঁর রাসূল হওয়া জরুরি নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থি নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ : এখানে تَمَنّٰى শব্দটি قَرَاَ অর্থে, আর اُمْنِيَّةٌ অর্থ হলো পাঠ করা, বা قِرَاءَتٌ আবু হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীত গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু আলেম এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে এখানে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, যা غَرَانِيْقُ -এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট এ ঘটনা ঠিক নয়। কেউ কেউ এটাকে মওজু বলেছেন এবং নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আবিস্কৃত আখ্যা দিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তি এ ঘটনাকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন বা ধর্তব্য করেছেন, সে ক্ষেত্রে এর জাহেরী শব্দ দ্বারা যে সকল সন্দেহ কুরআন এবং হাদীসের অকাট্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেগুলোর বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এ ঘটনার উপর সীমাবদ্ধ নয়।

মুফাসসিরগণের একটি জামাত এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে গারানিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উক্ত ঘটনার সারাংশ এই যে, একদিন নবী করীম ﷺ মক্কার মুশরিকদের এক মজলিসে গমন করেছিলেন। তার উপর সে সময় সূরা নাজম অবতীর্ণ হলো। তিনি সূরা নাজম পড়তে শুরু করলেন, যখন তিনি اَفَرَاَيْتُمْ পর্যন্ত পড়ছিলেন তখন শয়তানের প্রভাবে তার জবান মোবারক দ্বারা تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى বের হয়ে গেল। কুরাইশরা এ শব্দগুলো শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। নবী করীম তাঁর পাঠ বহাল রেখেছিলেন, এক পর্যায়ে সূরা শেষ করলেন। সর্বশেষ যখন তিনি সিজদা করলেন তখন মজলিসে উপস্থিত সবাই সিজদা করল। এ ঘটনার পরে মুশরিকরা আনন্দের সাথে নিজ গন্তব্যে চলে গেল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ আজ আমাদের দেবতাদের প্রশংসা করেছে। এরপরে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেছেন, আপনি তো তাদের নিকট এমন কথা শুনিয়েছেন যা আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনিনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ঘটনার অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আয়াতের সারাংশ হচ্ছে– এমন ঘটনা শুধু আপনার বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে– তা নয়; বরং প্রত্যেক রাসূল ও নবীর বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে। অতএব, চিন্তিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি আদৌ ঠিক নয়; বরং আল্লাহর কিতাব দ্বারা এটা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ এবং وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ইমাম বায়হাকী (র.) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, বর্ণনাসূত্রে এ ঘটনা মোটেই স্বীকৃত নয়। ইমাম ইবনে খুযাইমা (র.) বলেন– اِنَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ অর্থাৎ, এ কাহিনীটি কোনো নাস্তিকের উদ্ভাবিত। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার গারনিক -এর কাহিনীর সাথে হাবশা তথা আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণের ফিরে আসার কাহিনীকেও জুড়ে দিয়েছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সূরা নাজমে আসবে। মূলত এখানে تَمَنّٰى -এর অর্থ হলো قَرَاَ বা পাঠ করা। আর اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِىْ تِلَاوَتِهٖ وَقِرَاءَتِهٖ অর্থাৎ তার তেলাওয়াত ও পাঠের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করা। ইবনে জারীর (র.) বলেন, এ উক্তিটি কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতের সারমর্ম এই যে, শয়তান মুশরিকদের কানে নবী করীম ﷺ -এর জবান মোবারকে উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়া ছাড়াই নিজেই শব্দগুলো প্রবেশ করালো। –[ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ তা'আলা শয়তানের ইলকাকৃত শব্দগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং নিজ আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দিলেন।

٥٨. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ طَاعَتِهٖ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قُتِلُوْاۤ اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا هُوَ رِزْقُ الْجَنَّةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ اَفْضَلُ الْمُعْطِيْنَ ـ

٥٩. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَىْ اِدْخَالًا اَوْ مَوْضِعًا يَّرْضَوْنَهٗ ط وَهُوَ الْجَنَّةُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ بِنِيَّاتِهِمْ حَلِيْمٌ ـ عَنْ عِقَابِهِمْ ـ

٦٠. اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ ط الَّذِىْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَنْ عَاقَبَ جَازٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ظُلْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَىْ قَاتَلَهُمْ كَمَا قَاتَلُوْهُ فِى الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ اَىْ ظُلِمَ بِاِخْرَاجِهٖ مِنْ مَنْزِلِهٖ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ غَفُوْرٌ ـ لَهُمْ عَنْ قِتَالِهِمْ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ـ

٦١. ذٰلِكَ النَّصْرُ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ اَىْ يُدْخِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فِى الْاٰخَرِ بِاَنْ يَزِيْدَ بِهٖ وَذٰلِكَ مِنْ اَثَرِ قُدْرَتِهِ الَّتِىْ بِهَا النَّصْرُ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَصِيْرٌ ـ بِهِمْ حَيْثُ جَعَلَ فِيْهِمُ الْاِيْمَانَ فَاَجَابَ دُعَاءَهُمْ ـ

অনুবাদ :

৫৮. এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য মক্কা থেকে মদীনায় অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন আর তা হলো জান্নাতের রিজিক। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিজিকদাতা দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন। مُّدْخَلًا শব্দটি مِيْم বর্ণে পেশও যবর উভয় হরকতই হতে পারে অর্থাৎ মাসদার বা اِسْم ظَرْف হবে। যা তারা পছন্দ করবে। আর তা হলো জান্নাত। এবং আল্লাহ তা'আলা সম্যক প্রজ্ঞাময় তাদের নিয়ত সম্পর্কে পরম সহনশীল তাদের শাস্তির ব্যাপারে।

৬০. বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। কোনো ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে মুমিনদের থেকে নিপীড়িত হয়ে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে মুশরিকদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় যেমনিভাবে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে মুহাররম মাসে। ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে তাদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের ঘর বাড়ি হতে তাদেরকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কার করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী। মুমিনদের থেকে। ক্ষমাশীল তাদের জন্য নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

৬১. এটা এ জন্য যে, সাহায্য আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করান, এভাবে যে, এর দ্বারা তার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটান। এটা তাঁর কুদরতের নিদর্শন যার দ্বারা তার সাহায্য লাভ হয়। এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা মুমিনের দোয়াকে। সম্যক দ্রষ্টা তাদের ব্যাপারে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঈমান দান করেছেন। তাই তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন।

অনুবাদ :

٦٢. ذٰلِكَ النَّصْرُ اَيْضًا بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهٖ وَهُوَ الْاَصْنَامُ هُوَ الْبَاطِلُ الزَّائِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ اَيِ الْعَالِيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهٖ الْكَبِيْرُ . الَّذِيْ يُصَغِّرُ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ .

৬২. এটা সাহায্য ও এজন্য যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আর তারা যাকে ডাকে تَدْعُوْنَ শব্দটি يَاء দ্বারা এবং تَاء দ্বারা উভয়রূপেই পঠিত। অর্থ– উপাসনা করে তার পরিবর্তে আর তা হলো মূর্তি তা তো অসত্য ধ্বংসশীল। এবং আল্লাহ তিনিই তো সমুচ্চ অর্থাৎ স্বীয় কুদরতে তিনি সকল বস্তুর উর্ধ্বে মহান তাঁকে ছাড়া সকল বস্তুকে হেয় করে দেয়।

٦٣. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ط بِالنَّبَاتِ وَهٰذَا مِنْ اَثَرِ قُدْرَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ فِيْ اِخْرَاجِ النَّبَاتِ بِالْمَاءِ خَبِيْرٌ . بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ عِنْدَ تَاخِيْرِ الْمَطَرِ .

৬৩. আপনি কি লক্ষ্য করেন না জানেন না। আল্লাহ আকাশ হতে বারি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী উদ্ভিদের মাধ্যমে। আর এটা তাঁরই কুদরতের নিদর্শন। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী পানির দ্বারা উদ্ভিদ উৎপাদনে। পরিজ্ঞাত যে বিষয়ের উদ্ভব ঘটে তাদের হৃদয়ে বৃষ্টি বিলম্বের সময়।

٦٤. لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط عَلٰى جِهَةِ الْمِلْكِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ عِبَادِهٖ الْحَمِيْدُ . لِاَوْلِيَائِهٖ .

৬৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। মালিকানার দৃষ্টিকোণ হতে। এবং আল্লাহ, তিনিই তো অভাবমুক্ত তাঁর বান্দাদের থেকে প্রশংসার্হ তাঁর বন্ধুদের নিকট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا : এটা হলো মুবতাদা, আর لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ হলো এর খবর। وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا বাক্যটি যদিও اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর মধ্যে দাখিল রয়েছে, তবে তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে বিশেষভাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা যেন تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ তথা ব্যাপক শব্দের পরে খাস শব্দের অন্তর্গত। لَيَرْزُقَنَّهُمْ এটা বিলুপ্ত কসমের জবাব। অর্থাৎ وَاللّٰهُ لَيَرْزُقَنَّهُمْ ছিল قَسَم ও جَوَاب قَسَم মিলে বাক্য হয়ে وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا-এর خَبَرْ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, جُمْلَه خَبَرْ টা قَسَمِيَّه হতে পারে। لَيَرْزُقَنَّهُمْ বাক্যটি رِزْقًا حَسَنًا-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل এবং لَيَرْزُقَنَّهُمْ-এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ -ও হতে পারে। এ সময় এটা তাকিদের জন্য হবে।

قَوْلُهٗ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ : এর পরে اَفْضَلُ الْمُعْطِيْنَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَيْرُ اِسْم تَفْضِيْل শব্দটি তার মূল অর্থে রয়েছে। কুরআনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে اِسْم تَفْضِيْل-এর সীগাহ اِسْم فَاعِلْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এখানে تَفْضِيل -ই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন রিজিক খাস যার প্রদানে অন্য কেউ সক্ষম নয়। আর রিজিকের মধ্যে এটাই আসল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহ থেকে যে রিজিক লাভ হয় তা আল্লাহই দান করেন। কেননা আল্লাহর রিজিকের ভাণ্ডার থেকেই তা প্রদত্ত হয়। তৃতীয়ত গায়রুল্লাহ যে রিজিক দেয় তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বিনিময় কামনা করা, কমপক্ষে পরকালের প্রতিদানই হোক না কেন, আর আল্লাহ তা'আলা যে রিজিক দান করেন, তা নিছক অনুগ্রহস্বরূপ। এর কোনো বিনিময় তার লাভ হয় না।

قَوْلُهُ لَيُدْخِلَنَّهُمْ : এটা لَيَرْزُقَنَّهُمْ থেকে বদলও হতে পারে এবং مُسْتَانِفَةٌ বাক্যেও হতে পারে।

قَوْلُهُ مُدْخَلًا : এটা بَابُ اِفْعَالٌ -এর মাসদার। অর্থাৎ اِدْخَالًا وَمُدْخَلًا এসময় এটা لَيُدْخِلَنَّهُمْ -এর مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ হবে। আর তার مَفْعُولٌ بِهٖ বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ لَيُدْخِلَنَّهُمُ الْجَنَّةَ اِدْخَالًا يَرْضَوْنَهٗ আর মীম বর্ণে যবর পড়লে এটা اِسْم ظَرْفٌ مَكَانٌ হবে। অর্থাৎ مَوْضَعُ دُخُوْلٌ অর্থ হবে। এ সময় مَدْخَلًا শব্দটিই لَيُدْخِلَنَّهُمْ -এর مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হবে। অর্থাৎ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَكَانًا يَرْضَوْنَهٗ হবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা উহ্য مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ অর্থাৎ اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ কাফের মুমিনদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে তা নিজ নিজ জায়গায় সঠিক এবং সত্য। যখন এক বাক্য থেকে অপর বাক্যের দিকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য হয় তখন اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَاقَبَ : এটা تَعَاقُبٌ থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো এক বস্তুর পরে অপর বস্তু আসা। অর্থাৎ অতিক্রম করা।

قَوْلُهُ اَىْ قَاتَلَهُمْ كَمَا قَاتَلُوْهُ فِى الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ : মুফাসসির (র.)-এর এ কথার মধ্যে শানে নুযূল -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মুকাতিল (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি মক্কার সেসব মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের এক জামাআতের সাথে যাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। অথচ তখনো মুহাররম মাস শেষ হয়নি; বরং আরো দু'দিন বাকি ছিল। মুশরিকরা এ ধারণা করেছিল যে, মুহাম্মদের সাথীরা মুহাররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে অন্যায় জানে এ মনে করে তারা তাদের উপর আক্রমণ করে বসল। মুসলমানরা মুহাররম মাসে তাদের উপর আক্রমণ না করার ব্যাপারে তাদের কসম দিয়েছিল; কিন্তু তারা তা শুনেনি। বাধ্য হয়ে মুসলমানরাও তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে তাদের মনে এক প্রকার অনুশোচনা ও অনুতাপ এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মনের এ সংশয় ও সংকোচ দূরীভূত করার জন্য উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়াকে عَاقَبٌ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এটা مَجَازٌ তথা রূপকার্থে বাহ্যিক মিলের কারণে বলা হয়েছে। যেমন– جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মধ্যে বলা হয়েছে। অথবা এটা تَسْمِيَةُ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ -এর অন্তর্গত। অর্থাৎ মুশরিকদের নিজেদের জুলুমই তাদের থেকে এ প্রতিশোধ গ্রহণের কারণ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَاقَبَ : এটা হলো مُبْتَدَأٌ আর لَيَنْصُرَنَّهٗ হলো خَبَرٌ আর এটা ঐ সময় হবে যখন مَنْ مَوْصُوْلَةٌ হবে। আর এটাও হতে পারে যে, مَنْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর لَيَنْصُرَنَّهٗ হলো তার جَزَاءٌ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ النَّصْرُ : এটা مُبْتَدَأٌ আর بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ হলো এর خَبَرٌ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ مِنْ اَثَرِ قُدْرَتِهٖ : অর্থাৎ রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করা এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিদর্শন। কারণ ক্ষমতা ব্যতিরেকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

قَوْلُهُ فَتُصْبِحُ : مَرْفُوْعٌ রূপে পঠিত। আর عَطْف হলো اَنْزَلَ -এর উপর। এ সময় بِهٖ যমীর বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ فَتُصْبِحُ بِهٖ আবার فَاءٌ টা سَبَبِيَّةٌ -ও হতে পারে। এ সময় যমীর বা عَائِدٌ -এর দরকার নেই।

প্রশ্ন : فَتُصْبِحُ হলো جَوَابُ اَمْرٍ , কাজেই শব্দটি مَنْصُوْبٌ না হয়ে مَرْفُوْعٌ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : এ اِسْتِفْهَامْ تَقْرِيْرِىْ টি খবর অর্থে। অর্থাৎ, اَلَمْ تَرَ হলো قَدْ رَاَيْتَ অর্থে। আর যে اِسْتِفْهَامْ টি খবর অর্থে হয়, তা جَوَابُ اَمْرٍ হয় না।

এখন এ প্রশ্ন থেকে গেল যে, مَاضِى -এর স্থলে مُضَارِعٌ -এর সীগাহ ব্যবহারের কারণ কি?

এর উত্তর এই যে, مُضَارِعٌ -এর সীগাহ বৃষ্টি এর আছর বহাল থাকা বুঝায়, আর এটা পছন্দনীয় বিষয়। আর مَاضِى -এর সীগাহ এরূপ বুঝায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ নেককার মুমিনদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা ইসলামের জন্যে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর, ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-খেশ সবকিছু ছেড়ে হিজরত করেছেন এবং যারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করেছেন– এমন মুহাজির ও মুজাহিদদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুহাজিরগণকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : অর্থাৎ, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর ছেড়েছে, হিজরত করেছে তাদের এই অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তারা কাফেরদের সাথে জিহাদ করে শাহাদত বরণ করুক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে রয়েছে তাদের জন্যে অশেষ নিয়ামত। তিনি তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করবেন তথা জান্নাতের রিজিক দান করবেন। আর তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছে দেবেন, যা তারা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করে। কেননা বেহেশতে রয়েছে অনন্ত অসীম নিয়ামত আর সে নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী, যার কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।

قَوْلُهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ : নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি তাঁর মুহাজির বান্দাদের এবং তাদের দুশমনদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। মুহাজির ও মুজাহিদীনের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি অবশ্যই তা ক্ষমা করবেন একথা সত্য। যদি কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনা প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত-উৎপীড়িত হওয়ার কারণে জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এরপরও যদি জালেম পুনরায় জুলুম করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মজলুমকে সাহায্য করেন। আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে মজলুম ধন্য হয়। এজন্যে হাদীস শরীফে মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করার তাগিদ রয়েছে– اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

অর্থাৎ তোমরা মজলুমের বদ দোয়াকে ভয় কর, কেননা তার এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোনো পর্দা নেই।

মজলুমের পক্ষে তার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে, সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি থাকলেও তা উন্নত আদর্শ নয়, বরং প্রতিশোধ গ্রহণ হলো কু-প্রবৃত্তির তাড়না। আর ক্ষমা করা বিশেষ গুণ। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ "আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা অত্যন্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"

আলোচ্য আয়াতে প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ . অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনাপ্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"

আল্লাহ পাকের শাস্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অতএব, প্রকৃত মুমিন বান্দারও এ আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৪১]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

مَنْ عَاقَبَ .... لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ .

অর্থাৎ, "যে মুশরিকদের সাথে লড়াই করে যেমন মুশরিক তার সাথে লড়াই করে। এরপর মুশরিক তার প্রতি অত্যন্ত বেশি বাড়াবাড়ি করে। যেমন তাকে দেশ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অবশ্য তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ পাক শাস্তি দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অতএব, মুসলমানদের মধ্যে যারা মজলুম তারা ইচ্ছা করলে জালেমের জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করাই হলো উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন যেকোনোভাবে, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ الخ : পূর্বের আয়াতে মজলুমের সাহায্যের আলোচনা ছিল। আর সাহায্য তিনিই করতে পারেন যিনি সাহায্যের ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ক্ষমতার আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ উক্ত ক্ষমতার অধিকারী, দিনের আবর্তন-বিবর্তন এবং তাকে কমান বাড়ান একমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁরই হুকুমে কখনো রাত বড় আর দিন ছোট হতে থাকে, আবার কখনো এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। সে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ কি মজলুম জাতি বা ব্যক্তিকে সাহায্য করতে এবং জালিমদের উপর মজলুমদেরকে ক্ষমতা ও বলিয়ান করতে সক্ষম নন? এ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ অবস্থা দিন-রজনীর পরিবর্তনের ন্যায় পরিবতর্তিত হতে যাচ্ছে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা রাতকে দিনের দ্বারা পরিবর্তন করেন তদ্রূপ কাফেরদের ভূখণ্ডকে মুসলমানদের করতলগত করে দিবেন। তিনি মজলুমের ফরিয়াদ শুনেন এবং জালিমের কর্ম দেখেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ النَّصْرُ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ : অর্থাৎ এমন বিশাল পরিবর্তন ও আবর্তন মহামহিম উপাস্য ছাড়া আর কে করতে পারে? বাস্তব পক্ষে সঠিক ও সত্য উপাস্য থেকে থাকলে একমাত্র তিনিই আছেন। তাঁকে ছেড়ে অন্য যেসব মনগড়া উপাস্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা সব মিথ্যা ও ভ্রান্ত। কেবল এমন সত্ত্বাকেই উপাস্য বানানো উচিত যিনি সবার ঊর্ধ্বে, সর্বসময় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর সর্বসম্মতভাবে এমন সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الخ : যে, আল্লাহ শুষ্ক ও মৃত ভূমিকে আকাশের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা সুফলা করে দেন এভাবে কুফরের শুষ্ক পতিত ভূমিকে ইসলামের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা-সুফলা করবেন। এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিকট কিছুই নয়। তিনিই জানেন বৃষ্টি কিভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ভেতরে ভেতরে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, শুষ্কভূমি তার মধ্যে পানি পুষে নিয়ে বীজ দানার মধ্যে প্রবেশ করায়। ক্রমান্বয়ে তা থেকে চারার অঙ্কুর গজায়। আর তা থেকে ক্রমান্বয়ে মৃত ভূমি সবুজ-শ্যামাকার ধারণ করে। ঠিক এভাবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এবং সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি দ্বারা আদমজাতির অন্তরে ইসলামের বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত হৃদয়কে সতেজ-শ্যামল করেন।

قَوْلُهُ وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের সকল বস্তু যখন তাঁর মালিকানাধীন এবং তাঁরই সৃজিত এবং সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা করেন পরিবর্তন করেন, এ ব্যাপারে কেউ তাঁর কর্মে বাধা সৃষ্টিকারী নেই। তাঁর সকল কাজ প্রসংশনীয় এবং তাঁর সত্ত্বা সকল উত্তম গুণাবলি সম্বলিত।

অনুবাদ :

٦٥. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْفُلْكَ السُّفُنَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ لِلرُّكُوْبِ وَالْحَمْلِ بِاَمْرِهٖ بِاِذْنِهٖ وَيُمْسِكُ السَّمَاۤءَ مِنْ اَنْ اَوْ لِئَلَّا تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط فَتَهْلِكُوْا اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - فِى التَّسْخِيْرِ وَالْاِمْسَاكِ -

৬৫. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ আপনাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে জীব-জন্তু হতে তৎসমুদয়কে এবং নৌযানসমূহকে জলযান তথা নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি সমুদ্রে বিচরণশীল আরোহণ ও পরিবহনের জন্য। তার নির্দেশে তাঁর অনুমতিতে আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত। ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ নিশ্চয় মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু কাজে নিয়োজিত করা ও আটকে রাখার ক্ষেত্রে।

٦٦. وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ بِالْاِنْشَاءِ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اٰجَالِكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط عِنْدَ الْبَعْثِ اِنَّ الْاِنْسَانَ اَىِ الْمُشْرِكَ لَكَفُوْرٌ - لِنِعَمِ اللّٰهِ بِتَرْكِهٖ تَوْحِيْدَهٗ -

৬৬. এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। সৃষ্টির মাধ্যমে অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তোমাদের পৃথিবীতে অবস্থানের মেয়াদকাল শেষ হলে, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন পুনরুত্থানকালে মানুষতো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ মুশরিকরা আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর একত্ববাদকে পরিত্যাগ করে।

٦٧. لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا شَرِيْعَةً هُمْ نَاسِكُوْهُ عَامِلُوْنَ بِهٖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ يُرَادُ بِهٖ لَا تُنَازِعُهُمْ فِى الْاَمْرِ اَمْرِ الذَّبِيْحَةِ اِذْ قَالُوْا مَا قَتَلَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَاكُلُوْهُ مِمَّا قَتَلْتُمْ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اَىْ اِلٰى دِيْنِهٖ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى دِيْنٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি। مَنْسَكًا শব্দের سِيْن বর্ণ টি যবর ও যের উভয়ই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত। যা তারা অনুসরণ করে তার উপর আমলকারী। সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এর উদ্দেশ্য হলো- আপনারা তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। এই ব্যাপারে জবাইয়ের ব্যাপারে। যেহেতু তারা বলত যে, আল্লাহ যাকে হত্যা করেছেন তা খাওয়ার অধিক যোগ্য তোমায় যাকে হত্যা করেছ তা হতে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন অর্থাৎ তাঁর দীনের দিকে। আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। দীনে।

٦٨. وَاِنْ جَادَلُوْكَ فِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - فَيُجَازِيْكَ عَلَيْهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ -

৬৮. তারা যদি আপনার সাথে বিতণ্ডা করে দীনের বিষয়ে তবে বলে দিন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান/ শাস্তি দিবেন। আর এটা ছিল জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে।

অনুবাদ :

٦٩. اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكَافِرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ـ بِاَنْ يَّقُوْلَ كُلٌّ مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ خِلَافَ قَوْلِ الْاٰخَرِ ـ

৬৯. আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে দিবেন হে মুমিন ও কাফের সম্প্রদায় কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ। এভাবে যে, প্রত্যেক দলই বিপক্ষ দলের বিপরীত কথা বলে থাকে।

٧٠. اَلَمْ تَعْلَمْ اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّقْرِيْرِ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّ ذٰلِكَ اَىْ مَا ذُكِرَ فِىْ كِتٰبٍ ط هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ اِنَّ ذٰلِكَ اَىْ عِلْمَ مَا ذُكِرَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ سَهْلٌ ـ

৭০. আপনি কি জানেন না? এখানে اِسْتِفْهَامْ টি تَقْرِيْر তথা কথাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। যে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এ সবই রয়েছে অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হলো। একটি কিতাবে অর্থাৎ লৌহে মাহফুযে তথা সংরক্ষিত ফলকে। নিশ্চয় এটা অর্থাৎ, যা কিছু উল্লেখ করা হলো তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট সহজ।

٧١. وَيَعْبُدُوْنَ اَىْ اَلْمُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ هُوَ الْاَصْنَامُ سُلْطٰنًا حُجَّةً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط اَنَّهَا اٰلِهَةٌ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ بِالْاِشْرَاكِ مِنْ نَّصِيْرٍ ـ يَمْنَعُ عَنْهُمْ عَذَابَ اللّٰهِ ـ

৭১. তারা উপাসনা করে মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোনো দলিল প্রেরণ করেননি। অর্থাৎ মূর্তি ও দেব-দেবীর উপাসনা করে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। এবং যাদের সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। শিরক করার কারণে কোনো সাহায্যকারী যে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

٧٢. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط اَىِ الْاِنْكَارَ لَهَا اَىْ اَثَرَهٗ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْعُبُوْسِ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ط اَىْ يَقَعُوْنَ فِيْهِمْ بِالْبَطْشِ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ اَىْ بِاَكْرَهَ اِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمَتْلُوِّ عَلَيْكُمْ هُوَ النَّارُ ط وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط بِاَنَّ مَصِيْرَهُمْ اِلَيْهَا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِىَ ـ

৭২. এবং তাদের নিকট কুরআন হতে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে بَيِّنٰتٌ শব্দটি حَال হয়েছে। আপনি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করবেন অর্থাৎ অপছন্দ ও অসন্তুষ্টির ছাপ। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। অর্থাৎ তাদেরকে ধরে বসার উপক্রম হয়। আপনি বলুন! তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? অর্থাৎ কুরআন অপেক্ষা আরো অধিক অপছন্দনীয় বিষয় যা তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়। আর তা হলো নরকাগ্নি এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফেরদেরকে। যে, তার প্রতিই তারা ধাবিত হবে। এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ দোজখের আগুন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ : تَرَ মূলত تَرَاىِ ছিল। এটা رُؤْيَتٌ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। শুরুতে لَمْ আসার কারণে শেষ থেকে يَاءٌ পড়ে গেছে। تَرَ-এর ব্যাখ্যা تَعْلَمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, দেখা বলতে এখানে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখা তথা চিন্তা-গবেষণা করা উদ্দেশ্য। سَخَّرَ ক্রিয়াটি تَسْخِيْر থেকে مَاضِىْ-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো কর্তৃতাধীন করা, অনুগত করা, কাজে লাগানো, জোরপূর্বক কোনো কাজে নিয়োজিত করা।

قَوْلُهُ وَالْفُلْكَ : مَافِى الْاَرْضِ-এর عَطْف হওয়ার مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ تَجْرِىْ : এটা فُلْكُ-এর حَالٌ, আবার اللّٰه শব্দের উপরও এর عَطْف হতে পারে। এ সময় এটা اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ-এর অধীনে হবে। আর تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ এটা اَنَّ-এর خَبَرْ হবে। একবচনও বহুবচন সব ক্ষেত্রে فُلْكٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ مِنْ (اَنْ) اَوْ لِئَلَّا (تَقَعَ) : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো اَنْ تَقَعَ-এর اِعْرَابْ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা। এটা হয়তো جَرّ-এর স্থলে রয়েছে এর حَرْف جَرّ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ- مِنْ اَنْ تَقَعَ ছিল, আর اَنْ تَقَعَ শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ, اَلسَّمَاءُ থেকে بَدَل এর কারণে وُقُوْعٌ-এর অর্থে। অথবা এটা নসবের স্থলে পতিত হয়েছে। অথবা যেহেতু এটা اَلْاِشْتِمَالُ, অর্থাৎ, يَمْنَعُ وُقُوْعَهَا আর কেউ বলেন مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। বসরার নাহুবিদগণের মতে বাক্যটি এরূপ ছিল- يُمْسِكُ السَّمَاءَ كَرَاهَةَ اَنْ تَقَعَ আর কূফীগণের মতে ছিল يُمْسِكُ السَّمَاءَ لِئَلَّا تَقَعَ আমাদের মুফাসসির (র.) প্রথম ও তৃতীয় সম্ভাবনাকে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ : এটা مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغٌ - كَلَام مُوْجَبْ-এর মধ্যে পতিত হয় না। আর এখন مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তথা يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ, এ আপত্তির উত্তর এই যে, كَلَامْ مُوْجَبْ হলো يُمْسِكُ السَّمَاءَ শক্তির দিক দিয়ে نَفِىْ-এর মতো। বাক্যটি এরূপ ছিল- لَا يَتْرُكُهَا تَقَعُ فِىْ حَالَةٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا فِىْ حَالِ كَوْنِهَا مُتَلَبِّسَةً بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى বা টি بَسَتْ-এর মধ্যে بِاِذْنِهٖ-এর জন্যে। مُلَا

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ قَالَ الْجُنَيْدُ قُدِّسَ سِرُّهٗ اَحْيَاكُمْ بِمَعْرِفَةٍ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ بِاَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ وَالْفَتْرَةِ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ بِالْجَذْبِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো- তিনি তোমাদের আত্মাকে জীবিত করেন তাঁর মা'রিফাত দ্বারা, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাঁর জিকির থেকে উদাসীন ও গাফেল থাকার সময়ের দ্বারা, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন জিকিরবিহীন সময়ের পরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করার দ্বারা।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এখানে উম্মত দ্বারা সে সকল মানুষ উদ্দেশ্য যাদের নিকট কোনো আসমানি ধর্ম ও কোনো নবীর শরিয়ত নেই। কাফের মুশরিকগণ উদ্দেশ্য নয়। جَعَلْنَا শব্দটি এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করছে। ব্যাখ্যাকার (র.) شَرِيْعَةٌ দ্বারা مَنْسَكٌ-এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلنَّسِيْكَةُ শব্দটি ইবাদত অর্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। কাজেই مَنْسَكًا শব্দকে ইবাদতখানা বা ইবাদতের সময় অর্থে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। نَاسِكُوْهُ শব্দটিও এ বিষয়ের ইঙ্গিত করছে। যদি ইবাদতখানা বা ইবাদতের সময় অর্থ হতো তাহলে نَاسِكُوْنَ فِيْهِ বলতেন।

قَوْلُهُ لَا يُنَازِعُنَّكَ : ব্যাখ্যাকার (র.) لَا تُنَازِعْهُمْ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। এটা كِنَايَةٌ তথা ইঙ্গিত স্বরূপ। কেননা বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব হয় দু'পক্ষ থেকে। মূলত এর দ্বারা রাসূল ﷺ -কে তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি যখন তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না তাহলে দ্বন্দ্ব এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। এক পক্ষকে নিষেধ করার দ্বারা কেনায়া স্বরূপ অপর পক্ষকেও নিষেধ করা বুঝায়।

قَوْلُهُ فِى الْاَمْرِ : ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْر দ্বারা জবাইকৃত পশু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম খতীব (র.) বলেন, এ আয়াতটি বুদাইল ইবনে ওরাকা, বিশর ইবনে সুফিয়ান ও ইয়াজীদ ইবনে হুনাইস -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ -এর

সাহাবীদের নিকট বলেছিল– مَا لَكُمْ تَاكُلُوْنَ مِمَّا تَقْتُلُوْنَ وَلَا تَاكُلُوْنَ مِمَّا قَتَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ তোমরা নিজেরা মেরে তা ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার মারা তথা এমনিতেই মৃত জন্তুকে ভক্ষণ কর না? ব্যাখ্যাকার (র.)-এর فِى الْاَمْرِ -এর ব্যাখ্যা জবাই দ্বারা করা এ স্থলে সমীচীন হয়নি; বরং এখানে স্বাভাবিকভাবে শরিয়তের বিধান উদ্দেশ্য। অন্যথায় পূর্বের উম্মতদের মধ্যে মৃত পশু খাওয়া বৈধ হওয়া বোঝা যায়। আর তা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ : এখানে مَا হলো مَوْصُوْلَهْ এবং يَعْبُدُ -এর مَفْعُوْل بِهِ

قَوْلُهُ يَكَادُ يَسْطُوْنَ : এটা جُمْلَهْ حَالِيَةْ অথবা اَلَّذِيْنَ থেকে حَالْ, তবে এ সময় প্রশ্ন জাগে যে, اَلَّذِيْنَ হলো مُضَاف اِلَيْهِ আর উদ্দেশ্য হয় مُضَاف, সুতরাং مُضَاف اِلَيْهِ থেকে حَالْ হওয়া কিভাবে ঠিক হতে পারে?

উত্তর : مُضَاف যেহেতু مُضَاف اِلَيْهِ -এর অংশ হয়, কাজেই তার থেকে حَالْ হওয়া বৈধ আছে। অথবা এটা وُجُوْه থেকে حَالْ আর وَجْه দ্বারা তার অধিকারী ব্যক্তি উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার (র.) يَسْطُوْنَ -এর ব্যাখ্যা بَطْش দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَسْطُوْنَ শব্দটি يَبْطِشُوْنَ -এর অর্থ বিশিষ্ট। এ কারণেই يَسْطُوْنَ -এর صِلَهْ স্বরূপ بَا আসা বৈধ হয়েছে। অন্যথায় এর সেলাহ্ আসে عَلٰى

قَوْلُهُ هُوَ النَّارُ : এখানে اَلنَّار হলো উহ্য هُوَ مُبْتَدَأْ -এর خَبَرْ এ সময় ওয়াকফ হবে ذٰلِكَ -এর উপর। আবার اَلنَّارُ শব্দটি مُبْتَدَأْ এবং وَعَدَهَا اللّٰهُ হলো এর খবর। এ সময় ওয়াকফ হবে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ : **অর্থাৎ**, আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এ অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোনো কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে تَسْخِيْر -এর অনুবাদ "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোনো এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন। কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে مَنْسَك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে مَنْسَك ও نُسُك কুরবানির অর্থে হজের বিধানবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে واو সহকারে وَلِكُلِّ اُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে مَنْسَك -এর অন্য অর্থ [অর্থাৎ জবাই করার বিধানাবলি অথবা শরিয়তের বিধানাবলির জ্ঞান] বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে وَاوْ সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তাফসীর কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক সে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃত্যুজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াতে অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

অতএব এখানে مَنْسَك -এর অর্থ হবে জবাই করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরিয়তের জন্য জবাইয়ের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর শরিয়ত একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত। এই শরিয়তের বিধি-বিধানের মোকাবিলা কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েজ নয়। অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েজ হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরিয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গাম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। –[রূহুল মা'আনী]

সাধারণ তাফসীরকারদের মতে مَنْسَكٌ শব্দের অর্থ এখানে শরিয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে مَنَاسِكُ الْحَجِّ বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ইবাদত। কুরআনে وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَاسِكُ বলে ইবাদতের বিধানাবলি বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রুহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, مَنْسَكٌ বলে শরিয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষী মুহাম্মাদী শরিয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোনো পূর্ববর্তী শরিয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরিয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরিয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উম্মত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরিয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরিয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরিয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসিখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরিয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য- فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ -এর সারমর্মও তা-ই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী ﷺ একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরিয়তের বিধি বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারো নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তাফসীর ও এই দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াত জবাই সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরিয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষায় ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরিয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরিয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবে; বরং নতুন শরিয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اُدْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের অপনোদন : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মাদী শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত মনসূখ হয়ে গেল। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কুরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা স্বয়ং কুরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। এ কথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরো সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে- وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতীতে আল্লাহ পাক প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদত-বন্দেগির ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতি বা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সে যুগের উপযোগী ছিল। তারা আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মোতাবেক বন্দেগী করতো অনুরূপভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে করীম ﷺ -কেও পরিপূর্ণ শরিয়ত ও সর্বশেষ শরিয়ত দান করেছেন, যাঁর অনুসরণ করা সর্বকালের সকল মানুষেরই কর্তব্য। কেননা প্রিয়নবী ﷺ সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোনো নবীর আগমন হবে না এবং তাঁর শরিয়ত সর্বশেষ শরিয়ত, এরপর আর কোনো শরিয়ত আসবে না। অতএব,

এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বিতর্কের অবকাশ নেই। যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ করবে, তারা নাজাত লাভ করবে। আর যারা তাঁর অনুসরণে অপ্রস্তুত হবে, তারা নাজাত লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই ইরশাদ হয়েছে– فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ [হে রাসূল!] কেউ কেউ যেন আপনার সাথে দীনি ব্যাপারে বা শরিয়তের ব্যাপারে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়। কেননা আপনার দীন আল্লাহ পাকের মনোনীত, আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত, তাই তা কলহ-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই কুরবানির জন্তু জবাই করার পন্থা নির্দিষ্ট ছিল। তারা সে পন্থাতেই জবাই করতো। হে রাসূল ! লোকদের উচিত হলো, জবাই করার ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই শরিয়তের রীতি-নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার مَنْسَكٌ শব্দটির অনুবাদ করেছেন পর্ব, বিশেষ অনুষ্ঠান। মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কুরবানির স্থান যেখানে তারা কুরবানি করতো। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, مَنْسَكٌ শব্দটির অর্থ হলো, ইবাদতের স্থান।

قَوْلُهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا الخ : শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বোদায়েল ইবনে ওরাকা, ইয়াজিদ ইবনে খুনাইস এবং বসর ইবনে সুফিয়ান নামক ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এ কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের নিকট এসে বলেছিল, তোমরা যেসব জন্তুকে জবাই করে মার তা হালাল মনে করে খাও, আর যেসব জন্তুকে আল্লাহ পাক সরাসরি মৃত্যু দেন, সেগুলোকে মৃত মনে করে তোমরা সেগুলোর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ মনে কর, এর কারণ কি? আল্লাহ পাক তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে কাফেরদের সাথে কোনো ব্যাপারে বিতর্কে মশগুল না হয়ে শুধু ইসলাম গ্রহণের জন্যে তাদেরকে আহবান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ

অর্থাৎ হে রাসূল! তাদেরকে আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন, যেন তারা তাওহীদের মূল নীতিতে বিশ্বাস করে। কেননা নবী রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ যুগের মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাস, স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এ মূলনীতিতে কোনো মত পার্থক্য নেই। অতএব এ সম্পর্কে বিতর্ক সম্পূর্ণ আশোভনীয়। অবশেষে এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন– إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ "[হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনিই সরল সঠিক পথের হেদায়েতের উপর রয়েছেন"।

প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ : পৃথিবীর কোনো মানুষকে যদি হেদায়েত লাভ করতে হয় তবে অবশ্যই আপনার অনুসারী হতে হবে। দুনিয়াতে শান্তি লাভ করার, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরিপূর্ণ অনুসরণ। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন– "[হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনিই সঠিক পথে রয়েছেন"।

قَوْلُهُ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ : অর্থাৎ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ -এ আয়াতটি জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর কোনো কোনো আলেম বলেন, আয়াতটি মানসূখ নয়; বরং مُحْكَمٌ তথা সদা বহাল। এ সময় আয়াতের অর্থ হবে– তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক বর্জন কর এবং এ বিষয়টিকে اَللّٰهُ اَعْلَمُ [আল্লাহ সর্বাধিক অবগত] বলে তাকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর।

قَوْلُهُ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ : সবচেয়ে বড় জুলুম ও অন্যায় হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো অংশীদার বানানো। এমন জালিম ও অন্যায় আচরণকারীদের মনে রাখা উচিত যে, তারা যাদেরকে ইবাদতে শরিক করত তারা বিপদে পড়লে যেসব শরিকরা তাদের কোনো কাজে আসবে না। আর অন্য কেউ তখন তাদেরকে সাহায্য করবে না।

قَوْلُهُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا : وَعَدَ ক্রিয়াটি দুই مَفْعُول দ্বারা مُتَعَدِّى হয়। هَا ضَمِير টি দ্বিতীয় مَفْعُول আর الَّذِينَ كَفَرُوا হলো প্রথম مَفْعُول -এর বিপরীতেও বৈধ। ব্যাখ্যাকার (র.) তাঁর উক্তি بِأَنَّ مَصِيرَهُمْ إِلَيْهَا দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا -কে প্রতিশ্রুতি লাভকৃত তথা مَوْعُودٌ بِهِ এবং النَّارُ -কে مَوْعُودٌ তথা প্রতিশ্রুত বিষয় সাব্যস্ত করেছেন।

অনুবাদ :

٧٣. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَهُوَ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا اِسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهٗ ذُبَابَةٌ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ط اَىْ لِخَلْقِهٖ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الطِّيْبِ وَالزَّعْفَرَانِ الْمُلَطَّخِيْنَ بِهٖ لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ يَسْتَرِدُّوْهُ مِنْهُ ط لِعَجْزِهِمْ فَكَيْفَ يَعْبُدُوْنَ شُرَكَاءَ لِلّٰهِ تَعَالٰى هٰذَا اَمْرٌ مُسْتَغْرَبٌ عُبِّرَ عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلٍ ضَعُفَ الطَّالِبُ الْعَابِدُ وَالْمَطْلُوْبُ الْمَعْبُوْدُ.

৭৩. হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসীরা একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে মনেযোগ সহকারে শোন! আর হলো তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহবান কর উপাসনা কর অর্থাৎ মূর্তি ও প্রতিমাদের তারা তো কখনো একটি মাছি ও সৃষ্টি করতে পারবে না ذُبَابٌ শব্দটি اِسْمِ جِنْس -এর একবচন হলো ذُبَابَةٌ এটা স্ত্রী ও পুং লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও অর্থাৎ তা সৃষ্টি করার জন্য। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে তাদের উপর যে সুগন্ধি জাফরান যা তারই সাথে লেগে থাকে। এটাও তারা তাদের নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাদের অক্ষমতার কারণে। তবুও তারা কিভাবে আল্লাহর শরিকদের উপাসনা করে। এ বিষয়টি অদ্ভুত ধরনের। এটাকেই উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কতইনা দুর্বল অন্বেষক উপাসক ও অন্বেষিত উপাস্য।

٧٤. مَا قَدَرُوا اللّٰهَ عَظَّمُوْهُ حَقَّ قَدْرِهٖ عَظَمَتِهٖ اِذْ اَشْرَكُوْا بِهٖ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنَ الذُّبَابِ وَلَا يَنْتَصِفُ مِنْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ غَالِبٌ.

৭৪. তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা সম্মান উপলব্ধি করেন। তার সম্মান ও বড়ত্ব । যখন তারা তার সাথে এমন সব বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে যারা মাছির প্রতিরোধেও সক্ষম নয় এবং তা থেকে কোনোরূপ প্রতিশোধও নিতে পারে না। আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রম বিজয়ী।

٧٥. اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط رُسُلًا نَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِمَقَالَتِهِمْ بَصِيْرٌ. بِمَنْ يَّتَّخِذُهٗ رَسُوْلًا كَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্যে হতে মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য হতে ও। রাসূল! এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুশরিকরা বলল যে, আমাদের মধ্য থেকেই একজনের উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হলো? আল্লাহ সর্বশ্রোতা তাদের কথার/ বক্তব্যের সম্যক দ্রষ্টা তাদেরকে যাদেরকে তিনি রাসূল মনোনীত করেন। যেমন- হযরত জিবরীল, মীকাঈল, ইবরাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ প্রমুখ।

٧٦. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط اَىْ مَا قَدَّمُوْا وَمَا خَلَّفُوْا اَوْ مَا عَمِلُوْا وَمَا هُمْ عَامِلُوْنَ بَعْدُ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ .

٧٧. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا اَىْ صَلُّوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَحِّدُوْهُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ كَصِلَةِ الرَّحْمِ وَمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . تَفُوْزُوْنَ بِالْبَقَاءِ فِى الْجَنَّةِ .

٧٨. وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ لِاِقَامَةِ دِيْنِهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط بِاسْتِفْرَاغِ الطَّاقَةِ فِيْهِ وَنَصَبُ حَقَّ عَلَى الْمَصْدَرِ هُوَ اجْتَبٰكُمْ اِخْتَارَكُمْ لِدِيْنِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ اَىْ ضِيْقٍ بِاَنْ سَهَّلَهُ عِنْدَ الضَّرُوْرَاتِ كَالْقَصْرِ وَالتَّيَمُّمِ وَاَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ وَالسَّفَرِ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْكَافِ اِبْرٰهِيْمَ ط عَطْفُ بَيَانٍ هُوَ اَىِ اللّٰهُ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ط مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ هٰذَا الْكِتَابِ وَفِىْ هٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنِ لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَّهُ بَلَّغَكُمْ وَتَكُوْنُوْا اَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج اَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ دَاوِمُوْا عَلَيْهَا وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط ثِقُوْا بِهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ ج نَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّىْ اُمُوْرِكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ . اَىِ النَّاصِرُ هُوَ لَكُمْ .

অনুবাদ :

৭৬. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন অর্থাৎ যে আমল অগ্রে প্রেরণ করেছ এবং যা পেছনে রেখে এসেছ, এবং যে আমল করে ফেলেছ এবং যা ভবিষ্যতে করবে এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৭. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর অর্থাৎ সালাত আদায় কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর, এবং সৎকর্ম কর যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন ও উত্তম চরিত্রের কার্যাবলি যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার অর্থাৎ জান্নাতে স্থায়ী হওয়ার মাধ্যমে সাফল্য পেতে পার।

৭৮. এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য। যেভাবে জিহাদ করা উচিত অর্থাৎ এ ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। حَقَّ শব্দটি মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁর দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি অর্থাৎ, সংকীর্ণতা। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বিধান সহজ করেছেন, যেমন– নামাজের কসর করার বিধান, তায়াম্মুমের বিধান, নিরুপায় অবস্থায় মৃতজন্তু ভক্ষণ এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজা ভঙ্গের অনুমোদন। এটা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত مِلَّةَ শব্দটি حَرْفُ جَارّ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর اِبْرَاهِيْم এটা اَبِيْكُمْ-এর عَطْفُ بَيَانْ হয়েছে। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম অর্থাৎ এ কিতাবের পূর্বে। এবং এ কিতাবেও অর্থাৎ কুরআনে যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন। কিয়ামতের দিন যে, তিনি তোমাদের নিকট প্রচার করেছেন এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য যে তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট প্রচার করেছেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর সর্বদা এর পাবন্দি কর এবং জাকাত দাও এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর অর্থাৎ তার উপর নির্ভরশীল হও। তিনিই তোমাদের অভিভাবক অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের সকল কর্মের তত্ত্বাবধায়ক। কতইনা উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী তিনি অর্থাৎ তিনি তোমাদের সাহায্য-সহায়তাকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ : এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্বের وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে। এ আয়াতে যদিও মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে এর দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারী সকল মানুষ উদ্দেশ্য। ضَرَبَ مَثَلاً -এর মধ্যে مَثَلاً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আশ্চর্যকারী বিষয়। আর উক্ত আশ্চর্যকর বিষয় হলো শিরক ও মূর্তিপূজার আহমকীকে এক স্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করা। তা এই যে, তোমরা যেসব মূর্তিকে কার্যনিয়ন্তা তথা বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী মনে করছ তারা তো এতো অসহায় ও অক্ষম যে, তারা সবাই মিলে মাছির ন্যায় একটি সাধারণ তুচ্ছ জিনিসকেও সৃষ্টি করতে পারে না। আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা তোমরা প্রতিদিন তাদের সামনে যে মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্রব্য রাখ আর মাছি এসে তা খেয়ে যায় তারা সে মাছিগুলোকেও তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। অতএব তারা কোনো বিপদাপদ থেকে তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? অবশেষে আয়াতে তাদের এহেন নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণ ও বোকামিকে এ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যে- ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

قَوْلُهُ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ : এ বাক্যটি حَالٌ -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, اِنْتَفٰى خَلْقُهُمُ الذُّبَابَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلَوْفِىْ حَالِ اِجْتِمَاعِهِمْ অর্থে।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا : يَسْلُبْ শব্দটি দু'মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ, এর প্রথম مَفْعُوْل হলো هُمْ আর দ্বিতীয়টি হলো شَيْـًٔا আর مُلَطَّخُوْنَ শব্দটি لَطْخٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হলো মিশ্রণ করা, মেশা। مُلَطَّخُوْنَ মূলত طِيْبٌ وَالزَّعْفَرَانُ -এর সিফতে সববী। কাজেই এর স্থলে مُلَطَّخِيْنَ হওয়া উচিত ছিল। -[জুমাল]

قَوْلُهُ عُبِّرَ عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلٍ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : উদাহরণ পেশ করার নামে যা উল্লিখিত হয়েছে তা কোনো উদাহরণ নয় তথাপি তাকে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বলা হলো কেন?

উত্তর : আরবিতে আশ্চর্যকর ও উন্নত বিষয়বস্তুকেও مَثَلٌ বলা হয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ رُسُلاً : رُسُلاً শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে শব্দ বিলুপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর কিয়াস করে رُسُلاً -কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَقَّ جِهَادِهٖ : মূলত جِهَادًا حَقًّا। এটা اِضَافَتُ الصِّفَتِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ هُوَ اَىْ اَللّٰهُ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ : এখানে هُوَ -এর مَرْجِعْ -এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এর مَرْجِعْ হলো اِبْرَاهِيْمُ ২. এর مَرْجِعْ হলো اَللّٰهُ ব্যাখ্যাকার (র.)-এর পরে اَللّٰهُ শব্দ উহ্য মেনে দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এর আলামত হলো- وَفِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ। কেননা কুরআনে মুসলমান নাম রাখাটা আল্লাহ তা'আলার কাজ, ইবরাহীম (আ.)-এর কাজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ : একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : ضُرِبَ مَثَلٌ এই শব্দটি সাধারণত কোনো বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্র হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন. ফলমূল ইত্যাদি

খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরো বেশি শক্তিহীন হবে। ইরশাদ হচ্ছে- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরিক সাব্যস্ত করেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সূরা হজের সিজদায়ে তেলাওয়াত : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ - এ অংশটুকু সূরা হজে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সওরী (র.)-এর মতে এই আয়াতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা এতে সিজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে নামাজের সিজদা বোঝানো হয়েছে। যেমন- وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য! [এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) প্রমুখের মতে এই আয়াতেও সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে সূরা হজে অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দুইটি সিজদায়ে তেলাওয়াত আছে। ইমাম আযম (র.)-এর মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهٗ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ : جِهَادٌ ও مُجَاهَدَةٌ শব্দের অর্থ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهٖ-এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নামযশ ও গনিমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- حَقَّ جِهَادِهٖ-এর অর্থ হলো জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার কর্ণপাত না করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

যাহ্হাক ও মুকাতিল (র.) বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে- اِعْمَلُوْا حَقَّ عَمَلِهٖ وَاعْبُدُوْهُ حَقَّ عِبَادَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادٍ অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী (র.) প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ قَالَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ لِهَوَاهُ অর্থাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি বর্ণনা করে ইমাম বায়হাকী (র.) বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য : তাফসীরে মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তাফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনো চালু ছিল। কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ الخ : উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহর মনোনীতে উম্মত : হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। -[মুসলিম, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোনো গুনাহ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গুনাহও ছিল, যা তওবা করলেও মাপ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কুরআন পাকে একে إِصْرٌ ও أَغْلَالٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতইনা পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোনো কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, ধর্মে সংকীর্ণতা নেই- এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ ; বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারি কাজও হালকা পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়।
-[আহমদ, নাসায়ী, হাকিম]

قَوْلُهُ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ : অর্থাৎ তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফজিলতে শামিল হয়। যেমন হাদীসে আছে-

اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমানগণ মুসলমান কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। -[মাযহারী]

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম ﷺ হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমিনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম ﷺ যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

قَوْلُهُ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন : যেমন হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর এই দোয়া কুরআনে বর্ণিত আছে- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নন ; কিন্তু কুরআনের পূর্বে তাঁর এই

নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি তাফসীরকার ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতানুযায়ী। তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতে هُوَ যমীরের مَرْجِعْ হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। এ ব্যাপারে আরেকটি মত রয়েছে। আর তা হলো- هُوَ যমীরের مَرْجِعْ হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। জালালাইন গ্রন্থকার (র.) এ দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। 'তাহকীক ও তারকীব' অংশে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ : অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গাম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। এ সময় উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গাম্বরগণ নিশ্চিত রূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের জমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই ; কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল ﷺ -এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে; তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলি পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলির মধ্যে এ স্থলে শুধু নামাজ ও জাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলির মধ্যে জাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরিয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ : অর্থাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন, এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক যেমন এক হাদীসে আছে-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দুটিকে অবলম্বন করে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুন্নত। -[মাযহারী]

اَلْجُزْءُ الثَّامِنُ عَشَرَ অষ্টাদশ পারা

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ وَّثَمَانٌ اَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ اٰيَةً

সূরা মু'মিনূন মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত : ১১৮/১১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ اَفْلَحَ فَازَ الْمُؤْمِنُوْنَ .

১. অবশ্যই قَدْ টা تَحْقِيْق তথা দৃঢ়তাসূচক, সফলকাম হয়েছে কৃতকার্য হয়েছে মুমিন গণ্য।

٢. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ . مُتَوَاضِعُوْنَ .

২. যারা নিজেদের সালাতে বিনম্র বিনয়ী।

٣. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهٖ مُعْرِضُوْنَ .

৩. যারা অসার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তা ইত্যাদি হতে বিরত থাকে।

٤. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ . مُؤَدُّوْنَ .

৪. যারা জাকাত দানে সক্রিয় আদায়কারী।

٥. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ عَنِ الْحَرَامِ .

৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে হারাম থেকে।

٦. اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَيْ مِنْ زَوْجَاتِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَيِ السَّرَارِيْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ج فِيْ اِتْيَانِهِنَّ .

৬. তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না তাদের সাথে যৌন মিলনে।

٧. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ اَيْ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِيْ كَالْاِسْتِمْنَاءِ بِيَدِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ج اَلْمُتَجَاوِزُوْنَ اِلٰى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ .

৭. এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে অর্থাৎ স্ত্রী ও বাঁদি ছাড়া যেমন– হস্তমৈথুন তারা হবে সীমালজ্ঘনকারী অর্থাৎ যা তাদের জন্য বৈধ নয় তার সীমাতিক্রমকারী।

٨. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا وَعَهْدِهِمْ اَوْ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةٍ وَغَيْرِهَا رٰعُوْنَ . حَافِظُوْنَ .

৮. যারা নিজেদের আমানত এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় উভয়রূপেই পঠিত। ও প্রতিশ্রুতি যা তাদের পরস্পর ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার নামাজ ইত্যাদি হতে রক্ষা করে সংরক্ষক।

٩. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا يُحَافِظُوْنَ . يُقِيْمُوْنَهَا فِيْ اَوْقَاتِهَا .

৯. যারা নিজেদের সালাতে থাকে এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে পঠিত। যত্নবান অর্থাৎ যথাসময়েই তা কায়েম করে।

অনুবাদ :

١٠. أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ـ لَا غَيْرُهُمْ ـ

১০. এরাই হবে অধিকারী তাদের ছাড়া অন্যরা নয়।

١١. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُوَ جَنَّةُ أَعْلَى الْجِنَانِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ فِيْ ذٰلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَعَادِ وَ يُنَاسِبُهُ ذِكْرُ الْمَبْدَإِ بَعْدَهُ ـ

১১. অধিকারী হবে ফেরদাউসের আর ফেরদাউস হলো সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাত। যাতে তারা স্থায়ী হবে। এর দ্বারা পরিণামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং এর পরে শুরুর অবস্থা বর্ণনা করাটা যথাযথ।

١٢. وَ اللّٰهِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اٰدَمَ مِنْ سُلٰلَةٍ هِيَ مِنْ سَلَلْتُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ أَيْ اِسْتَخْرَجْتُهُ مِنْهُ وَهُوَ خُلَاصَتُهُ مِّنْ طِيْنٍ ج مُتَعَلِّقٌ بِسُلَالَةٍ ـ

১২. আমার সত্তার শপথ! আমি তো মানুষকে আদমকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। سُلَالَةٍ শব্দটি سَلَلْتُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ অর্থাৎ আমি এক বস্তু থেকে অপর বস্তু বের করেছি। আর তা হলো তার সারনির্যাস বা মূল উপাদান। مِنْ طِيْنٍ এটা سُلَالَةٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

١٣. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ أَيِ الْإِنْسَانَ نَسْلَ اٰدَمَ نُطْفَةً مَنِيًّا فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ هُوَ الرَّحِمُ ـ

১৩. অতঃপর আমি তাকে মানুষকে হযরত আদম (আ.)-এর বংশকে স্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে বীর্যরূপে এক নিরাপদ আধারে। আর তা হলো জরায়ু/গর্ভাশয়।

١٤. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً دَمًا جَامِدًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً لَحْمَةً قَدْرَ مَا يُمْضَغُ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ق وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَظْمًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ بِمَعْنٰى صَيَّرْنَا ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ أَيِ الْمُقَدِّرِيْنَ وَمُمَيِّزُ أَحْسَنَ مَحْذُوْفٌ لِلْعِلْمِ بِهٖ أَيْ خَلْقًا ـ

১৪. পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি পিণ্ডে। চিবানোর পরিমাণ মাংসপিণ্ডে। এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা এক কেরাতে عِظَامًا -এর পরিবর্তে উভয় স্থানে عَظْمًا এসেছে। আর উপরের তিন স্থানেই خَلَقْنَا শব্দটি صَيَّرْنَا [আমি পরিণত করেছি] অর্থে হয়েছে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান অর্থাৎ সর্বোত্তম ক্ষমতা প্রদানকারী। আর أَحْسَنُ -এর تَمْيِيْزُ হলো خَلْقًا এটা অধিক জ্ঞাত হওয়ার কারণে উহ্য রয়েছে।

١٥. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ـ

১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

١٦. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ـ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ ـ

১৬. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। হিসাব নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য।

অনুবাদ :

١٧. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ج اَىْ سَمٰوَاتٍ جَمْعُ طَرِيْقَةٍ لِاَنَّهَا طُرُقُ الْمَلَائِكَةِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتَهَا غٰفِلِيْنَ ـ اَنْ تَسْقُطَ عَلَيْهِمْ فَتُهْلِكَهُمْ بَلْ نُمْسِكُهَا كَاٰيَةِ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ ـ

১৭. আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর অর্থাৎ আকাশসমূহ। طَرَآئِقَ শব্দটি طُرُقٌ -এর বহুবচন। যেহেতু আকাশ ফেরেশতাগণের চলাচলের পথ এ কারণে একে طَرَائِقُ বলা হয়েছে। এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে আকাশসমূহের নিচের অসতর্ক নই যে তা তাদের উপর পতিত হয়ে তাদেরকে বিনাশ করে দিবে; বরং আমি আকাশসমূহকে সুদৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছি। যেমনটা يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

١٨. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ مِنْ كِفَايَتِهِمْ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ م بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ـ فَيَمُوْتُوْنَ مَعَ دَوَابِّهِمْ عَطْشًا ـ

১৮. আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে তাদের প্রয়োজন অনুসারে। অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম। ফলে তারা তাদের পশুসহ তৃষ্ণাকাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

١٩. فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ هُمَا اَكْثَرُ فَوَاكِهِ الْعَرَبِ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ صَيْفًا وَشِتَاءً ـ

১৯. অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। এ দু'টি হলো আরবের অধিক উৎপাদনশীল ফল। এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর তা হতে তোমরা আহার করে থাকো গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে।

٢٠. وَ اَنْشَاْنَا شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ جَبَلٌ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا مَنْعُ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ لِلْبُقْعَةِ تَنْبُتُ مِنَ الرُّبَاعِىِّ وَالثُّلَاثِىْ بِالدُّهْنِ اَلْبَاءُ زَائِدَةٌ عَلَى الْاَوَّلِ وَمُعَدِّيَةٌ عَلَى الثَّانِىْ وَهِىَ شَجَرَةُ الزَّيْتُوْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ـ عَطْفٌ عَلَى الدُّهْنِ اَىْ اِدَامٌ يُصْبَغُ اللُّقْمَةُ بِغَمْسِهَا فِيْهِ وَهُوَ الزَّيْتُ ـ

২০. এবং আমি সৃষ্টি করি বৃক্ষ যা জন্মায় সিন্নাই পর্বতে سَيْنَاءَ শব্দটি سِيْن বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। এতে عَلَمِيَّتْ থাকায় এবং এটা بُقْعَةٌ -এর অর্থে হওয়ায় তাতে تَانِيْث পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা غَيْر مُنْصَرِفْ হয়েছে। এতে উৎপন্ন হয় এ শব্দটি ثُلَاثِىْ এবং رُبَاعِىْ উভয় থেকেই হতে পারে অর্থাৎ, اَنْبَتَ ও نَبَتَ দুটি থেকে হতে পারে। তৈল প্রথম ক্ষেত্রে تَنْبُتُ টা اَنْبَتَ হতে নিষ্পন্ন হলে بِالدُّهْنِ -এর ب টি অতিরিক্ত হবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তথা نَبَتَ থেকে নিষ্পন্ন হলে بِالدُّهْنِ -এর ب টি تَعْدِيَه -এর জন্য হবে আর তা হলো যায়তুন বৃক্ষ। এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। এটা بِالدُّهْنِ -এর উপর عَطْف হয়েছে অর্থাৎ তরকারি যার মধ্যে খাদ্যগ্রাস ডুবালে তা রঙিন হয়ে যায়, আর তা হলো তৈল।

٢١. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَعِبْرَةً ط عِظَةً تَعْتَبِرُوْنَ بِهَا نُسْقِيْكُمْ بِفَتْحِ النُّوْنِ وَضَمِّهَا مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا اَىِ اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ مِنَ الْاَصْوَافِ وَالْاَوْبَارِ وَالْاَشْعَارِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অনুবাদ :

২১. তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে উট, গরু, বকরিতে শিক্ষাণীয় বিষয় উপদেশ যা দ্বারা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তোমাদেরকে আমি পান করাই نُسْقِيْكُمْ শব্দটির نُوْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয়ই হতে পারে। তাদের উদরে যা আছে তা হতে অর্থাৎ দুধ হতে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা তার পশম, উল, চুল ইত্যাদি হতে। তোমরা তা হতে আহার কর।

٢٢. وَعَلَيْهَا اَىِ الْاِبِلِ وَعَلَى الْفُلْكِ اَىِ السُّفُنِ تُحْمَلُوْنَ ـ

২২. তোমরা তাতে অর্থাৎ উটে এবং নৌযানে নৌকায় জাহাজে আরোহণও করে থাক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَدْ : قَدْ অব্যয়টি تَحْقِيْق তথা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক। অর্থাৎ مَاضِىْ-এর পূর্বে প্রবিষ্ট হলে তা উক্ত ক্রিয়া সংঘটিত হওয়াকে জোরদার করে। এ কারণেই তা অতীতকালকে বর্তমানের নিকটবর্তী করে দেয় এবং আশান্বিত বিষয়কে সাব্যস্ত বা বাস্তবায়িত হওয়া বুঝায়। মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের আশাবাদী ছিল এ কারণে তাদের সুসংবাদকে قَدْ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাদের সে সুসংবাদের বাস্তবায়ন যেহেতু অবশ্যসম্ভাবী এ কারণে مَاضِىْ-এর সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفْلَحَ : এটা فَلَاحٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অভিধানে এর অর্থ হলো উদ্দেশ্যে সফল হওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো فَلَا بَقَاءَ فِى الْخَيْرِ তথা কল্যাণ ও মঙ্গলমতে থাকা।

قَوْلُهُ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ : زكوة শব্দটি তার ধাতুগত অর্থে তথা জাকাত আদায় করা এবং জাকাতের মালকে বলা হয়। এখানে مَعْنٰى مَصْدَرِىْ তথা ধাতুগত অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ ফায়েল হয় مَعْنٰى حَدَثِىْ বা ধাতুগত অর্থের ; مَحَلّ فِعْل বা ক্রিয়া সংঘটিত স্থানের নয়। অর্থাৎ সে সকল মানুষ সফলতা লাভ করে যারা জাকাত আদায় করে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, জাকাত আদায় সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ শব্দ যেমন يُؤْتُوْنَ، اِيْتَاءٌ বা اٰتُوْا না বলে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বললেন কেন?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আরবে এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। উমাইয়া ইবনে সলত -এর উক্তি রয়েছে যে–

اَلْمُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ فِى السَّنَةِ اللَّازِمَةِ وَالْفَاعِلُوْنَ لِلزَّكٰوةِ (رُوْحُ الْبَيَانِ)

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এর দ্বারা আয়াতের শেষাংশের ছন্দ বা গতি ঠিক রাখা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে মূল জাকাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এ সময় মুযাফ উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِتَادِيَةِ الزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ : এ আয়াতের দ্বারা মূতা বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। اَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَالَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ عَادٍ

وَرُوِيَ عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمُ الْقُرْاٰنُ، ثُمَّ قَرَاَءَ الْاٰيَةَ قَالَتْ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللّٰهُ اَوْ مَلَكَهُ يَمِيْنُهُ فَقَدْ عَدَا ـ

قَوْلُهُ اَىْ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَلٰى অব্যয়টি مِنْ অর্থে।

قَوْلُهُ اَوْ مَا مَلَكَتْ : এখানে مَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃতদাসী। مَنْ -এর স্থলে مَا ব্যবহারের উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, মহিলারা হলো نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ তথা কম বুদ্ধিসম্পন্না বিশেষত কৃতদাসী হলে তো কোনো কথাই নেই এ ক্ষেত্রে তারা বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্যের দরুন مَا ব্যবহৃত হয়েছে। مَا مَلَكَتْ শব্দটি যদিও ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে গোলাম ও বাঁদি উভয়কে শামিল করে তবে এখানে শুধু দাসী-বাঁদি উদ্দেশ্য। কেননা মহিলা মনিবদের জন্য তাদের কৃতদাসদের সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়। غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ দ্বারা এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এটাকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া কোনো প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। তবে মানুষের মানবিক চাহিদা নিবারণার্থেই কেবল তাকে বৈধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَالْاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ : ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এ নিকট হস্তমৈথুন হারাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে তা জায়েজ। যথা– ১. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ২. বিবাহের মোহর আদায় করা বিংবা দাসী ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকলে এবং ৩. নিজ হস্ত দ্বারা হস্তমৈথুন করলে অন্য কারো হস্তের দ্বারা নয়। –[জালালাইনের প্রান্তটিকা]

قَوْلُهُ سَرَارِيْ : শব্দটি سُرِّيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো দাসী, বাঁদি। শব্দটি سِرٌّ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো সহবাস করা বা গোপন করা। কেননা অনেক সময় মানুষ ক্রীতদাসের সাথে সহবাস করাকে নিজ স্বাধীন স্ত্রী থেকে গোপন রাখাতে চায়, এ কারণেই একে سُرِّيَّة বলা হয়। অথবা, এটা سُرُوْرٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো সন্তুষ্টি, আনন্দ। যেহেতু মনিব ক্রীতদাসীর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে, এ কারণেই তাকে سُرِّيَّة বলা হয়।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ : এটা اِسْتِثْنَاء -এর আলামত।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ لَا غَيْرُهُمْ : এখানে لَاغَيْرُهُمْ এ বৃদ্ধির দ্বারা বাক্যের আগে পরের অংশ থেকে যে সীমাবদ্ধতা প্রতিভাত হয়, স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। কোনো বাক্য যখন তার পূর্বাপরের অংশ দ্বারা কারো পরিচয় প্রকাশ করে যেমন– উল্লিখিত বাক্যে ঘটেছে তখন তা দ্বারা সীমাবদ্ধতা বুঝা যায়। উপরন্তু উভয় অংশে هُمْ ضَمِيْر -ও সীমাদ্ধতা বা حَصْر বুঝায়। এখানে حَصْر দ্বারা حَصْر اِضَافِيْ তথা তুলনামূলক সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। حَقِيْقِيْ তথা প্রকৃত সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও যেমন শিশু, পাগল ইত্যাদি লোকও বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি حَصْر حَقِيْقِيْ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জান্নাতুল ফেরদাউস -এর দিক দিয়ে হবে। অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউসে কেবল উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রবেশ করবেন। আর অন্যান্য জান্নাতে অন্য বেহেশতী প্রবেশ করবেন।

قَوْلُهُ وَيُنَاسِبُهُ ذِكْرُ الْمَبْدَاِ بَعْدَ : এই ইবারত বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ আয়াত এবং সামনের আয়াতের মাঝে যোগসূত্র বর্ণনা করা।

قَوْلُهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ خَلَقْنَا : এখানে اَللّٰهُ শব্দ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَاوْ টি শপথের জন্য। আর لَقَدْ -এর মধ্যকার لَامْ টি جَوَاب قَسَم -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ جَعَلْنَاهُ اَيِ الْاِنْسَانَ نَسْلَ اٰدَمَ : এখানে ه যমীরটি পূর্বে উল্লিখিত اِنْسَانْ -এর প্রতি ফিরেছে, তবে এর দ্বারা আদম জাতি উদ্দেশ্য। আর اِنْسَانْ দ্বারা আদম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে বাক্যে صَنْعَت اِسْتِخْدَامْ ঘটেছে। আর صَنْعَت اِسْتِخْدَامْ বলা হয় مَرْجِعْ দ্বারা এক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া এবং তার যমীর দ্বারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াকে।

قَوْلُهُ وَاَنْشَانَا شَجَرَةً : এখানে اَنْشَانَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, شَجَرَةً -এর আতফ হলো جَنَّاتٍ -এর উপর।

قَوْلُهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ اَيِ الْمُقَدِّرِيْنَ : এখানে اَلْمُقَدِّرِيْنَ-এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, এ সন্দেহ দূর করা যে, اِسْمِ تَفْضِيْل পরস্পর অংশীদারিত্ব চায়। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সুতরাং এ শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তর দিচ্ছেন যে, خَلْق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার আকৃতি বা দেহ অবয়ব গঠন করা নতুনভাবে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهٖ : যেহেতু خَالِقِيْنَ শব্দটি خَلْقًا তথা সৃষ্টি করার দিক দিয়ে এ অর্থ প্রকাশ করছে, এ কারণে تَمْيِيْز-কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ : এখানে فَوْقَ দ্বারা সাধারণভাবে উপর উদ্দেশ্য। মানুষের মাথার উপর হওয়া উদ্দেশ্য নয়, কেননা যে সময় আসমানসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন মানুষ বিদ্যমান ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমিনুন। মুমিনগণের যে বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মূলত এ সবই হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন সূরা মুমিনুন মক্কায় নাজিল হয়েছে।

নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি ওহী নাজিল হতো, তখন মধু মক্ষিকার আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শ্রুত হতো। একবার এমন অবস্থাই হলো। কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাজিল হলো, তখন প্রিয়নবী ﷺ কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেন।

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْنَا وَارْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে অধিকত পরিমাণে দাও, আমাদেরকে কম দিয়ো না, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, আমাদেরকে নিয়ামত দান কর, বঞ্চিত করো না, অন্যদের উপর আমাদের পছন্দ কর, আমাদের উপর অন্যদের পছন্দ করো না, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দাও!"

এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন "আমার প্রতি দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করলো সে জান্নাতী হয়ে গেল।" এরপর তিনি এই সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ১]

ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে, এবং ইমাম নাসায়ী, ইবনুল মুনজের, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া, বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহান পূতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন! তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কুরআনে কারীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পাঠ কর? এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

ইবনে জারীর তাবারী (র.) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা শুধু তিনটি বস্তু স্বীয় হস্ত মোবারকে সৃষ্টি করেছেন। যথা- ১. আদম (আ.)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। ২. তাওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. জান্নাতে আদন । এরপর জান্নাতকে বলেছেন, তুমি কথা বল, জান্নাত তখন এই সূরার প্রথম আয়াতসমূহ পাঠ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে এ বর্ণনার আংশিক উল্লেখ করেছেন।"

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। ইরশাদ হয়েছে- وَافْعَلُوا الْخَيْرَ; এর শুভ পরিণতি স্বরূপ সাফল্য লাভের সুসংবাদ ছিল। ইরশাদ হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ হয়তো তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর এ আয়াতের শুরুতেই সেই ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জীবন সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০]

قَوْلُهُ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ : শানে নুযূল : হাকেম (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ নামাজের অবস্থায় কখনও আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ আর নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাননি।

ইবনে মরদবিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তাঁরা সিজদার স্থানে নজর করতেন।

ইবনে আবি হাতেম ইবনে সীরীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। −[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৬১]

قَوْلُهُ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ – সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় : فَلَاحٌ [সাফল্য] শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। −[কামূস] এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কোনো কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা, এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জায়েজ কোনো মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গাম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোনো কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের আশংকা এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোনো সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে−

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۔

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এ আয়াতে আরো ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকে কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হলো। কুরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে− قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাথে সাথে আরো ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে− بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক অথচ পরকাল উত্তম ও স্থায়ী; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে দুনিয়াতে এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মুমিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাওয়ার কথা তো বোধগম্য; কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট। আর তা হলো– দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরূপ কষ্টের সম্মুখীন হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেজগার সৎ কর্মপরয়াণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তা-ই; অর্থাৎ মুমিন ও কাফের নির্বিশষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের উপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ : সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা রেখে এখানে অপরাপর সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত গুণগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথম গুণ– নামাজে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ 'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ– স্থিরতা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা। অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না করা। –[বয়ানুল কুরআন] বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাজের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হযরত মুজাহিদ বলেন, দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রা.) বলেন, ডানে বামে ভ্রুক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা (র.) বলেন, দেহের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশূ। হাদীসে হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নামাজের সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাজি অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। –[আহমদ, নাসায়ী আবূ দাউদ, মাযহারী] নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে নির্দেশ দেন, সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে ভ্রুক্ষেপ করো না। –[বায়হাকী, মাযহারী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন– لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشِعَتْ جَوَارِحُهٗ অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত। –[মাযহারী]

নামাজে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর : ইমাম গাযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজে খুশূ ফরজ। সম্পূর্ণ নামাজে খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাজই হবে না। অন্যেরা বলেছেন, খুশূ নিঃসন্দেহে নামাজের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামাজ নিষ্প্রাণ ; কিন্তু একে নামাজের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাজই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরজ।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ নয় ; কিন্তু নামাজ কবুল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ। তাবারানী (র.) 'মু'জামে কবীরে' হযরত আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোনো খুশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। –[বয়ানুল কুরআন]

দ্বিতীয় গুণ– অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ; এখানে لَغْو -এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তর গুনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসার্হ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ, 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ– জাকাত আদায়কারী হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ; زَكٰوة -এর আভিধানিক অর্থ– পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে জাকাত বলা হয়। কুরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নয়। কারণ মক্কায় জাকাত ফরজ হয়নি, মদীনায় হিজরতের পর ফরজ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, জাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে জাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যারা জাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তা-ই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরপরই জাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ স্থানে জাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কুরআন পাকে যেখানে ফরজ জাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে إِيْتَاء - اٰتُوا الزَّكٰوةَ ও يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পরিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এছাড়া فَاعِلُوْنَ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فِعْل [কাজ]-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক জাকাত فِعْل নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ فَاعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে জাকাতের পরিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে জাকাত যে মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ফরজ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে জাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরজই। কেননা শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গুনাহ। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ।

চতুর্থ গুণ– যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরিয়ত সম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণির সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোনো অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অথাৎ যারা শরিয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে; এটাকে জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ : অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরিয়তসম্মত দাসীর সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ হালাল নয়। যেমন জেনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এগুলো সব নিষিদ্ধও হারাম। অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদদের মতে إِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।

–[বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুণ– আমানত প্রত্যর্পণ করা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ 'আমানত' শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে

বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকূকুল ইবাদত তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে, অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত। শরিয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরিউক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝানো যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরিয়তের আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে– اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গুনাহ। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে; কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গুনাহ।

সপ্তম গুণ– নামাজে যত্নবান হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ নামাজে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাজের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামাজ মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। –[রূহুল মা'আনী] এখানে صَلٰوةٌ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেখানে নামাজে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صَلٰوةٌ শব্দটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক নামাজ মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামিল মু'মিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এ সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাজকে নামাজের মতো পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা আপনি নামাজির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ـ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ : উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত। قَدْ اَفْلَحَ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবন-সংগ্রামে সফলকাম, ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির সৃষ্টির

ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে, আর অবশেষে কি হবে তার পরিণতি? এর বিবরণ আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে ও বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবন সাধনায় সফলকাম মুমিনদের জন্যে পরকালীন জিন্দেগীতে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; কিন্তু যারা পরকালীন জিন্দেগীতেই বিশ্বাস করে না, তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের কথা প্রমাণিত হয় এবং কিয়ামতের দিন মানবজাতির পুনরুত্থানের দলিল প্রমাণ প্রকাশিত হয়। আর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং মানুষকে তার জীবনের শুরু এবং শেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এভাবে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে, আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হতে পারে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর বন্দেগীর আদেশ দিয়েছেন। আর একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উপরই মানবজাতির জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করতে পারে। –[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৬৪]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতসমূহের সম্পর্কের বিবরণ এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করা ব্যতীত তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। মূলত এ কারণেই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কিভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার এক বিস্ময়কর ধারাবাহিক বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মানুষ আজ যত ক্ষমতা এবং যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন সে যেন এই সত্য ভুলে না যায় যে, সে মাটির মানুষ, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সন্তানদের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে মাটির উপাদানই। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ -

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ : سُلَالَة অর্থ সারাংশ এবং طِين অর্থ আদ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তাফসীরবিদ আয়াতের এ তাফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

মানবসৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর– سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ অর্থাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় স্তর– বীর্য, তৃতীয় স্তর– জমাট রক্ত, চতুর্থ স্তর– মাংসপিণ্ড, পঞ্চম স্তর– অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ স্তর– অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম স্তর– সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তাফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন, রমজানের কোন তারিখ শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমজানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন

পর্যন্ত পুরাপুরি গজায়নি অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত আছে–

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ; এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ اَبّ জন্তুদের খাদ্য।

এটি কুরআন পাকের ভাষালঙ্কার যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি; বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তর বিবর্তনকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও فَ অব্যায় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই কর্মের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিবর্তন মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়। সেমতে কুরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে ثُمَّ ব্যবহার করে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলেছেন। কেননা মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি হওয়া এবং অস্থির উপর মাংসের প্রলেপ হওয়া– এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে فَ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির কথা সর্বশেষে ثُمَّ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষে কাজ ছিল সেখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে فَ অব্যয় প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

মানবসৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : পবিত্র কুরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে– ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। 'এক বিশেষ ধরনের' বলার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর অন্য জগত অর্থাৎ রূহ জগত তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ : এখানে خَلْقًا اٰخَرَ-এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহহাক ও আবুল আলিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রূহ সঞ্চার দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ বলে জৈব রূহ বোঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সুক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈবদেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ' তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্কে সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহর প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পর স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃত পক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

قَوْلُهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ : خَلْق ও تَخْلِيْق-এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোনো সাবেক নমুনা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহর তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خَالِقٌ [স্রষ্টা] একমাত্র আল্লাহ

তা'আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানব কোনো সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خَلْق ও تَخْلِيْق শব্দ করিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। করিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কুরআন বলেছে تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছে- اِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـئَةِ الطَّيْرِ এসব ক্ষেত্রে خَلْق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে خَالِقِيْنَ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোনো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ : পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ : طَرَائِقَ শব্দটি طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেওয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طَرِيْقَةٌ -এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ হচ্ছে বিধানাবলি নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

قَوْلُهُ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ : এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষেকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-মূল দ্বারা সুখের সর াম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে-

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আজাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জবিন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আজাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়,. যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং বর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থি। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি কোনোরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িক ভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত

হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌঁছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ধূলিবালি এমন কি মানুষ ও জীবজন্তু পৌঁছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফ গলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্গুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্যে অর্থাৎ- وَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ আয়াতাংশে ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছু সংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ : এ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এসব বাগান তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোনো কোনো ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهُ تَاْكُلُوْنَ বাক্যের মর্মার্থ তা-ই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ ; সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ করা ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে- تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ; যয়তুন বৃক্ষের জন্য বিশেষত তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণে এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন। -[মাযহারী]

এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানেয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার আপনার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে- نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا অর্থাৎ এসবের পেটে আমি তোমাদের জন্যপাক সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে : শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক [অগণিত] উপকারিতা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ ; চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয় জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরো একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারের আরো একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিয়ুক্ত কর। এই শেষ উপকারে মধ্যে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরিক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ; উল্লেখ্য যে, চাকার মাধ্যমে চলে এমন সব যানবাহনও নৌকারে হুকুম রাখে।

অনুবাদ :

২৩. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ اَطِيْعُوْهُ وَوَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَهُوَ اِسْمُ مَا وَمَا قَبْلَهُ الْخَبَرُ وَمِنْ زَائِدَةٌ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - تَخَافُوْنَ عُقُوْبَتَهٗ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَهٗ -

২৩. আমি হযরত নূহ (আ.)-কে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর আনুগত্য কর এবং তার একত্ববাদের ঘোষণা প্রদান কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। এটা (اِلٰه) হলো مَا -এর ইসম আর পূর্ববর্তী অংশ হলো খবর। এর مِنْ টি অতিরিক্ত। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তাঁকে ছাড়া অন্যের উপাসনা করার কারণে তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে না।

২৪. فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِاَتْبَاعِهِمْ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ يَتَشَرَّفَ عَلَيْكُمْ ط بِاَنْ يَكُوْنَ مَتْبُوْعًا وَاَنْتُمْ اَتْبَاعَهٗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ اَنْ لَّا يُعْبَدَ غَيْرُهٗ لَاَنْزَلَ مَلٰۤئِكَةً بِذٰلِكَ لَا بَشَرًا مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا الَّذِىْ دَعَا اِلَيْهِ نُوْحٌ مِنَ التَّوْحِيْدِ فِىْۤ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ - اَىِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ -

২৪. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিল, তারা বলল তাদের অনুগত ও অধীনস্থদেরকে এতো তোমাদের মতো একজন মানুষই তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছেন। এভাবে যে, তিনি তোমাদের নেতা হবেন আর তোমরা তার অনুসারী হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না হোক ফেরেশতাই পাঠাতেন এ বাণী নিয়ে; মানুষ নয়। আমরা তো একথা শুনিনি যে একত্ববাদের প্রতি হযরত নূহ (আ.) আহবান করছেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে। অর্থাৎ বিগত উম্মত বা সম্প্রদায় থেকে।

২৫. اِنْ هُوَ مَا نُوْحٌ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ حَالَةُ جُنُوْنٍ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ اِنْتَظِرُوْهُ حَتّٰى حِيْنٍ - اِلٰى زَمَنِ مَوْتِهٖ -

২৫. এ তো এমন ব্যক্তি হযরত নূহ (আ.) যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে উন্মাদ অবস্থা সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

২৬. قَالَ نُوْحٌ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَيْهِمْ بِمَا كَذَّبُوْنِ - اَىْ بِسَبَبِ تَكْذِيْبِهِمْ اِيَّاىَ بِاَنْ تُهْلِكَهُمْ -

২৬. হযরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন তাদের বিপক্ষে কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে অর্থাৎ আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আপনি তাদেরকে বিনাশ করে দিন!

অনুবাদ :

٢٧. قَالَ تَعَالٰى مُجِيْبًا دُعَاءَهُ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِيْنَةَ بِاَعْيُنِنَا بِمَرْأًى مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحْيِنَا ـ اَمْرِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ وَفَارَ التَّنُّوْرُ لِلْخَبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةً لِنُوْحٍ فَاسْلُكْ فِيْهَا اَيْ اَدْخِلْ فِى السَّفِيْنَةِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ذَكَرٍ وَ اُنْثٰى اَيْ مِنْ كُلِّ اَنْوَاعِهَا اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَ اُنْثٰى وَهُوَ مَفْعُوْلٌ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاَسْلُكْ وَفِى الْقِصَّةِ اِنَّ اللّٰهَ حَشَرَ لِنُوْحٍ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِىْ كُلِّ نَوْعٍ فَيَقَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى عَلَى الذَّكَرِ وَالْيُسْرٰى عَلَى الْاُنْثٰى فَيَحْمِلُهُمَا فِى السَّفِيْنَةِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ كُلٍّ بِالتَّنْوِيْنِ فَزَوْجَيْنِ مَفْعُوْلٌ وَاثْنَيْنِ تَاكِيْدٌ لَهُ وَاَهْلَكَ اَيْ زَوْجَتَهُ وَاَوْلَادَهُ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج بِالْاِهْلَاكِ وَهُوَ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كِنْعَانُ بِخِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثٍ فَحَمَلَهُمْ وَزَوْجَاتَهُمْ ثَلٰثَةً وَفِىْ سُوْرَةِ هُوْدٍ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ قِيْلَ كَانُوْا سِتَّةَ رِجَالٍ وَنِسَاؤُهُمْ وَقِيْلَ جَمِيْعُ مَنْ كَانَ فِى السَّفِيْنَةِ ثَمَانِيَةٌ وَّسَبْعُوْنَ نِصْفُهُمْ رِجَالٌ وَنِصْفُهُمْ نِسَاءٌ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِتَرْكِ اَهْلَاكِهِمْ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ـ

২৭. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন– অতঃপর আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম যে, আপনি নৌযান নৌকা, জাহাজ নির্মাণ করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী আমার হিকমত ও নির্দেশ মতে। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে উনুন উথলে উঠবে রান্নাকারীর চুলার পানি, আর এটা ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য তাদের ধ্বংসের নিদর্শন স্বরূপ। তখন উঠিয়ে নাও অর্থাৎ নৌকায় প্রবেশ করাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া অর্থাৎ নর ও মাদীর প্রত্যেক শ্রেণির। এটা অর্থাৎ كُلِّ زَوْجَيْنِ হলো اُسْلُكْ ফে'ল-এর মাফউল। আর مِنْ টি اُسْلُكْ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। এ ঘটনার বিবরণ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর সম্মুখে সকল প্রকার পশু পাখি ইত্যাদি জমা করে দিলেন। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত প্রত্যেক প্রকারের উপর রাখতেন। তখন তার ডান হাত নর প্রাণীর উপর এবং বাম হাত মাদী প্রাণীর উপর পড়ত আর সাথে তিনি তা নৌকায় উঠিয়ে নিতেন। অন্য কেরাতে كُلٍّ শব্দটি তানভীনসহ রয়েছে। তখন زَوْجَيْنِ হবে মাফউল আর اِثْنَيْنِ হবে তার তাকিদ। এবং আপনার পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদিকে। তাদেরকে ছাড়া, তাদের মধ্য হতে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধ্বংসের ব্যাপারে। আর তারা হলো তাঁর স্ত্রী ও ছেলে কেনান। হাম, সাম ও ইয়াফিছ ব্যতিরেকে। হযরন নূহ (আ.) তাদেরকে ও তাদের তিন স্ত্রীকে উঠিয়ে নিলেন। আর সূরা হূদে বর্ণিত রয়েছে যে, এবং যারা ঈমান এনেছে। আর তাঁর উপর অল্প কয়েকজনই ঈমান এনেছিল। বলা হয় যে, তারা ছিলেন ছয়জন পুরুষ ও তাদের স্ত্রীগণ, আরো কথিত রয়েছে যে, নৌযানে সর্বমোট ৭৮ জন লোক ছিল। তাদের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। আর তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, যারা জুলুম করেছে। সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মুক্তির ব্যাপারে। তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

অনুবাদ :

٢٨. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اِعْتَدَلْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰينَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ الْكَافِرِيْنَ وَاِهْلَاكِهِمْ ـ

২৮. যখন আপনি ও আপনার সঙ্গি সাথীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবেন তখন বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন, জালিম সম্প্রদায় হতে। কাফেরদের থেকে ও তাদের ধ্বংস হতে।

٢٩. وَقُلْ عِنْدَ نُزُوْلِكَ مِنَ الْفُلْكِ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِ الزَّايِ مَصْدَرٌ اَوْ اِسْمُ مَكَانٍ وَبِفَتْحِ الْمِيْمِ وَكَسْرِ الزَّايِ مَكَانُ النُّزُوْلِ مُّبٰرَكًا ذٰلِكَ الْاِنْزَالُ اَوِ الْمَكَانُ وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ مَا ذُكِرَ ـ

২৯. আপনি বলুন নৌযান হতে অবতরণের সময় হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান مُنْزَلًا শব্দটি مِيْم বর্ণে পেশ এবং زَاء বর্ণে যবর এটা মাসদার অথবা اِسْم ظَرْف مَكَانْ হবে। এবং مِيْم বর্ণে যবর ও زَاء বর্ণে যের উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ– অবতরণস্থল। যা হবে কল্যাণকর উক্ত অবতরণ বা অবতরণস্থলে। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। যা উল্লিখিত হলো।

٣٠. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنْ اَمْرِ نُوْحٍ وَالسَّفِيْنَةِ وَاِهْلَاكِ الْكُفَّارِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَّاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا ضَمِيْرُ الشَّاْنِ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ـ مُخْتَبِرِيْنَ قَوْمَ نُوْحٍ بِاِرْسَالِهِ اِلَيْهِمْ وَوَعْظِهِ ـ

৩০. এতে অবশ্যই রয়েছে হযরত নূহ (আ.), নৌকা এবং কাফেরদের ধ্বংসের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হলো নিদর্শন আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রমাণবহ। اِنْ অব্যয়টি مُثَقَّلَة হতে مُخَفَّفَة তার ইসিম হলো ضَمِيْرُ الشَّاْنِ যা উহ্য রয়েছে। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁকে প্রেরণ করে এবং তাঁর উপদেশের মাধ্যমে।

٣١. ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ هُمْ عَادٌ ـ

৩১. অতঃপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম তারা হলো আদ জাতি।

٣٢. فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ هُوْدًا اَنْ اَىْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ عِقَابَهٗ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

৩২. এবং আমি তাদের একজনকে তাদের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম অর্থাৎ হযরত হূদ (আ.)-কে। আর এখানে اَنْ অব্যয়টি بِاَنْ অর্থে হয়েছে। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না তাঁর শাস্তিকে। ফলে তোমরা ঈমান আনবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا : আল্লাহ তা'আলা এখান থেকে পাঁচটি ঘটনার বর্ণনা শুরু করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে মোট ছয়টি ঘটনা রয়েছে। এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যাতে পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় বিষয়াদিতে তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের কুকীর্তি সম্পর্কে বিরত থাকে। উপরন্তু এসব ঘটনায় রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সাথে আপনার আপনার কওমের পক্ষ থেকে যে সকল পরিস্থিতি সামনে আসছে তা পূর্বের নবীদের সম্মুখেও পেশ এসেছিল। অতএব আপনি তাদের এসব কাজকর্মে দুঃখিত হবেন না। এখানে যে পাঁচটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো ১. হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা। ২. হযরত হুদ (আ.)-এর ঘটনা। ৩. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা। ৪. হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এ ঘটনা। ৫. হযরত ঈসা এবং তাঁর জননীর ঘটনা।

নূহ হলো উপাধি, তার নাম ছিল আব্দুল গাফফার অথবা আব্দুল্লাহ। কেউ কেউ ইয়াশকারও বলেছন। তিনি এক হাজার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ৪০ বছর বয়সে তাঁকে নবুয়তে দান করা হয় এবং সাড়ে নয়শত বছর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। প্লাবনের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর সর্বমোট হায়াত বা জীবনকাল হচ্ছে- ১ হাজার ৫০ বছর হয়।

قَوْلُهُ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ : এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ইল্লত বা কারণের পর্যায়ে।

قَوْلُهُ هُوَ اِسْمُ مَا : মুফাসসির (র.) এখান থেকে مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -এর তারকীব বর্ণনা করছেন। اِلٰهٍ হলো مَا -এর اِسْم مُؤَخَّرْ আর لَكُمْ হলো كَائِنًا -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে مَا -এর خَبَرْ ; غَيْرُهٗ -এর উপর رَفْع -ও হতে পারে। এ সময় اِلٰهٍ -এর مَحَلّ -এর অনুগামী হবে। আবার جَرّ হতে পারে। এ সময় اِلٰهٍ -এর শব্দের অনুগামী হবে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি مَا قَبْلَهٗ দ্বারা لَكُمْ উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশের মতে, এ তারকীবটি দুর্বল। কারণ مَا হলো দুর্বল আমিল। কেননা এর اِسْم ও خَبَرْ এর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করলে এটা আমল করে না। অতএব اِلٰهٍ -কে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এবং لَكُمْ -কে خَبَر مُقَدَّمْ স্থির করা উচিত ছিল।

قَوْلُهُ اَنْ لَّا يُعْبَدَ غَيْرُهٗ : এ ইবারত উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَشِيْئَة -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بِذٰلِكَ لَا بَشَرًا : بِذٰلِكَ -এর সম্বন্ধ হলো اَنْزَلَ -এর সাথে। আর ذٰلِكَ এ দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত না করার নির্দেশ বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ : এর মধ্যে اَنْ হলো تَفْسِيْرِيَّة তথা বিবরণমূলক। কেননা এর পূর্বে اَوْحَيْنَا রয়েছে এটা قَوْل -এর অর্থ সম্বলিত।

قَوْلُهُ بِاَعْيُنِنَا : এটা اِصْنَعْ -এর خَبَرْ থেকে حَالْ আর عَيْن -কে مُبَالَغَة স্বরূপ বহুবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَرْأًى مِنَّا وَحِفْظِنَا : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতে مَجَاز مُرْسَلْ ঘটেছে। কেননা চোখে দেখার জন্য তা সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অতএব مَلْزُوْم বলে لَازِمْ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفَارَ التَّنُّوْرُ : এটা جَاءَ اَمْرُنَا -এর عَطْف بَيَانْ আর চুলা থেকে পানি উথলে উঠা আজাবের আলামত স্বরূপ ছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-কে আলামতস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, যখন চুলা থেকে পানি উথলে উঠবে তখন বুঝতে হবে, আজাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ زَوْجَتَهُ : এখানে স্ত্রী ও সন্তানাদি দ্বারা যারা ঈমান এনেছিলেন তারা উদ্দেশ্য। হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী ছিল দুই জন। একজন ঈমানদার, তাকে কিস্তিতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর অপর স্ত্রী ছিল কাফের। সে নিজ পুত্র কেনানের সাথে কিস্তিতে আরোহণ করেনি। এ স্ত্রীর নাম ছিল ওয়াগিলা। হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে ছিল মোট চারজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল কাফের, তার নাম ছিল কিনআন। সে তার পিতার সাথে কিস্তিতে আরোহণ করেনি। অপর তিন পুত্র ছিলেন মুমিন বা ঈমানদার, তাদের নাম হচ্ছে সাম, হাম ও ইয়াফিজ। সাম ছিলেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হাম ছিলেন সুদানীদের পূর্বপুরুষ, আর ইয়াফিস ছিলেন তুর্কীদের পূর্বপুরুষ।

قَوْلُهُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ : এটা اذا -এর জবাব। বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, فَقُلْ -এর স্থলে فَقُولُوْا বললে তা ভালো হতো, যাতে অবতরণকালে সকল মানুষ দোয়ায় শরিক থাকত। তবে তাঁর দোয়া যেহেতু সবার দোয়ার স্থলাভিষিক্ত ছিল, এ কারণে তখন শুধু তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের অনেক দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে আক্লান্ত সাধনা করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত পূববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের কুদরতে ও রহমতে নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাক। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা হযরতু নূহ (আ.)-এর যুগ থেকেই নৌকা নির্মাণের শিল্প আরম্ভ হয়। এরপর অন্যান্য নবীগণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, নবী রাসূলগণ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানুষকে এই তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। যারা এই আহবানে সাড়া দেওয়ার স্থলে আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত এই সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা ঈমান এবং ইয়াকীনের দিকে মানব মনকে আকৃষ্ট করে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে অবাধ্য কাফেদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নাফরমান জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ وَفَارَ التَّنُّوْرُ : تَنُّوْر চুল্লিকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদে এবং কারো কারো মতে সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের আলামত নির্ধারণ করা হয়েছিল। -[মাযহারী]

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আ.), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটি নৌযান নির্মাণ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে হযরত নূহ (আ.) নির্মিত নৌযানটি সম্পর্কে কিছু আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যথা-

১. হযরত নূহ (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করছেন। আর শোকরগুজারীর যে ভাষা হবে তাও আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।

২. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই দোয়া কর– وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমি উত্তম অবতারণকারী।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, নৌযানে বরকতময় অবতরণের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে দুশমনদের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। আর জমিনে বরকতের সাথে অবতরণের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক নিমজ্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধর রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাদেরকে অধিক পরিমাণে রিজিক বৃদ্ধি করেছেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন।

এ দোয়া করার হুকুম হয়েছে একমাত্র হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি, তাঁর নিজের জন্য ও সাথীদের জন্য। এরূপ করার কারণ হলো– ১. এর দ্বারা হযরত নূহ (আ)-এ মাহাত্ম্যের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। ২. এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হযরত নূহ (আ.)-এর দোয়াই তাঁর সাথীদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দোয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ : পূর্বেকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীরকারগণ বলেন, লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয় এসব আয়াতে আদ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গাম্বর ছিলেন হযরত সালেহ (আ.)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صَيْحَة অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচিৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِيْنَ বলে সামূদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَة শব্দের অর্থ আজাব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

অনুবাদ :

٣٣. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ اَىْ بِالْمَصِيْرِ إِلَيْهَا وَأَتْرَفْنٰهُمْ اَنْعَمْنَا هم فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ـ

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরি করেছিল ও অস্বীকার করেছিল আখিরাতের সাক্ষাৎ করাকে অর্থাৎ, পরকালে প্রত্যাবর্তনকে। এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার তারা বলছিল, এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা আহার কর, সে তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে।

٣٤. وَاللّٰهِ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ فِيْهِ قَسَمٌ وَشَرْطٌ وَالْجَوَابُ لِأَوَّلِهِمَا وَهُوَ مُغْنٍ عَنْ جَوَابِ الثَّانِىْ إِنَّكُمْ إِذًا اَىْ إِنْ اَطَعْتُمُوْهُ لَّخٰسِرُوْنَ ـ اَىْ مَغْبُوْنُوْنَ ـ

৩৪. যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের আনুগত্য কর এখানে لَئِنْ -এ قَسَم ও شَرْط রয়েছে। আর এ দুটির প্রথমটি তথা قَسَم -এর جَوَابْ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ جَوَاب টি شَرْط -এর جَوَاب قَسَم উল্লেখের প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে দিয়েছে। তবে তোমরা অর্থাৎ যদি তোমরা তার আনুগত্য কর অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ প্রতারিত হবে। [...إِنَّكُمْ إِذًا হলো جَوَاب قَسَم]

٣٥. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ـ هُوَ خَبَرُ اَنَّكُمُ الْأُوْلٰى وَاَنَّكُمُ الثَّانِيَةُ تَاكِيْدٌ لَهَا لِمَا طَالَ الْفَصْلُ ـ

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ হলো প্রথম اَنَّكُمْ তথা اَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ -এর خَبَرْ আর দ্বিতীয় اَنَّكُمْ হলো প্রথম اَنَّكُمْ -এর তাকিদ। মাঝে ব্যবধান বেশি থাকায় তা উল্লিখিত হয়েছে।

٣٦. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اِسْمُ فِعْلٍ مَاضٍ بِمَعْنٰى مَصْدَرٍ اَىْ بَعُدَ بَعُدَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ـ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُوْرِ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْبَيَانِ ـ

৩৬. একেবারেই অসম্ভব এটা اِسْمُ فِعْلٍ مَاضٍ অতীতকালীন ক্রিয়াজ্ঞাপক ইসমে মাসদার তথা بَعُدَ بَعُدَ অর্থে তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার কবর হতে বের করা সম্পর্কে। আর لِمَا -এর لَامْ টি অতিরিক্ত بَيَانْ -এর জন্য এসেছে।

٣٧. إِنْ هِىَ اَىْ مَا الْحَيٰوةُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا بِحَيٰوةِ اَبْنَائِنَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ـ

৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি আমাদের সন্তানাদি বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্থিত হবো না।

٣٨. إِنْ هُوَ اَىْ مَا الرَّسُوْلُ إِلَّا رَجُلٌ نِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ اَىْ مُصَدِّقِيْنَ فِى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

৩৮. সে অর্থাৎ রাসূল এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই। অর্থাৎ সত্যায়নকারী নই মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে।

অনুবাদ :

٣٩. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ .

৩৯. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

٤٠. قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ وَمَا زَائِدَةٌ لَيُصْبِحُنَّ لَيَصِيْرُنَّ نٰدِمِيْنَ ج عَلٰى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيْبِهِمْ .

৪০. আল্লাহ বললেন, অচিরেই সামান্য সময় পরেই এবং مَا হলো অতিরিক্ত তারা অনুতপ্ত হবে। এখানে لَيُصْبِحُنَّ টা لَيَصِيْرُنَّ অর্থে হয়েছে। তাদের অস্বীকার করার কারণে ও মিথ্যাবাদী বলার কারণে।

٤١. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ الْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ كَائِنَةً بِالْحَقِّ فَمَاتُوْا فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاۤءً ط وَهُوَ نَبْتٌ يَبِسَ اَىْ صَيَّرْنَاهُمْ مِثْلَهُ فِى الْيُبْسِ فَبُعْدًا مِنَ الرَّحْمَةِ لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ . الْمُكَذِّبِيْنَ .

৪১. অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। আজাব ও ধ্বংসের প্রকট শব্দ, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করল। এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। غُثَاۤءً হলো শুষ্ক তৃণলতা, খড়কুটা। অর্থাৎ আমি তাদেরকে শুষ্ক খড়কুটার ন্যায় কর দিলাম। সুতরাং দূর হোক রহমত হতে। ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সম্প্রদায়।

٤٢. ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اَىْ اَقْوَامًا اٰخَرِيْنَ .

৪২. অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।

٤٣. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا بِاَنْ تَمُوْتَ قَبْلَهُ وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ . عَنْهُ ذُكِّرَ الضَّمِيْرُ بَعْدَ تَانِيْثِهِ رِعَايَةً لِلْمَعْنٰى .

৪৩. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না যে এর পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করবে। বিলম্বিত ও করতে পারে না তার থেকে। مُؤَنَّثٌ -এর মধ্য مُذَكَّرٌ নেওয়ার পর يَسْتَاْخِرُوْنَ -এর যমীর আনা হয়েছে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে।

٤٤. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ط بِالتَّنْوِيْنِ وَعَدَمِهِ اَىْ مُتَتَابِعِيْنَ بَيْنَ كُلِّ اِثْنَيْنِ زَمَانٌ طَوِيْلٌ كُلَّمَا جَاۤءَ اُمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَاوِ رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِى الْهَلَاكِ وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ج فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ .

৪৪. অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করছি। تَتْرَا শব্দটি তানভীনসহ ও তানভীন ছাড়া উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে অনবরত। যদিও দু'জনের মাঝে দীর্ঘকালের ব্যবধানও ছিল। যখনই কোনো জাতির নিকট এসেছে এখানে উভয় হামযাকে ঠিক রেখে এবং দ্বিতীয় হামযা ও ওয়াও -এর মাঝামাঝি সহজ করে পাঠ রীতি রয়েছে। তার রাসূল তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।

অনুবাদ :

٤٥. ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ لا بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ـ حُجَّةٍ بَيِّنَةٍ وَهِيَ الْيَدُ وَالْعَصَا وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْاٰيَاتِ ـ

৪৫. অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.)-কে পাঠালাম। প্রকাশ্য দলিলসহ। তা হলো হাত শুভ্র হওয়া, লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া ইত্যাদি নিদর্শনাবলি।

٤٦. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَبِاللّٰهِ وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ـ قَاهِرِيْنَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ بِالظُّلْمِ ـ

৪৬. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করল। তার ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারের স্ট্রীমরোলার পরিচালনাকারী।

٤٧. فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ـ مُطِيْعُوْنَ خَاضِعُوْنَ ـ

৪৭. তারা বলল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মতো এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে অনুগত ও নত।

٤٨. فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ـ

৪৮. অতঃপর তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

٤٩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ لَعَلَّهُمْ اَيْ قَوْمَهُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ يَهْتَدُوْنَ ـ بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اُوْتِيَهَا بَعْدَ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ جُمْلَةً وَاحِدَةً ـ

৪৯. আমি হযরত মূসা (আ.)-কে কিতাব দিয়েছিলাম। তাওরাত। যাতে তারা অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলগণ। সৎপথ পায় এর মাধ্যমে ভ্রষ্টতা থেকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় বিনাশ হওয়ার পর হযরত মূসা (আ.)-কে একই সাথে পূর্ণ তাওরাত কিতাব দান করা হয়েছিল।

٥٠. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عِيْسٰى وَاُمَّهٗ اٰيَةً لَمْ يَقُلْ اٰيَتَيْنِ لِاَنَّ الْاٰيَةَ فِيْهِمَا وَاحِدَةٌ وِلَادَتُهٗ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وَهُوَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ اَوْ دِمَشْقُ اَوْ فِلَسْطِيْنُ اَقْوَالٌ ذَاتِ قَرَارٍ اَيْ مُسْتَوِيَةٍ لِيَسْتَقِرَّ عَلَيْهَا سَاكِنُوْهَا وَّمَعِيْنٍ ـ اَيْ مَاءٍ جَارٍ ظَاهِرٍ تَرَاهُ الْعُيُوْنُ ـ

৫০. এবং আমি মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এখানে اٰيَتَيْنِ তথা দুটি নিদর্শন বলেননি। কেননা তাদের উভয়ের মধ্যে নিদর্শন একটিই ছিল। আর তা হলো পুরুষবিহীন তার জন্মগ্রহণ। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উচ্চ ভূমিতে رَبْوَةٍ অর্থ– উচ্চ ভূমি। আর তা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা দামেশক কিংবা ফিলিস্তীন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিরাপদ অর্থাৎ সমতল যার উপর বসবাসকারীরা স্থিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। এবং প্রস্রবণ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রবহমান পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি যা আঁখি দ্বারা অবলোকন করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَلَأُ : اَلْمَلَأُ এটা اِسْم جَمْع -اَلْأَمْلَاءُ হলো বহুবচন, এর অর্থ হলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

قَوْلُهُ وَاللّٰهِ لَئِنْ اَطَعْتُمْ : এখানে শপথ এবং শর্ত একত্র হয়েছে। যখন এ দুটি একত্র হয় তখন প্রথমটির জবাব আনা হয়। আর দ্বিতীয়টির জবাবকে প্রথমটির উপর অনুমান করে বিলোপ করা হয়। اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ এটা হলো جَوَاب قَسَم ; শর্তের জবাব নয়। কেননা এখানে اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ হলো جُمْلَه اِسْمِيَّة যদি শর্তের জবাব হতো তাহলে এর উপর। فَا প্রবিষ্ট হওয়া জরুরি ছিল। অথচ এখানে তা উল্লিখিত হয়নি।

قَوْلُهُ اِنَّكُمْ اِذًا : অর্থাৎ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُ لَخٰسِرُوْنَ এখানে كُمْ হলো اِنَّ-এর اِسْم আর خَاسِرُوْنَ হলো এর خَبَر ; لَامْ جُمْلَه اِبْتِدَائِيَّة আর اِذًا হলো اِنَّ-এর اِسْم এবং তার খবরের মাঝে শর্তের বিষয়বস্তুর জন্য তাকীদ। اِذًا-এর তানভীনটি লুপ্ত اَىْ اِنْ شَرْطِيَّة-এর পরিবর্তে এসেছে। যেমন- يَوْمَئِذٍ-এর মধ্যে হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার (র.) এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য اَطَعْتُمُوْهُ বৃদ্ধি করেছেন। এ সময় এর জবাবের প্রয়োজন হয় না। কেননা এ সময় পূর্বের কথার শব্দের তাকিদস্বরূপ উল্লিখিত হয় আর কোনো বস্তুকে পুনরুল্লেখ করা তার সম অর্থের পর্যায়ে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ اَيَعِدُكُمْ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة; পূর্বের বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مُخْرَجُوْنَ : এটা প্রথম اِنَّ-এর خَبَرْ আর مِتُّمْ اِذَا হলো مُخْرَجُوْنَ-এর ظَرْف এটা اِنَّكُمْ-এর মা'মূল নয়। কেননা এটা পূর্বের اِنَّكُمْ-এর تَاكِيْد لَفْظِىْ

قَوْلُهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ : এটা اِسْم فِعْل অতীতকালীন অর্থে। এ শব্দটি অধিকাংশ সময় বিলুপ্তসহ ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির তাকীদের জন্য দ্বিতীয়টি উল্লিখিত হয়। যেহেতু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা অতীতকালীন অর্থে নাকি মাসদার? এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) بَعُدَ-এর উপর দু'রাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : هَيْهَاتَ-কে اِسْم فِعْل বলা হয় কেন? এতে তো পরস্পর সংঘর্ষিক দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ মনে হয়। কেননা اِسْم এবং فِعْل ভিন্ন ভিন্ন দুটি শব্দ।

উত্তর : যেহেতু এটা শাব্দিকভাবে اِسْم , এ কারণেই তো এর গর্দান বা রূপান্তর হয় না। আর অর্থের দিক দিয়ে এটা فِعْل , কারণ এর মধ্যে কাল পাওয়া যায়। উভয়দিকে লক্ষ্য করে এ নাম রাখা হয়েছে। আবার যেহেতু এটা মাসদার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) اِسْم فِعْل مَاضِىْ বলে প্রথম অর্থের দুদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর بِمَعْنٰى مَصْدَرْ বলে দ্বিতীয় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ উভয় অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য بَعُدَ-এর উপর দু ই'রাব লাগিয়েছেন।

সার সংক্ষেপ : هَيْهَاتَ শব্দটি اِسْم فِعْل, এটা بَعُدَ অর্থে। এ فِعْل-এর মধ্যে দুটি ধরন হতে পারে- ১. এর فَاعِلْ হলো তার উহ্য যমীর। বাক্যটি এরূপ হবে- بَعُدَ التَّصْدِيْقِ اَوِ الصِّحَّةِ اَوِ الْوُقُوْعِ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ইত্যাদি। ২. এর فَاعِلْ হলো مَا আর لَامْ অতিরিক্ত। এটা দূরবর্তীজ্ঞাপক। যেন বলা হয়েছে- এ দূরত্ব কিসের? এর উত্তর দেওয়া হয়েছে- لِمَا تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ তোমাকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুত দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পুনরুত্থান। কেউ কেউ বলেন, هَيْهَاتَ হলো اَلْبُعْدُ মাসদার অর্থে মুবতাদা, আর لِمَا تُوْعَدُوْنَ হলো خَبَرْ, কেউ কেউ এটাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। প্রথম ক্ষেত্রে هَيْهَاتَ-এর কোনো مَحَلِّ اِعْرَابْ থাকবে না।

قَوْلُهُ مِنَ الْاِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُوْرِ : مَا تُوْعَدُوْنَ-এর মধ্যকার مَا হলো বিবরণমূলক।

قَوْلُهُ بِحَيَاتِ اَبْنَائِنَا : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, نَمُوْتُ وَنَحْيَا তথা আমরা মৃত্যুবরণ করব ও জীবিত হবো বলা তো পুনরুত্থানকে স্বীকার করার শামিল। অথচ তারা তো পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) يَحْيَاتِ اَبْنَائِنَا বলে এর উত্তর দিয়েছেন যে, মুশরিকদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখন আমরা মরে যাই, তখন আমাদের সন্তানাদি জীবিত থাকে। এছাড়া মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, আয়াতে বিষয়বস্তু বর্ণনায় অগ্র পশ্চাত ঘটেছে। অর্থাৎ نَحْيَا وَنَمُوْتُ ছিল।

قَوْلُهُ عَمَّا قَلِيْلٍ : কারো কারো মতে مَا অতিরিক্ত। অর্থাৎ عَنْ قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ সামান্য সময়ে। কেউ বলেন, مَا অর্থ شَيْئٌ অথবা زَمَانٌ অর্থাৎ- عَنْ شَيْئٍ قَلِيْلٍ اَوْ عَنْ زَمَانٍ قَلِيْلٍ এখানে عَمَّا কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে- ১. لَيُصْبِحُنَّ -এর সাথে ২. نَادِمِيْنَ -এর সাথে ৩. উহ্য শব্দের সাথে। অর্থাৎ- عَمَّا قَلِيْلٍ نَنْصُرُهُ مَا قَبْلَ , অর্থাৎ اُنْصُرْنِيْ -এর দলিলের ভিত্তিতে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ صَيْحَةُ الْعَذَابِ : এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّة হয়েছে। অর্থাৎ, صَيْحَةُ الْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ - صَيْحَة দ্বারা আজান উদ্দেশ্য। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর চিৎকার উদ্দেশ্য নয়। কেননা আ'দ জাতি জিবরাঈল (আ.)-এর চিৎকারে ধ্বংস হয়নি।

قَوْلُهُ كَائِنَةً : ব্যাখ্যাকার এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِالْحَقِّ এটা كَائِنَةً -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে صَيْحَةً -এর حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ كَبُعْدًا : এর فِعْل -কে বিলোপ করে মাসদারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এর فِعْل -কে বিলোপ করা জরুরি। মূলত فَبَعُدُوْا بُعْدًا এটা মুশরিকদের জন্য বদদোয়ার স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ ذُكِرَ الضَّمِيْرُ الخ : অর্থাৎ, يَسْتَأْخِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে। অথচ اَجَلَهَا -এর মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর : هَا যমীরটি اُمَّةٍ -এর প্রতি ফিরেছে, আর اُمَّةٍ দ্বারা قَوْم উদ্দেশ্য। আর এ শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ কারণেই يَسْتَأْخِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَتْرًا : এটা বিলুপ্ত মাসদার থেকে حَالٌ বা صِفَتْ অর্থাৎ اِرْسَالًا تَتْرًا ছিল। تَتْرًا মূলত وَاتِرًا ছিল। وَاوْ -কে ت দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে, এটাকে مُتَابَعَتٌ مَعَ الْمُهْلَتِ বলা হয়।

قَوْلُهُ اَحَادِيْثَ : এটা اُحْدُوْثَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো مَا يَتَحَدَّثُهُ النَّاسُ অর্থাৎ সে সকল কাহিনী যা মানুষ সময় কাটানোর জন্য বা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে বলে থাকে।

قَوْلُهُ مِنْ اُمَّتِهِ : এখানে مِنْ এটা فَاعِلْ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে। اُمَّة হলো تَسْبِقُ -এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ : প্রথম ধরন হলো, উভয় হামযাকে স্ব অবস্থায় বহাল রেখে পড়বে। দ্বিতীয় ধরণ হলো প্রথম হামযাকে ঠিক রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে সহজ করে পড়বে। অর্থাৎ হামযা এবং وَاوْ -এর মাঝামাঝি পড়বে।

قَوْلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً : এর সম্বন্ধ হলো اُوْتِيْهَا -এর সাথে। এ সময় অর্থ হবে ফেরাউনের ধ্বংসের পরে তাওরাত একই বার প্রদান করা হয়েছে। আবার এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা ফেরাউনের ধ্বংস এবং তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সময় উদ্দেশ্য হবে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর তাওরাত দান করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির সলিল সমাধির পর আল্লাহ পাক অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এর দ্বারা কোনো জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল আদ জাতি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২৩, পৃ. ১৭]

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল সামূদ জাতি। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেন। আদ জাতি হলে হযরত হুদ (আ.) এবং সামূদ জাতি হলে হযরত সালেহ (আ.) তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার ও তাঁর বন্দেগী করার আহবান জানান; কিন্তু তারা আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃত জানায়। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির ধ্বংস দেখেও তারা কোনো প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সকল সঠিক পথে আসার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়নি; বরং তারা আল্লাহ পাকের নাফরমান হয়েছে, তাঁর প্রেরিত নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, এবং তাদের নেতারা অন্যায়, অসুন্দর ও ভিত্তিহীন কথা বলেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا الخ

অর্থাৎ তাঁর জাতির যে প্রধানরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে এবং আখিরাতে হাজির হওয়াকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দান করেছিলাম অনেক ভোগ সম্পদ, তারা বলেছিল, এ-তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তা-ই পান করে।

অতএব, তার এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যার কারণে আমরা তার কথা মেনে চলবো। ঐ পথভ্রষ্ট জাতির প্রধানরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলে, তারা একথাও বলে যে, যদি এ কথা তোমরা মেনে চল তবে তোমরা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, তোমরা হবে অপমানিত। অতএব, অযথা কেন অপমানিত হবে, অকারণে কেন নিজেদের অপমান ডেকে আনবে?

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তারা ছিল অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ। কেননা তারা তাদের ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়নি এবং এ কাজকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করেছে। অথচ প্রাণহীন পাথরকে পূজা করতে অথবা হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করতে অপমানিত বোধ করেনি। ঐ ভাগ্যহত জাতির প্রধানরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করতো। এরপর যে আরো একটি জীবন আসবে এবং সে জীবনে বর্তমান জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে– একথা তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি হত না। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ

অর্থাৎ সে কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে?

আল্লাহর নবী আখিরাতের তথা চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা বলতেন; কিন্তু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো, মরণের পর পচে গেলে যখন অস্থি চূর্ণ হয়ে যাবে মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে, তার পরে আবার জীবিত হবে– একথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি!

قَوْلُهُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ : পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোনো পুনরুজ্জীবন নেই– কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বক্তব্য এটাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো প্রকাশ্য কাফেরই; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোনো সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন!

قَوْلُهُ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত সালেহ (আ.) হযরত লূত (আ.) ও হযরত শুয়াইব (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আদ জাতি বা সামূদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে আরো অনেক জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ যথাসময়ে ধ্বংস হয়েছে।

আর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, সে জাতি সে নির্দিষ্ট সময়েই ধ্বংস হয়েছে, এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি এবং তাদের ধ্বংসকে কেউ ঠেকিয়ে রাখাতে পারেনি।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন- تَتْرًا শব্দটি মূলত وَتْرًا ছিল। আর تَوَاتُرٌ বলা হয় কোনো বস্তুর একের পর এক আসা তথা অনবরত আসাকে। হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে- لَا بَأْسَ بِقَضَاءٍ تَتْرًا

অর্থাৎ, রমজানের যেসব রোজা কাযা হয়েছে, সেগুলো বিভিন্নভাবে আদায় করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর এজন্যেই خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ সেই হাদীসকে বলা হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, যাদের কোনো অসত্যের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়।

تَتْرًا শব্দটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণের পর ثُمَّ اَرْسَلْنَا আয়াতের অর্থ হবে, এরপর আমি একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করি। এরপর আমি অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন নবী সৃষ্টি করি। -[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ১৮৮-৮৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ এ কথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাক একদিকে বিভিন্ন জাতির হেদায়েতের জন্য নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকেন অন্যদিকে সে জাতির পাপিষ্ঠ লোকেরা আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে থাকে। এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা কোপগ্রস্ত হতে থাকে। তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করা হয় যে, পৃথিবীতে তাদের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকেনি। তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, গল্প কাহিনীর উপাখ্যানে। তাদের পরবর্তী লোকদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ঐ কিচ্ছা কাহিনীগুলোই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ - بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ : এরপর ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তদানীন্তনকালে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আত্মগরিমা এবং অহংকারে এমনভাবে মেতে উঠেছিল যে, ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে ফেলেছিল এবং অহংকারের কারণে আল্লাহর নবীকে আমলে নিতে রাজি হয়নি।

আলোচ্য আয়াতের سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ শব্দটির অর্থ হলো সুস্পষ্ট দলিল, এমন দলিল যা প্রতিপক্ষকে নিশ্চুপ করে দেয়। অথবা سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক লাঠিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা ঐ লাঠিটি তাঁর সর্বপ্রথম মুজেযা। এজন্যেই তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে, আর এজন্যে যে, ঐ লাঠি দ্বারা বিভিন্ন সময় একাধিক মুজেযা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঐ লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হতো। যাদুকররা রশি দ্বারা যে সাফ বানিয়ে ছেড়েছিল, ঐ লাঠিটি অজগর সর্পের আকৃতি ধারণ করে যাদুকরদের ছেড়ে দেওয়া সাফগুলোকে গিলে ফেলেছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতেই আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে একটি ছোট পাথর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছিল, যার পানি ছয় লক্ষ বনী ইসরাঈলের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর কাফেলা যেখানে বিশ্রামরত হতো, এ লাঠি চারিদিকে প্রদক্ষিণ কর তাদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতো। আর ঐ লাঠিটি অন্ধকার রাত্রে প্রদীপের কাজ করতো। আর ঐ লাঠিটি এক সময় ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। আর ঐ লাঠিটি কূপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্যে রাশি ও বালতির কাজও করেছে। এ সবই ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা। আর মুজেযা হলো নবীর নবুয়তের দলিল। আর কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের اٰيَاتٌ শব্দটির অর্থ বলেছেন, মুজেযা নয়'; বরং বিধান । অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে তাঁর বিধান ও মুজিযাসহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুরাত্মা কাফেররা ঈমান আনেনি। কেননা তারা ছিল অহংকারী। ইরশাদ হচ্ছে- فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ

"কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক সম্প্রদায়।" তাদের এই অহংকারের কারণেই তারা সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হলো। তাদের অহংকার ও আত্মগরিমা সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

قَوْلُهُ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ : ঐ পাপিষ্ঠ দাম্ভিক লোকেরা বলল, যারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, যাদের স্বজাতি আমাদের পদানত গোলাম, আমরা কি এমন দুটি লোকের কথা মেনে চলবো? তা কখনো সম্ভব নয়। ফেরাউন ও তার দলবলের এই অহংকারই মূলত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ : ফেরাউন এবং তার দলবলের ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করেন, যাতে বনী ইসরাঈল জাতি তাওরাত মোতাবেক জীবন যাপন করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে তারাই আখিরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যই তওরাত অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ اٰيَةً : পিতা ব্যতীত হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম নিঃসন্দেহে একটি নিদর্শন। কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতীত গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব এসব বিস্ময়কর নিদর্শন। এসব কিছু মানুষের কাছে বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট কোনো কিছুই কঠিন নয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা– তাই করেন, তাঁর কুদরত হিকমতের কোনো সীমা নেই, তাই বিশ্ববাসীর জন্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম একটি নিদর্শন, হযরত মারইয়াম (আ.)-ও আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন।

قَوْلُهُ وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ : ربوة শব্দটির অর্থ হলো উচ্চস্থান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, এটি ছিল দামেশক। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) এবং মোকাতেল (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল দামেশক শহরের উপকণ্ঠে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেছেন, رَبْوَةٍ দ্বারা রমলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আতা (রা.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এ স্থানটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। আর কাতাদা (র.) এবং কা'আব (র.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, এটি ছিল মিশর। কেননা ইহুদি রাজা হিরুদোস যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ইচ্ছা করে তখন হযরত মারইয়াম (আ.) ঈসা (আ.)-কে নিয়ে মিশর চলে যান। আর সুদ্দী (রা.) বলেছেন, এটি ছিল ফিলিস্তীন। –[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ১৯১-৯২]

সম্ভবত এটা ঐ উঁচু ভূমি গর্ভ খালাসের জন্য যেখানে হযরত মারইয়াম (আ.) গমন করেছিলেন। সূরা মারইয়ামে– فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَا আয়াতটি নির্দেশ করে, যে তা উঁচু ভূমি ছিল। নিচে ঝরনা বা নহর প্রবাহিত ছিল। তবে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর শৈশবের ঘটনা ছিল। হিরোদোস নামক জনৈক বাদশাহ জ্যোতিষীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) নেতৃত্ব লাভ করবেন। এ কারণে তাঁর শৈশবকাল থেকেই সে হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর হত্যার পেছনে লেগেছিল। হযরত মারইয়াম আল্লাহ তা'আলার ইলহামের সাহায্যে জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে মিশর চলে যান। উক্ত জালিম বাদশাহর মৃত্যুর পরে তিনি শামদেশে ফিরে আসেন। ইঞ্জীল কিতাবের মাত্তা সংকলনে এ ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে। আর মিশর উঁচু ভূমি হওয়াটা নীলনদের প্রতি লক্ষ্য করে। অন্যথায় তা অনেক সময় প্লাবিত হয়ে যেত। আর مَاءٍ مَعِيْنٍ হলো নীলনদ। কেউ কেউ رَبْوَةٍ দ্বারা শাম অথবা ফিলিস্তীন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মোটকথা মুসলনাদের কেউই رَبْوَةٍ দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য নেননি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর কাশ্মীরে হওয়ার ব্যাপারেও কেউ মন্তব্য করেননি। তবে বর্তমানের কোনো কোনো বিপদগামী লেখক رَبْوَةٍ দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য বলে থাকেন। আর তারা এটাকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বলেছেন। ঐতিহাসিকভাবে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ভারতের শ্রীনগরের মহল্লা খানইয়ার 'ইউযাসিফ' নামে যে প্রসিদ্ধ কবর রয়েছে তার সম্পর্কে 'তারীখে আ'যমী'-এর লেখক এটাকে মানুষের সাধারণ উক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণ মানুষ তাকে নবীর কবর বলে থাকে। তা ছিল মূলত কোনো শাহজাদার কবর। সে অন্য কোনো দেশ থেকে এখানে এসেছিল। তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর বলার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও বোকামির পরিচায়ক। এ ধরনের আজগুবি ও মনগড়া কথায় হযরত ঈসা (আ.) জীবিত থাকাকে অস্বীকার করাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। কেউ যদি এ কবরের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে চায়, যে ইউযাসিফ কে ছিল? তাহলে জনাব মুনশী জাবীহুল্লা সাহেব অমৃতশহরী-এর লিখিত পুস্তিকা দেখুক, যা বিশেষত এ বিষয়কে কেন্দ্র করে অত্যন্ত গবেষণামূলকভাবে লিখিত হয়েছে। তাতে এ ভ্রান্ত ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। –[ফাওয়াইদে উসমানী]

অনুবাদ :

٥١. يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ الْحَلَالَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ فَاُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ ـ

৫১. হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র হালাল বস্তু হতে আহার করুন এবং সৎকর্ম করুন ফরজ ও নফল হতে আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। কাজেই আমি আপনাদেরকে এর প্রতিদান দিব।

٥٢. وَاعْلَمُوْا اَنَّ هٰذِهٖٓ اَىْ مِلَّةَ الْاِسْلَامِ اُمَّتُكُمْ دِيْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُخَاطَبُوْنَ اَىْ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنُوْا عَلَيْهَا اُمَّةً وَّاحِدَةً حَالٌ لَازِمَةٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَخْفِيْفِ النُّوْنِ وَفِىْ اُخْرٰى بِكَسْرِهَا مُشَدَّدَةً اِسْتِئْنَافًا وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ـ فَاحْذَرُوْنِ ـ

৫২. এবং জেনে রাখুন যে, এই যে, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম তোমাদের ধর্ম। তোমাদের দীন হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। তোমাদের এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জরুরি। একই জাতি اُمَّةً وَّاحِدَةً হলো حَال لَازِمَة অন্য এক কেরাতে اِنْ هٰذِهٖ -এর ن টি تَخْفِيْف তথা তাশদীদবিহীন রূপে পঠিত। অন্য এক কেরাতে جُمْلَه مُسْتَانِفَة হিসেবে হামযাটি যেরযোগে ও نُوْن তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমাকে ভয় কর।

٥٣. فَتَقَطَّعُوْٓا اَىِ الْاِتْبَاعَ اَمْرَهُمْ دِيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَقَطَّعُوْا اَىْ اَحْزَابًا مُتَخَالِفِيْنَ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَغَيْرِهِمَا كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ اَىْ عِنْدَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ فَرِحُوْنَ ـ مَسْرُوْرُوْنَ ـ

৫৩. কিন্তু তারা অর্থাৎ অনুসারীগণ তাদের বিষয়টিকে দীনকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। زُبُرًا শব্দটি تَقَطَّعُوْا -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ তাদের নিকট যে দীন রয়েছে তা নিয়ে আনন্দিত।

٥٤. فَذَرْهُمْ اُتْرُكْ كُفَّارَ مَكَّةَ فِىْ غَمْرَتِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ـ اَىْ حِيْنَ مَوْتِهِمْ ـ

৫৪. সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে ছেড়ে দিন স্বীয় বিভ্রান্তিতে ভ্রষ্টতায় কিছুকালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

٥٥. اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ نُعْطِيْهِمْ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ـ فِى الدُّنْيَا ـ

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ দান করছি, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি? পৃথিবীতে।

٥٦. نُسَارِعُ نَجْعَلُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ط لَا بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ـ اَنَّ ذٰلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ ـ

৫৬. তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না বরং তারা বুঝে না। যে এটা তাদের জন্য অবকাশ দান মাত্র।

٥٧. اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ خَوْفِهِمْ مِنْهُ مُّشْفِقُوْنَ ـ خَائِفُوْنَ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

৫৭. নিশ্চয় যারা তার প্রতিপালককের ভয়ে সন্ত্রস্ত তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

অনুবাদ :

٥٨. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ اَلْقُرْاٰنِ يُؤْمِنُوْنَ . يُصَدِّقُوْنَ .

৫৮. যারা তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে কুরআনে ঈমান আনে সত্যায়ন করে।

٥٩. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ . مَعَهٗ غَيْرَهٗ .

৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করে না তাঁর সাথে অন্য কাউকে।

٦٠. وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ يُعْطُوْنَ مَآ اٰتَوْا اَعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ خَائِفَةٌ اَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يُقَدَّرُ قَبْلَهٗ لَامُ الْجَرِّ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ .

৬০. যারা যা দান করার তারা তা দান করে দান-সদকা ও সৎ আমল করে ভীত প্রকম্পিত হৃদয়ে ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদের উক্ত সৎকর্মসমূহ গৃহীত হবে না। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে– এই বিশ্বাসের কারণে। اَنَّهُمْ -এর পূর্বে لَامْ হরফে জার উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল– لِاَنَّهُمْ

٦١. اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ . فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ .

৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। আল্লাহর ইলমে।

٦٢. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اَىْ طَاقَتَهَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّىَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ جَالِسًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَصُوْمَ فَلْيَاْكُلْ وَلَدَيْنَا عِنْدَنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ بِمَا عَمِلَتْهُ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ تُسْطَرُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ وَهُمْ اَىِ النُّفُوْسُ الْعَامِلَةُ لَا يُظْلَمُوْنَ . شَيْئًا مِنْهَا فَلَا يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ اَعْمَالِ الْخَيْرِ وَلَا يُزَادُ فِى السَّيِّاٰتِ .

৬২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। অর্থাৎ তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম সে যেন বসে সালাত আদায় করে। আর যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম সে যেন পানাহার করে। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব, যা সত্য ব্যক্ত করে যা সে আমল করবে সে বিষয়ে, আর তা হলো লৌহে মাহফূজ- তাতে সকল আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। এবং তাদের প্রতি আমলকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং কারো নেক কাজের প্রতিদান কমিয়ে দেওয়া হবে না এবং কারো পাপও বৃদ্ধি করা হবে না।

٦٣. بَلْ قُلُوْبُهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ فِىْ غَمْرَةٍ جَهَالَةٍ مِّنْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ . فَيُعَذَّبُوْنَ عَلَيْهَا .

৬৩. বরং তাদের অন্তর অর্থাৎ কাফেরদের অন্তর অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাপারে। এতদ ব্যতীত তাদের আরো কাজ আছে মুমিনগণের উল্লিখিত আমল যা তারা করে থাকে ফলে তাদেরকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হবে।

অনুবাদ :

٦٤. حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ - اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ اَغْنِيَائَهُمْ وَرُؤَسَائَهُمْ بِالْعَذَابِ اَيِ السَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ يَضِجُّوْنَ يُقَالُ لَهُمْ -

৬৪. এমনি সময় এখানে حَتّٰى টি اِبْتِدَائِيَّة হয়েছে। আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ধনী ও নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিদেরকে ধৃত করি শাস্তি দ্বারা অর্থাৎ বদরের দিন তরবারির আঘাতে তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে চিল্লাচিল্লি আরম্ভ করে দেয়। তাদেরকে বলা হবে–

٦٥. لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ - لَا تَمْنَعُوْنَ -

৬৫. আজ-আর্তনাদ করো না। তোমরা আমার সাহায্য পাবে না তোমাদের শাস্তি বারণ করা হবে না।

٦٦. قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ مِنَ الْقُرْاٰنِ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ - تَرْجِعُوْنَ قَهْقَرٰى -

৬৬. আমার আয়াত তো কুরআন থেকে তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হতো; কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে পড়তে পশ্চাতে ফিরে যেতে।

٦٧. مُسْتَكْبِرِيْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ اَيْ بِالْبَيْتِ اَوِ الْحَرَامِ بِاَنَّهُمْ اَهْلُهٗ فِيْ اَمْنٍ بِخِلَافِ سَائِرِ النَّاسِ فِيْ مَوَاطِنِهِمْ سٰمِرًا حَالٌ اَيْ جَمَاعَةً يَتَحَدَّثُوْنَ بِاللَّيْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ تَهْجُرُوْنَ - مِنَ الثُّلَاثِيِّ تَتْرُكُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَمِنَ الرُّبَاعِيِّ اَيْ تَقُوْلُوْنَ غَيْرَ الْحَقِّ فِي النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ -

৬৭. দম্ভ ভরে বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। তার কারণে অর্থাৎ তারাই বায়তুল্লাহ শরীফ ও হারাম শরীফের নিরাপত্তার অধিকারী, অন্যান্য স্থাপন মানুষের বিপরীত। এ বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে থাকতে। سَامِرًا টি حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে রাত জেগে বায়তুল্লাহ-এর পার্শ্বে গল্পগুজব করতে। تَهْجُرُوْنَ ফে'লটি ثُلَاثِيْ হতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– তোমরা কুরআনকে ছেড়ে দিবে। আর رُبَاعِيْ হতে হলে অর্থ হবে– তোমরা নবী ও কুরআনের ব্যাপারে অসত্য কথা বল।

٦٨. قَالَ تَعَالٰى اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَصْلُهٗ يَتَدَبَّرُوْا فَاُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ الْقَوْلَ اَيِ الْقُرْاٰنَ الدَّالَّ عَلٰى صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ جَاۤءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَاۤءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ -

৬৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তবে তারা কি অনুধাবন করে না يَدَّبَّرُوْا মূলত ছিল يَتَدَبَّرُوْا - تَا কে دَال -এর মধ্যে ইদগাম করার ফলে يَدَّبَّرُوْا হয়েছে। এই বাণী অর্থাৎ কুরআন, যা নবী করীম ﷺ -এর সত্যতার প্রমাণবহ। অথবা তাদের নিকট এমন কিছু আসে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি।

٦٩. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ -

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?

অনুবাদ :

٧٠. أَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ط اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّقْرِيْرِ بِالْحَقِّ مِنْ صِدْقِ النَّبِيِّ وَمَجِيْئِ الرُّسُلِ لِلْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَمَعْرِفَةِ رَسُوْلِهِمْ بِالصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ وَاَنْ لَا جُنُوْنَ بِهٖ بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ اَيِ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ـ

৭০. অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদনাগ্রস্ত। এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি সুদৃঢ়করণকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে নবীর সত্যতা, অতীতের উম্মতদের নিকট রাসূলগণের আগমন এবং তাদের রাসূলকে সত্য, বিশ্বস্ত ও তিনি উম্মাদনাগ্রস্ত নন বলে জানা ইত্যাদি বিষয়ে। বরং بَلْ টি اِنْتِقَالٌ তথা কথা বা অবস্থার গতি পরিবর্তনের জন্য। তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ তাওহীদ ও ইসলামি বিধি বিধান সম্বলিত কুরআন নিয়ে এসেছেন। আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

٧١. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَيِ الْقُرْاٰنُ اَهْوَآءَ هُمْ بِاَنْ جَاءَ بِمَا يَهْوُوْنَهُ مِنَ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط اَيْ خَرَجَتْ عَنْ نِظَامِهَا الْمُشَاهَدِ لِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ فِى الشَّيْئِ عَادَةً عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ اَيْ بِالْقُرْاٰنِ الَّذِيْ فِيْهِ ذِكْرُهُمْ وَشَرَفُهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ ـ

৭১. যদি সত্য অনুগামী হতো অর্থাৎ কুরআন তাদের কামনা-বাসনার অর্থাৎ তারা যা কামনা করে আল্লাহর অংশীদার ও সন্তান থাকা, যা থেকে তিনি মহা পবিত্র ও উর্ধ্বে। তবে বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুই অর্থাৎ এসবের মধ্যে যে শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় তা বিনষ্ট হয়ে যেত। শাসনকর্তার সংখ্যাধিক্যে স্বভাবতই একই বস্তুতে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের অসম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ। অর্থাৎ কুরআন যাতে তাদের জন্য উপদেশ ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٧٢. اَمْ تَسْاَلُهُمْ خَرْجًا اَجْرًا عَلٰى مَا جِئْتَهُمْ بِهٖ مِنَ الْاِيْمَانِ فَخَرَاجُ رَبِّكَ اَجْرُهٗ وَثَوَابُهٗ وَرِزْقُهٗ خَيْرٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ خَرْجًا فِى الْمَوْضِعَيْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اُخْرٰى خَرَاجًا فِيْهِمَا وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ اَفْضَلُ مَنْ اَعْطٰى وَاَجَرَ ـ

৭২. আপনি কি তাদের নিকট কোনো ব্যয়ভার চান প্রতিদান। তাদের নিকট যে ঈমান নিয়ে এসেছেন তার বিনিময়ে আপনার প্রতিপালকের ব্যয়ভারই তার প্রতিদান, তার ছওয়াব ও তার জীবিকা শ্রেষ্ঠ অপর এক কেরাতে উভয় স্থানেই خَرْجًا এসেছে। আবার অন্য কেরাতে উভয় স্থানেই خِرَاجًا ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা সর্বোত্তম দাতা ও প্রতিদান প্রদানকারী।

٧٣. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ اَيْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

৭৩. আপনি তো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে।

অনুবাদ :

٧٤. وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ بِالْبَعْثِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَنِ الصِّرَاطِ اَيِ الطَّرِيْقِ لَنٰكِبُوْنَ ـ عَادِلُوْنَ ـ

৭৪. যারা আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না পুনরুত্থান ছওয়াব এবং শাস্তি সম্পর্কে তারা তো সকল পথ হতে বিচ্যুত দূরে অবস্থানকারী।

٧٥. وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ اَيْ جُوْعٍ اَصَابَهُمْ بِمَكَّةَ سَبْعَ سِنِيْنَ لَّلَجُّوْا تَمَادَوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ يَتَرَدَّدُوْنَ ـ

৭৫. আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ দৈন্য দূর করলেও অর্থাৎ তারা সাত বছর মক্কায় যে অভাব অনটনে পতিত হয়েছিল তা বিদূরিত করি। তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। পথভ্রষ্টতায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে।

٧٦. وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ الْجُوْعِ فَمَا اسْتَكَانُوْا تَوَاضَعُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ـ يَرْغَبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ فِي الدُّعَاءِ ـ

৭৬. আমি তাদেরকে শাস্তি ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা ধৃত করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না। দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরক্ত হয় না।

٧٧. حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ بِالْقَتْلِ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ـ اٰيِسُوْنَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ـ

৭৭. অবশেষে حَتّٰى টি اِبْتِدَائِيَّةٌ হয়েছে। যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তা হলো বদরের দিন হত্যার মাধ্যমে। তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। সকল মঙ্গল হতে নিরাশ হয়ে পড়ে।

তাহকীক ও তারকীব

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ : এ আয়াতে যদিও বাহ্যিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে তবে এর দ্বারা প্রত্যেক নবীই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই তাঁর আমলে এ নির্দেশ ছিল।

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْا اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً : ব্যাখ্যাকার (র.) وَاعْلَمُوْا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنَّ-এর হামযাটি যবরযোগে হবে। আর هٰذِهٖ হলো اِنَّ-এর اِسْم এবং اُمَّتُكُمْ তার خَبَرْ ; اُمَّةً হলো حَال لَازِمَة আর وَاحِدَةً তার صِفَت لَازِمَة ; অপর এক কেরাতে نُوْن লঘু আকারে তথা তাশদীদবিহীন এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এর اِسْم হলো বিলুপ্ত ضَمِيْر شَاْن ; তৃতীয় এক কেরাতে اِنَّ তাশদীদসহ এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এ সময় এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَة হবে পূর্বের جُمْلَه مُسْتَانِفَة-এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ اَمْرَهُمْ : এটা تَقَطَّعُوْا যা قَطَّعُوْا-এর অর্থ বিশিষ্ট তার مَفْعُوْل ; যেমন- تَقَدَّمَ শব্দটি قَدَّمَ-এর অর্থে আসে। অর্থাৎ جَعَلُوْا دِيْنَهُمْ اَدْيَانًا مُخْتَلِفَةً [তারা তাদের ধর্মকে অনেকগুলো ধর্মে পরিবর্তন করে ফেলেছে।]

قَوْلُهُ زُبُرًا : এটা زَبُوْرًا-এর বহুবচন। অর্থ হলো দল, গোষ্ঠী, লৌহখণ্ড। এটা تَقَطَّعُوْا-এর فَاعِل থেকে حَال অথবা তার مَفْعُوْل -

قَوْلُهُ فِىْ غَمْرَتِهِمْ : এটা فَذَرْهُمْ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل অর্থাৎ- اُتْرُكْهُمْ مُسْتَغْرِقِيْنَ فِىْ غَمْرَتِهِمْ [তাদেরকে তাদের উদাসীনতার মধ্যে ছেড়ে দিন!]

قَوْلُهُ اِنَّمَا نُمِدُّهُمْ : এখানে مَا টি مَوْصُوْلَة কেননা مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ হলো এর বয়ান যা সামনে উল্লিখিত হয়েছে। এটা مَا مَوْصُوْلَة হওয়ার প্রমাণ। অতএব مَا -কে اِنَّ থেকে পৃথক করে লেখা উচিত ছিল। তবে মাসহাফে ওসমানীর লেখনী নীতির অনুকরণ করে اِنَّ -কে مَا -এর সাথে মিলিত করা হয়েছে। এ مَا হলো اِنَّ -এর اِسْم আর نُسَارِعُ হলো বাক্য হয়ে خَبَرْ আর رَابِطَة বা সম্পর্ক সৃষ্টিকারী এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- بِهٖ -

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ : এখানে اَلَّذِيْنَ হলো اِنَّ -এর اِسْم আর هُمْ মুবতাদা তার খবর مُشْفِقُوْنَ -এর সাথে মিলে صِلَة অতঃপর مَوْصُوْل صِلَه মিলে اِنَّ -এর اِسْم এভাবে সামনের চারোটি مَوْصُوْل হলো اِنَّ -এর اِسْم আর اُولٰئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ বাক্য হয়ে اِنَّ -এর خَبَرْ

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ يُعْطُوْنَ مَا اَعْطَوْا : সাধারণ মুফাসসিরগণের মতে, يُؤْتُوْنَ শব্দটি اِيْتَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তারা তা প্রদান করে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা.) বলেন- يَأْتُوْنَ مَا اَتَوْا এটা اِتْيَانٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ- يَفْعَلُوْنَ مَا فَعَلُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ [তারা যে সকল সৎকর্ম করেছে তারাও তা করে।] ব্যাখ্যাকার (র.) উভয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে مَا -এর বর্ণনায় দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। مِنَ الصَّدَقَةِ এ ব্যাখ্যা হলো অধিকাংশ মুফাসসিরগণের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে, আর اَعْمَال صَالِحَة -এর সম্পর্ক হলো হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর কেরাতের সাথে।

قَوْلُهُ وَجِلَةٌ : এটা يُؤْتُوْنَ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ لَامُ الْجَرِّ : اَنَّهُمْ -এর পূর্বে যদি لَامْ হরফে জার উহ্য মানা হয়, তাহলে تَوْجِلَة -এর ইল্লত হবে আর এটাই সঠিক। অর্থাৎ তাদের অন্তর এজন্য ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ : এটা মূলত وَهُمْ سَابِقُوْنَ لَهَا ছিল। فَاصِلَة তথা আয়াতের শেষে মিল রাখার জন্য لَهَا -কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বাক্যটি মুবতাদা ও খবর। وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এখানে هُمْ যমীরটি نَفْس -এর প্রতি ফিরেছে, যা لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا -এর মধ্যে রয়েছে। نَفْس যেহেতু نَفِىْ -এর অধীনে উল্লিখিত রয়েছে এ কারণে এটা ব্যাপকতা বুঝায়। অর্থাৎ এর মধ্যে বহুবচনের অর্থ নিহিত রয়েছে। এ কারণেই وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -কে বহুবচন ব্যবহার করা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَهُمْ الخ : অর্থাৎ মুমিনদের জন্য উল্লিখিত সৎকর্মসমূহ ছাড়া কাফেররা বিভিন্নরূপ কুকর্মও করত। কাতাদা (র.) বলেন- لَهُمْ -এর যমীর দ্বারা মুসলমানগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য উল্লিখিত নেক আমলসমূহ ছাড়াও আরো আমল রয়েছে। বগভী (র.) বলেন, প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ : অর্থাৎ এরপর থেকে বাক্য শুরু হচ্ছে।

قَوْلُهُ اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ : এটা হলো শর্ত, আর اِذَا هُمْ يَجْاَرُوْنَ হলো جَزَاء আর مُفَاجَاتِيَة اِذَا -টা فَا অর্থে, বাক্যটি এরূপ ছিল- حَتّٰى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ فَاجْئَرُوْا بِالصُّرَاخِ এখানে يَجْئَرُوْنَ শব্দটি جَئَرَ(ف) থেকে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ অর্থ- অস্থির হয়ে ফরিয়াদ করা, গরুর হাম্বা রব করা। تَنْكِصُوْنَ ক্রিয়াটি نُكُوْصٌ (ض) থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা, ঘোরা।

قَوْلُهُ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ : এখানে بِهٖ টা مُسْتَكْبِرِيْنَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। بَا سَبَبِيَّة অথবা سَامِرًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট. بَاء অর্থ فِىْ আর بِهٖ -এর দ্বারা হয়তো কুরআন শরীফ উদ্দেশ্য, যা كَانَتْ اٰيَاتِىْ দ্বারা বুঝা যায়, অথবা এর দ্বারা হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। যদিও এ দুটি পূর্বে উল্লিখিত হয়নি, তবে বায়তুল্লাহ এবং হেরেম শরীফের ব্যাপারে তাদের গর্ব ও অহংকার করা এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাকে উল্লেখ করার মতোই মনে করা হয়।

قَوْلُهُ مُسْتَكْبِرِيْنَ وَسَامِرًا وَتَهْجُرُوْنَ : এ তিনোটি শব্দ يَنْكِصُوْنَ -এর যমীর -এর حَالٌ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) -এর জন্য উচিত ছিল যে, حَالٌ -কে تَهْجُرُوْنَ -এর পরে উল্লেখ করা এবং حَالٌ -এর স্থলে اَحْوَالٌ বলা।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُمْ اَهْلُهُ : এখানে بَا سَبَبِيَّة তথা কারণজ্ঞাপক। অর্থাৎ ঈমানের দ্বারা অহংকার করত। এ ইল্লত ও দলিল বর্ণনা করে বলতো যে, আমরা বায়তুল্লাহর ব্যবস্থাপক এবং মুতাওয়াল্লী।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ : এটা বিলুপ্ত হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর فَا হলো আতেফা, বাক্যটি এমন ছিল- اَعَمُوْا فَلَمْ يَدَّبَّرُوْا অর্থাৎ তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে যে, তাদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই?

قَوْلُهُ عَادَةً : এখানে উচিত ছিল عَادَةً -এর স্থলে عَقْلاً বলা। কেননা মুশরিকদের অস্তিত্ব টিকে থাকা জগতের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে। অবশ্য এটা যুক্তিগতভাবে।

قَوْلُهُ لَلَجُّوْا : এ অংশটি لَوْ -এর জবাব।

قَوْلُهُ مُبْلِسُوْنَ : এটা اِبْلَاسٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো– নিরাশ হওয়া। এর থেকে ইবলীস শব্দ গঠিত। কেননা সে আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাসূলগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নবী রাসূলগণ তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের আহবায়ক ছিলেন, তাঁরা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাগিদ করতেন। আর এ আয়াতসমূহে তাওহীদে বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণের এবং নেক আমল করার আহবান রয়েছে। আর এটিই সকল নবী রাসূলগণের পথ। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ পথের হেদায়েত করেছেন।

কিন্তু অহংকারী পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে। তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্যে তারা নিজেরদের পছন্দনীয় ভিন্ন ধর্মমতকে অনুসরণ করেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে রাসূলগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا অর্থাৎ হে রাসূলগণ! আপনারা পূত পবিত্র বস্তু থেকে আহার করুন, আর সৎ কাজ করতে থাকুন।

طَيِّبَاتٌ -এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামি শরিয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই এর দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,. পয়গাম্বরগণকে তাদের সময়ে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা– ১. হালাল ও পবিত্র বস্তুর আহার করুন। ২. সৎকর্ম করুন। আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরো অধিক পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎ কর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে 'ইয়া রব! ইয়া রব!' বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? –[কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

قَوْلُهُ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً : اُمَّةٌ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোনো বিশেষ পয়গাম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোনো সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়: যেমন وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ আয়াতে 'উম্মত' শব্দটি দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا : زُبُرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব পয়গাম্বর ও তাদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দিন ও তরিকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছেন। زُبُرٌ শব্দটি কোনো সময় زُبْرَةٌ -এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ– খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ : يُؤْتُوْنَ শব্দটি اِيْتَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে এর এক কেরাত يَاْتُوْنَ مَآ اَتَوْا ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার তা আমল করে। এতে দান-খয়রাত, নামাজ, রোজা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম; যেমন– এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সিদ্দীক তনয়া! এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং দান-খায়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে [আমাদের কোনো ত্রুটির কারণে] কবুল হবে না। এধরনের লোকই সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মাযহারী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎ কাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না! –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ : দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজ তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকে।

قَوْلُهُ غَمْرَةٍ : এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غَمْرَه শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে غَمْرَه বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনো দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছত না।

قَوْلُهُ وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ : অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيْهِمْ শব্দটি تَرَفٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আজাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আজাব যখন আসে তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আজাবে আক্রান্ত করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে সেই আজাব বোঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারের উপর পতিত হয়েছিল।

কারো কারো মতে এই আজাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আজাব বুঝানো হয়েছে যা, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে কারীম ﷺ কাফেরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ –[বুখারী, মুসলিম ও কুরতুবী]

قَوْلُهُ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে بِهٖ শব্দের সর্বনাম হেরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَامِرًا শব্দটি سَمَرٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سَمَرٌ শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سَامِر বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচনে হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার একটি কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক এবং এর তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব। দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোনো ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُوْنَ শব্দটি هُجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। এটা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

ইশার পর কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ : রাত্রিকালে কিস্‌সা কাহিনী বলার প্রথা আরব আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রথা বন্ধের উদ্দেশ্যে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং ইশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, ইশার নামাজের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামাজ সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি ইশার পর অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়। এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরো কত রকমের গুনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) ইশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও, সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে! -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوْنَ الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অহংকারী কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তারা কি কি কারণে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত তাও ইরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যথা- পাঁচটি কারণে এ কাফেররা সত্য বিমুখ হয়েছে-

১. এ হতভাগ্য কাফেররা পবিত্র কোরআনের মহিমা ও মাধুর্য সম্পর্কে আদৌ ভেবে দেখেনি। তার সৌন্দর্য সম্পর্কেও তারা অবগত হয়নি। পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল। যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে তথা মানব কল্যাণ সাধনের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাজিল হয়েছে। যার মোকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। কেননা সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ মহিমান্বিত আসমানি গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন।
২. এ দুরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেনি।
৩. অথবা তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা, মহানুভবতা, সাধুতা ও সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অবগত হয়নি। তারা শুধু শুনেছে যে, তিনি উম্মী, তিনি লেখাপড়া শিখেননি, অথচ ইলম এবং হিকমতের যে বিস্ময়কর ঝর্ণাধারা তাঁর নিকট থেকে প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা এতটুকু চিন্তা করেনি।
৪. অথবা এর কারণ হলো এই যে, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো- হুজুর আকরাম ﷺ মজনু বা পাগল, অথচ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্রোতাধারা তাঁর নিকট থেকেই উৎসারিত হয়েছে।
৫. তাদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, হুজুরে আকরাম ﷺ তাদের নিকট হয়তো কোনো আর্থিক সুবিধা চান, অথচ দুরাত্মা কাফেরদের এসব ধারণার মধ্যে কোনোটিই সত্য নয়। আল্লাহ পাক এ স্থলে তাদের প্রতিটি কথা উল্লেখ করে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَاءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ
আলোচ্য আয়াতের اَلْقَوْلُ শব্দ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে কি কাফেররা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখেনি। যদি তা করত, তবে পবিত্র কুরআনের

ভাষার অলংকার ও ভাবের মাহাত্ম্য দেখে প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করতো। যখন তারা পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতের অনুরূপ আয়াত আনয়নে ব্যর্থ হলো, তখনই পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহান বাণী– একথা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ থেকে اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে– بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই, এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে; শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটি একটি।

قَوْلُهٗ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ : অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়; বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভ্রান্ততম কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র জমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোনো কর্ম, কোনো অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন' তথা 'সত্যবাদী' ও 'বিশ্বস্ত' বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কোনো সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে তারা তাঁকে চেনে না।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَضَرَّعُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আজাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আজাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই তারা আবার নারফরমানিতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আজাবে আক্রান্ত করা হয়। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ-এর বরকতে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি; বরং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয়ে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহর আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি! আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আজাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আজাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অজাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। –[মাযহারী]

অনুবাদ :

٧٨. وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط الْقُلُوْبَ قَلِيْلاً مَا تَاكِيْدُ لِلْقِلَّةِ تَشْكُرُوْنَ .

৭৮. তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন তোমরা অল্পই مَـا অব্যয়টি স্বল্পতার تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

٧٩. وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ خَلَقَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ . تُبْعَثُوْنَ .

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে, এবং তোমাদেরকে তারই নিকট একত্র করা হবে। তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

٨٠. وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِى الْمُضْغَةِ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ . صَنِيْعَهُ تَعَالٰى فَتَعْتَبِرُوْنَ .

৮০. তিনিই জীবন দান করেন মাংসপিণ্ডে রূহ ফুঁকে দিয়ে এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকার দিবা-নিশির পরিবর্তন সাদা-কালো ও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে তবুও কি তোমরা বুঝবে না? মহান আল্লাহর কার্যাবলি সম্পর্কে, ফলে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে।

٨١. بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ .

৮১. এতদসত্ত্বেও তারা তা-ই বলে, যেমনটা বলেছিল পূর্ববর্তীগণ।

٨٢. قَالُوْٓا اَىِ الْاَوَّلُوْنَ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ . لَا وَفِى الْهَمْزَتَيْنِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ .

৮২. তারা বলে অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা উত্থিত হবো? না। اِذَا এবং ءَاِنَّا-এর হামযাদ্বয়কে ঠিক রেখে অথবা দ্বিতীয়টি تَسْهِيْل করে এবং উভয়টিতেই মাঝে একটি اَلِفْ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

٨٣. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا اَىِ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلُ اِنْ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ اَكَاذِيْبُ الْاَوَّلِيْنَ . كَالْاَضَاحِيْكِ وَالْاَعَاجِيْبِ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ .

৮৩. আমাদেরকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে। এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও। এটাতো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মিথ্যা কাহিনী, হাস্যকর ও আজগুবি কথা। اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ-এর বহুবচন।

অনুবাদ :

٨٤. قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا مِنَ الْخَلْقِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . خَالِقُهَا وَمَالِكُهَا .

৮৪. আপনি বলুন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে সৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে এগুলো কার? যদি তোমরা জান। এর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক কে?

٨٥. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ لَهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ . بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الذَّالِ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْخَلْقِ اِبْتِدَاءً قَادِرٌ عَلَى الْاِحْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

৮৫. তারা বলবে, আল্লাহর। আপনি বলুন তাদেরকে তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না। تذكرون শব্দের ذَالْ অক্ষরে দ্বিতীয় تَاءْ-এর ইদগাম হয়েছে। ফলে তোমরা জানতে যে, যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সক্ষম তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম।

٨٦. قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . اَلْكُرْسِيِّ .

৮৬. আপনি জিজ্ঞাসা করুন কে সপ্ত আকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? কুরসির।

٨٧. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ . تَحْذَرُوْنَ عِبَادَةَ غَيْرِهٖ .

৮৭. তারা বলবে "আল্লাহ"। বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত হতে বিরত হবে না।

٨٨. قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ يَحْمِىْ وَلَا يُحْمٰى عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

৮৮. জিজ্ঞসা করুন, সকল কিছুর, কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে? تَاءْ বর্ণটি মুবালাগার জন্য যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই। তিনি সাহায্য সহায়তা করেন ; কিন্তু তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। যদি তোমরা জানতে।

٨٩. سَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِلّٰهِ بِلَامِ الْجَرِّ فِى الْمَوْضَعَيْنِ نَظْرًا اِلٰى اَنَّ الْمَعْنٰى مَنْ لَهٗ مَا ذُكِرَ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ . تُخْدَعُوْنَ وَتُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهٗ اَىْ كَيْفَ يُخَيَّلُ لَكُمْ اَنَّهٗ بَاطِلٌ .

৮৯. তারা বলবে, আল্লাহর অন্য কেরাতে لَامْ হরফে জরের সাথে لِلّٰهِ রয়েছে উভয় স্থানে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কার হাতে? এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো। তোমরা প্রতারিত হচ্ছ এবং হক তথা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদ হতে বিমুখ রয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের কি করে এমন ধারণা হলো যে, এ সবকিছুই বাতিল ও নিরর্থক।

অনুবাদ :

٩٠. بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ فِىْ نَفْيِهِ ـ

৯০. বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে।

٩١. وَهُوَ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا اَىْ لَوْكَانَ مَعَهُ اِلٰهٌ لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ اَىْ اِنْفَرَدَ بِهِ وَمَنَعَ الْاٰخَرَ مِنَ الْاِسْتِيْلَاءِ عَلَيْهِ وَلَعَلٰى بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط مُغَالَبَةً كَفِعْلِ مُلُوْكِ الدُّنْيَا سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ ـ

৯১. আর তা হলো– আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোনো ইলাহ নেই। অর্থাৎ যদি তাঁর সাথে কোনো ইলাহ থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। অর্থাৎ আলাদা হয়ে যেত এবং তার উপর অপরের কর্তৃত্ব প্রয়োগে বাধা দিত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। বল প্রয়োগপূর্বক যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণ করে থাকেন। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পূত-পবিত্র যা উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٢. عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفْعِ خَبَرُ هُوَ مُقَدَّرًا فَتَعٰلٰى تَعَظَّمَ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ مَعَهُ ـ

৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা যা গোপন আছে আর যা প্রকাশ্যে আছে। عَالِم শব্দটি যেরযুক্ত হলে اَللّٰه শব্দের সিফত হবে। আর যদি পেশযুক্ত হয় তবে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। তারা যাকে শরিক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে তাঁর সাথে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ : এখানে مَا হলো قَلِيْلًا-এর تَنْوِيْن تَنْكِيْر-এর তাকিদের জন্য, قَلِيْلًا শব্দটি مَفْعُوْل مُطْلَق-এর সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। বাক্যটি এরূপ ছিল– تَشْكُرُوْنَ شُكْرًا قَلِيْلًا আর এটা কৃতজ্ঞতা আদায় না করার প্রতি ইঙ্গিতবহ। কেননা قِلَّتْ কখনো কখানো عَدَمْ তথা অস্তিত্বহীনের অর্থও বুঝায়। আর এ অর্থটিই কাফেরদের অবস্থার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

قَوْلُهُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : اَفَلَا-এর হামযাটি উহ্য ক্রিয়ার পূর্বে এসেছে। আর فَا হলো عَاطِفَةٌ মূলত বাক্যটি ছিল–
اَغَفَلْتُمْ فَلَا تَعْقِلُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى اِنْشَاءِ الْخَلْقِ قَادِرٌ عَلٰى اِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ

قَوْلُهُ بَلْ قَالُوْا : قَالُوْا-এর فَاعِلْ হলো মক্কার কাফেররা। এটা উহ্য পদ থেকে اِضْرَابْ اِنْتِقَالِىْ হয়েছে [অর্থাৎ বাক্যের ভঙ্গি পরিবর্তন ঘটেছে। বাক্যটি এরূপ ছিল– فَلَمْ يَعْتَبِرُوْا بَلْ قَالُوْا ব্যাখ্যাকার আবুস সাঊদ (র.) বলেন– بَلْ قَالُوْا-এর عَطْف ঘটেছে উহ্য শব্দের উপর। বাক্যটি মূলত فَلَمْ يَعْقِلُوْا بَلْ قَالُوْا ছিল।

قَوْلُهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا : اٰبَاؤُنَا-এর عَطْف হয়েছে وُعِدْنَا-এর ضَمِيْر مُتَّصِلْ-এর উপর। আর নিয়ম হচ্ছে– ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ-এর عَطْف করতে হলে ضَمِيْر مُنْفَصِلْ-এর মাধ্যমে তাকিদ আনা জরুরি। তবে

এখানে نَحْنُ যমীর মাঝে আসার তার প্রয়োজন না থাকায় عطف সঙ্গত হয়েছে। هٰذَا হলো وُعِدْنَا -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل ; نَا যমীর হলো نَائِبْ فَاعِلْ বাক্যটি এরূপ ছিল– وَعَدْنَا الْاٰنَ مُحَمَّدٌ بِالْبَعْثِ وَعَدَ غَيْرَهٗ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِنَا بِهٖ

قَوْلُهٗ لَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ءَاِذَا مِتْنَا -এর হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ -এর জন্য।

قَوْلُهٗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : এটা হলো شَرْط ; এর جَوَابْ লুপ্ত রয়েছে, অর্থাৎ– اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَاَخْبِرُوْنِيْ بِخَلَاقِهَا

قَوْلُهٗ مَلَكُوْتُ : এর মধ্যকার وت হলো مُبَالَغَةْ -এর জন্য বর্ধিত। যেমন جَبَرُوْتُ- رَحَمُوْتُ ইত্যাদির মধ্যে হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ : عَلٰى দ্বারা مُتَعَدِّيْ হয়েছে نُصِرْتُ বা সাহায্যের অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে।

قَوْلُهٗ نَظْرًا اِلٰى اَنَّ الْمَعْنٰى مَنْ لَهٗ : উপরে তিন জায়গায় اَللّٰه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।। প্রথম জায়গায় لِ হরফে জারের সাথে নির্দিষ্ট। কারণ প্রশ্নের মধ্যে لَامْ স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। যেমন– قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَمَا অতএব উত্তর হবে لِلّٰهِ

দ্বিতীয় স্থানে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে لَامْ উল্লিখিত হবে, আর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে لَامْ লুপ্ত হবে। কারণ প্রশ্ন হলো مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রতিপালক কে? উত্তর হবে– আল্লাহ। আর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ -এর উদ্দেশ্য হলো لِمَنِ السَّمٰوٰتُ আসমান [ও জমিন] সমূহ কার? সুতরাং উত্তর হবে– لِلّٰهِ [আল্লাহর]।

আর তৃতীয় স্থান হলো مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ؟ [প্রত্যেক বস্তুরা মালিকানা কার হাতে?] এখানেও যদি প্রশ্নের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে لَامْ লুপ্ত হবে। আর যদি প্রশ্নের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে لَامْ উল্লেখ হবে। কারণ এর অর্থ হলো– لِمَنْ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ সারকথা এই যে, উপরিউক্ত তিন স্থানের প্রথম স্থানে لَامْ جَارَّةْ উল্লেখ হওয়া নির্দিষ্ট। আর পরবর্তী দু স্থানে শব্দের বিচারে لَامْ লুপ্ত হবে, আর অর্থের বিচারে لَامْ উল্লেখ হবে।

قَوْلُهٗ تَخْدَعُوْنَ : تُسْحَرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা تَخْدَعُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন, যে রূপকার্থে تَخْدَعُوْنَ শব্দটি تُسْحَرُوْنَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَتُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةِ اللّٰهِ : عِبَادَةُ اللّٰهِ এটা حَقْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। এ কারণে তা مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهٗ كَيْفَ يُخَيَّلُ لَكُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنّٰى এখানে كَيْفَ অর্থে। আর تُسْحَرُوْنَ হলো تُخَيَّلُ অর্থে।

قَوْلُهٗ مِنْ وَلَدٍ : مِنْ অব্যয়টি مَفْعُوْل -উপর অতিরিক্ত হয়েছে। আর مِنْ اِلٰهٍ -এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত হয়েছে كَانَ -এর اِسْم -এর উপর।

قَوْلُهٗ اِذًا اَىْ لَوْ كَانَ مَعَهٗ اِلٰهٌ لَذَهَبَ : اِذًا -এর পরে لَوْكَانَ مَعَهٗ বৃদ্ধি করেছেন একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ।

প্রশ্ন : اِذًا এমন বাক্যের পূর্বে আসে যা شَرْط . جَزَاءْ সম্বলিত, অথচ এখানে لَذَهَبَ শুধু جَزَاءْ উল্লেখ রয়েছে। شَرْط কোথায়?

উত্তর : এখানে شَرْط উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) لَوْكَانَ مَعَهٗ اِلٰهٌ উহ্য মেনে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর اِذًا অব্যয়টি لَوْ اِمْتِنَاعِيَّةْ অর্থে।

قَوْلُهٗ مَا ذُكِرَ : এখানে উদ্দেশ্য হলো সন্তানাদি ও শরিকগণ।

قَوْلُهٗ عَالِمُ الْغَيْبِ : عَالِمْ শব্দটি مَجْرُوْر হবে, اللّٰه শব্দের بَدَلْ বা صِفَتْ হওয়ার কারণে। আর مَرْفُوْعْ পড়া হলে তা উহ্য هُوَ مُبْتَدَأْ -এর خَبَرْ হবে।

قَوْلُهٗ فَتَعَالٰى : এর عَطْف হলো পূর্বের বিষয়বস্তুর উপর। অর্থাৎ– عَلِمُ الْغَيْبِ فَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিবরণ ছিল, আর এর কারণ ছিল এই যে, তারা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করত এবং জীবনের কৃতকর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে- একথা বিশ্বাস করত না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাঁর বিস্ময়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ করছেন, যাতে করে তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন কঠিন কিছুই নয় এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই হবে। যাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বিস্ময়কর, বর্ণনাতীত, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক চারটি দলিল বর্ণনা করেছেন। যথা-

প্রথম দলিল- قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمْ :অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দেখবার জন্যে চক্ষু, শ্রবণ করবার জন্যে কর্ণ এবং উপলব্ধি করার জন্যে হৃদয় দান করেছেন। যদি তিনি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান না করতেন, তবে তোমরা দেখতেও পারতে না, শ্রবণও করতে পারতে না এবং কিছুই উপলব্ধি করতে পারতে না।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এই নিয়ামতসমূহের সদ্ব্যবহার কর এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, জীবন সাধনায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর।

قَوْلُهُ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ : অর্থাৎ কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমাদের অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা শোকর গুজারী বা কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য হলো চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা এবং এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতসমূহকে তাঁর নাফরমানিতে ব্যয় করতে অভ্যস্ত, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তাদের অধিকাংশই অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। -[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ২০৬]

দ্বিতীয় দলিল- قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ : অর্থাৎ আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্র করা হবে।

মানুষ মাত্রকে উপলব্ধি করা উচিত যে, পৃথিবীতে তার অবস্থান আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকই মানুষকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইতিপূর্বে যার অস্তিত্বই ছিল না, যে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলনা, আজ আল্লাহ পাক তাকে শুধু যে অস্তিত্ব দান করেছেন তাই নয়; বরং দিয়েছেন তাকে শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি। এমনিভাবে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে ছড়িয়ে রেখেছেন, আর এমন এক দিন আসবে, যখন সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে সমবেত করাবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তৃতীয় দলিল- قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ : অর্থাৎ আর তিনিই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি জীবন দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে জীবন ছিনিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। কেউ জন্ম লাভ করে, আর কেউ মৃত্যুবরণ করে, উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

চতুর্থ দলিল- قَوْلُهُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ আর রাত ও দিনের পবির্তন তাঁরই কাজ, তবু কি তোমরা বুঝতে পার না? প্রত্যহ যথানিয়মে যথাসময়ে রাতের অন্ধকারের পর আসে দিনের আলো, এরপর দিনের অবসান ঘটে, রাতের আগমন হয়, আর সারা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অবস্থার এই পরিবর্তন শুধু

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয় এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত ও হিকমতেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। কুরআনে কারীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে।

অতএব, এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

قَوْلُهُ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : **তাওহীদের প্রমাণ :** অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জান তবে বলো?

এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর একত্ববাদের এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা ঘোষণা করছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে এসব কার? তারা অবশ্যই বলবে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের। হে রাসূল! আপনি তাদরেকে বলুন, যদি একথা সত্য হয় আর তা অবশ্যই সত্য, তাহলে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না? কেন তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো না? কেন আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল না? কেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নিকট মাথা নত কর?

قَوْلُهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ : অর্থাৎ যখন সব কিছুই আল্লাহ পাকের, তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনি কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না, কেন তোমরা এসব সত্যকে অস্বীকার কর? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

قَوْلُهُ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ : অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাক। হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যখন তোমরা একথা স্বীকার কর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের মালিক, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তবে কেন তাঁকে ভয় কর না? কেন তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হও না? কেন তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক কর? কোন সাহসে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর? অথচ আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব আধিপত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করছো, এমন অবস্থায় কেন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছো না?

قَوْلُهُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ : আলোচ্য আয়াতের مَلَكُوْتُ শব্দটির অর্থ হলো ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্মান এবং পরিপূর্ণ আধিপত্য, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এজন্যে এ শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের ক্ষমতার ব্যাপারেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা অগণিত ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, আজাব, মসিবত ও দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তার মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আজাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আজাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আজাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না। –[কুরতুবী]

অনুবাদ :

٩٣. قُلْ رَّبِّ اِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ لا مِنَ الْعَذَابِ هُوَ صَادِقٌ بِالْقَتْلِ بِبَدْرٍ.

৯৩. আপনি বলুন! হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি আমাকে দেখাতে চান এখানে اِمَّا -এর মধ্যে اِنْ شرطيه অতিরিক্ত مَا -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। মূলত ছিল اِنْ - مَا যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। আর তা হলো শাস্তি। যা বদরের ময়দানে হত্যার মাধ্যমে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে।

٩٤. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. فَاُهْلَكَ بِهَلَاكِهِمْ.

৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ফলে তাদের ধ্বংসের কারণে আমিও বিনাশ হয়ে যাবো।

٩٥. وَاِنَّا عَلٰى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ.

৯৫. আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

٩٦. اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اَىِ الْخَصْلَةُ مِنَ الصَّفْحِ وَالْاِعْرَاضِ عَنْهُمُ السَّيِّئَةَ اِذَاهُمْ اِيَّاكَ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ. اَىْ يَكْذِبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ فَنُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

৯৬. মন্দের মোকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা অর্থাৎ, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন দ্বারা। আপনাকেই তাদের কষ্ট দেওয়ার দ্বারা। এ নির্দেশ জিহাদের বিধান নাজিলের পূর্বেকার ছিল। তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত অর্থাৎ যা মিথ্যা বলে ও কষ্টদায়ক কথা বলেন। সুতরাং সে বিষয়ে আমি তাদেরকে বদলা দিব।

٩٧. وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ اَعْتَصِمُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ. نَزَغَاتِهِمْ بِمَا يُوَسْوِسُوْنَ بِهٖ.

৯৭. বলুন, হে আমার প্রতিপলক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। শয়তানের প্ররোচনা হতে। তাদের প্ররোচনা হতে যার দ্বারা তারা কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

٩٨. وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ. فِىْ اُمُوْرِىْ لِاَنَّهُمْ اِنَّمَا يَحْضُرُوْنَ بِسُوْءٍ.

৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। আমার কাজে-কর্মে। কারণ তারা অনিষ্ট নিয়ে উপস্থিত হয়।

٩٩. حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَرَاٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ. اَلْجَمْعُ لِلتَّعْظِيْمِ.

৯৯. পরিশেষে এখানে حَتّٰى টি اِبْتِدَائِيَّةٌ হয়েছে। যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে দেখে তার অবস্থানস্থল জাহান্নামে এবং তার অবস্থানস্থল জান্নাতে যদি সে বিশ্বাস স্থাপন করে। তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। এখানে اِرْجِعُوْا বহুবচনের সীগাহ আল্লাহ তা'আলার সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٠٠. لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا بِاَنْ اَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَكُوْنُ فِيْمَا تَرَكْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ عُمْرِيْ اَيْ فِيْ مُقَابَلَتِهٖ قَالَ تَعَالٰى كَلَّا ط اَيْ لَا رُجُوْعَ اِنَّهَا اَيْ رَبِّ ارْجِعُوْنِ كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ط وَلَا فَائِدَةَ لَهٗ فِيْهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ اَمَامِهِمْ بَرْزَخٌ حَاجِزٌ يَصُدُّهُمْ عَنِ الرُّجُوْعِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ وَلَا رُجُوْعَ بَعْدَهٗ ـ

১০০. যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি। এভাবে যে, এ সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই। যা আমি পূর্বে করিনি। আমি নষ্ট করেছি, আমার জীবন হতে অর্থাৎ তার মোকাবিলায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– না, এটা হওয়ার নয় অর্থাৎ পৃথিবীতে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এটা তো অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন একটি উক্তি মাত্র তার জন্য তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তাদের সম্মুখে থাকে বরযখ প্রতিবন্ধক/ প্রাচীর যা তাদেরকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন হতে বাধা দিবে। কিয়ামত পর্যন্ত এরপরও আর প্রত্যাবর্তন হবে না।

١٠١. فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى اَوِ الثَّانِيَةُ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَفَاخَرُوْنَ بِهَا وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ـ عَنْهَا خِلَافَ حَالِهِمْ فِى الدُّنْيَا لِمَا يَشْغَلُهُمْ مِنْ عَظْمِ الْاَمْرِ عَنْ ذٰلِكَ فِيْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيٰمَةِ وَفِيْ بَعْضِهَا يُفِيْقُوْنَ وَفِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ـ

১০১ এবং যেদিন শিঙ্গায় বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়া হবে প্রথম ফুৎকার অথবা দ্বিতীয় ফুৎকার সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না যার দ্বারা পরস্পর বড়াই করবে। এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবে না। সে সম্পর্কে। তাদের দুনিয়ার অবস্থার বিপরীত। কিয়ামতের কোনো কোনো স্থানের মহাসঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখার কারণে। আর কোনো স্থানে তারা চৈতন্য ফিরে পাবে। অপর এক আয়াতে এসেছে তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

١٠٢. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ بِالْحَسَنَاتِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ الْفَائِزُوْنَ ـ

১০২. এবং যাদের পাল্লা ভারি হবে নেকীর কারণে তারাই হবে সফল কাম কৃতকার্য।

١٠٣. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ بِالسَّيِّئَاتِ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ج

১০৩. এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে গুনাহের কারণে। তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। সুতরাং তারা তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

অনুবাদ :

١٠٤. تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ تُحْرِقُهَا وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ـ شُمِّرَتْ شِفَاهُهُمُ الْعُلْيَا وَالسُّفْلٰى عَنْ اَسْنَانِهِمْ ـ

১০৪. অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে জ্বালিয়ে দিবে। এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়। তাদের উপরের ও নিচের ঠোঁট দন্তরাজি থেকে কুঁচকে যাবে।

١٠٥. وَيُقَالُ لَهُمْ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ مِنَ الْقُرْاٰنِ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ تُخَوَّفُوْنَ بِهَا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ـ

১০৫. আর তাদেরকে বলা হবে– তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ কুরআন হতে আবৃত্তি করা হতো না যার দ্বারা তোমাদেরকে ভয় দেখানো হতো। অথচ তোমরা সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করতে।

١٠٦. قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ شَقَاوَتُنَا بِفَتْحِ اَوَّلِهِ وَاَلِفٍ وَهُمَا مَصْدَرَانِ بِمَعْنًى وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ـ عَنِ الْهِدَايَةِ ـ

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অন্য কেরাতে شَقَاوَتُنَا রয়েছে। প্রথম বর্ণ তথা شِيْن -এর যবর এবং قَافْ -এর পর একটি আলিফ বৃদ্ধি করে উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট মাসদার। এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় সৎপথ বিচ্যুত।

١٠٧. رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا اِلَى الْمُخَالَفَةِ فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ـ

১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় ফিরে যাই বিরোধিতার দিকে তবে তো অবশ্যই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী হবো।

١٠٨. قَالَ لَهُمْ بِلِسَانِ مَالِكٍ بَعْدَ قَدْرِ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ ـ اِخْسَئُوْا فِيْهَا اُقْعُدُوْا فِى النَّارِ اَذِلَّاءَ وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ـ فِيْ رَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ فَيَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُمْ ـ

১০৮. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন মালেক ফেরেশতার মুখ দিয়ে দুনিয়ার দ্বিগুণ পরিমাণ সময়ের পর। তোরা হীন অবস্থায়ই এখানেই থাক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় আগুনে বসে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলিস না তোদের থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে। ফলে তাদের আশারও পরিসমাপ্তি ঘটবে।

١٠٩. اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

১০৯. আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল তাঁরা হলো মুহাজির সম্প্রদায় যারা বলতেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন! আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অনুবাদ :

١١٠. فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا بِضَمِّ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْهَزْءِ مِنْهُمْ بِلَالٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسَلْمَانُ حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ فَتَرَكْتُمُوْهُ لِاشْتِغَالِكُمْ بِالْاِسْتِهْزَاءِ بِهِمْ فَهُمْ سَبَبُ الْاِنْسَاءِ فَنُسِبَ اِلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ.

১১০. তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো বিদ্রূপ করতে যে, سُخْرِيًّا শব্দের سِيْن বর্ণে পেশ ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। এটা মাসদার। অর্থ– বিদ্রূপ, উপহাস। তন্মধ্যে ছিলেন হযরত বিলাল, সুহাইব, আম্মার এবং হযরত খাব্বাব (রা.) তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল ফলে তোমরা তা [আমার স্মরণকে] ছেড়ে বসেছিলে। তাঁদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপে লিপ্ত থাকার কারণে। এ হিসেবে তাদের প্রতি ভুলিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধ করে اَنْسَوْكُمْ বলা হয়েছে। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।

١١١. اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ بِمَا صَبَرُوْا عَلٰى اِسْتِهْزَائِكُمْ بِهِمْ وَاَذٰكُمْ اِيَّاهُمْ اِنَّهُمْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ. بِمَطْلُوْبِهِمْ اِسْتِئْنَافٌ وَبِفَتْحِهَا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ لِجَزَيْتُهُمْ.

১১১. আমি আজ তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম চির সুখময় দিন তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তাদের প্রতি তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের এবং নির্যাতনের উপর, বস্তুত তারাই হলো সফলকাম তাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে। اِنَّهُمْ -এর হামযাটি যেরযোগে جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ হিসেবে এবং যবরযোগেও হতে পারে جَزَيْتُهُمْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফঊল হিসেবে।

١١٢. قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ فِى الدُّنْيَا وَفِىْ قُبُوْرِكُمْ عَدَدَ سِنِيْنَ تَمْيِيْزٌ.

১১২. আল্লাহ বলবেন তাদেরকে মালেক ফেরেশতার জবানীতে, অন্য কেরাতে قُلْ রয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে দুনিয়ায় এবং কবরে। বছরের হিসেবে।

١١٣. قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ شَكُّوْا فِىْ ذٰلِكَ وَاسْتَقْصَرُوْهُ لِعَظْمِ مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ. اَىْ الْمَلَائِكَةَ الْمُحْصِيْنَ اَعْمَالَ الْخَلْقِ.

১১৩. তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছি একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। তারা এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হবে। তারা ভয়ানক শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণে দুনিয়ার অবস্থানকে একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করবে। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। অর্থাৎ সৃষ্টির আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

١١٤. قٰلَ تَعَالٰى بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ قُلْ اِنْ اَىْ مَا لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. مِقْدَارَ لُبْثِكُمْ مِنَ الطُّوْلِ كَانَ قَلِيْلًا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى لُبْثِكُمْ فِى النَّارِ.

১১৪. তিনি বলবেন আল্লাহ তা'আলা মালেক ফেরেশতার জবানীতে। অন্য কেরাতে এসেছে قُلْ [আপনি বলুন!] তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের দীর্ঘ অবস্থানের পরিমাণকে। অবশ্য জাহান্নামে অবস্থানের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থান কমই।

অনুবাদ :

١١٥. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا لَا لِحِكْمَةٍ وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ . بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ لَا بَلْ لِنَتَعَبَّدَكُمْ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْيِ وَتُرْجَعُوْا اِلَيْنَا وَنُجَازِيْ عَلٰى ذٰلِكَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। কোনো তাৎপর্য ছাড়াই। আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। تُرْجَعُوْنَ ফে'লটি مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। না, তা নয়; বরং এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে আমার দাসত্ব করবে। এরপর এক সময় আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আমি তোমাদেরকে কর্মের প্রতিফল প্রদান করব। ইরশাদ হচ্ছে– আমি মানব ও দানবকে একমাত্র আমার দাসত্বের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।

١١٦. فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَنِ الْعَبَثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَلِيْقُ بِهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ . الْكُرْسِيِّ هُوَ السَّرِيْرُ الْحَسَنُ .

১১৬. আল্লাহ অতি উর্ধ্বে অনর্থ ইত্যাদি তাঁর শানের অনুপোযোগী কর্ম থেকে। তিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সম্মানিত আরশের তিনিই অধিপতি। আর তা হলো কুরসী। আর তা হলো উন্নত খাট বিশেষ।

١١٧. وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَا مَفْهُوْمَ لَهَا فَاِنَّمَا حِسَابُهُ جَزَاؤُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ج اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ . لَا يَسْعَدُوْنَ .

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে। এ বিষয়ে তার কোনো সনদ নেই। لَا بُرْهَانَ لَهُ হলো اِلٰهًا اٰخَرَ -এর صِفَتْ كَاشِفَةْ -এর مَفْهُوْم مُخَالِفْ তথা বিপরীতমুখী অর্থ ধর্তব্য নয়। তার হিসাব তার প্রতিফল তাঁর প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। সৌভাগ্যশীল হবে না।

١١٨. وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الرَّحْمَةِ زِيَادَةً عَلَى الْمَغْفِرَةِ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ . اَفْضَلُ رَحْمَةٍ .

১১৮. বলুন! হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন মুমিনদেরকে ক্ষমার উপর অনুগ্রহ অনুকম্পা বৃদ্ধির মাধ্যমে। আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। সর্বোত্তম দয়াবান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُرِيَنِّيْ : তুমি আমাকে দেখাবে, এটা اِرَائَةٌ থেকে مضارع , وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ بَانُوْنْ ثَقِيْلَةْ : এটা যবরের উপর মাবনী দু' মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّيْ হয়েছে বাবে اِفْعَالْ-এর হামযার মাধ্যমে ضَمِيْرْ হলো প্রথম মাফউল, আর مَا مَوْصُوْلَةْ হলো দ্বিতীয় মাফউল।

قَوْلُهُ فَلَا تَجْعَلْنِيْ : এটা جَوَابِ شَرْط ; فِيْ এখানে مَعَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিক বিনয় ও আবেগ প্রকাশের দরুন رَبِّ শব্দ পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। فَاَهْلَكَ بِهَلَاكِهِمْ হলো جَوَابْ نَهِيْ

قَوْلُهُ وَإِنَّا عَلٰى اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُوْنَ : إِنَّ হলো حَرْفُ مُشَبَّه -এর نَا হলো إِسْمٌ এবং عَلٰى হলো حَرْفُ جَارٌ - نُرِىَ ফে'ল ও ফায়েল, كَ প্রথম মাফঊল, مَا তার ফায়েল ও উভয় মাফঊল মিলে বাক্য হয়ে সিফত। সিফত মাওসুফ মিলে মাসদারের তাবীলে হয়ে দ্বিতীয় মাফঊল। نُرِىَ তার ফায়েল ও উভয় মাফঊল মিলে বাক্য হয়ে جَارٌ ; مَجْرُوْرٌ মিলে قَادِرُوْنَ -এর مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ অতঃপর قَادِرُوْنَ তার مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ মিলে إِنَّ -এর خَبَرٌ

قَوْلُهُ خُلَّةٌ : خُلَّةٌ অর্থ- চরিত্র, অভ্যাস। ব্যাখ্যাকার (র.) خلة উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ...اَلَّتِىْ হলো مَوْصُوْفٌ -এর صِفَتٌ আর اَلسَّيِّئَةٌ হলো اِدْفَعْ -এর مَفْعُوْل بِهٖ বাক্যটি এরূপ হবে- اِدْفَعِ السَّيِّئَةَ بِالْخَصْلَةِ উহ্য اَلَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

قَوْلُهُ مِنَ الصَّفْحِ وَالْاِعْرَاضِ عَنْهُمْ : এর মধ্যকার مِنْ হলো بَيَانِيَّةٌ আর اَلصَّفْحُ হলো خَصْلَةٌ -এর বয়ান।

قَوْلُهُ اِذَا هُمْ اِيَّاكَ : এটা اَلسَّيِّئَةٌ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ هَمَزَاتٌ : এটা هَمْزٌ -এর বহুবচন, অর্থ- শয়তানী প্ররোচনা, রিপুতাড়িত কামনা বাসনা।

قَوْلُهُ حَتّٰى : এটা اِبْتِدَائِيَّةٌ অর্থাৎ এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ থেকে পৃথক। এর দ্বারা কাফেরদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَلْجَمْعُ لِلتَّعْظِيْمِ : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা একক সত্ত্বা, কাজেই رَبِّ ارْجِعْنِىْ বলা উচিত ছিল। এখানে বহু বচনের সীগাহ ব্যবহার করা হলো কেন?

উত্তর :

১. সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

২. اِرْجِعُوْنِ -এর মধ্যে وَاوْ -কে تَكْرَارٌ বুঝানোর জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ, اِرْجِعْنِىْ، اِرْجِعْنِىْ، اِرْجِعْنِىْ যেমন اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ -এর মধ্যে আলিফটি تَكْرَارٌ তথা اَلْقِ- اَلْقِ এর অর্থে।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَائِهِمْ : هُمْ যমীর لِاَحَدِهِمْ -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে বহুবচনের যমীর আনা হয়েছে। কারণ اَحَدُهُمْ এটা كُلُّهُمْ অর্থে, আর পূর্বে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে اَحَدٌ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ : اَنْسَابٌ শব্দটি نَسَبٌ -এর বহুবচন, অর্থ আত্মীয়তা, বংশীয় সম্বন্ধ। প্রশ্ন জাগে যে, তাদের মাঝে আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক তো একটি অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং তাকে نَفِىْ করা যায় কিভাবে?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) يَتَفَاخَرُوْنَ ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এর উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার বিশেষণ (صِفَتٌ) -কে অস্বীকার করা হয়েছে।। অর্থাৎ তাদের মাঝে গর্ব করার মতো কোনো সম্পর্ক থাকবে না, পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ হাশরের ময়দানের বিভীষিকা যখন তাদের সামনে চলে আসবে তখন পারস্পরিক দয়া-মায়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই নিজচিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। এ অবস্থা চিত্রিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ [স্মরণ রেখ সেদিনকে, যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, তার মা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানাদি থেকে।]

قَوْلُهُ لِمَا يَشْغَلُهُمْ : এটা وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ -এর ইল্লত। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়ার কারণ হলো তাদের নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তিত থাকা।

قَوْلُهُ فِىْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيَامَةِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে মানুষের পরস্পরে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ [তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অগ্রসর হবে।] সুতরাং এর উত্তর কি হবে?

উত্তর : হাশরের ময়দানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি হবে। যে সময় ভয়-ভীতি অতি তীব্র হবে তখন কেউ খোঁজ খবর নিবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে যখন ভয়ভীতি কিছুটা লাঘব হবে তখন একে অন্যকে চিনবে এবং খোঁজ খবর নিবে।

قَوْلُهُ مَوَازِيْنُ : এটাকে হয়তো বিশালত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে, অথবা ওজনের পাল্লা যা উপকরণের বিভিন্ন ধরনের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ একেক প্রকার আমল ওজনের জন্য একে ধরনের মীযান পাল্লা থাকবে। যেমন দুনিয়ায় বস্তুভেদে পরিমাপ-যন্ত্র বিভিন্ন হতে দেখা যায়।

قَوْلُهُ بِالْحَسَنَاتِ : এর মধ্যকার بِ হলো সববিয়া বা কারণজ্ঞাপক। অর্থাৎ নেকীসমূহ ভারি হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ فَهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, فِيْ جَهَنَّمَ হলো উহ্য مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ ; আল্লামা যমশখরী (র.) বলেন- فِى الَّذِيْنَ اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ হলো خَسِرُوْا-এর بَدَلْ-

قَوْلُهُ تَلْفَحُ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ।

قَوْلُهُ شَمَّرَتْ : شَمَّرَ-এর অর্থ হলো জামার হাতা ইত্যাদি গুটান, সংকোচন করা।

قَوْلُهُ وَالسُّفْلٰى عَنْ اَسْنَانِهِمْ : এর পূর্বে اِسْتَرْخَتْ ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى بِلِسَانِ مَالِكٍ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ-এর মাধ্যমে কাফেরদেরকে সম্বোধন করাটা তাদের কাথোপকথন দাবি করে। অথচ অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ এটা কথোপকথন না হওয়া দাবি করে, উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কি?

উত্তর : যে আয়াত দ্বারা কথা না বলা প্রমাণিত হয়, তার উদ্দেশ্য হলো সরাসরি কথা বলা, আর যে আয়াতে কথা বলার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা অর্থ হলো মাধ্যম যোগে কথা বলা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ لَبِثْتُمْ مِقْدَارَ : এখানে لَوْ হলো اِمْتِنَاعِيَّةٌ , আর تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مِقْدَارُ لُبْثِكُمْ উহ্য মেনে مَفْعُوْل উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। جَوَابُ لَوْ-ও উহ্য রয়েছে, كَانَ قَلِيْلًا বলে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ- كَانَ قَلِيْلًا فِيْ عِلْمِكُمْ

قَوْلُهُ اَفَحَسِبْتُمْ : এর মধ্যে হামযাটি উহ্য ফে'লের পূর্বে এসেছে, আর فَ হলো عَاطِفَةٌ ; মূলত اَجَهِلْتُمْ শব্দটি فَحَسِبْتُمْ অর্থে আর اِسْتِفْهَامٌ টি تَوْبِيْخٌ-এর জন্য।

قَوْلُهُ عَبَثًا : হয়তো মাসদার اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে, حَالٌ-এর স্থলে ব্যবহৃত হওয়ায় مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ عَابِثِيْنَ অর্থে অথবা خَلَقْنَا-এর مَفْعُوْلٌ لَهُ

قَوْلُهُ لَا لِحِكْمَةٍ : এটা عَبَثًا-এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ اِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ : এর عَطْف হলো اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ-এর উপর।

قَوْلُهُ لَا بَلْ : এর উত্তরটি পূর্বে اِسْتِفْهَامٌ হিসেবে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ هُوَ سَرِيْرُ الْحَسَنِ : কোনো কোনো কপিতে এ ইবারতটি নেই।

قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَا مَفْهُوْمَ لَهَا : এ ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্ন নিরসন করা।

প্রশ্ন : وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ-দ্বারা বুঝা যায় যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে বস্তুত তাদের এ কর্ম হলো সম্পূর্ণ দলিল প্রমাণহীন কাজ। এর مَفْهُوْمِ مُخَالِفْ তথা বিপরীত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যে শুধু গায়রুল্লাহর ইবাদত করে তার নিকট দলিল প্রমাণ আছে। অথচ এ বিষয়টি সঠিক নয়।

উত্তর : এখানে اٰخَرَ হলো اِلٰهًا-এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ যা কেবল مَوْصُوْف-কে স্পষ্ট করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ ধর্তব্য নয়, অবশ্য صِفَتْ مُخَصِّصَةٌ হলে তার مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ ধর্তব্য হতে صِفَتْ كَاشِفَةٌ তো কেবল

তাকিদের জন্য আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ -এর মধ্যে, طَائِرٌ -এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ হলো بِجَنَاحَيْهِ - [جَنَاحٌ অর্থ ডানা] প্রত্যেক পাখি তো ডানার সাহায্যেই উড়ে, এর অর্থ কি? ঠিক এভাবেই وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ দ্বারাও مَفْهُوْم مُخَالِفْ ধর্তব্য নয়; বরং এটি তাকীদস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। –[রূহুল বয়ান]

فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ এটা হলো جَوَابُ شَرْط

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ : জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হামযা যেরযোগে, এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ -এর মধ্যে ইল্লতের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ : এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আজাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আজাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই; দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আজাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তার জমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোনো আজাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আজাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোনো আজাব ভোগ করবে না; বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা ছওয়াবও পাবে। কুরআন পাক বলে– اِتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ এমন আজাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালিমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ! যদি তাদের উপর আপনার আজাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে তবে আমাকে এই জালিমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহর আজাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ছওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَاِنَّا عَلٰى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُوْنَ : অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আজাব আসা দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আজাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আজাব আসা এর পরিপন্থি নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আজাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আজাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আজাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ : অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জবাবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে গেছে; কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। যেমন– কোনো নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত যারা মুসলমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়।

قَوْلُهُ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে কাফেরদের জুলুম অত্যাচার ও মন্দ আচরণের মোকাবিলায় তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মন্দের মোকাবিলা মন্দ পন্থায় নয়; বরং উত্তম পন্থায় করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে শয়তান চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করেছে, তার প্ররোচনা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘৃণ্য কৌশল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সঠিক পথ হলো, মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ পাককে স্মরণ করা। শুধু আল্লাহ পাকই শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারেন। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে; কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। -[তাফসীরে কবীর খ. ২৩, পৃ. ১১৮]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে প্রিয়নবী ﷺ শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ কখনো শয়তানের ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে অন্য দোয়াও পাঠ করতেন। যেমন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

মূলত বান্দার কোনো কাজে তা পানাহার হোক বা অন্য কিছু, যখন সে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, তখন শয়তান ঐ কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

আবূ দাউদ শরীফে হুজুর আকরাম ﷺ -এর অন্য একটি দোয়াও সংকলিত হয়েছে, কখনো তিনি এ দোয়াও করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, প্রিয়নবী ﷺ আমাদেরক এ দোয়া শিক্ষা দিতেন যাদের অনিদ্রার কষ্ট থাকে তারা এ দোয়া পাঠ করতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ নিয়ম ছিল যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে বয়স্ক হতো, তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিতেন। আর যে অবুঝ হতো, তার জন্যে এ দেয়া লিপিবদ্ধ করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

আবূ দাউদ ছাড়া তিরমিযী এবং নাসায়ী শরীফেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبِّ ارْجِعُوْنِ : অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আজাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস,আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আজাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জারীর (র.) ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব?

আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে– رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ হে প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

قَوْلُهُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ : بَرْزَخٌ-এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে, বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমানা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোম্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আজাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোনো ফায়দা নেই। কারণ সে বরযখ পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই আইন।

قَوْلُهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ : কিয়ামতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের মাধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কুরআন পাকের فَإِذَا نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে নাকি দ্বিতীয় ফুৎকার? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়েরের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারো কোনো প্রাপ্য তার জিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারো জিম্মায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সন্তুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তা-ই-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ -

অর্থাৎ, সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থায় পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; মুমিনগণের নয়। কারণ উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন বলে যে- اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ তা'আলা [ঈমানদার হওয়ার শর্তে] তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই। -[মাযহারী]

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে [কেউ কারো উপকার করতে পারবে না] আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বংশের মধ্যে মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না; কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ : অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোনো অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .... فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ : অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সেই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে।

কুরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহের পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোনো ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতোই হাল্কা হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। কামিল মুমিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হলো। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফেরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্কা হবে। গুনাহগার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহের পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কুরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহের চেয়ে বেশি হবে এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাত যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ নেকীর চেয়ে বেশি হবে এক গোনাহ বেশি হলেও সে দোজখের যাবে। কিন্তু এই মুমিন গুনাহগারের দোজখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্য হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোজখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহের মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওজন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক সেদিক হবে না। যার নেকী ও গুনাহ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোজখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। –[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই উক্তিতে কাফেরদের উল্লেখ নেই, শুধু মুমিন গুনাহগারদের কথা আছে।

আসল ওজনের ব্যবস্থা : কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফের ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফেরের ওজনই হবেন না, সে যত মোটা ও স্থুলদেহীই হোক না কেন। –[বুখারী, মুসলিম] কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম (র.) এই বিষয়বস্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আব্দুর রাজ্জাক 'ফজলুল ইলম' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখায়ী (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে– কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে। তুমি জান এটা কি? [যার দ্বারা পাল্লা ভারি হয়ে গেছে।]। সে বলবে, আমি জানি না। তখন বলা হবে, এটা তোমার ইলম যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী (র.) ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন

শহীদদের রক্ত এবং আলেমদের কলমের কালি [যা দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন] পরস্পরে ওজন করা হবে। আলেমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চেয়েও বেশি হবে। –[মাযহারী]

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোনো অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

قَوْلُهُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ : كَالِحٌ অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎসা আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলাও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تُكَلِّمُوْنَ : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে لَا تُكَلِّمُوْنَ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ اَفَحَسِبْتُمْ : **এ আয়াতসমূহের ফজিলত :** اَفَحَسِبْتُمْ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত এই আয়াতসমূহের বহু ফজিলত হাদীস শরীফে রয়েছে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ জিহাদের জন্যে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল প্রেরণ করেন আর এ আদেশ দেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় এ আয়াত সমূহ পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা নির্দেশ মোতাবেক এ আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকি। ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসি। এক ব্যক্তির কানে অত্যন্ত কষ্ট ছিল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতসমূহ পাঠ করে তার কানে ফুঁক দিয়েছিলেন তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এ কথা জানতে পেরে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, শপথ সেই পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি কেউ পূর্ণ একীন নিয়ে এই আয়াতসমূহ পাহাড়ের উপর পাঠ করে, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে।

قَوْلُهُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ : এখানে اِغْفِرْ ও اِرْحَمْ উভয়ের مَفْعُوْلٌ তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। –[মাযহারী] । রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ও রহমত প্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ : সূরা মু'মিনূনের সূচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং এর সমাপ্তি لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. هٰذِهِ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا لِكَثْرَةِ الْمَفْرُوْضِ فِيْهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الذَّالِ تَتَّعِظُوْنَ ـ

১. এটা একটি সূরা, এটা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। فَرَضْنَا ফেলের رَاءٌ বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত। পাঠে অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি; সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যার অর্থ একেবারেই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে দ্বিতীয় تَاءٌ -কে ذَالٌ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থ উপদেশ গ্রহণ, শিক্ষা লাভ।

٢. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ اَىْ غَيْرُ الْمُحْصَنَيْنِ لِرَجْمِهِمَا بِالسُّنَّةِ وَاَلْ فِيْمَا ذُكِرَ مَوْصُوْلَةٌ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَلِشِبْهِهٖ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِىْ خَبَرِهٖ هُوَ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص اَىْ ضَرْبَةٍ يُقَالُ جَلَدَهٗ ضَرَبَ جِلْدَهٗ وَيُزَادُ عَلٰى ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ تَغْرِيْبُ عَامٍ وَالرَّقِيْقُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَىْ حُكْمِهٖ بِاَنْ تَتْرُكُوْا شَيْئًا مِنْ حَدِّهِمَا اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج اَىْ يَوْمِ الْبَعْثِ فِىْ هٰذَا تَحْرِيْضٌ عَلٰى مَا قَبْلَ الشَّرْطِ وَهُوَ جَوَابُهٗ اَوْ دَالٌّ عَلٰى جَوَابِهٖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اَىِ الْجَلْدَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ قِيْلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيْلَ اَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُوْدِ الزِّنَا ـ

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী অর্থাৎ গায়রে মুহসিন। [মুহসিন বলা হয় বিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষকে।] কারণ সুন্নাহর মাধ্যমে মুহসিনের জন্য রজমের বিধান সাব্যস্ত রয়েছে। اَلزَّانِيَةُ -এর ال টি হলো مَوْصُوْلَةٌ এবং সেটা মুবতাদা হয়েছে। আর তার খবরে فَاءٌ বৃদ্ধি করা হয়েছে শর্তের সাথে এর সদৃশের কারণে। আর তা হলো তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। অর্থাৎ বেত্রাঘাত। বলা হয় جَلَدَهٗ অর্থাৎ ضَرَبَهٗ তথা সে তাকে প্রহার করল। এবং সুন্নাহর মাধ্যমে এর উপর এক বছরের দেশান্তর বৃদ্ধি করা হবে। আর গোলাম বাঁদির ক্ষেত্রে উল্লিখিত শাস্তির অর্ধেক প্রযোজ্য হবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পালনে যে, তোমরা তাদের শাস্তির কিছু অংশ ছেড়ে দিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে। এর মাধ্যমে শর্তের পূর্বের অংশ তথা এ ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর উক্ত অংশটিই শর্তের জবাব, অথবা তার জবাবকে বুঝায় মুমিনদের একটি দল যেন তাদের সাজা প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ বেত্রাঘাত দেখে। বলা হয়েছে তিন জন অথবা চারজন ব্যভিচারের সাক্ষীর পরিমাণ।

অনুবাদ :

৩. اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ يَتَزَوَّجُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج اَىْ الْمُنَاسِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ اَىْ نِكَاحُ الزَّوَانِىْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ . الْاَخْيَارِ نَزَلَ ذٰلِكَ لَمَّا هَمَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اَنْ يَتَزَوَّجُوْا بُغَايَا الْمُشْرِكِيْنَ وَهُنَّ مُوْسِرَاتٌ لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ فَقِيْلَ التَّحْرِيْمُ خَاصٌّ بِهِمْ وَقِيْلَ عَامٌّ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ .

৩. ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করো না এবং ব্যভিচারিণী তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই সমীচীন ও প্রযোজ্য। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য উত্তম ও নেককারদের জন্য। যখন কতিপয় দরিদ্র মুহাজির সাহাবী ধনবতী চরিত্রহীনা নষ্ট নারীকে বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা করলেন, যাতে তারা তাঁদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে, তখন অবতীর্ণ হলো। কেউ কেউ বলেন, উক্ত মুহাজিরগণের সাথেই এই নিষেধাজ্ঞা সুনির্দিষ্ট ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ব্যাপক ছিল। তবে وَاَنْكِحُوا اَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াত দ্বারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।

৪. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْعَفِيْفَاتِ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلٰى زِنَاهُنَّ بِرُؤْيَتِهِمْ فَاجْلِدُوْهُمْ اَىْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً فِىْ شَيْءٍ اَبَدًا ج وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ . لِاِتْيَانِهِمْ كَبِيْرَةً .

৪. যারা সাধবী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে পবিত্র সতী নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। এবং চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে কশাঘাত করবে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না যে কোনো ব্যাপারে। এরাই তো সত্যত্যাগী/ফাসিক কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

৫. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج عَمَلَهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَّهُمْ قَذْفَهُمْ رَحِيْمٌ . بِهِمْ بِاِلْهَامِهِمُ التَّوْبَةَ فَبِهَا يَنْتَهِىْ فِسْقُهُمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَقِيْلَ لَا تُقْبَلُ رُجُوْعًا بِالْاِسْتِثْنَاءِ اِلَى الْجُمْلَةِ الْاَخِيْرَةِ .

৫. তবে যদি এরপর তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তাদের আমলকে আল্লাহ তো অতিশয় দয়াশীল তাদের প্রতি। তাদের অপবাদের পাপের ক্ষেত্রে। পরম দয়ালু তাদের প্রতি। তাদের হৃদয়ে তওবা উদ্রেক করে। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদের ফিসক বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পাপ শেষ হয়ে যাবে। এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এ অভিমতের অনুসারীরা اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا -কে বাক্যের শেষাংশ তথা فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -এর প্রতি নিসবত করেন। [অর্থাৎ যারা তওবা করে নিজেদের আমলের সংশোধন করে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাদের পাপ ক্ষমা করবেন। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণ করার সাথে এর সম্পর্ক নেই।

অনুবাদ :

٦. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَقَعَ ذٰلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ مُبْتَدَأٌ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ نَصَبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ . فِيْمَا رَمٰى بِهٖ زَوْجَتَهٗ مِنَ الزِّنَا .

৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের ব্যাপারে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই। এ বিষয়ে। এক জামাত সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে। এটি মুবতাদা সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, شَهَادَاتٌ শব্দটি মাসদার তথা مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। সে অবশ্যই সত্যবাদী যে ব্যভিচারের বিষয়ে সে তার স্ত্রীকে অপবাদ দিচ্ছে সে বিষয়ে।

٧. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ . فِيْ ذٰلِكَ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَفِ .

৭. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। এ ব্যাপারে। এবং مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ হলো উহ্য يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَفِ অর্থাৎ তার থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

٨. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَىْ حَدَّ الزِّنَا الَّذِىْ ثَبَتَ بِشَهَادَاتِهٖ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ . فِيْمَا رَمَاهَا بِهٖ مِنَ الزِّنَا .

৮. তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে। অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তি যা তার সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। ব্যভিচারের যে ব্যাপারে সে তাকে অপবাদ দিচ্ছে।

٩. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . فِىْ ذٰلِكَ .

৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব। এ বিষয়ে।

١٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ بِالسَّتْرِ فِىْ ذٰلِكَ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ بِقَبُوْلِهِ التَّوْبَةَ فِىْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ حَكِيْمٌ . فِيْمَا حَكَمَ بِهٖ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ لَبَيَّنَ الْحَقَّ فِىْ ذٰلِكَ وَعَاجَلَ بِالْعُقُوْبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا .

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এ বিষয়কে গোপন রাখার ক্ষেত্রে। তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। এবং আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী এ পাপ ও অন্যান্য বিষয়ে তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় এ ক্ষেত্রে এবং আরো যেসব বিষয়ে তিনি বিধান দান করেন। যাতে এ বিষয়ে সত্য স্পষ্ট করেন এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে দ্রুত শাস্তি দেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذِهِ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا : ব্যাখ্যাকার (র.) هٰذِهِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, سُوْرَةٌ হলো উহ্য مُبْتَدَأٌ এর خَبَرٌ ; هٰذِهِ এর مَرْجِعٌ যদিও পূর্বে উল্লেখ নেই তবে যেহেতু উল্লেখের নিকটবর্তী, যা حَاضِرٌ -এর পর্যায়ে শামিল। অতএব اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ তথা مَرْجِعٌ উল্লেখ ছাড়াই ضَمِيْرٌ ব্যবহারের প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। [জুমাল] আবার এমনও হতে পারে যে, سُوْرَةٌ হলো مُبْتَدَأٌ আর اَنْزَلْنَاهَا বাক্যে তার صِفَتٌ আর صِفَتٌ -এর কারণে مُبْتَدَأٌ نَكِرَةٌ হওয়া সঙ্গত হয়েছে। এর خَبَرٌ -এর ক্ষেত্রে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ বাক্য হয়ে خَبَرٌ যেমন ইবনে আতিয়া (র.)-এর অভিমত।

২. خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। বাক্যটি এমন হবে– فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بَعْدَ سُوْرَةٍ এখানে اَنْزَلْنَا দু'বার উল্লিখিত হওয়ার কারণ হলো অধিক গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝানো।

قَوْلُهُ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণাদি। এ সূরার সূচনায় শরয়ী দণ্ড [হদ] ও কতিপয় বিধানের উল্লেখ ছিল। আর সূরার শেষে একত্ববাদের দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ فَرَضْنَا : এর দ্বারা শরয়ী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ দ্বারা দলিল প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَتَذَكَّرُوْنَ : প্রথমে تَاءٌ -কে دَالٌ -এর নিকটবর্তী মাখরাজ হওয়ার কারণে دَالٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে অতঃপর دَالٌ -কে ذَالٌ দ্বারা পরিবর্তন করে অপর ذَالٌ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। يَذَّكَّرُوْنَ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ : এটা হলো مُبْتَدَأٌ আর فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بَعْدُ অথবা فَاجْلِدُوْا হলো خَبَرٌ -আর اَلِفْ لَامْ যেহেতু اَلَّذِيْ অর্থে, যার ফলে مُبْتَدَأٌ টি شَرْط -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়েছে। আর مُبْتَدَأٌ যদি شَرْط -এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তাহলে خَبَرٌ টা جَزَاءٌ -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়েছে। আর مُبْتَدَأٌ যদি شَرْط -এর অর্থবিশিষ্ট হয় তাহলে خَبَرٌ টা جَزَاءٌ -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়। এ কারণে خَبَرٌ -এর শুরুতে فَاءٌ আসে। اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ -এর মধ্যে شَرط টি مُبْتَدَأٌ -এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার خَبَرٌ -এর উপর فَاءٌ প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ هٰذَا تَحْرِيْضٌ عَلٰى مَا قَبْلَ الشَّرْطِ الخ : আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (الاية) এ আয়াতে شَرْط -এর পূর্বে অর্থাৎ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ [তোমাদেরকে যেন দয়ায় পেয়ে না বসে।] এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি ঈমান থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কারো পক্ষপাতিত্ব করো না, কারো উপর দয়া বশীভূত হয়ো না। কূফী নাহু শাস্ত্রবিদগণ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ -কে جَزَاءٌ مُقَدَّمٌ বলেছেন। আর বসরীগণ جَزَاءٌ -কে উহ্য মানেন এবং উপরিউক্ত আয়াতকে جَزَاءٌ -এর নির্দেশিকা বলেন। অর্থাৎ যে বাক্যটি دَالٌّ عَلَى الْجَزَاءِ হবে হুবহু ঐটিই উহ্য جَزَاءٌ হবে।

قَوْلُهُ وَلْيَشْهَدْ : এ নির্দেশটি মোস্তহাবমূলক, ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ قِيْلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيْلَ اَرْبَعَةٌ : এ উভয় উক্তি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর। অর্থাৎ কোড়া মারার সময় তিন/চার ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, চার কিংবা ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম নাসায়ী, মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে কমপক্ষে দু'জন থাকা বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ اَلْمُنَاسِبُ لِكُلٍّ مِنْهَا : এটা তাদের জন্য ধমক ও সতর্কবাণী যারা ব্যভিচারিণী তথা পতিতাদেরকে বিবাহ করতে চায়।

قَوْلُهُ الْاَيَامٰى : শব্দটি اَيِّمٌ-এর বহুবচন। অর্থ- বিধবা ও স্বামীহীনা নারী, [চাই বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা] এবং স্ত্রীহীন পুরুষ উভয়কে বুঝায়।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ : এ অংশটি مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ হলো ৩টি। যথা- ১. فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ২. وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ৩. وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা পূর্বে উভয় বাক্য لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً এবং اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ থেকে مُسْتَثْنٰى সুতরাং কোনো সতী-সাধ্বী নারী বা নির্দোষ পুরুষকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের পর যদি খাঁটি মনে তওবা করে এবং নিজ আমল সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের মতে, এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের ফাসিক হওয়াও রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ اِسْتِثْنَاءٌ হলো শেষ বাক্য- اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর উপর থেকে فِسْق তথা ফাসিক হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

قَوْلُهُ وَقَعَ ذٰلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ : অর্থাৎ স্ত্রীকে অপবাদ আরোপের ঘটনা তিন জন সাহাবী থেকে ঘটেছিল। ১. হিলাল ইবনে উমাইয়া ২. উয়াইমির আজলানী ও ৩. আসিম ইবনে আদী। -[হাশিয়াতুল জুমাল]

قَوْلُهُ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ : এটা مَرْفُوْعٌ হওয়ার তিনটি কারণ থাকতে পারে। যথা-

১. এটা مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرٌ আগে উহ্য রয়েছে। যথা- فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ অথবা পরে, যথা- فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ كَائِنَةٌ

২. مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ হবে। যথা- فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

৩. উহ্য ফে'লের ফায়েল হবে। যথা- فَيَكْفِيْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

চতুর্থ আরেকটি তারকীব হতে পারে যা আমাদের ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعٌ শَهَادَاتٌ হলো مُبْتَدَأٌ আর تَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ হলো خَبَرٌ ; তবে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এটাকে قِيْل দ্বারা উল্লেখ করেছেন, যা দুর্বলতার পরিচায়ক।

অধিকাংশ আলেম اَرْبَعَ-কে মাসদার তথা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ পড়েছেন। আর এর আমিল হল شَهَادَةٌ মাসদার اَرْبَعَ হলো লুপ্ত مَوْصُوْفٌ-এর صِفَتٌ অর্থাৎ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ شَهَادَةً اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ

সারকথা- فَشَهَادَةُ মাসদার তার ফায়েল اَحَدِهِمْ-এর প্রতি مُضَافٌ হয়েছে। মূলত يَشْهَدُ اَحَدُهُمْ অর্থে। এটা مَرْفُوْعٌ হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। যথা-

১. এটা উহ্য مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ বাক্যটি এরূপ ছিল- فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

২. شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ হলো مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرٌ লুপ্ত রয়েছে, অর্থাৎ- فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

قَوْلُهُ ابع : اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ এটা خَبَرٌ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ-ও পঠিত আছে। فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ হলো مُبْتَدَأٌ আর خبر হলো ; এক্ষেত্রে বিলুপ্তির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। জমহুর তথা অধিকাংশের মতে اَرْبَعَ-কে مَنْصُوْبٌ-ও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ- يَشْهَدُ اَحَدُهُمْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

قَوْلُهُ بِاللّٰهِ : বসরীগণের মতে এটা شَهَادَاتٌ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। আর কূফীগণের মতে شَهَادَةٌ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা এটা আগে এসেছে।

قَوْلُهُ اِنَّهُ : এটা شَهَادَةٌ বা شَهَادَاتٌ-এর مَعْمُوْل অর্থাৎ, يَشْهَدُ عَلٰى اَنَّهُ صَادِقٌ-এর থেকে عَلٰى-কে বিলোপ করা হয়েছে, আর اَنَّ-এর যবরকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আমেলকে لَامُ تَاكِيْد-এর কারণে আমল থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْخَامِسَةُ لَعْنَةَ عَلَيْهِ : এটা مُبْتَدَأٌ আর لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ হলো خَبَرْ ; বাক্যটি এরূপ ছিল– وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ اَنَّ

قَوْلُهُ اَنْ تَشْهَدَ : এটা يَدْرَءُ -এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ : لَوْلَا -এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি মূলত لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ لَفَضَحَكُمْ اَوْ لَهَلَكْتُمْ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নূরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, শাসন-শৃঙ্খলা এবং তাওহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উন্নয়নের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) কূফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারি করেছিলেন। যা নিম্নরূপ– عَلِّمُوْا نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, স্ত্রীলোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবে না, তাদেরকে লেখনী শিক্ষা দেবে না, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সূতো কাটা শিক্ষা দেবে। –[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৯৩]

সায়ীদ ইবনে মনসূর, ইবনুল মুনজির, বায়হাকী মুজাহিদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও; আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শেখাও।

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নিসা, সূরা আহযাব এবং সূরা নূর শেখাও। –[রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ৭৪]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা মু'মিনূন -এর প্রারম্ভে মুমিনগণের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে। তারা চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়। কখনো তারা অন্যায় অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃন্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা অনেক দূরে থাকে। আর এমনি গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্নাতুল ফেরাদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ সূরার প্রারম্ভে সেসব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে এবং যারা এ পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন করে।

যারা এমনি অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন ঐ নূরই কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এজন্যে হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসিরাতে পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর বিদায় নেবে, তারা আর পুলসিরাতের পথ দেখবে না। এজন্যে মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হবে যেন মুনাফিকদের ন্যায় মুমিনদের নূরও দূরীভূত না হয়। এ কারণেই মুমিনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্যে মুনাজাত করে বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায়? এ কথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদ সমূহে, আল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর।

অতএব, মুমিনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মুমিনের কলব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমরাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কিয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতার পর্যবসিত। এজন্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে, তারাই হবে [জীবন-সাধনায়] সফলকাম।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য : সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে যেসব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আখিরাতের স্মরণের তাগিদ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যা দ্বারা এর বিধানাবলির বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি যা সূরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমানায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপারাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলি সংঘটিত হয় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতা মূলোৎপাটনের জন্যে এর শরিয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শাস্তি সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে : কুরআন পাক ও মূতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর তা ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' [দণ্ড] বলা হয়। হুদূদ চারটি। যথা– চুরি, কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোনো অপরাধে নেই। যেমন–

১. কোনো ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কুরবানি করা ততটুকু কঠিন নয় যতুটুকু কঠিন তার অন্দর মহলের উপর হাত রাখা। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

২. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। জননী, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারে চেয়েও কঠোরতর অপরাধ।

৩. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চেয়ে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারে যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কুরআনে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সঙ্গোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়। যেমন- اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে; এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষেণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হিফাজতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা তার বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। তাই সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

قَوْلُهُ فَاجْلِدُوْا : جِلْد শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جِلْدٌ [চামড়া] থেকে উদ্ভূত। কারণ চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন- جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কশাঘাতের শাস্তিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, তাতে মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোনো কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন- মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই-

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا - وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -

অর্থাৎ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগে জনসম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচারে প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ বিধান নয়; বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا অংশের মর্ম তা-ই।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মতো যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোনো বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি; বরং কুরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর, তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল। যার পরিমাণ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মন্তব্য করলেন, সূরা নিসায় اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করা শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন– يَعْنِى الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা– একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরঘাতে হত্যা। –[ইবনে কাসীর]

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, নাকি বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য

দেশান্তরিতও করে দেবেন? এই ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল। অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্র হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا আয়াতের তাফসীর করেছেন। তাফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। ১. একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং ৩. বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান । বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদশে বলে ছিল। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে– اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ; পয়গাম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'ইয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিত মহিলাকে প্রস্তরঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। –[ইবনে কাসীর]

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন। অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে; প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তাফসীর আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ–

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اٰيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى اَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِهِ فَرِيْضَةً اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَاِنَّ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنَا اِذَا حَصُنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبْلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ .

অর্থাৎ হযরত ওমর ফারূক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাজিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে– একথা সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি তা প্রযোজ্য; যদি ব্যভিচারের শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। –[মুসলিম খ. ২, পৃ. ৬৫]

এই রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত আছে। [বুখারী খ. ২, পৃ. ১০০৯] নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিম্নরূপ–

اِنَّا لاَ نَجِدُ مِنَ الرَّجْمِ بُدًّا فَاِنَّهٗ حَدٌّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ اَلاَ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهٗ وَلَوْلاَ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُوْنَ اِنَّ عُمَرَ زَادَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ لَكَتَبْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمُصْحَفِ وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهٗ ـ

অর্থাৎ "শরিয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহর অন্যতম হদ। মনে রেখে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। ওমর ইবনে খাত্তাব, আব্দুর রহমান ইবন আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।" –[ইবনে কাসীর]

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াতের ভাষ্য প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কুরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম। –[নাসায়ী]

এই রেওয়ায়েত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কুরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত ওমর (রা.) মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয়ে এই যে, হযরত ওমর (রা.) একথা বলেননি যে, আমি এই আয়াতকে কুরআনে দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ওমর (রা.) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তাফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোনো শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়; বরং সুরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ স্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কুরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহবিদগণ একে 'তেলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়'–এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কুরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

সারকথা এই যে, সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরি জ্ঞাতব্য : এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়র মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিনটি স্তর : উপরিউক্ত রেওয়ায়েত ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এ বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামি আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও কড়া রাখা হয়েছে : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর এতদসঙ্গে ইসলামি আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি 'হদ' মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যভিচারে হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি; যেমনটা সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরি কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তি এই সাক্ষ্যে দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি তথা বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি ফিকহগ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তাফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে কম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ : ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের পক্ষ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

قَوْلُهُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা : অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্য ইসলামি শরিয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্ত বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরিয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরিয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ইসলাম ততটুকুই যত্নবান। এ

কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً الخ : ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। তন্মধ্যে অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয় এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়, কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোনো সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরিয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে, পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোনো মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্য অর্থাৎ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً -এর অর্থ।

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোনো সত্যিকার মু'মিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ মু'মিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যাঁ, এরূপ নারীকে কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোনো মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দুটি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য অর্থাৎ- وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ -এর অর্থ।

উল্লিখিত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোনো পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সৎপুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরিয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকহবিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলি প্রমাণিত আছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ : আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে ذٰلِكَ বলে জেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তাফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো

আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন যে, ذَالِكَ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎপুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎপুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যূসী [ভেড়ুয়াপনা] যা শরিয়তে হারাম। এমনিভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরি নয়। শরিয়তের পরিভাষায় 'হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোনো পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়। যেমন– কোনো মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবিরা গুনাহ এবং শরিয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।
২. কাজটি হারাম অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এবং শরিয়তানুযায়ী দুজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতি ক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে তা বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরিয়তারোপিত ফলাফল যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে حُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ সঠিক। কোনো কোনো তাফসীরকারক আয়াতটি মনসূখ তথা রহিত বলেন; কিন্তু বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটি মনসুখ বলার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الخ : ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান : মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরিয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চেয়ে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরিয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্যে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরিয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুৎসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চেয়ে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোনো সময় শরিয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এ ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরিয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না: বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে।

কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহসিনাত কারা? مُحْصَنَاتٌ শব্দটি اِحْصَانٌ থেকে উদ্ভূত। শরিয়তের পরিভাষায় اِحْصَانٌ দু' প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য اِحْصَانٌ এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য اِحْصَانٌ এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই। -[জাসসাস]

قَوْلُهُ وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا : অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোনো মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা না করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হ্যাঁ, তবে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا : এ বাক্যের এই ব্যতিক্রম বিধান ইমাম আবূ হানীফা ও অন্য কয়েক জন্য ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ, وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এর সাথে অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক; কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে ফাসেক থাকবে না এবং তাঁর পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া- এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আজাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি তথা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম বিধান পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্কে রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাসসাস ও মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জবাব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ الخ : ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান : لِعَانٌ ও مُلَاعَنَتٌ শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেওয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়; আর অপর পক্ষে স্ত্রী তার স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে

উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরিউক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী? মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকহগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামি শরিয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরি যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ করে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খুলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খুলে তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা- বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ানের আয়াতের শানে নুযূল কোন ঘটনাটি? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন, বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নববী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানীতে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই জবানীতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোনো নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরি করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে; তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) রাসুলাল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাজিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি শুনছ তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) নিজেই আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ !

আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমার পুরাপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরি যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং তাদেরকে সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই। -[কুরতুবী]

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াজের এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া ইশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন; কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্র হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে, কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরিয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন, আল্লাহ কসম! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালের ব্যাপারে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চার সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। উত্তরে তিনি আরজ করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন , তাঁর কসম! আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন কোনো বিধান নাজিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

আবূ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্যার সমাধান নাজিল করেছেন। হিলাল আরজ করলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হলো। সে বলল, আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আজাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হিলাল (রা.) আরজ করলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমি সম্পূর্ণ কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও! অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাজির ও নাজির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল (রা.) আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষ্য এরূপ- যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল (রা.)-কে বললেন, দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহর আজাব মানুষের দেওয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরজ করলেন, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আজাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আজাব মানুষের আজাব তথা ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ

অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে; সে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। -[মাযহারী]

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন- অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূল ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষর সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাতো বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখেতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি......... পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমার নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! বিগত জুমায় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা আমার পরিবারে মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। -[মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সাঈদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপে এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এসো, বর্ণনাকারী সাহল বললেন, তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। -[মাযহারী]

উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হজর ও ইমাম নববী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ানের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অভিযোগ পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে- فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষ্য হচ্ছে- قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكَ -এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাজিল করেছেন। -[মাযহারী]

১১. إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ أَسْوَءَ الْكِذْبِ عَلٰى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا بِقَذْفِهَا عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ وَمِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ لَا تَحْسَبُوْهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ غَيْرَ الْعُصْبَةِ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط يَأْجُرُكُمُ اللّٰهُ بِهٖ وَيُظْهِرُ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ وَهُوَ صَفْوَانُ فَإِنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَفَرَغَ مِنْهَا وَرَجَعَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَاٰذَنَ بِالرَّحِيْلِ لَيْلَةً فَمَشَيْتُ وَقَضَيْتُ شَأْنِيْ وَأَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَإِذَا عِقْدِيْ انْقَطَعَ هُوَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الْقِلَادَةُ فَرَجَعْتُ أَلْتَمِسُهٗ وَحَمَلُوْا هَوْدَجِيْ هُوَ مَا يُرْكَبُ فِيْهِ عَلٰى بَعِيْرِيْ يَحْسَبُوْنَنِيْ فِيْهِ وَكَانَتِ النِّسَاءُ خِفَافًا إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ هُوَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُوْنِ اللَّامِ مِنَ الطَّعَامِ أَيِ الْقَلِيْلِ وَجَدْتُ عِقْدِيْ وَجِئْتُ بَعْدَ مَا سَارُوْا فَجَلَسْتُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِيْ كُنْتُ فِيْهِ .

অনুবাদ :

১১. যারা এই অপবাদ রচনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর এই মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে জঘন্যতম মিথ্যা বলেছে। তারা তো তোমাদেরই একটি দল অর্থাৎ মুমিনগণেরই একটি গ্রুপ। অর্থাৎ হযরত হাসসান ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, মিসতাহ এবং হামযা বিনতে জাহশ। একে তোমরা মনে করিও না উক্ত দলটি ছাড়া অপরাপর মুমিনগণ তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করবেন। আর তাঁর সাথে যে সাহাবী ছিলেন তিনি হলেন হযরত সফওয়ান (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণের পরে আমি রাসূল ﷺ -এর সাথে কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, একরাতে তিনি কাফেলা রওয়ানা দেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলাম। আমি কাফেলার নিকট এসে দেখলাম যে, আমার গলার হারটি হারিয়ে গেছে। [عِقْدٌ শব্দের عَيْن বর্ণটি যেরযুক্ত, অর্থ— গলার মালা, হার।] আমি সেটিকে তালাশে ফিরে গেলাম। তারা আমার হাওদাজকে উঠিয়ে ফেলল। হাওদাজ হলো আমার উটের পিঠে আরোহণ করার জন্য যা স্থাপন করা হয়েছিল [পালকি জাতীয় বাহন] তারা মনে করেছিল যে, আমি তাতে রয়েছি। কারণ তৎকালীন নারীরা অল্প ভক্ষণের কারণে খুবই ছিপছিপে ও হাল্কা ধরনের ছিল। عُلْقَه শব্দে عَيْن বর্ণে পেশ এবং لَامْ বর্ণটি সাকিনযুক্ত, অর্থ— অল্প খাবার। আমি তথায় আমার হারটি পেয়ে গেলাম এবং তারা চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে আসলাম। তখন আমি যে স্থানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম।

وَظَنَنْتُ اَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُوْنَنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ فَغَلَبَتْنِىْ عَيْنَاىَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ اَىْ نَزَلَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ لِلْاِسْتِرَاحَةِ فَسَارَ مِنْهُ فَاَصْبَحَ فِىْ مَنْزِلِىْ فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ اَىْ شَخْصَهٗ فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَكَانَ يَرَانِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهٖ حِيْنَ عَرَفَنِىْ اَىْ قَوْلَهٗ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ اَىْ غَطَّيْتُهٗ بِالْمِلَاءَةِ وَاللّٰهِ مَا كَلَّمَنِىْ بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتِرْجَاعِهٖ حِيْنَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهٗ وَوَطِئَ عَلٰى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُبِى الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُوْغِرِيْنَ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ اَىْ مِنْ اَوْغَرَ اَىْ وَاقِفِيْنَ فِىْ مَكَانٍ وَغْرٍ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِىَّ وَكَانَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلٍ اِنْتَهٰى قَوْلُهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ تَعَالٰى لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَىْ عَلَيْهِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج فِىْ ذٰلِكَ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ اَىْ تَحَمَّلَ مُعْظَمَهٗ فَبَدَأَ بِالْخَوْضِ فِيْهِ وَاَشَاعَهٗ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ هُوَ النَّارُ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

অনুবাদ :

এবং মনে মনে ভাবলাম যে, যখন তারা আমাকে পাবে না তখন তারা আমার তালাশে অবশ্যই এখানে আসবে। আমার চোখে নিদ্রা চলে আসায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সফওয়ান (রা.) পেছনে তল্লাশীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওনা হয়ে প্রভাতে আমার স্থানে পৌঁছলেন [عَرَّسَ এবং اِدَّلَجَ ফে'ল দুটো তাশদীদযুক্ত। عَرَّسَ অর্থ– শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা আর اِدَّلَجَ অর্থ– যাত্রা করা। তিনি একজন নিদ্রিত মানুষের আকৃতি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন। কেননা তিনি আমাকে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন। তখন তিনি "ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বললেন, তার এই শব্দে আমি জাগ্রত হয়ে সাথে সাথে উড়না বা চাদর দ্বারা মুখ ডেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমার সাথে আর একটি কথাও বলেননি এবং اِسْتِرْجَاعٌ তথা ইন্নালিল্লাহ ব্যতীত তার থেকে অন্য কোনো শব্দও আমি শুনিনি। তিনি তার উট বসিয়ে তার [উটের] হাত অর্থাৎ, উটের সামনের দু পা ধরে রাখলেন যাতে সে দ্রুত উঠে না যায়। অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করালাম। তিনি আমাকে নিয়ে উটের লাগাম ধরে কাফেলা পানে ছুটে চললেন। এভাবে আমরা এমন সময় কাফেলার নিকট পৌঁছলাম, যখন তারা দ্বি-প্রহরের তীব্র গরমের কারণে যাত্র বিরতি করছিলেন। مُوْغِرِيْنَ শব্দটি اَوْغَرَ হতে নির্গত, যার অর্থ– তীব্র গরমে তপ্ত জায়গায় যাত্রা বিরতি করা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার সমালোচনা করে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। –[বুখারী-মুসলিম] আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল। এ ব্যাপারে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে উক্ত বিষয়ে ছিদ্রান্বেষণের পেছনে পড়েছে এবং তা প্রচার করেছে সে হলো [মুনাফিক নেতা] আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল'। তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। আর তা হলো পরকালে জাহান্নামের অগ্নিদাহন।

অনুবাদ :

١٢. لَوْلَآ هَلَّا إِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ أَيْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ كِذْبٌ بَيِّنٌ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ أَيْ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ ـ

১২. যখন তোমরা একথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করল না। অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি ধারণা করা। এবং তারা কেন বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা। এখানে خِطَابٌ হতে غَيْبَتٌ -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ হয়েছে। অর্থাৎ- ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ [হে লোকজন! তোমরা কেন সুধারণা পোষণ করলে না ও বললে না।]

١٣. لَوْلَا هَلَّا جَآءُوْا أَيِ الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ج شَاهَدُوْهُ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ أَيْ فِيْ حُكْمِهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ فِيْهِ ـ

১৩. তারা উক্ত দলটি কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট অর্থাৎ তাঁর বিচারে মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে।

١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ أَيْ خُضْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِي الْاٰخِرَةِ ـ

১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করতো হে লোকজন! অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ে ছিদ্রান্বেষণ করছিলে চরম শাস্তি পরকালে।

١٥. إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ أَيْ يَرْوِيْهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ وَحُذِفَ مِنَ الْفِعْلِ إِحْدَى التَّائَيْنِ وَإِذْ مَنْصُوْبٌ بِمَسَّكُمْ أَوْ بِأَفَضْتُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا لَا إِثْمَ فِيْهِ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ـ فِي الْإِثْمِ ـ

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ একে অপরের নিকট বর্ণনা করছিলে। تَلَقَّوْنَهٗ ফেলটিতে একটি تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর إِذْ অব্যয়টি مَنْصُوْبٌ হয়েছে مَسَّكُمْ বা اَفَضْتُمْ -এর কারণে। এবং এমন বিষয় মুখে মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যে, এতে কোনো পাপ হবে না। যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয় পাপের ক্ষেত্রে।

অনুবাদ :

١٦. وَلَوْلَآ هَلَّا إِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ مَا يَنْبَغِى لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هُوَ لِلتَّعَجُّبِ هُنَا هٰذَا بُهْتَانٌ كِذْبٌ عَظِيْمٌ .

১৬. তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। সমীচীন নয় আল্লাহ পবিত্র মহান سُبْحَانَكَ শব্দটি এখানে বিস্ময়সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তো এক গুরুতর অপরাধ। মিথ্যা রটনা।

١٧. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . تَتَّعِظُوْا بِذٰلِكَ .

১৭. আল্লাহ তোমাদেরেকে উপদেশ দিচ্ছেন নিষেধ করেছেন বারণ করেছেন তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। এর দ্বারা উপদেশ লাভ কর।

١٨. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط فِى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهٖ وَيَنْهٰى عَنْهُ حَكِيْمٌ فِيْهِ .

১৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ যে ব্যাপারে তিনি আদশে করেন এবং যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেন। প্রজ্ঞাময় এ ব্যাপারে।

١٩. إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ بِاللِّسَانِ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِنِسْبَتِهَا إِلَيْهِمْ وَهُمُ الْعُصْبَةُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا بِالْحَدِّ لِلْقَذْفِ وَالْاٰخِرَةِ ط بِالنَّارِ لِحَقِّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنْتِفَاءَهَا عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ لَا تَعْلَمُوْنَ . وُجُوْدَهَا فِيْهِمْ .

১৯. যারা মুমিনদরে মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে মৌখিকভাবে। তাঁদের প্রতি অশ্লীলতার সম্বন্ধ করে। তারা হলো একটি দল। তাদের জন্য, রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি পৃথিবীতে অপবাদের সাজা প্রয়োগের মাধ্যমে। এবং আখিরাতে জাহান্নামে অগ্নি দ্বারা আল্লাহর হকের কারণে। এবং আল্লাহ জানেন তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টি অসত্য হওয়াকে তোমরা হে লোক সকল! জান না তাদের মাঝে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে।

٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ بِكُمْ لَعَاجَلَكُمْ بِالْعُقُوْبَةِ .

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে হে লোক সকল! [এ বিষয়টি গোপন রাখার মাধ্যমে, তাহলে তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না।] এবং আল্লাহ তা'আলা দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু তোমাদের সাথে শাস্তি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ الخ : এখানে থেকে ১৮নং আয়াত পর্যন্ত إِفْك -এর আলোচনা করা হয়েছে। অভিধানে إِفْكٌ অর্থ হলো পরিবর্তন সাধন করা, পাল্টে ফেলা। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম মিথ্যা হলো যা সত্যকে আসত্যে ও অসত্যকে সত্যে পরিণত করে। সৎ নিষ্কলুষ ব্যক্তিকে ফাসিক ও ফাসিককে সৎ নিষ্কলুষ পরহেজগার বানিয়ে দেয়। শরিয়তে একে ইফক বলা হয়।

قَوْلُهُ عُصْبَةٌ : ছোট দল, উক্ত দলের লোক সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبُوْهُ : এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর, আয়েশা ও সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَنْ جَاءَ مِنْهُ : এখানে مَنْ দ্বারা সাফওয়ান ইবনে মুআত্তা সুলামী (রা.) উদ্দেশ্য। আর مِنْهُ দ্বারা إِفْك-এর ঘটনা উদ্দেশ্য। مِنْهُ- -এর সম্পর্ক হলো بَرَاءَةٌ -এর সাথে।

قَوْلُهُ فِيْ غَزْوَةٍ : এর দ্বারা গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিক উদ্দেশ্য। এর অপর নাম হলো গাযওয়ায়ে মুরাইসী। বিশুদ্ধ উক্তি মতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা।

قَوْلُهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ : حِجَابٌ দ্বারা পর্দা সংক্রান্ত আয়াত উদ্দেশ্য। আর তা হলো- وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

قَوْلُهُ قَد عَرَّسَ : تَعْرِيْس বলা হয় বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে অবতরণকে।

قَوْلُهُ إِدَّلَجَ : إِدَّلَجَ وَادْلَاجٌ অর্থ- শেষ রাতে সফর করা।

قَوْلُهُ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ : عَرَّسَ ও إِدَّلَجَ সম্পর্কে ক্রমধারা (لَفٌّ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ) রূপে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَاء ও دَال উভয়টি তাশদীদযোগে।

قَوْلُهُ نزل مِنْ أخِرِ اللَّيْلِ لِلْإِسْتِرَاحَةِ : এটা عَرَّسَ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ فَسَارَ مِنْهُ : এটা হলো ادلج -এর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকার (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর শব্দের ব্যাখ্যা করার জন্য এর মাঝে বিশ্লেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন, নতুবা মূল ভাষ্য হত এরূপ-

كَانَ صَفْوَانُ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ مِنْهُ فَاَصْبَحَ فِيْ مَنْزِلِيْ

قَوْلُهُ مُوْغِرِيْنَ : এটা وَغْرٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ প্রচণ্ড গরম।

قَوْلُهُ بِالْمِلَاةِ : এমন চাদর যা শরীরকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

قَوْلُهُ مُوْغِرِيْنَ : অর্থ হলো তীব্র গরমে প্রবেশকারী।

قَوْلُهُ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ : ঠিক দ্বিপ্রহরে।

قَوْلُهُ سَلُوْلٍ : সালূল হলো মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর মায়ের নাম।

قَوْلُهُ لِكُلِّ امْرِئٍ : ব্যাখ্যাকার (র.) عَلَيْهِ দ্বারা তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَامْ টি عَلٰى অর্থে।

قَوْلُهُ لَوْلَا هَلَّا : এ لَوْلَا টি تَوْبِيْخِيَّة বা ধমকমূলক। কেননা এটি مَاضِىْ -এর পূর্বে এসেছে। لَوْلَا মূলত ৩ ধরনের হয়ে থাকে।

১. مَاضِىْ -এর পূর্বে এলে تَوْبِيْخِيَّة তথা ধমকমূলক হয়। ২. مُضَارِعْ -এর পূর্বে এলে تَحْضِيْضِيَّة তথা উৎসাহজ্ঞাপক হয়। ৩. আর جُمْلَة اِسْمِيَّه -এর পূর্বে এলে اِمْتِنَاعِيَّة তথা পূর্ববর্তী অংশের অস্তিত্বের দরুন পরবর্তী অংশের অস্তিত্ব না হওয়া বুঝায়।

এখানে মোট ৬ জায়গায় لَوْلَا ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম, ২য়, ও ৪র্থটি تَوْبِيْخِيَّة ; এ কারণে এর جَوَابٌ -এর প্রয়োজন নেই। আর ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠটি شَرْطِيَّه বা اِمْتِنَاعِيَّه ৩য় ও ৬ষ্ঠটির ক্ষেত্রে جواب উল্লিখিত হয়েছে। আর ৫ম স্থানে جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। -[হাশিয়াতুস সাবী]।

قَوْلُهُ بِاَنْفُسِهِمْ اَىْ اَبْنَاءِ جِنْسِهِمْ فِى الْاِيْمَانِ : অর্থাৎ ঈমানী ভাইদের প্রসঙ্গে সু-ধারণা পোষণ করেনি কেন?

قَوْلُهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ : অর্থাৎ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ হিসেবে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ এবং قَالُوْا -এর স্থলে ظَنَنْتُمْ ও قُلْتُمْ বলা প্রয়োজন ছিল। এ জন্যে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, এখানে اِلْتِفَاتٌ ঘটেছে। এখানে বস্তুত দু'ধরনের اِلْتِفَاتٌ ঘটেছে। ক. حَاضِرٌ থেকে غَائِبٌ -এর প্রতি। খ. এবং যমীর থেকে প্রকাশ্য ইসমের প্রতি। এ اِلْتِفَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَوْبِيْخٌ তথা ধমকের ক্ষেত্রে আধিক্যতা বুঝানো। অর্থাৎ মর্ম এই যে, এ ধরনের বিষয়ে ঈমানের দাবি এই ছিল যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। আর তার স্থলে তোমরা তাদের দোষক্রটির অন্বেষণে ও দুর্নাম করার পেছনে লেগে রয়েছ। প্রয়োজন তো ছিল তাদের ব্যাপারে কেউ সমালোচনা ও কুমন্তব্য করলে তার প্রতিবাদ করা, যেভাবে নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করে থাক। বাক্যটি এরূপ ছিল-

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاِخْوَانِهِمْ خَيْرًا وَهَلَّا قُلْتُمْ اِفْكٌ مُبِيْنٌ

[তোমরা যখন তা শুনলে হে মুমিনগণ! তোমাদের ভাইদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে না কেন? তোমরা কেন বললে না যে, এটা স্পষ্ট মিথ্যা।

قَوْلُهُ لَوْلَا هَلَّاجَاؤُوْا عَلَيْهِ : এটা পূর্বের কথার পরিশিষ্টও হতে পারে, অর্থাৎ মু'মিন নারী পুরুষগণ মিথ্যা রচনাকারীদের নিকট ৪জন সাক্ষী পেশ করার দাবি জানাল কেন? অর্থাৎ অপবাদ শ্রবণের পর যেভাবে পরস্পরে সুধারণা পোষণ করা জরুরি ছিল তদ্রূপ অপবাদ আরোপকারীদের নিকট ৪জন সাক্ষী তলব করাও জরুরি ছিল। اَىْ وَقَالُوْا هَلَّا جَاءُوْا الْخَائِضُوْنَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلٰى مَا قَالُوْا

দ্বিতীয় ধরন এ হতে পারে যে, لَوْلَا جَاءُوْا হলো جُمْلَة مُسْتَنَافِيَة । এ সময় قَالُوْا বিলুপ্ত মানার প্রয়োজন পড়বে না।

قَوْلُهُ اَىْ فِىْ حُكْمِهِ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : মিথ্যা অভিযোগকারীদেরকে আল্লাহর সমীপে এজন্য মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে যে, তারা ৪জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ৪ জন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হলেও তারা মিথ্যুকই ছিল।

উত্তর : সাক্ষী পেশ করতে না পারার ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যুক ছিল, আর যদি সাক্ষী পেশ করত, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে বাহ্যত সত্যবাদী হতো। আর আল্লাহ তা'আলার যেহেতু তাদের জাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবেই মিথ্যুক সাব্যস্ত করার ইচ্ছা ছিল, এ জন্য ৪জন সাক্ষী তলব করেছেন। যাতে স্পষ্টাকারে তাদের মিথ্যা প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ : এর اِمْتِنَاعِيَّه টি لَوْلَا ; এর جَوَابٌ হলো لَمَسَّكُمْ

قَوْلُهُ فِيْمَا اَفَضْتُمْ : এখানে অব্যয়টি সবব অর্থে। اَىْ بِسَبَبِ مَا اَفَضْتُمْ আর مَا হলো مَوْصُوْلَة -এর দ্বারা ইফক সংক্রান্ত হাদীস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ لَمَسَّكُمْ بِسَبَبِ الَّذِىْ خُضْتُمْ فِيْهِ وَهُوَ الْاِفْكُ আর مَا টা مَصْدَرِيَّة ও হতে পারে। اَىْ لَمَسَّكُمْ بِسَبَبِ خَوْضِكُمْ

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ : এখানে اِذْ হলো قُلْتُمْ -এর ظَرْف তথা مَفْعُوْل فِيْهِ مُقَدَّمٌ অর্থাৎ তোমাদের জন্য উচিত ছিল যে, অপবাদ শ্রবণ মাত্রই এমন কথা বলে দিতে যে, এ ধরনের সমালোচনা ও মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়।

قَوْلُهُ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَعُوْدُوْا : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَعِظُكُمْ ক্রিয়াটি عَنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ -এর অর্থবিশিষ্ট। অতঃপর عَنْ -কে বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْعَوْدِ ; اَنْ হলো مَصْدَرِيَّة -এর কারণে تَعُوْدُوْا ক্রিয়াটি عَوْد অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ تَتَّعِظُوْنَ بِذَالِكَ : এ বাক্যটি مُؤْمِنُوْنَ -এর সিফত। অর্থাৎ তোমরা যদি উপদেশ গ্রহণকারী মু'মিন হও, তাহলে এমন আচরণ দ্বিতীয়বার আর করবে না। এখানে جَوَاب شَرْط লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَلَا تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ

قَوْلُهُ بِاللِّسَانِ : এটা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারীদের নিকট এটা পছন্দনীয় ছিল যে, সবার মুখে মুখে অশ্লীল বিষয়ের প্রচার হোক। প্রকৃত অশ্লীলতার প্রসার ঘটা উদ্দেশ্য ছিল না।

قَوْلُهُ بِنِسْبَتِهَا اِلَيْهِمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আয়েশা (রা.) ও সাফওয়ান (রা.), আর وَهُمْ عُصْبَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক, যারা অশ্লীল বিষয়ের প্রচার কামনা করত।

قَوْلُهُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এটা হলো اِنَّ -এর خَبَرٌ

قَوْلُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ : এর عَطْف হলো فَضْلُ اللّٰهِ -এর উপর। আর لَعَاجَلَكُمْ হলো لَوْلَا -এর جَوَابٌ মা'তূফ ও مَعْطُوْف عَلَيْهِ মিলে مُبْتَدَأ আর এর خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। তা হলো– مَوْجُوْدَانِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারকলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরিউক্ত দশটি আয়াত নাজিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে–

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরিতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা চলে গেছে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। বাহন

উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ও ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজের জন্য নিযুক্ত করছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজি'উন" উচ্চারিত হয়ে গেল। এ বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিসতা এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ (রা.) ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত। তাফসীরে দূররে মনসূরে ইবনে মরদুওয়াইহের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে– اَعَانَهُ اَىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ حَسَّانُ وَمِسْطَحُ وَحَمْنَهُ

যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। আয়াতগুলোর তাফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ হিসেবে বর্ণিত কুরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের উপর অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন মুসলমান মিসতাহ, হামনাহ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী (র.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসলুল্লাহ ﷺ আসলে অপবাদ রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। –[বয়ানুল কুরআন]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে , যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, এ আপনার স্ত্রী। –[তিরমিযী] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : রাসূলুল্লাহ তাঁকে ছাড়া কোনো কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : রাসলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কখনো ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোনো বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফকীহ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দীকার চেয়ে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। -[তিরমিযী]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসূফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাজিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ : إِفْكٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টিয়ে দেওয়া, বদলিয়ে দেওয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহভীরুকে ফাসিকরূপে এবং ফাসিককে আল্লাহভীরু পরহেজগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও إِفْك বলা হয়। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِنْكُمْ বলে মু'মিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়, মুনাফিক ছিল। কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানি দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিনদের বাহ্যিক বিধানাবলি প্রযোজ্য হতো। তাই مِنْكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ (রা.) তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। যদিও তিনি অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেন, হাসসান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে কাব্য-প্রতিভা দ্বারা কাফেরদের চমৎকার মোকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোনো সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ : এতে নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদের দোষমুক্ততা নাজিল করে তাদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাজিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ : অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছেন, সেই পরিমাণে তার গুনাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আজাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরো কম আজাবের যোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : كِبْرٌ শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আজাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। -[বগভী]

قَوْلُهُ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ ...... وَقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ : অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য–

১. بِاَنْفُسِهِنَّ শব্দ দ্বারা কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানদের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন– এক জায়গায় বলা হয়েছে– لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য কোনো মুসলমান পুরুষও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে– لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোনো মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বোঝানো হয়েছে। আরেক এক জায়গায় আছে– وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ, কোনো মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরো বলা হয়েছে– وَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কুরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি । শায়খ সা'দী (র.) বলেন–

چو از قومے یکے بے دانشی کرد * نہ کہ را منزلت ماند نہ مہ را

অর্থাৎ কুরআনের প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছেন, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছেন; অগ্রগতি লাভ করেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে।

২. এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوْهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে সম্বোধন পদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

৩. আয়াতের শেষ বাক্য তথা هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ বাক্যে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেওয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান সম্পর্কে কোনো গুনাহ অথবা দোষ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাত ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা : এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ এটা নিছক গিবত [পরনিন্দা] এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ..... عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ : এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা প্রচার করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, কোনো ব্যক্তি স্বচক্ষে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষ্য পেল না– এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনোরূপেই বুঝে আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে? এ প্রশ্নের দুটি জবাব আছে। যথা–

১. এখানে, 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

২. অনর্থক কোনো কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য। বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে; কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে সে যেন দাবি করে যে, আমি মানবজাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরিয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না, এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরিয়তের ধারা মোতাবেক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। –[মাযহারী]

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারি : উপরিউক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন? এমন কি, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসলূল্লাহ ﷺ -এর এই কিংবকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয়। কেননা তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেছেন যে- مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। –[তাহাভী]

রাসলূল্লাহ ﷺ -এর কর্মপন্থা উপরিউক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়– তাঁর এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, এটা মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থি ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং তা ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ..... فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোনো-না-কোনোরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আজাব আসতে পারতো যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্তু মুমিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমহত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আজাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গুনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

قوله اذ تلقونه بالسنتكم : تَلَقِّىْ শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোনো কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানো বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ : অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করছিলে যে, যা শুনলে তা-ই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ .... سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ : অর্থাৎ তোমরা যখন এই গুজব শুনেছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ পবিত্র। পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরো প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোনো ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোনো কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। প্রত্যেক মুসলমানকে গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরিয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলিলে যে, কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন মুসলমানের প্রতি শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ .... فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : যারা এই অপবাদে কোনো না কোনোরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কুরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরি উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে : কুরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কসর্মসূচি তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরিয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে 'সাধারণ সমাবেশে' ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নিলর্জ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল গল্প-পত্রিকায় প্রত্যেহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিন প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরিয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কুরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি শর্তাবলির অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

অনুবাদ :

٢١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ طُرُقَ الشَّيْطَانِ ط اَىْ تَزْيِيْنِهٖ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ اَىِ الْمُتَّبَعُ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ اَىِ الْقَبِيْحِ وَالْمُنْكَرِ ط شَرْعًا بِاتِّبَاعِهَا وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ بِمَا قُلْتُمْ مِنَ الْاِفْكِ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا اَىْ مَا صَلُحَ وَطَهُرَ مِنْ هٰذَا الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ يُطَهِّرُ مَنْ يَّشَاۤءُ ط مِنَ الذَّنْبِ بِقَبُوْلِ تَوْبَتِهٖ مِنْهُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِمَا قُلْتُمْ عَلِيْمٌ . بِمَا قَصَدْتُمْ .

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। অর্থাৎ, তার সৌন্দর্যমণ্ডিত পথে চলো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সে তো অর্থাৎ অনুসৃত শয়তান নির্দেশ দেয় অশ্লীলতা জঘন্য ও মন্দের শরিয়তের দৃষ্টিতে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের হে লোক সকল! তোমরা যে, অপবাদমূলক কথা বলেছ তা হতে কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না। অর্থাৎ এই পাপ থেকে তওবার মাধ্যমে পূতপবিত্র ও সংশোধন হতে পারতে না। তার থেকে তওবার মাধ্যমে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন গুনাহ থেকে তার থেকে তওবা গ্রহণ করে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা যা তোমরা বলছ সর্বজ্ঞ যার তোমরা ইচ্ছা করেছ।

٢٢. وَلَا يَاْتَلِ يَحْلِفُ اُولُو الْفَضْلِ اَىْ اَصْحَابُ الْغِنٰى مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ لَا يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ق نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ بَكْرٍ حَلَفَ اَنْ لَا يُنْفِقَ عَلٰى مِسْطَحٍ وَهُوَ ابْنُ خَالَتِهٖ مِسْكِيْنٌ مُهَاجِرٌ بَدْرِيٌّ لِمَا خَاضَ فِى الْاِفْكِ بَعْدَ اَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اَقْسَمُوْا اَنْ لَا يَتَصَدَّقُوْا عَلٰى مَنْ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْاِفْكِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط عَنْهُمْ فِىْ ذٰلِكَ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . لِلْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى اَنَا اُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ وَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ مَا كَانَ يُنْفِقُهٗ عَلَيْهِ .

২২. তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি তাঁর খালাতো ভাই দরিদ্র মিসতাহ (রা.)-কে কোনোরূপ সহায়তা না করার শপথ করেন। অথচ তিনি ছিলেন বদরী মুহাজির সাহাবী। কারণ তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা.) তার ব্যয়ভার বহন করতেন। এবং আরো কতিপয় সাহাবা যারা শপথ করেছিলেন যে, যারা ইফকের ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে কোনো রকমের দান সদকা করবেন না। তাদের ব্যাপারেও এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তাদের থেকে এ ব্যাপারে তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। মুমিনদের জন্য। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, "হ্যাঁ, আমি পছন্দ করি যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।" তিনি পূর্বের ন্যায় হযরত মিসতাহ (রা.)-এর ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন।

অনুবাদ :

٢٣. إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بِالزِّنَا الْمُحْصَنٰتِ الْعَفَائِفَ الْغٰفِلٰتِ عَنِ الْفَوَاحِشِ بِاَنْ لَا يَقَعَ فِيْ قُلُوْبِهِنَّ فِعْلُهَا الْمُؤْمِنٰتِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

২৩. যারা অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের সাধ্বী পবিত্রা সরলমনা অশ্লীল কার্যাবলি হতে পবিত্র, এমন কি তাদের হৃদয়ে তার কল্পনাও জাগ্রত হয় না। মুমিন নারীদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

٢٤. يَوْمَ نَاصِبُهُ الْاِسْتِقْرَارُ الَّذِيْ تَعَلَّقَ بِهٖ لَهُمْ تَشْهَدُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ـ

২৪. যেদিন يَوْمَ -এর نَاصِبٌ হলো اِسْتَقَرَّ যা উহ্য রয়েছে যার সাথে لَهُمْ টা مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। সাক্ষ্য দিবে يَشْهَدُ শব্দটি تَا ، يَا ، এবং উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহবা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। তাদের কথা ও কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে, আর সেটা হবে কিয়ামতের দিন।

٢٥. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ يُجَازِيْهِمْ جَزَاءَهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ حَيْثُ حَقَّقَ لَهُمْ جَزَاءَهُ الَّذِيْ كَانُوْا يَشُكُّوْنَ فِيْهِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ وَالْمُحْصَنٰتُ هُنَا اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُذْكَرْ فِيْ قَذْفِهِنَّ تَوْبَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ فِيْ قَذْفِهِنَّ اَوَّلَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ غَيْرُهُنَّ ـ

২৫. যেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দান করবেন অর্থাৎ তাদের উপর যে প্রতিফল আবশ্যক হয়েছে তা যথাযথ দান করবেন। এবং তারা জানবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। আর তা এভাবে যে, তাদের সম্মুখে তাদের প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল অবধারিত হয়ে যাবে। যে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করত। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের অন্যতম। এখানে اَلْمُحْصَنٰتُ দ্বারা মহানবী ﷺ -এর পবিত্র স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। তাদের ব্যাপারে অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তওবার উল্লেখ নেই। সূরার প্রারম্ভে যাদের ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপ প্রসঙ্গে তওবার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা দ্বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্দেশ্য।

٢٦. اَلْخَبِيْثٰتُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمٰتِ لِلْخَبِيْثِيْنَ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيْثُوْنَ مِنَ النَّاسِ لِلْخَبِيْثٰتِ ج مِمَّا ذُكِرَ وَالطَّيِّبٰتُ مِمَّا ذُكِرَ لِلطَّيِّبِيْنَ مِنَ النَّاسِ وَالطَّيِّبُوْنَ مِنْهُمْ لِلطَّيِّبٰتِ مِمَّا ذُكِرَ ـ

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী ও কু-কথা দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। যারা উল্লিখিত হলো। এবং সচ্চরিত্রা নারী পূর্বে উল্লিখিতদের মধ্য হতে। সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।

أَيِ اللَّائِقُ بِالْخَبِيْثِ مِثْلُهُ وَبِالطَّيِّبِ مِثْلُهُ أُولَٰئِكَ الطَّيِّبُوْنَ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْهُمْ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ط أَيِ الْخَبِيْثُوْنَ وَالْخَبِيْثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فِيْهِمْ لَهُمْ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ـ فِى الْجَنَّةِ وَقَدِ افْتَخَرَتْ عَائِشَةُ بِاَشْيَاءٍ مِنْهَا اَنَّهَا خُلِقَتْ طَيِّبَةً وَوُعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيْمًا ـ

অনুবাদ :

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রদের জন্য অনুরূপ চরিত্রের মানুষ এবং সচ্চরিত্রদের জন অনুরূপ চরিত্রের মানুষই উপযোগী। এরা অর্থাৎ সচ্চরিত্র পুরুষ ও সচ্চরিত্র নারী এবং হযরত আয়েশা (রা.) ও সফওয়ান (রা.) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা যা বলে তা হতে পবিত্র অর্থাৎ দুশ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্রা মানুষগণ যা বলে তা হতে। তাদের জন্য আছে সচ্চরিত্র নারী পুরুষের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা জান্নাতে। হযরত আয়েশা (রা.) কতিপয় বিষয় নিয়ে গর্ব করতেন। তন্মধ্য হতে এটাও একটি বিষয় যে, তাকে পবিত্রা রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁর সাথে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ : خُطْوَةٌ শব্দটির আদ্যবর্ণে পেশসহ। অর্থ হলো পা।

قَوْلُهُ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ : এটা হলো শর্ত। এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। বাক্যটি এমন ছিল– مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَلَا يُفْلِحُ

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ : এটা جَوَاب شَرْط -এর ইল্লত বা কারণ।

قَوْلُهُ اَيِ الْمُتَّبِعُ : এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ة সর্বনামের দ্বারা مَنْ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে। কেউ কেউ اِنَّهٗ -এর সর্বনাম দ্বারা শয়তান উদ্দেশ্য বলেছেন। আর এটাই অধিক স্পষ্ট। আবার সর্বনামটি ضَمِيْر شَاْن -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ بِاتِّبَاعِهِمَا : এটা يَاْمُرُ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। مَا زَكٰى مِنْكُمْ এটা لَوْلَا -এর جَوَابٌ আর مِنَ الْاِفْكِ -এর مِنْ بَيَانِيَّةٌ এবং مِنْ اَحَدٍ -এর মধ্যকার مِنْ অতিরিক্ত। اَحَدٍ শব্দটি فَاعِلٌ -এর স্থলে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَاْتَلِ : এটা(اِفْتِعَالٌ) اِيْتِلَاءٌ থেকে نَهِىْ غَائِبٌ -এর সীগাহ্। অর্থ হলো শপথ না করে। মূলত يَاْتَلِىْ ছিল। لَا نَاهِيَةٌ -এর কারণে يَا পড়ে গেছে। মূলধাতু হলো اِلٰى অর্থ– শপথ।

قَوْلُهُ اَىْ اَصْحَابُ الْغِنٰى : এটা اُولُوا الْفَضْلِ -এর ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার (র.) ইমাম বগভী (র.)-এর অনুকরণে এ ব্যাখ্যা করেছেন। যদি فَضْلٌ -এর ব্যাখ্যা فَضْلٌ فِى الدِّيْنِ দ্বারা করতেন তাহলে তা আরও উত্তম হতো। এটা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে দলিল হতো। اُولُوا الْفَضْلِ -এর ব্যাখ্যা اَصْحَابُ الْغِنٰى দ্বারা করার ক্ষেত্রে অহেতুক দ্বিরুক্তি অনিবার্য হয়। এজন্য যে, وَالسَّعَةِ -এর দ্বারাও স্বচ্ছলতা ও সম্পদের প্রাচুর্যতা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَنْ لَا يُؤْتُوْا : لَا -কে এমনিতেই বুঝে আসার কারণে বিলোপ করা হয়েছে। যেমন- تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ -এর لَا উহ্য রয়েছে। আর এটা حَرْفِ جَرّ উহ্য মেনে অর্থাৎ- عَلٰى اَنْ لَا يُؤْتُوْا

قَوْلُهُ وَنَاسٍ : -এর عَطْف হলো اَبِىْ بَكْرٍ -এর উপর। অর্থাৎ يَوْمَ نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ এখানে -এর নসবদানকারী আমিল লুপ্ত রয়েছে। বাক্যটি এমন ছিল- وَعَذَابٌ عَظِيْمٌ كَائِنٌ لَهُمْ يَوْمَ تَشْهَدُ الخ

প্রশ্ন : عَذَابٌ শব্দটি মাসদার দ্বারা مَنْصُوْب হয়নি কেন?

উত্তর : বসরীগণের মতে মাসদার আমল করার জন্য শর্ত হল মাসদারটি مَوْصُوْف না হওয়া, অথচ এখানে عَظِيْم -এর مَوْصُوْف হয়েছে। এ কারণে মাসদারটি নসব দান করতে সক্ষম নয়।

قَوْلُهُ اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ : এ বাক্যটি জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য।

قَوْلُهُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمَاتِ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার বলতে চেয়েছেন যে, اَلْخَبِيْثٰتُ -এর দুটি ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে একটি হলো اَلنِّسَاءِ আর দ্বিতীয়টি হলো اَلْكَلِمَاتِ এবং এখানে وَاوْ বর্ণটি اَوْ অর্থে।

قَوْلُهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ : এটাও জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য হতে পারে। আবার اُولٰٓئِكَ -এর দ্বিতীয় খবরও হতে পারে। এ সময় এটা স্থানগতভাবে مَرْفُوْع হবে, আর প্রথম খবর হবে مُبَرَّءُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাক। মুসলমানদের কাজ এটা হওয়া উচিত নয় যে, তারা জিন ও মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কারণ এসব অভিশপ্তদের মিশন এই যে, তারা মানুষকে অন্যায় ও নির্লজ্জতার দিকে ধাবিত করে। তোমরা জেনে বুঝে কীভাবে তাদের প্রতারণার শিকার হও। লক্ষ্য কর, শয়তান কীভাবে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বড় ঝড় প্রবাহিত করেছে এবং সহজ-সরল মুসলমানগণকে কীভাবে তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ : অর্থাৎ শয়তান তো সবাইকে নষ্ট করে ছাড়ে। সে কাউকে সোজা রাস্তায় থাকতে দিতে চায় না। এটা আল্লাহ বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর মুখলেস বান্দাদের হাত ধরে তাদেরকে সঠিক পথে রাখেন এবং কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার পর তওবার তাওফীক দান করে তাকে সঠিক পথে আনয়ন করেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ الخ : সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে :
وَلَا يَأْتَلِ - اِئْتِلَاءٌ শব্দের অর্থ- কসম খাওয়া। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়াররর পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাজিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা এবং তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ (রা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যাবৎসল পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোনো বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক

ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বভাবগত দুঃখের কারণে গরিবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরিবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ (রা.)-কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবূ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন– যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যায় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ বাক্যাংশটি এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে– أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীকা (রা.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন– وَاللّٰهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِيْ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতা (রা.)-এর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন, এ সাহায্য কোনোদিন বন্ধ হবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এই আয়াতে বাহ্যত ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই ; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহাকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমন কি, কুরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাজিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোনো মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোনো মুসলমানও কুরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফের মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করেনি, তাদেরকে এই আয়াত উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছে। তওবাকরীদেরকে আজাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছে এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছে। তওবাকারীদেরকে إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছে। –[বয়ানুল কুরআন]

একটি জরুরি হুশিয়ারী : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কুরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হয়নি। আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে

ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, কুরআনে অবিশ্বাসী। যেমন- শিয়াদের কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের ।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহগার তার গুনাহ স্বীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছেন, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষী দেবে। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে; বরং তাদের জিহবা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখও জিহবাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহবাকে সত্যকথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ .... لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ : অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারিণী নারী দুশ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তেমনিভাবে সচচরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক পয়গাম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা পত্নী ও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গাম্বরকুল শিরোমনি হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভার্যকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কুরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- مَا بَغَتْ اِمْرَاَةُ نَبِيٍّ قَطُّ অর্থাৎ কোনো পয়গাম্বরের বিবি কোনো দিন ব্যভিচার করেননি। -[দুররে মনসুর] এ থেকে জানা গেল যে, পয়গাম্বরের বিবি কাফের হবে এটা তো সম্ভবপর; কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে এটা সম্ভবপর নয়। কেননা ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণ হয় না। -[বয়ানুল কুরআন]

অনুবাদ :

٢٧. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا اَىْ تَسْتَاْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا فَيَقُوْلُ الْوَاحِدُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الدُّخُوْلِ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الذَّالِ خَيْرِيَّتَهُ فَتَعْمَلُوْنَ بِهٖ -

২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। একজন বলবে, আসসালামু আলাইকুম আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? যেমনটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার চেয়ে। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে تَاء বর্ণটি ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। তার কল্যাণ। সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

٢٨. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا يَاْذَنُ لَكُمْ فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ بَعْدَ الْاِسْتِيْذَانِ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَيِ الرُّجُوْعُ اَزْكٰى اَىْ خَيْرٌ لَّكُمْ ط مِنَ الْقُعُوْدِ عَلَى الْبَابِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مِنَ الدُّخُوْلِ بِاِذْنٍ وَغَيْرِ اِذْنٍ عَلِيْمٌ - فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ -

২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও। যে তোমাদেরকে অনুমতি দিবে। তবে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় অনুমতি চাওয়ার পর ফিরে যাও! তবে তোমরা ফিরে যাবে, আর এটাই অর্থাৎ ফিরে যাওয়া তোমাদের জন্য অতিশয় পবিত্র উত্তম দরজার সামনে বসে থাকার চেয়ে। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনুমতি সাপেক্ষে বা অনুমতিহীন প্রবেশ করা সম্পর্কে। ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

٢٩. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ اَىْ مَنْفَعَةٌ لَّكُمْ ط بِاسْتِكْنَانٍ وَغَيْرِهٖ كَبُيُوْتِ الرُّبُطِ وَالْخَانَاتِ الْمُسْبِلَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ تُظْهِرُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ - تُخْفُوْنَ فِىْ دُخُوْلِ غَيْرِ بُيُوْتِكُمْ مِنْ قَصْدِ صَلَاحٍ اَوْ غَيْرِهٖ وَسَيَاْتِىْ اَنَّهُمْ اِذَا دَخَلُوْا بُيُوْتَهُمْ يُسَلِّمُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ -

২৯. যে গৃহে কেউ বসবাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী উপকারী কিছু থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই আরামে লুকিয়ে থাকার জায়গা ইত্যাদি শীত ও গরম হতে বেঁচে থাকার জায়গা, পান্থশালা স্বরূপ ব্যবহারের গৃহাদি ও দোকান প্রভৃতি। এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর তোমাদের নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে মঙ্গলজনক বা অন্য কোনো বিষয়ের সংকল্প করার। অচিরেই আসছে যে, তারা যখন তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন তখন নিজেদেরকে সালাম করতেন।

অনুবাদ :

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ نَظْرُهٗ وَمِنْ زَائِدَةٌ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ فِعْلُهٗ بِهَا ذٰلِكَ اَزْكٰى اَىْ خَيْرٌ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ . بِالْاَبْصَارِ وَالْفُرُوْجِ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ .

৩০. মুমিনদেরকে বলুন ! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে যা তাদের জন্য দেখা জায়েজ নয়, তা থেকে। আর مِنْ টি হলো অতিরিক্ত। এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার অবৈধ তা থেকে এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্র উত্তম তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। তাদের চোখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং তিনি তাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

٣١. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ نَظْرُهٗ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ عَمَّا لَا يَحِلُّ فِعْلُهٗ بِهَا وَلَا يُبْدِيْنَ يُظْهِرْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ فَيَجُوْزُ نَظْرُهٗ لِاَجْنَبِيٍّ اِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً فِىْ اَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِيْ يَحْرُمُ لِاَنَّهٗ مَظَنَّةُ الْفِتْنَةِ وَرُجِّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ط اَىْ يَسْتُرْنَ الرُّؤُوْسَ وَالْاَعْنَاقَ وَالصُّدُوْرَ بِالْمَقَانِعِ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الْخَفِيَّةَ وَهِىَ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ جَمْعُ بَعْلٍ اَىْ زَوْجٍ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ .

৩১. আর মুমিন নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা তাদের জন্য বৈধ নয়, তা থেকে। ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার বৈধ নয় তা থেকে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তা হলো মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু তথা হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ। সুতরাং এক বর্ণনা মতে গায়রে মাহরামের জন্য তা দেখা জায়েজ আছে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। অন্য বর্ণনা মতে তা হারাম। কেননা তাতে ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর পাপের পথ রুদ্ধ করার জন্য এ মতটিকেই প্রাধান্য দান করা হয়েছে। তাদের গ্রীবাও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে অর্থাৎ তাদের মাথা, ঘাড় এবং বক্ষদেশ উড়না দ্বারা ঢেকে রাখবে। তারা তাদের আবরণ যেন প্রকাশ না করে গোপন সজ্জা আর তা হলো হাত কব্জি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল। তবে তাদের স্বামীগণ بُعُوْلٌ শব্দটি بَعْلٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ স্বামী। অথবা পিতা, স্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত।

فَيَجُوزُ لَهُمْ نَظْرُهُ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَحْرُمُ نَظْرُهُ لِغَيْرِ الْأَزْوَاجِ وَخَرَجَ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمٰتِ الْكَشْفُ لَهُنَّ وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيْدُ اَوِ التَّبِعِيْنَ فِيْ فُضُوْلِ الطَّعَامِ غَيْرِ بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَالنَّصْبِ اِسْتِثْنَاءٌ اُولِى الْاِرْبَةِ اَصْحَابِ الْحَاجَةِ اِلَى النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ بِاَنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذِكْرُ كُلٍّ اَوِ الطِّفْلِ بِمَعْنَى الْاَطْفَالِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا يَطَّلِعُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ لِلْجِمَاعِ فَيَجُوْزُ اَنْ يُبْدِيْنَ لَهُمْ مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ خَلْخَالٍ يَتَقَعْقَعُ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُوْمِنُوْنَ مِمَّا وَقَعَ لَكُمْ مِنَ النَّظَرِ الْمَمْنُوْعِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ تَنْجُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ لِقَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَفِى الْاٰيَةِ تَغْلِيْبُ الذُّكُوْرِ عَلَى الْاِنَاثِ ـ

অনুবাদ :

সুতরাং তাদের জন্য এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ব্যতীত। সুতরাং স্বামী ছাড়া অন্যদের এতে দৃষ্টিপাত করা হারাম। আর بِنِسَائِهِنَّ -এর দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে গেছে। কাজেই মুসলিম মহিলাদের জন্য কাফের নারীদের সম্মুখে উক্ত অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েজ হবে না। আর مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ -এর মধ্যে দাসগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ যারা তাদের অনুসরণ করে চলে। বেঁচে যাওয়া খাদ্যের ব্যাপারে غَيْرِ শব্দটি تَابِعِيْنَ -এর সিফত হলে যের যুক্ত হবে। আর اِسْتِثْنَاء হলে যবর বিশিষ্ট হবে। মহিলাদের প্রতি জরুরত রাখে এমন পুরুষ নয়। পুরুষদের মধ্যে থেকে প্রত্যক এমন ব্যক্তি যার লিঙ্গ নড়াচড়া করে না। অথবা এমন বালক এটা اَطْفَالُ অর্থে যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ সহবাসের জন্য সুতরাং তাদের সম্মুখে নাভী থেকে হাঁটু ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রকাশ করা বৈধ তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য সজোরে পদক্ষেপ না করে যেমন বাজনা বিশিষ্ট নুপুর হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর অবৈধ স্থানে তোমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া ও অন্যান্য পাপ হতে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার তা থেকে মুক্তি পেতে পার তওবা কবুলের মাধ্যমে। আর আয়াতে মহিলাদের উপর পুরুষদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

٣٢. وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ جَمْعُ اَيِّمٍ وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ بِكْرًا كَانَتْ اَوْ ثَيِّبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهٗ زَوْجَةٌ وَهٰذَا فِي الْاَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ وَالصّٰلِحِيْنَ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط وَعِبَادِ مِنْ جُمُوْعِ عَبْدٍ اِنْ يَّكُوْنُوْا اَيِ الْاَحْرَارِ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ بِالتَّزَوُّجِ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ لِخَلْقِهٖ عَلِيْمٌ - بِهِمْ -

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম তথা স্বামীহীনা ও বিপত্নীক তাদেরকে বিবাহ দাও। اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো যে নারীর স্বামী নেই চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক এবং যে পুরুষের স্ত্রী নেই। এটা স্বাধীন নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এবং তোদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও অর্থাৎ যারা মুমিন। আর عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ -এর বহুবচন তাঁরা স্বাধীন পুরুষগণ অভাবী হলে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন বিবাহের মাধ্যমে স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় স্বীয় সৃষ্টির জন্য সর্বজ্ঞ তাদের সম্পর্কে।

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا اَيْ مَا يَنْكِحُوْنَ بِهٖ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ مِنَ الزِّنَا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ يُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهٖ ط فَيَنْكِحُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالْاِمَاءِ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ق اَيْ اَمَانَةً وَقُدْرَةً عَلَى الْكَسْبِ لِاَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَصِيْغَتُهَا مَثَلًا كَاتَبْتُكَ عَلَى الْفَيْنِ فِيْ شَهْرَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ اَلْفٌ فَاِذَا اَدَّيْتَهَا فَاَنْتَ حُرٌّ فَيَقُوْلُ قَبِلْتُ ذٰلِكَ وَاٰتُوْهُمْ اَمْرٌ لِلسَّادَةِ -

৩৩. যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে অর্থাৎ যার দ্বারা বিবাহ করবে যেমন মহর ভরণ পোষণের ব্যয়ভার। ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত স্বচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত। নিজ অনুগ্রহে তখন তারা বিয়ে করবে। আর যারা লিখিত চুক্তি চাইবে اَلْكِتَابُ এটা مُكَاتَبَةٌ অর্থে। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে থেকে তার মুক্তির জন্য তবে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। অর্থাৎ তাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এবং কিতাব ও চুক্তির মাল পরিশোধের জন্য উপার্জনের শক্তি রাখে। আর এর বাক্যগুলো এরূপ হতে যেমন আমি তোমাদের সাথে দু মাসে দু' হাজার দিরহাম পরিশোধ করার শর্তে 'কিতাবত চুক্তি'তে আবদ্ধ হলাম। প্রতি মাসে একহাজার দিরহাম করে পরিশোধ করবে। যখন তুমি এটা পরিশোধ করবে তখন থেকেই তুমি আজাদ হয়ে যাবে। তখন সে বলবে, আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। এবং তোমরা তাদেরকে দান করবে এ নির্দেশ মনিবদের জন্য।

مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ط مَا يَسْتَعِيْنُوْنَ بِهٖ فِيْ اَدَاءِ مَا الْتَزَمُوْهُ لَكُمْ وَفِيْ مَعْنَى الْاِيْتَاءِ حَطُّ شَيْءٍ مِمَّا الْتَزَمُوْهُ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ اَيْ اِمَائِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اَيِ الزِّنَا اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا تَعَفُّفًا عَنْهُ وَهٰذِهِ الْاِرَادَةُ مَحَلُّ الْاِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لِلشَّرْطِ لِّتَبْتَغُوْا بِالْاِكْرَاهِ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا نَزَلَتْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ كَانَ يُكْرِهُ جَوَارِيَ لَهٗ عَلَى الْكَسْبِ بِالزِّنَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ لَّهُنَّ رَّحِيْمٌ بِهِنَّ ـ

অনুবাদ :

আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হতে। যার দ্বারা তারা তোমাদেরকে প্রদানের ব্যাপারে যা আবশ্যক করে নিয়েছে তা পরিশোধ সহায়তা লাভ করতে পারে। তোমরা তোমাদের যুবতীদেরকে অর্থাৎ দাসীদেরকে বাধ্য করো না যৌনকর্মে অর্থাৎ ব্যভিচারে যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায় পবিত্র থাকতে চায়, তাদের এ ইচ্ছা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে। কাজেই তাদের পবিত্র থাকতে চাওয়ার শর্তের বিপরীত অর্থ ধর্তব্য নয় যে, তারা পবিত্র থাকতে না চাইলে যৌনকর্মে নিয়োগ করা বৈধ। পার্থিব জীবনের ধন লালসায় বাধ্যকরণ দ্বারা। এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার দাস-দাসীদেরকে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করত। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল তাদের জন্য পরম দয়ালু। তাদের প্রতি।

٣٤. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ بُيِّنَ فِيْهَا مَا ذُكِرَ اَوْ بَيِّنَةٌ وَّمَثَلًا اَيْ خَبَرًا عَجِيْبًا وَهُوَ خَبَرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ اَيْ مِنْ جِنْسِ اَمْثَالِهِمْ اَيْ اَخْبَارِهِمُ الْعَجِيْبَةِ كَخَبَرِ يُوْسُفَ وَمَرْيَمَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ الخ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ الخ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ الخ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا الخ وَتَخْصِيْصُهَا بِالْمُتَّقِيْنَ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

৩৪. আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত مُبَيِّنٰتٍ শব্দটির يَاء বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। যবর হলে অর্থ হবে উল্লিখিত, যা কিছু বর্ণিত হয়েছে। আর যের হলে অর্থ হবে সুস্পষ্ট। এবং দৃষ্টান্ত অর্থাৎ বিস্ময়কর সংবাদ। আর তা হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর সংবাদ বা ঘটনার বিবরণ। তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ। অর্থাৎ পূর্বর্তীদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি। যেমন– হযরত ইউসুফ ও মারইয়াম (আ.)-এর কাহিনী। এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا الخ [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে তাদের উভয়ের উপর করুণা যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।] এবং لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ ও وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ এবং الْمُؤْمِنُوْنَ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا আয়াতে মুত্তাকীগণকে নির্দিষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, এ সকল লোকেরাই উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا ...... تَسْتَاْنِسُوْا اَيْ تَسْتَـ : পূর্বের আয়াতসমূহে সতর, সচ্চরিত্রের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। উক্ত বিধানসমূহের একটি হলো কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না সুতরাং সতর ও পর্দার বিধানের পরে এখন অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা প্রবেশের আদব ও নিয়ম উল্লেখ করেছেন। কেননা গায়রে মাহরাম তথা নারী-পুরুষের অবাধ চলাচল অনেক সময় ার কারণে ঘটে।

قَوْلُهُ تَسْتَاْنِ : এটা تَسْتَاْذِنُوْا তথা তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর অর্থে। এটা اِسْتِيْذَانٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ অনুমতি নেওয়া, সখ্যতা সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُ : এটা لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا থেকে اِسْتِثْنَاء-এর পর্যায়ে।

قَوْلُهُ اِسْتِـ : এটা كَنٌّ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো লুকানো, গোপন হওয়া। অর্থাৎ, ঠাণ্ডা, গরম বৃষ্টি থেকে রক্ষাকল্পে কোনো আড়ালে গিয়ে স্বস্তি লাভ করা।

قَوْلُهُ : এটা رِبَاطٌ-এর বহুবচন। এর আসল অর্থ হলো গোয়াল ঘর বা ব্যারাক। কিন্তু এখানে এর দ্বারা সরাইখানা াবলিকের আশ্রয় শিবির উদ্দেশ্য, যেখানে জনসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকে। اَلْمُسْبِلَةُ এমন রাস্তাকে বলা তে বহু মানুষের চলাচল থাকে। এ সম্পর্কের দরুন যেখানে বহু মানুষের আসা-যাওয়ার অনুমতি থাকে তাকেও مُسْبِلَة য়। مُسْبِلَة মূলত رُبُط-এর সিফত বা বিশেষণ। সুতরাং এটাকে رُبُط-এর সাথে উল্লেখ করলে তা আরো স্পষ্ট । خَانَاتٌ হলো خَانَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ হলো দোকান-পাট, যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আসা-যাওয়ার ব্যাপক অনুমতি । اَلْمُسْبِلَةُ শব্দটি رُبُط ও خَانَات উভয়ের সিফত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

قَوْلُهُ بِالْمَقَ : এটা مِقْنَعٌ বা مِقْنَعَةٌ-এর বহুবচন। ওড়না, চাদর ইত্যাদি অর্থে।

قَوْلُهُ اَوِ التَّابِعِيْنَ اَيِ التَّابِعِيْنَ لِلْـ : অর্থাৎ সে সকল নির্বোধ ও অর্ধ পাগল মানুষ যারা খাদ্য দের জন্য নারীদের নিকট গমন করে। خَلْخَالٌ হলো পায়ের নূপুর, এর বহুবচন আসে خَلَاخِلُ, আর تَقَعْقَعَ يَتَقَعْقَعُ অর্থ হলো হাঁটা চলার সময় শব্দ করা।

قَوْلُهُ اَلصّٰلِحِيْنَ اَيِ الْمُؤْمِ : এখানে صَالِحِيْن দ্বারা সে সকল মুমিন উদ্দেশ্য যারা বিবাহের হক তথা অধিকারসমূহ আদায় করতে সক্ষম।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِ : اَلَّذِيْنَ হলো مَوْصُوْل صِلَة মিলে مُبْتَدَأ, শর্তের অর্থ বিশিষ্ট। এ কারণে স্থানগতভাবে مَرْفُوْع; এ সময় فَكَاتِبُوْهُ তার خَبَر হবে। আর مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এটা يَبْتَغُوْنَ-এর যমীর حَال. আবার উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب-ও হতে পারে।

قَوْلُهُ هٰذِهِ الْاِرَادَةُ مَحَلُّ الْاِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ لِلـ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا-এর মধ্যে হরফে শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীরা যদি সতী-সাধ্বী থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে র্ম বা ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি তারা তা না চায় তাহলে তাদেরকে উক্ত কর্মে বাধ্য করা বৈধ হবে। অথচ াদৌ ঠিক নয়।

: এখানে এর مَفْهُوْم مُخَالِف তথা বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা বাধ্য করার প্রয়োজন তো তখনই দেখা দিবে তারা পবিত্র তথা সতী-সাধ্বী থাকতে চাইবে, নইলে তো বাধ্য করার প্রয়োজনই পড়বে না; বরং তারা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে হবে।

قَوْلُهُ اَوْ بَيِّنَةً : এটা مُبَيِّنَةً তথা স্পষ্টকারী অর্থে। শরয়ী বিধানসমূহকে স্পষ্টকারী আয়াতসমূহ।

قَوْلُهُ مَثَلًا : অর্থাৎ এ সূরায় বা এ কুরআনে আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর আশ্চর্যকর ঘটনাও উল্লেখ করেছি। যা বিস্ময়কর হওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের মানুষের যেমন– হযরত ইউসুফ ও মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তাদের উভয়ের উপরও অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কীয় বিধানের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে কারো গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করার নির্দেশ রয়েছে, যাতে করে ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অপবাদের পথ বন্ধ হয়।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا الخ : **শানে নুযূল :** ইবনে জারীর হযরত আদি ইবনে সাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী স্ত্রীলোক প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, আমি আমার গৃহে কখনো এমন অবস্থায় থাকি যে আমি চাই না ঐ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক। কিন্তু আমার বাড়ির লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা বাধায় আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে দেখে। এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করব? এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কুরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয় হলো– ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে; কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামি বিধিবিধানের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা অনুমতি চাওয়া কুরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা। এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কুরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ............

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমুল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে– جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তিও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থীরা। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকরিতা হলো– নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলিকে কুরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তির বিধি-বিধানের সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, সে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরবস্তি জানার চেষ্টা করাও গুনাহ এবং অপররের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা : আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا বলা হয়েছে : অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম إِسْتِيْنَاسٌ শাব্দিক অর্থ– প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ– অনুমতি হাসিল করা। এখানে إِسْتِيْنَاسٌ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই। আবূ আইয়ূব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি (র.) বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে তবে প্রথম সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরিকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী (র.) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিয়ো না। কারণ সে সুন্নত তরিকা ত্যাগ করেছে। –[রূহুল মা'আনী]

আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল– اَاَلِجُ অর্থাৎ আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা শুনে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন– لَا تَاْذَنُوْا لِمَنْ لَا يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। –[মাযহারী]

এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সংশোধন করেছেন। প্রথমে সালাম করা উচিত এবং اَدْخُلُ -এর স্থলে اَلِجُ শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা اَلِجُ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। এটা মার্জিত ভাষার পরিপন্থি। মোটকথা , এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

জরুরি হুঁশিয়ারি : আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব বর্জনের গুনাহ। যারা সুন্নত তরিকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শর্ত এই যে, ঘণ্টা বাজানোর পর

নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা কোনো স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েজ। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এ প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ الخ : শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম মোকাতেল ইবনে হাব্বানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনার হুকুম নাজিল হলো, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কুরাইশের অনেক ব্যবসায়ী মক্কা মদীনা এবং সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করেন। পথিমধ্যে তাদের অবস্থানের স্থান নির্দিষ্ট হয়। যেসব ঘরে কেউ থাকে না, সেখানে কার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন? কাকে সালাম দিবেন। এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا ...... فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ : مَتَاعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ, ভোগ করার অধিকার। শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন-কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়-

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোনো দরকারি কাজ অথবা নামাজে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েজ নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

ক. টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরজ করব। কারণ প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারি কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোনো নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

খ. কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনোরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে- إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার কথার জবাব দিন।

গ. কারো গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয় আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে অবগত না হোন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। -[বুখারী, মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীত না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। -[মাযহারী]

ঘ. উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত। -[মাযহারী]

ঙ. যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَالِكَ لَهُ إِذْنٌ অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি। -[আবূ দাউদ, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিচু করে রাখার নির্দেষ দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে অনুরূপ ফরমান নারীদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো নিজের দৃষ্টির হেফাজত করা। নৈতিক মান উন্নয়নে চরিত্র সংশোধনে এর গুরুত্ব বাঁধিক। এজন্যে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যভিচারের উপকরণ তথা নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা এবং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন প্রত্যেকে বিরত থাকে। এজন্যে দৃষ্টির হেফাজতের তথা কু-দৃষ্টিপাত করা থেকে আত্মরক্ষা করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। এ নির্দেশের উপর আমল করার মাধ্যমে শুধু যে দৃষ্টি হেফাজত হয় তা নয়; বরং ঈমানের নূরের হেফাজত হয়।

قَوْلُهُ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الخ : শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম মুকাতেল (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, একবার হযরত আসমা বিনতে মারছাদ [যিনি বনী হারেছার মহল্লায় বাস করতেন] -এর কাছে কয়েকজন মহিলা আসলো, তারা ইজার পরিহিত ছিল না। ফলে তাদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের বক্ষস্থলও খোলা ছিল। হযরত আসমা বললেন, কত নিকৃষ্ট এ আকৃতি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ অর্থাৎ "আর [হে রাসূল] মুমিন স্ত্রীলোকদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নিচু রাখে।"

পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহযাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরি এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরি। তাফসীরে ইবনে কাসীর ও 'নায়লূল আওতার' গ্রন্থে পঞ্চম হিজরিকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলি প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তাফসীর লিখিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ..... يَصْنَعُوْنَ : يَغُضُّوْا শব্দটি غَضٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- কম করা এবং নত করা। -[রাগিব] দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো- দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরূহ- এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল [চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত]। এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ : যৌনাঙ্গ সংঘত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র.) হযরত ওবায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, كُلُّ مَا عَصَى اللّٰهَ بِهٖ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ الطَّرَفَيْنِ অর্থাৎ যা দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবিরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত তথা সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهٗ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهٗ فِىْ قَلْبِهٖ অর্থাৎ দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। –[ইবনে কাসীর]

হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে– প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গুনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে তা ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধানও অনুরূপ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাবে সহকারে দেখা হয়।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ : **বেগানাকে দেখা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ :** এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু আলোচনায় জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলেমের মতে, নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম– কাম ভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হযরত উম্মে সালমার হাদীস যাতে বলা হয়েছে একদিন হযরত উম্মে সালমা ও মায়মূনা (রা.) উভয়েই রাসূলূল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এ ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) আরজ করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

অপর কয়েকজন ফিকহবিদ বলেন, কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-ও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতের ভাষ্যদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও

কারণ : কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকিগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরজ। কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরো সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থি। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরিয়ত নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..... اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ : অভিধানে زِيْنَتٌ এমন বস্তুকে বলা হয়, যা দ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোনো নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল। যেমন– বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোনো দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زِيْنَتٌ-এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান। অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহে প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। –[রূহুল মা'আনী]
আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোনো সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়, এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। [ইবনে কাসীর] এতে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড় যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোনো বস্তু প্রকাশ করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েজ নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ কারণে ফিকহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েজ নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েজ নয়। এমনিভাবে এব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাজের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে। কাযী বায়যাভী ও 'খাযেন' (র.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনো কিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ; গুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েজ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরিয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও

এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েজ নয়। 'যাওয়াজের' গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামাজ হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েজ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকহবিদদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েজ, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফ্যাসাদ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে– وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে; خُمُرٌ শব্দটি خِمَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جُيُوْبٌ শব্দটি جَيْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীন কাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ মূর্খতার যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতার যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর রেখে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে তাদের গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। –[রূহুল মা'আনী]

এর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরিয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। যথা– ১. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোনো অনর্থের আশঙ্কা নেই, তারা মাহরাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে স্বয়ং তাদের পক্ষে থেকে কোনো অনর্থের সম্ভাবনা নেই। ২. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম; গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাজে খোলা জায়েজ নয়, তা দেখা মাহরামের জন্যেও জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুঁশিয়ারি : স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ– ১. স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– مَا رَأَى مِنِّىْ وَلَا رَأَيْتُ مِنْهُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বিশেষাঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর বিশেষাঙ্গ দেখিনি।

২. পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। ৩. শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৪. নিজ গর্ভজাত সন্তান। ৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ৬. ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়রে-মাহরাম। ৭. ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ৮. ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনের পুত্র বোঝানো হয়েছে।

এই আট প্রকার হলো মাহরাম। ৯. أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য; মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমন সব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান

থেকে; গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোনো মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলাটা ভিন্ন কথা।

আয়াতে نِسَائِهِنَّ তথা মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফিরে মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন– এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোনো মুসলমান নারীর জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের সব নারীই نِسَائِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন– هٰذَا الْقَوْلُ اَوْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَاِنَّهُ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ اِحْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ عَنِ الذِّمِّيَّاتِ অর্থাৎ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

১০. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহরামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা.) তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন– لَا يَغُرَّنَّكُمْ اٰيَةُ النُّوْرِ فَاِنَّهُ فِى الْاِمَاءِ دُوْنَ الذُّكُوْرِ অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ বাক্যাংশে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন (র.) বলেন, পুরুষ দাসের জন্য তার মনিব নারীর কেশ দেখা জায়েজ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী اَوْ نِسَائِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস (র.)-এর জবাবে বলেন– نِسَائِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

১১. اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। –[ইবনে কাসীর]

ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবূ আব্দুলল্লাহ, ইবনে জুবাইর, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোনো ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক– যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত– غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী (র.) 'মিনহাজ' গ্রন্থের টীকায় বলেন, পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ শব্দের সাথে التَّابِعِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহের মধ্যে প্রবেশ করত। স্মর্তব্য যে, এখানে বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর; অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

১২. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে 'মুরাহিক' অর্থাৎ সাবলকত্বের নিকটবর্তী । তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। -[ইবনে কাসীর]

ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, এখানে طِفْل বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিকে দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

قَوْلُهُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ : অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারদির আওয়াজ ঝংকৃত হয় এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় : আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরো জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই, উপরন্তু গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েজ নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বেজে উঠে কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় এবং বেগানা পুরুষের কানে পৌছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েজ। এ কারণেই অনেক ফিকহবিদ বলেন, যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরো কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েজ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাজে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লা' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী মুসল্লি জামাতে উপস্থিত থাকলে সে মুখে আওয়াজ করতে পারবে না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান : নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম (র.) নাওয়াযিলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আজান মাকরূহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে তা নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশঙ্কা নেই, সেখানে জায়েজ। -[জাসসাস] কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া : নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধি হলো গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েজ। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ : ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, কুরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। -[জাসসাস]

قَوْلُهُ وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপররের তা জানা কঠিন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোনো সময় যদি কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরি। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

قَوْلُهُ وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ : اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ-এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভিঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজেদের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে– এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ আশংকা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরিয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল অর্থাৎ তার বিবাহ না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়; কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা? আয়াতটি এ ব্যাপারে নীরব। বিশেষত এ কারণেও যে, اَيَامٰى [বিবাহহীন লোক] শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয় অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ; কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না; বরং গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য ও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরজ অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন গুনাহগার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে, যেমন– কোনো উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয় ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, সে লাগাতার রোজা রাখবে। রোজার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওকাফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শরিয়তসম্মত বাঁদি আছে কি? উত্তর হলো, না। প্রশ্ন হলো– তুমি কি আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলো, হ্যাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরো বললেন, বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে। –[মাযহারী]

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহের আশঙ্কা প্রবল, ফিকহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। -[মাযহারী]

এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকহবিদ একমত যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা নিশ্চিত অন্য কোনো গুনাহ হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোনো গুনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ তথা শরিয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও ছওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোনো মুবাহ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চেয়ে উত্তম বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গাম্বরদের ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে পানাহার ও নিদ্রাও তো পয়গাম্বরগণের সুন্নত। কারণ তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গাম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গাম্বরগণের সুন্নত; বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গাম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গাম্বরগণের সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার জিকির ও ইবাদতে অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ উত্তম। সকল পয়গাম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক জিকির ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কুরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ; এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

قَوْلُهُ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও মনিবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। صَالِحِيْن শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ হলো স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মহর

আদায় করার যোগ্যতা। যদি صَالِحِيْنَ শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার **কারণ** এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা মুনিবদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করে বরং অনুমতি দেওয়া মনিবদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ ক্রীতদাস ও বাঁদিদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কুরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে- وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে। -[তিরমিযী]

সারকথা এই যে, মনিবরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেই জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের জিম্মায় ওয়াজিব এটা জরুরি নয়।

قَوْلُهُ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ : যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হেফাজতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক; কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজত ও সুন্নতে রাসূল ﷺ পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন।

যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্রের কারণেই বিবাহ করতে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থ কড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে, এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন। -[ইবনে কাসীর]

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন- اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ -[ইবনে কাসীর]

সতর্কবাণী : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্মতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ হলো পরবর্তী আয়াত- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহগার হয় যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোজা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থসম্পদ দান করবেন।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদিদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদিরা যদি মালিকদের সাথে

মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকহবিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ, অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোস্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ– কোনো গোলাম অথবা বাঁদি তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি মনিব ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও তা গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অংককে 'বদলে কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরিয়ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কমবেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরিকৃত হবে, তা-ই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামি শরিয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদি মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদির সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এবং তাকে মোস্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরিয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদি, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদি মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে– إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, এই কল্যাণের অর্থ হচ্ছে– উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। উদাহরণত সে কাফের হলে এবং তার কাফের ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও না থাকা চাই। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِي آتَاكُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। জাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তা-ই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরো কম হ্রাস করে দিতেন। –[মাযহারী]

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকালবিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা

যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনাও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। তাই বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরিউক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় না। এগুলোর কোনো একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন। যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই; বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, নাকি এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফেরদের ছিল। তারা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েজ-নাজায়েজের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কুরআনের أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

দ্বিতীয় মতবাদ তথা সোশ্যালিজম মানুষকে কোনো বস্তুর উপর কোনোরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হলো।

কুরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে এই মূলনীতি দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ অর্থাৎ এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান করা, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যথা–

১. ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ।

২. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন।

৩. তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনো কানো ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব, মোস্তাহাব, উত্তম করেছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ : শানে নুযূল : মুসলিম শরীফে হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল তার বাঁদি দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। মুসলিম শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাইর দু'টি বাঁদি ছিল। একজনের নাম ছিল 'মুসাইকা'

এবং অপরজনের নাম ছিল 'উমাইমা'। আব্দুল্লাহ উভয়ের দ্বারা ব্যভিচারের অর্থ উপার্জন করতো। এই অবস্থায় উভয় বাঁদিই হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দিল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

হযরত যাবের (রা.)-এর সূত্রে আবূ যুবাইরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে হাকেম (র.) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাইকা' জনৈক নাসারার বাঁদি ছিল। সে অভিযোগ করেছিল যে আমার মালিক আমাকে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করছে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বাজ্জার ও তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর একটি বাঁদি ছিল। সে বর্বরতার যুগে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তখন ঐ বাঁদিটি শপথ করে বললো, আমি আর কখনো ব্যভিচার করবো না। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

সাঈদ ইবনে মানছুর হযরত ইকরিমার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মুসাইকা ও মাআজা নাম্নী দু'টি বাঁদি ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই -এর। সে তাদের দ্বারা ব্যভিচার করাতো। অবশেষে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন তাদের একজন বলল, যদি এ কর্মটি ভালো হয় তবে তা আমি অনেক করেছি। পক্ষান্তরে, যদি তা ভালো না হয় তবে তা বর্জন করাই উচিত। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, একথাও বর্ণিত আছে যে, একটি বাঁদি আব্দুল্লাহর কাছে ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত একটি চাদর নিয়ে উপস্থিত হলো এবং অপর বাঁদিটি একটি দীনার নিয়ে হাজির হলো। আব্দুল্লাহ বলল, যাও, আরো কিছু কামাই করে নিয়ে আসো। বাঁদিরা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজ আর করবো না। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ পাক ব্যভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও যখন আব্দুল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করার চেষ্টা করলো, তখন উভয়ে হুজুর পাক ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করলে এ আয়াত নাজিল হলো।

মুকাতেল (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক সা'লাবী (র.) বলেন যে, আব্দুল্লাহর কাছে কুকর্মের জন্যে ছয়টি বাঁদি ছিল এবং এদের ব্যাপারেই উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অন্যায় অনাচার, অশ্লীল, অসামাজিক কাজ পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। যারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আর যেসব পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সেসব পন্থা অবলম্বনেরও পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিশেষ নসিহত ও উপদেশ রয়েছে। যারা আত্ম-সংশোধন করে এবং অন্যায় অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, আত্ম-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, তারাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে তারা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যত জীবনকে উজ্জ্বল ও সাফল্যমণ্ডিত করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা কল্যাণের পথ গ্রহণে দ্বিধা করে না। আলোচ্য আয়াতে তাই মুমিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের ইহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ নাজিল করেছি যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অতীতে যারা এ পৃথিবীতে ছিল তাদের দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়েছে এবং মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ নসিহত। আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যথা–

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, তাতে কোনো আড়ষ্টতা নেই, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালনে কোনো অসুবিধা নেই। বিষপানে যদি নীলকণ্ঠ হতে হয়, তবে পবিত্র কুরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করেও অবশেষে ধ্বংস হতে হয়।

আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে ইতিপূর্বে সেসব জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সতর্ক করা হয়েছে।

যারা এ সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٣٥. اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ مُنَوِّرُهُمَا بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مَثَلُ نُوْرِهٖ اَىْ صِفَتُهٗ فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط هِىَ الْقِنْدِيْلُ وَالْمِصْبَاحُ السِّرَاجُ اَيِ الْفَتِيْلَةُ الْمَوْقُوْدَةُ وَالْمِشْكٰوةُ الطَّاقَةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ اَيِ الْاَنْبُوْبَةِ فِى الْقِنْدِيْلِ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا وَالنُّوْرُ فِيْهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ اَىْ مُضِىْءٌ بِكَسْرِ الدَّالِ وَضَمِّهَا مِنَ الدَّرْءِ الْمَعْنٰى الدَّفْعُ لِدَفْعِهِ الظَّلَامَ وَبِضَمِّهَا وَتَشْدِيْدِ الْيَاءِ مَنْسُوْبٌ اِلَى الدُّرِّ اللُّؤْلُؤِ يُّوْقَدُ الْمِصْبَاحُ بِالْمَاضِىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِمُضَارِعِ اُوْقِدَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِىْ اُخْرٰى بِالْفَوْقَانِيَّةِ اَيِ الزُّجَاجَةُ مِنْ زَيْتِ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ بَلْ بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ مُضِرَّيْنِ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط لِصَفَائِهٖ نُوْرٌ بِهٖ عَلٰى نُوْرٍ ط بِالنَّارِ وَنُوْرُ اللّٰهِ اَىْ هُدَاهُ لِلْمُؤْمِنِ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرِ الْاِيْمَانِ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ اَىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَيَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط تَقْرِيْبًا لِاَفْهَامِهِمْ لِيَعْتَبِرُوْا فَيُؤْمِنُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ - مِنْهُ ضَرْبُ الْاَمْثَالِ -

অনুবাদ :

৩৫. আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। অর্থাৎ উভয়টিকে সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বলকারী। তাঁর জ্যোতির উপমা অর্থাৎ এর গুণাগুণ মুমিনগণের অন্তরে এরূপ, যেন একটি দীপাধার; যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। আর প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত। এখানে زُجَاجَةٌ অর্থ হচ্ছে কাঁচের আবরণ। اَلْمِصْبَاحُ হচ্ছে প্রদীপ, অর্থাৎ প্রজ্বলিত বাতি। আর اَلْمِشْكٰوةُ অর্থ হচ্ছে স্থির দীপাধার তথা প্রদীপের মধ্যে থাকা নল বা পাইপ। কাঁচের আবরণটি এবং তাতে বিদ্যমান আলো, যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল, دُرِّىٌّ শব্দটি دَالْ বর্ণে যের ও পেশযোগে اَلدَّرْءُ থেকে উদগত। اَلدَّرْءُ অর্থ হচ্ছে দূরীভূত করা। কেননা প্রদীপ অন্ধকারকে দূর করে। এ শব্দটিকে دَالْ -এর মধ্যে পেশ ও يَا -এর মধ্যে তাশদীদ দিয়ে পড়লে, তা دُرٌّ -এর প্রতি সম্পর্কিত হবে। আর دُرٌّ অর্থ হচ্ছে মোতি। প্রজ্বলিত করা হয় প্রদীপটি تَوَقَّدَ শব্দটি بَاب تَفَعُّلْ থেকে فِعْل مَاضِىْ -এর সীগাহ। অপর এক কেরাতে শব্দটিকে اُوْقِدَ থেকে يُوْقَدُ صِيْغَة فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর বানিয়ে অর্থাৎ পড়া হয়, তখন এর نَائِب فَاعِلْ হবে اَلْمِصْبَاحُ শব্দটি। তৃতীয় আরেকটি কেরাতে يَا -এর স্থলে تَا দিয়ে পড়া হয়। অর্থাৎ, تُوْقَدُ ; তখন এর نَائِب فَاعِلْ হবে اَلزُّجَاجَةُ শব্দটি। পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়; বরং তা এ দুটির মাঝখানে বিদ্যমান রয়েছে। আর তাইতো গরম ও ঠাণ্ডা এ বৃক্ষের জন্য ক্ষতিকর হয় না। অগ্নি সেটাকে স্পর্শ না করলেও যেন এর তৈল স্বীয় পরিচ্ছন্নতার দরুন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর তেলের জ্যোতি আগুনের। আল্লাহর নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের নূরের উপর মুমিনদের জন্য আল্লাহর হেদায়েতের নূর। আল্লাহ তার নূরের পথ নির্দেশ দান করেন অর্থাৎ দীন ইসলামের যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন বর্ণনা করে থাকেন। যাতে তা মানুষের বোধগম্যের নিকটবর্তী হয়, মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। আল্লাহর এ ইলমের মধ্যে উপমা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য; যা পূর্ববর্তী বাক্যের تَاكِيْد -এর জন্য আনা হয়েছে। এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হচ্ছে তার خَبَرْ ; আল্লাহর সত্তার উপর نُوْر শব্দটির প্রয়োগ হয়তো مُبَالَغَة হিসেবে করা হয়েছে। যেমনটা زَيْدٌ عَدْلٌ বাক্যে হয়েছে। অথবা এর مُضَاف টি مَحْذُوْف রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল- اَللّٰهُ ذُوْ نُوْرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - কিংবা نُوْر শব্দটি مُتَّصِلٌ بِمَعْنٰى اِسْم فَاعِل তথা منور অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এমনটিই বলেছেন।

قَوْلُهُ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ : مَثَلُ نُوْرِهٖ অংশটি تَرْكِيْب اِضَافِىْ হয়ে مُبْتَدَأ আর كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ হচ্ছে এর خَبَرْ ; مِشْكٰوة -এর পূর্বে نُوْر শব্দটি مُضَاف হিসেবে مَحْذُوْف রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটির মূলরূপ এভাবে হবে- صِفَةُ نُوْرِهٖ تَعَالٰى فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَنُوْرِ مِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

قَوْلُهُ زُجَاجَةٍ : زُجَاجَةٍ শব্দটি زَاء অক্ষরে তিন প্রকারের حَرَكَة তথা যবর, যের এবং পেশ যে কোনো একটি দিয়ে পড়া যায়। এর অর্থ হচ্ছে সীসা, সীসা দ্বারা নির্মিত পাত্র। زُجَاجَة শব্দটি قِنْدِيْل তথা প্রদীপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা তা সীসা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تُوْقَدُ : تُوْقَدُ শব্দটিতে তিন রকম কেরাত জায়েজ আছে। যথা-

১. بَاب تَفَعُّلْ থেকে فِعْل مَاضِىْ -এর صِيْغَة যেমন- تَوَقَّدَ بَر وَزْن تَفَعَّلَ -এ ক্ষেত্রে اَلْمِصْبَاحُ তার فَاعِلْ হবে।

২. اَوْقَدَ -এর فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ -এর صِيْغَة যেমন- يُوْقَدُ -এ ক্ষেত্রে اَلْمِصْبَاحُ উক্ত فِعْل -এর نَائِب فَاعِلْ হবে।

৩. اَوْقَدَ -এর فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর صِيْغَة যেমন- تُوْقَدُ- এক্ষেত্রে اَلزُّجَاجَةُ শব্দটি تُوْقَدُ -এর نَائِب فَاعِلْ হবে। অর্থাৎ نَائِب فَاعِلْ টির মূলরূপ হচ্ছে- فَتِيْلَةُ الزُّجَاجَةِ - তার উহ্য مُضَاف সহ تُوْقَدُ -এর نَائِب فَاعِلْ

قَوْلُهُ زَيْتُوْنَةٍ : زَيْتُوْنَةٍ শব্দটি شَجَرَةٍ থেকে بَدَل -এটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট অথবা কূফার নাহু শাস্ত্রবিদগণের মতে, এটি হচ্ছে- عَطْف بَيَانْ ; কেননা তাদের মতে نَكِرَه -এর মধ্যেও عَطْف بَيَانْ জায়েজ আছে। شَجَرَةٍ হচ্ছে مَوْصُوْف আর مُبْدَلْ مِنْه তার بَدَل ; بَدَل হচ্ছে زَيْتُوْنَةٍ - مُبْدَلْ مِنْه -এর সঙ্গে মিলে তার مَوْصُوْف ; صِفَتْ হচ্ছে এর مُبَارَكَةٍ -এর সঙ্গে মিলে مُضَافْ اِلَيْه আর زَيْت উহ্য مُضَاف টি তার مُضَافْ اِلَيْه -এর সঙ্গে মিলে مَجْرُوْر হয়েছে। তার جَارّ -এর সঙ্গে মিলে تُوْقَدُ -এর مُتَعَلِّق হয়েছে। مَجْرُوْر

قَوْلُهُ لَا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ : এ বাক্যটি شَجَرَةٍ -এর صِفَةْ -

قَوْلُهُ وَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ : এ বাক্যটি হচ্ছে شَرْط আর جَوَاب شَرْط টি উহ্য রয়েছে। جَوَاب شَرْط হচ্ছে لِاِضَاءِ نُوْرِ بِهٖ اَىْ بِالزَّيْتِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : মহান আল্লাহ বলেন- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর বা জ্যোতি, উক্ত আয়াতের তাফসীর আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম نُوْر সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক। আরবি اَلنُّوْرُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْوَارٌ ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো- আলো, জ্যোতি, প্রদীপ ইত্যাদি।

আর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র.) বলেন– اَلظَّاهِرُ بِنَفْسِهٖ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهٖ অর্থাৎ, যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায় এমন সব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে। অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে।

এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে مُنَوِّرٌ অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য দানকারী অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরবিশিষ্টকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে আরবিতে عَدْلٌ তথা ন্যায়পরায়ণতা বলে ব্যক্ত করা হয়। আর এখানে আয়াতের অর্থও তা-ই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এ নূর বলে হেদায়েতের নূর বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন– اَللّٰهُ هَادِىْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

قَوْلُهُ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ : মহান আল্লাহ বলেন– مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ অর্থাৎ তাঁর জ্যোতি দীপাধার সদৃশ। এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন– ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন–

هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ وَالْقُرْاٰنَ فِىْ صَدْرِهٖ فَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَهٗ فَقَالَ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَبَدَأَ بِنُوْرِ نَفْسِهٖ ثُمَّ ذَكَرَ نُوْرَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ فَكَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُهَا مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ ـ

অর্থাৎ এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুরআনের নূরে হেদায়েত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন– مَثَلُ نُوْرِهٖ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ ; হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এ আয়াতের কেরআতও مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর পরিবর্তে مَثَلُ نُوْرِهٖ পড়তেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) এ কেরাত এবং আয়াতের এ অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন– مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। যথা–

১. এ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে-হেদায়েত, যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكٰوةٍ ; এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি।

২. সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এ অর্থ বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মতো এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তূন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হেদায়েতের দৃষ্টান্ত। যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তূন তৈল রাখা হলো নূরে হেদায়েত যখন তা আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এ নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এ সৃষ্টিগত নূরে হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরের রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে এই নূরে হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর

দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক; কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ হাদীস থেকে এ ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ ফিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এ নূরে হেদায়েতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গাম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপক আকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক পায়, তারাই এ নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তৌফিক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক; বরং মাঝে মাঝে তা ক্ষতিকরও হয়।

قَوْلُهُ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ইমাম বগভী (র.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন– এ আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'বে আহবার (রা.) তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, زجاجة তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পূত পবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এ নবুয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হয়ে এটা এমন নূরে পরিণত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'ইরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মুজেযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহা-সা-ত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'খাসাইসে-কুবরা' গ্রন্থে, আবূ নু'আঈম 'দালাইলে-নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ الخ : মহান আল্লাহ বলেন– يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ অর্থাৎ এ প্রদীপকে প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। زَيْتُوْنَةٍ শব্দটি بَدَل বা عَطْف بَيَانٌ হয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে– ঐ যয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে এর উপর রৌদ্র এসে পড়বে না এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এর উপর হতে ছায়া সরে যাবে; বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই এর তৈলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে– ঐ বৃক্ষটি মাঠের মধ্যে রয়েছে। কোনো গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোনো জিনিস তাকে আড়াল করে না। এ কারণেই ঐ গাছের তৈল খুবই পরিষ্কার হয়।

হযরত ইকরিমা (র.) বলেন, খোলা বায়ু এবং পরিষ্কার রৌদ্র তাতে পৌঁছে থাকে। কেননা এটা খোলা মাঠের মধ্যস্থলে থাকে। **আর এ কারণেই** তার তৈল অত্যন্ত পাক-সাফ, উজ্জ্বল ও চকচকে হয়। এটাকে প্রাচ্যের গাছও বলা যাবে না এবং প্রতীচ্যেরও নয়। এরূপ গাছ খুবই তরতাজা ও সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ বৃক্ষ যেমন বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মুমিনও ফেতসা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষিত থাকে। যদি সে ফেতনার কোনো পরীক্ষায় পড়েও যায়, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের উপর স্থির ও অটল রাখেন।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এ বৃক্ষটি যদি দুনিয়ার মাটিতে থাকতো, তবে তো অবশ্যই তা প্রাচ্যের হতো অথবা প্রতীচ্যের হতো। কিন্তু এটা তো আল্লাহর জ্যোতির উপমা!

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো ভালো লোকের দৃষ্টান্ত, যে ইহুদিও নয় এবং খ্রিস্টানও নয়। এসব উক্তির মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম উক্তিটি যে, এটা জমিনের মধ্যভাগে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় বিনা বাধায় সেখানে রৌদ্র পৌঁছে থাকে। কেননা এর চারদিকে কোনো গাছ নেই। কাজেই এরূপ গাছের তৈল নিঃসন্দেহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাতলা এবং উজ্জ্বল হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটা প্রজ্বলিত করা হয়েছে পূত-পবিত্র যয়তূন তৈল দ্বারা। এটা এমনই উজ্জ্বল যে, তাকে অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। তাই এটা জ্যোতির উপর জ্যোতি। সুতরাং মুমিন পাঁচটি নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে। তার কথা জ্যোতি, তার আমল জ্যোতি, তার আগমন জ্যোতি, তার প্রস্থান জ্যোতি এবং তার শেষ ঠিকানাও জ্যোতি অর্থাৎ জান্নাত।

হযরত কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টান্ত। তাঁর নবুয়ত জনগণের উপর এমনভাবে প্রকাশমান যে, তিনি মুখে না বললেও জনগণের উপর তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন এ যয়তূন তৈল যে, এটাকে না জ্বালালেও নিজেই উজ্জ্বল। তাহলে এখানে দুটো জ্যোতি একত্র হয়েছে। একটি যয়তূনের এবং অপরটি আগুনের। এ দুটি যৌথভাবে আলো দেয়। অনুরূপভাবে কুরআনের জ্যোতি ও ঈমানের জ্যোতি একত্র হয়ে মুমিনের অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য : মহান আল্লাহর বাণী– شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ হতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোনো যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; আপনা-আপনি ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। –[মাযহারী]

অনুবাদ :

٣٦. فِىْ بُيُوْتٍ مُتَعَلِّقٌ بِيُسَبِّحُ الْاٰتِىْ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ تُعْظَمَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ بِتَوْحِيْدِهٖ يُسَبِّحُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ كَسْرِهَا اَىْ يُصَلِّىْ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْغَدَوَاتِ اَىِ الْبُكَرِ وَالْاٰصَالِ. الْعَشَايَا مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ.

৩৬. সেসব গৃহে এটি পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দের সাথে সম্পর্কিত। যেগুলোকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য একত্ববাদ দ্বারা তাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ নামাজ পড়ে, এখানে يُسَبِّحُ শব্দটি بَاء বর্ণে যবর এবং যের উভয় কেরাতে পঠিত সকাল বেলায় اَلْغُدُوِّ শব্দটি مَصْدَرٌ, এর অর্থ হচ্ছে غَدَاوَتٌ তথা সকাল। এবং সন্ধ্যা বেলায় সাঁঝ বেলায় সূর্য হেলার পর থেকে।

٣٧. رِجَالٌ فَاعِلُ يُسَبِّحُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَعَلٰى فَتْحِهَا نَائِبُ الْفَاعِلِ لَهٗ وَرِجَالٌ فَاعِلُ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَاَنَّهٗ قِيْلَ مَنْ يُسَبِّحُهٗ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ اَىْ شِرَاءٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ حُذِفَ هَاءُ اِقَامَةٍ تَخْفِيْفًا وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ تَضْطَرِبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ. مِنَ الْخَوْفِ الْقُلُوْبُ بَيْنَ النَّجَاةِ وَالْهَلَاكِ وَالْاَبْصَارُ بَيْنَ نَاحِيَتَيِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ.

৩৭. সেসব লোক, এখানে يُسَبِّحُ-কে যখন بَاء-এর মধ্যে كَسْرَة দিয়ে পড়া হবে, তখন رِجَالٌ তার فَاعِلْ হবে। আর যদি بَاء-এর মধ্যে فَتْحَة দিয়ে পড়া হয়, তাহলে رِجَالٌ তার نَائِب فَاعِلْ হবে। رِجَالٌ এখানে একটি উহ্য فِعْل-এর فَاعِلْ এবং একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। যেন এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, কে তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে? আর এর জবাবে বলা হচ্ছে– رِجَالٌ الخ যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না, এবং নামাজ কায়েম করা থেকে -এ আয়াতে اِقَامَةٌ শব্দ থেকে ه অক্ষরটিকে রহিত করা হয়েছে, সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ও জাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন অন্তর মুক্তি ও ধ্বংসের ব্যাপারে অস্থির থাকবে এবং চোখ ডানে বামে তাকাতে থাকবে। আর সেটি হবে কিয়ামতের দিন।

٣٨. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا اَىْ ثَوَابَهٗ وَاَحْسَنَ بِمَعْنٰى حَسَنٌ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. يُقَالُ فُلَانٌ يُنْفِقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ يُوَسِّعُ كَاَنَّهٗ لَا يَحْسَبُ مَا يُنْفِقُهٗ.

৩৮. তারা এজন্য এরূপ করতে থাকবে, যাতে তারা যে কর্ম করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন তার প্রতিদান দেন। এ আয়াতে اَحْسَنَ শব্দটি حَسَنٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা প্রদান করেন। بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্য। যেমন– বলা হয়, অমুক ব্যক্তি বে-হিসাব খরচ করে। অর্থাৎ সে এত বেশি খরচ করে যে, যা কিছু খরচ করে, সে যেন এর কোনো হিসাবই রাখে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ : এ বাক্যটি بُيُوْتٍ-এর صِفَتْ - اَنْ تُرْفَعَ الخ বাক্যটি بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হয়ে উহ্য بَاء -এর কারণে مَجْرُوْر এর হবে। উহ্য عِبَارَةْ হচ্ছে এরূপ- اَمَرَ اللّٰهُ بِرَفْعِهَا يُسَبِّحُ ; يُسَبَّحُ -কে যদি بَاء বর্ণে فَتْحَة-এর সাথে পড়া হয়, তাহলে لَهٗ তার نَائِب فَاعِلْ হবে এবং رِجَال শব্দটি فِعْل مَحْذُوْف-এর فَاعِلْ হবে। আর তখন এই উহ্য فِعْل টি একটি উহ্য سُوَالْ-এর جَوَابْ হবে। অর্থাৎ যখন বলা হবে যে, يُسَبَّحُ لَهٗ তখন প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, مَنْ يُسَبِّحُ ? উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে- رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَهُمْ : এ বাক্যের টি হচ্ছে لَامْ عَاقِبَة অর্থাৎ عَاقِبَةُ اَمْرِهِمُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ ; এটি يُسَبِّحُ-এর সঙ্গেও مُتَعَلِّقْ হতে পারে। অর্থাৎ يُسَبِّحُوْنَ لِاَجْلِ الْجَزَاءِ এ বাক্যটি يُسَبِّحُ-এর مُتَعَلِّقْ-ও হতে পারে। অর্থাৎ يُسَبِّحُوْنَ لِاَجْلِ الْجَزَاءِ ; এছাড়া এটি فِعْل مَحْذُوْف-এর مُتَعَلِّقْ-ও হতে পারে। তখন تَقْدِيْر عِبَارَتْ হবে এরূপ- فَعَلُوْا ذٰلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূরে হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন, এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তাওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনের আসল আবাসস্থল হচ্ছে যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়- সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী فِىْ بُيُوْتٍ-এর সম্পর্ক يَهْدِى اللّٰهُ بِنُوْرِهٖ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার নূরে হেদায়েত পাওয়ায় স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদের গুরুত্ব : মসজিদ আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। ইমাম কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ اَحَبَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبَّ اَصْحَابِىْ وَمَنْ اَحَبَّ اَصْحَابِىْ فَلْيُحِبَّ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَحَبَّ الْقُرْاٰنَ فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ فَاِنَّهَا اَفْنِيَةُ اللّٰهِ اَذِنَ اللّٰهُ فِىْ رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا مَيْمُوْنَةٌ مَيْمُوْنٌ اَهْلُهَا مَحْفُوْظَةٌ مَحْفُوْظٌ اَهْلُهَا هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ حَوَائِجِهِمْ هُمْ فِى الْمَسَاجِدِ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। যে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হেফাজতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হেফাজতে থাকে। যারা নামাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাজত করেন। -[কুরতুবী]

رَفْع مَسَاجِد-এর অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী– اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ -এর মধ্যে اَذِنَ শব্দটি اِذْنٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। تُرْفَعَ শব্দটি رَفْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। –[ইবনে কাসীর]

ইকরিমা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, رَفْع বলে মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। যেমন– কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رَفْع قَوَاعِد বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, رَفْع مَسَاجِد বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইজ্জত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। যেমন– এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোনো নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন। –[ইবনে মাজাহ]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। –[কুরতুবী]

প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীসগ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারূকে আযম (রা.) বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি রসুন-পিঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত, যতদিন এ রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামাজ পড়া।

رَفْعُ الْمَسَاجِد-এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে, মসজিদ নির্মাণ করা এবং মসজিদকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওসমান (রা.) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাগণত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহরা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। তাঁর নির্মিত এ মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়; বরং আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং এর দ্বারা ছওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফজিলত : আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গৃহে অজু করে ফরজ নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাজের পরে অন্য নামাজ ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয়, যদি উভয়ের মাঝখানে কোনো কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। –[মুসলিম]

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুরুষের নামাজ জামাতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামাজ পড়ার চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নত অনুযায়ী অজু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাজের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাজেরই ছওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে, "হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার অজু না ভাঙ্গে।"

হযরত হাকাম ইবনে ওমায়র (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ, নম্রচিত্ত হও। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং [আল্লাহর ভয়ে] অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত আবূদ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন, তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনেছি– মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে [অধিক জিকির দ্বারা] নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম ও শান্তি নিশ্চিত করেন এবং পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার জিম্মাদার হয়ে যান।

আবূ সাদেক ইজদী শুয়াইব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন, মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এ রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসিজদ পয়গাম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শেষ জমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়া ও তার মহব্বতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা মসজিদে আগমনকারী এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নেই।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বের না করা তার দায়িত্ব। –[কুরতুবী]

মসজিদের পনেরটি আদব : আলেমগণ মসজিদের পনেরটি আদব উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. মসজিদে পৌঁছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামাজ, তেলাওয়াতে কুরআন, তাসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা নামাজ অবস্থায় সালাম করা জায়েজ নয়। ২. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাজের জন্য মাকরূহ সময় না হয়। অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় না হয়। ৩. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। ৪. মসজিদে তীর-তরবারি বের না করা। ৫. মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি বা নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। ৬. মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। ৭. মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। ৮. মসজিদে বসার জায়গায় কারো সাথে ঝগড়া না করা। ৯. যেখানে কাতারে পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। ১০. নামাজি ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। ১১. মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। ১২. অঙ্গুলি না ফুটানো। ১৩. শরীরের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা। ১৪. নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উম্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। ১৫. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ পনেরটি আদব লিখার পর বলেন, যে ব্যক্তি এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং এর ফলে মসজিদ তার জন্য হেফাজত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়।

মুফতি শফী (র.) মসজিদের আদব-কায়দা ও এর প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহর জিকির, কুরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, কুরআনের فِىْ بُيُوْتٍ শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহ কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহত অথবা জিকিরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, তা দ্বারা সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন– মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اَذِنَ اللّٰهُ বাক্যে اَذِنَ শব্দের বিশেষ রহস্য : তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে اَذِنَ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে حُكْم ও اَمَرَ শব্দের পরিবর্তে اَذِنَ শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রূহুল মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

قَوْلُهُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُهُ : এখানে তাসবীহ [পবিত্রতা বর্ণনা], তাহমীদ [প্রশংসা কীর্তন], নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিকির বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ الخ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন, একদিন আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নামাজের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, এদের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়েছে–

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওজন করার সময় আজানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাজের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আজানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাজে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতে না। তাঁদের প্রশংসায়ই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ الخ : মহান আল্লাহর বাণী– رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতে যেসব মু'মিন আল্লাহ তা'আলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য; পক্ষান্তরে নারীদের জন্য গৃহে নামাজ পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালাম (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই কোনো কোনো তফসীরবিদ বৈপরীত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে تِجَارَةٌ অর্থ ক্রয় এবং بَيْعٌ শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন।

কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থেই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بَيْعٌ -কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির ও নামাজের বিপরীতে মু'মিনগণ কোনো বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসায়ী ছিলেন : এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পপতি ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা আল্লাহর স্মরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা এ কথা বলা অনর্থক হবে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ الخ : মহান আল্লাহর বাণী- يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। মাতারুল অরাক (র.) বলেন যে, তাঁরা বেচাকেনা করতেন, নিক্তি হয়তো তাদের হাতে থাকতো এমতাবস্থায় আজান তাদের কানে আসলে তাঁরা নিক্তি ফেলে দিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে ধাবিত হতেন। জামাতের সাথে নামাজ পড়ার প্রতি তাঁদের খুবই আসক্তি ছিল। তাঁরা নামাজের সময়, রুকন এবং আদবের হেফাজতসহ নামাজের পাবন্দ ছিলেন। এটা এ কারণে যে, তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে তারা ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল যে, সেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই তো তাঁরা থাকতেন সদা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে- শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا الخ : এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাতে তারা যে কর্ম করে তজ্জন্যে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ "আল্লাহ অণুপরিমাণও জুলুম করেন না।" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে তার জন্য দশগুণ পুণ্য রয়েছে।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, "কে এমন আছে, যে আল্লাহকে করজে হাসানা দিতে পারে?" তিনি আরো বলেন, "তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন [পুণ্য] বৃদ্ধি করে থাকেন।" এখানে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

বর্ণিত আছে, যে, একদা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে দুধ আনয়ন করা হয়। তিনি তাঁর মজলিসের সব লোককেই তা পান করাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সবাই রোজা অবস্থায় ছিলেন বলে পুনরায় দুধের পাত্রটি তাঁর কাছেই ফিরিয়ে আনা হয়। তখন তিনি তা পান করেন, কারণ তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন না। অতঃপর তিনি يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর বাণী- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ [তিনি তাদেরকে পূর্ণভাবে তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং প্রাপ্যের অধিক দিবেন] -এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তাদের প্রতিদান এই যে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। আর তাদের প্রাপ্যের অধিক দিবেন, এর ভাবার্থ এই যে, যারা তাদের প্রতি ইহসান করেছিল তারা শাফাআতের হকদারও বটে, তাদের জন্য শাফাআত করার অধিকারও লাভ করবে।"

এরপর বলা হয়েছে- وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন। وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোনো সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রিজিক দান করবেন।

অনুবাদ :

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ جَمْعُ قَاعٍ اَىْ فِىْ فَلَاةٍ وَهُوَ شُعَاعٌ يُرٰى فِيْهَا نِصْفُ النَّهَارِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ يُشْبِهُ الْمَاءَ الْجَارِىْ يَّحْسَبُهُ يَظُنُّهُ الظَّمْاٰنُ اَىِ الْعَطْشَانُ مَاۤءً حَتّٰىٓ اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا مِمَّا حَسِبَهٗ كَذٰلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ اَنَّ عَمَلَهٗ كَصَدَقَةٍ تَنْفَعُهٗ حَتّٰىٓ اِذَا مَاتَ وَقَدِمَ عَلٰى رَبِّهٖ لَمْ يَجِدْ عَمَلَهٗ اَىْ لَمْ يَنْفَعْهُ وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِنْدَ عَمَلِهٖ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ط اَىْ اَنَّهٗ جَازَاهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ اَىِ الْمُجَازَاةِ ـ

৩৯. যারা কুফরি করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, قِيْعَةٌ শব্দটি قَاعٌ -এর বহুবচন। অতএব, بِقِيْعَةٍ অর্থ– হচ্ছে فِىْ فَلَاةٍ তথা মরুভূমিতে। سَرَابٌ -ঐ চাকচিক্যকে বলা হয়, যা গ্রীষ্মকালীন দুপুর বেলার প্রচণ্ড রোদে প্রবহমান পানির মতো মনে হয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু সে যখন এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন কিছুই পায় না। যা সে ধারণা করেছে, সেই বস্তু থেকে। অনুরূপভাবে কাফেররা মনে করে যে, নিশ্চয় তার আমল যেমন– সদকা তাকে উপকৃত করবে। কিন্তু সে যখন মৃত্যুবরণ করবে এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে তার আমলকে উপকারী হিসেবে পাবে না। আর সে তার আমলের নিকট আল্লাহকে পাবে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে তৎপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমলের প্রতিফল দানে অত্যন্ত তৎপর।

٤٠. اَوْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمُ السَّيِّئَةُ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ عَمِيْقٍ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ اَىِ الْمَوْجِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ اَىْ مَوْجُ الثَّانِىْ سَحَابٌ ط اَىْ غَيْمٌ هٰذِهٖ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ظُلْمَةُ الْبَحْرِ وَظُلْمَةُ الْمَوْجِ الْاَوَّلِ وَظُلْمَةُ الْمَوْجِ الثَّانِىْ وَظُلْمَةُ السَّحَابِ اِذَآ اَخْرَجَ النَّاظِرُ يَدَهٗ فِىْ هٰذِهِ الظُّلُمٰتِ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا اَىْ لَمْ يَقْرُبْ مِنْ رُؤْيَتِهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ اَىْ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللّٰهُ لَمْ يَهْتَدِ ـ

৪০. অথবা কাফেরদের বদ আমলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ; যাকে আচ্ছন্ন করে এক তরঙ্গের উপর দ্বিতীয় তরঙ্গ; যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর সমুদ্রের অন্ধকার, প্রথম তরঙ্গের অন্ধকার, দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্ধকার, মেঘপুঞ্জের অন্ধকার– এসব অন্ধকারের মঝে দর্শক যদি নিজের হাত বের করে, তা আদৌ দেখতে পাবে না। অর্থাৎ সে মোটেই দেখার নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন না, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا - مَوْصُوْل ও صِلَة মিলে مُبْتَدَأ اَوَّلْ এবং اَعْمَالُهُمْ হচ্ছে مُبْتَدَأ ثَانِىْ - অতঃপর كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ বাক্যটি كَائِنٌ -এর مُتَعَلِّقْ হয়ে مُبْتَدَأ ثَانِىْ -এর خَبَرٌ হয়েছে। এরপর مُبْتَدَأ ثَانِىْ তার خَبَرٌ -এর সঙ্গে মিলে مُبْتَدَأ اَوَّلْ - وَالَّذِيْنَ -এর خَبَرٌ হয়েছে। مُبْتَدَأ اَوَّلْ তার خَبَرٌ -এর সঙ্গে মিলে جُمْلَيه اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ الخ : এ আয়াত থেকে মহান আল্লাহ কাফেরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটি হচ্ছে প্রথম দৃষ্টান্ত। আর প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফেরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরির দিকে আহ্বান করে থাকে এবং মনে করে যে, তারা হেদায়েতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; কিন্তু এটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত তো হলো এরূপ যেমন কোনো পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং তাকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে। উক্ত আয়াতে قِيْعَةٌ শব্দটি قَاعٍ শব্দের বহুবচন, যেমন جَارٍ শব্দটির বহুবচন হলো جِيْرَةٌ, আর قَاعٍ শব্দের বহুবচন قِيْعَانٌ -ও এসে থাকে, যেমন جَارٍ শব্দের বহুবচন جِيْرَانٌ -ও আসে। قَاعٍ শব্দের অর্থ হলো জনশূন্য প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরূপ মরুভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দুপুরের সময় এরূপই মনে হয় যে, পানির প্রশস্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোনো লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ভ্রান্তের মতো পানির খোঁজে ফিরতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, সেখানে এক ফোঁটা পানিরও কোনো নাম-নিশানা নেই। তদ্রূপ এই কাফেররাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভালো কাজই করছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের কাছে একটা পুণ্যও নেই। হয়তো তাদের পুণ্য তাদের বদ নিয়তের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা শরিয়ত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। মোটকথা, সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্যহস্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যমান। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করছেন এবং ঐ কাফেরদের একটি আমলও পুণ্যের যোগ্যরূপে পাওয়া যাচ্ছে না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে?" উত্তরে তারা বলবে, "আমরা আল্লাহর পুত্র [নাউযুবিল্লাহ] উযায়ের (আ.)-এর উপাসনা করতাম।" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর কোনো পুত্র নেই।" তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, "আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও?" তারা জবাবে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে পানি পান করিয়ে দিন!" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না [ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন?]" অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। সুতরাং তারা পানি মনে করে সেদিকে দৌড় দেবে এবং সেখানে পৌঁছলেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

قَوْلُهُ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ الخ : এ আয়াতে মহান আল্লাহ কাফেরদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আর এটা হলো অনুসরণকারী লোকদের দষ্টান্ত, যারা মোটেই জ্ঞান রাখতো না। তারা পূর্ববর্ণিত কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ করতো। যাদের উপমা দেওয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের সাথে, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে রয়েছে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফেরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে। যাদেরকে তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনে না। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে? সেটাও তারা জানে না। তারা তাদের পিছনে চলতে থাকে; কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোনো একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" উত্তরে সে বলে, "আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি।" আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়, "এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে?" জবাবে সে বলে, "তা তো আমি জানি

না।" যেমন সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে তেমনই এই কাফেরের কানে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর ও কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ....।"

অন্য আয়াতে রয়েছে–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشٰوَةً

অর্থাৎ "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে, আর আল্লাহ তাকে জ্ঞানের উপর পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কর্ণকুহরে ও অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ও তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন?।" –[সূরা জাসিয়া : ২৩]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধাকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং পরিণাম অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েতের জ্যোতি দান না করেন, সে হেদায়েতশূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন– مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো হেদায়েতকারী নেই।" এটা সে কথার মোকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটাকে খুবই বড় ও বেশি করেন।

قَوْلُهٗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا الخ : উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে– وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ এ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নূরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহর নূর কোথায় পাবে? আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা নিরেট আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে। –[মাযহারী]

আয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম হেদায়েতের নূরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে হেদায়েতের নূর লাভ হয় ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। এরপর ইরশাদ হয়েছে, হেদায়েতের এ নূর লাভ করতে হলে আল্লাহর ঘর মসজিদে নিয়মিত হাজির হতে হবে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে। আর হেদায়েতের এ নূরকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকির এবং তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতে হবে। এজন্যে পন্থা হলো, যারা সকাল সন্ধ্যায় তথা দিবারাত্রি আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকে এবং তাদের দুনিয়াদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে না, এমন লোকদের সন্নিধ্য লাভ করা। এমন লোকদের সংসর্গের কারণে সর্বদা জিকিরে ইলাহীতে মশগুল থাকার তাওফীক হবে। এরপর যারা সত্য-সাধক, তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ : এখানে আল্লাহ পাকের প্রেমিক আউলিয়ায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত– .....وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে কাফেরদের অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কাফেরদের কার্যকলাপের দু'টি দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। কাফেরদের মধ্যে যারা কিছু সৎকাজ করে, যেমন– দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে দান-খয়রাত করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদের এসব কাজ হলো মরীচিকার ন্যায়, যাকে তারা দূর থেকে দেখে পানি মনে করে; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে পানির নামগন্ধও নেই। ঠিক এমনিভাবে কাফেররা যত দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করুক না কেন; কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, তাই আখিরাতে এর কোনো ফল তারা পাবে না। কেননা এর জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। আর কাফেরদের কুফর ও শিরক, অন্যায় অনাচার, জুলুম অত্যাচারকে অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ অন্ধকারেই তারা থাকবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। দুনিয়াতে এ অন্ধকারে থাকার কারণে তারা হেদায়েতের আলো পায় না, আর আখিরাতে তাদের জন্যে দোজখের চিরশাস্তি অবধারিত। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭]

٤١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِنَ التَّسْبِيْحِ صَلٰوةٌ وَالطَّيْرُ جَمْعُ طَائِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ صٰفّٰتٍ ط حَالٌ بَاسِطَاتٌ اَجْنِحَتَهِنَّ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ـ فِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ ـ

٤٢. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج خَزَائِنُ الْمَطَرِ وَالرِّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ـ الْمَرْجِعُ ـ

٤٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا يَسُوْقُهٗ بِرِفْقٍ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ يَضُمُّ بَعْضَهٗ اِلٰى بَعْضٍ فَيَجْعَلُ الْقِطَعَ الْمُتَفَرِّقَةَ قِطْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا بَعْضَهٗ فَوْقَ بَعْضٍ فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج مَخَارِجِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ زَائِدَةٌ جِبَالٍ فِيْهَا فِى السَّمَاءِ بَدَلٌ بِاِعَادَةِ الْجَارِ مِنْ بَرَدٍ اَىْ بَعْضَهٗ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ط يَكَادُ يَقْرُبُ سَنَا بَرْقِهٖ لَمَعَانُهٗ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ـ النَّاظِرَةِ لَهٗ اَنْ يَخْطَفَهَا ـ

অনুবাদ :

৪১. তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর নামাজও এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। এবং পক্ষীকুল طَيْرٌ শব্দটি طَائِرٌ -এর বহুবচন, আকাশ ও পাতালের মাঝে উড়ন্ত তাদের পাখা বিস্তার করা অবস্থায় প্রত্যেকেই জানে আল্লাহকে তাঁর যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। এখানে জ্ঞানীদেরকে জ্ঞানহীনদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৪২. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই বৃষ্টি, জীবিকা ও তৃণলতার ভাণ্ডার আল্লাহরই এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন কোমলতার সাথে পরিচালনা করেন অতঃপর তাকে পুঞ্জিভূত করেন একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দেন। অতঃপর বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলোকে একই টুকরায় পরিণত করে দেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন একটাকে অপরটার উপর রাখেন অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা বৃষ্টি নির্গত হয় তার গর্তসমূহ থেকে তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে বর্ষণ করেন এখানে مِنْ جِبَالٍ -এর مِنْ টি অতিরিক্ত। আর فِيْهَا অর্থ হলো فِى السَّمَاءِ হরফে জরকে পুনরায় এনে اَلسَّمَاءِ থেকে بَدْل হয়েছে শিলা অর্থাৎ, কিছু অংশ এবং তার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। নিকটবর্তী করে দিতে চায়, তার বিদ্যুত চমক তার আলোর ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন দর্শকের চক্ষুকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

অনুবাদ :

٤٤. يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اَىْ يَاْتِىْ بِكُلِّ مِنْهُمَا بَدَلَ الْاٰخَرِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ التَّقْلِيْبِ لَعِبْرَةً دَلَالَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ لِاَصْحَابِ الْبَصَائِرِ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪৪. আল্লাহ দিবানিশির পরিবর্তন ঘটান অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে প্রতিটিকে একটির পরিবর্তে অপরটি আনয়ন করেন নিশ্চয় এতে পরিবর্তনে উপকরণ বা শিক্ষা রয়েছে নির্দেশনা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নগণের জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, আল্লাহর কুদরতের উপর।

٤٥. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ اَىْ حَيَوَانٍ مِّنْ مَّآءٍ ج اَىْ نُطْفَةٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج كَالْحَيَّاتِ وَالْهَوَامِّ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج كَالْاِنْسَانِ وَالطَّيْرِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط كَالْبَهَائِمِ وَالْاَنْعَامِ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৪৫. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক চলন্ত জীবকে প্রাণীকে পানি থেকে অর্থাৎ বীর্য ও শুক্র থেকে তাদের কতেক বুকে ভর দিয়ে চলে যেমন– সর্প ও পোকামাকড় বা কীট পতঙ্গ কতেক দু' পায়ে ভর দিয়ে চলে যেমন– মানুষ, পাখি কতেক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে যেমন– চতুষ্পদ প্রাণী আর আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى الخ : এখানে اَلَمْ تَرَ-এর হামযাহটি تَقْرِيْر -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। আর رُؤْيَتٌ দ্বারা رُؤْيَت قَلْبِىْ তথা অন্তর্দৃষ্টি উদ্দেশ্য। কেননা সাধারণ দৃষ্টির সাথে تَسْبِيْح -এর কোনো সম্পর্ক নেই; বরং تَسْبِيْح -এর সম্পর্ক হচ্ছে قَلْب বা অন্তকরণের সাথে। অর্থ হলো হে মুহাম্মদ ﷺ! খুব ভালোভাবে অনুধাবন করুন যে, আকাশ পাতালের সকল সৃষ্টজীব আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। এমন কি পক্ষীকুলও হাওয়ায় ভেসে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর তাসবীহ জপতে থাকে। আর এখানে مَنْ শব্দটি জ্ঞানসম্পন্নকে জ্ঞানহীনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আনয়ন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ طَيْرٌ : এখানে طَيْرٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে طَائِرٌ যেমন– رَكْبٌ বহুবচন, আর এর একবচন হলো رَاكِبٌ আর طَيْرٌ শব্দটি مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -এর উপর عَطْف হয়েছে। এ তারকীবের উপর একটি প্রশ্ন এসে যায়। প্রশ্নটি হলো, যদি طَيْر -এর عَطْف টা مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -এর উপর করা হয়, তবে عَطْفُ الشَّىْءِ عَلَى نَفْسِهٖ লাযেম আসে। কেননা مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -এর মধ্যে পক্ষীকুলও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف একই বস্তু হয়ে গেল।

মুসান্নিফ (র.)-এর بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ দ্বারা উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। উত্তরের সারকথা হলো– এখানে مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه এক হয়নি; বরং এর মধ্যে পরিবর্তন রয়েছে। এভাবে যে, مَعْطُوْف عَلَيْه দ্বারা আসমান এবং জমিনের সৃষ্টজীব উদ্দেশ্য। কিন্তু পাখি যখন হাওয়ায় ভেসে উড়তে থাকে, তখন তা আকাশেও থাকে না। আবার জমিনেও থাকে না। কাজেই عَطْفُ الشَّىْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর সংশয় তিরোহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ صَافَّاتٍ : এখানে صَافَّاتٍ শব্দটি طَيْرُ থেকে حَالٌ হয়েছে। আর طَيْرُ টি مَنْ -এর উপর عطف হওয়ার কারণে مَرْفُوعٌ হয়েছে এবং صَافَّاتٍ এটা حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ : এখানে عَلِمَ , صَلَاتَهُ এবং تَسْبِيْحَهُ তিনটি যমীরের مَرْجِعْ হলো كُلٌّ –[জুমাল]

قَوْلُهُ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, بَيْنَ শব্দটি একাধিকের মাঝে ব্যবহৃত হয়, অথচ এখানে শুধুমাত্র سَحَاب এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর سَحَاب হলো একবচন। মুসান্নিফ (র.) স্বীয় উক্তি يَضُمُّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْض দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ قَطَعِ سَحَابْ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, প্রথম অভিমত হলো তিনটি ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো আল্লাহ তা'আলা। আর كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ– অর্থাৎ كُلٌّ ই– مَرْجِعْ হবে। আর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ -এর صَلَاتَهُ এবং تَسْبِيْحَهُ -এর ضَمِيْر এর مَرْجِعْ হলো كُلٌّ [জুমাল] একটি مُضَاف উহ্য রয়েছে।

আর যদি سَحَاب -কে سَحَابَةٌ -এর বহুবচন ধরা হয় বা إِسْم جِنْس মেনে নেওয়া হয়, তবে উক্ত প্রশ্ন অবান্তর হবে। আর জবাবেরও কোনো প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ رُكَامًا : رُكَام শব্দটি إِسْم অর্থ হলো স্তরে স্তরে। আর يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ এ বাক্যটি الودق হতে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَالِ : এখানে خِلَالِ শব্দটিকে কেউ কেউ حِجَاب -এর ওজনে একবচন বলেছেন। আবার কেউ কেউ خِلَالٌ -কে خَلَلٌ -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন– جِبَالٌ শব্দটি جَبَلٌ -এর বহুবচন خِلَالٌ অর্থ হচ্ছে– ছিদ্র, গর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ الخ : আল্লাহ তা'আলা اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ الخ আয়াতে ইরশাদ করেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জিন, ফেরেশতা এমনকি অজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ "সপ্ত আকাশ ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে।

উড্ডীয়মান পক্ষীকুলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে থাকে। এ সবগুলোর জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের ইবাদতের বিভিন্ন পন্থাও তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও জমিনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। কিয়ামতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে। তিনি যা চাইবেন তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারি করে দিবেন। মন্দ লোক মন্দ বিনিময় পাবে এবং ভালো লোক ভালো বিনিময় লাভ করবে। সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত হাকেম। তাঁরই সত্তা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যোগ্য।

قَوْلُهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ : আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। হযরত সুফিয়ান (র.)-এর বর্ণনা মতে এ পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে– এর চুল পরিমাণও বিরোধিত করে না। এ আনুগত্যকে তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত; উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

আল্লামা যামাখশারী (র.) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন, এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে,

তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও নামাজে সমগ্র সৃষ্টজগত ব্যাপৃত আছে; কিন্তু প্রত্যেকের নামাজ ও তাসবীহের পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামাজ ও তাসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এ বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে- اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এটা ছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্য অত্যাশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

قَوْلُهٗ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে উঠে। তারপর ঐগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয়ে যায় এবং একে অপরের উপর জমে যায়। তারপর ঐগুলোর মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, জমিনকে তিনি যোগ্য করে তুলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বর্ষিতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

এ বাক্যে প্রথম مِنْ টি اِبْتِدَاء غَايَتْ-এর জন্য, দ্বিতীয়টি تَبْعِيْض-এর জন্য এবং তৃতীয়টি جِنْس-এর বর্ণনার জন্য। এটা এ তাফসীরের উপর ভিত্তি করে যে, আয়াতের অর্থ করা হবে- শিলার পাহাড় আকাশে রয়েছে। আর যাঁদের মতে এখানে جَبَلٌ বা 'পাহাড়' শব্দটি রূপক অর্থে 'মেঘ' রূপে ব্যবহৃত, তাঁদের নিকট দ্বিতীয় مِنْ টিও اِبْتِدَاء غَايَتْ-এর জন্য এসেছে। কিন্তু এটা প্রথম مِنْ হতে বদল হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

قَوْلُهٗ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ الخ : মহান আল্লাহর বাণী- فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ-এর ভাবার্থ হচ্ছে- বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা যেখানে বর্ষাবার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর রহমতে বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষে না। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন, নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানি করেন তার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন। পরবর্তী আয়াতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এটা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

قَوْلُهٗ يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিনকে ছোট করেন ও রাত্রিকে বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিনকে বড় করেন ও রাত্রিকে ছোট করেন। এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলো মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে।" -[সূরা আলে ইমরান : ১৯০]

উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত اَلسَّحَابُ অর্থ মেঘমালা, আর جِبَالٌ অর্থ বড় বড় মেঘ খণ্ড, আর بَرَدٌ অর্থ- শিলা।

قَوْلُهٗ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ : আল্লাহ তা'আলা وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ আয়াতে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একই পানি দ্বারা নানা প্রকারের মাখলুক বা সৃষ্টজীব সৃষ্টি করেছেন। সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে দেখা যায় যে, এগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান; তিনি যা চান না, তা কখনো হয় না।

অনুবাদ :

٤٦. لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط اَىْ بَيِّنَاتٍ هِىَ الْقُرْاٰنُ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ . اَىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ .

৪৬. আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল, আর তা হলো কুরআন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথে রাস্তায় পরিচালিত করেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পথে।

٤٧. وَيَقُوْلُوْنَ اَىِ الْمُنَافِقُوْنَ اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِاللّٰهِ بِتَوْحِيْدِهٖ وَبِالرَّسُوْلِ مُحَمَّدٍ وَاَطَعْنَا هُمَا فِيْمَا حَكَمَا بِهٖ ثُمَّ يَتَوَلّٰى يُعْرِضُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط عَنْهُ وَمَآ اُولٰٓئِكَ الْمُعْرِضُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ . الْمَعْهُوْدِيْنَ الْمُوَافِقِ قُلُوْبُهُمْ لِاَلْسِنَتِهِمْ .

৪৭. তারা বলে, অর্থাৎ মুনাফিকরা আমরা ঈমান এনেছি আমরা সত্যায়ন করেছি, আল্লাহর উপর তাঁর একত্ববাদের উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর মুহাম্মদ ﷺ এবং আনুগত্য করি তাঁরা যে বিধান দান করেছেন তার অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমুখ হয় এরপরও তাদের একদল তা থেকে এবং তারা নয় বিমুখকারীগণ বিশ্বাসী। এমন অঙ্গীকারকারী নয় যাতে তার হৃদয় রসনার সাথে একমত।

٤٨. وَاِذَا دُعُوْآ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَلْمُبَلِّغُ عَنْهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ . عَنِ الْمَجِئِ اِلَيْهِ .

৪৮. যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দায়ী বা মুবাল্লিগ তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় তাঁর নিকট আগমন করা হতে।

٤٩. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْآ اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ . مُسْرِعِيْنَ طَائِعِيْنَ .

৪৯. সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে দ্রুত অনুগত হয়ে।

٥٠. اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ كُفْرٌ اَمِ ارْتَابُوْآ اَىْ شَكُّوْا فِىْ نُبُوَّتِهٖ اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ط فِى الْحُكْمِ اَىْ يُظْلَمُوْا فِيْهِ لَا بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ . بِالْاِعْرَاضِ عَنْهُ .

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? কুফরির না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে অর্থাৎ তারা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে সন্দিহান নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ফয়সালার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফয়সালায় তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। না, এটা হতে পারে না বরং তারাই তো অবিচারকারী। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا الخ : এখানে لَقَدْ -এর لَامٌ টি হলো قَسَمِيَّة এবং قَسَم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মূলরূপ ছিল- وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلْنَا আর اَطَعْنَا -এর পর هُمَا যমীরকে এ কারণে বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, اَطَعْنَا -এর মাফউল উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمُبَلِّغُ عَنْهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো لِيَحْكُمَ -এর মধ্যে ضَمِيْر -কে একবচন কেন আনা হয়েছে, অথচ পূর্বে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মূলত দুটি সত্তা।

জবাবের সারকথা হলো হুকুম বাস্তবিক পক্ষে যদিও আল্লাহর, তবে مُبَاشِرٌ بِالْحُكْمِ এবং مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ হলেন রাসূল ﷺ। আল্লাহর উল্লেখ শুধু সম্মানার্থে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ الخ : এখানে اِذَا টি مُفَاجَاتِيَه যা এমন فَاء -এর স্থলাভিষিক্ত যেই فَاء জওয়াবে শর্তকে শর্তের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়, অর্থাৎ اِذَا دُعُوْا হলো شَرْط আর اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ হলো তার جَزَاء

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الخ : **শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী (র.) প্রমুখ এ ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদির মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদি তাকে বলল, চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে মকদ্দমা গেল তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূল ﷺ -এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদির নিকট মকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। ইহুদি রাসূল ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করল। অবশেষে উভয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে মকদ্দমা নিয়ে পৌছল। ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক মহানবী ﷺ ইহুদির পক্ষে ফয়সালা দিলেন। রাসূল ﷺ -এর দরবার থেকে বের হয়ে মানুফিক বিশর বলল, চলো আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁর থেকে এ ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করি। সেহেতু তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। তাঁর নিকট পৌছে ইহুদি বলল, হযরত এ বিষয়ে আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গিয়েছিলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি; বরং এখন আপনার দ্বারস্থ হয়েছে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিককে বললেন- اَكَذٰلِكَ [ব্যাপারটি কি এরূপই?] মুনাফিক বিশর বলল, জি-হ্যাঁ। হযরত ওমর (রা.) উভয়কে বললেন- رُوَيْدًا حَتّٰى اَخْرُجَ اِلَيْكُمَا [তোমরা আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর] এরপর হযরত ওমর (রা.) ঘরে গিয়ে তরবারি নিয়ে ফিরে আসলেন এবং এক আঘাতেই মুনাফিকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। এরপর বললেন- هٰكَذَا اَقْضِى بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَضَاءِ رَسُوْلِهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট নয়, আমি তার বিচার এভাবেই করে থাকি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন- اِنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ অর্থাৎ ওমর সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। আর এ কারণেই তাঁকে فَارُوْق নামে ভূষিত করা হয়।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হক বা সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট; কিন্তু হক গ্রহণের তাওফীক একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, কিছু লোক হেদায়েত পাবে আর কিছু লোক পাবে না। যারা হেদায়েত পাবে না, তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবি করবে; কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে। এরাই হলো মুনাফিকের দল। ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করে না। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিমুখী নীতির এবং তাদের

কলঙ্কময় জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারা ইসলামের সত্যতার কথা প্রকাশ করত, প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর **প্রতি ঈমান** ও আনুগত্যের দাবিও করত, কিন্তু অন্তরে তাদের বিশ্বাস থাকত না, শুধু প্রতারণার লক্ষ্যেই তারা একথা প্রকাশ **করত**। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَيَقُولُونَ

অর্থাৎ মুনাফিকরা মুখে অত্যন্ত ফলাও করে বলে সে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আনুগত্য **প্রকাশ** করেছে, অথচ এরপর তাদের একদল এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে তাদের সম্পর্কে **চূড়ান্ত** ঘোষণা করা হয়েছে- وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ প্রকৃত পক্ষে, তারা মুমিন নয়। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ২০]

قَوْلُهُ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, তারা মুখে তো **ঈমান** ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো **মিল** নেই। কারণ তারা ঈমানদার নয়।

মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ যখন তাদেরকে হেদায়াতের দিকে আহবান করা হয় এবং কুরআন ও হাদীস মানতে বলা হয়, তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا -

অর্থাৎ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও ওটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূল ﷺ -এর দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" -[সূরা নিসা : ৬০ - ৬১]

قَوْلُهُ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ الخ : মহান আল্লাহ বলেন- وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ অর্থাৎ যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল ﷺ -এর নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শরিয়তের ফয়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শরয়ী ফয়সালা তাদের মনের চাহিদার উল্টো, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থি, তবে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং এরূপ লোক পাকা কাফের। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোনো একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়তো অন্তরে বে-ঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এ ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি জুলুম করেন। এ তিনটাই কুফরির অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এরূপ কাফেরের সংখ্যা অনেক ছিল, যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। যখন তারা দেখতো যে, কুরআন ও হাদীসমূলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে, তখন তারা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে তাদের মকদ্দমা পেশ করতো। আর যখন দেখতো যে, তাদের প্রতিপক্ষের অনুকূলে রায় যাবে, তখন নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিবাদ হয় এবং তাদেরকে ইসলামি হুকুম অনুযায়ী ফয়সালার দিকে আহ্বান করা হয়, আর তারা তা অস্বীকার করে তবে তারা জালিম এবং তারা অন্যায়ের উপর রয়েছে।"

পক্ষান্তরে সঠিক ও খাঁটি মুমিনের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা তো কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলোর ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে থাকে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) [যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক] মৃত্যুর সময় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জানাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রা.)-কে বলেন, "তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার জন্য কি উপকারী তা কি আমি তোমাকে বলে দেবো না?" তিনি জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, বলুন!" তখন তিনি বললেন, "তোমার কর্তব্য হলো [ধর্মীয় উপদেশ] শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবে না। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতার হুকুম করে তবে, তা কখনো মানবে না। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু বলে তবে তা কখনো স্বীকার করবে না। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে।"

হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামাতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তদীয় রাসূল ﷺ, মুসলমানদের খলীফা এবং সাধারণ মুসলমানদের মঙ্গল কামনার মধ্যে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, ইসলামের দৃঢ় রজ্জু হলো আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা, জাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের বাদশাহ তথা খলিফাদের আনুগত্য স্বীকার করা।

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ-এর এবং মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন, তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপকার্য করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐসব পাপকার্য হতে বিরত থাকবে, সে সমুদয় কল্যাণ অর্জনকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

অনুবাদ :

٥١. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَىْ بِالْقَوْلِ اللَّائِقِ بِهِمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط بِالْإِجَابَةِ وَأُولٰئِكَ حِيْنَئِذٍ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - النَّاجُوْنَ -

৫১. মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যে, যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয় অর্থাৎ এরূপ বলাই মুমিনদের উপযুক্ত শান যেন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম এ কথার কারণে তারাই তখন সফলকাম মুক্তিপ্রাপ্ত।

٥٢. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ يَخَافُهُ وَيَتَّقْهِ بِسُكُوْنِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا بِأَنْ يُطِيْعَهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ - بِالْجَنَّةِ -

৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি ভীত হয়ে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে। يَتَّقْهِ শব্দের ه বর্ণটি যেরযুক্ত বা সাকিনযুক্ত উভয়ভাবে পড়া যায় অর্থাৎ তার আনুগত্য করে তারাই কৃতকামী জান্নাত পেয়ে।

٥٣. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ غَايَتَهَا لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ بِالْجِهَادِ لَيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لَّهُمْ لَّا تُقْسِمُوْا ج طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ط لِلنَّبِيِّ خَيْرٌ مِّنْ قَسَمِكُمُ الَّذِىْ لَا تَصْدُقُوْنَ فِيْهِ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - مِنْ طَاعَتِكُمْ بِالْقَوْلِ وَمُخَالَفَتِكُمْ بِالْفِعْلِ -

৫৩. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে চূড়ান্ত পর্যায়ের আপনি তাদেরকে আদেশ করলে জিহাদের তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই, বলুন তাদেরকে তোমরা কসম খেয়ো না নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য নবীর জন্য, তোমাদের এ জাতীয় কসম খাওয়ার চেয়ে উত্তম। যাতে তোমরা সত্যবাদী নও। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত, তোমাদের কথার ক্ষেত্রে আনুগত্য আর কর্মের ক্ষেত্রে বিরোধিতা সম্পর্কে।

٥٤. قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ طَاعَتِهِ بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ خِطَابٌ لَهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ مِنَ التَّبْلِيْغِ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط مِنْ طَاعَتِهِ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - اَيِ التَّبْلِيْغُ الْبَيِّنُ -

৫৪. বলুন! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তার আনুগত্য হতে, এখানে تَوَلَّوْا শব্দের মধ্যে একটি تَا -কে হযফ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করে তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী প্রচারকার্যের এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী তার আনুগত্য করা থেকে তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তবে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম এখানে قَوْلَ -কে كَانَ -এর খবর হওয়ার ভিত্তিতে নসব দিয়েছেন। আর اَنْ يَقُوْلُوْا -কে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হিসেবে كَانَ -এর اِسْم বলেছেন। আর আলী, হাসান এবং ইবনে আবী ইসহাক قَوْلُ -কে كَانَ -এর ইসিম হিসেবে مَرْفُوْع পড়েছেন। আর اَنْ يَقُوْلُوْا -কে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হিসেবে كَانَ -এর খবর সাব্যস্ত করেছেন। তবে প্রথম কেরাতকে জমহুর ওলামা প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَنْ يَقُوْلُوْا : এটা جُمْلَه خَبَرِيَّة হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর দ্বারা শরিয়তের আদব শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। তাই এটা جُمْلَة اِنْشَائِيَّة -এর হুকুমে হয়েছে।

قَوْلُهُ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ الخ : এখানে جَهْدَ টি উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। তবে কেউ কেউ একে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب পড়েছেন অর্থাৎ مُجْتَهِدِيْنَ فِيْ اَيْمَانِهِمْ

قَوْلُهُ لَيَخْرُجُنَّ : এটা কসমের জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ طَاعَةٌ مَعْرُوْفَةٌ : এটা مُرَكَّب تَوْصِيْفِيْ হয়ে مُبْتَدَأ আর خَيْرٌ الخ হলো তার خَبَرْ মুসান্নিফ (র.) خَيْرٌ -কে উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অথবা طَاعَةٌ مَعْرُوْفَةٌ এটা উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হতে পারে। অর্থাৎ- طَاعَتُهُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوْفَةٌ

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ : এ বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের عِلَّتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا : فَاِنْ تَوَلَّوْا -এর মধ্যে আদিষ্টদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -এর মধ্যে যে সকল লোককে সম্বোধন করা হয়েছে তারা-ই تَوَلَّوْا -এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ الخ -এর মধ্যে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর فَاِنْ تَوَلَّوْا -এর মধ্যে অনুসারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ : এটা শর্তের জবাব হয়েছে। অন্য মতানুসারে جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। আর فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ঐ জবাবের ইল্লত হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ الخ : এটা পূর্ববর্তী বাক্যের تَاكِيْد হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ অর্থাৎ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম। উক্ত আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ওমর (রা.) একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ; হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে বলল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনো কারণ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই

আয়াত। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আয়াতটি কি? রুমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে **সাথে তার অভিনব তাফসীর**ও বর্ণনা করল যে, مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে وَرَسُوْلَهٗ রাসূলের সুন্নতের সাথে وَيَخْشَ اللّٰهَ **অতীত জীবনের** সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এ চারটি বিষয় পালন **করবে, তখন তাকে** أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ -এর সুসংবাদ দেওয়া হবে। فَائِزٌ তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে **মুক্তি ও জান্নাতে** স্থান পায়। হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া **যায়, তিনি বলেছেন** أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুদূর প্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলি দান করেছেন, **এগুলোর শব্দ** সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ الخ : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করতো এবং শপথ করে বলতো যে, তারা জিহাদে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; কিন্তু হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ি ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, মুখে অন্য কথা। সুতরাং তোমাদের শপথের হাকীকত আমার অজানা নয়। তোমাদের মুখ যতটা মুমিন, তোমাদের অন্তর ততটা কাফের। তোমাদের এ শপথগুলো শুধু মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করার জন্য। হে মুমিনগণ! এই মুনাফিকরা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। তারা যে শুধু তোমাদের সামনে কসম করছে তা নয়; বরং কাফেরদের সামনেও তারা তাদের পক্ষ অবলম্বনের ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতার কসম খেয়ে থাকে। কিন্তু তারা এতো ভীরু ও কাপুরুষ যে, তাদের সাথেও তারা থাকতে পারে না।

এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, "হে মুনাফিকরা! তোমাদের জ্ঞানসম্মত ও পছন্দনীয় আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল, এভাবে শপথ করা মোটেই শোভনীয় নয়, তোমাদের সামনে মুসলমানরা বিদ্যমান রয়েছে। তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তারা না শপথ করছে, না অতি কথা বলছে; বরং কাজের সময় তারা সবারই আগে বেরিয়ে পড়ছে। বেশি কথা না বলে কাজই তারা বেশি করছে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তোমাদের কোনো কাজই তাঁর কাছে গোপন নেই। প্রত্যেক অবাধ্য ও অনুগত তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রত্যেকের ভিতরের খবর তিনি তেমনই জানেন যেমন জানেন বাহিরের খবর। তোমরা বাহিরে যা কিছুই প্রকাশ কর না কেন, তিনি তোমাদের অন্তরের লুক্কায়িত খবরও পূর্ণমাত্রায় রাখেন।

قَوْلُهٗ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ : মহান আল্লাহ বলেন- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ অর্থাৎ হে নবী ﷺ! তুমি বলে দাও' তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ যে, তোমাদের এ অপরাধের শাস্তি নবী ﷺ -এর উপর পতিত হবে না। তার কাজ তো শুধু আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। তোমাদের উপর অর্জিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর কথা মেনে নেওয়া এবং এর উপর আমল করা ইত্যাদি। হেদায়েত শুধু রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা সরল-সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই। এ সরল-সোজা পথ ঐ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে, যাঁর রাজত্ব সমস্ত জমিন ও আসমানব্যাপী। রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। সবারই হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর। যেমন- তিনি বলেন- فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ অর্থাৎ "অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।" -[সূরা গাশিয়া : ২১-২২]

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে হযরত শাইয়া (আ.) নামক একজন নবীর নিকট এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করেন, "তুমি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখ দিয়ে যা বের করার বের করব।" আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশক্রমেই হযরত শাইয়া (আ.) দাঁড়িয়ে যান। তখন আল্লাহর হুকুমে তাঁর মুখ দিয়ে নিম্নলিখিত ভাষণ বের হয়-

"হে আকাশ! শুন, এবং হে জমিন! চুপ থাক। আল্লাহ তা'আলা একটা শান বা মাহাত্ম্য পূর্ণ করতে এবং একটা বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ইচ্ছা করেছেন। ওটা তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি চান যে, জঙ্গলকে বাসযোগ্য করবেন, জনহীন মরুপ্রান্তরকে করবেন জনবসতিপূর্ণ, বালুকাময় মরুভূমিকে করবেন শ্যামল-সবুজ, দরিদ্রদেরকে করবেন সম্পদশালী এবং রাখালদেরকে তিনি বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। তিনি অশিক্ষিতদের মধ্য হতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী করে পাঠাবেন, যিনি চরিত্রহীন হবেন না এবং কর্কশভাষীও হবেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল ও গোলমাল করবেন না।

তিনি এতো বিনয়ী ও নম্র হবেন যে, তাঁর বস্ত্রের আঁচলের বাতাসে ঐ প্রদীপ নির্বাপিত হবে না, যার পার্শ্ব দিয়ে তিনি গমন করবেন। তিনি যদি শুষ্ক বাঁশের উপর পা রেখেও চলেন, তবুও ঐ বাঁশের চড়চড়ি শব্দ কারো কানে পৌছে না। আমি তাঁকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠাবো। তাঁর মুখের ভাষা হবে মধুর ও পবিত্র। তাঁর আবির্ভাবের ফলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে এবং বধির ফিরে পাবে শ্রবণশক্তি। তাঁর বরকতে মোহরযুক্ত অন্তর খুলে যাবে। যাবতীয় কল্যাণকর কাজ দ্বারা আমি তাঁকে শোভনীয় করব। তাঁকে আমি সর্বদিক দিয়ে মধুর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করব। চিত্ত প্রশান্তি হবে তাঁর পোশাক। পুণ্য হবে তাঁর রীতিনীতি এবং তাঁর অন্তর হবে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কথা হবে জ্ঞানপূর্ণ এবং সত্যবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা পালন হবে তাঁর স্বভাব। তাঁর অভ্যাস ও প্রকৃতি হবে মার্জনা ও ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনা। হক ও সত্য হবে তার শরিয়ত এবং আদল ও ইনসাফ হবে তাঁর চরিত্র। হেদায়েত হবে তাঁর ইমাম এবং ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। তাঁর নাম হবে আহমদ ﷺ।

তাঁর কারণে আমি পথভ্রষ্টতার পরে হেদায়েত ছড়িয়ে দিব। অজ্ঞতার পরে জ্ঞান বিকশিত হবে। তার কারণে অবনতির পরে উন্নতি হবে। তাঁর মাধ্যমে অজানা জানার সাথে পরিবর্তিত হবে। স্বল্পতা আধিক্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাঁরই কারণে আমি দারিদ্র্যকে পরিবর্তিত করব ঐশ্বর্যে। যারা পরস্পর পৃথক পৃথক রয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরস্পর মিলিত করব। তাঁর মাধ্যমে আমি পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করব। তাদের পরস্পরের মতানৈক্যের পর তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে মতৈক্যে পৌঁছিয়ে দেব। তাঁর মাধ্যমে আমি পৃথক পৃথক হৃদয়কে এক হৃদয়ে পরিণত করব। অর্থাৎ তারা পরস্পর শত্রুতা ভুলে গিয়ে একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, মনে হবে যেন একই হৃদয়।

মহান আল্লাহর অসংখ্য বান্দা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাঁর উম্মতকে আমি সমস্ত উম্মতের উপর মর্যাদা দান করব, যারা জনগণের জন্য উপকারী হবে। তারা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে। তারা হবে একত্ববাদী খাঁটি মুমিন। আল্লাহ তা'আলার যত রাসূল তাঁর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন, এই শেষ নবী ﷺ তাঁদের সকলকেই স্বীকার করবেন; কাউকেও অস্বীকার করবেন না।

অনুবাদ :

٥٥. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ بَدْلًا عَنِ الْكُفَّارِ كَمَا اسْتَخْلَفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بَدْلًا عَنِ الْجَبَابِرَةِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَهُوَ الْاِسْلَامُ بِاَنْ يُظْهِرَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ وَيُوَسِّعَ لَهُمْ فِى الْبِلَادِ فَيَمْلِكُوْهَا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ اَمْنًا ط وَقَدْ اَنْجَزَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ لَهُمْ بِمَا ذَكَرَهٗ وَاَثْنٰى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهٖ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط هُوَ مُسْتَانِفٌ فِىْ حُكْمِ التَّعْلِيْلِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْاِنْعَامِ مِنْهُمْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ وَاَوَّلُ مَنْ كَفَرَ بِهٖ قَتَلَةُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَارُوْا يَقْتَتِلُوْنَ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا اِخْوَانًا ـ

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন কাফেরদের পরিবর্তে যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন এখানে اِسْتَخْلَفَ শব্দটি مَجْهُوْل এবং مَعْرُوْف উভয় কেরাতেই পাঠ করা যায় তাদের পূর্ববর্তীদেরকে বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে জালিমদের পরিবর্তে। তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন আর তা হলো ইসলাম ধর্ম, এভাবে যে, ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করে দিবেন এবং তাদের জন্য রাজত্বের মধ্যে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন তারা এর আধিকারী হয়ে যাবে। এবং অবশ্যই তিনি দান করবেন এখানে لَيُبَدِّلَنَّهُمْ শব্দটি تَخْفِيْف এবং تَشْدِيْد উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে কাফেরদের শান্তি ও নিরাপত্তা আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর উক্তি يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا দ্বারা তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর এ বাক্যটি مُسْتَانِفَة যা عِلَّتْ -এর হুকুমে এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তাদের প্রদত্ত এ পুরস্কারের পরেও তারাই অবাধ্য আর সর্বপ্রথম যারা এ পুরস্কারের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকারী, তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ল।

٥٦. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ اَىْ رَجَاءَ الرَّحْمَةِ ـ

৫৬. তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশা রেখে।

অনুবাদ :

৫৭. لَا تَحْسَبَنَّ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ الرَّسُوْلُ ـ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ لَنَا فِى الْاَرْضِ ج بِاَنْ يَفُوْتُوْنَ وَمَاْوٰيهُمُ مَرْجِعُهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِىَ ـ

৫৭. আপনি মনে করবেন না এখানে يَحْسَبَنَّ শব্দটি يَاء এবং تَاء যোগে পড়া যায় এবং এর فَاعِلْ হলো রাসূল ﷺ কাফেরদেরকে পরাক্রমশালী আমার জন্য পৃথিবীতে যে তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলবে তাদের ঠিকানা প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম আর কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল ফেরার জায়গা বা ঘাটি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ হলো اَعَدَ -এর প্রথম مَفْعُوْل আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلْاِسْتِخْلَافُ فِى الْاَرْضِ وَتَمْكِيْنُ دِيْنِهِمْ وَتَبْدِيْلُ خَوْفِهِمْ بِالْاَمْنِ এসব مَعْطُوْف মিলিত হয়ে وَاعَدَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হবে। لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ হলো উহ্য قَسَم -এর جَوَابْ , বাক্যটি এমন ছিল وَاللّٰهِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ এটা দ্বিতীয় مَفْعُوْل উহ্য থাকার উপর নির্দেশ করছে।

قَوْلُهُ كَمَا اسْتَخْلَفَ : এর মধ্যেকার مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ اِسْتِخْلَافًا كَاسْتِخْلَافِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ : এর সম্বন্ধ হলো وَعْدَهٗ -এর সাথে, আর مَا ذُكِرَ দ্বারা উল্লিখিত বিষয় তিনটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَعْبُدُوْنَنِىْ : এটা مُسْتَانِفَة বাক্য। ব্যাখ্যাকার (র.) هُوَ مُسْتَانِفٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর মধ্যে বিভিন্নরূপ তারকীব হতে পারে। তবে ব্যাখ্যাকার (র.) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বাক্যটি যেন একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন করা হয়েছে- مَا بَالُهُمْ يَسْتَخْلِفُوْنَ وَيُؤْمِنُوْنَ ; এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে يَعْبُدُوْنَنِىْ ; উল্লিখিত বাক্যটি উহ্য। مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ -ও হতে পারে। এ সময়ও বাক্যটি مُسْتَانِفَة থাকবে। বাক্যটি এমন হবে- هُمْ يَعْبُدُوْنَنِىْ

قَوْلُهُ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة হতে পারে। আবার يَعْبُدُوْنَنِىْ -এর فَاعِلْ -এর যমীর থেকে حَال -ও হতে পারে। অর্থাৎ- يَعْبُدُوْنَنِىْ مُوَحِّدِيْنَ

قَوْلُهُ مِنْهُمْ : এটা থেকে حَال আর هُمْ যমীরটি لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর প্রতি ফিরেছে।

قَوْلُهُ بِهٖ : এর যমীরটি اِنْعَامْ -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থাৎ اَلْاِنْعَامُ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ এবং কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ামতের অস্বীকার করা। ঈমানের বিপরীত কুফর উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ বলেছেন এবং اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ বলেননি।

قَوْلُهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ : এটা উহ্য বাক্যের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। বাক্যেরে বাচনভঙ্গি তার দাবি করছে। অর্থাৎ- فَاٰمِنُوْا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبَنَّ : এর فَاعِلْ হলো اَلرَّسُوْلُ আর اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا প্রথম মাফউল এবং مُعَاجِزِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। يَحْسَبَنَّ শব্দটি يَاء যোগে হলে প্রথম মাফউল বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْفُسَهُمْ আর مُعَاجِزِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا হবে لَا يَحْسَبَنَّ -এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ مُعَاجِزِيْنَ : অর্থাৎ গা বাঁচিয়ে বের হয়ে যাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে, বর্তমানে সে কাফের এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা যুদ্ধ করে তাদের সকলকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেবেন। ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং কুফর ও নাফরমানি ভূলুণ্ঠিত হবে, তখন তোমাদেরকে আর অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে দিন রাত অতিবাহিত করতে হবে না। তোমরা হবে সম্মানিত এবং তোমাদের শত্রুরা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন আর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৪২]

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ الخ : শানে নুযূল : ইমাম কুরতুবী (র.) হযরত আবুল আলিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাজিল হয়নি। মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মদিনায় হিজরত করেন। অতঃপর জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলমানরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। কোনো সময়ই বিপদশূন্য ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রা.) অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত থাকতেন। একজন সাহাবী একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের জীবনের একটা মুহূর্তও কি শান্তিতে কাটবে না? হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ক্ষণিকের জন্যও কি আমরা অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়ে তৃপ্তি ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করতে পারব না?" রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দেন, "আরো কিছুদিন ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর এমন শান্তি এবং নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, মানুষ ভরা মজলিসে আরামে ও নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, একজনের কাছে কেন, কারো কাছেই কোনো অস্ত্র থাকবে না।" ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। যথা-

১. আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে।

২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং

৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোনো ভয়ভীতি থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উম্মতে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইঞ্জীলে দিয়েছিলেন। -[বাহরে মুহীত]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যময় শাসনামলে মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়েমেন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিশর অভিমুখে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করেন। বসরা ও দামেশক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ মুসলমানদের করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গাম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিশর ও পারস্যের অধিকাংশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাঁর হাতে

কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর ওসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামি বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্র করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। -[ইবনে কাসীর]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এ খিলাফত হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ স্থলে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যামরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের এ কাজ অব্যাহত থাকবে- যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। অতঃপর তিনি একটি বাক্য আস্তে বলেন, যা আমার কর্ণগোচর হয়নি। আমি ওটা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ যে কথাটি আস্তে বলেছিলেন, তা হলো- এদের সবাই কুরাইশী হবেন। রাসূল ﷺ একথাটি দিনের সন্ধ্যায় বলেছিলেন। যেদিন হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রা.)-কে রজম করা হয়েছিল। সুতরাং জানা গেল যে, এই বারজন খলীফা অবশ্যই হবেন, কিন্তু এটা স্মর্তব্য যে, এই বারজন খলীফা তারা নন, যাদেরকে শিয়া সম্প্রদায় ধারণা করেছে। কেননা শিয়াদের ইমামদের মধ্যে এমন বহু ইমাম রয়েছে যারা সারা জীবনও খিলাফত ও সালতানাতের কোনো অংশও লাভ করেনি। এই বারজন খলীফা সবাই হবেন কুরাইশ বংশের। তারা হবেন ন্যায়ের সাথে ফয়সালাকারী। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও তাদের সুসংবাদ রয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরি। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হযরত মাহদী (আ.)। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর এটাও জরুরি নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল।

এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে- أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর দলই প্রবল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) যখন প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ?" উত্তরে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) বলেন, না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছে তওয়াফ কার্য সম্পন্ন করত ফিরে আসবে। সে না কাউকে ভয় করবে এবং না কারো আশ্রয়ে থাকবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগার

বিজিত হবে।" হযরত আদী (রা.) বিস্ময়ের স্বরে বলেন, "ইরানের বাদশাহ কিসরা বিন হরমুযের কোষাগার মুসলমানরা জয় করবেন!" উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেউ থাকবে না।" হযরত আদী (রা.) বলেন, "দেখুন, বাস্তবিকই স্ত্রীলোকেরা হীরা হতে কারো আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও আমার চোখের সামনে বাস্তবায়ন হয়েছে। কিসরার ধনভাণ্ডার জয়কারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই ভবিষ্যদ্বাণী।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই উম্মতকে ভূপৃষ্ঠে উন্নতি, উচ্চ মর্যাদা, দীনের প্রসার ও সাহায্যের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করবে তার জানা উচিত যে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই।"

قَوْلُهُ يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের [উটের গদীর] শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না [অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ-এর খুবই সংলগ্ন ছিলাম]। তখন তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সামনে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। আবার তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। পুনরায় তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি [এবার] বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে এতটুকুও শরিক করবে না।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে গেলেন এবং আবার বললেন, "হে মুআয! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচেয়ে ভালো জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে, সে আমার হুকুম অমান্য করলো এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় পাপ।

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যেই যুগে ইসলামের শক্তি বেশি থেকেছে, সেই যুগে তিনি সাহায্যও বেশি করেছেন। সাহাবীগণ ঈমানে অগ্রগামী ছিলেন, কাজেই তাঁরা বিজয় লাভের ব্যাপারেও সবারই অগ্রে থেকেছেন। যখন ঈমানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তখন পার্থিব অবস্থা, রাজত্ব এবং শান-শওকতও নীচে নেমে গেছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে এবং তারা থাকবে সদা জয়যুক্ত। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকবে।" আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এ দলটিই সর্বশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ পর্যন্ত এ লোকগুলো কাফেরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ এবং সবগুলোরই ভাবার্থ একই।

আলোচ্য আয়াত খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত সত্য ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ : এ আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; [যেমনটা রাফেযীদের ধারণা] তবে বলতে হবে যে, কুরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ কিছু নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও

লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এ প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সমপূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাম্ভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الخ : আল্লাহর বাণী– وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ আয়াতে كَفَرَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত অবস্থান। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুঝনো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনো যদি কোনো ব্যক্তি কুফরি করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালঙ্ঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই بَعْدَ ذٰلِكَ বলে একে জোরদার করা হয়েছে।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের এ বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এ মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। ইমাম বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এ ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই–

"যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাজতে মশগুল আছে। যদি তোমরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাজির হবে। সাবধান! আল্লাহর তরবারি এখনো পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম! যদি এ তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো আর কোষে ফিরে যাবে না। কেননা যখন কোনো নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোনো খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।" –[মাযহারী]

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে রক্ত প্রবাহের যে হোলিখেলা শুরু হলো তা আজও বিরামহীনভাবে বেড়েই চলছে।

قَوْلُهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, তারই জন্য তোমরা নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং তাঁর সাথে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র ও মিসকিনদের খবরা-খবর নিতে থাক। সম্পদের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ জাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন, তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ! আল্লাহর রহমত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ ওরাই তারা যাদের উপর আল্লাহ সত্বরই করুণা বর্ষণ করবেন।

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী ﷺ! আপনি ধারণা করবেন না যে, আপনাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়যুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি তাদের প্রকৃত অবস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি , যা বসবাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

৫৮. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالْاِمَاءِ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ مِنَ الْاَحْرَارِ وَعَرَفُوْا اَمْرَ النِّسَاءِ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ فِىْ ثَلٰثَةِ اَوْقَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ اَىْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ط ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ بَعْدَهُ مُضَافٌ وَقَامَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ اَىْ هِىَ اَوْقَاتٌ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ اَوْقَاتٍ مَنْصُوْبًا بَدَلًا مِنْ مَحَلِّ مَا قَبْلَهُ قَامَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ وَهِىَ لِاِلْقَاءِ الثِّيَابِ فِيْهَا تَبْدُوْ فِيْهَا الْعَوْرَاتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ اَىِ الْمَمَالِيْكِ وَالصِّبْيَانِ جُنَاحٌ فِى الدُّخُوْلِ عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانٍ بَعْدَهُنَّ اَىْ بَعْدَ الْاَوْقَاتِ الثَّلٰثَةِ هُمْ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلٰى بَعْضٍ ط وَالْجُمْلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط اَىِ الْاَحْكَامَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِاُمُوْرِ خَلْقِهِ حَكِيْمٌ ـ بِمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ وَاٰيَةُ الْاِسْتِئْذَانِ قِيْلَ مَنْسُوْخَةٌ وَقِيْلَ لَا وَلٰكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِىْ تَرْكِ الْاِسْتِئْذَانِ ـ

অনুবাদ :

৫৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা যেন তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে অর্থাৎ গোলাম ও দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা স্বাধীনদের মধ্য হতে, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে অবগত হয়েছে তিন সময়ে অর্থাৎ তিন সময়ের মধ্যে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়; "ثَلٰثُ" শব্দটি পেশবিশিষ্ট। কেননা তা উহ্য মুবতাদার খবর, আর মুবতাদার পরে মুযাফ উহ্য রয়েছে এবং মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তখন ইবারত এভাবে হবে– هِىَ اَوْقَاتُ ثَلٰثِ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ। অথবা "ثَلٰثَ" শব্দটি যবরবিশিষ্ট, আর اَوْقَاتٌ শব্দটি উহ্য রয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ -এর মহল থেকে বদল হিসেবে যবরবিশিষ্ট হয়েছে, মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। তখন ইবারত এভাবে হবে–تِلْكَ الْاَوْقَاتُ الثَّلٰثَةُ لِاِلْقَاءِ الثِّيَابِ فِيْهَا مِنَ الْجَسَدِ। অর্থাৎ এ তিন সময় এমন যে, তাতে কাপড় খোলার কারণে লজ্জাস্থান খুলে যায়। তোমাদের ও তাদের জন্য নেই অর্থাৎ ক্রীতদাস ও বালকদের জন্য কোনো দোষ অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রবেশ করার মধ্যে এ সময়ের পর অর্থাৎ এ তিন সময়ের পর। তারা তোমাদের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয় খেদমতের জন্য একে অপরের এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ হয়েছে। এমনিভাবে যেরূপ পূর্ববর্তী নির্দেশাবলি বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন অর্থাৎ নির্দেশাবলি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ স্বীয় মাখলূকের অবস্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় যা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে। অনুমতি প্রার্থনার আয়াতের ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো– তা রহিত হয়ে গেছে। আর কারো কারো অভিমত হলো, তা রহিত হয়নি, তবে মানুষ অনুমতি প্রার্থনা বর্জনের ব্যাপারে অলসতা অবলম্বন করেছে।

অনুবাদ :

৫৯. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْأَحْرَارُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَيِ الْأَحْرَارُ الْكِبَارُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

৫৯. তোমাদের সন্তানসন্ততিরা যখন হয় হে স্বাধীন ব্যক্তিরা! বয়ঃপ্রাপ্ত, তারাও যেন অনুমতি চায় সব সময় তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা স্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬০. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ الّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا لِذٰلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ مِنَ الْجِلْبَابِ وَالرِّدَاءِ وَالْقِنَاعِ فَوْقَ الْخِمَارِ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ مُظْهِرَاتٍ بِزِيْنَةٍ ط خَفِيَّةٍ كَقَلَادَةٍ وَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ بِأَنْ لَا يَضَعْنَهَا خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيعٌ لِقَوْلِكُمْ عَلِيمٌ ـ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ ـ

৬০. আর বৃদ্ধা নারী যারা বার্ধক্যের কারণে হায়েজ ও সন্তানসন্ততি হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যারা বিবাহের আশা রাখে না, ঐ বার্ধক্যের কারণে যদি তারা তাদের বস্ত্র খুলে রাখে; এতে তাদের জন্য দোষ নেই যেমন– বোরকা, চাদর এবং এমন ওড়না যা ঘোমটার উপর হয় তাদের [সৌন্দর্য] প্রকাশ না করে জাহির না করে লুক্কায়িত সৌন্দর্য । যেমন– গলার হার, চুড়ি ও পায়ের মল [গহনা] তবে এ থেকে বিরত থাকাই অর্থাৎ তারা তাদের বস্ত্র খুলে না রাখাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা তোমাদের কথা সর্বজ্ঞ যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে সে সম্পর্কে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثَلٰثُ مَرَّاتٍ : "ثَلٰثَ" শব্দটি নসববিশিষ্ট হওয়ার দুটি কারণ–

১. এটি لِيَسْتَاْذِنْكُمْ -এর মাফউলে ফীহ অর্থাৎ– لِيَسْتَاْذِنُوْا فِىْ ثَلٰثَةِ اَوْقَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ; তাফসীরকার (র.) فِىْ ثَلٰثِ اَوْقَاتٍ বাক্যটি বর্ধিত করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ثَلٰثَ مَرَّاتٍ টি যরফ আর مَرَّاتٌ অর্থ– اَوْقَاتٌ অর্থাৎ ثَلٰثَ اَوْقَاتٍ لِيَسْتَاْذِنْكُمْ ثَلٰثَةَ اَوْقَاتٍ অতঃপর مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ হতে مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ পর্যন্ত অংশটুকু হলো اَوْقَاتٍ -এর তাফসীর।

২. "ثَلٰثَ" শব্দটি নসববিশিষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, তা لِيَسْتَاْذِنْكُمْ -এর মাফউলে মুতলাক অর্থাৎ اِسْتَاْذِنُوْا ثَلٰثَ اِسْتِئْذَانَاتٍ

قَوْلُهُ ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ : "ثَلٰثُ" শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে রফা'বিশিষ্ট হয়েছে। উহ্য মুবতাদার পরে اَوْقَاتٌ মুযাফ উহ্য রয়েছে; মুযাফকে বিলোপ করে মুযাফ ইলাইহি অর্থাৎ عَوْرَاتٍ -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ সুরতে اَلْعِشَاءُ শব্দের উপর ওয়াকফ হবে, অর্থাৎ هِيَ ثَلٰثَةُ اَوْقَاتٍ كَائِنَةٌ لَّكُمْ ; উল্লিখিত اَوْقَاتٌ -কে عَوْرَاتٍ বলা হয়েছে, অথচ উল্লিখিত তিন اَوْقَاتٌ তথা সময় عَوْرَاتٌ নয়। কিন্তু যেহেতু উল্লিখিত তিন সময় عَدَمِ تَسَتُّرْ তথা كَشْفُ عَوْرَاتٍ [সতর খোলা] -এর সময়, তাই مَظْرُوْفْ বলে ظَرْفْ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাকে تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يَقَعُ فِيْهِ বলা হয়।

আর "ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ" নসববিশিষ্ট হওয়ার সুরতে ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ তার পূর্ববর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ -এর মহল **হতে বদল** হয়েছে, আর মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু উল্লিখিত সময়ত্রয়ে অতিরিক্ত বস্ত্র খোলার কারণে **লুক্কায়িত** অংশ প্রকাশ পায়, এজন্য উল্লিখিত সময়ত্রয়কে عَوْرَاتٌ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ هِيَ : এটা হলো مُبْتَدَأ আর تَبْدُوْ فِيْهَا الْعَوْرَاتُ হলো خَبَرٌ আর لِإِلْقَاءِ الثِّيَابِ الخ : এ অংশটি تَبْدُوْ -এর **অগ্রগামী** ইল্লত, أَوْقَاتٌ -কে عَوْرَاتٌ নাম রাখার ইল্লতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ : এ বাক্যটি পূর্বের বাক্য طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ -এর তাকিদ।

قَوْلُهُ مُتَبَرِّجٰتٍ : এ ব্যাখ্যা مُظْهِرَاتٌ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بِزِيْنَةٍ -এর মধ্যকার بَا অব্যয়টি تَعْدِيَة -এর **জন্য**। কেউ কেউ বলেছেন, এটা لَامْ অর্থে। অর্থাৎ مُظْهِرَاتٍ لِزِيْنَةٍ ; جِلْبَابٍ অর্থ– চাদর, বোরকা ইত্যাদি যার দ্বারা সম্পূর্ণ **দেহ** আবৃত থাকে। এর বহুবচন হলো جَلَابِيْب

قَوْلُهُ مِنْ بُيُوْت مَنْ ذُكِرَ : এর সম্বন্ধ হলো قِنَاع -এর সাথে। এর অর্থ হলো ওড়না ইত্যাদি দোপাল্লা কাপড়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الخ : **শানে নুযূল** : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে **কয়েকটি** ঘটনা বর্ণিত আছে–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মাদলাজ ইবনে ওমর নামীয় এক আনসারী ছেলেকে দ্বিপ্রহরের সময় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পাঠালেন– যাতে সে হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে আনে। ছেলেটি হযরত ওমর (রা.)-এর গৃহে আচমকা প্রবেশ করল এবং হযরত ওমর (রা.)-কে এমন অবস্থায় দেখল যা তিনি পছন্দ করতেন না। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে মুরসিদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু খাদ্য তৈরি করেন। এমন সময় লোকেরা বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তখন হযরত আসমা (রা.) বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটাতো খুবই জঘন্য প্রথা যে, স্বামী স্ত্রী একই কাপড়ে রয়েছে এমতাবস্থায় তাদের গোলাম ঘরে প্রবেশ করে।" ঐ সময় يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الخ : আলোচ্য আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পরপুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্যে। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হলো–

১. প্রথম হলো ফজরের নামাজের পূর্বে। কেননা এটা হলো ঘুমানোর সময়।
২. দ্বিতীয় হলো দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণত কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে থাকে।
৩. তৃতীয় হলো ইশার নামাজের পর। কেননা ওটাই হচ্ছে শিশুদেরকে নিয়ে শয়নের সময়।

সুতরাং এ তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। তবে এ তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ঘরে যাতায়াত জরুরি। তারা বারবার আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ির লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। এজন্যেই নবী করীম ﷺ বলেছেন "বিড়াল অপবিত্র নয়। ওটা তো তোমাদের বাড়িতে তোমাদের আশে-পাশে সদা ঘোরাফেরা করেই থাকে।" –[এ হাদীসটি ইমাম মালেক (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন।] হুকুম তো এটাই, কিন্তু এর উপর আমল খুব কমই হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "তিনটি আয়াতের উপর আমল মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো এ আয়াত। দ্বিতীয়টি হলো সূরা নিসার وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى الخ এ আয়াতটি এবং তৃতীয়টি হলো সূরা হুজুরাতের

إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ الخ এ আয়াতটি। শয়তান লোকদের উপর ছেয়ে গেছে এবং সে তাদেরকে এ আয়াতগুলোর উপর আমল করা হতে উদাসীন রেখেছে, যেন তাদের এ আয়াতগুলোর উপর ঈমান নেই। আমি তো আমার দাসটিকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন এ তিন সময়ে বিনা অনুমতিতে কখনো না আসে।" প্রথম আয়াতটিতে দাসদাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে ওয়ারিশদের মধ্যে মাল বণ্টনের সময় আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন এসে গেলে তাদেরকেও কিছু দেওয়া ও তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার হুকুম করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে বংশ ও আভিজাত্যের উপর গর্ব না করা; বরং আল্লাহভীরু লোককেই সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্য মনে করার বর্ণনা রয়েছে।

হযরত মূসা ইবনে আবী আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞেস করেন- لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ এ আয়াতটি কি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বলেন, "না, রহিত হয়নি।" তখন পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, "কিন্তু জনগণ তো এর প্রতি আমল ছেড়ে দিয়েছে?" জবাবে তিনি বলেন, "এ আয়াতের প্রতি আমল করার জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।"

হযরত ইবনে আবী হাতিম (র.) কর্তৃক হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, দু জন লোক কুরআন কারীমে বর্ণিত তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, "এ আয়াতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার একটি বড় কারণ হলো লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও প্রশস্ততা। পূর্বে জনগণের আর্থিক অবস্থা এমন ভালো ছিল না যে, তারা ঘরের দরজার উপর পর্দা লটকাবে বা কয়েকটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বড় ঘর নির্মাণ করবে; বরং তাদের একটি মাত্র ঘর থাকত এবং অনেক সময় দাসদাসীরা তাদের অজ্ঞাতে ঘরে প্রবেশ করত। ঐ সময় স্বামী স্ত্রী হয়তো ঘরে একত্রে থাকত, ফলে তারা খুবই লজ্জিত হতো এবং বাড়ির লোকেরাও এতে কঠিনভাবে অস্বস্তিবোধ করত। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করলেন এবং তারা পৃথক পৃথক কক্ষ বানিয়ে নিল ও দরজার উপর পর্দা লটকিয়ে দিল তখন তারা রক্ষিত হয়ে গেল। আর এর ফলে যে যৌক্তিকতায় অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেল। তাই জনগণ এ হুকুমের অনুসরণ ছেড়ে দিল এবং তারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করল।"

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, এ তিনটি এমন সময়, যখন মানুষ কিছুটা অবসর পায় এবং বাড়িতেই অবস্থান করে। আল্লাহ জানেন তারা তখন কি অবস্থায় থাকে। এজন্যেই দাসদাসীদেরও অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা সাধারণত ঐ সময়েই মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, যেন গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে বের হতে পারে এবং নামাজে শরিক হতে পারে। -[ইবনে কাসীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তো শরিয়তের কোনো আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এ আদেশ দেওয়া তো নীতিবিরুদ্ধ।

উত্তর : এর জবাব হলো, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই- এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভিতরে এসো না; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাজের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের মূল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোনো جُنَاحٌ নেই। جُنَاحٌ শব্দটি সাধারণত গুনাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لَا جُنَاحَ -এর অর্থ তা-ই; অর্থাৎ কোনো অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গুনাহগার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ : মহান আল্লাহ বলেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ অর্থাৎ 'এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোনো দোষ নেই।' কেননা সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না।

আলোচ্য আয়াত- اَلَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী মনিবকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

এ বিশেষ অনুমিত গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব- না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিধান এখনো কার্যকর আছে- না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে, আয়াতটি মুহকাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব। -[কুরতুবী] কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এ তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামশোও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমিত গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওজর বর্ণনা করেছেন। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম বিধান : ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ব্যতিক্রম দর্শকের দিকে দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে মাহরাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিকে দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক তথা বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারো কারো মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামের কাছে, যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে- اَلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الخ ; এর তাফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে খোলা যায়, যে মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যদি সে সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে- وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ, সে যদি মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

قَوْلُهُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الخ : আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হচ্ছে- বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, অর্থাৎ যারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনোই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্যে এটা অপরাধ নয়, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মতো তাদের পর্দার দরকার নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটি وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الخ এ আয়াতটি হতে স্বতন্ত্র।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরকা এবং চাদর নামিয়ে দিয়ে শুধু দোপাট্টা এবং জামা ও পায়জামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। তাঁর কেরাতও اَنْ يَّضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ এরূপই বটে। এর দ্বারা দোপাট্টার উপরের চাদরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুড়ি স্ত্রীলোকেরা যখন মোটা, চওড়া দোপাট্টা পরে থাকবে, তখন তার উপরে অন্য চাদর রাখা জরুরি নয়। কিন্তু এর দ্বারাও যেন সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়।

স্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জা অবশ্যই বৈধ; কিন্তু এটা যেন অপর পুরুষদের চক্ষু ঠাণ্ডা করার জন্য না হয়।"

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর স্ত্রী খুবই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁর গোলামের দ্বারা তাঁর মাথায় মেহেদি লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার পুরুষদের প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই।"

পরিশেষে মহান আল্লাহ বলেন, [চাদর না নেওয়া তো এরূপ বুড়ি স্ত্রীলোকদের জন্য জায়েজ বটে, কিন্তু] এটা হতে তাদের বিরত থাকাই [অর্থাৎ বোরকা ও চাদর ব্যবহার করাই] তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। -[ইবনে কাসীর]

٦١. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ فِىْ مُؤَاكَلَتِهِ مُقَابِلِيْهِمْ وَلَا حَرَجٌ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اى بيوت اولادكم اَوْ بُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَىْ خَزَنْتُمُوْهُ لِغَيْرِكُمْ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ط وَهُوَ مَنْ صَدَّقَكُمْ فِىْ مَوَدَّتِهِ الْمَعْنٰى يَجُوْزُ الْاَكْلُ مِنْ بُيُوْتِ مَنْ ذُكِرَ وَاِنْ لَمْ يَحْضُرُوْا اَىْ اِذَا عَلِمَ رِضَاهُمْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ اَوْ اَشْتَاتًا مُتَفَرِّقِيْنَ جَمْعُ شَتٍّ نَزَلَ فِيْمَنْ تَحْرَجُ اَنْ يَاْكُلَ وَحْدَهٗ وَاِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَاكِلُهٗ يَتْرُكُ الْاَكْلَ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا لَكُمْ لَا اَهْلَ فِيْهَا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَىْ قُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَرُدُّ عَلَيْكُمْ وَاِنْ كَانَ بِهَا اَهْلٌ فَسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مَصْدَرُ حَيًّا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ط يُثَابُ عَلَيْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ اَىْ يُفَصِّلُ لَكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ لِكَىْ تَفْهَمُوْا ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ :

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই নিজেদের বিপরীত তথা ওজরবিহীনদের সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অর্থাৎ ঐ গৃহে যা তোমরা অপরের জন্য সংরক্ষণ করেছ অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে আর বন্ধু হলো, যে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আন্তরিক হয়। আয়াতের অর্থ হলো উল্লিখিতদের গৃহে তাদের অবর্তমানে [তাদের সম্পদ হতে] খাওয়া জায়েজ আছে। অর্থাৎ যখন খাওয়ার ব্যাপারে তাদের সন্তুষ্টি জানা যায়। তোমরা একত্রে আহার কর, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই সমবেত হয়ে অথবা পৃথকভাবে আহার কর অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে; اَشْتَاتًا শব্দটি شَتٌّ -এর বহুবচন। এ আয়াত ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে একাকী খেতে অসুবিধা মনে করত, আর যদি সঙ্গে খাওয়ার কাউকে না পেত, তাহলে খাবারই খেত না। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তোমাদের এমন গৃহে যাতে কেউ নেই, তখন তোমাদের নিজেদের প্রতি সালাম বলবে। অর্থাৎ বল اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ [আমাদের উপর এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।] কেননা ফেরেশতারা তোমাদেরকে তার উত্তর দিবেন। আর যদি তাতে [গৃহের] বাসিন্দা থাকে, তাহলে তাদেরকে সালাম বলবে অভিবাদন স্বরূপ। এটা কল্যাণময় "تَحِيَّةً" শব্দটি حَيَّ -এর মাসদার আল্লাহর কাছ থেকে ও পবিত্র দোয়া এর উপর প্রতিদান দেওয়া হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তোমাদের দীনের নির্দেশাবলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও যাতে তোমরা এ নির্দেশাবলি বুঝ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِيْ مُوَاكَلَةِ مُقَابِلِيْهِمْ : مُوَاكَلَة শব্দটি মাসদার, এটা مَفْعُوْل -এর প্রতি مُضَاف হয়েছে। অর্থাৎ فِيْ اَكْلِهِمْ مَعَ مُقَابِلِيْهِمْ অর্থাৎ উপরিউক্ত তিনো প্রকার ক্রটি থেকে যারা মুক্ত তাদের সাথে আহার করায়।

قَوْلُهُ وَلَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة

قَوْلُهُ صَدِيْقِكُمْ : صَدِيْق অর্থ– বন্ধু। এটা একবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

قَوْلُهُ مِنْ بُيُوْتِ مَنْ ذُكِرَ : পূর্বে ১১টি ঘরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর সংখ্যা ওরফ ও স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيْ اِذَا عَلِمَ رِضَاءَ هُمْ بِهٖ : এ সন্তুষ্টি স্পষ্ট আকারে হোক কিংবা এমন কোনো আলামত সাপেক্ষে হোক যা সন্তুষ্টি বুঝায়। আর উপরিউক্ত অনুমতি সাধারণ পানাহারের বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন– রুটি, তরকারি প্রভৃতি। এ অনুমতি এমন বস্তুর ক্ষেত্রে নয় যা বিশেষভাবে ব্যক্তি বিশেষ -এর জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং এ অনুমতি কেবল নিজের পানাহারের ক্ষেত্রে সীমিত, সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। একইভাবে যে সকল বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয়, সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনধিকার চর্চা করা বা হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট অনুমতি লাভ না হবে।

قَوْلُهُ تَحِيَّةً : এটা উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ অর্থাৎ فَحَيُّوا تَحِيَّةً এটা فَسَلِّمُوْا -এর مَعْمُوْل -ও হতে পারে। কেননা سَلِّمُوْا এবং تَحِيَّة -এর অর্থ কাছাকাছি। এক্ষেত্রে তা قَعَدْتُ جُلُوْسًا -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : এর সম্বন্ধ হলো تَحِيَّةً -এর উহ্য صِفَتْ -এর সাথে। তখন বাক্য হবে– تَحِيَّةً صَادِرَةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ আবার স্বয়ং تَحِيَّة -এর সাথেও সম্বন্ধ হতে পারে।

قَوْلُهُ يُثَابُ عَلَيْهَا : এটা مُبَارَكَةً -এর ব্যাখ্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ الخ : **শানে নুযূল** : মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাবলির সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলি নিম্নরূপ–

১. ইমাম বগভী (র.) প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের ও যাহহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ণ ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারো সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চেয়ে যেন বেশি না খায় এবং সবাই যেন সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মতো বসতে পারি না, দুজনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এ চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

২. ইমাম বগভী (র.) ইবনে জারীরের সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরিউক্ত ঘটনার বিপরীত। তা এই যে, কুরআন মাজীদে لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ –[অর্থাৎ তোমরা একে

অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।] আয়াতটি নাজিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণ ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ণ ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব, সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। অথচ, যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলি কমবেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

৩. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলেন, মুসলমানগণ জিহাদের যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে বায্যারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত।

ইমাম বাগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের صَدِيْقِكُمْ [অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই] শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোনো এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। –[মাযহারী]

বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ الخ : এ আয়াতে যে দোষ না হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত আতা (রা.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেন যে, এর দ্বারা অন্ধ ও খোঁড়াদের জিহাদে যোগদান না করা বুঝানো হয়েছে। যেমনটা 'সূরা ফাতহ'-এ রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের লোক যদি জিহাদে গমন না করে, তবে তাদের শরিয়তসম্মত ওজর থাকার কারণে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। সূরা বারাআতে রয়েছে, "যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা আর্থিক সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোনো অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো হেতু নেই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোনো অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্যে কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" অতএব, এ আয়াতে তাদের জন্যে অনুমতি রইল যে, তাদের কোনো অপরাধ নেই।

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, মানুষ যখন তার ভ্রাতা, ভগ্নি প্রমুখের বাড়ি যেত এবং স্ত্রীলোকেরা কোনো খাদ্য তার সামনে হাজির করত, তখন সে তা খেত না এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ির মালিক তো নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী– "তোমাদের নিজেদের জন্যেও কোনো দোষ নেই," এটা তো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলোর সংযোগ স্থাপনের জন্যে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এ হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ির হুকুমও এটাই, যদিও শব্দে এর বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এ আয়াত দ্বারাই দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, পুত্রের মাল পিতার মালেরই স্থলবর্তী।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার [-ই মালিকানাধীন]।" আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একের খাওয়া পরা অপরের উপর ওয়াজিব। যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ : আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ অর্থাৎ 'যার চাবি তোমাদের মালিকানায় রয়েছে' এ উক্তি দ্বারা গোলাম ও প্রহরীকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের মনিবের মাল হতে প্রয়োজন হিসেবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খেতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জিহাদে গমন করতেন তখন প্রত্যেকেরই মনের বাসনা এটা হতো যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যদি যেতে পারত! জিহাদে যাওয়ার সময় তারা নিজেদের বিশিষ্ট বন্ধুদেরকে চাবি দিয়ে যেত এবং তাদেরকে বলে যেত, "প্রয়োজনবোধে তোমরা আমাদের মাল থেকে খেতে পারবে। আমরা তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম।" কিন্তু এরপরেও এরা নিজেদেরকে আমানতদার মনে করে এবং এই মনে করে যে, তারা হয়তো খোলা মনে অনুমতি দেয়নি। পানাহারের কোনো জিনিসকে তারা স্পর্শই করত না। তখন এ হুকুম নাজিল হয়।

قَوْلُهُ اَوْ صَدِيْقِكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুদের গৃহেও খেতে পার, যখন তোমরা জানবে যে, তারা এটা খারাপ মনে করবে না এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবে না। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "যখন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে যাবে তখন তার অনুমতি ছাড়াই তুমি তার খাদ্য হতে খেতে পারবে।"

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا الخ : **শানে নুযূল** : আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সম্পদশালী লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গেলে তারা আহার্য বস্তু সম্পদশালী লোকদের নিকট রাখতো। তখন সম্পদশালী লোকেরা বলত, আল্লাহর শপথ! আমরা পানাহারে তোমাদের সাথে শরিক হয়ে গুনাহ করব না। কেননা আমরা সম্পদশালী, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বনী ইলিয়াছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। এ গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করত না। যদি কোনো মেহমান পাওয়া যেত তখন আহার করত। এমনও হতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মেহমান পেত না- এজন্য খাবার গ্রহণ করত না। এমনকি তার উষ্ট্রির দুগ্ধ পরিপূর্ণ থাকত, কিন্তু কোনো মেহমান তার সঙ্গে পান করার জন্য না পেলে সে দুগ্ধ দোহন করত না। যখন কোনো মেহমান পেত, তখনই কেবল দোহন করে পান করত। অন্যথায় সন্ধ্যা নাগাদ ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকত। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে নূরুল কুরআন : খ. ১৮, পৃ. ৩১০]

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا الخ : উক্ত আয়াতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যখন يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" -এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন, "পানাহারের জিনিসগুলোও তো মাল, সুতরাং এটাও আমাদের জন্যে হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের সাথে আহার করি।" কাজেই তাঁরা ওটা থেকেও বিরত হন। ঐ সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তাঁরা খারাপ মনে করতেন। কেউ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা খেতেন না। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা এ হুকুমের মধ্যে দুটোরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতেও এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। বনূ কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কাউকেও না পাওয়া পর্যন্ত খেত না। সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতার যুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশি বরকতও রয়েছে।

হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না [এর কারণ কি?]।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, "সম্ভবত তুমি পৃথকভাবে একাকী খেয়ে থাক। তোমরা খাদ্যের উপর একত্র হও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর, তোমাদের খাদ্যে বরকত দেওয়া হবে।" -[মুসনাদে আহমদ।]

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সবাই একত্রে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না। কেননা বরকত জামাতের উপর রয়েছে।" -[ইবনে মাজাহ]

قَوْلُهُ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার শেখানো বরকতময় উত্তম সালাম বলবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে।"

হযরত ইবনে তাউস (র.) বলেন, "তোমাদের যে কেউ বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে যেন বাড়ির লোকদেরকে সালাম দেয়।"

হযরত আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "এটা কি ওয়াজিব?" উত্তরে তিনি বলেন, "কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আমি এটা খুবই পছন্দ করি যে, যখনই তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তো এটা কখনো ছাড়িনি। তবে কোনো সময় ভুলে গিয়ে থাকি, সেটা অন্য কথা।"

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, "যখন মসজিদে যাবে তখন বলবে- اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন নিজের ছেলেমেয়েদেরকে সালাম দিবে এবং যখন এমন কোনো বাড়িতে যাবে যেখানে কেউই নেই, তখন বলবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ 'আমাদের উপর ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এ সময়ে তোমাদের সালামের জবাব আল্লাহর ফেরেশতারা দিয়ে থাকেন।"

হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে আনাস (রা.)! তুমি পূর্ণভাবে অজু কর, তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। আমার উম্মতের যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকেই সালাম দেবে, এর ফলে তোমার পুণ্য বেড়ে যাবে। যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার পরিবারের লোককে সালাম দেবে, তাহলে তোমার বাড়ির কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। চাশতের নামাজ পড়তে থাকবে, তোমাদের পূর্ববর্তী দীনদার লোকদের এ নীতিই ছিল। হে আনাস (রা.)! ছোটদেরকে স্নেহ করবে এবং বড়দেরকে সম্মান করবে, তাহলে কিয়ামতের দিন তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"- [এ হাদীসটি হাফিয আবু বকর আল-বায্যার (র.) বর্ণনা করেছেন।]

মহান আল্লাহ বলেন, এটা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ ও পবিত্র। অর্থাৎ এটা হলো দু'আয়ে খায়ের যা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা কল্যাণময় ও পবিত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি তাশাহ্হুদ তো আল্লাহর কিতাব হতেই গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি- فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

অর্থাৎ "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" সুতরাং নামাজের তাশাহ্হুদ হলো-

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ .

অর্থাৎ "কল্যাণময় অভিবাদন ও পবিত্র সালাত আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। [হে নবী ﷺ!] আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর নামাজি ব্যক্তি নিজের জন্যে দোয়া করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।"-[এটা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা কচ্ছেন।] আবার সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই মারফূ' রূপে যা বর্ণিত আছে, তা এর বিপরীত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অনুবাদ :

٦٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ اَيِ الرَّسُوْلِ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَذْهَبُوْا لِعُرُوْضِ عُذْرٍ لَهُمْ حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ امرهم فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ بِالْاِنْصِرَافِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর সাথে মিলিত হলে অর্থাৎ রাসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে যেমন- জুমার খুতবা চলে যায় না অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া অবস্থায়ও তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের অনুমতি চাইলে তাদের কোনো বিষয়ের আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন প্রস্থানের এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

٦٣. لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ بَلْ قُوْلُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ لِيْنٍ وَتَوَاضُعٍ وَخَفْضِ صَوْتٍ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا اَيْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِئْذَانٍ خُفْيَةً مُسْتَتِرِيْنَ بِشَيْءٍ وَقَدْ لِلتَّحْقِيْقِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَيِ اللّٰهِ اَوْ رَسُوْلِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ بَلَاۤءٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الْاٰخِرَةِ .

৬৩. রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না এভাবে যে, বল 'হে মুহাম্মদ!' বরং বিনয়, নম্রতা ও নিম্নস্বরে 'হে আল্লাহর নবী', 'হে আল্লাহর রাসূল' বল। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে চুপিসারে সরে পড়ে। অর্থাৎ মসজিদ হতে খুতবা চলাকালীন অবস্থায় অনুমতি ছাড়া চুপিসারে কোনো বস্তুর আড়াল নিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে قَدْ শব্দটি তাহকীক [নিশ্চিতকরণ]-এর জন্য হয়েছে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের তাদেরকে স্পর্শ করবে বিপর্যয় অর্থাৎ বিপদ অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে পরকালে।

٦٤. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُكَلَّفُوْنَ عَلَيْهِ ط مِنَ الْاِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ وَ يَعْلَمُ يَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ اَيْ مَتٰى يَكُوْنُ فَيُنَبِّئُهُمْ فِيْهِ بِمَا عَمِلُوْا ط مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهَا عَلِيْمٌ .

৬৪. মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই মালিক হওয়া হিসেবে, সৃষ্টি করা হিসেবে ও দাস হওয়া হিসেবে। তোমরা হে দায়িত্বপ্রাপ্তরা! যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন অর্থাৎ ঈমান ও নেফাক অবস্থায়। আর তিনি জানেন যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এখানে خِطَابٌ হতে غَيْبَةٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ জানেন তিনি যে, প্রত্যাবর্তনের দিন কখন হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দিবেন তারা যা করেছে ভালো ও মন্দ। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় তাদের আমল ইত্যাদি জানেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ : এটা مُبْتَدَأ আর اَلَّذِيْنَ - مَوْصُوْل , اٰمَنُوْا الخ - মা'তুফ আলাইহি এবং وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ মা'তুফ মিলে صِلَة , صِلَة مَوْصُوْل মিলে خَبَرْ الخ

قَوْلُهُ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ : এর মধ্যে إِسْنَاد مَجَازِىْ ঘটেছে। কেননা اَمْر হলো سَبَب جَمْع আর جَمْع হলো مُسَبَّبْ এখানে যেন সববের প্রতি মুসাব্বাবের সম্বন্ধ ঘটেছে।

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ اَىْ لَا تُنَادُوْهُ بِاسْمِهٖ فَتَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ وَلَا بِكُنْيَتِهٖ فَتَقُوْلُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ، بَلْ نَادُوْهُ بِالتَّعْظِيْمِ بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম যেভাবে তার জীবদ্দশায় সম্মানের সাথে নেওয়া জরুরি ছিল, তদ্রূপ তার ইন্তেকালের পরেও জরুরি। রাসূলল্লাহ ﷺ -এর শানে কোনোরূপ কটূক্তিকারী কাফের অভিশপ্ত।

قَوْلُهُ لِوَاذًا : শব্দটি مُفَاعَلَة -এর মাসদার, একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করা। এটা হয়তো, يَتَسَلَّلُوْنَ -এর সমার্থ হওয়ার কারণে মাসদার তথা مَفْعُوْل مُطْلَقْ অর্থাৎ يَتَسَلَّلُوْنَ لِوَاذًا অথবা উহ্য فِعْل -এর মাসদার। অর্থাৎ يُلَاوِذُوْنَ لِوَاذًا আর মাসদারটি حَالْ -এর স্থলে হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ يَتَسَلَّلُوْنَ مُتَلَاوِذِيْنَ অর্থে।

قَوْلُهُ اَنْ يُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ : মাসদারের তাবিলে হয়ে فَلْيَحْذَرِ -এর مَفْعُوْل অর্থাৎ اِصَابَةَ فِتْنَةٍ

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ : এর আত্ফ হলো يَعْلَمُ -এর مَعْمُوْل তথা مَا اَنْتُمْ -এর উপর। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) يَعْلَمُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে মজলিসসমূহের আদব কায়দা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে উপদেশ স্থান পেয়েছে, কোনো আগন্তুকের কারো বাড়িতে প্রবেশের সঠিক নিয়মও ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে হযরত রাসূলে করীম ﷺ -এর মজলিসের আদব এবং নিয়ম-কানুন পালন সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ-এর দরবার থেকে বের হওয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা একান্ত জরুরি। তিনি ডাকলে অনতিবিলম্বে সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁর পবিত্র মজলিস থেকে অনুমতি না নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে হাজির না হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ এবং মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ -এর তাজীম করা এবং তাঁর মজলিসের আদব রক্ষা করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ الخ : **শানে নুযূল :** ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনযির ও বায়হাকী (র.) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারযীর সূত্রে বর্ণনা করেন, পঞ্চম হিজরিতে অনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে সারা আরবের কাফেররা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মদিনা আক্রমণ করে। কাফেরদের সেনাপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। কাফেরদের আক্রমণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পূর্বাহ্নেই পৌঁছেছিল। তাই তিনি মদিনা মুনাওয়ারার সমতল ভূমিতে এক বিরাট পরিখা খননের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিন হাজার পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনিই এই পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করেন। হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ নিজে মাটি কাটেন এবং মাটির বোঝা তুলে দেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা কাজে অলসতা করছিল। এমনকি পরিখা খননের নামে প্রতারণা করছিল। তারা সুযোগ বুঝে পেছন থেকে সরে পড়ত এবং বাড়ি চলে যেত। মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা এসব করত। ঘটনাক্রমে যদি কোনো মুসলমান দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে বাসস্থানে যেতে বাধ্য হতেন তখন মুনাফিকরা এসে তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট খবর দিত। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে মুসলমানরা প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুমতিক্রমে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতেন এবং কাজ শেষে ফিরে আসতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৪১৬]

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ الخ : এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আরো একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নবী ﷺ -এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান কর। বিশেষ করে যখন কোনো সমাবেশ হবে এবং কোনো জরুরি বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন- জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো এদিক-ওদিক যাবে না। কারণ এটাও পূর্ণাঙ্গ মুমিনের একটা নিদর্শন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী ﷺ! তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে যাবে তখন সে যেন মজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে, তখনো যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয়বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।"

[এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম নাসায়ী (র.)-ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।] -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন : আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন ; তখন তারা এর জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি মনে করতেন না।

উত্তর : জবাব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়নি; বরং কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, এটা হচ্ছে তার বিধান; যেমনটা খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এ বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ- عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ -এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

اَمْرٍ جَامِعٍ বলে কি বুঝানো হয়েছে? : এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরি মনে করেন; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল। এছাড়াও জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শসভা ইত্যাদি।

এ আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, নাকি ব্যাপক : ফিক্‌হবিদগণ সবাই একমত যে, এ আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামি প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এ বিধান, তিনি সবাইকে একত্র হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েজ। -[কুরতুবী, মাযহারী ও বয়ানুল কুরআন]

বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের জন্য এ আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামি সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এ আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোনো মজলিসে কোনো সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ الخ : শানে নুযূল : আবূ নু'আঈম দালায়েল গ্রন্থে যাহহাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা হুযূর ﷺ-কে 'ইয়া মুহাম্মদ!' কিংবা 'ইয়া আবাল কাসেম!' বলে ডাকত। এটা শিষ্টাচারের খেলাফ। এ প্রসঙ্গে নাম ধরে ডাকতে নিষেধপূর্বক এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الخ : শানে নুযূল : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, মুনাফিকরা জুমার দিনে খোতবার সময় বসে থাকাকে কষ্টদায়ক মনে করত। এজন্য তারা লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আবডালে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করত। আর কখনো হুজুর ﷺ তাদেরকে ডাকলে তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাদের যেন মরণ আসত। তাই কিভাবে ফাঁকি দেবে সেজন্য তারা বাহানা খুঁজত। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা মানুষকে ফাঁকি দিতে পার, তাদের দৃষ্টি এড়াতে পার, মানুষকে প্রতারণা করতে পার; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কোনো কর্মই গোপন নেই। তোমাদের কোনো আচরণই তাঁর নিকট গোপনীয় নেই।

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ الخ : হযরত যাহহাক (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'হে মুহাম্মদ ﷺ!' এবং 'হে আবুল কাসেম ﷺ!' বলে আহ্বান করত, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ বেআদবি হতে নিষেধ করে দেন। তাদেরকে তিনি বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম ধরে ডেকো না; বরং 'হে আল্লাহর নবী ﷺ!' বা 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!' এই বলে ডাকবে। তাহলে তাঁর বুজুর্গি, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোও এ আয়াতের মতোই। আল্লাহ তা'আলা বলেন– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. অর্থাৎ "হে মুমিনগণ!" রাইনা [হে নির্বোধ] বলো না, এবং 'উনযুর না' [আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন!] বল, আর শুনে রেখ, কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" –[সূরা বাকারা : ১০৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তবে তাই তাদের জন্য উত্তম হতো; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –[সূরা হুজুরাত : ২-৫]

সুতরাং এসব আয়াত দ্বারা মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিখানো হয়েছে যে, তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি পূর্বে তো তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় সদকা করার হুকুম ছিল। এটা হচ্ছে এ আয়াতের একটি ভাবার্থ। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়াকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দোয়ার মতো মনে করো না। তাঁর দোয়াতো কবুল হবেই। সুতরাং সাবধান! তোমরা আমার নবী ﷺ-কে কষ্ট দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বদ দোয়া যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর পূর্ববর্তী বাক্যের তাফসীরে মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) বলেন যে, জুমার দিন খুতবায় বসে থাকা মুনাফিকদের কাছে খুবই ভারি বোধ হতো। আর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার এবং খুতবা শুরু হয়ে যাবার পর কেউ মহানবী ﷺ -এর অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারত না। কারো বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইত এবং তিনি তাকে অনুমতি দিতেন। কেননা খুতবার সময় কথা বললে জুমা বাতিল হয়ে যায়। তখন এ মুনাফিকরা আড়ে আড়েই দৃষ্টি বাঁচিয়ে সটকে পড়ত। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন যে, জামাতে যখন এ মুনাফিকরা থাকত তখন একে অপরের আড়ালে হয়ে পালিয়ে যেত। আল্লাহর নবী ﷺ হতে এবং তাঁর কিতাব হতে সরে যেত। জামাতের সারি হতে বেরিয়ে গিয়ে ইসলামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যেত।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশের, তাঁর সুন্নতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সুন্নত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তো তা ভালো। আর যদি সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য।" [এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।] প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেউই শরিয়তে মুহাম্মাদীর ﷺ বিপরীত করে, তার অন্তরে কুফরি, নিফাক, বিদআত ও মন্দের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়; হয়তো দুনিয়াতেই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালাল। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয়, সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে [আগুন থেকে] ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।"-[এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-ও এটা তাখরীজ করেছেন।]

قَوْلُهُ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যাতে ব্যাপৃত রয়েছ তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন, সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। বান্দাদের ভালো-মন্দ সমস্ত কাজ তিনি পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাক অথবা গোপনে গোপনে কিছু কর না কেন, আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। প্রকাশ্যও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। চুপি চুপি কথা এবং উচ্চৈঃস্বরের কথা সবই তাঁর কানে পৌঁছে যায়। সমস্ত প্রাণীর রিজিকদাতা তিনিই। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক অবস্থার খবর তিনিই রাখেন। প্রথম থেকেই সবকিছু লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে আছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। জলে ও স্থলে অবস্থানরত সবকিছুর খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে সেটাও তাঁর অজানা থাকে না। জমিনের অন্ধকারের মধ্যে কোনো দানা নেই এবং শুষ্ক ও সিক্ত এমন কোনো জিনিস নেই, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এ বিষয়ের বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। যখন সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, ঐ সময় তাদের সামনে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্য ও পাপ পেশ করা হবে। তারা তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত আমল দেখতে পাবে। আমলনামা তারা ভীত ও কম্পিতভাবে দেখবে এবং তার মধ্যে তাদের সারা জীবনের কার্যাবলি দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের স্বরে বলবে, "এটা কেমন কিতাব যে, এতে বড় তো বড়ই; এমনকি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোনো কিছুও বাদ পড়েনি!" যে যা করেছে তার সবই সেখানে বিদ্যমান পাবে। যেমন মহামহিম ও প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন- يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ অর্থাৎ "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে।' -[সূরা কিয়ামাহ : ১৩]

অন্যত্র তিনি বলেন-

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا .

অর্থাৎ "আর হাজির করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।" -[সূরা কাহাফ : ৪৯]
এ জন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেন, যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। -[ইবনে কাসীর]

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ : সূরা ফুরকান মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِلٰى رَحِيْمًا فَمَدَنِيٌّ وَهِيَ سَبْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً

তবে وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ.................رَحِيْمًا আয়াতটি ছাড়া।

এটি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত। এতে ৭৭ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. تَبٰرَكَ تَعَالَى الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ الْقُرْاٰنَ لِاَنَّهٗ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ عَلٰى عَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ اَيِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ دُوْنَ الْمَلٰئِكَةِ نَذِيْرًا . مُخَوِّفًا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

১. কত মহান তিনি, যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। তাঁর বান্দার প্রতি হযরত মুহাম্মদ -এর প্রতি যাতে তিনি হতে পারেন বিশ্বজগতের জন্য অর্থাৎ মানব ও দানবের জন্য। ফেরেশতাগণের জন্য নয়, সতর্ককারী আল্লাহর শাস্তি হতে ভীতি প্রদর্শনকারী।

٢. اِلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ شَانِهٖ اَنْ يُّخْلَقَ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا سَوَّاهُ تَسْوِيَةً.

২. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। যা সৃজিত হওয়ার উপযোগী এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। অর্থাৎ তাকে সঠিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

٣. وَاتَّخَذُوْا اَيِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَيِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ اٰلِهَةً هِيَ الْاَصْنَامُ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا اَيْ دَفْعَهٗ وَّلَا نَفْعًا اَيْ جَرَّهٗ وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً اَيْ اِمَاتَةً لِاَحَدٍ وَاِحْيَاءً لِاَحَدٍ وَّلَا نُشُوْرًا . اَيْ بَعْثًا لِلْاَمْوَاتِ.

৩. আর তারা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ কাফেররা তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহরূপে অর্থাৎ মূর্তিকে। যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা অন্যের সৃষ্টি। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের অপকার করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ লাভ করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু ও জীবনের অর্থাৎ কাউকে মৃত্যুদান করতে এবং কাউকে জীবন দান করতে এবং পুনরুত্থানের উপরও তারা কোনো ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ মৃতদেরকে জীবিত করার।

অনুবাদ :

٤. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ هٰذَا اَىْ مَا الْقُرْاٰنُ اِلَّآ اِفْكٌ كِذْبٌ نِ افْتَرَاهُ مُحَمَّدٌ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ وَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالٰى فَقَدْ جَآءُوْا ظُلْمًا وَّزُوْرًا . كُفْرًا وَكِذْبًا اَىْ بِهِمَا .

৪. কাফেররা বলে, এটা তো কিছুই নয় কুরআন তো কিছুই নয় মিথ্যা ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেই এটাকে উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে আর তারা হলো কিতাবধারী সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরূপে তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা বলা উভয় ক্ষেত্রেই।

٥. وَقَالُوْآ اَيْضًا هُوَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكَاذِيْبُهُمْ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ اكْتَتَبَهَا انْتَسَخَهَا مِنْ ذٰلِكَ الْقَوْمِ بِغَيْرِهٖ فَهِىَ تُمْلٰى تُقْرَأُ عَلَيْهِ لِيَحْفَظَهَا بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا . غُدْوَةً وَعَشِيًّا .

৫. তারা আরো বলে এগুলো তো সে কালের উপকথা মিথ্যা অলীক কাহিনী। اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ [হামযা বর্ণে পেশসহ]-এর বহুবচন। যা তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন অন্যের সাহায্যে উক্ত সম্প্রদায় থেকে। এগুলো তার নিকট পাঠ করা হয়। যাতে তিনি মুখস্থ করে নিতে পারেন। সকাল-সন্ধ্যায়।

٦. قَالَ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ الْغَيْبَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَّحِيْمًا بِهِمْ .

৬. আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন– বলুন! এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি সকল রহস্য অবগত আছেন অদৃশ্যের ব্যাপারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল মুমিনদের জন্য পরম দয়ালু তাদের ব্যাপারে।

٧. وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط لَوْلَآ هَلَّا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا يُصَدِّقُهٗ .

৭. তারা বলে– এ কেমন রাসূল, যিনি আহার করেন এবং হাঁটে বাজারে চলাফেরা করেন, তার নিকট কোনো ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে, তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারী রূপে, যে তাঁকে সত্যায়ন করত।

٨. اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ مِنَ السَّمَاءِ يُنْفِقُهٗ وَلَا يَحْتَاجُ اِلَى الْمَشْىِ فِى الْاَسْوَاقِ لِطَلَبِ الْمَعَاشِ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ط اَىْ مِنْ ثِمَارِهَا فَيَكْتَفِىْ بِهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ نَاْكُلُ بِالنُّوْنِ اَىْ نَحْنُ فَيَكُوْنُ لَهٗ مَزِيَّةٌ عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اَىِ الْكَافِرُوْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ مَا تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا مَخْدُوْعًا مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهٖ .

৮. অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন? আকাশ থেকে যা তিনি ব্যয় করতে পারতেন। ফলে জীবিকা অন্বেষণকল্পে তাকে বাজারে গমন করতে হতো না। অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন? যা থেকে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করতেন। অর্থাৎ তার ফলফলাদি হতে। ফলে তিনি তাতে যথেষ্ট করতে পারতেন। অন্য কেরাতে نَاْكُلُ রয়েছে يَاء -এর পরিবর্তে نُوْن দ্বারা অর্থাৎ আমরা তা থেকে খেতাম। এবং এর দ্বারা আমাদের উপর তার বিশেষ মর্যাদা লাভ হতো। সীমালঙ্ঘনকারীরা আরো বলে অর্থাৎ কাফেররা মুমিনগণকে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। প্রতারিত ও বিবেক পরাভূত ব্যক্তিরই অনুসরণ করে থাকো।

অনুবাদ :

৯. قَالَ تَعَالَى أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ بِالْمَسْحُوْرِ وَالْمُحْتَاجِ اِلَى مَا يُنْفِقُهُ وَاِلَى مَلَكٍ يَقُوْمُ مَعَهُ بِالْاَمْرِ فَضَلُّوْا بِذٰلِكَ عَنِ الْهُدٰى فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَيْهِ .

৯. আল্লাহ তা'আলা বলন– দেখুন! এরা আপনার কি উপমা দেয়। জাদুগ্রস্ত, ব্যয়ভারের প্রতি মুখাপেক্ষী ও একজন ফেরেশতার সাথে, যে তার কাজে সহায়ক হতো। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এর কারণে হেদায়েত থেকে ফলে তারা পথ পাবে না। তার প্রতি পৌঁছতে কোনো রাস্তা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

এ সূরাট মক্কী, তবে তিনটি আয়াত হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল সূরার নাম এবং তার ক্রমধারা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সবকিছুই تَوْقِيْفِيٌّ তথা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর তরফ থেকে শ্রুত। তবে আয়াতের সংখ্যা এরূপ تَوْقِيْفِيٌّ নয়। এ সূরাটি তাওহীদ ও পুনরুত্থানের বিষয়াদি সম্বলিত। –[জুমাল]

قَوْلُهُ اِلَى رَحِيْمًا : এ পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : এটা تَبَارَكَ -এর ব্যাখ্যা, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তা ও গুণাবলি ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে সকল মাখলুকের উর্ধ্বে। تَبَارَكَ ক্রিয়াটি অতীতকালীন শব্দ। এর مُضَارِعْ ,اِسْم فَاعِلْ ও মাসদার ব্যবহৃত হয় না এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় না। বরকতের অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া চাই প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক। –[জুমাল]

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ : এটা হলো কুরআনকে ফুরকান অভিহিত করার ইল্লত বা কারণ। এর অর্থ হলো পার্থক্য বিধানকারী। কুরআন যেহেতু হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধান করেছে এ কারণেই কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কুরআন যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হয়েছে এ কারণে কুরআনের অবতরণ প্রসঙ্গে نَزَّلَ বলা হয়েছে, যা অধিকরূপে পৃথক পৃথক অবতরণ করা বুঝায়। –[জুমাল]

قَوْلُهُ لِيَكُوْنَ : এটা অবতরণের ইল্লত বা কারণ। এর মধ্যকার যমীরটি عَبْد -এর প্রতি ফিরেছে। কেননা এটা এর নিকটবর্তী, আবার فُرْقَانٌ -এর প্রতিও ফিরতে পারে। আবার مُنَزِّلْ তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও ফিরতে পারে।

قَوْلُهُ لِلْعٰلَمِيْنَ : এটা نَذِيْرًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ شَاْنِهِ اَنْ يُّخْلَقَ : এটা বৃদ্ধি করে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে মাখলুক হওয়া থেকে খারিজ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা شَيْءٌ হওয়া স্বীকৃত। অন্যথায় তিনি যদি لَا شَيْءَ হন তাহলে اِرْتِفَاع نَقِيْضَيْن তথা ভিন্নমুখী দুটির কোনো একটি না হওয়া সাব্যস্ত হবে। কাজেই তাকে شَيْئٌ মানতে হবে। আর যখন আল্লাহ তা'আলার সত্তা شَيْءٌ হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ -এর অন্তর্গত হলো। সুতরাং তাঁর সত্তাও মাখলুক হওয়া সাব্যস্ত হলো। অথচ এটা অসম্ভব। এ প্রশ্ন নিরসনকল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) مِنْ شَاْنِهِ اَنْ يُّخْلَقَ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন।

উত্তরের সারাংশ এই যে, تَخْلِيْق বলা হয় কোনো বস্তু অস্তিত্বে আনাকে, আর অস্তিত্বহীনতা থেকে ঐ বস্তুই অস্তিত্বে আসা সম্ভব যা অস্তিত্বহীন ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো অস্তিত্বহীন ছিলেন না। অতএব আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুক বা সৃজিত হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ سَوَّاهُ تَسْوِيَةً : এ বাক্যে বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্ন নিরসন করেছেন।

প্রশ্ন : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا -এর মধ্যে **قَلْب** ঘটেছে। কেননা মূলত **وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا فَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ** হওয়া উচিত ছিল। কেননা তাকদীর হলো চিরন্তন বা অনাদি বিষয়, আর তাখলীক হলো নশ্বর বা হাদীস। কেননা তাকদীরের অর্থ হলো নির্ধারণ করা, পরিমিত করা, পরিকল্পনা করা। আর **خَلْق** -এর অর্থ হলো তৈরি করা, সৃষ্টি করা। আর এটা স্পষ্ট যে, পরিকল্পনা আগে হয়ে থাকে, আর সৃষ্টি এর পরে হয়ে থাকে। কোনো বিল্ডিং -এর প্ল্যান বা নকশা আগে হয়, আর বিল্ডিং পরে নির্মিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আয়াতে ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে অগ্র পশ্চাৎ বা **قَلْب** ঘটেছে।

উত্তর : আয়াতে **قَلْب** বা অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেনি। কেননা **قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا** অংশটি **سَوَّاهُ تَسْوِيَةً** অর্থে। এর অর্থ হলো কোনো বস্তু তৈরি করার পর তা ঠিক করা। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করা, মজবুত করা ইত্যাদি। আর এটা সৃষ্টির পরে হয়ে থাকে। অতএব এখানে কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ بِهِمَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, **ظُلْمًا وَّزُورًا** শব্দদ্বয় হরফে জার উহ্য থাকার মাধ্যমে (بِنَزْعِ الْخَافِضِ) মানসুব হয়েছে। মূলত **جَاءُوا بِظُلْمٍ وَّزُورٍ** ছিল। ব্যাখ্যাকার এটাই অবলম্বন করেছেন। আর কারো কারো মতে **جَاءُوْ اَتٰى** শব্দদ্বয় নিজেই **مُتَعَدِّى**; এ সময় **مَفْعُوْل بِه** হওয়ার কারণে **مَنْصُوْب** হবে।

قَوْلُهُ هُوَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ : এখানে **اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ** উহ্য **هُوَ** মুবতাদার **خَبَرْ** টা ব্যাখ্যাকার (র.) যেমন বলেছেন। আর **اِكْتَتَبَهَا** বাক্যটি **حَال** -এর স্থলে এবং **اِكْتَتَبَهَا** তার খবরও হতে পারে।

قَوْلُهُ مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ : এখানে **لَامْ** -কে ভিন্ন লেখা হয়েছে। এটা সাধারণ আরবি **رَسْمُ الْخَطِّ** তথা আরবি লেখ্যনীতির পরিপন্থি। এর কারণ এই যে, বর্তমানে আমরা যে কুরআন পড়ে থাকি, তা মাসহাফে উসমানী অনুযায়ী। তাতে যেভাবে লিখিত আছে তার ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنَ : এটা যেহেতু **لَوْلَا** [যা **هَلَّا** -এর অর্থে ব্যবহৃত] -এর জবাব এ কারণে **مَنْصُوْب** হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ : এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য **اِسْم** -কে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জুলুম অত্যাচারকে স্পষ্ট করার জন্য; অন্যথায় **وَقَالُوا** বলা যথেষ্ট ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- **يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ** অর্থাৎ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছ অর্থাৎ তোমাদের আকিদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এরপর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে আসবে, সেদিন তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে, তাই এ সূরার শুরুতে ইরশাদ হয়েছে- **تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ**

অর্থাৎ কত মহান, মহিমময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল। তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত, তারা এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না যে, আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বসন্ত তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিস্ময়কর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য, মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে,

আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফুরকান। এ সূরায় তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে। যাতে করে পবিত্র কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। –[দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ৬৮]

আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র.) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ একমত যে এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাখানি মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাহহাক (র.) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ২৩০]

এই সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

قَوْلُهُ تَبَارَكَ : تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। فُرْقَانٌ কুরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মুজেযার মাধ্যমে সত্যপন্থি ও মিথ্যাপন্থিদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে৭ তাই একে ফুরকান বলা হয়।

قَوْلُهُ لِلْعَالَمِيْنَ : এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

قَوْلُهُ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا : تَخْلِيْق এর পর تَقْدِيْر উল্লেখ করা হয়েছে। تَخْلِيْق এর অর্থ কোনোরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রহস্য : تَقْدِيْر -এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন প্রকৃতি, আকার আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে তা ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্ত করা হয়নি যে, তা খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে, বাতাসও তরল; কিন্তু পানি থেকে পানি ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে

কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনোরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্টবস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ণ নমুনা। ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে اَلْحِكْمَةُ فِى مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عَبْدِهٖ খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো সৃষ্ট মানবের জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

قَوْلُـهٗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ الـخ : এখানে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়: বরং মুহাম্মদ ﷺ নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরা কালের উপকথা ইহুদি, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর– লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেন যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কুরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে– اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ; এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আল্লাহ তা'আলার সেই পবিত্র সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর; বরং কোনো মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ। এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কুরআনের এক আয়াতের মোকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারো হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি এমন কি সন্তান সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ সূরা লিখে আনার মতো ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়রে জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোনো মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়াই এর অর্থসম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না; বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধনভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোনো চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রাসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি; প্রথমত তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত কোনো ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না, যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি জাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং তিনি আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছে যে– اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ দেখুন, এরা আপনার শানে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিস্তারিত জবাব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

অনুবাদ :

১০. تَبٰرَكَ تَكَاثَرَ خَيْرًا الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِىْ قَالُوْا مِنَ الْكَنْزِ وَالْبُسْتَانِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اَىْ فِى الدُّنْيَا لِاَنَّهٗ شَاءَ اَنْ يُّعْطِيَهٗ اِيَّاهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَيَجْعَلْ بِالْجَزْمِ لَّكَ قُصُوْرًا ـ اَيْضًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا ـ

১০ কত মহান তিনি কত প্রাচুর্যময় যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। যা তারা বলেছে ধনভাণ্ডার ও বাগান হতে। উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে। কেননা, এটা তিনি আখিরাতে দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং তিনি আপনাকে প্রাসাদসমূহ ও দিতে পারেন। يَجْعَلْ শব্দটি জযম সহকারে। অন্য এক কেরাতে رَفْع সহকারে পঠিত হয়েছে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হিসেবে।

১১. بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ الْقِيَامَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ج نَارًا مُّسْعَرَةً اَىْ مُشْتَدَّةً ـ

১১. কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। অর্থাৎ, তীব্র উত্তপ্ত।

১২. اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا غِلْيَانًا كَالْغَضْبَانِ اِذَا غَلَا صَدْرُهٗ مِنَ الْغَضَبِ وَّزَفِيْرًا ـ صَوْتًا شَدِيْدًا وَسِمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهٗ وَعِلْمُهٗ ـ

১২. দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখাবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার تَغَيُّظ শব্দের অর্থ হলো উত্তেজনায় রাগান্বিতের ন্যায়, যখন ক্রোধে বুকের মধ্যে টগবগ করে উথলানোর ন্যায় শব্দ হয়। আর زَفِيْرً অর্থ হলো- প্রচণ্ড শব্দ বা আওয়াজ অথবা ক্রুদ্ধ স্বর শ্রবণ দ্বারা অর্থ হলো তাকে দেখা ও জানা।

১৩. وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِاَنْ يُّضِيْقَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهَا حَالٌ مِنْ مَكَانًا لِاَنَّهٗ فِى الْاَصْلِ صِفَةٌ لَهٗ مُقَرَّنِيْنَ مُصَفَّدِيْنَ قَدْ قُرِنَتْ اَيْدِيْهُمْ اِلٰى اَعْنَاقِهِمْ فِى الْاَغْلَالِ وَالتَّشْدِيْدُ لِلتَّكْثِيْرِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ـ هَلَاكًا ـ

১৩. যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এর কোনো সঙ্কীর্ণ স্থানে ضَيِّقًا শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয় অবস্থায়ই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। مِنْهَا হলো مَكَانْ থেকে حَالْ কারণ মূলত এটা হলো তার সিফত। শৃঙ্খলিত অবস্থায় শিকলে জড়িত। অর্থাৎ শিকল দ্বারা তাদের হাতকে স্কন্ধের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে তথা বেঁধে ফেলা হবে। আর তাশদীদটিকে আধিক্য বুঝানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে বিনাশ।

١٤. فَيُقَالُ لَهُمْ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا - كَعَذَابِكُمْ -

١٥. قُلْ اَذٰلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْوَعِيدِ وَصِفَةُ النَّارِ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ هَا الْمُتَّقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ فِي عِلْمِهٖ تَعَالٰى جَزَاءً ثَوَابًا وَّمَصِيرًا مَرْجِعًا -

١٦. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خٰلِدِينَ ط حَالٌ لَازِمَةٌ كَانَ وَعْدُهُمْ مَا ذُكِرَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا - فَيَسْاَلُهُ مَنْ وَعَدَ بِهٖ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ اَوْ يَسْاَلُهُ لَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِنِ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ -

١٧. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّوْنِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَعِيْسٰى وَعُزَيْرٍ وَالْجِنِّ فَيَقُوْلُ تَعَالٰى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالنُّوْنِ لِلْمَعْبُوْدِيْنَ اِثْبَاتًا لِلْحُجَّةِ عَلَى الْعَابِدِيْنَ ءَاَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ اَوْقَعْتُمُوْهُمْ فِي الضَّلَالِ بِاَمْرِكُمْ اِيَّاهُمْ بِعِبَادَتِكُمْ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ - طَرِيْقَ الْحَقِّ بِاَنْفُسِهِمْ -

অনুবাদ :

১৪. তখন তাদেরকে বলা হবে– আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাকো, তোমাদের বারবার শাস্তির মতো।

১৫. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন! এটাই শ্রেয় উল্লিখিত শাস্তির হুমকি ও জাহান্নামের আগুনের বিবরণ নাকি স্থায়ী জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুত্তাকীগণকে। এটাই তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পুরস্কার ছওয়াব, পুণ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৬. সেথায় তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং তারা স্থায়ী হবে। خَالِدِيْنَ শব্দটি حَال لَازِمَة হয়েছে। এবং এই তাদের উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। সুতরাং যাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে সে তাঁর নিকট তা পূরণ করার দাবি করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন আমাদেরকে তা প্রদান করুন। অথবা ফেরেশতাগণ তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে প্রবেশ করান সেই স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে প্রদান করেছেন।

১৭. এবং যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন يَحْشُرُ শব্দটি يَاء এবং نُوْن উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করত তাদেরকে অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া ফেরেশতা। হযরত ঈসা, হযরত ওজায়ের এবং জিনদের সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন يَقُوْلُ শব্দটি يَاء ও نُوْن উভয়রূপেই পঠিত। উপাস্যদেরকে, উপাসকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সুদৃঢ় করার জন্য। তোমরাই কি ءَاَنْتُمْ এর দুটি হামযাকে আপন অবস্থায় বহাল রেখে, দ্বিতীয় টিকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে, দ্বিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃত ও অপরটির মাঝে একটি اَلِفٌ বৃদ্ধি করে এবং তা পরিত্যাগ করেও পাঠ করা যায়। আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের উপাসনা করার নির্দেশ দিয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলে? নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? অর্থাৎ নিজেদের থেকেই সৎপথ বিচ্যুত হয়েছে।

অনুবাদ :

١٨. قَالُوا سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي يَسْتَقِيْمُ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ اَيْ غَيْرِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ وَمِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ النَّفْيِ وَمَا قَبْلَهُ الثَّانِيْ فَكَيْفَ نَأْمُرُ بِعِبَادَتِنَا وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ بِاِطَالَةِ الْعُمُرِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ج تَرَكُوا الْمَوْعِظَةَ وَالْاِيْمَانَ بِالْقُرْاٰنِ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا هَلْكٰى -

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান আপনি আপনার শানের অনুপযোগী বিষয়াদি হতে আপনি পূত-পবিত্র। আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না। অর্থাৎ আপনি ব্যতীত اَوْلِيَاءَ শব্দটি نَتَّخِذَ -এর প্রথম মাফঊল আর مِنْ অতিরিক্ত হয়েছে نَفْي -এর তাকিদের জন্য। এর পূর্ববর্তী অংশ হলো দ্বিতীয় মাফঊল। কাজেই কিভাবে আমরা আমাদের উপাসনার নির্দেশ দিতে পারি? আপনিই তো এদেরকে ও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দীর্ঘায়ু ও সম্পদের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল তারা উপদেশ ও কুরআনে প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে পরিত্যাগ করেছিল। এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। বিপর্যয়ে।

١٩. قَالَ تَعَالٰى فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ اَيْ كَذَّبَ الْمَعْبُوْدُوْنَ الْعَابِدِيْنَ بِمَا تَقُوْلُوْنَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ اَنَّهُمْ اٰلِهَةٌ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ اَيْ لَا هُمْ وَلَا اَنْتُمْ صَرْفًا دَفْعًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ وَّلَا نَصْرًا ج مَنْعًا لَكُمْ مِنْهُ وَمَنْ يَّظْلِمْ يُشْرِكْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا - شَدِيْدًا فِي الْاٰخِرَةِ -

১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তোমরা যা বলতে তা তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ উপাস্য দেবতাগণ অস্বীকার করবে। تَقُوْلُوْنَ শব্দটি تَاء যোগে পঠিত। তারা যে উপাস্য এ বিষয়টি। সুতরাং তোমরা পারবে না تَسْتَطِيْعُوْنَ শব্দটি يَاء এবং تَاء উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারাও নয় এবং তোমরাও নও শাস্তি প্রতিহত করতে তোমাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করতে এবং সাহায্যও পাবে না অর্থাৎ তাঁর থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে। তোমাদেরকে মধ্যে যে সীমালঙ্ঘন করবে শিরক করবে তাকে আমি চরম শাস্তি আস্বাদন করাব পরকালে কঠিন শাস্তি।

٢٠. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ط فَاَنْتَ مِثْلُهُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَقَدْ قِيْلَ لَهُمْ كَمَا قِيْلَ لَكَ -

২০. আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তাঁরা সকলেই তো আহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন আপনিও তাদের মতোই এবং তাদেরকেও অনুরূপ বলা হয়েছে যেমনটি আপনাকে বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً بَلِيَّةً أُبْتُلِىَ الْغَنِىُّ بِالْفَقِيْرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْمَرِيْضِ وَالشَّرِيْفُ بِالْوَضِيْعِ يَقُوْلُ الثَّانِىْ فِىْ كُلِّ مَا لِىْ لَا اَكُوْنُ كَالْاَوَّلِ فِىْ كُلِّ اَتَصْبِرُوْنَ ج عَلٰى مَا تَسْمَعُوْنَ مِمَّنْ اُبْتُلِيْتُمْ بِهِمْ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ اِصْبِرُوْا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ـ بِمَنْ يَصْبِرُوْنَ وَبِمَنْ يَجْزَعُ ـ

অনুবাদ :

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। ধনীকে দরিদ্র দ্বারা, সুস্থকে অসুস্থতা দ্বারা, সম্ভ্রান্তকে ইতরের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, কেন তাকে প্রথমজনের মতো করা হলো না। উপরের প্রতিটির মধ্যে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? যাদের সাথে তোমাদেরকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তাদের থেকে যা শুনে থাক, তার উপর। এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি اَمْرٌ তথা নির্দেশ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন। কে ধৈর্যধারণ করে আর কে ধৈর্যধারণ করে না; বরং ছটফট করে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَبَارَكَ : এটা এমন একটি গুণ যা অন্যান্য সকল গুণাবলি সম্বলিত এবং সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়াকে অনিবার্য করে। এ কারণেই স্থানের প্রতি লক্ষ্য করে এর বিভিন্নরূপ তাফসীর করা হয়। সূরার সুচনায় যেহেতু আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা ছিল। এ কারণে সেখানে تَعَاظَمَ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। আর এটা যেহেতু দানের ক্ষেত্র, এ কারণে كَثُرَتْ خَيْر তথা প্রভূত কল্যাণ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। আর সূরার শেষ অংশ যেহেতু আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ক্ষেত্র, এ কারণে সেখানে تَعَاظَمَ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبَارَكَ : এটা অতীতকালীন ক্রিয়া اَلَّذِىْ মুযাফ বিলুপ্ত সহ এর فَاعِلْ অর্থাৎ تَبَارَكَ خَيْرُ الَّذِىْ

قَوْلُهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ : এ বাক্যটি خَيْر থেকে بَدَل হয়েছে। আর এটা মঙ্গল ও উত্তম হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। কারণ মুশরিকরা যে বাগানের বিষয়ে বলেছিল তা ছিল সাধারণ বাগান। তাতে সংখ্যাধিক্য এবং ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার কোনো শর্ত ছিল না, আর কারো মতে خَيْرًا থেকে عَطْف بَيَانْ -ও হতে পারে। আবার কেউ কেউ উহ্য اَعْنِىْ ক্রিয়ার কারণে جَنّٰتٍ -কে مَنْصُوْب স্থির করেছেন تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ এবং এ বাক্যটিকে جَنّٰتٍ -এর صِفَتْ সাব্যস্ত করেছেন।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ الخ : ব্যাখ্যাকার (র.) لِاَنَّهُ দ্বারা فِى الدُّنْيَا -এর قَيْد সংশ্লিষ্ট করার ইল্লত বর্ণনা করেছেন। ইল্লতের সারমর্ম এই যে, اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا -এর মধ্যে خَيْرِيَّتْ -কে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ঝুলন্ত করা দুনিয়ার দিক দিয়ে এটি সঠিক। অন্যথায় পরকালে তা সুনিশ্চিত।

قَوْلُهُ يَجْعَلُ : এ ক্রিয়াটি জযমযোগে جَعَلَ -এর মহলের উপর عَطْف হবে, যা শর্তের جَزَاء হয়েছে। এ কারণে এটাও জযমযুক্ত হবে। অপর এক কেরাতে مَرْفُوْع মেনে নিয়ে, شَرْط যখন مَاضِىْ হয় তখন جَزَاء -এর মধ্যে রফা ও জযম উভয়টি বৈধ। এ কারণে তার উপর যেটা مَعْطُوْف হবে তার মধ্যেও উভয় ই'রাব বৈধ হবে। কেননা شَرْط যখন مَاضِىْ হয় তখন شَرْط -এর প্রভাব جَزَاء -এর মধ্যে দুর্বল হয়ে যায়। এ কারণে জযম ও রফা উভয় বৈধ হয়ে যায়। ইবনে মালিক (র.) বলেন– وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَاءَ اَحْسَنَ আর উভয় কেরাত, কেরাতে সাবআ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ غَلْيَانًا : এখানে تَغَيُّظًا -এর ব্যাখ্যা غَلْيَانًا দ্বারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : غَيْظ তো শ্রবণের বস্তু নয়, তা হলো দেখার বস্তু।

উত্তর : এখানে غَيْظ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غَلْيَانٌ অর্থাৎ উত্তেজিত হওয়া, টগবগ করা, যা শ্রবণ করা যায়। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ وَسَمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ عِلْمُهُ : এটি উল্লিখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর। অর্থাৎ রাগ শ্রবণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা দেখা ও অবগত হওয়া, আর এটা ক্রোধের ক্ষেত্রে সম্ভব। কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন যে, বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল سَمِعُوْا وَرَاَوْا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا অতএব رَاَوْا -এর সম্পর্ক হলো تَغَيُّظٌ -এর সাথে, আর زَفِيْرٌ -এর সম্পর্ক হলো سَمِعُوْا -এর সাথে। কেউ কেউ শ্রবণ দ্বারা সাধারণভাবে যে কোনো উপায়ে উপলব্ধি করার অর্থ নিয়েছেন। এ সময় سَمِعُوْا -এর সম্পর্ক زَفِيْرٌ ও تَغَيُّظٌ উভয়ের সাথে বৈধ হবে। –[জুমাল]

قَوْلُهُ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا : এখানে مِنْهَا হলো مَكَانًا -এর صِفَتْ আর نَكِرَهْ -এর صِفَتْ -কে যখন আগে উল্লেখ করা হয়, তখন তা حَالْ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مُقَرَّنِيْنَ : এটা اُلْقُوْا -এর যমীরের حَالْ হয়েছে। مُصَفَّدِيْنَ (ض) ও مُصَفِّدِيْنَ উভয়টি বৈধ। এর অর্থ হলো বাঁধা, জড়ানো ইত্যাদি। صَفًّا অর্থ– বেড়ী।

قَوْلُهُ دَعَوْا هُنَالِكَ : এটা اِذَا اُلْقُوْا -এর جَزَاءْ আর هُنَالِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংকীর্ণ স্থান।

قَوْلُهُ ثُبُوْرًا : এটা উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ অর্থাৎ ثَبَرْنَا ثُبُوْرًا অর্থে। কেউ কেউ বলেন, এটা دَعَوْا -এর مَفْعُوْل لَهٗ

قَوْلُهُ لِعَذَابِكُمْ اَىْ لِاَجَلِ دَوَامِ عَذَابِكُمْ ...... دُعَائُكُمْ عَلٰى حَسْبِهٖ : এর দ্বারা আধিক্যের ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে তোমাদের আজাব চিরস্থায়ী এবং বিভিন্ন ধরনের এ হিসেবে তোমরা তোমাদের ধ্বংস আহবান করতে থাক। আর কোনো কোনো কপিতে আছে– لِعَذَابِكُمْ ; তখন বাক্যটির অর্থ হবে– মৃত্যুকে আহবান করার দ্বারা মৃত্যু কামনা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ هَا : এখানে صِلَةْ যেহেতু বাক্য হয়েছে, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) هَا যমীরকে উহ্য মেনে رَابِطْ তথা সংযোগ স্থাপনকারীর প্রতি ইশারা করেছেন।

قَوْلُهُ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ : বিভিন্নরূপ ধমক ও দোজখাগ্নি বেশি উত্তম? নাকি চিরস্থায়ী বেহেশত? এখানে প্রশ্ন হয় যে, এর দ্বারা তো বুঝা গেল যে, আগুনের মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নেই।

উত্তর : ১. পবিত্র কুরআনে خَيْرٌ অধিকাংশ ক্ষেত্রে اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

২. এটা এমনই যে, কোনো মনিব তার গোলামকে কিছু টাকা দিল, এ কারণে গোলাম দুষ্টামি ও বিরুদ্ধাচরণ শুরু করল। ফলস্বরূপ মালিক গোলামকে প্রহার করতে করতে বলল, এটা উত্তম নাকি ওটা?

প্রশ্ন : جَنَّةٌ বলা হয় চিরস্থায়ী আবাসকে। সুতরাং পরে আবার خُلْد উল্লেখ করার প্রয়োজন কি?

উত্তর : ইযাফতের দ্বারা কখনো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلْخَالِقُ ও اَلْبَارِئُ এ দুটোও এ ধরনের।

قَوْلُهُ فِىْ عِلْمِهٖ تَعَالٰى : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ حَالٌ لَازِمَةٌ : উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের جَزَاءْ ও مَصِيْر ভবিষ্যতে হিসাব নিকাশের পরে হবে। তথাপি এটাকে অতীতকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করা হলো কেন?

উত্তর : ১. আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে যেহেতু সবকিছুই বেষ্টিত রয়েছে, এ কারণে অতীতকালীন সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ২. যে বিষয়টি ঘটা সুনিশ্চিত তাকে অতীতকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করেন।

قَوْلُهُ حَالٌ لَازِمَةٌ : এখানে لَهُمْ خٰلِدِيْنَ হলো لَهُمْ-এর যমীরের حَالٌ অথবা يَشَاءُوْنَ-এর فَاعِلٌ-এর যমীরের حَالٌ لَازِمَةٌ; আর حَالٌ لَازِمَةٌ-এর উদ্দেশ্য হলো পূর্বের অংশ দ্বারা যে অর্থ বুঝে আসে তাকে আরো জোরদার করা।

قَوْلُهُ وَعْدَهُمْ : এটা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো كَانَ-কে জাহির করা। অর্থাৎ وَعْدَ الْمُتَّقُوْنَ থেকে যে وَعْدَةٌ বুঝা যায় সেটাই كَانَ-এর اِسْم; কেউ কেউ مَا يَشَاءُوْنَ-এর মধ্যে যে مَا রয়েছে তাকে كَانَ-এর اِسْم সাব্যস্ত করেছেন।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ : এটা اُذْكُرْ উহ্য فِعْل-এর ظَرْف হয়েছে এবং قُلْ-এর উপর عَطْف হয়েছে। نَحْشُرُهُمْ-এর مَفْعُوْل-এর যমীর দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারীগণ উদ্দেশ্য। وَمَا يَعْبُدُوْنَ-এর عَطْف হলো هُمْ যমীরের উপর।

قَوْلُهُ اِثْبَاتًا لِلْحُجَّةِ عَلَى الْعَابِدِيْنَ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা তো সকল গায়েবী বিষয় অবগত, অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট বর্তমান তুল্য। কাজেই উপাস্যদেরকে اَضْلَلْتُمْ-এর মাধ্যমে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : এ প্রশ্ন মূলত জিজ্ঞাসার জন্য নয় বরং তাদেরকে নিরুত্তর ও নির্বাক করা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট প্রশ্ন করা হবে اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এভাবে وَاِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -এর মধ্যেও তাদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়া উদ্দেশ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بُوْرًا : এটা بَائِرٌ-এর বহুবচন। অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

قَوْلُهُ اَلَا اِنَّهُمْ : এটা تَقُوْلُوْنَ-এর উক্তি বা مَقُوْلَةٌ আর مَا থেকে بَدَلٌ ও হতে পারে فَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর মধ্যে যেহেতু ت ও ى যোগে দুটি কেরাতে রয়েছে। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) لَاهُمْ وَلَا اَنْتُمْ বলেছেন।

قَوْلُهُ اَلَا اِنَّهُمْ : ইবনে আম্বরী বলেন, এ বাক্যটি حال হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হবে। বাক্যটি এরূপ ছিল اِلَّا وَاِنَّهُمْ তার নিকট واو বিলুপ্ত থাকবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসির (র.)-এর মতে لَاِنَّهُمْ-এর হামযাকে যের দিয়ে পড়েছেন اِنَّهُمْ-এর খবরের উপর لَامْ আসার কারণে যদি اِنَّ-এর খবরে উপর لَامْ আসে তাহলে অধিকাংশের মতে اِنَّ যেরযুক্ত হবে। কেউ কেউ যবরও বৈধ বলেছেন। তবে তা ঠিক নয়। -[ফাতহুল কাদীর : শাওকানী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছুটা বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া যে. এরূপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গাম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনদে আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ উমামার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পালনকর্তা! আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরজ করলাম: না, হে আমার পালনকর্তা! আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস যাপন করে সবর করব- এ অবস্থায়ই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। -[মাযহারী]

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গাম্বরগণ সাধারণত দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিত্তশালী ও

ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোনো ঔৎসুক্যই হয়নি। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গাম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হতে পারেন না, ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গাম্বরকে তোমরাও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন, তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থি নয়। উপরিউক্ত– وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ আয়াতে এই বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেসব লোক এ সকল বস্তু দাবি করে, তারা বাস্তবতা ও সত্য অন্বেষণের নিয়তে করে না; বরং দুষ্টামি ও বিরক্ত করার উদ্দেশ্য করে থাকে। তাদের দুষ্টামির কারণ এই যে, তাদের এখনও পর্যন্ত কিয়ামত এবং পুরস্কার ও তিরস্কারের উপর বিশ্বাস আসেনি। সুতরাং মনে রাখা উচিত যে, তাদের এ মিথ্যা আখ্যা দেওয়ার কারণে কিছুই আসে যায় না, কিয়ামত আসবেই। আর এসব মিথ্যাচারীদের জন্য আগুনের যে কয়েদখানা তৈরি করে রাখা হয়েছে অবশ্যই তাদেরক সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

قَوْلُهُ اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : অর্থাৎ দোজখের আগুন হাশরের ময়দানে দূর থেকে দোজখীদেরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তার ক্রোধ ও ভয়ংকর শব্দে অনেক বড় বড় বীরপুরুষদের কলিজা পানি হয়ে যাবে। কাফেরদেরকে তার ভিতরে নেওয়ার জন্য চিৎকার করবে। দোজখের এ দেখা এবং চিৎকার করা প্রকৃতার্থেই; রূপকার্থে নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তার মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া কষ্টকর নয়। এটাই আহলে সুন্নত ও জামাতের আকীদা। আর মু'তাজিলা সম্প্রদায় যেহেতু দর্শন, কথোপকথন ও চিৎকার করাকে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বলে থাকে। এ কারণে তারা উপরের বিষয়টি প্রকৃতার্থে হওয়া অস্বীকার করে থাকে। তারা তাকে রূপকার্থে বলে থাকে।

قَوْلُهُ وَكَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا : অর্থাৎ, এমন ওয়াদা যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর ওয়াদা পালনকে জরুরি করে নিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি ঈমানদারদের জন্য এ মহাপুরস্কারকে নিজ জিম্মায় অবধারিত করে নিয়েছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যেসব ব্যক্তি বা বস্তুর উপাসনা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও করা হবে তার মধ্যে জড়বস্তু যথা– পাথর, লোহা, কাঠ, সোনা-রূপা ও অন্যান্য ধাতু পদার্থও রয়েছে। এ সবগুলো বিবেকহীন। আর আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দারাও রয়েছেন, যাঁরা বিবেকসম্পন্ন। যেমন– হযরত উযাইর (আ.) হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য আরো অনেক নেককার বান্দা, এভাবে ফেরেশতা ও জিনদেরকেও পূজা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পরকালে বিবেকহীন জলজ পদার্থকে অনুভূতি ও বাকশক্তি দান করবেন। তিনি এসব উপাস্যদেরকে বলবেন, বল দেখি তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনার নির্দেশ দিয়েছিলে? নাকি তারা তাদের ইচ্ছামতো তোমাদের উপাসনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছিল? সেদিন তারা উত্তর দিবে, আমরা নিজেরাই যেহেতু আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের স্রষ্টা মনে করতাম না। সুতরাং আমরা কীভাবে অন্যদেরকে আমাদের উপাসনা করার ও অভিভাবক ও কার্যনিয়ন্তা মনে করার নির্দেশ দিতে পারি?

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً : মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল : এতে ইঙ্গিত আছে যে, তা'আলার সবকিছু করার শক্তি রয়েছে। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্ব ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন। কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আর কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণি, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্‌ণ ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমাদের অপেক্ষা বেশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও সম্পত্তিতে তোমার চেয়ে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের, যাতে তুমি হিংসার গুনাহ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে পার।

অনুবাদ :

২১. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا لَا يَخَافُوْنَ الْبَعْثَ لَوْلَا هَلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ فَكَانُوْا رُسُلًا إِلَيْنَا أَوْ نَرٰى رَبَّنَا ط فَيُخْبِرُنَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ تَعَالٰى لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا فِيْ شَأْنِ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا طَغَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا . بِطَلَبِهِمْ رُؤْيَةَ اللّٰهِ فِي الدُّنْيَا وَعَتَوْا بِالْوَاوِ عَلٰى أَصْلِهِ بِخِلَافِ عُتِيَ بِالْإِبْدَالِ فِيْ مَرْيَمَ .

২১. যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, পুনরুত্থানকে ভয় পায় না আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন। তারা আমাদের নিকট রাসূল হতেন। অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? অতঃপর তিনি আমাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দিবেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে নিজেদের ব্যাপারে অহমিকায় লিপ্ত। এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছে গুরুতররূপে। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়ে। عَتَوْا ফে'লটি وَاوْ সহ মূল অবস্থায় রয়েছে। তবে সূরা মারইয়ামের عُتِيَ শব্দটি এর বিপরীত। সেখানে يَاءْ টি وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

২২. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ فِيْ جُمْلَةِ الْخَلَائِقِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَنَصْبُهُ بِأُذْكُرْ مُقَدَّرًا لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ أَيِ الْكَافِرِيْنَ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمُ الْبُشْرٰى بِالْجَنَّةِ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا . عَلٰى عَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ شِدَّةٌ أَيْ عَوْذًا مَعَاذًا يَسْتَعِيْذُوْنَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ .

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে অন্যান্য সকল সৃষ্টির সাথে কিয়ামতের দিন। يَوْمَ শব্দটি اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য। মুমিনগণ এর ব্যতিক্রম, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ থাকবে। এবং তারা বলবে, রক্ষা কর রক্ষা কর! দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী। যখন তাদের উপর বিপদ এসে পড়ত। অর্থাৎ বাঁচাও! বাঁচাও! তারা ফেরেশতাদের থেকে আশ্রয় কামনা করবে।

২৩. قَالَ تَعَالٰى وَقَدِمْنَا عَمَدْنَا إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ وَقِرٰى ضَيْفٍ وَإِغَاثَةِ مَلْهُوْفٍ فِي الدُّنْيَا فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا .

২৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব ভালো কাজের প্রতি, যেমন দান সদকা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অতিথিপরায়ণতা এবং পৃথিবীতে বিপদগ্রস্তের প্রতি সাহায্য সহানভূতি করা। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

هُوَ مَا يُرَى فِي الْكُوَى الَّتِي عَلَيْهَا الشَّمْسُ كَالْغُبَارِ الْمُفَرَّقِ أَيْ مِثْلَهُ فِي عَدَمِ النَّفْعِ بِهِ إِذْ لَا ثَوَابَ فِيهِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَيُجَازُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا .

অনুবাদ :

আর তা হলো যা দেখা যায় এমন ছিদ্রে, যাতে সূর্যের কিরণ নিপতিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায়। অর্থাৎ তার মতো অনুপকারী। যেহেতু শর্ত তথা ঈমান না থাকার কারণে এতে কোনোরূপ ছওয়াব পাওয়া যায় না, তবে এর কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়।

২৪. اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَاَحْسَنُ مَقِيْلًا . مِنْهُمْ أَيْ مَوْضِعَ قَائِلَةٍ فِيْهَا وَهِيَ الْاِسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ فِي الْحَرِّ وَأُخِذَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْقِضَاءُ الْحِسَابِ فِيْ نِصْفِ نَهَارٍ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ .

২৪. জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে সেদিন কিয়ামতের দিন উৎকৃষ্ট বাসস্থান দুনিয়ার কাফেরদের চেয়ে এবং বিশ্রামস্থল মনোরম তাদের থেকে। অর্থাৎ জান্নাতে কায়লূলা করার স্থান, আর তা হলো গ্রীষ্মের দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করা। আর এ থেকে (اَحْسَنُ مَقِيْلًا) গৃহীত হয়েছে দ্বি-প্রহরে হিসাব শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২৫. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ أَيْ كُلُّ سَمَاءٍ بِالْغَمَامِ أَيْ مَعَهُ وَهُوَ غَيْمٌ اَبْيَضُ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَنْزِيْلًا . هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَنَصَبُهُ بِاُذْكُرْ مُقَدَّرًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ شِيْنِ تَشَّقَّقُ بِادْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ فِيْهَا وَفِيْ اُخْرٰى نُنْزِلُ بِنُوْنَيْنِ الثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ وَضَمِّ اللَّامِ وَنَصْبِ الْمَلَائِكَةِ .

২৫. আর সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আকাশ [মেঘপুঞ্জসহ] অর্থাৎ তার সাথে, আর غَمَامٌ হলো সাদা মেঘ। এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে প্রতিটি আসমান থেকে, আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। আর يَوْمَ শব্দটি উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। অন্য কেরাতে شِيْن বর্ণটি তাশদীদযুক্ত রয়েছে। তখন تَاءٌ -কে شِيْن -এ পরিবর্তন করে شِيْن -কে شِيْن -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অপর কেরাতে نُنْزِلُ [বাবে اِفْعَالٌ হতে] দু' نُوْن -সহ এবং দ্বিতীয়টি সাকিনযুক্ত, لَام পেশযুক্ত এবং اَلْمَلَائِكَةُ মাফঊল হিসেবে নসবযুক্ত হয়েছে।

২৬. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط لَا يُشْرِكُهُ فِيْهِ اَحَدٌ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا . بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

২৬. সেদিন কর্তৃত্ব হবে বস্তুত দয়াময়ের তাতে কেউই তাঁর অংশীদার থাকবে না এবং কাফেরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। মুমিনগণের বিপরীত।

২৭. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ الْمُشْرِكُ عُقْبَةُ بْنُ اَبِيْ مُعَيْطٍ كَانَ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ رِضَاءً لِاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ عَلٰى يَدَيْهِ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ مُحَمَّدٍ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْهُدٰى .

২৭. জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, জালিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিক উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত। প্রথমে সে কালেমায়ে শাহাদত পড়েছিল পরবর্তীতে উবাই ইবনে খলফের মনতুষ্টির জন্য ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে। হায়! يَا টি সতর্কীকরণের জন্য যদি রাসূলের সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম হেদায়েতের পথ।

অনুবাদ :

٢٨. يٰوَيْلَتٰى اَلِفُهٗ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ اَىْ وَيْلَتِىْ وَمَعْنَاهُ هَلَكَتِىْ لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا اَىْ اُبَيًّا خَلِيْلًا ـ

২৮. হায় দুর্ভোগ আমার! يٰوَيْلَتٰى -এর اَلِفٌ ইযাফতের يَاءٌ -এর পরিবর্তে এসেছে অর্থাৎ وَيْلَتِىْ অর্থ হলো হায় আমার ধ্বংস আমি যদি অমুককে উবাই ইবনে খলফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

٢٩. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ اَىِ الْقُرْاٰنِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ ط بِاَنْ رَدَّنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ قَالَ تَعَالٰى وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ الْكَافِرِ خَذُوْلًا ـ بِاَنْ يَتْرُكَهٗ وَيَتَبَرَّءَ مِنْهُ عِنْدَ الْبَلَاءِ ـ

২৯. আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর অর্থাৎ কুরআন আসার পর। এভাবে যে, সে আমাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক কাফেরের জন্য এভাবে যে, বিপদের সময় তাকে ত্যাগ করে ও তার থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে।

٣٠. وَقَالَ الرَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ قُرَيْشًا اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا مَتْرُوْكًا ـ

৩০. রাসূল ﷺ বললেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো কুরাইশ গোত্র এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।

٣١. قَالَ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ كَمَا جَعَلْنَا لَكَ عَدُوًّا مِنْ مُشْرِكِىْ قَوْمِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ قَبْلَكَ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط الْمُشْرِكِيْنَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا لَكَ وَنَصِيْرًا نَاصِرًا لَكَ عَلٰى اَعْدَائِكَ ـ

৩১. আল্লাহ তা'আলা বলেন– এভাবেই যেভাবে আপনার শত্রু বানিয়েছি আপনার মুশরিক সম্প্রদায় থেকে। প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অপরাধীদেরকে মুশরিকদেরকে। সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেভাবে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। আপনার জন্য আপনার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। আপনার শত্রুর মোকাবেলায় আপনার জন্য সাহায্যকারী রূপে।

٣٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ قَالَ تَعَالٰى نَزَّلْنَاهُ كَذٰلِكَ ج اَىْ مُتَفَرِّقًا لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ نُقَوِّىْ قَلْبَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ـ اَىْ اَتَيْنَا بِهٖ شَيْئًا بِتَمَهُّلٍ وَتُؤَدَّةٍ لِيَتَيَسَّرَ فَهْمُهٗ وَحِفْظُهٗ ـ

৩২. কাফেররা বলে, সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলো না কেন? তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর -এর ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি এটাকে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি অল্প অল্প করে আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য। আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করার জন্য। এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি। অর্থাৎ একটার পর একটা বিলম্বের সাথে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তা স্মরণ রাখা ও বুঝা সহজ হয়।

অনুবাদ :

৩৩. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ فِي إِبْطَالِ أَمْرِكَ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ الدَّافِعِ لَهُ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا بَيَانًا هُمْ .

৩৩. তারা আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত করে না আপনার বিষয়টিকে রহিত করার জন্য যার সঠিক সমাধান তার প্রতিরোধক ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি। তাদের বিবরণ।

৩৪. اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ أَيْ يُسَاقُونَ إِلٰى جَهَنَّمَ لا أُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا هُوَ جَهَنَّمُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا . أَخْطَأُ طَرِيقًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ .

৩৪. যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলাবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। তারা স্থানের দিক দিয়ে অধিক নিকৃষ্ট আর তা হলো জাহান্নাম এবং অধিক পথভ্রষ্ট। অন্যদের তুলনায় অধিক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। আর তা হলো তাদের কুফরি বা সত্য প্রত্যাখ্যান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يَخَافُونَ : এটা তাহামার ভাষায় لَا يَرْجُوْنَ -এর ব্যাখ্যা, তবে এটাকে তার প্রকৃতার্থে ব্যবহার করাই উত্তম। এ সময় অর্থ হবে- لَا يَأْمَلُوْنَ لِقَاءَ مَا وَعَدْنَا عَلَى الطَّاعَةِ مِنَ الثَّوَابِ আর এটা স্পষ্ট যে, যে ছওয়াবের আশা রাখে না, সে আজাবেও ভয় পায় না। لَقَدِ اسْتَكْبَرَ -এর মধ্যকার لَامْ টি কসমিয়া

قَوْلُهُ وَعَتَوْا عَلٰى اَصْلِهٖ : অর্থাৎ এটা এর মূল অবস্থায় রয়েছে। وَاوْ -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়নি। পক্ষান্তরে সূরা মারইয়ামে আয়াতের ছন্দ ঠিক রাখার লক্ষ্যে وَاوْ -কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بُشْرٰى : এ বাক্যটি উহ্য قَوْلٌ -এর مَعْمُوْلٌ অর্থাৎ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ يَقُوْلُوْنَ لَا بُشْرٰى

قَوْلُهُ حِجْرًا : এ শব্দটি মাসদার, ক্ষমাপ্রার্থনা অর্থে। আর مَحْجُوْرًا হলো তার তাকিদ। যেমন- আরবরা বলে থাকে- اَلْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ অথবা, বলে- حَرَامٌ

قَوْلُهُ عَمَدْنَا : এখানে قَدِمْنَا -এর তাফসীর عَمَدْنَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো قُدُوْمٌ -এর اِطْلَاقْ আল্লাহ তা'আলার উপর বৈধ নয়। কেননা قُدُوْمٌ টা جِسْمَاتْ -এর সিফত, আর আল্লাহ হলেন দেহমুক্ত।

قَوْلُهُ مَلْهُوْفٌ : এর অর্থ- অত্যাচারিত, ফরিয়াদকারী।

قَوْلُهُ كُوٰى : كَافْ -এর উপর যবর ও পেশ যে কোনোটি বৈধ। এমন ছিদ্র যার দ্বারা সূর্যের আলোক-রশ্মি প্রবেশ করে।

قَوْلُهُ هَبَاءً : এটা এমন সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র কণা যা ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশকারী আলোক-রশ্মির মধ্যে উড়তে দেখা যায়। তবে হাত দ্বারা তা ধরা বা অনুভব করা সম্ভব হয় না।

قَوْلُهُ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا مِّنَ الْكَافِرِيْنَ : অর্থাৎ বেহেশতে মুমিনগণের অবস্থানস্থল দুনিয়ার কাফেরদের অবস্থানস্থল থেকে বহু উন্নত। এখানে خَيْر اِسْمُ تَفْضِيْل নিজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا বলে ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা যেন ঐ প্রশ্নের উত্তর যে, দোজখীদের অবস্থানস্থল তথা দোজখে কোনো মঙ্গল নেই। কিন্তু خَيْر اِسْمُ تَفْضِيْل দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের অবস্থানস্থল ও মঙ্গলজনক হবে। তবে তা বেহেশতীদের তুলনায় নিম্নমানের হবে। অথবা এর উদ্দেশ্য হবে যে, مُسْتَقَرٌّ তথা আবসস্থল দ্বারা উভয় পক্ষের পরকালের আবাসস্থল উদ্দেশ্য এ সময় خَيْر -এর তুলনাবাচক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না; বরং কাফেরদেরকে ধমক ও আজাবের হুমকি দেওয়া উদ্দেশ্য হবে। এ বাক্যটি আরবদের উক্তি- اَلْعَسَلُ اَحْلٰى مِنَ الْخَلِّ [মধু সিরকা অপেক্ষা মিষ্ট] -এর অন্তর্গত হবে। অথচ সিরকার মধ্যে কোনো মিষ্টতা থাকে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, اِسْمُ تَفْضِيْل দ্বারা সব সময় তুলনাবাচক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

قَوْلُهُ اَخْذ مِنْ ذٰلِكَ الخ : অর্থাৎ اَحْسَنُ مَقِيْلاً দ্বারা একথা বুঝে আসে যে, হাশরের ময়দানে দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। কেননা বেহেশতে আরামের জন্য مَقِيْلاً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর এর অর্থ হলো- দুপুরে আহার করার পর বিশ্রাম নেওয়া। অতএব বুঝা গেল যে, দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীগণ দোজখে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। যদিও এ অর্ধদিন মুমিনদের জন্য এক নামাজের সময় পরিমাণ হবে, আর কাফেরদের নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হবে।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ : এখানে يَوْمَ শব্দটি উহ্য اُذْكُرْ-এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। كُلُّ سَمَاءٍ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلسَّمَاءُ-এর মধ্যে اَلْ টি اِسْتِغْرَاق-এর জন্য। আর مَعَهُ দ্বারা ইশারা করেছেন যে, بَا টি مَعَ অর্থে। তবে এটা সববিয়া এবং عَنْ অর্থেও হতে পারে।

قَوْلُهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ : اَلْمُلْكُ হলো مُبْتَدَأٌ , اَلْحَقُّ হলো صِفَتْ আর اَلرَّحْمٰنُ হলো خَبَرْ অর্থাৎ- اَلْمُلْكُ الثَّابِتُ الَّذِىْ لَا يَزُوْلُ لِلرَّحْمٰنِ يَوْمَئِذٍ ; ব্যাখ্যাকার (র.) জালিমের ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ মুশরিক ওকবা ইবনে আবী মুঈত দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতটি এ বিশেষ মুশরিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ : বাক্যটি يَعَضُّ-এর যমীরের حَالْ হয়েছে। এখানে يَا হলো তাম্বীহ বা সতর্ক করার জন্য, نِدَا আহবানের উদ্দেশ্য নয়। কেননা মুনাদা اِسْم হওয়া শর্ত, আর যদি نِدَا জন্য মেনে নেওয়া হয় তাহলে نِدَا-কে বিলোপ মানতে হবে। অর্থাৎ- يَا قَوْم

قَوْلُهُ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ : এখানেও لَامْ টি কসমিয়া। অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, বাক্যটি مُسْتَانِفَةٌ , এখানে জালিমের উক্তি اِذْ جَائَنِىْ দ্বারা শেষ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا نُزِّلَ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً : এখানে نُزِّلَ ক্রিয়াটি اُنْزِلَ অর্থে। কেননা نُزِّلَ-এর অর্থ হলো অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা। আর اُنْزِلَ-এর অর্থ হলো একই সঙ্গে অবতীর্ণ করা। সুতরাং نُزِّلَ এবং جُمْلَةً وَّاحِدَةً-এর মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। এ জন্য বলতে হবে যে, نُزِّلَ ক্রিয়াটি اُنْزِلَ অর্থে كَذٰلِكَ نَزَّلْنَا এখানে نَزَّلْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, كَذٰلِكَ এটা উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل , لِنُثَبِّتَ بِهٖ দ্বারা কুরআনকে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ করার তিনটি রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَحْسَنَ : এর عَطْف হলো اَلْحَقُّ-এর উপর। শব্দটি مَحَلّ হিসেবে مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ : এটা هُمْ উহ্য مُبْتَدَأ-এর خَبَرْ , যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন করা হতো, তার জবাব দেওয়া হয়েছে এবং কাফেররা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন করতো, তার উপর সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আরো প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।
যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা করে না, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের হিসেব দিতে হবে- একথাও মানে না, তারাই নিজেদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রয়েছে। তাদের দৌরাত্ম্য এবং ধৃষ্টতার কোনো সীমা নেই। তাই তারা বলে, যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর সত্য নবী হন, তবে আমাদের নিকট আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য কেন প্রদান করে না? অথবা স্বয়ং আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখা দিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সত্যতার কথা যদি ঘোষণা করতেন, তবে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতাম। যেহেতু আমাদের নিকট ফেরেশতা আসেন না এবং আল্লাহ পাকের দীদারও হয় না, তাই তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। মূলত তারা নিজেকে অনেক বড় মনে করে, তাই তারা এসব অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অসুন্দর কথা বলছে এবং নিজেদেরকে পাপাচারে লিপ্ত রেখেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا.

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا : رَجَا শব্দের সাধরণ অর্থ কোনো প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোনো কোনো সময় এটা আশঙ্কা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। -[কিতাবুল আজদাদ : ইবনুল আম্বারী] এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সে-ই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, সে ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলি সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকর আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

قَوْلُهُ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا : حِجْر -এর শাব্দিক অর্থ- সুরক্ষিত স্থান। مَحْجُوْرًا -এর তাকিদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয়- আশ্রয় চাই! আশ্রয় চাই! অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামেতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আজাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ- حَرَامًا مُحَرَّمًا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আজাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা তাদের উক্তির জবাবে- حِجْرًا مَحْجُوْرًا বলবে। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا : مُّسْتَقَرًّا শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مَقِيْل শব্দটি قَيْلُوْلَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مَقِيْل -এর উল্লেখ সম্ভবত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দ্বিপ্রহরে সময় সৃষ্টজীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ : এখানে بِالْغَمَامِ -এর অর্থ مِنَ الْغَمَامِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا : এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনা এই ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোনো সফর থেকে ফিরে এলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক, ইবাদতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ট বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হলো। ওকবা ওজর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোতুষ্টির জন্য এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল, আমি তোমার এই ওজর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত করছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধ নিহত হয়। -[বগভী] পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা পরকালের শাস্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। -[মাযহারী ও কুরতুবী]

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فُلَانًا [অমুক] শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্বলিত হয় এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলিতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلْ مَالَكَ اِلَّا تَقِيٌّ কোনো অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ [বন্ধুত্বের দিক দিয়ে] যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ প্রত্যেক মানুষ [অভ্যাসগতভাবে] বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। -[বুখারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন- مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللّٰهِ رُؤْيَتُهٗ وَزَادَ فِيْ عِلْمِكَ مَنْطِقُهٗ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهٗ অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا : অর্থাৎ রাসূল ﷺ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, নাকি এই দুয়িাতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং এর জবাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কুরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গাম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমতো তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّقَ مُصْحَفَهٗ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهٖ يَقُوْلُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اِنَّ عَبْدَكَ هٰذَا اتَّخَذَنِيْ مَهْجُوْرًا فَاقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে; কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমতো তেলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলিও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ الخ : সূরার শুরু থেকে কাফের ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জবাব দেওয়া হচ্ছিল। এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জবাবে কুরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতরণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। যথা- ১. এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাজিল হয়ে গেল এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনোরূপ পেরেশানী থাকে না। ২. কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোনো অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্য কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাজিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা-বাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরি ছিল না। ৩. আল্লাহ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং এর আরো অনেক রহস্য আছে।

অনুবাদ :

٣٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ج مُعِيْنًا .

৩৫. আমি তো হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত এবং তার সাথে তাঁর ভ্রাতা হযরত হারুন (আ.)-কে করেছিলাম সাহায্যকারী।

٣٦. فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اَىِ الْقِبْطِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ فَذَهَبَا اِلَيْهِمْ بِالرِّسَالَةِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا . اَهْلَكْنَاهُمْ اِهْلَاكًا .

৩৬. আমি বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নির্দশনাবলিকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ কিবতীদের নিকট, তারা ফেরাউন বংশীয় লোক ছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের নিকট রিসালতের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে পুরোপুরি বিনাশ করে ফেললাম।

٣٧. وَ اذْكُرْ قَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ بِتَكْذِيْبِهِمْ نُوْحًا لِطُوْلِ لُبْثِهٖ فِيْهِمْ فَكَاَنَّهٗ رُسُلٌ اَوْ لِاَنَّ تَكْذِيْبَهٗ تَكْذِيْبٌ لِبَاقِى الرُّسُلِ لِاِشْتِرَاكِهِمْ فِى الْمَجِيْئِ بِالتَّوْحِيْدِ اَغْرَقْنٰهُمْ جَوَابُ لَمَّا وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ بَعْدَهُمْ اٰيَةً عِبْرَةً وَاَعْتَدْنَا فِى الْاٰخِرَةِ لِلظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا . مُؤْلِمًا سِوٰى مَا يَحُلُّ بِهِمْ فِى الدُّنْيَا .

৩৭. এবং স্মরণ করুন হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। কিংবা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়ার মাধ্যমে অবশিষ্ট রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ তাওহীদের বাণী আনয়নে সকলেই অংশীদার দিলেন। তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এটা لَمَّا -এর জবাব। এবং তাদেরকে মানব জাতির জন্য তাদের পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম শিক্ষণীয় উপদেশ। আর আমি প্রস্তুত রেখেছি পরকালে জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে তাদের উপর যে শাস্তি আপতিত হয়েছে তা ব্যতিরেকে।

٣٨. وَ اذْكُرْ عَادًا قَوْمَ هُوْدٍ وَّثَمُوْدَ قَوْمَ صَالِحٍ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ اِسْمِ بِئْرٍ وَنَبِيُّهُمْ قِيْلَ شُعَيْبٌ وَقِيْلَ غَيْرُهٗ كَانُوْا قُعُوْدًا حَوْلَهَا فَانْهَارَتْ بِهِمْ وَبِمَنَازِلِهِمْ وَقُرُوْنًا اَقْوَامًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا . اَىْ بَيْنَ عَادٍ وَّاَصْحٰبِ الرَّسِّ .

৩৮. এবং স্মরণ করুন, আমি ধ্বংস করেছিলাম আদকে হযরত হূদ (আ.)-এর জাতি। এবং ছামূদকে হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। এবং রাস্‌স -এর অধিবাসীকে رَسّ একটি কূপের নাম। তাদের নবী হলেন কারো কারো মতে হযরত শুয়াইব (আ.), আবার কারো মতে অন্য কেউ। তারা এই কূপের চতুষ্পার্শ্বে বসবাস করত। তাদের এবং তাদের বাড়ি ঘরের সাথে এ কূপকেও ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও অর্থাৎ আদ এবং রাস্‌স -এর অধিবাসীদের মাঝে।

অনুবাদ :

٣٩. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ فِيْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ نُهْلِكْهُمْ اِلَّا بَعْدَ الْاِنْذَارِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ـ اَهْلَكْنَا اِهْلَاكًا بِتَكْذِيْبِهِمْ اَنْبِيَاءَ هُمْ ـ

৩৯. আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম তাদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন না করে আমি ধ্বংস করিনি। আর তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম সমূলে ধ্বংস করেছিলাম, তাদের নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার করার কারণে।

٤٠. وَلَقَدْ اَتَوْا مَرُّوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ مَصْدَرُ سَاءَ اَىْ بِالْحِجَارَةِ وَهِىَ عُظْمٰى قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ فَاَهْلَكَ اللّٰهُ اَهْلَهَا لِفِعْلِهِمُ الْفَاحِشَةَ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا فِىْ سَفَرِهِمْ اِلَى الشَّامِ فَيَعْتَبِرُوْنَ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ نُشُوْرًا ـ بَعْثًا فَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

৪০. তারা তো যাতায়াত করে অতিক্রম করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সেই জনপদ দিয়েই, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি। اَلسَّوْءِ শব্দটি سَاءَ -এর মাসদার। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি। আর উক্ত জনপদটি ছিল হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ জনপদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের অশ্লীল কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তবে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করে না? তাদের শামের যাত্রাপথে। ফলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি تَقْرِيْر তথা জিজ্ঞাসাটির বিষয়বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত তারা পুনরুত্থানের আশঙ্কা করে না ভয় করে না। ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

٤١. وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ مَا يَتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط مَهْزُوًّا بِهِ يَقُوْلُوْنَ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ـ فِىْ دَعْوَاهُ مُحْتَقِرِيْنَ لَهُ عَنِ الرِّسَالَةِ ـ

৪১. তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে। তারা বলে, এই-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাঁর দাবির ক্ষেত্রে। বস্তুত তারা রিসালতের বিষয়ে তাঁকে হেয় করার ছলে এমন বলত।

٤٢. اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهُ كَادَ لَيُضِلُّنَا يَصْرِفُنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط لَصَرَفْنَا عَنْهَا قَالَ تَعَالٰى وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ عِيَانًا فِى الْاٰخِرَةِ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ـ اَخْطَأُ طَرِيْقًا اَهُمْ اَمِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

৪২. اِنْ -টি ثَقِيْلَةٌ থেকে خَفِيْفَةٌ -এ রূপান্তরিত হয়েছে, এর اِسْم উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّهُ সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম নিশ্চিতরূপে সে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন অচিরেই তারা জানবে যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে পরকালে চাক্ষুষ দেখবে কে অধিক পথভ্রষ্ট অধিক বিভ্রান্ত পথ অনুসরণে তারা নাকি মুমিনগণ?

অনুবাদ :

٤٣. اَرَاَيْتَ اَخْبِرْنِىْ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰىهُ ط اَىْ مَهْوِيَّهُ قُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ لِاَنَّهُ اَهَمُّ وَجُمْلَةُ مَنِ اتَّخَذَ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ لِرَاَيْتَ وَالثَّانِىْ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ـ حَافِظًا تَحْفَظُهُ عَنْ اِتِّبَاعِ هَوَاهُ لَا ـ

৪৩. আপনি কি দেখেন না আমাকে অবহিত করুন তার সম্পর্কে যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে মনের চাহিদাকে। এখানে اِلٰهَهُ দ্বিতীয় মাফঊলকে অগ্রে আনা হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে। আর مَنِ اتَّخَذَ বাক্যটি হলো প্রথম মাফঊল رَاَيْتَ ফে'লের। আর اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا হলো দ্বিতীয় মাফঊল। তবুও কি আপনি তার কর্মবিধায়ক হবেন? অর্থাৎ তাকে তার কু-রিপুর অনুসরণ হতে রক্ষার জিম্মাদার হবেন? না, আদৌ নয়।

٤٤. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط مَا تَقُوْلُ لَهُمْ اِنْ مَا هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ـ اَخْطَأُ طَرِيْقًا مِنْهَا لِاَنَّهَا تَنْقَادُ لِمَنْ يَتَعَهَّدُهَا وَهُمْ لَا يُطِيْعُوْنَ مَوْلَاهُمُ الْمُنْعِمَ عَلَيْهِمْ ـ

৪৪. আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে বুঝার জন্য শোনে অথবা অনুধাবন করে আপনি যা তাদেরকে বলেন এরাতো পশুর মতোই; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। এর চেয়েও আরো অধিক বিভ্রান্ত। কারণ তারা যাদের রাখালী করে তারা তাদের আনুগত্য করে; কিন্তু এরা তাদের অনুগ্রহশীল মনিবের আনুগত্য করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اَىْ وَبِاللّٰهِ لَقَدْ اٰتَيْنَا : অর্থাৎ এখানে وَاوْ টি قَسَمِيَّةٌ , وَزِيْرًا শব্দটি وِزْرٌ-এর صِفَتْ مُشَبَّهْ অর্থ সাহায্যকারী।

قَوْلُهُ اَىِ الْقِبْطِ : اَلْقِبْطِ শব্দটি اَلْقَوْمَ থেকে بَدَلْ হওয়ার কারণে مَجْرُوْرٌ হয়েছে। فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ হলো قِبْطِ-এর বিবরণ।

قَوْلُهُ فَدَمَّرْنَاهُمْ : এর عَطْف হলো উহ্য فَذَهَبَا اِلَيْهِمْ-এর উপর। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন। তিনি قَوْمَ نُوْحٍ-কে اُذْكُرْ উহ্য فِعْلٌ-এর مَفْعُوْلٌ সাব্যস্ত করেছেন, আর لَمَّا شَرْطِيَّةٌ ধরে اَغْرَقْنٰهُمْ-কে جَوَابُ شَرْطٍ স্থির করেছেন। لَمَّا কে যদি ظَرْفِيَّةٌ গণ্য করা হয়, তখন এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বাক্যটি এমন হবে– اَغْرَقْنَا قَوْمَ نُوْحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ আর شَرْطِيَّةٌ গণ্য করলে مَا اُضْمِرَ-এর অন্তর্গত হবে না। কেননা لَمَّا-এর جَوَابْ-এরও জন্য مُفَسِّرٌ হয় না। –[জুমাল]

قَوْلُهُ لِطُوْلِ لُبْثِهِ فِيْهِمْ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি নিম্নরূপ–

প্রশ্ন : كَذَّبُوا الرُّسُلَ-এর মধ্যে رُسُلْ কে বহুবচন আনা হলো কেন? অথচ হযরত নূহ (আ.) ছিলেন তো একজন। ব্যাখ্যাকার এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

উত্তর : ১. হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সময়কাল এত দীর্ঘ ছিল যে, এ সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসূল আসতে পারতেন। সুতরাং যেন কালের দিক দিয়ে লক্ষ্য করে হযরত নূহ (আ.)-কে কয়েক নবীর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে।

২ সকল নবী তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ছিলেন। এটা সকল নবীর সামাগ্রিক মাসআলা। সুতরাং একজনকে এ বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তা সকল নবীগকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ لِلظّٰلِمِيْنَ وَضْعَ الظَّاهِرِ الخ : অর্থাৎ এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচারের বিষয়কে জোরদার করার জন্য, অন্যথায় وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ বলা যথেষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ وَكُلًّا : এটা উহ্য عَامِلْ -এর কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। এটা مَا اُضْمِرَ -এর অন্তগত। এর পূর্বে ضَرَبْنَا -এর সমার্থক কোনো فِعْل উহ্য রয়েছে। যেমন- اَنْذَرْنَا كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ

قَوْلُهُ الْاَمْثَالُ : اَمْثَالْ এমন ঘটনা ও কাহিনীকে বলা হয় যা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ততুল্য।

قَوْلُهُ مَرُّوْا : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দ্বারা একটি প্রশ্নের নিরসন করেছেন। প্রশ্নটি নিম্নরূপ-

প্রশ্ন : اَتَوْا ক্রিয়াটি নিজেই مُتَعَدِّىْ হয়। অথবা কখনও এর পরে اِلٰى আসে, অথচ এখানে عَلٰى ব্যবহৃত হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর : اَتَوْا ক্রিয়াটি مَرُّوْا -এর অর্থবিশিষ্ট। অতএব, এরপরে عَلٰى আসা সঙ্গত আছে।

قَوْلُهُ مَطَرَ السَّوْءِ : এটা اَمْطَرَتْ -এর مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ এটা اَلْاِمْطَارُ অর্থে, বাক্যটি এমন ছিল- اَمْطَرَتِ الْقَوْمَ رَمَيْتُ بِالْحِجَارَةِ -এর অর্থ- পাথরকণা, অর্থাৎ- مَطَرُ السَّوْءِ ; سَوْء

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا بِهِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, هُزُوًا টি مَفْعُوْل অর্থে।

قَوْلُهُ لَصَرَفْنَا عَنْهَا : এটা لَوْلَا -এর جَوَابْ যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا : مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّةْ، مُبْتَدَأْ আর اَضَلُّ হলো خَبَرْ এবং سَبِيْلًا হলো তার তমীয। এসব মিলে বাক্য হয়ে يَعْلَمُوْنَ -এর দুই مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। يَعْلَمُوْنَ -কে আমল থেকে বিরত রাখা হয়েছে, যাতে مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّةْ -এর صَدَارَتْ বাতিল না হয়।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتَ اَخْبِرْنِىْ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ : গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় مَفْعُوْل -কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত مَنِ اتَّخَذَ هَوٰهُ اِلٰهًا ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতায় যাদের সন্দেহ ছিল, এ পর্যায়ে যারা বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে পূর্বকালের কয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাঁদেরকে তাঁদের জাতি অবিশ্বাস করেছিল, এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ বর্ণনা দ্বারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য, যারা প্রিয়নবী ﷺ -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করে। আলোচ্য ঘটনাসমূহে বিশেষ শিক্ষাণীয় বিষয় রয়েছে, এ পর্যায়ে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا

অর্থাৎ আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার ভাই হারূনকে তার সাহায্যকারী বানিয়েছি।" আল্লাহর একত্ববাদের উজ্জ্বল দলিল প্রমাণসহ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ.)-কে সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করেন, যাতে করে তারা দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন, হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।

قَوْلُهُ فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ الخ : সমগ্র সৃষ্টিজগতে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তাওহীদের নিদর্শনসমূহ বিরাজমান রয়েছে, তারা তা দেখেও দেখে না এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করে না; বরং তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে, দেব-দেবীর পূজা করে। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে লক্ষ্য করে

বলেন, তোমরা তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাও, শিরক ও মূর্তিপূজা পরিহার করার শিক্ষা দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتِنَا শব্দটির আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হলো তারা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাসমূহকে অস্বীকার করত, তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا : হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণের পর তাঁরা যখন তাদেরকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানায়, তখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাই তারা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, অবশেষে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হয়, ঠিক এভাবেই যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলকে অস্বীকার করে, তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয়, তারা যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে পারে। অতএব, হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তকে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ।–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৪৫১]

قَوْلُهُ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ : হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সকল নবীকে অস্বীকার করা হয়, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে اَلرُّسُلُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো এই, যদি তাদের নিকট সমস্ত নবী রাসূলগণকেও প্রেরণ করা হতো, তবে তারা তাঁদেরকেও অস্বীকার করত। অবশ্য এ বাক্যটির অর্থ এই নয়, যে তাদের নিকট অনেক রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তাদের নিকট শুধু হযরত নূহ (আ.)-কেই প্রেরণ করা হয়, যিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দীনের তাবলীগ করেছেন, সত্য গ্রহণের জন্যে তিনি তাদেরকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে ঐতিহাসিক তরী নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের মাঝ থেকে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে। তাঁর তরীতে আরোহণ করে মাত্র ৪০ জোড়া মানুষ। আর অবশিষ্ট সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক প্রলয়ংকরী প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। হযরত নূহ (আ)-এর তরীতে যারা আরোহণ করছিল, তাদের ব্যতীত তদানীন্তন পৃথিবীতে আর একটি মানুষও বেঁচে থাকেনি, এভাবে পাপিষ্ঠরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব, হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতা কর, তবে তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

قَوْلُهُ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ : অর্থাৎ "আর আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামুদ এবং কূপের অধিবাসী লোকদেরকে। বর্ণিত আছে যে, আজরবাইজানের মরুভূমিতে একটি কূপ রয়েছে, সেই কূপের চারিপার্শ্বে যারা বাস করতো, তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। অথবা এর অর্থ হলো রস্ নামক মরুভূমির অধিবাসী। এ শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা ঐ কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দাফন করেছিল। তাদের নিকট প্রেরিত নবীর নাম ছিল হানজালা সানআনী। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আসহাবুর রস" শব্দটি দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ.) -এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় একটি কূপের পার্শ্বে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এরা চতুষ্পদ জন্তু পালন করত এবং মূর্তিপূজা করত। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত শুয়াইব (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করলেন; কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিল না; বরং হযরত শুয়াইব (আ.)-কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের ঐ জমিন ধ্বসে গেল এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ বিবরণ পেশ করেছেন ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.)। ইবনে জরীর এবং ইবনে আসাকির (র.) হযরত কাতাদা (র.)-এর সূত্রে এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কূপের কথা বলা হয়েছে, তা ইয়ামামা নামক এলাকায় ছিল। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করেছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, ঐ সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, একটি বিপদে পড়েছিল। একটি পাখী যার ঘাড় অনেক লম্বা ছিল, তাকে 'আনকা' বলা হতো। ঐ পাখীটি মাঝে মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নিকট প্রেরিত নবী হানজালাহ ঐ পাখীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। ফলে 'আনকা' নামক পাখীটি বজ্রপাতে ধ্বংস হলো; কিন্তু এরপর ঐ সম্প্রদায় তাদের নবীকে শহীদ করল। পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আজাব নাজিল হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হলো।

তাফসীরকার কাব (র.) মোকাতেল (র.) এবং সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেছেন 'রস' কূপটি ছিল ইনতাকিয়া নামক স্থানে, লোকেরা হাবীব ইবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ঐ কূপে নিক্ষেপ করে। হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কথা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে 'আসহাবুর রস' বলা হয়েছে, তারা আসহাবুল ওখদুদ, এরা সেই জালেম সম্প্রদায় যারা মুমিনদেরকে ধ্বংস করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছিল। তাদের কথা সূরা বুরুজে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا : আলোচ্য আয়াতের قُرُوْنٌ শব্দটি قَرْنٌ শব্দের বহুবচন অর্থাৎ আদ জাতি, সামুদ জাতি সহ পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ছাড়াও যুগে যুগে বহু জাতিকে তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। قَرْنٌ শব্দটি প্রিয়নবী ﷺ -এর একখানি হাদীসেও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

অর্থাৎ, সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপর পরবর্তী যুগ, এরপর পরবর্তী যুগ। অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগ হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগ, এরপর যাঁরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছেন অর্থাৎ তাবেয়ীনদের যুগ, এরপর যারা তাবেয়ীনদের দেখেছেন, অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনদের যুগ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কত বছরকে এক قَرْنٌ বলা হয়? এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছরের সময়কে এক قَرْنٌ বলা হয়। কারো কারো মতে, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর। আর কারো মতে, সত্তর বছর, আর কারো মতে, নব্বই বছর, আর কারো কারো মতে, একশত বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কে قَرْنٌ বলা হয়। তবে সঠিক মত হলো এই, এক শতাব্দীকেই قَرْنٌ বলা হয়। কেননা প্রিয়নবী ﷺ একটি শিশুর জন্যে দোয়া করেছিলেন, সে যেন এক قَرْنٌ পর্যন্ত বাঁচে। ঐ শিশুটি একশত বছর বেঁচেছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এক শতাব্দীকে قَرْنٌ বলা হয়। আয়াতের মর্মকথা হলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) থেকে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া পর্যন্ত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অনেক কাফের মুশরিককে তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করা হয়।

قَوْلُهُ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا : আল্লাহ পাক হঠাৎ কোনো জাতিকে ধ্বংস করেন না; বরং তাদের নিকট নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে সত্য গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে শিক্ষণীয় ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যখন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রাসূলগণকে অমান্য করেছে, সত্যের বিরোধিতায় তৎপর হয়েছে, জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাতে সীমা লঙ্ঘন করেছে, তখন আল্লাহ পাকের আজাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

তাফসীরকার জুযাজ (র.) বলেছেন, কোনো জিনিসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলাকে تَتْبِيْر বলা হয়। আর স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডকে تِبْر বলা হয়।

যাহোক, পূর্বকালের এসব ঘটনার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যারা প্রিয়নবী ﷺ -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অমান্য করে, তারা যেন এসব ঘটনা থেকে যথাসময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

قَوْلُهُ وَإِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ﷺ -এর সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব রয়েছে। এ আয়াত থেকে কাফেরদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা মহানবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো তারা অতীতের কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীর যে অন্ধকারে তারা ইতিপূর্বে ছিল, সেই অন্ধকারেই তারা নিমিজ্জিত রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা, তারা তাঁকে বিদ্রূপ করত। এ দুরাত্মা কাফেররা যখনই প্রিয়নবী ﷺ -কে দেখত, তখনই তাঁকে তারা বিদ্রূপ করত। অথচ তাঁর শান, তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর আমানতদারী, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য– এক কথায় অনেক গুণ সম্পর্কে তারা অবগত ছিল। তারা স্বচক্ষে দেখত যে, তিনি এতিম, মিসকিন, অনাথ, বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতেন শুধু তাই নয়; বরং তাঁর ন্যায় আমানতদার এবং বিশ্বস্ত লোক কেউ ছিল না। তাই তাঁর শত্রুরাও তাদের ধন-রত্ন তাঁরই নিকট আমানত রাখত। কিন্তু এতদসত্ত্বে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্রূপের ভাষা ছিল এরূপ–

أَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا অর্থাৎ ইনিই কি তিনি, যাঁকে আল্লাহ পাক রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সারা পৃথিবীতে পয়গাম্বরী প্রদানের জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকেই খুঁজে পেলেন? [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]

قَوْلُهُ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا : অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে, এ ব্যক্তির কথা মানব মনে রেখাপাত করে, তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করলে যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, আমরা যদি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ না করতাম, তবে এ ব্যক্তির আহবানে আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাফেরদের এ কথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রচারে মহানবী ﷺ কঠোর পরিশ্রম করেছেন, এ পর্যায়ে তিনি অসাধারণ সাধনা করেছেন। অনেক মুজেযাও তিনি দেখিয়েছেন। যার ফলে এ দুরাত্মা কাফেরদেরও ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু তাদের মূর্তিপূজা, তাদের জেদ এবং অহংবোধ তাদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম : চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞান নেই, আর কাফেদের জ্ঞান আছে, চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকলেও সে তার প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, তার প্রতি অনুগত থাকে; কিন্তু এ দুরাত্মা কাফেররা নিজের জীবনের মালিককে চেনে না এবং তার অনুগতও হয় না এমনকি, তিনি তাদের হেদায়েতের জন্যে যখন নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুজেযা প্রদর্শন করেন, তারপরও এ কাফেররা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয় না; বরং সত্যের বিরোধিতায় তৎপর থাকে।

চতুষ্পদ জন্তুরা সত্যকে সত্য জানে না, বাতিলকে বাতিল বোঝে না। কেননা তাদেরকে বোধশক্তি দেওয়া হয়নি; কিন্তু তারা হক্বকে বাতিল মনে করে না। এ দুরাত্মা কাফেররা হক্বকে বাতিল মনে করে এবং বাতিলকে হক্ব মনে করে। তাই তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।

মূর্খতার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো, এক ব্যক্তি কিছুই জানে না; তবে একথা জানে যে, সে জানে না। এ মূর্খতা সহনীয়; কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক মূর্খতা হলো আরেক ব্যক্তি, যে কিছুই জানে না অথচ সে মনে করে যে, সে অনেক কিছু জানে। কাফেররা এ পর্যায়ের মূর্খ। যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বদা লালন পালন করেছেন, তারা অহরহ যার অনন্ত অসীম নিয়ামত মানুষ ভোগ করছে, তাঁর প্রতি ভক্তি অনুরক্তি এবং আনুগত্য প্রকাশ করে না, তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে না, তবে মাথা নত করে তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোর সম্মুখে, আর এ কাজকে তারা দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যের কাজ মনে করে। এ কারণে তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ৪৫৭]

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কাফেরদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম বলার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের প্রভুকে চেনে এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুও তার উপকারী ও ক্ষতিসাধনকারীর মধ্যে পার্থক্য করে; শুধু তাই নয়; বরং যা দ্বারা তারা উপকৃত হয়, তা পেতে চায়, পক্ষান্তরে যা দ্বারা তাদের ক্ষতি হয়, তা থেকে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু এ দুরাত্মা, হতভাগা কাফেররা নিজেদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তাদের চিরশত্রু ইবলিসের সঙ্গে তারা করে বন্ধুত্ব, তার অনুগত হয় এবং যে কাজে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে তাদের লাভ হবে, তা থেকে তারা থাকে দূরে, আর যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হয়, তার প্রতি হয় তারা আকৃষ্ট। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলেছেন। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মনে যেমন জ্ঞানের কোনো পরশ নেই; তেমনি মূর্খতারও কোনো স্থান নেই, কিন্তু কাফেরদের ব্যাপার ভিন্নধর্মী, তাদের নিকট একে তো ইলম বা জ্ঞান নেই, উপরন্তু তাদের অন্তর মূর্খতায় পরিপূর্ণ। কাফেররা জানে না, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, আর তারা যে জানে না, একথাও জানে না। এতদসত্ত্বেও তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা জানে । দ্বিতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকা কারো জন্যে ক্ষতিকর হয় না; কিন্তু এ কাফেরদের মূর্খতা শুধু তাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর হয় না; বরং অন্যদের জন্যেও হয় বিরাট অনিষ্টের কারণ। কেননা তারা মানুষকে সত্যপথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে এবং মন্দের দিকে আহবান জানায়। পরিণামে অনেককেই তারা পথভ্রষ্ট করে।

তৃতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুর ইলম বা জ্ঞান না থাকলে তার প্রতি দুনিয়াতে কোনো শাস্তি হয় না, আখিরাতেও হবে না; কিন্তু এ কাফেরদের জন্যে কঠিন ও কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ৮৭]

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, চতুষ্পদ জন্তু নিজের স্রষ্টাকে চেনে, তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকে। যদিও সাধারণ লোকেরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারে না। বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি একটি গরু নিয়ে যাচ্ছিল, চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গরুর উপর আরোহণ করে [আল্লাহ পাক গরুটিকে বাকশক্তি দান করেন] গরুটি তখন বলল, আমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি, আমাকে জমিনে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকেরা এ কথা শ্রবণ করে বলল, সুবহানাল্লাহ! গরু কি কথা বলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং আবূ বকর ও ওমরও একথা বিশ্বাস করে, অথচ তাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না।

অপর এক হাদীসে হুজুর ﷺ -ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি বাঘ ছাগলটির উপরে আক্রমণ করল, ছাগলের মালিক উপস্থিত হয়ে ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল, তখন বাঘটি বলল, কিয়ামতের দিন কে তাকে সাহায্য করবে? যখন আমি ব্যতীত তার কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকবে না, লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ বাঘ কি কথা বলতে পারে? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, এর উপর আমি বিশ্বাস করি এবং আবূ বকরও ওমরও বিশ্বাস করে। তারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

অনুবাদ :

٤٥. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلٰى فِعْلِ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج مِنْ وَقْتِ الْاِسْفَارِ اِلٰى وَقْتِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَوْ شَاۤءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا مُقِيْمًا لَا يَزُوْلُ بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ اَىْ اَلظِّلِّ دَلِيْلًا ـ فَلَوْلَا الشَّمْسُ مَا عُرِفَ الظِّلُّ ـ

৪৫. আপনি কি আপনার প্রতিপালকের কর্মের প্রতি লক্ষ্য করেননি? কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? ফর্সা হওয়ার সময় থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তিনি ইচ্ছা করলে একে তো স্থির রাখতে পারতেন অবিচল, সূর্যোদয় দ্বারা তা দূরীভূত হতো না। অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর উপর অর্থাৎ ছায়ার উপর নির্দেশক সুতরাং সূর্য না থাকলে ছায়া চেনা যেত না।

٤٦. ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اَىْ اَلظِّلَّ الْمَمْدُوْدَ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ـ خَفِيًّا بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ ـ

৪৬. অতঃপর আমি এটাকে গুটিয়ে আনি অর্থাৎ, সম্প্রসারিত ছায়াকে আমার দিকে ধীরে ধীরে চুপিসারে সূর্য উদয়ের মাধ্যমে।

٤٧. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِرًا كَاللِّبَاسِ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا رَاحَةً لِّلْاَبْدَانِ بِقَطْعِ الْاَعْمَالِ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ـ مَنْشُوْرًا فِيْهِ لِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ وَغَيْرِهٖ ـ

৪৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ আবরণ পোশাকের ন্যায়। বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা শারীরিক প্রশান্তি লাভের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে এবং সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিবস তাতে জীবিকা ইত্যাদি অন্বেষণের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

٤٨. وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الرِّيْحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ج اَىْ مُتَفَرِّقَةً قُدَّامَ الْمَطَرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ تَخْفِيْفًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِهَا وَفَتْحِ النُّوْنِ مَصْدَرًا وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ النُّوْنِ اَىْ مُبَشِّرَاتٍ وَمُفْرَدُ الْاُوْلٰى نَشُوْرٌ كَرَسُوْلٍ وَالْاٰخِيْرَةِ بَشِيْرٌ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا مُطَهِّرًا ـ

৪৮. তিনিই বায়ু প্রেরণ করেন اَلرِّيَاحُ শব্দটি اَلرِّيْحُ তথা একবচন রূপে রয়েছে। স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে। অন্য এক কেরাতে সহজার্থে نُشْر -এর شِيْن বর্ণে সাকিন রয়েছে। অপর এক কেরাতে نَشْر -এর شِيْن বর্ণে সাকিন ও نُوْن বর্ণে যবর সহ (نَشْر) মাসদার রূপে পঠিত রয়েছে। অপর কেরাতে شِيْن বর্ণে সাকিন এবং نُوْن-এর পরিবর্তে بَاءْ পেশ সহকারে بُشْرًا [সুসংবাদ] রূপে পঠিত রয়েছে। نُشُرٌ -এর একবচন نَشُوْرٌ আসে যেমন رُسُلٌ -এর একবচন رَسُوْلٌ ব্যবহৃত হয়। আর بُشْرًا -এর একবচন হলো بَشِيْرٌ দ্বিতীয় কেরাত অনুসারে। এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। পবিত্রকারী।

অনুবাদ :

৪৯. لِنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا بِالتَّخْفِيْفِ يَسْتَوِىْ فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ذَكَّرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَنُسْقِيَهُ اَىِ الْمَاءَ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا اِبِلًا وَبَقَرًا وَ غَنَمًا وَاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ـ جَمْعُ اِنْسَانٍ وَاَصْلُهُ اَنَاسِيْنَ فَاُبْدِلَتِ النُّوْنُ يَاءً وَاُدْغِمَتْ فِيْهَا الْيَاءُ اَوْ جَمْعُ اِنْسِىٍّ ـ

৪৯. যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ড সঞ্জীবিত করি مَيْتًا শব্দটি تَخْفِيْف তথা লঘু করে তাশদীদবিহীনভাবে, এতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই সমান। অথবা পুংলিঙ্গবাচক শব্দ নেওয়া হয়েছে مَكَانْ তথা স্থান অর্থের হিসেবে। এবং আমি তা পান করাই অর্থাৎ পানি আমার সৃষ্টির মধ্য হতে বহু জীবজন্তু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। এবং বহু মানুষকে اَنَاسِىّ শব্দটি اِنْسَانٌ -এর বহুবচন। মূলত ছিল اَنَاسِيْن এরপর نُوْن কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে يَاءْ -কে يَاءْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অথবা اِنْسَانٌ শব্দটি اِنْسِىٌّ -এর বহুবচন।

৫০. وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ اَىِ الْمَاءَ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا اَصْلُهُ يَتَذَكَّرُوْا اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الذَّالِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِيَذْكُرُوْا بِسُكُوْنِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ اَىْ نِعْمَةَ اللّٰهِ بِهِ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ـ جُحُوْدًا لِلنِّعْمَةِ حَيْثُ قَالُوْا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ـ

৫০. আমি একে পানিকে তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। يَذَّكَّرُوْا মূলত يَتَذَكَّرُوْا ছিল تَاءْ -কে ذَال -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়ায় يَذَّكَّرُوْا হয়েছে। অন্য কেরাতে يَذْكُرُوْا তথা ذَال বর্ণে সাকিন ও كَافْ বর্ণে পেশসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। অর্থাৎ নিয়ামতকে অস্বীকার করে যেমন বলে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

৫১. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ـ يُخَوِّفُ اَهْلَهَا وَلٰكِنْ بَعَثْنَاكَ اِلٰى اَهْلِ الْقُرٰى كُلِّهَا نَذِيْرًا لِيَعْظُمَ اَجْرُكَ ـ

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। যে, তার অধিবাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। কিন্তু আমি সকল জনপদের জন্যই আপনাকে প্ররণ করেছি ভীতি প্রদর্শকরূপে যাতে আপনার প্রতিদান অনেক বেশি হয়।

৫২. فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ فِىْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اَىِ الْقُرْاٰنِ جِهَادًا كَبِيْرًا ـ

৫২. সুতরাং আপনি কাফেরেদের আনুগত্য করবেন না। তাদের কামনা মতে এবং আপনি এর সাহায্যে কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান।

৫৩. وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اَرْسَلَهُمَا مُتَجَاوِرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعُذُوْبَةِ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج شَدِيْدُ الْمُلُوْحَةِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حَاجِزًا لَا يَخْتَلِطُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ وَحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ اَىْ سِتْرًا مَمْنُوْعًا بِهِ اِخْتِلَاطُهُمَا ـ

৫৩. তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন অর্থাৎ পরস্পর পাশাপাশিভাবে উভয়টি সৃষ্টি করেছেন একটি মিষ্ট, সুপেয় অতি মিষ্ট এবং অপরটি লোনা, বিস্বাদ খুব বেশি লবণাক্ত উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, যার ফলে একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান অর্থাৎ উভয়ের সংমিশ্রণ হতে বিশুদ্ধ অন্তরাল।

٥٤. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا مِنَ الْمَنِيِّ اِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَصِهْرًا ط ذَا صِهْرٍ بِاَنْ يَتَزَوَّجَ ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى طَلَبًا لِلتَّنَاسُلِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ـ قَادِرًا عَلٰى مَا يَشَاءُ ـ

٥٥. وَيَعْبُدُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ بِعِبَادَتِهٖ وَلَا يَضُرُّهُمْ ط بِتَرْكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ـ مُعِيْنًا لِلشَّيْطَانِ بِطَاعَتِهٖ ـ

٥٦. وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَ نَذِيْرًا ج مُخَوِّفًا مِنَ النَّارِ ـ

٥٧. قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى تَبْلِيْغِ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ـ طَرِيْقًا بِاِنْفَاقِ مَالٍ فِىْ مَرْضَاتِهٖ تَعَالٰى فَلَا اَمْنَعُهُ مِنْ ذٰلِكَ ـ

٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهٖ ط اَىْ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ـ عَالِمًا تَعَلَّقَ بِهٖ بِذُنُوْبِ ـ

অনুবাদ :

৫৪. তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে বীর্য হতে মানুষকে। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন মানুষ বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে করে চাই পুরুষ হোক বা নারী আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান যা করেন সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৫৫. তারা কাফেররা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা তাদেরকে কোনো উপকার করতে পারে না তাদের উপসনার কারণে এবং তাদের অপকারও করতে পারে না। উপাসনা বর্জন করলে, আর তা হলো মূর্তিসমূহ। কাফেররা তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী শয়তানের আনুগত্যের ফলে তার সাহায্যকারী।

৫৬. আমি তো আপনাকে কেবল জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম থেকে সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

৫৭. বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অর্থাৎ আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি এর প্রচারের দরুন কোনো বিনিময় চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয় করার মাধ্যমে নাজাতের পথ অনুসরণ করুক। এতে আমি বাধা দিব না।

৫৮. আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ বলুন! "সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ।" তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ অংশটি خَبِيْرًا-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

অনুবাদ :

٥٩. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَىْ فِىْ قَدْرِهَا لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَمْسٌ وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِىْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِى اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اَلرَّحْمٰنُ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِ اِسْتَوٰى اَىْ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ فَاسْئَلْ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ بِهِ بِالرَّحْمٰنِ خَبِيْرًا . يُخْبِرُكَ بِصِفَاتِهِ .

৫৯. তিনি আকাশমণ্ডলী , পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর দিবসের হিসেবে অর্থাৎ উক্ত পরিমাণ সময়ে। কেননা তখন সূর্য ছিল না, তবে তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে তা না করার কারণ হলো সৃষ্টজীবকে ধীরস্থিরতা অবলম্বনের শিক্ষা দান করা। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। অভিধানে আরশ বলা হয় রাজ সিংহাসন কে তিনিই রহমান আর اَلرَّحْمٰنُ এটা اِسْتَوٰى ফে'লের ضَمِيْر হতে بَدَلٌ হয়েছে। আর সমাসীন হওয়ার দ্বারা তার শানের উপযোগী সমাসীন হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং জিজ্ঞাসা করে দেখ হে মানুষ! তার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে। সে তোমাকে তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে অবগত করবে।

٦٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْاٰمِرُ مُحَمَّدٌ وَلَا نَعْرِفُهُ لَا وَزَادَهُمْ هٰذَا الْقَوْلُ لَهُمْ نُفُوْرًا . عَنِ الْاِيْمَانِ

৬০. যখন তাদেরকে বলা হয় মক্কার কাফেরদেরকে তোমরা সেজদাবনত হও রহমান -এর প্রতি তখন তারা বলে রহমান আবার কে তুমি কাউকেও সেজদা করতে বললেই কি আমরা সেজদা করব? এ ফে'লটি نُوْن এবং يَاءٌ উভয়টি যোগেই পঠিত রয়েছে আর নির্দেশকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমরা তাকে চিনি না। এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। এ কথার দ্বারা। ঈমান হতে বিমুখতা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ تَنْظُرُ : এখানে تَنْظُرُ দ্বারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য, تَنْظُرُ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া اِلٰى অব্যয় দ্বারাও এর সমর্থন লাভ হয়। কারণ رُؤْيَتْ بَصَرِىْ তথা চোখের দর্শনের ক্ষেত্রেই اِلٰى ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ اِلٰى رَبِّكَ : এর মধ্যে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। কেননা দুনিয়ায় থেকে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়, এ কারণে বাক্যটি হবে- اَلَمْ تَرَ اِلٰى صَنِيْعِ رَبِّكَ [আপনি কি আপনার রবের কর্ম দেখেন না?] তবে কেউ কেউ رُؤْيَتٌ [দর্শন] দ্বারা رُؤْيَتٌ قَلْبِىْ [আত্মিক দর্শনও উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর اَلَمْ تَرَ কে اَلَمْ تَعْلَمْ অর্থে নিয়েছেন। এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে নবী করীম ﷺ এবং সে সকল ব্যক্তিবর্গকে, যারা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা রাখেন। আল্লাহ তা'আলা এ কতিপয় আয়াতে একমাত্র তিনিই ইলাহ হওয়ার যোগ্য, অন্য কেউ নয়- এ কথার পাঁচটি দলিল পেশ করেছেন। যথা-

১. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ২. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ৩. هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ ৪. هُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ৫. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ اِلَى وَقْتِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর জন্য উচিত ছিল- مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ বলা। আর যদি এটাকে مُطْلَقْ [স্বাভাবিক] রাখতেন, কোনো قَيْد -এর সাথে مُقَيَّدْ না করতেন তাহলে তা আরো ভালো হতো। কারণ রাতে তো পৃথিবীর ছায়া হয়। আর দিনে বৃক্ষরাজি ইত্যাদির ছায়া পড়ে। সম্ভবত সহনীয় সময় হওয়ার কারণে খাছ করেছেন।

قَوْلُهُ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : এর ব্যাখ্যায় তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা–

১. مِنَ الْفَجْرِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ২. مِنَ الْمَغْرِبِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ৩. مِنْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اِلٰى زَوَالِ الشَّمْسِ

বাহ্‌র গ্রন্থকার প্রথম উক্তিকে জমহুরের অভিমত বলেছেন, আল্লামা মহল্লী (র.) যে তাফসীর করছেন তা অন্যান্য মুফাসসিরগণের অনুকূলে নয়। –[সাবী ও জুমাল]

قَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا : এখানে রাতকে পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। وَجْهُ شِبْه [তুলনার সূত্র] হলো سَاتِرْ তথা আচ্ছাদানকারী হওয়া, وَجْهُ شِبْه ও حَرْفُ تَشْبِيْه কে বিলোপ করা হয়েছে। আর এ ধরনের تَشْبِيْه -কে تَشْبِيْه بَلِيْغ বলা হয়। যেমন زَيْدٌ اَسَدٌ -এর মধ্যে এরূপ تشبيه হয়েছে।

قَوْلُهُ بُشْرًا : এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর সামনে কুরআন মজীদের যে কপি ছিল, তাতে بُشْرًا -এর স্থলে نُشْرًا রয়েছে। আর এর মধ্যে ৪টি পাঠ রয়েছে। যথা– نُشْرًا ,نُشُرًا- نَشْرًا- ও بُشْرًا প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি হলো نُشُوْرًا -এর বহুবচন, তৃতীয়টি অর্থাৎ نَشْرًا হলো مَصْدَرْ , আর চতুর্থটি بَشِيْر -এর বহুবচন। অর্থ– সুসংবাদদাতা।

قَوْلُهُ مُفْرَدُ الْاُوْلٰى اَىْ وَالثَّانِيَةُ : অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার (র.)-এর জন্য اُوْلٰى -এর সাথে وَالثَّانِيَةْ বলা উচিত ছিল। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয়টি একবচনে একই, আর তা হলো– نُشُوْرًا

قَوْلُهُ مَيْتًا : مَيْت এবং مَيِّت -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, مَيْت বলা হয় যে মৃত্যু বরণ করেছে। আর مَيِّت বলা হয় মুমূর্ষ বা মৃত্যুমুখে পতিতকে।

قَوْلُهُ يَسْتَوِىْ فِيْهِ الخ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : بَلْدَةً হলো مَوْصُوْف আর مَيْتًا হলো তার صِفَتْ অথচ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গের দিক দিয়ে মিল নেই, صِفَتْ টি তো مَيْتَةً হওয়া দরকার ছিল। তাহলে উভয়ের মধ্যে تَطَابُقْ বা মিল হতো?

উত্তর : এর এক উত্তর এই দিয়েছেন যে– مَيْتٌ শব্দটি مُؤَنَّثْ ও مُذَكَّرْ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় উত্তর এই দিয়েছেন যে, وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ অর্থাৎ بَلْدَةً কে مَكَانْ [স্থান] এর প্রতি লক্ষ্য করে مُذَكَّرْ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা যেহেতু দ্বিতীয় উত্তর কাজেই وَذَكَرَهُ -এর স্থলে اَوْ ذَكَرَهُ বললে তা আরো সমীচীন হতো।

قَوْلُهُ وَنُسْقِيَهُ : -এর عَطْف হলো نُحْيِىْ -এর উপর।

قَوْلُهُ وَاَنْعَامًا : এটা نُسْقِيْهِ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل আর اَنْعَامًا শব্দটি خَلَقْنَا -এর আগে আসার কারণে حَالْ হয়েছে। মূলত خَلَقْنَا اَنْعَامًا ছিল। আর নিয়ম আছে যে, مَوْصُوْفْ যদি نَكِرَةْ হয়, আর صِفَتْ কে আগে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তা حَال রূপে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ اَنَاسِىَّ : এটা اِنْسَانٌ -এর বহুবচন, এটা ইমাম সীবওয়াইহ -এর অভিমত, আর এটা প্রাধান্যযোগ্য। কেউ বলেন, এটা اِنْسِىٌّ -এর বহুবচন। এ হলো ফাররা (র.)-এর অভিমত। তবে এটা প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা اِنْسِىْ -এর يَاءْ টি نِسْبَتِىْ [সম্বন্ধের জন্য] আর يَاءْ نِسْبَتِىْ যুক্ত শব্দের বহুবচন فَعَالِىْ -এর ওযনে আসে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اَىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اِلَى الْمَاءِ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর মতে صَرَّفْنَاهُ -এর মধ্যে যমীরের مَرْجِعْ হলো مَاءٌ অর্থ এই যে, আমি বৃষ্টিকে বিভিন্ন শহরে এবং এলাকায় পরিমাণ মতো বন্টন করে দিয়েছি, এভাবে صِفَتْ -এর দিক দিয়েও বন্টন করেছি। কোথাও মুষলধার বৃষ্টি হয়, কোথাও হয় হালকা। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত করেছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর مَرْجِعْ হলো কুরআন। এর قَرِيْنَةٌ বা আলামত হলো وَجَاهِدْهُمْ আর কারো মতে এর قَرِيْنَةٌ হলো اَلْمَطَرُ, জালালাইন গ্রন্থকার (র.)-এর মতও এটাই। قُرْاٰنْ-কে ءُ -এর مَرْجِعْ ধরলে অর্থ হবে– আমি কুরআনে বিভিন্ন প্রকার উপমা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সুন্দর সুন্দর বিষয় বর্ণনা করেছি, বিভিন্ন প্রকার দলিল প্রমাণ দ্বারা মানুষকে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। –[সফওয়াতুত্ তাফাসীর]

قَوْلُهُ اَلنَّوْءُ : এর বহুবচন আসে اَنْوَاءٌ অর্থ ঝুঁকে পড়া, পতিত হওয়া, বলা হয়– نَاءَ بِهِ الْجَمَلُ অর্থাৎ উটকে তার বোঝা ভারি করে দিয়েছে, ঝুঁকিয়ে বা কাত করে ফেলেছে। জাহিলি যুগে আরবরা নক্ষত্রকে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ তথা প্রকৃত কার্য নিয়ন্তা জ্ঞান করত। ঠাণ্ডা-গরম, বৃষ্টি প্রভৃতিকে কোনো কোনো তারকার উদয়াস্তের প্রতি সম্বন্ধ করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, শেষ রাতে বিশেষ একটি তারকা যখন পশ্চিমে অস্ত যায়, আর তার বিপরীতে পূর্বে দিকে আরেকটি উদয় হয় তখন বৃষ্টি হয়। মোটকথা তারা আল্লাহ তা'আলাকে সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা না মেনে তারকা-নক্ষত্রকে সবকিছুর নিয়ন্তা বা প্রভাবশীল মনে করত। এ কারণেই এটাকে কুফর অভিহিত করা হয়েছে। –[রূহুল বয়ান]

قَوْلُهُ مَرَجَ : এটা(ن) مُرُوْجًا হতে নিষ্পন্ন অর্থ- মুক্ত, ছেড়ে দেওয়া, প্রবাহিত করা। فُرَاتٌ অতি মিষ্ট, সুপেয় ও তৃপ্তিদায়ক, (ك)

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ : এ শব্দটি مَرْفُوْعْ হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে। যথা–

১. اَلَّذِىْ خَلَقَ الخ হলো مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ ২. هُوَ উহ্য مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرْ

৩. اِسْتَوٰى-এর যমীর থেকে بَدَلْ ; এটাই ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত।

قَوْلُهُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيْرًا : بِهِ -এর সম্বন্ধ হলো خَبِيْرًا -এর সাথে, فَوَاصِلْ তথা শ্লোকের সাথে মিল রাখার জন্য আগে আনা হয়েছে, অর্থাৎ فَاسْأَلْ خَبِيْرًا بِهِ ছিল। অথবা اِسْئَلْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ اِسْئَلْ عَنْهُ خَبِيْرًا ছিল। অর্থাৎ দয়াময়ের গুণাবলি সম্পর্কে কোনো আলেমের নিকট জিজ্ঞেস কর।

قَوْلُهُ يُخْبِرُكَ بِصِفَاتِهِ : এটা হলো جَوَابُ اَمْرٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যা তাঁর তাওহীদের বা একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ প্রমাণসমূহ কাফেররা অহরহ দেখতে পায়, যদি ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করে তবে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সত্যতা অনুধাবন করা কারো পক্ষেই আদৌ কঠিন হয়ে না। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৮৯]

ইমাম রাযী (রা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের বিবরণ রয়েছে, তাই এ আয়াত থেকে তাওহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ৮৮]

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলির সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : রৌদ্র ও ছায়া দুটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে এবং রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনো দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বসময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গাম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকাল প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্য অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যার সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র-ছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র-ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا -এর অর্থ তা-ই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্য নির্ধারণ করারও মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে : وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا –উক্ত আয়াতে রাত্রিকে লেবাস শব্দ দ্বারা ব্যাক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেওয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– ছিন্ন করা। سُبَاتٌ হলো এমন বস্তু, যা দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ -এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা হলো দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ ও জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত থাকায় তা হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ যে ব্যক্তির সাথে যখন আপনার কাজ, তখন হয়তো তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনো কোনো প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ;

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا বাক্যে দিনকে نُشُوْرٌ অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরা -এসব সময়ে খাদ্রদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا : طَهُوْرٌ শব্দটি আরবি ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طَهُوْرٌ বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোনো সময় বৃষ্টির আকারে ও কোনো সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই

পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি যেমন– পুকুর, হাউজ ও নদীর পানিতে কোনো অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তাফসীরে মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাসআলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকহের সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাসআলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا : اَنَاسِىّ শব্দটি اِنْسِىٌّ-এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, এটা اِنْسَانٌ-এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের ও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কি? এতে তো বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নদীর কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ : আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোনো সময় এক জনপদে এবং কোনো সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয়ে এবং কোনো জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আজাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আজাব ও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا : কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ : এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে بِهٖ অর্থাৎ কুরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনো পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ..... وَحِجْرًا مَّحْجُوْرًا : مَرَجَ শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرَجَ বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। عَذْبٌ মিঠা পানিকে বলা হয়। فُرَاتٌ-এর অর্থ সুপেয় مِلْحٌ-এর অর্থ লোনা এবং اُجَاجٌ-এর অর্থ তিক্ত, বিস্বাদ।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। যথা–

১. সর্ববৃহৎ দরিয়া, যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ।

২. পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই, মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনাও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজসিক্রয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে, তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত এই নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী, অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا : পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نَسَبْ বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে صِهْر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজ করতে পারে না।

قَوْلُهُ قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ .... رَبِّهٖ سَبِيْلاً : অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোনো পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোনো উপকার নেই যে, যার মনে চায় সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলা বাহুল্য কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোনো বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর ছওয়াব তিনিও পাবেন যেমন সহীহ হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজ করে, এই সৎ কাজের ছওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا : অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অথবা জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গাম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ : رَحْمٰنُ আরবি শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত। কিন্তু আল্লাহর জন্য শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান আবার কে?

٦١. قَالَ تَعَالٰى تَبٰرَكَ تَعَاظَمَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا اِثْنٰى عَشَرَ اَلْحَمَلَ وَالثَّوْرَ وَالْجَوْزَاءَ وَالسَّرَطَانَ وَالْاَسَدَ وَالسُّنْبُلَةَ وَالْمِيْزَانَ وَالْعَقْرَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدْىَ وَالدَّلْوَ وَالْحُوْتَ وَهِىَ مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ اَلْمِرِّيْخِ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهَرَةُ وَلَهَا الثَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعُطَارِدُ وَلَهُ الْجَوْزَاءُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسُ وَلَهُ الْاَسَدُ وَالْمُشْتَرِىْ وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوْتُ وَزُحَلُ وَلَهُ الْجَدْىُ وَالدَّلْوُ وَجَعَلَ فِيْهَا اَيْضًا سِرٰجًا هُوَ الشَّمْسُ وَقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ وَفِىْ قِرَاءَةٍ سُرُجًا بِالْجَمْعِ اَىْ نَيِّرَاتٍ وَخُصَّ الْقَمَرُ مِنْهَا بِالذِّكْرِ لِنَوْعِ فَضِيْلَةٍ ـ

٦٢. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً اَىْ يَخْلُفُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْاٰخَرَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كَمَا تَقَدَّمَ مَا فَاتَهُ فِىْ اَحَدِهِمَا مِنْ خَيْرٍ فَيَفْعَلَهُ فِى الْاٰخَرِ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ اَىْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا ؛

অনুবাদ :

৬১. আল্লাহ তা'আলা বলেন কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র আর রাশিচক্র হলো ১২ টি। সেগুলো হলো– ১. মেষ রাশি। ২. বৃষরাশি। ৩. মিথুন রাশি। ৪. কর্কট রাশি। ৫. সিংহরাশি। ৬. কন্যা রাশি। ৭. তুলা রাশি ৮. বৃশ্চিক রাশি। ৯. ধনু রাশি ১০ মকর রাশি। ১১ কুম্ভ রাশি। ১২. মীন রাশি। আর এগুলো হলো ভ্রাম্যমান সপ্ত নক্ষত্রের গতিপথ। মঙ্গলগ্রহের গতিপথ হলো মেষ ও বৃশ্চিক রাশি। শুক্রগ্রহের গতিপথ হলো বৃষ ও তুলা রাশি, বুধগ্রহের গতিপথ হলো মিথুন ও কন্যা রাশি। চন্দ্রের গতিপথ হলো কর্কট রাশি। সূর্যের গতিপথ হলো সিংহ রাশি। বৃহস্পতির গতিপথ হলো ধনু ও মীন রাশি এবং শনির গতিপথ হলো মকর ও কুম্ভ রাশি আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর তা হলো সূর্য। এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র। অন্য কেরাতে سِرَاجًا -এর পরিবর্তে سُرُجًا [বহুবচন] রয়েছে। অর্থাৎ জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজি। এখানে চন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে চন্দ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে অর্থাৎ একটি অপরটির পশ্চাতে আসে তার জন্য যে, উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। يَذَّكَّرَ শব্দটি ذَالْ বর্ণে তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাত এবং দিনের যে কোনোটির মধ্যে কল্যাণকর কোনো কাজ যদি ছুটে যায়, তবে অপরটির মধ্যে তা পূরণ করে নিতে পারে। অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়। অর্থাৎ রাত দিনে তার উপর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بُرُوْجًا : بُرُوْج শব্দটি بُرْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মনজিল, কক্ষপথ। সপ্ত নক্ষত্রের ১২ টি কক্ষপথ রয়েছে। সাতটির মধ্য হতে ৫টির রয়েছে ২টি করে কক্ষপথ অর্থাৎ মোট ১০টি, আর অবশিষ্ট দুটি নক্ষত্র তথা চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ হলো ১টি করে। এভাবে সপ্ত নক্ষত্রের মাঝে ১২ টি কক্ষপথ বিভক্ত হলো। مُشْتَرِىْ [বৃহস্পতি] হলো ষষ্ঠ আকাশে, مِرِّيْخ [মঙ্গলগ্রহ] পঞ্চম আকাশে, شَمْس [সূর্য] চতুর্থ আকাশে, زُهْرَةٌ [শুক্রগ্রহ/ শুকতারা] তৃতীয় আকাশে, عُطَارِدْ [বুধ] দ্বিতীয় আকাশে, আর قَمَرٌ [চন্দ্র] হলো প্রথম আকাশে। ব্যাখ্যাকার (র.) সপ্ত নক্ষত্রের যে ধারা বর্ণনা করেছেন তা প্রাচীন আকাশ বিজ্ঞানের প্রথম বৈজ্ঞানিক এরিস্টটল -এর উক্তি মতে। তার মতে বিশ্বজগতের কেন্দ্র হলো পৃথিবী। সকল নক্ষত্র, গ্রহ সবকিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে। অধিকাংশ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তার মতে একমত হন। বাতলিমিউসও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত তার এ উক্তি স্বীকৃত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম স্থপতি মনে করা হয় প্রখ্যাত মহাকাশ গবেষক কোপারনেক্সা পোল্যাণ্ডী [১৪৭২-১৫৪৩] -কে। প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম সূর্যকে সবকিছুর কেন্দ্র হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন।

কোপারনেক্স মতাদর্শের বুনিয়াদি নীতি হলো দুটি। যথা–

১. নক্ষত্রসমূহের নিত্যদিনের আবর্তনের মূল কারণ হলো নিজ কেন্দ্রের চারিদিকে প্রত্যহ পৃথিবীর আবর্তন।

২. সমস্ত গ্রহ সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে। আর পৃথিবীও একটি গ্রহ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহসমূহের প্রদক্ষিণের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ– ১. বুধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচুন ও ৯. প্লুটো।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا اَىْ فِى السَّمَاءِ : سَمَاءٌ দ্বারা পারিভাষিক سَمَاءٌ তথা আসমান উদ্দেশ্য নয়; বরং উপর বা আকাশ উদ্দেশ্য। বলা হয় كُلُّ مَا هُوَ فَوْقَ رَأْسِكَ هُوَ السَّمَاءُ [মাথার উপরের সবই আকাশ] গ্রহগুলো মহাশূন্যে ঝুলন্ত রয়েছে, আসমানের সাথে মিলিত নয়। সপ্ত গ্রহের যে সপ্তাকাশে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে, তা হলো তাদের দূরত্বে থেকে আবর্তনের পথ। একে বুরুজ তথা কক্ষপথ বলা হয়। যেমন চন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি প্রথম আকাশে, বুধ দ্বিতীয় আকাশে ইত্যাদি। এর দ্বারা আসমান উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ جَعَلَ فِيْهَا : এর মধ্যকার هَا সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য যদি বুরুজ বা কক্ষপথ হয় তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। আর سَمَاءٌ দ্বারা আসমান উদ্দেশ্য নেওয়া হলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এর পরে, سِرَاجًا কে عَطْف করা হয়েছে। এটা عَطْفُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর অন্তর্গত। আর এটা সঙ্গত নয়। وَخَصَّ الْقَمَرُ الخ দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আরবদের নিকট যেহেতু চন্দ্রের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। কারণ তারা চন্দ্রের মাধ্যমে বছর গণনা করে। নতুন চন্দ্রের দ্বারা নতুন মাস গণ্য করে। তাছাড়া চন্দ্র মাসের সাথে বিভিন্ন ইবাদত সংশ্লিষ্ট। এ কারণে تَخْصِيْصُ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ -এর পর্যায়ে قَمَرٌ কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটা حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

قَوْلُهُ وَهُوَالَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً : خِلْفَةً শব্দটি মাসদার, এটা نَوْع বা ধরন-প্রকৃতি জ্ঞাপক। যেমন– جِلْسَةً বিশেষ ধরনের উপবেশন বুঝায়, তদ্রূপ এর দ্বারা বিশেষ ধরনের একের পর এক আসা উদ্দেশ্য, যাতে একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হয়।

خِلْفَةً শব্দটি جَعَلَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل -ও হতে পারে যদি جَعَلَ কে صَيَّرَ অর্থে নেওয়া হয়। আর جَعَلَ -এর مَفْعُوْل -এর حَالٌ -ও হতে পারে, যদি একে خَلَقَ অর্থে নেওয়া হয়। অথচ خِلْفَةً শব্দটি حَالٌ বা مَفْعُوْل হওয়া জরুরি। নতুবা অর্থ ঠিক থাকে না। কাজেই خِلْفَةً -এর পূর্বে مُضَافٌ উহ্য মানা জরুরি। অর্থাৎ ذُوْخِلْفَةٍ এ সময় خِلْفَةً মাসদারটি اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হবে। অর্থাৎ خِلْفَةً শব্দটি خَلِيْفَةً অর্থে হবে।

এর আরেক উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কামূস অভিধানে আছে যে, خِلْفَةً শব্দটি مُخْتَلِفَةً অর্থে আসে। এ সময় مُضَافٌ উহ্য মানার প্রয়োজন পড়বে না। অর্থ হবে جَعَلَهُمَا مُخْتَلِفَيْنِ বাকি এ প্রশ্ন যে, خِلْفَةً শব্দটি দ্বিবাচনিক اِسْمِ فَاعِلٍ -এর অর্থে নিলে خِلْفَةً -কে একবচন আনা হলো কেন? এর উত্তর এই যে, خِلْفَةً মাসদারের সম ওযনের শব্দ। আর মাসদারের মধ্যে সব বচন একই ধরনের। তাই خِلْفَةً কে একবচন আনা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) يَخْتَلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْاٰخَرُ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَا فَاتَهُ : يَذْكُرُ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مَا فَاتَهُ দ্বারা তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا : اَوْ এখানে تَقْسِيْمٌ وَتَنْوِيْعٌ তথা বিভক্তি ও শ্রেণি বিন্যাসকল্পে; تَخَيُّرٌ তথা পূর্বাপরের কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা-দানকল্পে নয়। অর্থাৎ مَانِعَةُ الْخُلُوْ উদ্দেশ্য, যার মধ্যে উভয়টির সমাবেশ ঘটতে পারে তবে কোনো একটি থেকে খালি হওয়া সঙ্গত হয় না। شُكُوْرًا মাসদারটি شُكْرًا অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا .... اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا : এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক অর্থাৎ ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায়; ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কুরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কুরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক কোনো মাসআলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোনো অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তাফসীরে এর চেয়ে বেশি কোনো আলোচনায় যাওয়াও কুরআনের জরুরি খেদমত নয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো

সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, কুরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরো দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কুরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কুরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরি মনে করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ–

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, নাকি বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কুরআনে পাকের বাণী : جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, بُرُوْج অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা فِىْ অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا .

এতে فِيْهِنَّ-এর সর্বনাম سَبْعُ سَمَاوَاتٌ কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কুরআনে سَمَاءٌ শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سَمَاءٌ শব্দটির আরো একটি অর্থ আছে। অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سَمَاءٌ বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سَمَاءٌ শব্দের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا এবং এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তাফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোনো তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কুরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টত উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে– ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ

এতে مُزْنٌ শব্দটি مُزْنَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ নাকি আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে– وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ; এখানে مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কুরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ سَمَاءٌ শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল। সারকথা এই যে, কুরআন ও তাফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سَمَاءٌ শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فِى السَّمَاءِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোনো অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কুরআন নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে; বরং কুরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কুরআনের কোনো বর্ণনা তার পরিপন্থি হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কুরআন : এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, কুরআন পাক বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কুরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কুরআন পাক আকাশ, পৃথিবী,

নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও আলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরি নয়; বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি– এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক অবশ্যই আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কুরআন পাকও এর প্রতি আহবান জানায়নি। কুরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়। হ্যাঁ, সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মান-মন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব ছিল। বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোনো সময় এ দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কুরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কুরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরো বাড়ে, কুরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনজিলে-মকসূদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের ঊর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নতুন নতুন আবিষ্কার এ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোনো মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কুরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যা দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোনো বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থি আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোনো প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কুরআনের আয়াতে টানা হেঁচড়া ও সদার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়; বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কুরআনে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই; বরং কুরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে, সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কুরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত- جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কুরআন পাক কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কুরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোনো সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্যে থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ, কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে যেমন আজকাল কোনো কোনো আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব, তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কুরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশের দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনভিাবে কুরআন পাকের كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কুরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বোঝা যেত।

এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নূতন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোনো কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশত এগুলোকে কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (র.)-এর তাফসীরে রূহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তাফসীর। এই তাফসীরকার যেমন কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তাফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ مِمَّا يَعْضُدُ الْهَيْئَةَ الْجَدِيْدَةَ الْقَوِيْمَةَ الْبُرْهَانَ এই গ্রন্থে কুরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলেমের ন্যায় কুরআনের আয়াতে কোনো প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন-

رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ قَوَاعِدِهَا لَا يُعَارِضُ النُّصُوْصَ الْوَارِدَةَ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلٰى أَنَّهَا لَوْ خَالَفَتْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهَا وَلَمْ نُؤَوِّلُ النُّصُوْصَ لِأَجْلِهَا وَالتَّاوِيْلُ فِيْهَا لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحُرِّيَّةِ بِالْقَبُوْلِ بَلْ لَابُدَّ أَنْ نَقُوْلَ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَهَا مُشْتَمِلٌ عَلٰى خَلَلٍ فِيْهِ فَإِنَّ الْعَقْلَ الصَّرِيْحَ لَا يُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيْحَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَصْدُقُ الْآخَرَ وَيُؤَيِّدُهُ .

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কুরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কুরআন সুন্নাহর সদর্থ করব না। কেননা এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই; বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোনো না কোনো ত্রুটি আছে। কারণ সুস্থ বিবেক কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকারে-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজারো বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবি ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবি গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তাফসীরকার কুরআনের আয়াতের তাফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরি একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারি বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারি বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষশক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারি বস্তু নিচে পতিত হবে; কিন্তু যদি কোনো বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাব বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান আলবেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায় তখন তা আর নিচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমানকালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমা ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমন শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁরই একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট' এ এবং তার উর্দূ অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দূ মাসিক 'সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, এমন কোনো শক্তি আছে, যা এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন–

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্বে থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তা দৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি লিখেন–

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোনো গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর তিনি সব ভ্রমণ পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন–

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম; কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্ট জগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোনো মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গাম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারীগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্রগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? মানুষের চেষ্টা সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহ্নুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থা নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোনো সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্য আত্মিক শান্তি ও আরামের কোনো উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জবাবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। যথা- ১. যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তারই নাম আল্লাহ। ২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, কাজেই তা দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দুটি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিশরের মুফতী আল্লামা নজীত (র.) তাঁর গ্রন্থ 'তাওফীকুর রহমান' -এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত, তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরো লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গাম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে-

زبان تازه کردن باقرار تو * نینگیختن علق از کار تو .

میندس بسے جویر از راز شاد * نوانر کچود کردی أغاز شاد

সুফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সা'দী (র.) ব্যক্ত করেছেন:

چه شبها نشستم درین سیر گم * که حیرت گرفت أستینم کهقم

হাফেজ শিরাজী (র.) বলেছেন-

سخن از مطرب ومی گوئی وراز دهر کمترجو * که کس نکشود ونکشاید بحکمت این معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে। এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার করাও কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআনের প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের অভিমুখী একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কুরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থি আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কুরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কুরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কুরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

অনুবাদ :

٦٣. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ صِفَاتٌ لَهُ اِلٰى أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ غَيْرَ الْمُعْتَرِضِ فِيْهِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا اَىْ بِسَكِيْنَةٍ وَتَوَاضُعٍ وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ بِمَا يَكْرَهُوْنَهُ قَالُوْا سَلٰمًا ـ اَىْ قَوْلًا يَسْلَمُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ ـ

৬৩. রহমানের বান্দা তারাই এটা হলো মুবতাদা আর পরবর্তী অংশ أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ পর্যন্ত এর সিফত। তবে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ব্যতিরেকে। যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে অর্থাৎ প্রশান্তি ও বিনয়ের সাথে। এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে যাকে তারা অপছন্দ করে তখন তারা বলে সালাম। অর্থাৎ এমন কথা বলে যার দ্বারা সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

٦٤. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا جَمْعُ سَاجِدٍ وَقِيَامًا ـ بِمَعْنٰى قَائِمِيْنَ اَىْ يُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ ـ

৬৪. এবং যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে। سُجَّدًا শব্দটি سَاجِدٌ-এর বহুবচন ও দণ্ডায়মান থেকে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে অর্থাৎ তারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাত কাটিয়ে দেয়।

٦٥. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اَىْ لَازِمًا ـ

৬৫. এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর। তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। অনিবার্য ধ্বংস।

٦٦. اِنَّهَا سَاءَتْ بِئْسَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا هِىَ اَىْ مَوْضِعَ اِسْتِقْرَارٍ وَاِقَامَةٍ ـ

৬৬. নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট। অর্থাৎ দোজখ অবস্থান ও আবাসনের স্থান হিসেবে।

٦٧. وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا عَلٰى عِيَالِهِمْ لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا بِفَتْحِ اَوَّلِهٖ وَضَمِّهٖ اَىْ يُضَيِّقُوْا وَكَانَ اِنْفَاقُهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ الْاِسْرَافِ وَالْاِقْتَارِ قَوَامًا وَسْطًا ـ

৬৭. এবং তারা, যারা যখন ব্যয় করে তাদের পরিবার-পরিজনের উপর তখন তারা অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না لَمْ يَقْتُرُوْا ফে'লের يَاءْ বর্ণে যবর অথবা يَاءْ বর্ণে পেশ ও تَاءْ বর্ণে যের হতে পারে [বাবে اِفْعَالٌ থেকে] অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করে না, বরং তারা আছে অর্থাৎ তাদের ব্যয় হয়ে থাকে এতদুভয়ের মাঝে অপব্যয় ও কার্পণ্যতার মাঝামাঝি মধ্যম পন্থায়।

٦٨. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ قَتْلَهَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اَىْ وَاحِدًا مِنَ الثَّلٰثَةِ يَلْقَ اَثَامًا ـ اَىْ عُقُوْبَةً ـ

৬৮. এবং যারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে এ তিনটির যে কোনো একটি সে শাস্তি ভোগ করবে।

٦٩. يُضٰعَفْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشْدِيْدِ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ بِجَزْمِ الْفِعْلَيْنِ بَدَلًا وَبِرَفْعِهِمَا اِسْتِئْنَافًا مُهَانًا حَالٌ ـ

٧٠. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مِنْهُمْ فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ الْمَذْكُوْرَةِ حَسَنٰتٍ ط فِى الْاٰخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

٧١. وَمَنْ تَابَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ـ اَىْ يَرْجِعُ اِلَيْهِ رُجُوْعًا فَيُجَازِيْهِ خَيْرًا ـ

٧٢. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ اَىِ الْكِذْبَ وَالْبَاطِلَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ الْقَبِيْحِ وَغَيْرِهٖ مَرُّوْا كِرَامًا مُعْرِضِيْنَ عَنْهُ ـ

٧٣. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ اَىِ الْقُرْاٰنِ لَمْ يَخِرُّوْا يَسْقُطُوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ـ بَلْ خَرُّوْا سَامِعِيْنَ نَاظِرِيْنَ مُنْتَفِعِيْنَ ـ

٧٤. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ قُرَّةَ اَعْيُنٍ لَنَا بِاَنْ نَرَاهُمْ مُطِيْعِيْنَ لَكَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ فِى الْخَيْرِ ـ

অনুবাদ :

৬৯. দ্বিগুণ করা হবে অন্য কেরাতে عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ يُضَعَّفُ রয়েছে। তার শাস্তি কিয়ামতের দিন এবং সে সেখানে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। يُضٰعَفْ এবং يَخْلُدْ উভয় ফে'লটি جَزْم -যুক্ত হবে يَلْقَ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার প্রেক্ষিতে। আবার এটা رَفْع যুক্ত হবে جُمْلَهْ مُسْتَأْنِفَهْ হিসেবে। আর مُهَانًا এটা يَخْلُدْ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে।

৭০. তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের মধ্যে থেকে। আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করে দিবেন তাদের উল্লিখিত পাপ পুণ্যের দ্বারা পরকালে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এগুণে গুণান্বিত।

৭১. আর যে ব্যক্তি তওবা করে স্বীয় গুনাহ থেকে। পূর্বে যার আলোচনা করা হলো সে ব্যতীত। এবং সৎকর্ম করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন।

৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না মিথ্যা অসার ও বাতিল সাক্ষ্য। এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে মন্দ কথা ইত্যাদি হতে। স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে তার থেকে বিমুখ হয়ে, পরিহার করে।

৭৩. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত কুরআন স্মরণ করিয়ে দিলে এর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না; বরং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং উপকৃত হওয়ায় আশায় তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

৭৪. এবং যারা প্রার্থনা করে— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করুন, ذُرِّيّٰتِنَا শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই পঠিত। যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর আমরা যেন তাদেরকে আপনার অনুগত দেখতে পাই আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কল্যাণকর কাজে।

۷۵. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الْجَنَّةِ بِمَا صَبَرُوا عَلَىٰ طَاعَةِ اللّٰهِ وَيُلَقَّوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ فِيْهَا فِي الْغُرْفَةِ تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا - مِنَ الْمَلَائِكَةِ -

۷٦. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا - مَوْضِعَ اِقَامَةٍ لَهُمْ وَاُولٰئِكَ وَمَا بَعْدَهٗ خَبَرُ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الْمُبْتَدَأُ -

۷۷. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَا نَافِيَةٌ يَعْبَؤُ يَكْتَرِثُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ج اِيَّاهُ فِي الشَّدَائِدِ فَيَكْشِفُهَا فَقَدْ اَيْ فَكَيْفَ يَعْبَؤُ بِكُمْ وَقَدْ كَذَّبْتُمُ الرَّسُوْلَ وَالْقُرْاٰنَ فَسَوْفَ يَكُوْنُ الْعَذَابُ لِزَامًا - مُلَازِمًا لَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَعْدَمَا يَحُلُّ بِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُوْنَ وَجَوَابُ لَوْلَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا -

অনুবাদ :

৭৫. তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ বেহেশতের উন্নত মর্যাদা যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আল্লাহর আনুগত্যে তাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা প্রদান করা হবে يُلَقَّوْنَ শব্দটি قَافْ বর্ণে তাশদীদসহ। আর قَافْ বর্ণে তাশদীদ ছাড়া হলে يَاءْ বর্ণটি যবরযুক্ত হবে। জান্নাতের সে কক্ষে অভিবাদন ও সালাম সহকারে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে।

৭৬. সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট। مُقَامًا অর্থ হলো তাদের বসবাসের স্থান। আর أُولَٰئِكَ এবং তার পরবর্তী অংশ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ মুবতাদার খবর।

৭৭. আপনি বলুন! হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীদেরকে তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তাকেই। বিভিন্ন বিপদাপদে অতঃপর তিনি তা বিদূরিত করে দেন। সুতরাং কিভাবে তিনি তোমাদেরকে পরোয়া করবেন তোমরা তো অস্বীকার করেছ রাসূল ও কুরআনকে। ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি। পরকালেও তা তোমাদের জন্য অবধারিত হবে। দুনিয়ায় তোমাদের উপর যে আজাব নেমে আসবে, তারপরে। সুতরাং বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে ৭০ জন নিহত হয়েছিল, আর لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে, পূর্বের لَوْلَا তা বুঝাচ্ছে [অর্থাৎ- مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ] মূল ইবারত হবে- لَوْلَا دُعَائُكُمْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّيْ

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ। মুখলিস তথা আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের গুণাবলি বর্ণনাকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। عِبَادُ الرَّحْمٰنِ মুবতাদাটি مَوْصُوْف আর সামনের ৮টি اِسْمٌ مَوْصُوْل অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ থেকে وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ পর্যন্ত সবগুলো صِلَةٌ সহ صِفَتْ আর أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ বাক্য হলো خَبَرْ ; مُبْتَدَأْ ও خَبَرْ -এর মধ্যকার ৩টি বাক্য وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ থেকে مَا পর্যন্ত হলো مُعْتَرِضَةٌ , هَوْنًا শব্দটি هَانَ -এর মাসদার। অর্থ- নম্রতা অবলম্বন করা, শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে কথা বলা।

قَوْلُهٗ سُجَّدًا : এটা يَبِيْتُوْنَ -এর যমীরের حَالٌ , আর لِرَبِّهِمْ হলো মুতা'আল্লিক। فَوَاصِلْ -কে سُجَّدًا তথা শেষের মিলের প্রতি লক্ষ্য করে قِيَامًا -এর আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا : অর্থাৎ খালিক ও মাখলুকের সাথে সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সদা শংকিত থাকে। নিজেদের আমলের উপর ভরসা করে নির্ভয় হয় না। তারা এভাবে দোয়া করে- رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا [হে আল্লাহ ! আমাদের থেকে দোজখের আজাবকে দূরে রাখ।]

قَوْلُهُ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا : এ বাক্যে এবং سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا এ উভয়টি رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا الخ-এর ইল্লত বা কারণ বিশেষ।

قَوْلُهُ سَاءَتْ بِئْسَتْ : ব্যাখ্যাকার (র.) سَاءَتْ-এর তাফসীর بِئْسَتْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, سَاءَتْ হলো اَفْعَالُ الذَّمِّ-এর অন্তর্গত। এর فَاعِلْ হলো এর মধ্যকার هِيَ যমীর, আর مُسْتَقَرًّا হলো এর تَمْيِيْز যা مُبْهَمْ هِيَ যমীর -এর তাফসীর করেছে। مَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ هِيَ কেউ কেউ سَاءَتْ কে اَحْزَنَتْ অর্থে নিয়েছেন। এ সময় এটা সাধারণ فِعْل-এর ন্যায় হবে এবং مَفْعُوْل কে نَصَبْ দিবে, যা এখানে উহ্য রয়েছে। তা হলো اَصْحَابَهَا কিংবা دَاخِلِيْهَا ; বাক্যটি এরূপ হবে- اِنَّهَا (جَهَنَّم) اَحْزَنَتْ اَصْحَابَهَا وَدَاخِلِيْهَا- আর مُسْتَقَرًّا শব্দটি حَالْ বা تَمْيِيْز হতে পারে। প্রথমটিকে প্রাধান্যদানের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যাকার (র.) سَاءَتْ-এর ব্যাখ্যা করেছেন بِئْسَتْ দ্বারা। এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এটা اَحْزَنَتْ অর্থে নয়। তার মতে مُسْتَقَرْ ও مَقَامْ উভয়টি একই বস্তু, কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে مُسْتَقَرْ হলো পাপী মুমিনদের জন্য, অর্থাৎ তাদের জন্য দোজখ স্থায়ী আবাস, আর مَقَامْ হলো কাফেরদের জন্য। কেননা তাদের জন্য দোজখ হলো স্থায়ী নিবাস।

قَوْلُهُ يَقْتُرُوْا : এটা يَضْرِبُوْا-এর ছন্দে, অথবা يَكْرُمُوْا-এর ছন্দে, يَاءْ যবর ও تَاءْ বর্ণে পেশ যোগে। বলা হয় قَتَرْ عَلٰى عِيَالِهِ (ن ـ ض)-এর অর্থ হলো- ضَيِّقْ عَلَيْهِمْ فِى النَّفَقَةِ অর্থাৎ পরিবারের ব্যয়ভার সংকুচিত করল।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الخ : এর দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের পরে গুনাহ থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে يُضْعَفْ ও يَخْلُدْ উভয় ফে'ল يَلْقَ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ হিসেবে مَجْزُوْمٌ হয়েছে, আবার مُسْتَانِفَةْ হিসেবে مَرْفُوْعٌ পড়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ تَابَ : এটা يَلْقَ-এর যমীর থেকে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে। অর্থাৎ اِلَّا مَنْ تَابَ فَلَا يَلْقَ اَثَامًا কেউ কেউ এটাকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ-ও বলেছেন। তবে নাহু শাস্ত্রবিদ আবূ হাইয়ান এটাকে অসঙ্গত বলেছেন। কারণ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর উপর مُضَاعَفْ-এর বিধান আরোপ করা হয়েছে। এ সময় বাক্যটি এরূপ হবে- اِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَلَا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ আর عَذَابْ مُضَاعَفْ তথা দ্বিগুণ সাজাকে نَفِيْ করার দ্বারা عَذَابْ غَيْر مُضَاعَفْ [দ্বিগুণ আজাব ছাড়া অন্যান্য আজাব] -এর نَفِيْ বুঝায় না। সুতরাং مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ-ই উত্তম। اِلَّا এখানে لٰكِنْ অর্থে। -[ফতহুল কাদীর]

مُهَانًا হলো يَخْلُدْ-এর যমীরের حَالْ ; কেউ কেউ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ মতَابًا কে شَرْط- جَزَاءْ এক হয়ে যাওয়ার ন্যায় বলেছেন। আর তা বৈধ নয়। কেননা مَنْ تَابَ فَاِنَّهُ يَتُوْبُ বলা হয় না। কেউ কেউ এর এ উত্তর দিয়েছেন যে, شَرْط দ্বারা মৌখিক তওবা উদ্দেশ্য। আমলের বিনিময় লাভের জন্য تَوْبَةْ مُؤَكَّدْ উদ্দেশ্য। এ কারণেই جَزَاءْ শব্দকে مَتَابًا মাসদার দ্বারা مُؤَكَّدْ করেছেন। তারা আয়াতের অর্থ এই বলেছেন- مَنْ اَرَادَ التَّوْبَةَ وَعَزَمَ عَلَيْهَا فَلْيَتُبْ اِلَى اللّٰهِ ; এখানে خَبَرْ টি আদেশজ্ঞাপক। -[ফতহুল কাদীর : শাওকানী]

قَوْلُهُ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف টি مُغَايَرَتْ তথা ভিন্নতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রথম আয়াতে مَنْ تَابَ দ্বারা কাফের উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টিতে মুমিন উদ্দেশ্য। কেউ কেউ تَخْصِيْصْ بَعْدَ التَّعْمِيْم বলেছেন।

قَوْلُهُ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ : এখানে لَا يَشْهَدُوْنَ কে যদি لَا يَحْضُرُوْنَ অর্থে নেওয়া হয়, যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত, তাহলে زُوْرٌ শব্দটি مَفْعُوْل হবে। আর যদি شَهَادَتْ তথা সাক্ষ্য অর্থে নেওয়া হয় তাহলে زُوْرٌ শব্দটি مَنْصُوْبْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ [হরফে জার উহ্য থেকে নসব বিশিষ্ট] হবে। অর্থাৎ- لَا يَشْهَدُوْنَ بِالزُّوْرِ

قَوْلُهُ قُرَّةَ اَعْيُنٍ : قُرَّةُ الْعَيْنِ হলো চোখের খুশি ও আনন্দ। এর দ্বারা পরিবার পরিজনের সততা ও আনুগত্য দেখে আনন্দ ও খুশি হওয়া উদ্দেশ্য। এটাকে চোখের শীতলতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاجْعَلْنَا اِمَامًا : اِمَامْ শব্দটি একবচন ও বহুবচন রূপে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে اِجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا বলা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ : اُولٰئِكَ দ্বারা সেসব عِبَادُ الرَّحْمٰنِ তথা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা সামনের একের পর পর ৮টি مَوْصُوْل -এর অধীনে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত। اَلْغُرْفَةَ হলো اِسْمِ جِنْسْ -এর দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ : এটা এবং এর পরবর্তী অংশ হলো عِبَادُ الرَّحْمٰنِ মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ لَوْلَا دُعَائُكُمْ : لَوْلَا -এর جَوَابْ উহ্য রয়েছে। لَوْلَا -এর পরবর্তী অংশ উহ্য جَوَابْ নির্দেশ করছে। অর্থাৎ- لَوْلَا دُعَائُكُمْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের আলোচনা রয়েছে, যারা করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং অবাধ্য থাকে। আলোচ্য আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দাগণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেভাবে অবাধ্য নাফরমানদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের তাবেদার এবং পেয়ারা বান্দাগণের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাদের শুভ পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ যেন উল্লিখিত গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহ পাকের প্রকৃত এবং প্রিয় বান্দা হতে পারে, তার জন্যে রয়েছে এ আয়াত সমূহে উদাত্ত আহবান রয়েছে। মানুষ যেন দয়াময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি শোকরগুজার হয় এ শিক্ষাও রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। আর যারা আল্লাহ পাকের শোকরগুজার বান্দা, তাদেরকে অনুসরণ করার জন্যেও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, সমগ্র কুরআনে আল্লাহ পাক কোথাও হেদায়েতপ্রাপ্ত, সরল সঠিক পথের অনুসারীদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে দোজখের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। যারা সরল সঠিক পথের অনুসারী হয়েছেন, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। যেমন- ১. বিনয় ২. ইবাদতে তাদের মনের একাগ্রতা ৩. আল্লহর ভয় ৪. পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ৫. মধ্যপন্থা অবলম্বন ৬. তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ৭. ইখলাস ৮. ফেতনা-ফ্যাসাদ পরিহার করা ৯. জুলুম-অবিচার না করা ১০. ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা এবং ১১. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকা।

যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ। এ আয়াতসমূহে নিঃসন্দেহে তাঁদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২০০-২০১]

কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান' [রহমানের গোলাম] উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্টজীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর গোলাম এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী, তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকেও আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলির মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার

কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার রহমান [দয়াময়] গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি, যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ : عِبَادٌ হওয়া। عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বান্দা বা দাস, যে তার মনিবের মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম মনিবের আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هَوْن শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষ্য এরূপ– كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تَطْوِىْ لَهٗ অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কুঞ্চিত হতো। –[ইবনে কাসীর]

এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বলল, না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত হাসান বসরী (র.) يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا আয়াতের তাফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়: বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ সে তো দুনিয়ার পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরি রয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

তৃতীয় গুণ : وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جَاهِلُوْنَ শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবর্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تَسْلِيْم শব্দটি تَسَلُّم থেকে নয়; বরং سَلَامٌ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ– নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জবাবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

চতুর্থ গুণ : وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও

আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নাম-যশের আশঙ্কাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাসগত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী। -[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয়, بَاتَ لِلّٰهِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا অর্থাৎ সে-ও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী -[মাযহারী, বগভী]।

হযরত উসমান (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারীরূপে গণ্য করা হবে। -[আহমদ, মুসলিম ও মাযহারী]

পঞ্চম গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটিও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اِسْرَافٌ এবং এর বিপরীতে اِقْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِسْرَافٌ -এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اِسْرَافٌ তথা অপব্যয়, যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা تَبْذِيْرٌ তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ। আল্লাহ বলেন- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ এ দিক দিয়ে এই তাফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গুনাহের কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়। -[মাযহারী]

اِقْتَارٌ শব্দের অর্থ হলো- ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। [সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে]। এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[মাযহারী] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন- مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهٗ فِىْ مَعِيْشَتِهٖ অর্থাৎ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। -[আহমদ, ইবনে কাসীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না। -[আহমদ, ইবনে কাসীর]

সপ্তম গুণ : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ।

অষ্টম ও নবম গুণ : لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَمَنْ يَّفْعَلْ

ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবূ উবায়দা اَثَامٌ শব্দের তাফসীর করেছেন গুনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেন, اَثَامٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোনো কোনো হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। −[মাযহারী]

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা প্রথমে তো يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের এক গুনাহের জন্য একই শাস্তি কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্য হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আজাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোনো মুমিন চিরকাল আজাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ী হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বিগত দিনের সেসব পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গুনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। −[মাযহারী]

ইবনে কাসীর এর আরো একটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফেররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোনো সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তাফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا : বাহ্যত এটা পূর্বোক্ত اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। ইমাম কুরতুবী (র.) কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফেরও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَاٰمَنَ অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জবাবে শুধু يَتُوْبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং এর জবাবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎকর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গুনাহ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোনো প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই

যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যা দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দকাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে–

দশম গুণ : وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপকর্মও মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) বলেন, এখানে গান বাজনার অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়্যিম (র.) বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

সত্যকথা এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখাও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত। –[মাযহারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُوْنَ শব্দটিকে شَهَادَة অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবিরা গুনাহ, তা কুরআন ও সুন্নাহে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (র.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবিরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এ ছাড়া তার মুখে চুন কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। –[মাযহারী]

একাদশ গুণ : وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا : অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনোদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম তথা ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে। –[ইবনে কাসীর]

দ্বাদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আখিরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না: বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তাঁরা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যথা– ১. আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। ২. অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে; কিন্তু

বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজেদের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরিয়তের বিধানাবলি পাঠ করাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরি : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচারণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে, তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আমি এমন কোনো মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাবো? হযরত শা'বী বললেন, না বুঝে না শুনে কোনো কাজে লেগে যাওয়া মুমিনদেগর জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে শুনে আমল করা তাদের জন্য জরুরি। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাওয়া জায়েজ নয়।

এ যুগে যুব সম্প্রদায় ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারো তাফসীর দেখে কুরআনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোনো সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোনো উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোনো পারদর্শী উস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতি বিবর্জিত কুরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহর তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তাওফীক দান করুন!

ত্রয়োদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তারা তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটি প্রনিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জাঁকজমকতা, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ। যেমন- এক আয়াতে আছে- تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোনো কোনো আলেম এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন! তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা বলে অভিহিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি: বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, এই দোয়ায়

নিজের জন্য কোনো সর্দারি ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর ছওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী (র.) বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যা দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই। অর্থাৎ যে সর্দারি ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়; বরং জায়েজ। পক্ষান্তরে لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সর্দারি ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মুমিনদের প্রধান গুণাবলির বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয়গুলো বর্ণিত হচ্ছে–

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ : غُرْفَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ উপরতলার কক্ষ। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা বা নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। –[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا : অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকরেদকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ : এই আয়াতের তাফসীর এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে– مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোনো মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে– فَقَدْ كَذَّبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই।

قَوْلُهُ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا : অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের গলার হার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে। وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ

একটি বিশেষ আমল : হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেছেন, যদি কেউ নিম্নোক্ত আয়াত প্রত্যেক নামাজের পর একবার পাঠ করে, তবে তার স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার দীনদার হবে–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. طٰسٓمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

১. ত্বা-সীন-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

২. تِلْكَ اَيْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِيْنِ ـ اَلْمُظْهِرِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ ـ

২. এগুলো এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত অর্থাৎ কুরআনের اٰيٰتُ الْكِتٰبِ -এর মধ্যকার ইযাফত হলো مِنْ অর্থে তথা اِضَافَةٌ مِنِّيَّةٌ আর اَلْمُبِيْنِ -এর অর্থ হলো ভ্রান্ত থেকে সত্য প্রকাশকারী।

৩. لَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ قَاتِلُهَا غَمًّا مِنْ اَجْلِ اَنْ لَّا يَكُوْنُوْا اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ مُؤْمِنِيْنَ ـ وَلَعَلَّ هُنَا لِلْاِشْفَاقِ اَيْ اَشْفِقْ عَلَيْهَا بِتَخْفِيْفِ هٰذَا الْغَمِّ ـ

৩. হয়তো আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ! মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন চিন্তায় নিজেকে বিনাশ করে ফেলবেন তারা মুমিন হচ্ছে না বলে অর্থাৎ মক্কাবাসীরা। এখানে لَعَلَّ টি اِشْفَاقْ তথা নিজের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছে। অর্থাৎ দুশ্চিন্তা কম করে নিজের প্রতি দয়ার্দ্র হও।

৪. اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ اَيْ تَدُوْمُ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ـ فَيُؤْمِنُوْنَ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ بِالْخُضُوْعِ الَّذِيْ هُوَ لِاَرْبَابِهَا جُمِعَتِ الصِّفَةُ مِنْهُ جَمْعَ الْعُقَلَاءِ ـ

৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত তার প্রতি ফলে তারা ঈমান আনতে। এখানে ظَلَّتْ ফে'লটি مَاضِيْ হওয়া সত্ত্বেও مُضَارِعْ -এর অর্থ হবে। অর্থাৎ تَدُوْمُ [সর্বদা হবে]। خُضُوْعْ [নত হওয়া] -এর সম্বন্ধ اَعْنَاقْ [গ্রীবা, গর্দান] -এর দিকে করা হয়েছে, যা মূলত গ্রীবা অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ। এ হিসেবে اَعْنَاقْ -এর বিশেষণ خَاضِعِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ذَوِي الْعُقُوْلْ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে।

৫. وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ قُرْاٰنٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ـ

৫. যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোনো নতুন উপদেশ আসে কুরআন। তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। مُحْدَثٍ শব্দটি ذِكْرٌ -এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ তথা স্পষ্টকারী বিশেষণ হয়েছে।

অনুবাদ :

٦. فَقَدْ كَذَّبُوْا بِهٖ فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبٰؤُا عَوَاقِبُ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

৬. তারা তো তাকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে তার প্রকৃত বার্তা পরিণাম যা নিয়ে তার ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

٧. اَوَلَمْ يَرَوْا يَنْظُرُوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا اَىْ كَثِيْرًا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ . نَوْعٍ حَسَنٍ.

৭. তারা কি লক্ষ্য করে না তাকায় না জমিনের দিকে। আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি। অর্থাৎ বহু সংখ্যক। উত্তম প্রকারের।

٨. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط دَلَالَةً عَلٰى كَمَالِ قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيْهِ زَائِدَةٌ.

৮. নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার উপর নির্দেশক। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আল্লাহর ইলমে। সীবওয়াইহ -এর মতে এখানে كان টি অতিরিক্ত হয়েছে।

٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ ذُو الْعِزَّةِ يَنْتَقِمُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيْمُ . يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৯. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, তিনি এক পরাক্রমশালী মহা ক্ষমতাধর, তিনি কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ طٰسٓمٓ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে ط - س - م ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখিত।

قَوْلُهُ بَاخِعٌ : এটা اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ, (ف) بَخَعَ হতে নিষ্পন্ন, অর্থ চিন্তায় বা রাগে নিজেকে ধ্বংসে নিপতিতকারী। **بخعا অর্থ**– হারাম মগজ পর্যন্ত কর্তন করা, بَخْعٌ অর্থ– হারাম মগজ।

قَوْلُهُ لَعَلَّكَ : لَعَلَّ হলো حَرْفُ تَرَجِّىْ বা আশাব্যাঞ্জক অব্যয়। তবে এখানে যেহেতু تَرَجِّىْ -এর অর্থ সমীচীন নয় **এবং তা উদ্দেশ্যও নয়**। এ কারণে لَعَلَّ কে اِشْفَاقٌ অর্থে নেওয়া হয়েছে। আর اِشْفَاقٌ অর্থ হলো ভয়, আশঙ্কা। আল্লাহ **তা'আলা যেহেতু** আশঙ্কা থেকে মুক্ত, তাই এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির আশঙ্কা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এখানে এটা اَشْفِقْ বা اِرْحَمْ **তুমি দয়ার্দ্র** হও অর্থে ব্যবহৃত। কেননা এখানে ভয়ের কোনো বিষয় নেই। اِشْفَاقٌ শব্দটি مِنْ -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হলে **তখন ভয়** -এর অর্থ হয়। আর عَلٰى -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হলে তার অর্থ হয় দয়া ও মমতা।

قَوْلُهُ نُنَزِّلْ : اِنْ হরফে শর্ত نَشَأْ হলো ফে'লে শর্ত এবং نُنَزِّلْ জওয়াবে শর্ত।

قَوْلُهُ فَظَلَّتْ: فَاء -এর মাধ্যমে جَوَابُ شَرْطٍ -এর উপর عَطْف -এর কারণে مَجْزُوْم হয়েছে ظَلَّتْ -مَاضِىْ এর **সীগার পূর্বে** فَاءْ যুক্ত হওয়ায় مُضَارِعْ তথা نُنَزِّلْ -এর সাথে তার ব্যবহার বা প্রয়োগ সঙ্গত না হওয়ার কারণে مَاضِىْ -কে مُضَارِعْ -এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। ফলে عَطْف সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ الخ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : اَعْنَاقٌ শব্দটি عُنُقٌ -এর বহুবচন। আর এটা ذَوِى الْعُقُوْلِ তথা বোধসম্পন্নের অন্তর্গত নয়। বিধায় এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর বিধানে গণ্য হয়। এ হিসেবে এর সিফত خَاضِعَةٌ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে خَاضِعِيْنَ উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : خُضُوْعٌ তথা অবনত হওয়া বিবেকসম্পন্ন বস্তুর বিশেষণ। আর বিবেকহীন বস্তুর প্রতি তার সম্বন্ধ হলে তাকে বিবেকবানের পর্যায়ে গণ্য করে তার বহুবচন ون দ্বারা উল্লেখ করা বৈধ হয়। যেমনটা আল্লাহ তা'আলার বাণী- رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ -এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এর অপর একটি উত্তর এই যে, ظَلَّتْ اَصْحَابُ اَعْنَاقِهِمْ -এর দ্বারা ظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ তথা ঘাড় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। مُضَافٌ -কে বিলোপ করে مُضَافٌ اِلَيْهِ তথা خَبَرْ -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرٍ : এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত। আর مِنَ الرَّحْمٰنِ -এর মধ্যকার مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ مُحْدَثٌ : এটা ذِكْرٌ -এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ [স্পষ্টকারক বিশেষণ], কেননা مَايَاتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ দ্বারা যে مَعْنَى حَدَثِيْ তথা অস্থায়ী বা ধাতু অর্থ বুঝে আসে مُحْدَثٌ দ্বারা তার تَاكِيْد উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيَةً : لَاٰيَةً হলো اِنَّ -এর اِسْمُ مُؤَخَّرٌ -এর لَامْ টি অতিরিক্ত। এ আয়াতটি এ সূরায় ৮বার উল্লিখিত হয়েছে। مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ -এর ব্যাখ্যা فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে কাফেরদের ঈমান না আনার বিষয়ে অবহিত করা। সুতরাং كَانَ [অতীতকালীন ক্রিয়া] দ্বারা তা উল্লেখ কিভাবে সঙ্গত হলো?

উত্তর : ১. এর অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইলমে আগে থেকেই চূড়ান্ত রয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। এ হিসেবে অতীতকালীন ক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। এ উত্তরটি كَانَ -কে اَصْلِىْ গণ্য করে দেওয়া হয়েছে।

২. মুফাসসির (র.) وَقَالَ سِيْبَوَيْهِ দ্বারা এর দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে كَانَ অতিরিক্ত। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা ঈমান আনয়নকারী নয়।

জ্ঞাতব্য : وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيْهِ বাক্যটি অস্পষ্ট। বস্তুত قَالَ سِيْبَوَيْهِ كَانَ زَائِدَةٌ বললে তা স্পষ্ট হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়া কেরাম মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিগণ শুধু সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো, তাই তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হতেন। তার এ আকাঙ্ক্ষা হতো, যদি তার ঈমান আনতো তবে কত ভালো হতো! তাই এ সূরার প্রারম্ভে প্রিয়নবী ﷺ-কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ! যদি এ কাফের মুশরিকরা ঈমান না আনে, তবে কি আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন? এরপর কয়েকজন প্রখ্যাত নবী রাসূলের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের উম্মতিরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছে? তা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য কাফেরদের অন্যায় আচরণ নতুন কোনো বিষয় নয়; পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথেও এমন অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, যা কাফের-মুশরিকদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়বনী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাঁর নবুয়ত অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সাতজন পয়গাম্বরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলারপক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ -এর মুবারক কলবে নাজিল করা হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবগত, তারা খুব ভালো করেই জানে যে এটি আল্লাহ

তা'আলার ওহী; কাব্য বা জাদু নয়; বরং এটা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী যা দ্বারা সত্য-অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য ও জাদুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৫০৫]

স্বপ্নের তাবীর : যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করছে, তবে তার তাৎপর্য হবে এই– যদিও তার আর্থিক সংকট থাকবে, কিন্তু তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযূল : মক্কাবাসীরা যখন প্রিয়নবী ﷺ -কে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের এ আচরণ তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন মক্কাবাসীরা ঈমানদার হয়ে যায়। সম্ভবত প্রিয়নবী ﷺ মক্কাবাসীর ঈমান না আনার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনে না দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি কি তাদের দুশ্চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেবেন?

قَوْلُهُ طٰسٓمٓ : আল্লামা বগভী (র.) ইকরিমা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী ইবনে তালহা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দ্বারা তিনি শপথ করেছেন, কেননা এ শব্দটি আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম। মুহাম্মদ ইবনে কারজী (র.) বলেছেন– ط -এর অর্থ হলো কুদরত বা শক্তি আর س অর্থ নূর এবং م অর্থ مَجْد বা শ্রেষ্ঠত্ব।

অতএব, এ অক্ষরগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মুকাত্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে একটি রহস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। –[তাফসীরে তাবারী খ. ১৯, পৃ. ৩৭]

قَوْلُهُ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ : শব্দটি بَخْع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জবাই করতে বিখা' [গর্দানের একটি শিরা] পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী (র.) বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই কোনো কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা জন্য অধিক দুঃখ না করা উচিত।

قَوْلُهُ إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ : আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فَظَلُّوْا لَهَا خَاضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اَعْنَاقٌ [গর্দান] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তৌহিদ ও কুদরতের এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি ও আল্লাহর স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই ছওয়াব ও আজাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ زَوْجٍ كَرِيْمٍ : زَوْج -এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْج বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে। সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زَوْج বলা যায়। কোনো সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْج বলা যায়। كَرِيْم শব্দের অর্থ– উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

অনুবাদ :

١٠. وَ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ إِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى لَيْلَةً رَاَى النَّارَ وَالشَّجَرَةَ اَنِ اَىْ بِاَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ رَسُوْلًا ـ

১০. স্মরণ করুন হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার সম্প্রদায়ের কথা যখন আপনার প্রতিপালক হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে বললেন, যে রাতে হযরত মূসা (আ.) গাছে অগ্নি দেখতে পেলেন। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও। রাসূল হিসেবে।

١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط مَعَهٗ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ بِاللّٰهِ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِاسْتِعْبَادِهِمْ اَلَا الْهَمْزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ يَتَّقُوْنَ ـ اَللّٰهُ بِطَاعَتِهٖ فَيُوَحِّدُوْنَهٗ ـ

১১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট সে সহ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি ও বনী ইসরাঈলকে ভৃত্য বানানোর কারণে নিজেদের উপর জুলুম করেছে। اِلَّا -এর হামযাটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা কি ভয় করে না? আল্লাহকে তার আনুগত্যে? ফলে তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হতো।

١٢. قَالَ مُوْسٰى رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ـ

১২. তখন তিনি হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

١٣. وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ مِنْ تَكْذِيْبِهِمْ لِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ بِاَدَاءِ الرِّسَالَةِ لِلْعُقْدَةِ الَّتِىْ فِيْهِ فَاَرْسِلْ اِلٰى اَخِىْ هٰرُوْنَ مَعِىْ ـ

১৩. এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। আমার জিহবা তো সাবলীল নয় রিসালত আদায়ে বা প্রকাশে তাঁর জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে। সুতরাং আমার ভাই হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান আমার সাথে।

١٤. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ بِقَتْلِ الْقِبْطِىِّ مِنْهُمْ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ بِهٖ ـ

১৪. আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে তাদের মধ্য হতে এক কিবতীকে হত্যা করার কারণে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে সেই কারণে।

١٥. قَالَ تَعَالٰى كَلَّا ج اَىْ لَا يَقْتُلُوْنَكَ فَاذْهَبَا اَىْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ فَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْنَ ـ مَا تَقُوْلُوْنَ وَمَا يُقَالُ لَكُمْ اُجْرِيَا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ ـ

১৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, না, কখনোই নয় অর্থাৎ তারা আপনাকে হত্যা করবে না অতএব আপনারা উভয়ে গমন করুন আপনি ও আপনার ভাই এখানে غَائِبْ -এর উপর حَاضِرْ তথা উপস্থিত ব্যক্তির تَغْلِيْبْ হয়েছে। আমার নিদর্শনসহ, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণকারী আপনারা যা বলেন এবং আপনাদেরকে যা বলা হয় সে সম্পর্কে। এখানে দ্বিবচনকে বহুবচনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٦. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا اِنَّا اَىْ كُلًّا مِّنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِلَيْكَ ـ

১৬. অতএব আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান এবং বলুন আমরা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। তোমার নিকট প্রেরিত।

١٧. اَنْ اَىْ بِاَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا اِلَى الشَّامِ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ فَاَتَيَاهُ فَقَالَا لَهُ مَا ذُكِرَ ـ

১৭. আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে শামদেশে যেতে দাও তখন তাঁরা উভয়ে তার নিকট এসে উল্লিখিত কথাগুলো বললেন।

١٨. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوْسٰى اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا فِىْ مَنَازِلِنَا وَلِيْدًا صَغِيْرًا قَرِيْبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فِطَامِهٖ وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ـ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَلْبَسُ مِنْ مَلَابِسِ فِرْعَوْنَ وَيَرْكَبُ مِنْ مَرَاكِبِهٖ وَكَانَ يُسَمّٰى اِبْنَهُ ـ

১৮. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে আমাদের ঘরে লালন-পালন করিনি? শিশুকালে অর্থাৎ জন্মের নিকটবর্তী কালে দুধ ছাড়ানোর পর আর তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। ত্রিশ বছর। তিনি ফেরাউন-প্রদত্ত পোশাক পরিধান করতেন, তারই বাহনে আরোহণ করতেন এবং তাকে ফেরাউনের সন্তান বলা হতো।

١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ هِىَ قَتْلُهُ الْقِبْطِىَّ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ الْجَاحِدِيْنَ لِنِعْمَتِىْ عَلَيْكَ بِالتَّرْبِيَةِ وَعَدَمِ الْاِسْتِعْبَادِ ـ

১৯. এবং তুমি তোমার কর্ম যা করার তো করেছে আর তা হলো কিবতীকে হত্যা করা। তুমি অকৃতজ্ঞ তোমার প্রতি আমার যে অনুগ্রহ রয়েছে তোমাকে প্রতিপালন ও দাসে পরিণত না করার ব্যাপারে তা তুমি অস্বীকারকারী।

٢٠. قَالَ مُوْسٰى فَعَلْتُهَا اِذًا اَىْ حِيْنَئِذٍ وَاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ عَمَّا اٰتَانِىَ اللّٰهُ بَعْدَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ ـ

২০. হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালে আমাকে যে জ্ঞান ও রিসালত প্রদান করেছেন, সেটা ছিল তার পূর্বের ঘটনা।

٢١. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا عِلْمًا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

২১. অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল মনোনীত করেছেন।

অনুবাদ :

٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَصْلُهُ تَمُنُّ بِهَا اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ـ بَيَانٌ لِتِلْكَ النِّعْمَةِ اَيْ اتَّخَذْتَهُمْ عَبِيْدًا وَلَمْ تَسْتَعْبِدْنِيْ لَانِعْمَةَ لَكَ بِذٰلِكَ لِظُلْمِكَ بِاسْتِعْبَادِهِمْ وَقَدَّرَ بَعْضُهُمْ اَوَّلَ الْكَلَامِ هَمْزَةَ اِسْتِفْهَامٍ لِلْاِنْكَارِ ـ

২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ تَمُنُّهَا মূলত ছিল تَمُنُّ بِهَا তথা যার দ্বারা তুমি খোটা দিচ্ছ। তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ। এটা ঐ নিয়ামতের বিবরণ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তুমি দাসে পরিণত করেছ আর আমাকে দাসে রূপান্তরিত করনি। এটা তোমার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা হলো তোমার অত্যাচার ও অবিচার। কেউ কেউ উক্ত বাক্যের শুরুতে هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ- اَتِلْكَ نِعْمَةٌ তথা এটা কি কোনো অনুগ্রহ?

٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوْسٰى وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الَّذِيْ قُلْتَ اِنَّكَ رَسُوْلُهُ اَيْ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ سَبِيْلٌ لِلْخَلْقِ اِلٰى مَعْرِفَةِ حَقِيْقَتِهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا يَعْرِفُوْنَهُ بِصِفَاتِهِ اَجَابَ مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِبَعْضِهَا ـ

২৩. ফেরাউন বলল হযরত মূসা (আ.)-কে জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কি? যা তুমি বলেছ যে, তুমি তাঁর রাসূল। তিনি কে? বা তা আবার কি জিনিস? যেহেতু মাখলুখের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় লাভ করার কোনো উপায় নেই; বরং তার গুণাবলি দ্বারা পরিচয় লাভ করতে পারে। তাই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কিছু সিফাত বা গুণাবলি উল্লেখ করেছেন।

٢٤. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اَيْ خَالِقُ ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ـ بِاَنَّهُ تَعَالٰى خَالِقُهُ فَاٰمِنُوْا بِهٖ وَحْدَهُ ـ

২৪. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক অর্থাৎ এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও যে, তিনি এর সৃষ্টিকর্তা তবে তোমরা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।

٢٥. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمَنْ حَوْلَهٗ مِنْ اَشْرَافِ قَوْمِهٖ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ـ جَوَابَهُ الَّذِيْ لَمْ يُطَابِقِ السُّؤَالَ ـ

২৫. ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বলল, তোমরা শুনছ তো? তার উত্তর যা প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

٢٦. قَالَ مُوْسٰى رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۤئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ وَهٰذَا وَاِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيْمَا قَبْلَهٗ يَغِيْظُ فِرْعَوْنَ ـ

২৬. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক। এ কথাটি যদিও পূর্বের কথায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যেহেতু এটি ফেরাউনকে ক্রোধান্বিত করে-

অনুবাদ :

٢٧. وَلِذٰلِكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ.

২৭. তাই ফেরাউন বলে উঠল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয় পাগল।

٢٨. قَالَ مُوْسٰى رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. اِنَّهٗ كَذٰلِكَ فَاٰمِنُوْا بِهٖ وَحْدَهٗ.

২৮. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা বুঝতে যে, সত্যিই তিনি তাই, তবে সে একক সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে।

٢٩. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوْسٰى لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ. كَانَ سِجْنُهٗ شَدِيْدًا يُحْبَسُ الشَّخْصَ فِىْ مَكَانٍ تَحْتَ الْاَرْضِ وَحْدَهٗ لَا يَبْصُرُ وَلَا يَسْمَعُ فِيْهِ اَحَدًا.

২৯. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলারূপে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। তার কারাগার ছিল ভয়ানক কঠোর, সে মানুষকে মাটির নিচে একাকী আবদ্ধ করে রাখত। তথায় সে কাউকে দেখতোও না এবং কারো কথাও শুনত না।

٣٠. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اَوَلَوْ اَىْ اَتَفْعَلُ ذٰلِكَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ. اَىْ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ عَلٰى رِسَالَتِىْ.

৩০. হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তবুও কি? অর্থাৎ তুমি তাই করবে আমি যদি তোমার নিকট সুস্পষ্ট কোনো নিদর্শন আনয়ন করি। অর্থাৎ আমার রিসালতের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি।

٣١. قَالَ فِرْعَوْنُ لَهٗ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْهِ.

৩১. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর। এ ব্যাপারে।

٣٢. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ. حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ.

৩২. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলো। বিশালকায় সর্পে পরিণত হয়ে গেল।

٣٣. وَنَزَعَ يَدَهٗ اَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهٖ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ ذَاتُ شُعَاعٍ لِلنّٰظِرِيْنَ. خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ.

৩৩. এবং হযরত মূসা (আ.) হাত বের করলেন তিনি তা স্বীয় বগলের নিচ হতে বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো অর্থাৎ পূর্বের বাদামী রঙের বিপরীত দেখা গেল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنْ اَىْ بِاَنْ : এ ব্যাখ্যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ -এর পূর্বে بَا حَرْف جَرٌ উহ্য রয়েছে। কেউ কেউ اَنْ -কে تَفْسِيْرِيَّةٌ -ও বলেছেন। কেননা نَادٰى [আহবান করল] শব্দটি হলো قَالَ অর্থে।

قَوْلُهُ رَسُوْلًا : এটা اِئْتِ -এর যমীরের حَالْ বা অবস্থাবাচক পদ। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেরাউন অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপরন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করার অর্থ হলো ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা। কেননা অন্যায় ও ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল হোতা-ই হলো ফেরাউন।

قَوْلُهُ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْل : এর عَطْف হলো اَنْفُسَهُمْ -এর উপর, اِسْتِعْبَادْ -এর অর্থ হলো গোলামের ন্যায় আচরণ করা। অর্থাৎ, তাদের দ্বারা দুরূহ কষ্টকর কাজ করানো। প্রকৃত গোলাম বানানো উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا الْهَمْزَةَ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ : সঠিক কথা এই যে, এ হামযাটি تَعَجُّبْ তথা বিস্ময়জ্ঞাপক, اِنْكَارْ তথা অস্বীকারসূচক নয়। যেমন– মুফাসসির (র.) উল্লেখ করেছেন। কেননা لَا تَتَّقُوْنَ ক্রিয়াটি حَرْفُ نَفْىْ তথা لَا -এর মাধ্যমে مَنْفِىْ বা নেতিবাচক হয়েছে। এর উপর هَمْزَةُ اِنْكَارِىْ প্রবিষ্ট হলে نَفْىُ النَّفْىِ হিসেবে اِثْبَاتْ হয়ে যায়। আর তা সঠিক নয়। কেননা এ সময় অর্থ হবে– "হে মূসা! তুমি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর! কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে।" আর এ অর্থ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى اِنِّىْٓ اَخَافُ الخ : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সম্মুখে তিনটি আপত্তি পেশ করেছেন। যথা– ১. আমাকে মিথ্যাবাদী বলার আশঙ্কা করছি। ২. আমাকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করলে মন খারাপ হয়ে যাবে। ৩. আমার মুখে জড়তা রয়েছে। বস্তুত আল্লাহর নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এসব আপত্তি করেননি; বরং রিসালতের গুরু দায়িত্ব পালনে স্বীয় অপরাগতা, অযোগ্যতা এবং বাস্তবতা প্রকাশকল্পে এবং এ মর্মে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য কামনাকল্পে এ আপত্তি ছিল।

قَوْلُهُ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ : এটা হয়তো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হিসেবে مَرْفُوْعٌ হবে অর্থাৎ পূর্বের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই; বরং আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিজ অবস্থার বর্ণনা। অথবা اِنِّىْ اَخَافُ -এর মধ্যকার اِنَّ -এর خَبَرْ হওয়ার কারণে তা مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ اُجْرِيَا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ : এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : হযরত মূসা ও হারূন ছিলেন দু'ব্যক্তি। কাজেই দ্বিবাচনিক শব্দ তথা اِنَّا مَعَكُمَا উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল অথচ مَعَكُمْ তথা বহু বাচনিক শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : সম্মানার্থে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ كُلًّا مِنَّا : এ বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

প্রশ্ন : اِنَّا -এর اِسْمٌ ও خَبَرٌ -এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা নেই। কেননা رَسُوْلُ হলো خَبَرٌ এটা مُفْرَدٌ; আর যে বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে (مُخْبَرٌ عَنْهُ) হলো اِنَّا এর মধ্যকার نَا যমীর, আর এটা বহুবচন।

উত্তর : اِنَّا মূলত كُلًّا مِنَّا -এর অর্থ বিশিষ্ট, আর এটা مُفْرَدٌ -এর বিধানে শামিল। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ فَاَتَيَاهُ : এ বাক্য উহ্য মানার কারণ হলো এটা বুঝানো যে, قَالَ فِرْعَوْنُ বাক্যটিকে উহ্য ফে'লের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আরো কথা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ قَرِيْبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فِطَامِهِ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : وَلِيْدٌ বলা হয় নবজাতক দুগ্ধ পোষা শিশুকে। আর হযরত মূসা (আ.) তো এ সময় তার মায়ের নিকট ছিলেন। সুতরাং ফেরাউনের প্রতিপালনে থাকার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : وَلِيْدٌ দ্বারা দুধ ছাড়ানোর সময়কাল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, আয়াতকে স্বাভাবিক অর্থে রাখলেই ভালো হয়। তখন এর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা দুধপানের সময়কালে যদিও তিনি তাঁর মায়ের নিকট ছিলেন; কিন্তু তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ভার ফেরাউনের উপর ছিল। কাজেই ফেরাউনের اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا "শৈশবে তোমাকে আমি আমাদের মাঝে লালন করেছি" বলাটা যথার্থ।

قَوْلُهُ مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ : এখানে مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ আর مِنْ عُمْرِكَ হলো سِنِيْنَ -এর সিফত। আগে আসার কারণে حَالٌ হয়ে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেননা نَكِرَةٌ -এর সিফত আগে আসলে তা حَالٌ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ : অর্থাৎ যখন তোমাদের থেকে নির্যাতনের আশঙ্কাবোধ করলাম তখন আমি পলায়ন করলাম। হযরত মূসা (আ.) সে সময় নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন যখন তাকে জানানো হলো যে- اِنَّ الْمَلَأَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ অর্থাৎ "লোকজন তোমাকে হত্যার শলাপরামর্শ করছে।" [সূরা কাসাস : ২০] مِنْكُمْ -এর যমীরটি বহুবচন উল্লেখের কারণ লোকজনের শলা-পরামর্শের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, অন্যথা مِنْكَ বলতেন। কারণ আলাপ হচ্ছে কেবল ফেরাউনের সাথে।

قَوْلُهُ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ : এটা একটা অনুগ্রহ, যাকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ। এখানে تِلْكَ দ্বারা তার প্রতিপালনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা اَلَمْ نُرَبِّكَ দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে। تِلْكَ হলো مُبْتَدَأٌ আর نِعْمَةٌ হলো مَوْصُوْفٌ ; تَمُنُّهَا বাক্য হয়ে সিফত হয়েছে- صِفَتٌ . مَوْصُوْفٌ মিলে خَبَرٌ আর مُبْتَدَأٌ-خَبَرٌ মিলে مُبَيِّنٌ - اَنْ হলো عَطْفُ بَيَانٍ . تَمُنُّهَا মূলত تَمُنُّ بِهَا ছিল। حَرْفُ جَرٍّ কে বিলোপ করে যমীরকে ফে'লের সাথে মিলিত করা হয়েছে । কেমন যেন এটা حَذْفُ وَاتِّصَالٌ -এর অন্তর্গত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে তোমার ভৃত্য না বানানো আমার উপর তোমার বিশেষ করুণা নয়। কারণ আমার জাতির অন্য সবাইকে ভৃত্যে পরিণত করে রেখে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। অতএব বেশি থেকে বেশি এটা বলতে পার যে তোমাকেও ভৃত্য না বানিয়ে তোমার উপর অত্যাচার করিনি। আর অত্যাচার না করা কোনো দয়া- অনুকম্পা নয়; বরং অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকা তো সবার মৌলিক অধিকার।

কেউ কেউ وَتِلْكَ -এর পূর্বে একটি هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٍ উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ মূলত ছিল اَوْ تِلْكَ نِعْمَةٌ এটা কি কোনো দয়া-অনুকম্পা? যাকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ যে, আমাকে ছেড়ে দিয়ে গোটা জাতিকে দাসে পরিণত করেছ। তাদেরকে তুমি দুঃসাধ্য কাজে বাধ্য করেছ এবং তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার বানাচ্ছ?

قَوْلُهُ فَاٰمِنُوْا بِهٖ : ব্যাখ্যাকার (র.) এ বাক্যটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ [ফেরউন প্রশ্ন করল- রাব্বুল আলামীন কে?] ফিরআউন مَا -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করেছে। এটা প্রশ্নকৃত বস্তুর হাকিকত বা তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন বুঝায়। সুতরাং এখানে اَىٌّ দ্বারা প্রশ্ন করাই সঙ্গত ছিল, যা সিফত বা বিশেষণ বুঝায়; কিন্তু ফেরআউন তার মূর্খতার দরুন مَا هُوَ দ্বারা প্রশ্ন করেছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত স্বরূপ উত্তরে সিফত তথা বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহান আল্লাহর হাকীকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়। দুনিয়ায় থেকে তার হাকীকত ও তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَهُمَا : **প্রশ্ন :** هُمَا দ্বারা سَمٰوَاتٌ ও اَرْضٌ তথা আসমান ও জমিন উদ্দেশ্য। আর سَمٰوَاتٌ শব্দটি বহুবচন; অতএব بَيْنَهُنَّ বলা সঙ্গত ছিল।

উত্তর : سَمٰوَاتٌ হলো একই জিন্স বা শ্রেণিগত, আর اَرْضٌ হলো আরেক শ্রেণি। সুতরাং উভয় শ্রেণি বুঝানোর জন্য هُمَا উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ [ফেরআউন পার্শ্বের লোকজনকে বলল, তোমরা কি শুনছ না?] ফেরাউন তার এ উক্তি দ্বারা তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের মনে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে, দেখ! এ নবী দাবিদারের মধ্যে তো প্রশ্ন বুঝারই যোগ্যতা নেই। সুতরাং তার নবী হওয়ার দাবি কিভাবে সঠিক হতে পারে? আমি তাকে প্রশ্ন করেছি- রাব্বুল আলামীনের তত্ত্ব ও হাকীকত সম্পর্কে, আর সে উত্তর দিচ্ছে তার গুণাবলি দ্বারা। বস্তুত হযরত মূসা (আ.) যে এর দ্বারা ফেরাউনের প্রশ্নই যথার্থ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর যে এতটুকু বুঝার যোগ্যতা রাখে না, সে রব হওয়ার দাবি করতে পারে কোন মুখে? قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ [হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক।] এটা দ্বিতীয় উত্তর যদিও পূর্বে رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا -এর অধীনে চলে এসেছে তথাপি ফেরাউনকে রাগান্বিত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় এ উত্তর দিলেন যে, তিনি শুধু আসমান ও জমিনেরই প্রতিপালক নন; বরং তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের স্রষ্টাও তিনিই। তাই ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে বলে উঠল اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ [তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল নিশ্চয় পাগল] ব্যাখ্যাকার (র.) এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তবে তাফসীরে কবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেছেন আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথা থেকে ধরন পরিবর্তন করে আল্লাহর পরিচয়দানের কারণ এই ছিল যে, ফেরাউন এ কথা বলার সম্ভাবনা ছিল যে, আসমান ও জমিন কারো সৃজিত নয়; বরং তা وَاجِبُ الْوُجُوْدِ তথা এমনিতেই অস্তিত্ব অবধারিত সত্তা কারো সৃজিত নয়। আর এ কথা বলা কোনো বিবেকবানের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে তার পিতা ও পূর্বপুরুষদেরকে وَاجِبُ الْوُجُوْدِ আখ্যা দিবে। কেননা এটা বাস্তবের পরিপন্থি। কারণ নাস্তির পরে তারা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, পরে আবার তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আর যার উপর নাস্তি ভর করে তা নশ্বর হয়ে থাকে। কাজেই অবিনশ্বর এক সত্তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় পরিচয়টি প্রথম পরিচয় থেকে অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সাথে সাথে তৃতীয় উত্তরের অবতারণা করলেন। এটা দ্বিতীয়টি থেকে আরো স্পষ্ট যে, "তিনি উদয় ও অস্তাচলের স্রষ্টা।" مَشْرِقٌ দ্বারা সূর্যোদয়, আর مَغْرِبٌ দ্বারা সূর্যাস্ত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দিনের উদয়াচল ও অস্তাচল ভিন্ন হয়ে থাকে। এ উদয়াস্ত কোটি কোটি বছর যাবত কোনোরূপ পার্থক্যও ত্রুটি ব্যতীত একইভাবে চলে আসছে। কোনো নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া তা আদৌ সম্ভব নয়। আর উক্ত নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক সত্তা হলেন আল্লাহ।

قَوْلُهُ الْاُدْمَةُ : اُدْمَةٌ -এর অর্থ হলো গমের রং, সোনালী ও বাদামীর মাঝামাঝি বর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় : ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ ـ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ـ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ـ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ হযরত মূসা (আ.) যা করেছেন তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ : হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ضَلَالٌ শব্দের অর্থ : তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে; ফেরাউনের এই অভিযোগের জবাবে হযরত মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই হত্যা করেছিলাম ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম, যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থি। আর এই হত্যাকাণ্ড

অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضَلَالٌ শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদা ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় ضَلَالٌ শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ : মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। হযরত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ : বনী ইসলাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। –[কুরতুবী]

পয়গাম্বরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি : দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হার-জিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এর দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোনো দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হারূন (আ.) যখন ফেরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল। যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জবাব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। এখানেও ফেরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। যথা– ১. তুমি আমাদের লালিত পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল? ২. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুকে হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘ্নতা। তুমি যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ। তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ জবাব দেখুন। প্রথমত তিনি জবাবে প্রশ্নের ক্রম পরিরবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জবাব প্রথমে দিলেন, যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত, পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জবাব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এর জবাবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জবাবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। স্বীকারোক্তি শুনে প্রতিপক্ষ যে বলবে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর জবাবে একথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এ লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির

সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট জবাব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, যদি তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তবে তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতো ত কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তা-ই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গাম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জবাব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জবাব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফেরাউনের দরবার কোথায়! যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গাম্বরসুলভ জবাব থেকে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মুজেযা দেখে এ কথার সত্যতা আরো পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবারটি ফেরাউনের, শহর ও দেশ ফেরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

এ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গাম্বরগণের বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক এবং সততাও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার তাৎপর্য : তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে দুটি মুজেযা দান করেছেন। একটি হলো লাঠি, এর দ্বারা কাফের মুশরিক তথা পাপিষ্ঠদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর পর কবরে অজগর সর্প তাদেরকে লাগাতার দংশন করতে থাকবে, যতদিন লোকটি কবরে থাকবে, ততদিন বিষাক্ত সর্পের দংশন অব্যাহত থাকবে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মুজেযা হলো, তাঁর শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত। আর তার তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে নূরের নমুনা পেশ করা হয়েছে, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যাদের অন্তর অন্ধ হয়ে থাকে তারা সূর্যের আলো কখনো দেখে না। লাঠির মুজেযা ছিল আজাবের প্রতীক, আর সমুজ্জ্বল হাতের মুজেযা হলো আলোর প্রতীক। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের নূর দান করেন, তাঁর জীবনই হয় সার্থক এবং সুন্দর।

—[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ২১৮-১৯]

অনুবাদ :

٣٤. قَالَ فِرْعَوْنُ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ - فَائِقٌ فِيْ عِلْمِ السِّحْرِ -

৩৪. ফেরাউন বলল তার পরিষদবর্গকে এতো এক সুদক্ষ জাদুকর জাদু বিদ্যায় সকলের শীর্ষে।

٣٥. يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ق فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ -

৩৫. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার জাদু বলে বহিষ্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কি করবে বল?

٣٦. قَالُوْا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ أَخِّرْ أَمْرَهُمَا وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ جَامِعِيْنَ -

৩৬. তারা বলল, তাকেও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও অর্থাৎ তাদের উভয়ের বিষয়টি প্রলম্বিত কর। এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।

٣٧. يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ - يَفْضُلُ مُوْسٰى فِيْ عِلْمِ السِّحْرِ -

৩৭. যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকর উপস্থিত করে। যে জাদু বিদ্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

٣٨. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ - وَهُوَ وَقْتُ الضُّحٰى مِنْ يَوْمِ الزِّيْنَةِ -

৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। আর সেটা ছিল ঈদের দিন পূর্বাহ্ণের প্রথম প্রহর।

٣٩. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ -

৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হলো, তোমরাও সমবেত হচ্ছো কি?

٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ - اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلْحَثِّ عَلَى الْاِجْتِمَاعِ وَالتَّرَجِّيْ عَلٰى تَقْدِيْرِ غَلَبَتِهِمْ لِيَسْتَمِرُّوْا عَلٰى دِيْنِهِمْ فَلَا يَتَّبِعُوْا مُوْسٰى -

৪০. যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়। هَلْ أَنْتُمْ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ আনা হয়েছে মূলত উপস্থিতির ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। আর তাদের বিজয় লাভের সম্ভাবনা থাকার দরুন تَرَجِّيْ তথা لَعَلَّ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তারা স্বীয় ধর্মের উপর অটল থাকে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ না করে।

٤١. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ -

৪১. অতঃপর জাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? أَئِنَّ -এর হামযাদ্বয়কে সর্বাবস্থায় বহাল রেখে এর দ্বিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয় ক্ষেত্রে হামযাদ্বয়ের মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

٤٢. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا حِيْنَئِذٍ لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ -

৪২. ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুবাদ :

٤٣. قَالَ لَهُمْ مُوسَى بَعْدَ مَا قَالُوا لَهُ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ـ فَالْأَمْرُ مِنْهُ لِلْإِذْنِ بِتَقْدِيمِ إِلْقَائِهِمْ تَوَسُّلًا بِهِ إِلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ ـ

৪৩. হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তাঁকে তাদের একথা বলার পর যে, হয়তো আপনি আগে আপনার জাদুর প্রদর্শনী দেখান, নতুবা আমরা আগে আমাদের জাদু প্রদর্শন করি। তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ কর। হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রথমে নিক্ষেপের অনুমতিদানের কারণ হলো যাতে এ অনুমতি সত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে যায়।

٤٤. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ـ

৪৪. অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হবো।

٤٥. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْأَصْلِ تَبْتَلِعُ مَا يَأْفِكُونَ ـ يُقَلِّبُونَهُ بِتَمْوِيهِهِمْ فَيَتَخَيَّلُونَ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ أَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسْعَى ـ

৪৫. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন; সহসা তা গ্রাস করতে লাগল تَلْقَفُ -এর মধ্যে একটি تَاءْ -কে বিলুপ্ত করে পঠিত। তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে ঐ জিনিসগুলো স্বীয় নজরবন্দী করে ভেলকি সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের রশি ও লাঠিগুলোকে দ্রুত ধাবমান সর্পের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

٤٦. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ـ

৪৬. তখন জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে পড়ল।

٤٧. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ـ

৪৭. তারা বলল, আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি।

٤٨. رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ـ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَأَتَّى بِالسِّحْرِ ـ

৪৮. যিনি হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর প্রতিপালক তাদের এ বিষয়টি উপলব্ধির ফলে যে, তারা লাঠির যে কীর্তি আলোকন করল তা জাদু বলে সম্ভব নয়।

٤٩. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا لَهُ لِمُوسَى قَبْلَ أَنْ آذَنَ أَنَا لَكُمْ ج إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَعَلَّمَكُمْ شَيْئًا مِنْهُ وَغَلَبَكُمْ بِآخَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ط مَا يَنَالُكُمْ مِنِّي ـ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ أَيْ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ـ

৪৯. ফেরাউন বলল, কী ! তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে? ءَامَنْتُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে أَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে। মূসার প্রতি আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই? সেই তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং সে তোমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে এবং অপর কিছুর দ্বারা [যা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়নি।] তোমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমার পক্ষ থেকে তোমরা কি [শাস্তি] পেতে যাচ্ছো। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কেটে দিব। অর্থাৎ প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা এবং তোমাদের সকলকে শূলিবিদ্ধ করবোই।

অনুবাদ :

৫০. قَالُوْا لَا ضَيْرَ زلَا ضَرَرَ عَلَيْنَا فِيْ ذٰلِكَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا بَعْدَ مَوْتِنَا بِاَيِّ وَجْهٍ كَانَ مُنْقَلِبُوْنَ ـ رَاجِعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৫০. তারা বলল, কোনো ক্ষতি নেই এতে আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট মৃত্যুর পর যেভাবেই মৃত্যু আসুক প্রত্যাবর্তন করব পরকালে তাঁরই নিকট ফিরে যাব।

৫১. اِنَّا نَطْمَعُ نَرْجُوْ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ اَىْ بِاَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ زَمَانِنَا ـ

৫১. আমরা আশা পোষণ করি কামনা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করে দিবেন কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী। আমাদের যুগে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَلَا : এটা اِسْمُ جِنْسٍ ; অর্থ- নেতৃবর্গ, পরিষদ। এর বহুবচন হলো- اَمْلَاءٌ

قَوْلُهُ اَرْجِهْ : এটা اِرْجَاءٌ মাসদার থেকে اَمْرٌ وَاحِدٌ حَاضِرٌ আর যমীরটি مَفْعُوْلٌ অর্থ অবকাশ দাও, ঢিল দাও।

قَوْلُهُ تَامُرُوْنَ : এটা মূলত تَامُرُوْنَنِىْ ছিল। [অর্থাৎ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও]

قَوْلُهُ يَاْتُوْكَ : এটা اَمْرٌ -এর جَوَابٌ হওয়ার কারণে مَجْزُوْمٌ হয়েছে [ফলে ن বর্ণটি বিলুপ্ত হয়েছে।]

قَوْلُهُ وَادْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ : এখানে বস্তুত وَعَلٰى تَرْكِ الْاِدْخَالِ বলা উচিত ছিল। তাহলে ৪টি কেরাত হতো।

قَوْلُهُ فَالْاَمْرُ فِيْهِ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন : হযরত মূসা (আ.) اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ বলে জাদুর ন্যায় একটি অন্যায় কাজের আদেশ দিলেন কিভাবে? কোনো নবীর পক্ষে এ ধরনের গর্হিত কুফরি কাজের আদেশ দেওয়া কিভাবে শোভনীয় হতে পারে?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ নয়। নির্দেশ আকারে অনুমতি প্রদান ছিল। কেননা জাদুকররা জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন নাকি আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে আগে শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। তবে এ উত্তরের উপরও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কুফরি কাজের অনুমতিও কুফর বলে বিবেচিত হয়, কাজেই অনুমতি দান করা কি সমীচীন হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য প্রকাশের জন্য জাদুকরদেরকে জাদু প্রদর্শনের অনুমতিদানের প্রয়োজন ছিল। যাতে তারা তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযা তাদের বাতুলতা ও ভ্রান্ত ধারণা নস্যাত করে উপস্থিত জনতাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কথার প্রতি আস্থাশীল বানাতে পারেন। ফলে তাদের সামনে হক ও বাতিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর উদাহরণ হলো- মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা যদিও অন্যায়; কিন্তু পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলা দূষণীয় নয়; বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম কাজ। হযরত মূসা (আ.)-এর এ নির্দেশও এ পর্যায়ের ছিল।

قَوْلُهُ وَابْدَالُ الثَّانِيَةِ اَلِفًا : এখানে সঠিক ইবারত হলো- اِبْدَالُ الثَّالِثَةِ اَلِفًا কেননা তৃতীয় হামযাটিই আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত।

قَوْلُهُ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ : এ সবগুলো বাক্য رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

قَوْلُهُ يَاْفِكُوْنَ : এটা اِفْكٌ (ض) থেকে جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ, অর্থ- গড়াগড়ি করা।

قَوْلُهُ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ الخ : অর্থাৎ জাদুকররা অযাচিতভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে ভীত হলো যে, হয়তো তার পরিষদবর্গ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে ফেলবে, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে বলল, এ হলো একজন সুদক্ষ জাদুকর, জাদুকরি বিদ্যায় সে নিঃসন্দেহে পারদর্শী। হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সে বলল, এ ব্যক্তি তার জাদুবিদ্যার বলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, এমন অবস্থায় তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে খোদায়ী দাবি করেছিল এবং একদল লোককে বশীভূত করে রেখেছিল, সে এখন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে নিজেকে এত অসহায় মনে করেছে যে, আত্মরক্ষার জন্য তার পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাইছে। ফেরাউনের অন্তরে এ ভয় সৃষ্টি হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) অবশেষে বিজয় লাভ করবেন এবং তার সকল জারি জুরি ফাঁস হয়ে যাবে, তাই সে তাদেরকে বলেছে, মূসা জাদু বলে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়, এবং নিজে তোমাদের বাদশাহ হতে চায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মানুষ অন্যের সম্পর্কে ধারণা করে নিজের উপর বিচার করে অর্থাৎ সে যেমন, অন্যকেও তেমনি মনে করে। ফেরাউন মানুষের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, সর্বত্র তার ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। হযরত মূসা (আ)-কে দেখে সে প্রথম এ ধারণাই করেছে যে, হয়তো তিনি এসেছেন তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং নিজের রাজত্ব কায়েম করতে। অথচ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, তাকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসতে, তাকে চিরশান্তি প্রদান করতে। কিন্তু ফেরাউন ছিল হতভাগা, তাই হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে সে ভুল ধারণা করেছে। আর সে জন্যে সে তার আপন লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ : অর্থাৎ তারা বলল, তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে নকীব প্রেরণ কর। ফেরাউনের মোসাহেবরা তাকে এ পরামর্শ দিল যে, আপাতত মূসা ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দিয়ে সারা দেশ থেকে বড় বড় জাদুকরদেরকে একত্র করা হোক।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে ফেরাউন শুধু যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল, তাই নয়; বরং ঐ মুহূর্তে তার পূর্বের আত্মম্ভরিতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায় এবং সে তার মোসাহেবদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হক্ব বা সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি থাকে, বাতিল যত শক্তিশালীই হোক না কেন, হক্বের মুখোমুখি হওয়া বাতিলের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাথী ছিলেন হযরত হারূন (আ.)। তাঁর কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না, কোনো প্রকার জাগতিক শক্তি তাঁর ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যসাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহবায়ক, আর তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূল। তাঁর নিকট রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী ফেরাউন তাই তাঁর মোকাবিলা করত সাহস করেনি; সে তাঁকে জাদুকর মনে করেছে এবং দেশের সমস্ত বড় বড় জাদুকরদেরকে তাঁর মোকাবেলা করার জনর্য একত্র করেছে।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ : এরপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো বর্ণিত আছে, মোসাহেবদের পরামর্শের পর ফেরাউন সারা দেশে তার লোকদেরকে প্রেরণ করল এবং দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বড় বড় জাদুকরদের একত্র করার ব্যবস্থা করল।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সেদিন ছিল শনিবার, তাদের জাতীয় উৎসবের দিন; সকাল বেলা চতুর্দিক ফর্সা হলে জাদুকররা এবং জনসাধারণ একত্র হলো।

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ : ফেরাউন শুধু জাদুকরদেরকেই একত্র করেনি; বরং তাদের পাশাপাশি জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশেরও ব্যবস্থা করে, উন্মুক্ত ময়দানে অতি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সকলে একত্র হলো।

قَوْلُهُ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ : অর্থাৎ জাদুকররা যদি জয়লাভ করে তবে হয় আমরা তাদের অনুসরণ করতে পরি, আর জাদুকরদের পথই যে সত্য পথ, এতেও কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

কোনো কোনো তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জাদুকর বলতে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে। কেননা ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে তাঁকে সুদক্ষ জাদুকর বলেছিল। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ; যদি জাদুকরদের মোকাবিলায় হযরত মূসা ও হারুন (আ.) বিজয়ী হন, তবে হয়তো আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইতিপূর্বে ফেরাউনের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন কার্যত হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে ফেরাউনের জাদুকরদের মোকাবিলা হবে। তাদের উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ পাকের নূরকে নিষ্প্রভ করা, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো ঐ নূরকে উদ্ভাসিত করা। তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই বিজয় লাভ করল, আর কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। একথা সর্বজনবিদিত যে, যখনই ঈমান এবং কুফরিরর মোকাবিলা হয়েছে, তখন ঈমানই বিজয় লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা বাতিলের মোকাবিলায় হক্বকে বিজয় দান করে থাকেন। হক্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রত্যেক শহরে ফেরাউন তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ জাদুকরদের একত্র করা হয়েছে।

জাদুকরদের সংখ্যা : জাদুকরদের সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ১২ অথবা ১৫ অথবা ১৭ অথবা ১৯ অথবা ৩০ অথবা ৮০,০০০ অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকই জানেন। সকলের উস্তাদ বা নেতা ছিল চারজন। যথা– সাবুর, আজুর, হতহত ও মাসহাফী।

যেহেতু এ ঘটনা সারা দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাই চতুর্দিক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বহু লোক একত্র হয়, সকলের মুখে একই কথা জাদুকরদের বিজয় হলে আমরা তাদের অনুসারী হবো। কারো মুখে এ কথা ছিল না যে, আমরা সত্যের অনুসারী হবো বাতিল বা অসত্যের অনুসারী হবো না।

قَوْلُهُ اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, তা প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না; বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কোনো আল্লাহদ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আল্লাহদ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, একে আদৌ আল্লাহদ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

قَوْلُهُ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ : এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতার যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় হলো আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চেয়েও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চেয়ে কম পাপ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ : অর্থাৎ যখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, তুমি যা করতে পার, তা কর। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। আর সেখানে আরামই আরাম! এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোনো শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فاقض ما انت قاض [তোমার যা করবার করে ফেল] বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা, যা লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মুজেযার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং ঈমান আনয়নের পরক্ষণেই যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

অনুবাদ :

٥٢. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى بَعْدَ سِنِيْنَ اَقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَدْعُوْهُمْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَى الْحَقِّ فَلَمْ يَزِيْدُوْا اِلَّا عُتُوًّا اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَوَصْلِ هَمْزَةِ اَسْرِ مِنْ سَرٰى لُغَةٌ فِىْ اَسْرٰى اَىْ سِرْبِهِمْ لَيْلًا اِلَى الْبَحْرِ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْنَ . يَتَّبِعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ فَيَلِجُوْنَ وَرَاءَكُمُ الْبَحْرَ فَاُنْجِيْكُمْ وَاُغْرِقُهُمْ .

৫২. আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এই মর্মে ওহী করেছিলাম কয়েক বছর তাদের মাঝে অবস্থান করার পর। আর এসময় তিনি তাদের মাঝে আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাদেরকে সত্যের প্রতি ডাকতে থাকেন। কিন্তু এতে করে তাদের হঠকারিতাই বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হোন বনী ইসরাইলকে নিয়ে। অপর এক কেরাতে اَنْ-এর نُوْن-এর নিচে যের এ اَسْرِ-এর هَمْزَة টি هَمْزَة وَصْل-এর সাথে পঠিত রয়েছে; سَرٰى (ض) হতে নিষ্পন্ন। যা اَسْرٰى-এর অপর এক লোগাতে রয়েছে [سَيْر তথা ভ্রমণ অর্থে] অর্থাৎ তাদেরকে নিয়ে রাতের আঁধারে সমুদ্র পানে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সমুদ্রে নেমে পড়বে, তখন আমি আপনাদেরকে পরিত্রাণ দিব এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারব।

٥٣. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ حِيْنَ اُخْبِرَ بِسَيْرِهِمْ فِى الْمَدَائِنِ قِيْلَ كَانَ لَهٗ اَلْفُ مَدِيْنَةٍ وَاثْنَتَا عَشَرَةَ اَلْفَ قَرْيَةٍ حٰشِرِيْنَ ج جَامِعِيْنَ الْجَيْشَ .

৫৩. অতঃপর ফেরাউন প্রেরণ করল যখন তাদের নৈশ ভ্রমণ তথা রাতের আঁধারে পলায়নের সংবাদ অবগত হলো শহরে শহরে বলা হয় যে, তার কর্তৃত্বাধীন শহরের সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং গ্রামের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। সংগ্রহকারী সৈন্য জমায়েতকারী।

٥٤. قَائِلًا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ طَائِفَةٌ قَلِيْلُوْنَ قِيْلَ كَانُوْا سِتَّمِائَةِ اَلْفٍ وَسَبْعِيْنَ اَلْفًا وَمُقَدَّمَةُ جَيْشِهٖ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ فَقَلَّلَهُمْ بِالنَّظْرِ اِلٰى كَثْرَةِ جَيْشِهٖ .

৫৪.আর তাদেরকে এ বলে উৎসাহিত করল যে, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল কথিত আছে যে, তারা ছিলেন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আর ফেরাউনের অগ্রজ দলেই ছিল সাতলক্ষ। ফেরাউন সম্প্রদায় নিজেদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদেরকে অতি অল্প ও নগণ্য মনে করল।

٥٥. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ . فَاعِلُوْنَ مَا يُغِيْظُنَا .

৫৫. তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে। আমাদের রাগান্বিত হওয়ার কর্ম করেছে।

٥٦. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ . مُتَيَقِّظُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ حَاذِرُوْنَ مُسْتَعِدُّوْنَ .

৫৬. এবং আমরা সকলেই সদা শঙ্কিত সতর্ক। অন্য কেরাতে حَاذِرُوْنَ রয়েছে। যার অর্থ– প্রস্তুত।

অনুবাদ :

٥٧. قَالَ تَعَالٰى فَاَخْرَجْنٰهُمْ اَىْ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهٗ مِنْ مِصْرَ لِيَلْحَقُوْا مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ مِنْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ كَانَتْ عَلٰى جَانِبَىِ النِّيْلِ وَّعُيُوْنٍ ـ اَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِى الدُّوْرِ مِنَ النِّيْلِ ـ

৫৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন পরিণামে আমি তাদেরকে বহিষ্কৃত করলাম অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে মিশর হতে। যাতে তারা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হতে পারে। উদ্যানরাজি নীল নদের দু'পার্শ্বে অবস্থিত। ও প্রস্রবণ হতে। যা নীলনদ হতে তাদের ঘর বাড়িতে প্রবাহিত ছিল।

٥٨. وَكُنُوْزٍ اَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُمِّيَتْ كُنُوْزًا لِاَنَّهٗ لَمْ يُعْطَ حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهَا وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ ـ مَجْلِسٍ حَسَنٍ لِلْاُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ يَحُفُّهٗ اَتْبَاعُهُمْ ـ

৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা كُنُوْزٌ হলো প্রকাশ্য ও বাহ্যিক সম্পদ যেমন স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি كُنُوْزٌ নামকরণের কারণ হলো তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করা হয়নি। রাজা-বাদশাহ ও মন্ত্রীদের জন্য নির্মিত সুদর্শন মিলনায়তন যাকে তাদের অনুসারীরা ঘিরে রাখে।

٥٩. كَذٰلِكَ ج اَىْ اِخْرَاجُنَا كَمَا وَصَفْنَا وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ـ بَعْدَ اِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ـ

৫৯. এরূপেই ঘটেছিল অর্থাৎ আমার বহিষ্কার এরূপই যেমনটি বর্ণনা করলাম এবং বনী ইসলাঈলকে করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারার পর।

٦٠. فَاَتْبَعُوْهُمْ لَحِقُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ـ وَقْتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ ـ

৬০. তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। তাদের সাথে মিলিত হলো সূর্য উদয়ের সময়ে।

٦١. فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ اَىْ رَاٰى كُلٌّ مِّنْهُمَا الْاٰخَرَ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ج يُدْرِكُنَا جَمْعُ فِرْعَوْنَ وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ

৬১. অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে দেখল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আমাদেরকে ফেরাউন বাহিনী পেয়ে যাবে অথচ তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই।

٦٢. قَالَ مُوْسٰى كَلَّا ج اَىْ لَنْ يُّدْرِكُوْنَا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ بِنَصْرِهٖ سَيَهْدِيْنِ ـ طَرِيْقَ النَّجَاةِ ـ

৬২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, কখনো নয় অর্থাৎ তারা কখনোই আমাদেরকে ধরতে পারবে ন আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক অর্থাৎ তাঁর সাহায্য সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন। মুক্তির পথ।

অনুবাদ :

٦٣. قَالَ تَعَالٰى فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ اِنْشَقَّ اِثْنٰى عَشَرَ فِرْقًا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ج اَلْجَبَلِ الضَّخْمِ بَيْنَهَا مَسَالِكُ سَلَكُوْهَا لَمْ يَبْتَلَّ مِنْهَا سُرُجُ الرَّاكِبِ وَلَا لِبْدُهٗ.

৬৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর! তিনি তাতে আঘাত করলেন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে বার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। বৃহৎ পাহাড়ের মতো, সেগুলোর মাঝে রাস্তা হয়ে গেল। আর তারা উক্ত রাস্তা বেয়ে পার হয়ে গেল। অথচ আরোহীর গাদি এবং তাদের জিন পর্যন্ত সিক্ত হলো না।

٦٤. وَاَزْلَفْنَا قَرَّبْنَا ثَمَّ هُنَالِكَ الْاٰخَرِيْنَ. فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ حَتّٰى سَلَكُوْا مَسَالِكَهُمْ.

৬৪. আমি সেথায় উপনীত করলাম নিকটবর্তী করলাম অপর দলটিকে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায় [সেনাবাহিনী]-কে এবং তারা বনী ইসরাঈলের উক্ত পথে চলতে লাগল।

٦٥. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ ج بِاِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلٰى هَيْئَتِهِ الْمَذْكُوْرَةِ.

৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গী সকলকে। উল্লিখিত সুরতে তাদেরকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়ে।

٦٦. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ. فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ بِاِطْبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَمَّ دُخُوْلُهُمُ الْبَحْرَ وَخُرُوْجُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْهُ.

৬৬. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় [বাহিনী]-কে তাদের উপর সমুদ্রের পানি চাপিয়ে দিয়ে যখন তাদের সমুদ্রে প্রবেশ ও বনী ইসরাঈলদের তা থেকে বের হওয়া পূর্ণ হলো।

٦٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ اِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ لَاٰيَةً عِبْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ. بِاللّٰهِ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ غَيْرُ اٰسِيَةَ امْرَاَةِ فِرْعَوْنَ وَحِزْقِيْلَ مُؤْمِنُ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ نَامُوْسٰى الَّتِىْ دَلَّتْ عَلٰى عِظَامِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৬৭, এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করার মধ্যে নিদর্শন তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নয়। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, ফেরাউন বংশীয় হিযকীল নামক জনৈক মুমিন এবং মারাইয়াম বিনতে নামূসা, যিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেহাবশেষের ব্যাপারে নির্দেশনা দান করেছিলেন, এ কজন ছাড়া কেউই ঈমান আনয়ন করেনি।

٦٨. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ فَانْتَقَمَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ بِاِغْرَاقِهِمْ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَاَنْجَاهُمْ مِنَ الْغَرَقِ.

৬৮. আপনার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী তিনি কাফেরদেরকে নিমজ্জিতকরণের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছেন, পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি। তাইতো তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ شِرْذِمَةٌ : এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র দল। বহুবচন شَرَاذِمُ আর لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ -এর মধ্যে মূলত لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلَةٌ হওয়া সঙ্গত ছিল। কারণ قَلِيْلَةٌ হলো شِرْذِمَةٌ -এর সিফত। কিন্তু شِرْذِمَةٌ যেহেতু اَسْبَاطٌ -এর অর্থ সম্বলিত, আর তার মধ্য থেকে প্রত্যেক سِبْطٌ [দল] হলো قَلِيْلٌ তথা স্বল্প সংখ্যক। এ কারণেই جَمْع ব্যবহার করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী] قَلِيْلُوْنَ শব্দটি اِنَّ -এর দ্বিতীয় خَبَرٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ لَجَمِيْعٌ بِمَعْنَى جَمْعٌ اَىْ جَمَاعَةٌ : جَمِيْع শব্দটি تَاكِيْد -মূলক শব্দ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, حَرْفُ تَاكِيْد তো অন্য শব্দের تابع হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এখানে تَابِعٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। উত্তরের সারসংক্ষেপ এই যে, এটা তাকীদের শব্দাবলির অন্তর্গত নয়; বরং جَمَاعَةٌ বা দল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ حَاذِرُوْنَ : আবূ উবায়দা বলেন, حَذِرُوْنَ ও حَاذِرُوْنَ উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। উভয়টির অর্থ হলো সতর্ক, সজাগ। কেউ কেউ এ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, حَذِرٌ অর্থ হলো সজাগ, আর حَاذِرٌ -এর অর্থ হলো ভীত। কেউ বলেন, حَذِرٌ সেসব সৃষ্টিকে বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক হয়। যেমন কাক। আর حَاذِرٌ বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক নয়, বরং পরবর্তী সময়ে চতুর ও সতর্ক হয়।

قَوْلُهُ مَقَامٍ كَرِيْمٍ : كَرِيْمٌ -এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্নরূপ উক্তি করেছেন। যথা- ১. কেউ উন্নত দালান-কোঠা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ২. কেউ আমীর-উমারা তথা বড়দের মজলিস উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমনটা ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ كَذَالِكَ : এটা স্থানগতভাবে مَنْصُوْبٌ -ও হতে পারে। তখন বাক্যটি এমন হবে- اَخْرَجْنَا هُمْ مِثْلَ ذَالِكَ الْاِخْرَاجِ আবার مَقَامٍ كَرِيْمٍ -এর সিফাত হিসেবে مَجْرُوْرٌ -ও হতে পারে, তখন বাক্যটি হবে- مَقَامٌ ذَالِكَ الْمَقَامِ الَّذِىْ وَصَفْنَا আর যদি مُبْتَدَاْ مَحْذُوْف -এর خَبَرٌ -এর গণ্য হয় তাহলে مَرْفُوْعٌ হবে অর্থাৎ- اَلْاَمْرُ كَذَالِكَ ; كَانَ لَهُمْ

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَاهَا : এর عَطْف হলো فَاَخْرَجْنَا -এর উপর।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ : এর দ্বারা সেসব লোকদের অধিকাংশ উদ্দেশ্য নয়, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনে গিয়েছিল। কেননা তারা সবাই তো পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল; বরং এর দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা ফেরাউনের ধর্ম ও তার আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানও এনেছিল। যেমন হিযকীল, ফেরআউনের কন্যা, তার স্ত্রী আছিয়া এবং নামূসার কন্যা- যে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ইমাম সীবওয়াইহ كَانَ -কে অতিরিক্ত বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوْسَى : মিশরে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থানকাল যখন দীর্ঘ হয়ে গেল এবং সর্বদিক দিয়ে তিনি ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকট তাঁর সত্যতার ও আল্লাহর একত্ববাদের দলিল সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে সম্মত হলো না, তখন তাদেরকে আজাব ও সাজা দ্বারা সমুচিত শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে রাতের আঁধারে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। বললেন, ফেরাউন তোমার পশ্চাদ্ধাবন করবে, তাতে বিচলিত হবে না। বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন তুচ্ছভাবে شِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ [ক্ষুদ্র দল] অভিহিত করেছিল। অন্যথায় তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষাধিক।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ : এখানে لَنَا -কে حَصْرٌ [সীমিতরকণ] ও ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত وَاِنَّهُمْ لَغَائِظُوْنَ لَنَا ছিল। অর্থাৎ প্রথমত তারা আমার অনুমতিবিহীন চলে গেছে। দ্বিতীয়ত প্রতারণা করে কিবতীদের অলঙ্কারাদি নিয়ে গেছে। তাদের এ কীর্তি আমাদের উত্তেজিত ও রাগান্বিত করেছে।

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ : এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেওয়া হয়; কিন্তু এতে

একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিশরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আজাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গাম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ.) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোনো সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরাউন সম্প্রদায়ের বিষয়- সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুটি জবাব তাফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিশরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিশরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদি ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কুরআনের আয়াতে কোনোরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, এই ঘটনাটি কুরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন- সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়- সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাঈলের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াতে اَلَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদা (র.) বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোনো সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিশর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদা (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত দ্বারা শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ـ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ : পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চিৎকার করে উঠল, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহে ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি হযরত মূসা (আ.)-এরও আগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন- كَلَّا অর্থাৎ আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.)-এর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন- لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন- اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাসূলের সাথে আল্লাহর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

অনুবাদ :

٦٩. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ نَبَاَ خَبَرَ اِبْرٰهِيْمَ ـ وَيُبْدَلُ مِنْهُ ـ

৬৯ তাদের নিকট বর্ণনা করুন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকট বৃত্তান্ত সংবাদ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর। এর থেকে بَدَل হলো পরবর্তী আয়াতটি।

٧٠. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ

৭০. তিনি যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর?

٧١. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا صَرَّحُوْا بِالْفِعْلِ لِيَعْطِفُوْا عَلَيْهِ فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ـ اَىْ نُقِيْمُ نَهَارًا عَلٰى عِبَادَتِهَا زَادُوْهُ فِى الْجَوَابِ اِفْتِخَارًا بِهٖ ـ

৭১. তারা বলল, আমরা মূর্তির পূজা করি। এখানে نَعْبُدُ ফেলটি স্পষ্ট করে উল্লেখের কারণ হলো সামনের কথার উপর عَطْف শুদ্ধ হওয়া। এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকি অর্থাৎ আমরা দিনের বেলায় তাদের উপাসনায় লিপ্ত থাকি। তাদের পূজার গর্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উত্তরে এ অংশটি বৃদ্ধি করেছে।

٧٢. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ حِيْنَ تَدْعُوْنَ ـ

৭২. তিনি বললেন, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?

٧٣. اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اِنْ عَبَدْتُمُوْهُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ـ كُمْ اِنْ لَمْ تَعْبُدُوْهُمْ ـ

৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে? যদি তোমরা তাদের পূজা কর অথবা অপকার করতে পারে যদি তোমরা তাদের পূজা না কর।

٧٤. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ اَىْ مِثْلَ فِعْلِنَا ـ

৭৪. তারা বলল, না তবে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। অর্থাৎ আমাদের কর্মের মতো

٧٥. قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ز

৭৫. তিনি বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ কিসে পূজা করতেছ।

٧٦. اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ـ

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা।

٧٧. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ لَا اَعْبُدُهُمْ اِلَّا لٰكِنْ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ فَاِنِّىْ اَعْبُدُهٗ ـ

৭৭. তারা সকলেই আমার শত্রু আমি তাদের উপাসনা করি না, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। আমি তাঁর উপাসনা করি।

٧٨. الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ـ اِلَى الدِّيْنِ ـ

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন। দ্বীন তথা ধর্মের প্রতি।

٧٩. وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ـ

৭৯. তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।

٨٠. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ص

৮০. আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

অনুবাদ :

٨١. وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ .

৮১. এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন।

٨٢. وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَرْجُوْا اَنْ يَغْفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ اَىِ الْجَزَاءِ .

৮২. এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে।

٨٣. رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا عِلْمًا وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ . اَىِ النَّبِيِّيْنَ .

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অর্থাৎ নবীগণের মধ্যে গণ্য করুন।

٨٤. وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ ثَنَاءً حَسَنًا فِى الْاٰخِرِيْنَ . الَّذِيْنَ يَاْتُوْنَ بَعْدِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

৮৪. আমাকে যশস্বী করুন অর্থাৎ উত্তম প্রশংসার অধিকারী করুন। পরবর্তীদের মধ্যে যারা কিয়ামত পর্যন্ত আমার পরে আগমন করবে।

٨٥. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ . اَىْ مِمَّنْ يُعْطَاهَا .

৮৫. এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অর্থাৎ যাদেরকে তা দেওয়া হবে, তাদের।

٨٦. وَاغْفِرْ لِاَبِىْ ج اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ . بِاَنْ تَتُوْبَ عَلَيْهِ فَيَغْفِرَ لَهٗ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ اللّٰهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٍ .

৮৬. আর আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করুন, তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ আপনি তার তওবা কবুল করুন। এ দোয়ার অসিলায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার আহ্বান করাটা তার পিতা আল্লাহর শত্রু বলে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বের ঘটনা। যেমনটি সূরা বারাআতে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٧. وَلَا تُخْزِنِىْ تَفْضَحْنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ اَىِ النَّاسُ .

৮৭. এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থান দিবসে। অর্থাৎ লোকদেরকে পুনরুত্থান দিবসে।

٨٨. قَالَ تَعَالٰى فِيْهِ . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌ اَحَدًا .

৮৮. আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সম্পতি কোনো কাজে আসবে না কারো।

٨٩. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ . مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ .

৮৯. সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে। শিরক ও নেফাক থেকে। এটা হলো মুমিনের অন্তর। কেননা এগুলো তাকে উপকৃত করবে।

٩٠. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قُرِّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيَرَوْنَهَا .

৯০. সেদিন নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত খোদাভীরুদের জন্য। ফলে তারা তা দেখতে পাবেন।

অনুবাদ :

٩١. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ اُظْهِرَتْ لِلْغٰوِيْنَ ـ الْكَافِرِيْنَ ـ

৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম কাফেরদের জন্য।

٩٢. وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ـ

৯২. তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়? তোমরা যাদের ইবাদত করতে।

٩٣. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ مِنَ الْاَصْنَامِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ـ بِدَفْعِهٖ عَنْ اَنْفُسِهِمْ لَا ـ

৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্যান্য মূর্তিসমূহের। তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে? তোমাদের থেকে শাস্তি প্রতিরোধকল্পে। অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নিজেদের থেকে তা প্রতিহত করতে? না, তারা তা পারে না।

٩٤. فَكُبْكِبُوْا اُلْقُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ ـ

৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

٩٥. وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَتْبَاعُهٗ وَمَنْ اَطَاعَهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَجْمَعُوْنَ ـ

৯৫. ইবলীসের বাহিনীর তার অনুসারীদের এবং যেসব মানুষ ও জিন তার অনুসরণ করে সকলকেও।

٩٦. قَالُوْا اَىِ الْغَاوُوْنَ وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ مَعَ مَعْبُوْدِيْهِمْ ـ

৯৬. তারা অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে তাদের উপাস্যদের সাথে।

٩٧. تَاللّٰهِ اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهٗ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ ـ

৯৭. আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এখানে اِنْ টি ثَقِيْلَةٌ হতে خَفِيْفَةٌ আর এর ইসম উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّهٗ আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। প্রকাশ্য।

٩٨. اِذْ حَيْثُ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ج فِى الْعِبَادَةِ ـ

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। ইবাদতের ক্ষেত্রে।

٩٩. وَمَا اَضَلَّنَآ عَنِ الْهُدٰى اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ اَىِ الشَّيٰطِيْنُ اَوْ اَوَّلُوْنَ الَّذِيْنَ اِقْتَدَيْنَا بِهِمْ ـ

৯৯. আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল সৎপথ হতে দুষ্কৃতিকারীরাই অর্থাৎ শয়তান বা সে সকল পূর্বপুরুষরা, আমরা যাদের অনুসরণ করতাম।

١٠٠. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ـ كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

১০০. পরিণামে আমাদের কোনো সুপরিশকারী নেই। যেমন মুমিনদের পক্ষে সুপরিশের জন্য ফেরেশতা, নবীগণ এবং মুমিনগণ রয়েছেন।

١٠١. وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ـ اَىْ يُهِمُّهٗ اَمْرُنَا ـ

১০১. এবং কোনো সুহৃদ বন্ধুও নেই। যাকে আমাদের অবস্থা চিন্তিত করে দিবে।

অনুবাদ :

١٠٢. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّي وَنَكُونَ جَوَابُهُ.

১০২. হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত! অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম। তাহলে আমরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। এখানে لَوْ টি تَمَنِّيْ -এর জন্য এসেছে। আর এর جَوَابٌ হলো نَكُوْنَ

١٠٣. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِهِ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.

১০৩. এতে অবশ্যই রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনীতে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٠٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

১০৪. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ : وَاتْلُ -এর وَاوْ টি عَاطِفَةٌ , পূর্বে উহ্য اُذْكُرْ -এর উপর عَطْف হয়েছে যা اِذْ نَادٰى مُوْسٰى -এর আমিল। এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ : এ অংশটি نَبَأَ اِبْرَاهِيْمَ -এর بَدَلْ এবং উহ্য সংক্ষিপ্ত কথার বিবরণ।

قَوْلُهُ صَرَّحُوْا بِالْفِعْلِ لِيَعْطِفُوْا عَلَيْهِ : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : যুক্তির দাবি মতে مَاتَعْبُدُوْنَ -এর জবাবে اَصْنَامًا বলা উচিত ছিল। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ -এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কেননা প্রশ্নের মধ্যে فِعْل উল্লেখ থাকলে উত্তরে فِعْل উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

উত্তর : এখানে نَعْبُدُ ফে'ল উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ -এর عَطْف বৈধ হয়ে যায়। নতুবা اِسْم -এর উপর فِعْل -এর عَطْف হয়ে যায়। আর তা সঙ্গত নয়।

قَوْلُهُ نُقِيْمُ نَهَارًا : এটা نَظَلُّ -এর অর্থের বর্ণনা, এখন প্রশ্ন হলো نَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ বলার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর : মুশরিকরা যেহেতু মূর্তিপূজার ব্যাপারে গর্ববোধ করত। তাই তার উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে আরো গর্ব করত। এ কারণেই তারা فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ বলেছে যে, আমরা তো সর্বদা তাদের সম্মুখে মস্তকাবনত করে থাকি, আর এটা আমাদের গর্বের বিষয়ও।

قَوْلُهُ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ : এখানে মুযাফ লুপ্ত রয়েছে, বাক্যটি এমন ছিল هَلْ يَسْمَعُوْنَ دُعَائَكُمْ তারা কি তোমার ডাক শোনে? কেননা সত্তা শ্রবণের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمْ : এ হামযাটি উহ্য ফে'লের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর مَا হলো عَاطِفَة ; বাক্যটি এমন ছিল– اَتَاَمَّلْتُمْ فَاَبْصَرْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ [তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, কিসের উপাসনা করছ?]

قَوْلُهُ وَاٰبَاۤئُكُمْ : এর عَطْف হলো تَعْبُدُوْنَ -এর ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِل -এর উপর, এ করণে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل দ্বারা মাঝে একটি তাকীদ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ : কেননা তারা আমার শত্রু। হযরত ইবরাহীম (আ.) শত্রুতার সম্বন্ধকে নিজের প্রতি করেছেন। এটা হলো تعريض ; আর উপদেশের ক্ষেত্রে تَصْرِيْح [স্পষ্ট উল্লেখ] থেকে تَعْرِيْض [ইঙ্গিতমূলক উল্লেখ] অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি عَدُوٌّ لَّكُمْ -এর স্থলে عَدُوٌّ لِّيْ বলেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا لٰكِنَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ : اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; এর অর্থ হলো– لٰكِنَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ لَيْسَ بِعَدُوِّىْ بَلْ هُوَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ [রাব্বুল আলামীন আমার দুশমন নন; বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আমার পরম বন্ধু!]

قَوْلُهُ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ : এটা رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -এর সিফত, কিংবা بَدْلٌ কিংবা عَطْفُ بَيَانْ অথবা هُوَ উহ্য مُبْتَدَأْ -এর خَبَرْ -এর পরবর্তী অংশ এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ : [আমি অসুস্থ হলে তিনি আমায় সুস্থ করেন] এখানে অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধিকে নিজের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন; আল্লাহর প্রতি নয়। এটা বিশেষ আদবের পরিচায়ক।

قَوْلُهُ لِسَانَ صِدْقٍ : এটা صِفَتْ -এর প্রতি مَوْصُوْف -এর ইযাফতের অন্তর্গত। অর্থাৎ মূলত اَللِّسَانُ الصِّدْقُ ছিল।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى فِيْهِ اَىْ فِىْ شَانِ ذَالِكَ الْيَوْمِ : কেউ কেউ বলেন– يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ এটাও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাণী এবং يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ থেকে بَدْل ; প্রথম ক্ষেত্রে بَدل বলেছেন, কিন্তু তা প্রশ্নমুক্ত নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ : [তবে যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।] দাবি এই যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা রয়েছে। তবে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, যদি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -কে مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ স্থির করা হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হবে, আর اَحَدًا -কে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ স্থির করা হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। কেননা مَنْ اَتَى اللّٰهَ যা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এটা اَحَدًا -এর جِنْس -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ : اَيْنَ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مَا مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ এটা الَّذِىْ অর্থে كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ হলো حال বাক্যটি এরূপ হবে– اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَهُ [তোমরা যাদের উপাসনা করতে, তারা কোথায়?]

قَوْلُهُ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً : অর্থাৎ হায়! যদি আমাদের একবার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলত!

قَوْلُهُ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّىْ : এখানে لَوْ হলো تَمَنِّىْ বা আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক, আর فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ [তাহলে আমরা মুমিনদের দলভুক্ত হতাম] হলো এর جَوَابْ ; কেউ কেউ বলেন– لَوْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর এর جَوَابْ উহ্য রয়েছে فَنَكُوْنَ হলো كَرَّةً -এর উপর مَعْطُوْفٌ ; বাক্যটি এরূপ হবে– لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَرَجَعْنَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ অথবা لَخَلَصْنَا مِنَ الْعَذَابِ হলো এর جَوَابْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব পালনে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার পথভ্রষ্টতার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় বাবেল এলাকায় বাস করতো। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের পূজারী ছিল এবং কিছু লোক মূর্তি পূজাও করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) অকাট্য যুক্তি এবং বলিষ্ঠ দলিল প্রমাণ দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ অর্থাৎ [হে নবী!] আপনি মক্কাবাসীর নিকট ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন, মক্কাবাসীরা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার ব্যাপারে গৌরব বোধ করে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাওহীদে বিশ্বাসী। তিনি এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই জীবনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতেন। শিরক ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারকে দূরীভূত করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই ঘটনা হয়তো মক্কার কাফেরদের অন্তরের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং মূর্তিগুলো যে নিতান্ত অসহায় একথাও বলেছেন। এরপর বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে হেদায়েত দেওয়া,

রিজিক পৌছানো বা জীবিত রাখা সবই আল্লাহপাকের কর্তৃত্বাধীন। অতএব, মানুষের ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নয়।

তাই তিনি পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন- مَا تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কার পূজা করছো? হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্যে প্রশ্ন করেননি; কেননা তিনি জানতেন যে তারা মূর্তিপূজা করে। তিনি প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে একথা জানাবার জন্যে যে, তোমরা যেসব বস্তুর পূজা কর এবং যেসব বস্তুর সম্মুখে ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ কর, সেগুলো আদৌ এর যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি হলো মানুষ। অতএব, সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো অন্য কোনো সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে পারে না। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কিসের পূজা কর?

তারা বলল- نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ অর্থাৎ আমরা মূর্তি পূজা করি, আর সারাদিন তাদের কাছেই বসে থাকি। আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি তাদেরই সম্মুখে, আর সারাদিন ধরে ভক্তিভরে তাদেরই সম্মুখে আমরা বসে থাকি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তারা মূর্তিপূজার উপর গর্ব প্রকাশার্থে দীর্ঘ জবাব দিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)বলেন- هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ـ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে তাদেরকে ডাক, তারা কি তোমাদের ডাক শ্রবণ করতে পারে? তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে? অথবা তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে ঐ মূর্তিগুলো কারো কোনো কথা শ্রবণও করতে পারে না, কোনো কিছু বুঝতেও পারে না এবং কারো ভালো-মন্দ কোনো কিছুই করতে সক্ষম হয় না ; এমনকি, যদি তাদের দেহে একটি মশা মাছিও বসে তবে তা তাড়াবারও ক্ষমতা তারা রাখে না, এমন অক্ষম, অসহায় বস্তুকে তোমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর কোন যুক্তিতে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) هَلْ يَسْمَعُوْنَ -এর অর্থ করেছেন এভাবে- তারা কি তোমাদের কথা শ্রবণ করতে পারে? আর اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা কর, তবে তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে? اَوْ يَضُرُّوْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা না কর, তাহলে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ তারা বলে না, এসব কারণে আমরা তাদের পূজা করি না। আমরা এসব যুক্তি তর্কেরও ধার ধারি না। আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি, তাই আমরাও এদের পূজা করি।

قَوْلُهُ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ : কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া : এই আয়াতে لسان বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সৎ-গুণাবলি দ্বারা স্মরণ করে। -[ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী]

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে ।

খ্যাতি-যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে বৈধ : যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে- تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ; আর আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দেওয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে।

সারকথা এই যে, এই দোয়া দ্বারা কোনো সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কুরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তা দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র.) হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর জবানীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। ১. অর্থসম্পদের ভালোবাসা এবং ২. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বোঝানো হয়েছে, বা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন অথবা কোনো গুনাহ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন।" এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন লৌকিকতা প্রদর্শন না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালোবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েজ। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। যথা- ১. যদি নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয়; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। ২. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। ৩. যদি তা অর্জন করার জন্য কোনো গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় : সূরা তওবার ১১৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ; কুরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া কামনা করা দ্ব্যর্থহীনরূপে নাজায়েজ। যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজেই কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ـ

জবাবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তাওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ.)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পেরেছিলেন, নাকি তার মৃত্যুর পর, নাকি কিয়ামতের দিন জানবেন? এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো অর্থ সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছবে।

এই আয়াতের اِسْتِثْنَاءٌ -কে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে সেদিন কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোনো কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের কাছে প্রসিদ্ধ তাফসীর এই যে, আয়াতের اِسْتِثْنَاءٌ টি مُتَّصِلٌ এবং অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতের দিনও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে; কাফেরের কোনো উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَلَا بَنُوْنَ বলা হয়েছে, যার অর্থ– পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যাসন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতের দিন বিশেষ করে পুত্রসন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা করা হত।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قَلْبٌ سَلِيْمٌ -এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্‌ণ হয়ে থাকে। যেমন কুরআন বলে– فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে: আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তাফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোনো সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাশরের ময়দানেও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোনো সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারটিও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা ছওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের ছওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে। যেমন কোনো কোনো হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার মতো উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কুরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গাম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গাম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোনো উপকার হবে না। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র, লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার ব্যাপারে তাই হবে। কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তা-ই হতে পারে–

١. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ . ٢. اِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ . ٣. لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّالِدِهٖ .

অনুবাদ :

١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ج بِتَكْذِيْبِهِمْ لَهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيْءِ بِالتَّوْحِيْدِ اَوْ لِاَنَّهُ لِطُوْلِ لُبْثِهِ فِيْهِمْ كَاَنَّهُ رُسُلٌ وَتَانِيْثُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَتَذْكِيْرِهِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ.

১০৫ হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। তারা হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দরুন। সকল রাসূল তাওহীদের বার্তা আনায় শরিক থাকার কারণে অথবা তিনি দীর্ঘদিন তাদের মাঝে অবস্থানের ফলে মনে হয় তিনি একাই অনেক রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। قَوْمٌ শব্দটি অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে স্ত্রীলিঙ্গ এবং শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে পুংলিঙ্গ।

١٠٦. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نَسَبًا نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج اللّٰهَ.

১০৬. যখন তাদের বংশীয় ভ্রাতা হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করবে না? আল্লাহকে।

١٠٧. اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. عَلٰى تَبْلِيْغِ مَاۤ اُرْسِلْتُ بِهِ.

১০৭. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা প্রচারে।

١٠٨. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. فِيْمَا اٰمُرُكُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهِ.

১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করি, তা পালন কর।

١٠٩. وَمَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلٰى تَبْلِيْغِهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِيَ اَيْ ثَوَابِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

১০৯. আমি তোমাদের নিকট এর কোনো প্রতিদান চাই না এর প্রচারের বিনিময়ে। আমার পুরস্কার তো অর্থাৎ আমার ছওয়াব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকটই রয়েছে।

١١٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا.

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এটা তাকিদ স্বরূপ দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে।

١١١. قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ نُصَدِّقُ لَكَ لِقَوْلِكَ وَاتَّبَعَكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ وَاَتْبَاعُكَ جَمْعُ تَابِعٍ مُبْتَدَأٌ الْاَرْذَلُوْنَ. اَلسَّفَلَةُ كَالْحَاكَةِ وَالْاَسَاكِفَةِ.

১১১. তারা বলল, আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করব? সত্যায়ন করব তোমার প্রতি তোমার কথায় অথচ ইতর ব্যক্তিরা তোমার অনুসরণ করছে। وَاتَّبَعَكَ শব্দটি অন্য কেরাতে اَتْبَاعُكَ রয়েছে, যা تَابِعٌ -এর বহুবচন এটা মুবতাদা। [আর اَرْذَلُوْنَ হলো তার খবর] اَرْذَلُوْنَ অর্থ– ইতর শ্রেণির লোকজন যেমন– তাঁতী, মুচী প্রমুখ।

١١٢. قَالَ وَمَا عِلْمِيْ اَيْ عِلْمٍ لِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ج

১১২. হযরত নূহ (আ.) বললেন, তারা কি করত তা আমার জানা নেই।

অনুবাদ :

١١٣. إِنْ مَا حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلٰى رَبِّىْ فَيُجَازِيْهِمْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ج تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا عِبْتُمُوْهُمْ .

১১৩. তার হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ ফলে তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। যদি তোমরা বুঝতে। তাহলে তাদের দোষ তালাশ করতে না।

١١٤. وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

১১৪. মুমিনদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।

١١٥. إِنْ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ط بَيِّنُ الْإِنْذَارِ .

১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

١١٦. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ عَمَّا تَقُوْلُ لَنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ . بِالْحِجَارَةِ أَوْ بِالشَّتْمِ .

১১৬. তারা বলল, হে নূহ! তুমি যা বলছ তা থেকে যদি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তারাঘাতে নিহতদের মাঝে শামিল হবে। প্রস্তরসমূহ কিংবা গালমন্দের মাধ্যমে।

١١٧. قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ج

১১৭. হযরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে।

١١٨. فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا أَىْ أُحْكُمْ وَنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন!

١١٩. قَالَ تَعَالٰى فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ج اَلْمَمْلُوْءِ مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ .

১১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে যা মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ও পশু-পাখিতে ভরপুর ছিল।

١٢٠. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ أَىْ بَعْدَ إِنْجَائِهِمُ الْبَاقِيْنَ ط مِنْ قَوْمِهٖ .

১২০. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অর্থাৎ তাদেরকে রক্ষা করার পর, অবশিষ্ট সকলকে তাঁর সম্প্রদায়ের।

١٢١. إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

১২১ এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

১২২. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ لَهُ الخ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

প্রশ্ন : নূহ (আ.)-এর ক্ষেত্রে مُرْسَلِيْنَ বহুবাচনিক শব্দ চয়ন করার কারণ কি? তিনি তো সংখ্যায় একজন।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

১. সকল নবী ও রাসূল দ্বীনী উসূল তথা তাওহীদ, রিসালত, পুনরুত্থান ও পরকালীন সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে একই আকিদার বিশ্বাসী। এ হিসেবে একজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা সকল নবী রাসূলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।

২. ব্যাখ্যাকার (র.) أَوْ لِاَنَّهُ দ্বারা দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়তের আমল ছিল অতি দীর্ঘ। স্বাভাবিকভাবে ৯৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে কয়েকজন নবীর আগমন ঘটতে পারে, অতএব তিনি একাই যেন কয়েকজন নবীর স্থলাভিষিক্ত। এ লক্ষ্যে তাঁর একার ক্ষেত্রেই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَانِيْثُ قَوْمِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ : এখানে قَوْمٌ-কে স্ত্রীলিঙ্গ ধরে فِعْل-কে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। কেননা قَوْمٌ শব্দটি অর্থ [তথা جَمَاعَةٌ] -এর বিচারে স্ত্রীলিঙ্গ, আর শাব্দিক বিচারে পুংলিঙ্গ। قَوْم-এর تَصْغِيْر [ক্ষুদ্রবাচক শব্দ] আসে قُوَيْمَةٌ : এর দ্বারাও শব্দটি অর্থের বিচারে স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া বুঝা যায়। সে সব اِسْمُ جَمْعٍ শব্দেরও এ একই অবস্থা যেগুলোর একবচন কোনো শব্দ নেই। যেমন– رَهْط ، نَفَر প্রভৃতি। এ কারণেই لَهُمْ ، اَخُوْهُمْ ও تَتَّقُوْنَ-এর মধ্যে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَجْرٍ : এখানে مِنْ অব্যয়টি مَفْعُوْل-এর পূর্বে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِتَّبَاعُكَ : এটা مُبْتَدَأ আর اَرْذَلُوْنَ হলো خَبَر ; মুবতাদা খবর মিলে বাক্য হয়ে اَنُؤْمِنُ-এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যেখানে وَفِىْ قِرَاءَةٍ اُخْرٰى উল্লেখ করেন, সেখানে قِرَاءَةٌ سَبْعَةٌ উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁর এ নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সর্বক্ষেত্রে নয়। কারণ এখানে اِتْبَاعُكَ কেরাত قِرَاءَةٌ سَبْعَةٌ-এর অন্তর্গত হবে।

قَوْلُهُ سَفَلَةٌ : سَفَلَةٌ শব্দটি سَافِلَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। اَلْحَائِكُ অর্থ তাঁতী, কামূস অভিধান প্রণেতা লিখেন حَاكَ الثَّوْبَ حَوْكًا وَحِيَاكًا نَسَجَهُ فَهُوَ حَائِكٌ ; আর اَلْاِسَاكِفَةُ শব্দটি اِسْخَافٌ-এর বহুবচন। অর্থ– মুচী।

قَوْلُهُ وَمَا عِلْمِىْ : এখানে দু'টি সূরত হতে পারে। ১. مَا হলো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اِنْكَارِيَّةٌ মুবতাদা, আর عِلْمِىْ হলো খবর– بَا মুতাআল্লিক হয়েছে عِلْمِىْ-এর সাথে। ব্যাখ্যাকার (র.) اَىْ عِلْمَ لِىْ বলে প্রথম সূরতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। عِلْمِىْ মূলত عِلْمٌ بِىْ ছিল। সহজার্থে بَاءٌ বিলুপ্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ اَحْكُمْ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَافْتَحْ শব্দটি اَلْفَتَّاحَةُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো– রাজত্ব করা, اَلْفَتَّاحُ অর্থ– اَلْحَاكِمُ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান। কারণ– يَفْتَحُ الْمُغْلَقَ مِنَ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রের বন্ধ তথা কঠিন বিষয়াদির দ্বার উন্মুক্ত করেন বা সমাধান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ : সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তাই মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন; কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ– لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জ্ঞাতব্য : এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণত অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আরো অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

قَالُوْا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ...... كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র; পরিবার ও জাঁকজমকতা নয় : এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচু লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একান্ত হতে পারি? হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। হযরত নূহ (আ.) জবাবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা-ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমকতাকে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতর বলে দেওয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতর এবং কে ভদ্র? আমি তার ফয়সালা করতে পারি না। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতের أَرْذَلُوْنَ শব্দটি أَرْذَلْ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো ইতর, নীচু শ্রেণির লোক, সমাজে যার সম্মান বা প্রতিপত্তি নেই। –(قَامُوْس) আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যার সম্মান নেই এবং যার অর্থ সম্পদও কম, তাকেই ارذل বলা হয়। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেনম, নিম্ন শ্রেণির লোককে أَرْذَلْ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন أَرْذَلْ-এর অর্থ হলো স্বর্ণকার। ইকরিমা (র.) বলেছেন, কাপড় বুননকারী বা তাঁতী এবং চামারকে أَرْذَلْ বলা হয়।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির কথাবার্তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিল নির্বোধ। কেননা তারা বলেছিল যে, নিম্ন শ্রেণির লোকেরা শুধু অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভেই হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তাদের সাথে মিলে মিশে তাঁর প্রতি ঈমান আনব? –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮. পৃ. ৫৩৬]

এ আয়াতসমূহের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ হয় এবং লোকেরা শয়তানের পথে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েতের জন্য হযরত নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেকালের মানুষকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হলে যে শাস্তি হবে, সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাতও করেনি এবং তাদের অন্যায় অনাচার থেকে বিরতও হয়নি; বরং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁর শত্রু হয়েছে এবং তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে।

এরপর হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তখন তাঁর জাতি বলল, সমাজের কিছু ইতর শ্রেণির লোকই তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি?

قَوْلُهُ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ : হযরত নূহ (আ.) সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর জাতিকে সত্যের দিকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তাদের নাফরমানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা হযরত নূহ (আ.)-কে হুমকি ধমকি দিতে থাকে। তারা বলল, যদি তুমি উপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত না হও, যদি তোমার এ কাজ অব্যাহত রাখ, তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে দেব। যদি প্রাণ রক্ষা করতে চাও তবে আমাদেরকে উপদেশ দেওয়া পরিত্যাগ কর।

হযরত নূহ (আ.) যখন দেখলেন, তারা কখনো হেদায়েত গ্রহণ করবে না এবং তারা তাঁর প্রাণ-সংহারে উদ্যত হতে চায়, এমন অবস্থায় হযরত নূহ (আ.)-এর হাত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উঠে। তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে– رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنَ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। অতএব, তাদের এবং আমার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও!

হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত হেদায়েত করার পরও তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করল না। অবশেষে যখন কাফেররা পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিল এবং তিনি যখন তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন, তখনই তিনি আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এ আরজি পেশ করলেন– হে পরওয়ারদেগার! এ জাতিকে বুঝাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা আমাকে শুধু মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাদের হেদায়েত গ্রহণের কোনো আশাই রয়নি। অতএব তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও।

অনুবাদ :

١٢٣. كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

১২৩. আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিলেন।

١٢٤. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

১২৪. যখন তাদের ভ্রাতা হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٢٥. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

১২৫. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ج

১২৬. অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٢٧. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১২৭. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

١٢٨. اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ اٰيَةً بِنَاءً عَلَمًا لِلْمَارَّةِ تَعْبَثُوْنَ ـ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ وَتَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَبْنُوْنَ ـ

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ পথিকদের জন্য স্মৃতিফলক নির্মাণ করছ নিরর্থক। যারা তোমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাথে খেল তামাশা কর ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর। تَعْبَثُوْنَ বাক্যটি تَبْنُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

١٢٩. وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لِلْمَاءِ تَحْتَ الْاَرْضِ لَعَلَّكُمْ كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ج فِيْهَا لَا تَمُوْتُوْنَ ـ

১২৯. আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ মাটির নিচে পানির জন্য। এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে তথায় পৃথিবীতে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না।

١٣٠. وَاِذَا بَطَشْتُمْ بِضَرْبٍ اَوْ قَتْلٍ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ مِنْ غَيْرِ رَأْفَةٍ ـ

১৩০. যখন তোমরা আঘাত হান কাউকে প্রহার বা হত্যার জন্য তখন কঠোরভাবে আঘাত হেনে থাক। কোনো নম্রতা ও দয়া-মায়াহীনভাবেই।

١٣١. فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ ذٰلِكَ وَاَطِيْعُوْنَ ج فِيْمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ ـ

১৩১. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এ ব্যাপারে এবং আমার আনুগত্য কর। যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করি।

١٣٢. وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ اَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ج

১৩২. ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন তোমাদের প্রতি নিয়ামত দিয়েছেন। সেসব [নিয়ামত] যা তোমরা জান।

١٣٣. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ـ

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন জীব-জন্তু ও সন্তান-সন্ততি।

١٣٤. وَجَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَعُيُوْنٍ ج اَنْهَارٍ ـ

১৩৪. উদ্যান বাগবাগিচা ও প্রস্রবণ নদনদী।

অনুবাদ :

১৩৫. إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِنْ عَصَيْتُمُوْنِىْ .

১৩৫. আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিবসের শাস্তির পৃথিবীতেও পরকালে যদি তোমরা আমার অবাধ্যাচরণ কর।

১৩৬. قَالُوْا سَوَاۤءٌ عَلَيْنَا مُسْتَوٍ عِنْدَنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِيْنَ . أَصْلًا أَىْ لَا نَرْعَوِىْ لِوَعْظِكَ .

১৩৬. তারা বলল, উভয়ই আমাদের জন্য সমান আমাদের নিকট বরাবর তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও। আদৌ, অর্থাৎ আমরা তোমাদের উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

১৩৭. إِنْ مَا هٰذَا الَّذِىْ خَوَّفْتَنَا بِهٖ إِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ . أَىْ إِخْتِلَاقُهُمْ وَكِذْبُهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْخَاءِ وَاللَّامِ أَىْ مَا هٰذَا الَّذِىْ نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا بَعْثَ إِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ . أَىْ طَبِيْعَتُهُمْ وَعَادَتُهُمْ .

১৩৭. এটাতো যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছ কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব। অর্থাৎ তাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথাবার্তা। অপর এক কেরাতে خَاءْ এবং لَامْ বর্ণে পেশের সাথে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ যার উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তা অনর্থক নয়; বরং তা পূর্বসূরীদের স্বভাব তথা অভ্যাস-প্রকৃতি ছিল।

১৩৮. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ج

১৩৮. আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।

১৩৯. فَكَذَّبُوْهُ بِالْعَذَابِ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ط فِى الدُّنْيَا بِالرِّيْحِ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ .

১৩৯. অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল আজাবকে ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম পৃথিবীতে ঝড়-ঝাঞ্ঝা দ্বারা এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৪০. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

১৪০. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ عَادٌ : عَادٌ শব্দটি গোত্রের অর্থ বিশিষ্ট হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। এ কারণে ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। আ'দ হলো উক্ত গোত্রের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। হযরত নূহ (আ.) যেহেতু তাদেরই বংশের অন্তর্গত ছিলেন, এ কারণে তাঁকে أَخُوْهُمْ বলা হয়েছে। হযরত হূদ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠনের অধিকারী। পেশা হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, হযরত আদম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেহাবয়বের বেশ মিল ছিল। তিনি ৪৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। -[জুমাল]

قَوْلُهُ بِكُلِّ رِيْعٍ : رِيْع-এর رَاءٌ বর্ণে যের-যবর যে কোনোটি হতে পারে। অর্থ– উঁচু স্থান যেমন– পাহাড়, টিলা প্রভৃতি। আবূ উবায়দার বর্ণনা মতে এর অর্থ হলো সড়ক, পথ। اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ-এর মধ্যকার اِسْتِفْهَامْ বা জিজ্ঞাসাটি মূলত ধমক স্বরূপ। আর এ ধমকের আসল লক্ষ্য হলো تَعْبَثُوْنَ শব্দটি। এটা جُمْلَهْ حَالِيَهْ ; এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, উঁচু জায়গায় গৃহ নির্মাণ করা দূষণীয়। অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে হলে তা দূষণীয়। وَتَتَّخِذُوْنَ-এর عَطْف হলো تَبْنُوْنَ-এর উপর, এভাবে وَاِذْ بَطَشْتُمْ-এরও উদ্দেশ্য এই যে, কওমে হুদকে তিনটি বিষয়ে ধমক দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ ذَالِكَ : এর দ্বারা উক্ত ধমক প্রদত্ত তিন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। যথা– ১. اَلْبِنَاءُ [নিষ্প্রয়োজনে ভবন নির্মাণ] ২. اِتِّخَاذُ الْمَذْكُوْرِ [বিনা প্রয়োজন মাটির নিচে পানির ট্যাংকী তৈরি এবং ৩. اَلتَّجَبُّرُ [মানুষের সাথে কঠোর আচরণ]।

قَوْلُهُ اَمَدَّكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ : এ বাক্যের দু'ধরনের তারকীব হতে পারে। যথা– ১. দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের বিবরণ। ২. بِاَنْعَامٍ শব্দটি بِمَا تَعْمَلُوْنَ ফে'লের পুনরুল্লেখসহ تَكْرَارْ-কে- بَدَلْ তথা পুনরুল্লেখের পর্যায়ে গণ্য করা হয়।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا : এটা خَبَرْ مُقَدَّمْ আর اَوَعَظْتَ হলো مُفْرَدْ-এর তাবীলে مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ অর্থাৎ اَلْوَعْظُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا অর্থে।

قَوْلُهُ نَرْعَوِىْ : نَرْعَوِىْ শব্দটি اَرْعِوَاءٌ হতে নিষ্পন্ন, অর্থ হলো বিরত থাকা।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ خَلَقَ الْاَوَّلِيْنَ : اَوَّلِيْنَ যেমন হযরত শীস (আ.) ও হযরত নূহ (আ.) اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ হলো পূর্বের কথার ইল্লত বা কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তোমার উপদেশ ও নসিহতকে এ জন্য গ্রহণ করব না যে, এসব হলো আগেকার লোকদের রচিত কথাবার্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِيْنَ : এ আয়াত থেকে এ পর্যায়ে চতুর্থ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আ.)-কে আদ জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। এ জাতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, শুধু নিজের নাম, যশ, খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তারা বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করতে, আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। আহকাফ ইয়েমেনের হাজারামুত এলাকায় পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের নাম। সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির পরই আদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। তাদের সম্পদ ছিল অঢেল, ক্ষেত-খামার, বাগান, ফল-ফসল, নদ নদী, ঝর্ণা এককথায় সর্ব প্রকার নিয়ামতই তারা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পেয়েছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ ছিল, তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করত, হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর নবীকে তারা মিথ্যাজ্ঞান করে, শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত থাকে। হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান এবং দুনিয়ার এ জীবন যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে, এ বিষয়ে তাদেরকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর কোনো কথা মানতেই রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

অর্থাৎ যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। মানুষকে মন্দ পথ থেকে দূরে রাখার একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহর ভয়। যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করার গুণ অর্জন করতে পারে, তবে তার পক্ষে নেক আমল করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা সহজ হয়। এজন্যে হযরত হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা জান আমি আমানতদার, আমি বিশ্বস্ত, অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল, আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করি তার উপর তোমরা আমল কর।

قَوْلُهُ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : হযরত হুদ (আ.) তাঁর কওমকে বললেন, আমি যে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করছি, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই, কোনো কিছুর লাভে বা লোভে আমি এ কাজ করছি না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল।

قَوْلُهُ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ - وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা : ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, رِيْعٍ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيْعٍ উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رِيْعُ النَّبَاتِ উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। اٰيَةٌ -এর আসল অর্থ নিদর্শন। এ স্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُوْنَ শব্দটি عَبَثٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোনো প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعٌ শব্দটি مَصْنَعٌ -এর বহুবচন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন- مَصَانِعٌ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تَشْبِيْه অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। -[রূহুল মা'আনী]

বিনা প্রয়োজন অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজন গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরিয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাস (রা.)-এর ভাষ্যে ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের অর্থও তাই اَلنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়- اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلَّا مَا لَا يَعْنِىْ اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে নির্মিত তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরিয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

অনুবাদ :

١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ج

১৪১. ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

١٤٢. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

১৪২. যখন তাদেরকে তাদের ভ্রাতা হযরত সালেহ (আ.) বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٤٣. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٤. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ج

১৪৪. অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٤٥. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

١٤٦. اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا مِنَ الْخَيْرِ اٰمِنِيْنَ ـ

১৪৬. তোমাদেরকে কি আরাম-আয়েশের সামগ্রীর মাঝে নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে। যা এখানে আছে তাতে।

١٤٧. فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ

১৪৭. উদ্যানে ও প্রস্রবণে।

١٤٨. وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ لَطِيْفٌ لَيِّنٌ ـ

১৪৮. শস্যক্ষেত্র এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে। هَضِيْمٌ অর্থ সূক্ষ্ম নরম।

١٤٩. وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَرِهِيْنَ ج بَطِرِيْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَارِهِيْنَ حَاذِقِيْنَ ـ

১৪৯. তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। অন্য কেরাতে فَرِهِيْنَ -এর স্থলে فَارِهِيْنَ রয়েছে। অর্থ– হলো নৈপুণ্যের সাথে।

١٥٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ فِيْمَا اٰمُرُكُمْ بِهٖ ـ

১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করি।

١٥١. وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

১৫১. তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না।

١٥٢. الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِالْمَعَاصِىْ وَلَا يُصْلِحُوْنَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

১৫২. যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। অন্যায় ও নাফরমানির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করে না। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

١٥٣. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ . الَّذِيْنَ سُحِّرُوْا كَثِيْرًا حَتّٰى غَلَبَ عَلٰى عَقْلِهِمْ .

১৫৩. তারা বলল, তুমি জাদুগ্রস্তদের অন্যতম যাদেরকে অতিমাত্রায় জাদু-টোনা করার ফলে তাদের বিবেক লোপ পেয়ে গেছে।

١٥٤. مَآ اَنْتَ اَيْضًا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ رِسَالَتِكَ .

১৫৪. তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষই। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর। তোমার রিসালাতের ব্যাপারে।

١٥٥. قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ نَصِيْبٌ مِنَ الْمَاءِ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ ج

১৫৫. হযরত সালেহ (আ.) বললেন। এই একটি উষ্ট্রী এর জন্য আছে পানি পানের পালা পানির এক অংশ এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা।

١٥٦. وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ . بِعِظَمِ الْعَذَابِ .

১৫৬. এর উষ্ট্রীর কোনো অনিষ্ট সাধন করো না, করলে মহা দিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। মহা শাস্তি নিয়ে।

١٥٧. فَعَقَرُوْهَا اَىْ عَقَرَهَا بَعْضُهُمْ بِرِضَاهُمْ فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ عَلٰى عَقْرِهَا .

১৫৭. কিন্তু তারা তাকে বধ করল অর্থাৎ তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ তাদের সম্মতিক্রমে। পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো তাকে বধ করার কারণে।

١٥٨. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ط اَلْمَوْعُوْدُ بِهٖ فَهَلَكُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল যে শাস্তির ব্যাপারে তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুত শাস্তি। ফলে তারা ধ্বংস হয় গেল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٥٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

১৫৯. তোমার প্রতিপালক ! তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ : ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহারের কারণে এই যে, ثَمُوْدُ শব্দটি গোত্রের অর্থে, عَادْ-এর ন্যায় ثَمُوْدُ ও উক্ত সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম। তার নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের সবাইকে সামূদ সম্প্রদায় বলা হয়। তার বংশ পরম্পরা এরূপ সামূদ ইবনে উবায়দ ইবনে আ'উস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ। সামূদ হলো হযরত সালেহ (আ.) এর উম্মত। হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও হযরত হূদ (আ.)-এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

قَوْلُهُ فِيْمَا هٰهُنَا مِنَ الْخَيْرِ : هٰهُنَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ায়, আর مِنَ الْخَيْرِ হলো مَا -এর বিবরণ, এর দ্বারা পার্থিব সুখ-শান্তি উদ্দেশ্য। اٰمِنِيْنَ হলো تَكُوْنُ -এর যমীর থেকে حَالْ

قَوْلُهُ فِيْ جَنّٰتٍ الخ : حَرْفُ جَرٍّ -এর পুনরুল্লেখসহ فِيْمَا هٰهُنَا থেকে بَدَلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ طَلْعُهَا : অর্থ– ফলের সূচনায় যে অঙ্কুর উদগম হয় তা, অতঃপর بَلَح অতঃপর بُسْر অতঃপর رُطَب নাম ধারণ করে, সর্বশেষ হলো تَمْرٌ ; هَضِيْم অর্থ– কোমল, নরম।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ : এটা مُسْرِفِيْنَ -এর صِفَتْ كَاشِفَةْ কেননা এখানে مُسْرِفِيْنَ -এর স্বাভাবিক অর্থ [সীমালঙ্ঘনকারী] উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে সামুদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। সামুদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। সামুদ জাতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, শস্য শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ছিল তাদের এলাকা। বাগ-বাগিচা ঝরনায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল তাদের চতুর্দিকে। কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিল। মূর্তি পূজা ও ডাকাতি-রাহজানিতে লিপ্ত ছিল, তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ : **সামুদ জাতির আবাস :** সামুদ জাতি হজর নামক শহরের অধিবাসী ছিল। এ শহরটি ওয়াদিউল কোরা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। নবম হিজরিতে অনুষ্ঠিত তাবুক অভিযানের সময় প্রিয়নবী ﷺ তাদের এলাকা অতিক্রম করেছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) সামুদ জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করেন। ইরশাদ হয়েছে–

اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ـ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ـ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে فَارِهِيْنَ -এর তাফসীর বলা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ ও ইমাম রাগিবের মতে فَارِهِيْنَ -এর তাফসীর হলো حَاذِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েজ। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েজ। যেমন– পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ : এটা একটা উষ্ট্রী ছিল। তাদের কামনা মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এক পাথর থেকে মুজেযা স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিল। পানি পানের জন্য উক্ত উষ্ট্রীর একদিন, আর অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্য একদিনের পালা নির্ধারিত ছিল। সাথে সাথে তাদেরকে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ এর প্রতি হাত উত্তোলন করবে না এবং এর ক্ষতি সাধনের কোনো অপচেষ্টা করবে না। কিছু দিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকল। পরে তারা এটাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। একদিন রাতের আঁধারে কুদার নামক জনৈক ব্যক্তি গোত্রের লোকজনের প্রস্তাবে তাকে মেরে ফেলে। এ উষ্ট্রীটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং সালেহ (আ.)-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু সামূদ জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শিরক ও কুফরের উপর অটল থাকে। উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর সালেহ (আ.) বললেন, এখন তোমাদের মাত্র তিন দিনের অবকাশ রয়েছে। চতুর্থ দিন তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারা মঙ্গলবারে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। আর শনিবারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত সালেহ (আ.) আজাব নাজিল হওয়ার কতিপয় নিদর্শনও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো এভাবে প্রকাশ পায় যে, বুধবারে তাদের মুখমণ্ডল বিবর্তিত হয়ে যায়। বৃহস্পতিবারে তা লাল হয়ে যায়, আর শুক্রবারে কালো হয়ে যায়। আর শনিবারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও বিকট শব্দে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

অনুবাদ :

١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

১৬০ হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

١٦١. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

১৬১. যখন তাদের ভ্রাতা হযরত লূত (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٦٢. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٣. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ج

১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٦٤. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৬৪. আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

١٦٥. اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ اَىِ النَّاسِ ـ

১৬৫. বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে উপগত হও। অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে।

١٦٦. وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ ط اَىْ اَقْبَالَهُنَّ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ـ مُتَجَاوِزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ ـ

১৬৬. এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করে থাকো। অর্থাৎ তাদের যৌনাঙ্গকে। তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। হালালকে ছেড়ে হারামের প্রতি ধাবমান।

١٦٧. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ عَنْ اِنْكَارِكَ عَلَيْنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ مِنْ بَلْدَتِنَا ـ

১৬৭. তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও আমাদের ব্যাপারে কু-মন্তব্য করা থেকে তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। আমাদের শহর থেকে।

١٦٨. قَالَ لُوْطٌ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ الْمُبْغِضِيْنَ ـ

১৬৮. হযরত লূত (আ.) বললেন, আমি তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি। বিদ্বেষ পোষণকারী।

١٦٩. رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ اَىْ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন! অর্থাৎ তার শাস্তি থেকে।

١٧٠. فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ ـ

১৭০. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম।

١٧١. اِلَّا عَجُوْزًا اِمْرَاَتَهٗ فِى الْغٰبِرِيْنَ ج الْبَاقِيْنَ اَهْلَكْنَاهَا ـ

১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত তাঁর এক স্ত্রী ব্যতীত সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাকে ধ্বংস করলাম।

অনুবাদ :

١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ج اَهْلَكْنَاهُمْ.

১৭২. অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম তাদেরকে বিনাশ করলাম।

١٧٣. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج حِجَارَةً مِنْ جُمْلَةِ الْاِهْلَاكِ فَسَاۤءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ مَطَرُهُمْ.

১৭৩. তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। এটা তাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়াসমূহের একটি। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। তাদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি।

١٧٤. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ج وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

১৭৪. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٧٥. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

১৭৫. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ : হযরত লূত (আ.)-এর কওমে লূতের সাথে না বংশীয় সম্বন্ধ ছিল, না ধর্মীয় সম্পর্ক। কেননা হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের বাবেলের অধিবাসী। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে তথায় এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) শাম দেশের মাকামে খলীলে অধিবাস গ্রহণ করেন, আর হযরত লূত (আ.) তার নিকটবর্তী অর্থাৎ সেখান থেকে একদিনের রাস্তার দূরবর্তী 'সাদূম' নামক স্থানে অধিবাস গ্রহণ করেন। হযরত লূত (আ.) সাদুমের লোকজনের সাথে বসবাস করেন এবং উক্ত এলাকায়ই বিবাহ করেন। এ কারণেই হযরত লূত (আ.)-কে তাদের ভ্রাতা বলা হয়েছে।।

قَوْلُهُ مَا خَلَقَ لَكُمْ اَىْ اُحِلَّ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ : এটা مَا -এর বিবরণ, ব্যাখ্যাকার مِنْ اَزْوَاجِكُمْ -এর ব্যাখ্যা اِقْبَالَهُنَّ দ্বারা করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা– ১. مَاخَلَقَ لَكُمْ -এর মধ্যকার مَا -এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উদ্দেশ্য। কেননা এর স্থলে যদি مَنْ থাকত তাহলে তার ব্যাখ্যা مِنْ اَزْوَاجِكُمْ বলাই যথেষ্ট হতো। [কারণ مَنْ বিবেকসম্পন্ন সত্তা বা প্রাণী বুঝায়, আর مَا বিবেকহীন বস্তু ও প্রাণী বুঝায়। এ কারণেই اِقْبَالَهُنَّ তথা যোনী দ্বারা مَا -এর ব্যাখ্যা করেছেন। ২. اِقْبَالَهُنَّ দ্বারা এটাও ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল قُبُلٌ তথা যোনীপথই নির্দিষ্ট, গুহ্যদ্বার বৈধ নয়। কেননা যোনীপথই কেবল حَرْثٌ [শস্য] তথা সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্র, আর গুহ্যদ্বার নাপাকী তথা মল ত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট।

قَوْلُهُ عَدُوْنَ : এটা عَادٍ-এর বহুবচন, অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ ন্যায় ছেড়ে অন্যায় এবং হালাল ছেড়ে হারাম গ্রহণকারী।

قَوْلُهُ مِنَ الْقَالِيْنَ : এটা اَلْقَالِىْ-এর বহুবচন, মূল অক্ষর হলো قَوْلٌو বা قَلْى -এর অর্থের মধ্যে ঘৃণা ও বিরাগতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূল অর্থ হলো নিক্ষেপ করা, ভূনা করা, مِنَ الْقَالِيْنَ উহ্য قَالَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়ে اَنَّ -এর خَبَرٌ

قَوْلُهُ مِنْ عَذَابِهِ : এর দ্বারা مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ– مِنْ عَذَابٍ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ অর্থে। কেননা তাদের কু-কর্মের প্রতিফলে যে আজাব অবতীর্ণ হবে তা থেকে আমাকে ও আমার সংশ্লিষ্টদেরকে রক্ষা করুন।

قَوْلُهُ اِلَّا عَجُوْزًا : এটা শাব্দিক দিক দিয়ে اَهْلُ -এর মধ্যে শামিল হওয়ার কারণে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে, আর যেহেতু সে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আর হযরত লূত (আ.)-এর اَهْلُ ছিল প্রকৃত ঈমানদার, এ দিক দিয়ে এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে اِمْرَاَتَهٗ থেকে; عَجُوْزًا হলো بَدَلْ হযরত লূত (আ.)-এর কাফের স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়িলা। আর তাফসীরে রূহুল বয়ানে ওয়ালিহা লিখিত হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর এক স্ত্রী ছিলেন ঈমানদার। কাফের স্ত্রী যেহেতু সাধারণ গোত্রের সমমনা ছিল এবং তাদের অশ্লীল কাজের প্রতি সম্মত ছিল, এ কারণে গোত্রের সবার সাথে সেও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, কওমে লূতকে পাথর বৃষ্টি, ভূমি উল্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আজাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ .... اَلَا تَتَّقُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সামুদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ পাক সাদুম এলাকার জন্য নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।

সাদূম শহরটি সিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকার অধিবাসীরা শুধু যে মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়; বরং তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল তারা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তারা পথে আসেনি, তাঁর কোনো উপদেশ তারা গ্রহণ করেনি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ লূতের জাতিও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

হযরত লূত (আ.)-কে সেই জাতির ভাই বলা হয়েছে; তবে তিনি তাদের বংশীয় সূত্রে বা ধর্মের দিক থেকে ভাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাদের দেশী ভাই। তাদেরকে মন্দ পথ পরিহার করার জন্য তিনি উপদেশ দেন; কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ পাককে ভয় কর না? কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে, ভালো কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে, তেমনি মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হয়। হযরত লূত (আ.)-এর জাতি অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাই তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি কওমে লূতের উদ্দেশ্যে বলেছেন- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রাসূল।' তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে তথা রিসালতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি আমানতদার, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং আমার কথা মেনে চল! কেননা জীবন-সাধনার সার্থকতার জন্যে, পরকালীন জীবনে পরম সাফল্য লাভের জন্যে এটিই একমাত্র পথ।

قَوْلُهُ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, হযরত লূত (আ.)-এর পুরো নাম ছিল লূত ইবনে হারাম ইবনে আজর। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ.)-কে তাঁর জীবদ্দশায়ই আল্লাহ পাক নবী মনোনীত করেছিলেন। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন তাদের ঘৃণ্য কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে রাজি হলো না, তখন আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি আপতিত হয়। এ স্থানটি আজো বিশ্বাবাসীর উপদেশ গ্রহণের জন্যে একটি বিরাট পরিত্যক্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। অথচ এ স্থানটি হযরত লূত (আ.)-এর জাতির আবাসস্থল ছিল, হযরত লুত (আ.) তাদেরকে বার বার বললেন, দেখ তোমাদের অর্থ-সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমাদের কাছে আমি কোনো প্রকার প্রতিদানও চাই না; আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। আমি শুধু চাই তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর নাফরমানি বর্জন কর এবং ঘৃণ্য কুকর্ম পরিহার কর।

قَوْلُهُ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ : অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম : আয়াতের مِنْ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুত পরিণত করছ। এটা হীনমান্যতার পরিচায়ক। مِنْ অব্যয়টি এখানে تَبْعِيْض -এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ।
-[ফতওয়ায়ে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ : এখানে عَجُوْز বলে হযরত লুত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এ কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল। হযরত লূত (আ.)-এর এই কাফের স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধ হলে তার জন্য عَجُوْز শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে , তবে তাকে عَجُوْز শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গাম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহত করাটা অসঙ্গত নয়।

قَوْلُهُ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েজ। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা লূত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টো করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। -[ফতওয়ায়ে শামী : কিতাবুল হুদূদ]

অনুবাদ :

١٧٦. كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ وَفِى قِرَاءَةٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَاِلْقَاءِ حَرَكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَفَتْحِ الْهَاءِ هِيَ غَيْضَةُ شَجَرٍ قُرْبَ مَدْيَنَ الْمُرْسَلِيْنَ ج

১৭৬. 'আয়কা'বাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল অন্য এক কেরাতে হামযাকে উহ্য করে হামযার হরকত ل কে দিয়ে ; যবরসহ (لَيْكَةَ) পঠিত রয়েছে। আর আয়কা হলো মাদায়েনের নিকটতবর্তী বৃক্ষ বাগান।

١٧٧. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَمْ يَقُلْ اَخُوْهُمْ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

১৭৭. যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, এখানে اَخُوْهُمْ তথা তাদের ভাই বলেননি, কেননা তিনি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٧٨. اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

১৭৮. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٩. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ج

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٨٠. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৮০. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

١٨١. اَوْفُوا الْكَيْلَ اَتِمُّوْهُ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ج النَّاقِصِيْنَ ـ

১৮১. তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ করবে। যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অর্থাৎ যারা মাপে কম দেয়।

١٨٢. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ج الْمِيْزَانِ السَّوِىِّ ـ

১৮২. ওজন করবে সঠিক দাড়িপাল্লায় সমান পাল্লায়।

١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ لَا تَنْقُصُوْهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا ـ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَثِىَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ وَمُفْسِدِيْنَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنٰى عَامِلِهَا تَعْثَوْا ـ

১৮৩. লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না অর্থাৎ, তাদের পাওনা থেকে কোনো কিছু কম দিয়ো না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে عَثِىَ বাবে سَمِعَ হতে অর্থ- اَفْسَدَ তথা বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আর مُفْسِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ হয়েছে তার আমেল تَعْثَوْا -এর অর্থের জন্য।

١٨٤. وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْخَلِيْقَةَ الْاَوَّلِيْنَ ط

১৮৪. এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

অনুবাদ :

১৮৫. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

১৮৫. তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৮৬. وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهُ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ج

১৮৬. তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ। اِنْ টি ثَقِيْلَةٌ থেকে خَفِيْفَةٌ -এর اِسْمٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِنَّهُ আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

১৮৭. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا بِسُكُوْنِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا قِطْعَةً مِنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ رِسَالَتِكَ .

১৮৭. আমাদের উপর একখণ্ড মেঘমালা ফেলে দাও كِسَفًا শব্দটি سِيْن বর্ণে সাকিন এবং যবর উভয়ই হতে পারে। অর্থ– খণ্ড, টুকরা। আকাশ থেকে, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তোমার রিসালতে।

১৮৮. قَالَ رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

১৮৮. তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তোমরা যা কর। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করবেন।

১৮৯. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ط هِىَ سَحَابَةٌ اَظَلَّتْهُمْ بَعْدَ حَرٍّ شَدِيْدٍ اَصَابَهُمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ نَارًا فَاحْتَرَقُوْا اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

১৮৯. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করল। ظُلَّةٌ হলো মেঘমালা, যা তাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছিল প্রচণ্ড গরমের পরে। অতঃপর উক্ত মেঘমালা হতে তাদের উপর অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে তারা জ্বলে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে গেল। এটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।

১৯০. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

১৯০. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৯১. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

১৯১. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَيْكَةٌ : অন্য এক কেরাতে لَيْكَةٌ পঠিত আছে। اَيْكَةٌ অর্থ– জঙ্গল। اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম ও মাদায়েনের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী লোকজন উদ্দেশ্য। কারো মতে ঘন বৃক্ষকেও اَيْكَةٌ বলা হয়। غَيْضَةٌ শব্দটির আদ্যবর্ণে যবর, অর্থ বন, গাছের ঝাড়। মাদায়েন হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জনপদের নাম। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম উক্ত শহরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিধায় তার অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয়। মাদায়েন ও মিশরের মাঝে আটদিনের রাস্তা সমান দূরত্ব।

قَوْلُهٗ مُفْسِدِيْنَ : এটা تَعْثَوْا -এর অর্থ থেকে حَالٌ مُؤَكِّدَه ; حَالٌ - ذُوالْحَالِ -এর শব্দটি যদিও ভিন্ন, তবে অর্থ এক কেননা تَعْثَوْنَ ক্রিয়া عَثِىَ থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ হলো ফ্যাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ الْجِبِلَّةَ : جِبِلَّةٌ ও جَبَلٌ অর্থ মাখলূক, সৃষ্টবস্তু। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اَضَلَّ جِبِلًّا كَثِيرًا অর্থাৎ শয়তান বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।

قَوْلُهُ فَاَسْقِطْ الخ : এটাকে কেউ কেউ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ শর্তের جَوَابْ কে مُقَدَّمْ তথা পূর্বের অংশ স্থির করেছেন। আর কেউ কেউ উহ্য বলেছেন, আর فَاَسْقِطْ হলো তার নির্দেশকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ : আসহাবুল আয়কা : اَيْكَةٌ অর্থ- জঙ্গল, অরণ্য। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম মাদায়েন এলাকায় বসবাস করত। কেউ বলেন- اَيْكَةٌ অর্থ- ঘন বৃক্ষ, [বট গাছ] যাকে دَوْمٌ -ও বলা হয়। মাদায়েন এলাকায় এ ধরনের একটি বৃক্ষ ছিল, মানুষেরা তার পূজা করত। তাই তথাকার অধিবাসীদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নবুয়তের গণ্ডি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সীমানা মাদায়েন থেকে উক্ত জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানকার লোকেরা আয়কা [বট] বৃক্ষের পূজা করত। এর দ্বারা জানা গেল যে, আসহাবে আয়কা ও আহলে মাদায়েনের নবী একইজন অর্থাৎ হযরত শুয়াইব (আ.) ছিলেন। আয়কা যেহেতু কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং একটি বৃক্ষ। এ কারণে পূর্বের ন্যায় اَخُوْهُمْ বলে তাদের ভাই বলা হয়নি। তবে যেখানে মাদায়েনের অধীনে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার বংশগত ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধও উল্লিখিত হয়েছে। কারণ মাদায়েন হলো এক সম্প্রদায়ের নাম, যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا অর্থাৎ মাদায়েনে তাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে। -[সূরা আ'রাফ : ৮৫]

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আয়কা ও মাদায়েনকে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দুটি উম্মত। হযরত শুয়াইব (আ.)-কে নবুয়ত দান করে একবার মাদায়েনে ও একবার আয়কায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তারা একই উম্মত ছিল। اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ [তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণরূপে কর] বলে যে উপদেশ মাদায়েনবাসীকে দেওয়া হয়েছিল তা এখানে আসহাবে আয়কাকেও দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা একই উম্মত।

قَوْلُهُ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ : কারো কারো মতে قِسْطٌ গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবি শব্দ قِسْطٌ থেকে উদ্ভূত বলেছেন। এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে পরিমাপে কম হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

قَوْلُهُ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ : অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চেয়ে কম দেওয়া হারাম; তা কোনো মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো শ্রমিক কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারূক (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাজে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল, হযরত ওমর (রা.) বললেন- طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামাজ ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক (র.) বলেন- وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কারো হক কম দেওয়া তা যেভাবেই হোক না কেন তা হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ : আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে গ্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না : এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। -[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

١٩٢. وَإِنَّهُ أَيِ الْقُرْآنُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

১৯২. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

١٩٣. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ جِبْرِيْلُ .

১৯৩. হযরত জিবরীল (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন–

١٩٤. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ .

১৯৪. আপনার হৃদয়ে; যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।

١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ط بَيِّنٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ نَزَّلَ وَنَصْبِ الرُّوْحِ وَالْفَاعِلُ اللّٰهُ .

১৯৫. অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অপর কেরাতে نَزَلَ -এর رَاء বর্ণে তাশদীদ এবং اَلرُّوْحُ শব্দটি নসবযুক্ত রূপে পঠিত রয়েছে। আর فَاعِلٌ হলেন আল্লাহ।

١٩٦. وَإِنَّهُ أَيْ ذِكْرُ الْقُرْاٰنِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى مُحَمَّدٍ لَفِيْ زُبُرِ كُتُبِ الْاَوَّلِيْنَ . كَالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ .

১৯৬. আর নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআনের উপদেশ যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– তাওরাত, ইঞ্জীল।

١٩٧. اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اٰيَةً عَلٰى ذٰلِكَ اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ط كَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ مِمَّنْ اٰمَنُوْا فَاِنَّهُمْ يُخْبِرُوْنَ بِذٰلِكَ وَيَكُنْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَنَصْبِ اٰيَةٍ وَبِالْفَوْقَانِيَّةِ وَرَفْعِ اٰيَةٍ .

১৯৭. এটা কি তাদের জন্য নয়? মক্কার কাফেরদের জন্য নিদর্শন এ ব্যাপারে যে, বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ এটা অবহিত আছে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছেন, কেননা তারা এ ব্যাপারে তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। يَكُنْ ফে'লটি يَاء সহকারে এবং اٰيَةً পদটি নসবযুক্ত। অথবা تَكُنْ অর্থাৎ تَاء যোগে এবং اٰيَةٌ টি পেশযুক্ত হবে। উভয়টি বৈধ রয়েছে।

١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ . جَمْعُ اَعْجَمَ .

১৯৮. যদি আমি একে কোনো 'আজমী'র [অনারব ব্যক্তির] উপর অবতীর্ণ করতাম اَعْجَمِيْنَ পদটি اَعْجَمُ -এর বহুবচন।

١٩٩. فَقَرَأَهٗ عَلَيْهِمْ اَيْ كُفَّارِ مَكَّةَ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ . اَنَفَةً مِنْ اِتِّبَاعِهٖ .

১৯৯. এবং তা তিনি তাদের নিকট পাঠ করতেন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকট তবে তারা তাতে ঈমান আনত না। তার অনুসরণকে ঘৃণা করার কারণে।

অনুবাদ :

٢٠٠. كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِدْخَالِنَا التَّكْذِيْبَ بِهٖ بِقِرَاءَةِ الْاَعْجَمِ سَلَكْنٰهُ اَدْخَلْنَا التَّكْذِيْبَ بِهٖ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ بِقِرَاءَةِ النَّبِىِّ .

২০০. এভাবে অর্থাৎ অনারবের পাঠের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবেশ করানোর ন্যায় আমি আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছি তার প্রতি মিথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবিষ্ট করেছি। অপরাধীদের হৃদয়ে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্তরে মহানবী ﷺ -এর পাঠের ব্যাপারে।

٢٠١. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

২০১. তারা এতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করে।

٢٠٢. فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ .

২০২. ফলে তা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে; কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

٢٠٣. فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ . لِنُؤْمِنَ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا . قَالُوْا مَتٰى هٰذَا الْعَذَابُ .

২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে? যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, না। তারা বলবে, শাস্তি কখন আসবে?

٢٠٤. قَالَ تَعَالٰى اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ .

২০৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

٢٠٥. اَفَرَأَيْتَ اَخْبِرْنِىْ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ .

২০৫. তুমি ভেবে দেখ আমাকে সংবাদ জানাও যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করতে দেই।

٢٠٦. ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ .

২০৬. এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে। শাস্তি হতে।

٢٠٧. مَآ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَىُّ شَىْءٍ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ط فِىْ دَفْعِ الْعَذَابِ اَوْ تَخْفِيْفِهٖ اَىْ لَمْ يُغْنِ .

২০৭. তখন তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ তাদের কোনো কাজে আসবে কি? শাস্তি প্রতিহত করার কিংবা হাল্কা করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনোই কাজে আসবে না। এখানে مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ ; অর্থ– اَىُّ شَىْءٍ

٢٠٨. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ . رُسُلٌ تُنْذِرُ اَهْلَهَا .

২০৮. আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলেন না। রাসূলগণ, যাঁরা তার অধিবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন।

অনুবাদ :

٢٠٩. ذِكْرٰى عِظَةً لَهُمْ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ فِىْ اِهْلَاكِهِمْ بَعْدَ اِنْذَارِهِمْ ـ

২০৯. এটা উপদেশ স্বরূপ তাদের জন্য নছিহত আর আমি অন্যায়চারী নই। তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করার পর।

٢١٠. وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ بالقران الشَّيٰطِيْنُ ج

২১০. মুশরিকদের উক্তি খণ্ডনকল্পে অবতীর্ণ হয়- তা সহ অবতীর্ণ হয়নি কুরআনসহ শয়তানরা।

٢١١. وَمَا يَنْبَغِىْ يَصْلَحُ لَهُمْ اَنْ يَنْزِلُوْا بِهِ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ط ذٰلِكَ ـ

২১১. তারা এ কাজের যোগ্য নয় কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার এবং তারা এর সামর্থও রাখে না এটা করতে।

٢١٢. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لِكَلَامِ الْمَلٰئِكَةِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ط مَحْجُوْبُوْنَ بِالشُّهُبِ ـ

২১২. তাদেরকে তো ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। তারা তো উল্কাপিণ্ড দ্বারা প্রতিহত কৃত।

٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ـ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ الَّذِىْ دَعَوْكَ اِلَيْهِ ـ

২১৩. অতএব আপনি অন্য কোনো ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডাকবেন না। ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যদি তা করেন, তারা যার প্রতি আপনাকে আহবান করছে।

٢١٤. وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ـ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَقَدْ اَنْذَرَهُمْ جِهَارًا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ـ

২১৪. আপনি আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন। তা হলো বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব, তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করেছিলেন। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে।

٢١٥. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اَلِنْ جَانِبَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج الْمُوَحِّدِيْنَ ـ

২১৫. তাদের জন্য আপনার বাহু অবনমিত করুন বিনয়ী হন যারা আপনার অনুসরণ করে মুমিনগণের মধ্য হতে একত্ববাদে বিশ্বাসীগণ।

٢١٦. فَاِنْ عَصَوْكَ اَىْ عَشِيْرَتُكَ فَقُلْ لَهُمْ اِنِّىْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ ـ

২১৬. যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে অর্থাৎ আপনার আত্মীয়স্বজন তবে আপনি বলে দিন তাদেরকে তোমরা যা কর তা হতে আমি দায়মুক্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপাসনা হতে আমি মুক্ত।

অনুবাদ :

٢١٧. وَتَوَكَّلْ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهِ اَىْ فَوِّضْ اِلَيْهِ جَمِيْعَ اُمُوْرِكَ ـ

২১৭. আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার উপর। অর্থাৎ সকল বিষয় তাঁর নিকটই সোপর্দ করে দিন।

٢١٨. الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ـ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। নামাজের জন্য।

٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِىْ اَرْكَانِ الصَّلٰوةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا فِى السّٰجِدِيْنَ اَىِ الْمُصَلِّيْنَ ـ

২১৯. এবং দেখেন আপনার উঠাবসা [পরিবর্তন]-কে নামাজের রুকূসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে দাঁড়ানো, বসা, রুকূ করা ও সিজদা করাকে। সিজদাকারীদের সাথে অর্থাৎ মুসল্লীগণের সাথে।

٢٢٠. اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

২২০. তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢١. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ـ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ ـ

২২১. তোমাদেরকে কি আমি জানাব? হে মক্কার কাফেররা কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়। تَنَزَّلُ -এর মধ্যে দুটি تَا ، হতে একটি تَا ، -এর বিলুপ্তি ঘটেছে।

٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ كَذَّابٍ اَثِيْمٍ ـ فَاجِرٍ مِثْلَ مُسَيْلَمَةَ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْكَهَنَةِ ـ

২২২. তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট যেমন– মুসায়লামাতুল কাযযাব ও অন্যান্য গণকরা।

٢٢٣. يُلْقُوْنَ اَىِ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ اَىْ مَا سَمِعُوْهُ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَى الْكَهَنَةِ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ـ يَضُمُّوْنَ اِلَى الْمَسْمُوْعِ كِذْبًا كَثِيْرًا وَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ حُجِبَتِ الشَّيَاطِيْنُ عَنِ السَّمَاءِ ـ

২২৩. তারা পেতে রাখে অর্থাৎ শয়তানরা কর্ণ অর্থাৎ ফেরেশতাদের নিকট হতে যা শুনে তা গণকদের নিকট বলে দেয়। এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। তাদের শ্রুত বিষয়ের সাথে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেয়। আর এটা ছিল শয়তানদেরকে আকাশে গমন থেকে বাধাদানের পূর্বের কথা।

٢٢٤. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ـ فِىْ شِعْرِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ بِهٖ وَيَرْوُوْنَ عَنْهُمْ فَهُمْ مَذْمُوْمُوْنَ ـ

২২৪. এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই তাদের কবিতায়। তারা কবিতা পাঠ করে এবং কবিদের থেকে তা বর্ণনা করে। আর এটাই তো দোষের ব্যাপার।

অনুবাদ :

٢٢٥. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ مِنْ اَوْدِيَةِ الْكَلَامِ وَفُنُوْنِهِ يَهِيْمُوْنَ يَمْضُوْنَ فَيُجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ مَدْحًا وَهِجَاءً.

২২৫. আপনি কি দেখেন না? জানেন না তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় কথা এবং তার প্রকারভেদের উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ফলে প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনায় সীমাতিক্রম করে।

٢٢٦. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ فَعَلْنَا مَا لَا يَفْعَلُوْنَ اَىْ يَكْذِبُوْنَ.

২২৬. তারা বলে আমরা করেছি যা তারা করে না অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে।

٢٢٧. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا اَىْ لَمْ يَشْغَلْهُمُ الشِّعْرُ عَنِ الذِّكْرِ وَانْتَصَرُوْا بِهَجْوِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ط بِهَجْوِ الْكُفَّارِ لَهُمْ فِىْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسُوْا مَذْمُوْمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يُحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا مِنَ الشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ اَىَّ مُنْقَلَبٍ مَرْجِعٍ يَّنْقَلِبُوْنَ. يَرْجِعُوْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

২২৭. কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে কবিদের মধ্যে থেকে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে অর্থাৎ কবিতা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে ফিরিয়ে রাখে না এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে কাফেরদের পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার পর কাফেররা মুমিনদের কুৎসা বর্ণনার পর তারা দোষী নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা কোনো কুৎসামূল কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে যারা অত্যাচারিত হয়।" সুতরাং যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে তোমরাও তাদের উপর তাদের অত্যাচার অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ কর। যারা অত্যাচার করে কবি ও অন্যান্যদের মধ্য হতে তারা শীঘ্রই জানবে তারা কোন স্থলে প্রত্যাবর্তনস্থলে প্রত্যাবর্তন করবে মৃত্যুর পর ফিরে যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ : এটা بِهٖ -এর যমীর থেকে حَرْف جَرّ পুনরুল্লেখ সহ بَدَل হয়েছে। আবার اَلْمُنْذِرِيْنَ -এর মুতা'আল্লিকও হতে পারে। অর্থাৎ যাতে আপনি সেসব রাসূলের অন্তর্গত হন যারা আরবি ভাষায় মানুষকে সতর্ক করতেন ও সুসংবাদ দান করতেন। যেমন– হযরত হুদ, সালেহ, শুয়াইব ও ইসমাঈল আলায়হিমুস সালাম।

قَوْلُهُ اَىْ ذِكْرُ الْقُرْاٰنِ : এ ইবরাত বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য–

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন হুবহু পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে, অথচ তা যথার্থ নয়।

উত্তর : এখানে হুবহু কুরআন পূর্বের কিতাবসমূহ বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উল্লেখ ও বর্ণনা থাকা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ : আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের ৪জন সঙ্গী ইহুদি ধর্ম থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। তারা হলেন ১. আসাদ ২. উসায়দ ৩. সা'লাবা ও ৪. ইবনে ইয়ামীন। এ চারজনের সবাই ইহুদি ছিলেন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ يَكُنْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَنَصْبِ اٰيَةً : اٰيَةً হলো يَكُنْ -এর خَبَر مُقَدَّمْ - আর এর اِسْم হলো اٰيَةً ; اَنْ يَعْلَمَهٗ এটা اِسْم থেকে بَدَل হবে। تَكُنْ -এর اِسْم مُؤَخَّرْ এবং لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর اَنْ يَعْلَمَهٗ এটা مرفوع হয়ে يَعْلَمَهٗ শব্দটি

قَوْلُهُ جَمْعُ اَعْجَمَ : অর্থাৎ, اَعْجَمِيْنَ শব্দটি اَعْجَمُ -এর বহুবচন।

প্রশ্ন : فَعْلَاء ও فَعْل -এর বহুবচন তো ين ও ون দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। অতএব, اَعْجَمِيْنَ শব্দটি اَعْجَمِيْنَ -এর বহুবচন কথাটি সঠিক নয়।

উত্তর : শব্দটি মূলত اَعْجَمِيٌّ -এর يَاء نِسْبَتِىْ -কে সহজার্থে বিলোপ করা হয়েছে। কাজেই اَعْجَمِىْ -এর বহুবচন اَعْجَمِيْنَ সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ : এর عَطْف হলো فَيَقُوْلُوْنَ -এর উপর। মাঝের বাক্যটি جُمْلَة مُعْتَرِضَه

قَوْلُهُ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ : এটা বাক্য হয়ে قَرْيَة -এর সিফাত হয়েছে। قَرْيَة -এর حَال -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ مِنْ قَرْيَةٍ : এর মধ্যে مِنْ মাফঊলের উপর অতিরিক্ত হয়েছে। পূর্বে نَفِىْ থাকার কারণে এটা সঙ্গত হয়েছে

প্রশ্ন : اِلَّا এর পরে وَاوْ উল্লেখ না করার কারণ কি? অথচ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوْمٌ -এর মধ্যে وَاوْ উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর : وَاوْ উল্লেখ না করাই নীতিসঙ্গত। কেননা বাক্যটি قَرْيَة -এর সিফত, مَوْصُوْف صِفَتْ -এর মাঝে وَاوْ না থাকাই নিয়ম। কোথাও وَاوْ উল্লেখ করা হলে তা মওসূফের সাথে সিফতের সংশ্লিষ্টতাকে দৃঢ় করা জন্য হয়। যেমন– سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ -এর মধ্যে। لَهَا উহ্য فِعْل বা شِبْه فِعْل -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে خَبَر مُقَدَّمْ আর مُنْذِرُوْنَ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ উভয়টি মিলে বাক্য হয়ে হয়তো قَرْيَة -এর সিফত অথবা حَالْ হবে। যদি خَبَرْ হয় তাহলে বাক্যটি এরূপ হবে– قَدْ اَنْذَرَ اَهْلَهَا مُنْذِرُوْنَ আর حَالْ হওয়ার ক্ষেত্রে বাক্য হবে– اِلَّا كَائِنًا لَهَا مُنْذِرُوْنَ

قَوْلُهُ ذِكْرٰى : এটা হয়তো مُنْذِرُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالْ অর্থাৎ مُنْذِرُوْنَ ذوى ذكرى অথবা مُذَكِّرِيْنَ ذِكْرٰى আর যদি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হয় তাহলে مُبَالَغَة স্বরূপ গণ্য হবে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ , অথবা ذِكْرٰى মানসূব হবে مَصْدَرْ তথা مَفْعُوْل مُطْلَقْ হিসেবে, এ সময় مُنْذِرُوْنَ শব্দটি مُذَكِّرِيْنَ -এর অর্থে হবে। বাক্যটি এরূপ হবে– مُذَكِّرُوْنَ ذِكْرٰى اَىْ تَذْكِرَةً ; আর ذِكْرٰى শব্দটি مُنْذِرُوْنَ -এর ইল্লত তথা مَفْعُوْل لَهٗ -ও হতে পারে। অর্থাৎ يُنْذِرُهُمْ لِاَجْلِ تَذْكِيْرِهِمُ الْعَوَاقِبَ আবার ذِكْرٰى উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ -ও হতে পারে। অর্থাৎ هٰذِهٖ ذِكْرٰى এ সময় এটা جُمْلَة مُعْتَرِضَة হবে।

قَوْلُهُ لَهُ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে قَوْل -এর مَقُوْلَه উহ্য রয়েছে। আর তা হলো إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقُوْنَ الْقُرْاٰنَ اِلَيْهِ

قَوْلُهُ شُهُبٌ : এটা شِهَابٌ -এর বহুবচন । অর্থ হলো অগ্নিচ্ছটা, উল্কাপিণ্ড।

قَوْلُهُ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ : এটা উহ্য শর্তের جَزَاء مُقَدَّمْ যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ : অর্থাৎ تَوَكَّلْ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। وَاوْ সহ ও فَاء সহ, وَاوْ সহ হলে أَنْذِرْ -এর উপর عَطْف হবে। আর فَاء সহ হলে جَوَاب شَرْط অর্থাৎ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْئٌ থেকে بَدَل হবে।

قَوْلُهُ تَقَلُّبَ : এটা يَرَاكَ -এর كَافْ -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِي السَّاجِدِيْنَ : এর মধ্যে فِيْ অব্যয়টি مَعَ অর্থে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَنْ : এটা مُتَعَلِّقْ হয়েছে تَنَزَّلُ -এর সাথে। أُنَبِّئُكُمْ যদি তিন مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّيْ হয়, তাহলে كُمْ ضَمِيْر হলো প্রথম مَفْعُوْل আর تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ বাক্যাংশটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যদি দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّيْ হয়, তাহলে বাক্যটি দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। مَنْصُوْب

قَوْلُهُ مِثْلَ مُسَيْلَمَةَ : ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে এ উদাহরণ পেশ করা সঙ্গত হয়নি। কেননা প্রথমত মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের পরে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। আর সে সময় শয়তানদেরকে আকাশে অবাধে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই তার নিকট শয়তানদের আসমানি সংবাদ পৌঁছানো সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত মুসায়ালামা জ্যোতিষ বা গণক ছিল না; বরং সে ছিল ভণ্ড ও মিথ্যুক। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর مِنَ الْكَهَنَةِ বলাটা সঙ্গত মনে হয় না।

قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ : যেমন সাতীহ ছিল গণক আর كَاهِنْ [গণক] বলা হয় অগ্রিম সংবাদ প্রদানকারীকে । عَرَّافٌ বলা হয় অতীতের সংবাদদাতাকে । -[জুমাল]

قَوْلُهُ اَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ : এখানে اَيْ অব্যয়টি حَرْف نِدَا ও হতে পারে, যেমনটা স্বাভাবিভাবে বুঝে আসছে। আবার تَفْسِيْرِيَّة -ও হতে পারে। এ সময় مُفَسَّرْ তথা ব্যাখ্যেয় বিষয় হবে أُنَبِّئُكُمْ -এর ضَمِيْر টি।

قَوْلُهُ يَهِيْمُوْنَ : এটা اَنَّ -এর خَبَرْ আর فِيْ كُلِّ وَادٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : এটা উহ্য مَذْمُوْمُوْنَ থেকে اِسْتِثْنَاء হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচান

قَوْلُهُ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ..... زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ : শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কুরআন : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবি ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোনো ভাষায় কুরআনের কোনো বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা যাবে না।

وَاِنَّهُ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় থাকলে তাও কুরআন। কেননা اِنَّهُ -এর সর্বনামটি বাহ্যত কুরআনকে বোঝায় زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা বাহুল্য, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূববর্তী কিতাব আরবি ভাষায় ছিল না। কেবল কুরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোনো সময় শুধু কুরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কুরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ কোনো কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কুরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কুরআনের কোনো কোনো বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে সূরা বাকারা' 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طٰسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়,

সেগুলো মূসা (আ.)-এর ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুলক তাওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কুরআন বলে যে, إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহিফাসমূহে আছে।

এসব আয়াত ও রেওয়ায়াতের সারমর্ম এই যে, কুরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরি নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কুরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কুরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারেরও নাম নয়। যদি কেউ কুরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে- خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কুরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কুরআন বলা যায় না।

নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ : এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাজে ফরজ তেলাওয়াতের স্থলে কুরআনের শব্দাবলির অনুবাদ ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি কোনো ভাষায় পাঠ করা অপারগ অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয় । কোনো কোনো ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কুরআনের উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন' বলা জায়েজ নয় : এমননিভাবে আরবি মূল বাক্যাবলি ছাড়া শুধু কুরআনের অনুবাদ কোনো ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কুরআন বলা জায়েজ নয়। যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু, অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন ' ইংরেজি অনুবাদকে 'ইংরেজি কুরআন' বলে দেয়। এটা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলি ছাড়া কুরআনকে অন্য কোনো ভাষায় 'কুরআন ' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ।

قَوْلُهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ : এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোনো কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) প্রতিদিন সকালে তার শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন- أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ এর পর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন-

نَهَارُكَ بِالْغُرُوْرِ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ * وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ
فَلَا أَنْتَ فِى الْإِيْقَاظِ يَقْظَانُ حَازِمٍ * وَلَا أَنْتَ فِى النَّوْمِ نَاجٍ وَسَالِمٌ
وَتَسْعٰى إِلٰى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّةٌ * كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

অর্থাৎ তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও। তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

قَوْلُهُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ : عَشِيْرَةٌ শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। أَقْرَبِيْنَ বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষে বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরজ ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চেয়ে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিধিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোনো আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলি পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নমের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামাজ পড়তে চায়, তবে পাকা নামাজির পক্ষেও নামাজের যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ কঠিন কাজ; বরং এর কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি যে ক্ষেত্রে গুনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সবাইকে একত্র করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

قَوْلُهُ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ : কবিতার সংজ্ঞা : অভিধানে এমন বাক্যাবলিকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর ছন্দ, ওযন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রে এ ধরনের বিষয়বস্তুকে "কবিতাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলিকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকার কুরআনের شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهٖ شَاعِرٌ مَجْنُوْنٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওযন বিশিষ্ট ও সমিল শব্দ বিশিষ্ট বাক্যাবলি নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কুরআন কবিতাবলির সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে [নাউযুবিল্লাহ] মিথ্যাবাদী বলা। কারণ شِعْر [কবিতা] মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَاذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যবলিকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলিকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ -আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলি রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। -[ফতহুল বারী]

ইসলামি শরিয়তে কাব্যচর্চার মান ও অবস্থান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে

বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে- إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। -[বুখারী]

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই রেওয়াতে 'হিকমত' বলে সত্য ভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার এত্ব, তাঁর জিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরিউক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরো সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়- ১. উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবূ সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। ২. মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। ৩. তাবারী (র.) প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা করিতা রচনা করতেন এবং শুনাতেন। ৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হযরত আয়েশা(রা.) কবিতা বলতেন। ৫. আবূ ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভালো এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গুনাহের হলে কবিতা মন্দ।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার জ্ঞান-গরিমায় সেরা দশজন ফিকহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসঊদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়ের ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) আবূ আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখারী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন- لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يُرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا অর্থাৎ, পুঁজ দ্বারা পেটভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চেয়ে উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) বলেন আমার মতে, এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ কুরআন তেলাওয়াত ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ অথবা শরিয়ত বিরোধী অন্য কোনো বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েজ। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।

খলীফা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। -[কুরতুবী]

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরাহ (র.) বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হয়ে যায় : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ -আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্ট হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসৃত অর্থাৎ, কবিদের প্রতি কিরূপে আরোপ করা হলো? এর কারণ এই

যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্নবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ স্বয়ং অনুসৃতের গুনাহের আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতার অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি আকিদা-বিশ্বাস ও মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। কিন্তু কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলেমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্ম ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলেমের পথভ্রষ্টতার দলিল হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ : শানে নুযূল : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই কুরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অন্তরে নাজিল করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় অলংকার দেখে কাফেররা বিস্মিত হতো। কেননা প্রিয়নবী ﷺ কখনো কারো নিকট কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর জবান মুবারক থেকে এক অদ্বিতীয় কালাম বের হয়ে আসছে। তাই কোনো কোনো কাফের বলতে লাগল যে, হয়তো কোনো জিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুরআনে কারীম শিখিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন হুজুর ﷺ -এর নিকট ওহীর আগমন বন্ধ ছিল। তখন এক কাফের মহিলা প্রিয়নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল, "আপনার শয়তানটি কি আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে"? কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الخ : পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান বাণী, এটি কোনো জিন বা শয়তানের কথা নয়। কেননা শয়তান বা জিনেরা সর্বদা মন্দ কাজের কথা বলে, অথচ পবিত্র কুরআন হলো হেদায়েতের মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ববাসী তাঁদের দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখেনি। পক্ষান্তরে শয়তান হলো পথভ্রষ্টতার মূল উৎস। সে মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, সৎকাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। অতএব, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত শয়তানের পক্ষে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করাও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন অবতরণকালে জিন শয়তানদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হওয়ার পূর্বে জিন শয়তানরা আসমানে যাওয়ার সুযোগ পেত। সেখান থেকে কোনো কথা শ্রবণ করে তারা গণকদেরকে বলতো। আর গণকরা ঐ একটি কথার সঙ্গে একশটি মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষকে বলতো। কিন্তু যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়, তখন আসমানে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিন শয়তানদের আসমানে গমন চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ - اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ

অর্থাৎ আর তারা কুরআন নিয়ে অবতরণ করেনি, আর তাতে তারা সক্ষমও হয়নি। নিশ্চয় শয়তানদেরকে আসমানি কথা শ্রবণের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে।

অতএব পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কালাম তাঁর মহান বাণী, পবিত্র কুরআনের অনুশীলন এবং অনুসরণ মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২৪৭-৪৮]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. طٰسٓ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ اَىْ اٰيَاتٌ مِنْهُ وَكِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ مُظْهِرُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ ـ

১. তা-সীন আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। এগুলো এ আয়াতগুলো আয়াত আল কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের যা বাতিল হতে হককে প্রকাশকারী। এখানে অতিরিক্ত সিফতসহ عَطْف করা হয়েছে।

٢. هُوَ هُدًى اَىْ هَادٍ مِنَ الضَّلَالَةِ وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ الْمُصَدِّقِيْنَ بِهٖ بِالْجَنَّةِ ـ

২. পথনির্দেশ অর্থাৎ ভ্রষ্টতা হতে হেদায়েতের পথ নির্দেশকারী এবং সুসংবাদ মুমিনদের জন্য। অর্থাৎ তাঁর সত্যায়নকারীদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ।

٣. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ يَاْتُوْنَ بِهَا عَلٰى وَجْهِهَا وَيُؤْتُوْنَ يُعْطُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ يَعْلَمُوْنَهَا بِالْاِسْتِدْلَالِ وَاُعِيْدَهُمْ لِمَا فُصِّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ ـ

৩. যারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ তা যথাযথভাবে আদায় করে ও জাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী দলিল প্রমাণসহ তা বিশ্বাস করে। এখানে هُمْ সর্বনামটি পুরুল্লেখ করা হয়েছে মুবতাদা ও খবরের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে।

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ الْقَبِيْحَةَ بِتَرْكِيْبِ الشَّهْوَةِ حَتّٰى رَاَوْهَا حَسَنَةً فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ط يَتَحَيَّرُوْنَ فِيْهَا لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا ـ

৪. যারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করে দিয়েছি। রিপুর বাসনাকে জড়িত করে। ফলে তারা তাকে ভালো মনে করে থাকে। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়; উক্ত মন্দ কর্মে অস্থির হয়ে। আমার নিকট তা মন্দ হওয়ার কারণে

٥. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ اَشَدُّهٗ فِى الدُّنْيَا الْقَتْلُ وَالْاَسْرُ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ـ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ـ

৫. এদের জন্যই রয়েছে জঘন্য শাস্তি কঠিন শাস্তি পৃথিবীতে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। চিরস্থায়ী দোজখের আগুনে তাদের প্রত্যাবর্তনের কারণে।

অনুবাদ :

٦. وَاِنَّكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ . لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ اَىْ يُلْقٰى عَلَيْكَ بِشِدَّةٍ مِنْ لَّدُنْ مِنْ عِنْدِ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ فِىْ ذٰلِكَ .

৬. নিশ্চয় আপনাকে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআন দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আপনার উপর কঠোর উপায়ে অবতীর্ণ করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। এ ব্যাপারে।

٧. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ زَوْجَتِهٖ عِنْدَ مَسِيْرِهٖ مِنْ مَدْيَنَ اِلٰى مِصْرَ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ اَبْصَرْتُ مِنْ بَعِيْدٍ نَارًا ط سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ عَنْ حَالِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ ضَلَّهَا اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ بِالْاِضَافَةِ لِلْبَيَانِ وَتَرْكِهَا اَىْ شُعْلَةِ نَارٍ فِىْ رَاْسِ فَتِيْلَةٍ اَوْ عُوْدٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ . وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ مِنْ صَلِىَ بِالنَّارِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا تَسْتَدْفِئُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ .

৭. স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর পরিবারবর্গকে বলে ছিলেন তাঁর স্ত্রীকে মাদায়েন থেকে মিশর যাত্রাপথে আমি তো আগুন দেখেছি দূরে লক্ষ্য করছি সত্বর আমি সেথা হতে কোনো খবর আনব তোমাদের জন্য রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে। আর তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অথবা তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত আঙ্গার بِشِهَابٍ قَبَسٍ -এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ আকারে বা ইযাফতবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ, সলতা বা কাষ্ঠখণ্ডের মাথায় করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসব। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। تَصْطَلُوْنَ শব্দে طَاء টি اِفْتِعَالْ -এর تَا হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। এটা صَلِىَ بِالنَّارِ থেকে নিষ্পন্ন। এর لَامْ বর্ণে যের বা যবরযোগে। অর্থ– যাতে তোমরা ঠাণ্ডা প্রতিরোধকল্পে তাপ গ্রহণ করতে পার।

٨. فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ اَىْ بِاَنْ بُوْرِكَ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ مَنْ فِى النَّارِ اَىْ مُوْسٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط اَىِ الْمَلٰئِكَةُ اَوِ الْعَكْسُ وَبَارَكَ يَتَعَدّٰى بِنَفْسِهٖ وَبِالْحَرْفِ وَيُقَدَّرُ بَعْدَ فِىْ مَكَانٌ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . مِنْ جُمْلَةِ مَا نُوْدِىَ وَمَعْنَاهُ تَنْزِيْهُ اللّٰهِ مِنَ السُّوْءِ .

৮. অতঃপর তিনি যখন এর নিকট আসলেন তখন ঘোষিত হলো– ধন্য তিনি আল্লাহ বরকত দিয়েছেন যিনি আছেন এই আলোর মধ্যে অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) এবং যারা আছে এর চতুষ্পার্শে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বা এর বিপরীত। আর بَارَكَ ফে'লটি কখনো নিজে নিজেই مُتَعَدِّىْ হয় আবার কখনো হরফের মাধ্যমেও مُتَعَدِّىْ হয়। আর فِىْ -এর পর مَكَان উহ্য রয়েছে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। اَلْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত অংশটিও ঘোষণার অন্তর্গত। আর سُبْحَانَ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো মন্দ থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

٩. يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَىِ الشَّاْنُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

৯. হে মূসা! আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় اِنَّهٗ -এর যমীরটি হলো যমীরে শান।

অনুবাদ :

١٠. وَأَلْقِ عَصَاكَ ط فَأَلْقَاهَا فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَأَنَّهَا جَانٌّ خَفِيفَةٌ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يَرْجِعْ قَالَ تَعَالٰى يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ قف مِنْهَا اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ عِنْدِىْ الْمُرْسَلُوْنَ ق مِنْ حَيَّةٍ وَّغَيْرِهَا ـ

১০. আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন ফলে তিনি তা ফেললেন, অতঃপর তিনি যখন এটাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন جَانٌّ বলা হয় ছোট সাপকে। তখন তিনি পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং ফিরেও তাকালেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– হে মূসা! আপনি ভীত হবেন না এতে। নিশ্চয় আমি এমন আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পান না। সর্প ইত্যাদি হতে।

١١. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا اَتَاهُ بَعْدَ سُوْٓءٍ اَىْ تَابَ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ اَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَاَغْفِرُ لَهٗ ـ

১১. তবে যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে অর্থাৎ তওবা করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু অর্থাৎ আমি তার তওবা গ্রহণ করি ও তাকে ক্ষমা করে দেই।

١٢. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ طَوْقَ الْقَمِيْصِ يَخْرُجْ خِلَافَ لَوْنِهَا مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ بَرَصٍ لَهَا شُعَاعٌ يَغْشِى الْبَصَرَ اٰيَةً فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ مُرْسَلًا بِهَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

১২. এবং আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন জামার আস্তীনের নিচে বের হয়ে আসবে বাদামী বর্ণের বিপরীত বর্ণ শুভ্র নির্মল অবস্থায় শ্বেত রোগ ইত্যাদি ছাড়াই তাতে ঔজ্জ্বল্য হবে, যাতে চোখ ঝলসে যায়। একটি নিদর্শন ও মুজেযা এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত যা সহ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

١٣. فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً اَىْ مُضِيْئَةً وَاضِحَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ج بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ـ

১৩. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল। অর্থাৎ আলোকিত ও প্রকাশ্য তারা বলল, এটা সুস্পষ্ট জাদু। প্রকাশ্য ও স্পষ্ট।

١٤. وَجَحَدُوْا بِهَا اَىْ لَمْ يُقِرُّوْا وَ قَدِ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ اَىْ تَيَقَّنُوْا اَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط تَكَبُّرًا عَنِ الْاِيْمَانِ بِمَا جَاۤءَ بِهٖ مُوْسٰى رَاجِعٌ اِلَى الْجُحْدِ فَانْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ الَّتِىْ عَلِمْتَهَا مِنْ اِهْلَاكِهِمْ ـ

১৪. তারা নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করল অর্থাৎ স্বীকার করল না, অথচ তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যায় ও উদ্ধতভাবে অহঙ্কারবশত হযরত মূসা (আ.) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। আপনি দেখুন! হে মুহাম্মদ ﷺ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যা আপনি অবগত হয়েছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ : লেখক এ বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : اُقْرَان -এর উপর কিতাবের عَطْف করা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِه -এর অন্তর্গত মনে হয়, আর তা বৈধ নয়। কেননা উভয়টির অর্থ উদ্দেশ্য একই।

উত্তর : مَعْطُوف যদি কোনো অতিরিক্ত সিফত বিশিষ্ট হয়, তখন তার উপর عَطْف করা বৈধ হয়। কারণ তখন তা অনর্থক হয় না।

قَوْلُهُ يُؤْتُوْنَ : এটা اِيْتَاءٌ থেকে مُضَارِعٌ مَعْرُوْف এর সীগা, অর্থ তারা দেয়।

قَوْلُهُ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : هُمْ হলো مُبْتَدَأ . يُوْقِنُوْنَ হলো خَبَرْ আর يُوْقِنُوْنَ -এর সাথে بِالْاٰخِرَةِ অগ্রগামী مُتَعَلِّقْ এখানে مُبْتَدَأ ও خَبَرْ -এর মাঝে جَارمجرور -এর ব্যবধান ঘটায় هم যমীরকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। যাতে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে مُبْتَدَأ -এর সাথে خَبَرْ -এর اِتِّصَالْ বা সংযোগ ঘটে। ব্যাখ্যাকার (র.) وَاُعِيْدَهُمْ الخ বৃদ্ধি করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

قَوْلُهُ يَعْمَهُوْنَ : এটা عَمَهٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থ– সংশয়, সন্দেহ, অস্থিরতা, বিভ্রান্তি।

قَوْلُهُ لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا : এ ইবারত দ্বারা এ প্রশ্ন নিরসন করেছেন যে, কাফেরদের নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সংশয় ও বিভ্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কি? কারণ তারা তো বুঝেশুনে স্বেচ্ছায় স্ব-জ্ঞানেই কুফরি করে থাকে।

উত্তর : আমাদের কাছে তারা সংশয়ে লিপ্ত, তাদের নিজেদের কাছে নয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও বিভ্রান্তিকর কথা ও কাজ এবং দয়াময় আল্লাহর গায়বী সংবাদাদির মাঝে স্পষ্ট সংঘাতের দরুন তারা বিভ্রান্তি ও সংশয়ে লিপ্ত। তাদের মধ্যে এ পরিমাণ জ্ঞান নেই যার মাধ্যমে তারা ভালো-মন্দ ও সত্য-অসত্যের মাঝে প্রভেদ করবে। তারা কুফরি মতবাদের উপরই দৃঢ় থাকবে নাকি তা পরিহার করে সত্য দ্বীন গ্রহণ করবে– এ বিষয়ে তারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাখ্যাটি প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা কাফেররা যখন তাদের কর্মকে সঠিক ও উত্তম জ্ঞান করে, কাজেই তাদের সন্দিহান হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না। এ কারণে অন্যান্য মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই উত্তম। তা এই যে, يَعْمَهُوْنَ ক্রিয়াটি يَسْتَمِرُّوْنَ وَيَدَاوِمُوْنَ عَلَيْهَا তথা কুফর ও শিরকের উপর অনড় থাকা অর্থে। –[আবুস সাউদ] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা يَعْمَهُوْنَ -এর ব্যাখ্যা করেছেন يَلْعَبُوْنَ খেল-তামাশায় বিভোর থাকা দ্বারা। –[জুমাল-সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ لِمَصِيْرِهِمْ : এটা اَخْسَرُوْنَ -এর ইল্লত বা কারণ اَخْسَرُ হলো اِسْم تَفْضِيْل مُبَالَغَه বা আধিক্যজ্ঞাপক, অংশীদারিত্বজ্ঞাপক নয়। কেননা মুমিনদের জন্য ক্ষতি বা লোকসানের কিছুই নেই। কেউ কেউ বলেন– مُفَضَّلْ عَلَيْه তথা যাদের উপর প্রাধান্য বুঝাবে তারা কাফের গোষ্ঠী-ই, তবে স্থান-কালের পার্থক্য থাকতে পারে। অর্থাৎ কাফেররা দুনিয়ার তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قَوْلُهُ لَتُلَقّٰى : অর্থ– তোমাকে তালকীন করা হচ্ছে, শিখানো হচ্ছে। মূলত تُتَلَقّٰى ছিল بَاب تَفَعُّلْ থেকে وَاحِد مُؤَنَّثْ, مُضَارِعْ مَجْهُوْل একটি تَاء -কে বিলোপ করা হয়েছে। এটা দু' مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّيْ প্রথমটি فَاعِلْ -এর স্থলাভিষিক্ত। দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো اَلْقُرْاٰنَ

قَوْلُهُ بِشِدَّةٍ : কেননা সেখানে ভীষণ কষ্ট রয়েছে, অবতীর্ণের সময়ও এবং আমলের ক্ষেত্রেও।

قَوْلُهُ بِالْاِضَافَةِ : জালালাইন -এর বর্তমান কপিতে ইজাফতবিহীন রয়েছে। এ সময় قَبَسٍ শব্দটি مَقْبُوْسٍ অর্থে شِهَابٍ -এর بَدَلْ বা نَعْت হবে। আর ইযাফত আকারে হলে এটা اِضَافَت بَيَانِيَّة হবে।

قَوْلُهُ شُعْلَةَ نَارٍ : এটা مُضَافْ اِلَيْه ও مُضَافْ উভয়ের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ شِهَابٍ অর্থ– কুণ্ডলী, আর قَبَسٍ অর্থ– অগ্নি। فَتِيْلَةٌ অর্থ– সলতা, বটা বস্তু।

قَوْلُهُ نُوْدِيَ: এর نَائِب فَاعِلْ হলো مَوْسٰى এ সময় اَنْ تَفْسِيْرِيَّه হবে। কেননা পূর্বে نُوْدِيَ টি قِيْلَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, اَنْ تَفْسِيْرِيَّة উদ্দেশ্য নেওয়ার জন্য জরুরি হলো পূর্বে قَوْل বা তার থেকে নিষ্পন্ন কোনো শব্দ বা তার অর্থ বিশিষ্ট কোনো শব্দ বিদ্যমান থাকতে হবে। আর এখানে যদিও قَوْل থেকে গঠিত কোনো শব্দ নেই, তবে তার অর্থবোধক نُوْدِيَ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব اَنْ تَفْسِيْرِيَّة হবে। আবার مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ -ও হতে পারে। আর তার اِسْم হবে ضَمِيْر شَانْ আর بُوْرِكَ হবে তার خَبَرْ আবার اَنْ مَصْدَرِيَّة -ও হতে পারে। তখন حَرْف جَرّ উহ্য থাকবে। অর্থাৎ بِاَنْ হবে, আর اَنْ -এর পরের অংশ مَصْدَرْ -এর অর্থ বিশিষ্ট হবে। বাক্যটি এরূপ হবে– نُوْدِيَ بِبَرَكَةِ مَنْ فِى النَّارِ
بَارَكَ শব্দটি مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِه রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– بَارَكَ الرَّجُلَ অর্থাৎ লোকটির জন্য বরকতের দোয়া করেছে। আবার لَامْ , فِىْ ও عَلٰى -এর সাথে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়– بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ، بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا نُوْدِيَ : এর উদ্দেশ্য এই যে, যে জিনিসের আহবান করা হয়েছে তার মধ্যে تَنْزِيْه তথা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতামূলক বাক্য যথা سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -ও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ تَهْتَزُّ : এটা رَاٰهَا -এর مَفْعُوْل -এর যমীর থেকে حَالْ আর وَلّٰى مُدْبِرًا হলো لَمَّا -এর جَوَابْ

قَوْلُهُ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ ظَلَمَ : মুফাসসির (র.) اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ অর্থাৎ مَنْ ظَلَمَ দ্বারা غَيْر مُرْسَلِيْنَ তথা রাসূল নয় এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَنْ ظَلَمَ : এটা مُبْتَدَأْ আর فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ হলো خَبَرْ

قَوْلُهُ مُبْصِرَةً : এটা اٰيَاتٌ -এর حَالْ আর اٰيَاتٌ -এর প্রতি مُبْصِرَةٌ -এর সম্বন্ধ হলো مَجَازِىْ বা রূপক। কেননা اٰيَاتٌ দর্শনকারী হতে পারে না, বরং তার আলোকে দর্শন করা যায়। যেমন– نَهْرٌ جَارٍ -এর মধ্যে اِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে, অদ্রূপ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন– مُبْصِرَةٌ যদিও اِسْم فَاعِلْ তবে এটা اِسْم مَفْعُوْل অর্থে।

قَوْلُهُ اِسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُكُمْ : এটা جَحَدُوْا -এর وَاوْ থেকে قَدْ উহ্যসহ حَالْ

قَوْلُهُ ظُلْمًا وَعُلُوًّا : -এর সম্বন্ধ হলো جَحَدُوْ -এর সাথে। অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের ইল্লত হলো জুলুম ও অহংকার।

قَوْلُهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ : كَيْفَ হলো كَانَ -এর خَبَر مُقَدَّمْ এবং عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ হলো اِسْم مُؤَخَّرْ আর পূর্ণ বাক্যটি اُنْظُرْ বা চিন্তা-ভাবনা অর্থে, তার مُتَعَلِّقْ হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নামল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নামল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন নামল'। পিপীলিকার এ ঘটনা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের রাতে যখন তিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ গুহার মুখে মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল মহানবী ﷺ -এর মুজেযা ও নবুয়তের দলিল। ঠিক তেমনিভাবে হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এ সূরায় আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তাবলীগের পন্থা উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেন না।

এ সূরায় তাওহীদ এবং নবুয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৯, পৃ. ৩]

এই সূরার আমল : যদি কেউ এই সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বগৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছুসহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকেব। -[দুরারুন নাজিম]

স্বপ্নের তাবীর : সুফুরী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রিসালতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তাওহীদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে রয়েছে আখেরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

قَوْلُهُ طٰسٓمّٓ : এ অক্ষসমূহকে মুকাত্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো পবিত্র কুরআনের নাম সমূহের অন্যতম। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১১১]

قَوْلُهُ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ : অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এখানে اَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

১. زُيِّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ২. وَزُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ৩. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন- حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত اَعْمَالَهُمْ [তাদের কর্ম] শব্দও এ কথা বোঝায় যে, এর অর্থ হলো- কুকর্ম; সৎকর্ম নয়।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ اِنِّيْ ...... لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ : মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : হযরত মূসা (আ.) এ স্থলে দুটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। ১. বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। ২. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত- পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। -[রূহুল মা'আনী]

এ স্থলে হযরত মূসা (আ.) تَصْطَلُوْنَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম : আয়াতে قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ বলা হয়েছে। اَهْل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ স্থলে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া

যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন– সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ ..... اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : মূসা (আ.)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ : হযরত মূসা (আ.)-এর এই ঘটনা কুরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তাসাপেক্ষ– ১. بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং ২. اَنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে– اِذْ رَاٰى نَارًا থেকে نُوْدِىَ يَامُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ـ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ

এসব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ– ১. اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ এবং ২. اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ ; সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

এই সূরাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপে হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর আগুনের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলার তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এই আওয়াজ শুনা গেল– ١. اِنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ ٢. اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ ٣. اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ٤. اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا

এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান (র.) এবং রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোনো বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে– শুধু কর্ণ নয়; বরং হাত, পা এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ মুজেযা।

এই গায়বি আওয়াজ নির্দিষ্ট কোনো দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশও সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا এবং সূরা কাসাসে اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর সত্তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্টবস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরিউক্ত কারণেই এর তাফসীরে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে– مَنْ فِى النَّارِ বলে হযরত মূসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে হযরত মূসা (আ.) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে– مَنْ فِى النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

অনুবাদ :

١٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِبْنَهٗ عِلْمًا ج بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ وَقَالَا شُكْرًا لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَتَسْخِيْرِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّيَاطِيْنِ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج

১৫. আমি অবশ্যই হযরত দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলায়মান (আ.)-কে দান করেছিলাম জ্ঞান মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করা এবং পাখিদের সাথে কথা বলা ইত্যাদির জ্ঞান। তারা উভয়ে বলেছিলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নবুয়ত এবং জিন, মানুষ ও শয়তানকে অনুগত করার মাধ্যমে বহু মুমিন বান্দাদের উপর।

١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ النُّبُوَّةَ وَالْعِلْمَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اَىْ فَهْمَ اَصْوَاتِهٖ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ط يُؤْتَاهُ ه الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُلُوْكُ اِنَّ هٰذَا الْمُؤْتٰى لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ.

১৬. হযরত সুলায়মান (আ.) হয়েছিলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। নবুয়ত ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তিনি বলেছিলেন, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শব্দ বুঝার জ্ঞান। এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে। যা নবী ও বাদশাহগণকে দান করা হয়। এটা অবশ্যই প্রদত্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

١٧. وَحُشِرَ جُمِعَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فِىْ مَسِيْرٍ لَهٗ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ يُجْمَعُوْنَ ثُمَّ يُسَاقُوْنَ.

১৭. হযরত সুলামান (আ.)-এর সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে তাঁর সাথে চলার জন্য এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে। একত্র করা হলো। এরপর রওয়ানা দেওয়া হলো।

١٨. حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا هُوَ بِالطَّائِفِ اَوْ بِالشَّامِ نَمْلَةٌ صِغَارٌ اَوْ كِبَارٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ مَلِكَةُ النَّمْلِ وَقَدْ رَاَتْ جُنْدَ سُلَيْمَانَ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ يُكَسِّرَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. بِهَلَاكِكُمْ نَزَلَ النَّمْلُ مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ فِى الْخِطَابِ بِخِطَابِهِمْ.

১৮. যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল আর তা হলো তায়েফ বা সিরিয়া। ছোট বড় সকল পিপিলিকাকেই نَمْل বলা হয়। তখন এক পিপীলিকা বলল, পিপীলিকাদের রাণী, সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষ করেছিল। হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। ভেঙ্গে না ফেলে হযরত সুলায়মান (আ.) এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি। এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পিপীলিকাদেরকে বিবেকবানদের পর্যায়ে আনা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٩. فَتَبَسَّمَ سُلَيْمَانُ ابْتِدَاءً ضَاحِكًا انْتِهَاءً مِّنْ قَوْلِهَا وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْ ثَلٰثَةِ أَمْيَالٍ حَمَلَتْهُ الرِّيْحُ إِلَيْهِ فَحَبَسَ جُنْدَهُ حِيْنَ أَشْرَفَ عَلٰى وَادِيْهِمْ حَتّٰى دَخَلُوْا بُيُوْتَهُمْ وَكَانَ جُنْدُهُ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِيْ هٰذَا الْمَسِيْرِ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَلْهِمْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ - الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ -

১৯. তার উক্তিতে হযরত সুলায়মান (আ.) মৃদু হেসে ফেললেন প্রথমত মুচকি হাসি দিলেন, এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে অট্টহাসি দিলেন। তিনি একথা তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। বাতাস তার নিকট তা পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলে তার বাহিনীকে থামালেন। যাতে তারা তাদের গর্তে প্রবেশ করতে পারে। এ ভ্রমণে তাঁর বাহিনী আরোহী ও পদাতিক ছিল এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য প্রদান করুন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। নবী ও ওলীগণের।

٢٠. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ لِيَرَى الْهُدْهُدَ الَّذِيْ يَرَى الْمَاءَ تَحْتَ الْأَرْضِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَقْرِهِ فِيْهَا فَتَسْتَخْرِجُهُ الشَّيٰطِيْنُ لِاحْتِيَاجِ سُلَيْمَانَ إِلَيْهِ لِلصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرَهُ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ، أَيْ أَعَرَضَ لِيْ مَا مَنَعَنِيْ مِنْ رُؤْيَتِهِ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ . فَلَمْ أَرَهُ لِغَيْبَتِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَهَا قَالَ -

২০. হযরত সুলায়মান (আ.) বিহঙ্গদলের সন্ধান নিলেন হুদহুদকে দেখার জন্য। যে মাটির নিচে পানি দেখলে সেখানে চঞ্চু দ্বারা ঠোকর দিয়ে পানির তার সন্ধান দিত। আর শয়তান খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নামাজ আদায়ের জন্য পানির প্রয়োজন হতো। কিন্তু তিনি হুদহুদকে দেখতে পেলেন না। এবং বললেন, ব্যাপারকি হুদহুদকে দেখছি না যে, অর্থাৎ আমার এমন কি হলো? যা আমাকে তার দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হচ্ছে নাকি সে অনুপস্থিত? তার অনুপস্থিতির কারণে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না যখন তার অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হলো তখন তিনি বললেন–

٢١. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا أَيْ تَعْذِيْبًا شَدِيْدًا بِنَتْفِ رِيْشِهِ وَذَنَبِهِ وَرَمْيِهِ فِي الشَّمْسِ فَلَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْهَوَامِّ أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ بِقَطْعِ حُلْقُوْمِهِ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِنُوْنٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُوْرَةٍ أَوْ مَفْتُوْحَةٍ يَلِيْهَا نُوْنٌ مَكْسُوْرَةٌ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ - برهان بين ظاهر على عذره -

২১. আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব তার পালক ও লেজ উৎপাটন ও রোদ্রে নিক্ষেপের মাধ্যমে। ফলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। অথবা অবশ্যই তাকে জবাই করব। তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলার মাধ্যমে সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে। لَيَأْتِيَنِّيْ ফে'লটি যের বিশিষ্ট নূন সহকারে অথবা তার সাথে যের বিশিষ্ট নূন মিলিত আকারে পঠিত রয়েছে। সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ তার ওজরের বিষয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اٰتَيْنَا : এটা اَعْطَيْنَا [আমি দান করলাম] অর্থে। طَيْرٌ হলো طَائِرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পাখি, বিমান। قَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ [সে বলল, হে লোক সকল! আমাকে পাখির কথা বুঝার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।] اَلنُّوْنُ نُوْنُ الْوَاحِدِ الْمُطَاعُ عَلَى الْمُلُوْكِ فَاِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُوْنَ مِثْلَ ذَالِكَ رَعِيَّتُهُ لِقَاعِدَةِ السِّيَاسَةِ এখানে সুলায়মান (আ.)-এর নিজের একার ক্ষেত্রে عُلِّمْنَا তথা جَمْع مُتَكَلِّمْ শব্দ ব্যবহার করাটা শাহী সম্বোধনসুলভ ছিল, অহংকারবশত নয়। –[রূহুল বয়ান]

কেউ কেউ বলেন عُلِّمْنَا-এর দ্বারা তিনি নিজেকে ও তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে এ ব্যাখ্যাটা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পাখিদের ভাষা বুঝার বিশেষত্বের পরিপন্থি। হযরত সুলায়মান (আ.) যদিও পাখিসহ অন্যান্য প্রাণীর ভাষাও বুঝতেন, তবে পাখি সব সময় তার সঙ্গে থাকার দরুন এখানে পাখিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَىْ عِلْمًا الْقَضَاءِ وَبِمَنْطِقِ الطَّيْرِ শব্দের مَنْطِقَ হলো عَطْف -এর উপর قَضَاء -এর উপর بَاء -এর অধীনে আসার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَالِكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পাখিদের কথা বুঝার শক্তি ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীদের ভাষা বুঝার জ্ঞানও দান করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا : এটা উহ্য ফে'লের غَايَتْ বা সীমানা জ্ঞাপক। বাক্যটি এরূপ ছিল– فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا [তারা যাত্রা করল, এক পর্যায়ে যখন তারা আগমন করল] আর কেউ কেউ يُوْزَعُوْنَ -এর غَايَتْ বলেছেন, এ সময় বাক্য হবে– فَهُمْ يَسِيْرُوْنَ مَمْنُوْعًا بَعْضُهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ بَعْضٍ حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِى النَّمْلَةِ

قَوْلُهُ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ : এখানে مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ف আর صَالِحِيْنَ দ্বারা এখানে পূর্ণাঙ্গ সালেহ তথা নেককারগণ উদ্দেশ্য, আর তারা হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। কাজেই এ প্রশ্ন তিরোহিত হয়ে গেল যে, সালিহীনের অন্তর্গত হওয়ার অর্থ কি? নবীগণ তো সালিহীনের মর্যাদার চেয়ে বহু উর্ধ্বের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا : বলা বাহুল্য এখানে পয়গাম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়। যেমন হযরত দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গাম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্ব ও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়; বরং তিনি জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উর্ধ্বে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ : পয়গাম্বরগণের সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না : وَرِثَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে, আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْرِثُ وَلَا نُوْرَثُ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ অর্থাৎ আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী। কিন্তু পয়গাম্বরগণের জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে; তাঁদের আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবূ আব্দুল্লাহর রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) হলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। –[রূহুল মা'আনী]

যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ হযরত দাউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ.)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ.)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার ও বিহঙ্গকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারের কোনো কোনো ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদিরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا الخ : অহংকার না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্য ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শনা না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোনো বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। –[কুরতুবী]

জ্ঞাতব্য : আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنْطِقَ الطَّيْرِ অর্থাৎ বিহঙ্গকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। 'হুদহুদ' পাখী জাতীয় প্রাণী। আর হযরত সুলায়মান (আ.)-কে তো সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলিই শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ.) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোনো-না কোনো উপদেশ বাক্য।

قَوْلُهُ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : আভিধানিক দিক দিয়ে كُلّ শব্দের মধ্যে কোনো বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়। যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ি ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে ছিল না।

قَوْلُهُ رَبِّ أَوْزِعْنِي : এটা وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোনো সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে فَهُمْ يُوزَعُونَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ : এখানে رِضَا-এর অর্থ কবুল বা গ্রহণ করা। অর্থাৎ যে আল্লাহ আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরি নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন। যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন– رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا এতে বোঝা গেল যে, কোনো সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ : **সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না :** সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও । কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত সুলায়মান (আ.) ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যা দ্বারা আমি জান্নাতের উপযুক্ত হই।

قَوْلُهُ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ : تَفَقَّدَ -এর শাব্দিক অর্থ কোনো জনসমাবেশ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেওয়া । তাই এর অনুবাদ খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা মানব, জিন, জন্তু ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেওয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে– وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর পক্ষী-প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরিফ নিয়ে যেতেন, তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোনো কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজখবর নেওয়া জরুরি : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বস্তরে প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি; বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারূক (রা) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গাম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোনো ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ مَا لِىَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ : হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না?

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল একথা বলার "হুদহুদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোনো ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণির পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়েব

হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? সুফী-বুজুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোনো নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনকল্পে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোনো ত্রুটি হলো, যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী (র.) ইবনে আরবী (র.)-এর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুজুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে- إِذَا فَقَدُوْا اٰمَالَهُمْ تَفَقَّدُوْا اَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলির খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ত্রুটি হয়ে গেছে? এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তাভাবনার পর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন- اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ এখানে اَمْ শব্দটি بَلْ -এর সমার্থবোধক। অর্থাৎ হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি; বরং সে উপস্থিত নয়। -[কুরতুবী]

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাস করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বল-লেন, হযরত সুলায়মান (আ.) তখন এমন এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে? হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- قِفْ يَا وَقَّافُ كَيْفَ يَرَى الْهُدْهُدُ بَاطِنَ الْاَرْضِ وَهُوَ لَا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فِيْهِ অর্থাৎ হে জ্ঞানীগণ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোনো ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

قَوْلُهُ لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهُ : যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ : প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন। যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের গোশত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনো হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনো জায়েজ। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ : অর্থাৎ হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোনো উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত উযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

অনুবাদ :

٢٢. فَمَكَثَ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا غَيْرَ بَعِيْدٍ أَيْ يَسِيْرًا مِنَ الزَّمَانِ وَحَضَرَ لِسُلَيْمَانَ مُتَوَاضِعًا بِرَفْعِ رَأْسِهِ وَإِرْخَاءِ ذَنَبِهِ وَجَنَاحَيْهِ فَعَفَا عَنْهُ وَسَأَلَهُ عَمَّا لَقِيَ فِيْ غَيْبَتِهِ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ أَيْ اِطَّلَعْتُ عَلَى مَالَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ قَبِيْلَةٌ بِالْيَمَنِ سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدٍّ لَهُمْ بِاعْتِبَارِهِ صُرِفَ بِنَبَإٍ بِخَبَرٍ يَّقِيْنٍ.

২২. অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে গেল অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সম্মুখে বিনীতভাবে মাথা উঁচু করে লেজ ও উভয় ডানা নিচু করে উপস্থিত হলো। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে তার অনুপস্থিতিকালে কি ঘটেছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিলেন। তখন সে বলল, আপনি যা আয়ত্ত করতে পারেননি তা আমি আয়ত্ত করেছি। অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে অবগত নন আমি সে বিষয়ে অবগত হয়েছি আমি সাবা হতে আপনার নিকট এসেছি سَبَا শব্দটি مُنْصَرِفْ এবং غَيْر مُنْصَرِفْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে তারা এ নামে অভিহিত হয়েছে। এ হিসেবে এটা مُنْصَرِفْ সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে।

٢٣. إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ أَيْ هِيَ مَلِكَةٌ لَهُمْ اِسْمُهَا بِلْقِيْسُ وَ أُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُلُوْكُ مِنَ الْاٰلَةِ وَالْعُدَّةِ وَّلَهَا عَرْشٌ سَرِيْرٌ عَظِيْمٌ. طُوْلُهُ ثَمَانُوْنَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ ثَلٰثُوْنَ ذِرَاعًا مَضْرُوْبٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ الْأَحْمَرِ وَالزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَالزُّمُرُّدِ وَقَوَائِمُهُ مِنَ الْيَاقُوْتِ الْأَحْمَرِ وَالزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَالزُّمُرُّدِ عَلَيْهِ سَبْعَةُ بُيُوْتٍ عَلٰى كُلِّ بَيْتٍ بَابٌ مُغْلَقٌ.

২৩. আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে অর্থাৎ সে হলো তাদের রাণী তার নাম বিলকীস তাকে সকল কিছু হতেই দেওয়া হয়েছে। রাজা-বাদশাহগণের যা প্রয়োজন হয় যেমন হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। তার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত, প্রস্থ ছিল চল্লিশ হাত, উচ্চতায় ছিল ত্রিশ হাত; সেটি স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত এবং মণি-মুক্তা, লাল চুনি, সবুজ গোমেদ ও পান্না [পাথর বিশেষ] দ্বারা কারুকার্যকৃত। তার পায়াগুলো ছিল লাল চুনি ও সবুজ গোমেদ বিজড়িত। তাতে ছিল সাতটি কক্ষ এবং প্রত্যেক কক্ষের দরজা বন্ধ ছিল।

٢٤. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ صـ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ.

২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলি তাদের নিকট শোভন করছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সৎপথ পায় না।

অনুবাদ :

٢٥. أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ أَيْ أَنْ يَسْجُدُوْا لَهُ فَزِيْدَتْ لَا وَأُدْغِمَ فِيْهَا نُوْنُ أَنْ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ وَالْجُمْلَةُ فِيْ مَوْضِعِ مَفْعُوْلِ يَهْتَدُوْنَ بِإِسْقَاطِ إِلٰى . الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَخْبُوْءِ مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَمَا تُعْلِنُوْنَ بالسنتهم .

২৫. নিবৃত্ত করেছে এজন্য যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে أَلَّا يَسْجُدُوْا মূলত أَنْ يَسْجُدُوْا অর্থে لَا অতিরিক্ত আর তাতে أَنْ -এর نُوْن -কে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আল্লাহর বাণী– لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ -এর মধ্যে হয়েছে। إِلٰى হরফে জরকে বিলুপ্ত করে يَهْتَدُوْنَ -এর মাফউল -এর স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। اَلْخَبْأَ টি মাসদার اَلْمَخْبُوْءُ অর্থ– লুক্কায়িত পানি ও উদ্ভিদ। এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর। তোমাদের হৃদয়ে এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর তোমাদের রসনার মাধ্যমে।

٢٦. اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . اِسْتِئْنَافٌ جُمْلَةُ ثَنَاءٍ مُشْتَمِلٍ عَلٰى عَرْشِ الرَّحْمٰنِ فِيْ مُقَابَلَةِ عَرْشِ بِلْقِيْسَ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيْمٌ .

২৬. আল্লাহ; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি মহা আরশের অধিপতি। একটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য। বিলকীসের সিংহাসনের বিপরীতে দয়াময় আল্লাহর সিংহাসন স্তুতি সম্বলিত। আর উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে।

٢٧. قَالَ سُلَيْمَانُ لِلْهُدْهُدِ . سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ فِيْمَا أَخْبَرْتَنَا بِهِ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ . أَيْ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَمْ كَذَبْتَ فِيْهِ . ثُمَّ دَلَّهُمْ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتُخْرِجَ وَارْتَوَوْا تَوَضَّؤُوْا وَ صَلُّوْا ثُمَّ كَتَبَ سُلَيْمَانُ كِتَابًا صُوْرَتُهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ إِلٰى بِلْقِيْسَ مَلِكَةِ سَبَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ثُمَّ طَبَعَهُ بِالْمِسْكِ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْهُدْهُدِ .

২৭. হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে বললেন, আমি দেখব তুমি কি সত্য বলেছ যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে খবর দিয়েছ সে ব্যাপারে নাকি তুমি মিথ্যাবাদী অর্থাৎ তুমি মিথ্যুক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ বাক্যটি أَمْ كَذَبْتَ فِيْهِ নাকি এ বিষয়ে তুমি মিথ্যা বলেছ থেকে অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। এরপর হুদহুদ পাখি পানির সন্ধান দিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.) পানি বের করলেন। আর তখন লোকজন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। তারা অজু করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.) একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির ধরন এরূপ ছিল– আল্লাহর বান্দা সুলায়মান ইবনে দাউদের পক্ষ থেকে সাবা সম্রাজ্ঞী বিলকীসের প্রতি– পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। সত্যের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি আমার মোকাবেলায় অবাধ্যতা অবলম্বন করো না; বরং অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো! এরপর তাতে মেশক দ্বারা ছাপ দিয়ে স্বীয় সীলমোহর মেরে দিলেন। তার পর হুদহুদকে বললেন–

অনুবাদ :

٢٨. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهِ اِلَيْهِمْ اَىْ بِلْقِيْسَ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلَّ اِنْصَرِفْ عَنْهُمْ وَقِفْ قَرِيْبًا مِنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ـ يَرُدُّوْنَ مِنَ الْجَوَابِ فَاَخَذَهُ وَاَتَاهَا وَحَوْلَهَا جُنْدُهَا فَاَلْقَاهُ فِىْ حِجْرِهَا فَلَمَّا رَاَتْهُ اِرْتَعَدَتْ وَخَضَعَتْ خَوْفًا ثُمَّ وَقَفَتْ عَلٰى مَا فِيْهِ ـ

২৮. তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর অর্থাৎ বিলকীস ও তার সম্প্রদায়ের নিকট অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে যাও এবং তাদের অনতি দূরে অবস্থান কর এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি? তারা কি উত্তর দেয়? হুদহুদ চিঠিটি নিয়ে বিলকীসের নিকট আসল। সে ছিল তার বাহিনী পরিবেষ্টিত। হুদহুদ চিঠিটিকে তার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করল। যখন রাণী বিলকিস এটাকে দেখল, তখন প্রকম্পিত হলো এবং ভয়ে মূহ্যমান হয়ে পড়ল। অতঃপর সে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হলো।

٢٩. قَالَتْ لِاَشْرَافِ قَوْمِهَا يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا مَكْسُوْرَةً اِنِّىْٓ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ مَخْتُوْمٌ ـ

২৯. সেই নারী বলল তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে হে পরিষদবর্গ! উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে যেরযুক্ত واو দ্বারা পরিবর্তন করে পঠিত। আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। সিলমোহরকৃত।

٣٠. اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ اَىْ مَضْمُوْنُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

৩০. এটা সুলায়মানের নিকট হতে, আর এটা এই অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু- পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

٣١. اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ

৩১. অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَبْلَغُ مِنْ اَنْ كَذَبْتَ فِيْهِ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন : اَمْ كَذَبْتَ বলা সংক্ষিপ্ত ছিল এবং এমন বলাটা প্রসিদ্ধ ও অধিক ব্যবহৃত তথাপি তা পরিহার করে اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ বললেন কেন, অথচ এটা অপ্রসিদ্ধ ও দীর্ঘবাক্য?

উত্তর : اَمْ كَذَبْتَ এটা কখনো কখনো মিথ্যা প্রকাশিত হওয়া বুঝায়, আর اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ সব সময় মিথ্যা বলা বা মিথ্যায় অভ্যস্ত হওয়া বুঝায়। এ কারণেই সংক্ষিপ্ত পরিহার করে দীর্ঘ বাক্য অবলম্বন করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَانْظُرْ : اُنْظُرْ ক্রিয়াটি اِنْتَظِرْ [অপেক্ষা কর] অর্থে , مَا হলো اَلَّذِىْ অর্থে صِلَه টি যেহেতু বাক্য, এ কারণে عَائِدْ বিলুপ্ত হয়েছে। বাক্যটি এরূপ হবে- اِنْتَظِرِ الَّذِىْ يَرْجِعُوْنَ [তারা প্রতি উত্তরে কি করে তার অপেক্ষা করবে।]

قَوْلُهٗ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا مَكْسُوْرًا : এখানে তাসহীল তথা সহজাকার দ্বারা প্রসিদ্ধ তাসহীল উদ্দেশ্য নয়; বরং দ্বিতীয় হামযাকে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য । অর্থাৎ- يَا اَيُّهَا الْمَلَاوُ

قَوْلُهُ اُلْقِيَ كِتَابٌ كَرِيْمٌ : এর দ্বারা সিলমোহরকৃত পত্র উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- كَرَمُ الْكِتَٰبِ خَتْمُهُ [পত্র গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া হলো তার মোহরাঙ্কন]

قَوْلُهُ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة অর্থাৎ উহ্য প্রশ্নের উত্তর। বিলকীস যখন বলল اِنِّيْ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ [আমার নিকট একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে] তখন সহসা এ প্রশ্ন উঠে যে, مَا هُوَ؟ [তা কি?] এর উত্তরে বলা হয়েছে- اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ الخ

قَوْلُهُ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ : এটা হয়তো كِتَابٌ থেকে بَدَل হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَرْفُوْع অথবা উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرٌ হিসেবে مَرْفُوْع হয়েছে। অর্থাৎ- .... مَضْمُوْنُهُ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ : অর্থাৎ হুদহুদ তার ওজর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গাম্বরগণ 'আলেমুল গায়ব' নন : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গাম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

قَوْلُهُ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ : 'সাবা' ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়েমেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি? হুদহুদের উপরিউক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোনো শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোনো ব্যক্তি আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চেয়ে আমার বেশি; যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে পীর ও মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওজরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোনো কথা বললে তাতে দোষ নেই।

قَوْلُهُ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ : অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। -[কুরতুবী]

তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়েমেনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভেই বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। -[কুরতুবী]

প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান বলে স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানবজাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কিনা? এতে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েজ বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায়, ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ 'আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান' কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না। তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনা প্রয়োজন নেই। কেননা তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরিয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব-নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোনো রেওয়ায়েতে হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ বিলকীস নিজে জিন ছিল না। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরো বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কিনা? সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন- لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاةً অর্থাৎ যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ বিষয়ে একমত যে, কোনো নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাজের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) বিল্‌কীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, একথা কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

قَوْلُهُ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ কোনো সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তার সবই বিদ্যমান ছিল। অবশ্য সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ : আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল। আর মোতি, ইয়াকূত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

قَوْلُهُ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ : এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, তারা অগ্নিপূজারী ছিল। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الخ : اَلَّا يَسْجُدُوْا -এর সম্পর্ক زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ -এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্যপথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, তারা আল্লাহকে সিজদা করবে না।

قَوْلُهُ اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا : লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরিয়তসম্মত দলিল : হযরত সুলায়মান (আ.) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলিল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরি, ফিকহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা পত্র ও টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোনো আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাসআলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের কাছে পত্র লেখা জায়েজ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কাফেরদের কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে।

قَوْلُهُ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ : কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম । এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَوْلُهُ قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ : كَرِيْمٌ -এর শাব্দিক অর্থ– সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোনো পত্রকে তখনই সম্ভ্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَابٌ كَرِيْمٌ -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, যুহাইর (র.) প্রমুখ كِتَابٌ مَخْتُوْمٌ তথা 'মোহরাঙ্কিত পত্র' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল ﷺ যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পূরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ.)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল? হযরত সুলায়মান (আ.) আরববাসী ছিলেন না; কিন্তু আরবি ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহঙ্গকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সেক্ষেত্রে আরবি ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ.) আরবি ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক [বিলকীস] আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। আর এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : পত্র লেখার কতিপয় আদব : কুরআন পাক মানবজীবনের কোনো দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের নাম : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিকনির্দেশ এই যে, পত্রটি হযরত সুলায়মান (আ.) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন? কুরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে, চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে? এরূপ খোঁজাখুজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর অথবা কোনো মুরব্বির কাছে পত্র লেখে তখন প্রেরক হিসেবে তার নাম অগ্রে থাকাটা আদবের খেলাফ হবে কিনা এবং তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (র.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে–

مَا كَانَ اَحَدٌ اَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهٗ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ كِتَابًا بَدَأَ بِاَنْفُسِهِمْ قُلْتُ وَكِتَابُ عَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ يَشْهَدُ لَهٗ عَلٰى مَا رُوِيَ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিলেন না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে আ'লাউল হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কে; বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে দেয়, তবে তাও জায়েজ। ফকীহ আবুল-লাইস (র.) 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গাম্বরগণের সুন্নত : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জবাব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জবাবকে সালামের জবাবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। −[কুরতুবী]

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখার বিধান : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লিখিত সব পত্রদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এখন বিসমিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, নাকি পরে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, বিসমিল্লাহ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কুরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পূর্বে ও বিসমিল্লাহ পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিসমিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়; কিন্তু ইবনে আবী হাতেম (র.) ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন− بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ اِلٰى بِلْقِيْسَ اِبْنَةِ ذِىْ شَرْحٍ وَقَوْمِهَا اَنْ لَا تَعْلُوْا الخ কিন্তু বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। আর কুরআনে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ আগে ছিল নাকি পরে? কুরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র পড়ে শোনানোর সময় বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

কুরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোনো কাফের ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েজ কিনা? উপরিউক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখিত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, এরূপ করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কুরআন পাক তো কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোনো আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কুরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফেরের হাতেও দেওয়া যায় এবং অজু ছাড়াও তা স্পর্শ করা যায়। −[ফতওয়ায়ে আলমগীরী]

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যেই সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেরের মোকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলি ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কুরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গাম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। −[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

৩২. وَقَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا اَىْ اَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِىْ اَمْرِىْ ج مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا قَاضِيَتَهُ حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ تَحْضُرُوْنَ .

৩২. সেই নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। উভয় হামযা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করে সহজভাবে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত।

৩৩. قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ اَصْحَابُ شِدَّةٍ فِى الْحَرْبِ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ نُطِعْكِ .

৩৩. তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা। রণাঙ্গনে শৌর্যবীর্যের অধিকারী। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন, আমরা আপনার আনুগত্য করব।

৩৪. قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا بِالتَّخْرِيْبِ وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ اَىْ مُرْسِلُوا الْكِتَابِ .

৩৪. সে বলল, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। ধ্বংসলীলার দ্বারা এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিকে অপদস্ত করে, এরাও এরূপই করবে। অর্থাৎ পত্র প্রেরকগণ।

৩৫. وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ . مِنْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ اَوْرَدِّهَا اِنْ كَانَ مَلِكًا قَبِلَهَا اَوْ نَبِيًّا لَمْ يَقْبَلْهَا فَاَرْسَلَتْ خَدَمًا ذُكُوْرًا وَاِنَاثًا اَلْفًا بِالسَّوِيَّةِ وَخَمْسَمِاْئَةٍ لَبِنَةً مِنَ الذَّهَبِ وَتَاجًا مُكَلَّلًا بِالْجَوَاهِرِ وَ مِسْكًا وَعَنْبَرًا وَغَيْرَ ذٰلِكَ مَعَ رَسُوْلٍ بِكِتَابٍ فَاَسْرَعَ الْهُدْهُدُ اِلٰى سُلَيْمَانَ يُخْبِرُهُ الْخَبَرَ .

৩৫. আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতরা কি নিয়ে ফিরে আসে? উপঢৌকন গ্রহণ করে নাকি ফিরিয়ে দেয়। যদি সে রাজা হয়, তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি নবী হন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তখন সে একহাজার খাদেম প্রেরণ করল। তন্মধ্যে পাঁচশতজন যুবক ও পাঁচশত জন যুবতী ছিল। স্বর্ণের পাঁচশত ইট। মুক্তাখচিত একটি মুকুট এবং মেশক ইত্যাদি মূল্যবান বহু সামগ্রীর সাথে দূতের নিকট একটি চিঠিও পাঠিয়েছিল। হুদহুদ দ্রুত এসে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে এ সংবাদ অবহিত করল।

অনুবাদ :

فَاَمَرَ اَنْ تَضْرِبَ لَبِنَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ تَبْسُطَ مِنْ مَوْضِعِهٖ اِلٰى تِسْعَةِ فَرَاسِخَ مَيْدَانًا وَاَنْ يَبْنُوْا حَوْلَهٗ حَائِطًا مُشَرَّفًا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ يُؤْتٰى بِاَحْسَنِ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَعَ اَوْلَادِ الْجِنِّ عَنْ يَمِيْنِ الْمَيْدَانِ وَشِمَالِهٖ ـ

হযরত সুলায়মান (আ.) স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট তৈরি করে তার প্রসাদ থেকে নয় ফরসখ [এক ফরসখ প্রায় ৮ কি: মি:] পর্যন্ত মাঠে তা বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাঠের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দ্বারা উচু প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর জিনদের সন্তানাদিসহ ময়দানের ডানে বামে জল-স্থলের সর্বোৎকৃষ্ট সওয়ারী উপস্থিত করতেও নির্দেশ দিলেন।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَ الرَّسُوْلُ بِالْهَدِيَّةِ وَمَعَهٗ اَتْبَاعُهٗ سُلَيْمٰنَ قَالَ سُلَيْمٰنُ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰنِیَ اللّٰهُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْمُلْكِ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ج مِنَ الدُّنْيَا بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ لِفَخْرِكُمْ بِزَخَارِفِ الدُّنْيَا ـ

৩৬. যখন সেই দূত ও তার অনুচরবৃন্দ উপঢৌকনসহ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট আসল, তখন হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন নবুয়ত ও রাজত্ব থেকে তা তোমাদেরকে যা দিয়েছে না তা হতে উত্তম অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ হতে। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ। পার্থিব ঐশ্বর্যে তোমাদের গর্ব থাকার দরুন।

٣٧. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ بِمَا اَتَيْتَ بِهٖ مِنَ الْهَدِيَّةِ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ مِنْ بَلَدِهِمْ سَبَا سُمِّيَتْ بِاسْمِ اَبِىْ قَبِيْلَتِهِمْ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ اَىْ اِنْ لَّمْ يَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهَا الرَّسُوْلُ بِالْهَدِيَّةِ جَعَلَتْ سَرِيْرَهَا دَاخِلَ سَبْعَةِ اَبْوَابٍ دَاخِلَ قَصْرِهَا وَقَصْرِهَا دَاخِلَ سَبْعَةِ قُصُوْرٍ وَاَغْلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا حَرَسًا وَتَجَهَّزَتْ لِلْمَسِيْرِ اِلٰى سُلَيْمٰنَ لِتَنْظُرَ مَا يَاْمُرُهَا بِهٖ فَارْتَحَلَتْ فِىْ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفِ قَيْلٍ مَعَ كُلِّ قَيْلٍ اُلُوْفٌ كَثِيْرَةٌ اِلٰى اَنْ قَرُبَتْ مِنْهُ عَلٰى فَرْسَخٍ شَعُرَ بِهَا ـ

৩৭. তাদের নিকট ফিরে যাও যে উপঢৌকন নিয়ে এসেছ তা সহ আমি অবশ্য তাদের নিকট নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তথা হতে তাদেরকে বহিষ্কার করব তাদের সাবা নগর হতে। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হয়ে আমার নিকট আগমন না করে। যখন প্রেরিত দূত উপঢৌকনসহ রাণীর নিকট ফিরে গেল, তখন বিলকীস তার সিংহাসনকে তার প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাখল তার প্রাসাদটি অপর সাতটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল। আর ফটকসমূহকে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে প্রহারী নিযুক্ত করল। তারপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নিল তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন তা জানার/ দেখার জন্য। অতঃপর সে বার হাজার নেতৃস্থানীয় লোকজন নিয়ে যাত্রা করল। প্রত্যেক নেতার সাথে ছিল হাজার হাজার লোক। এভাবে সে হযরত সুলায়মান (আ.) থেকে মাত্র এক ফরসখ দূরত্বে পৌঁছে গেল। ইতোমধ্যে হযরত সুলায়মান (আ.) তার আগমন সম্পর্কে অবগত হলেন।

অনুবাদ :

٣٨. قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ فِى الْهَمْزَتَيْنِ مَا تَقَدَّمَ يَاْتِيْنِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِى مُسْلِمِيْنَ ـ اَىْ مُنْقَادِيْنَ طَائِعِيْنَ فَلِى اَخْذُهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ لَا بَعْدَهٗ ـ

৩৮. তিনি বললেন, হে আমার পরিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে اَلْمَلَأُ اَيُّكُمْ এখানে হামযাদ্বয়ের মাঝে পূর্বোল্লিখিত দুটি ধরন প্রযোজ্য। তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে ও অনুগত হয়ে আসার পূর্বে। তারা মুসলমান হয়ে আসার পূর্বে তা নেওয়া আমার জন্য বৈধ হবে, পরে নয়।

٣٩. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ هُوَ الْقَوِيُّ الشَّدِيْدُ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج الَّذِىْ تَجْلِسُ فِيْهِ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ مِنَ الْغَدَاةِ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَىْ عَلٰى حَمْلِهٖ اَمِيْنٌ ـ اَىْ عَلٰى مَا فِيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا ـ

৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল, عِفْرِيْت অর্থ হলো দুর্বার শক্তিশালী। আপনি আপনার স্থান হতে উঠবার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অর্থাৎ যেখানে আপনি বিচারের জন্য বসে আছেন। আর তা হলো সকাল হতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়। এবং আমি এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান অর্থাৎ এটা বহন করে আনতে বিশ্বস্ত অর্থাৎ তাতে যেসব মণি-মুক্তা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ مَاذَا تَامُرِيْنَ : مَاذَا হলো تَاْمُرِيْنَ-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل , আর এর প্রথম مَفْعُوْل লুপ্ত রয়েছে। বাক্যটি এরূপ ছিল- تَامُرِيْنَنَا

قَوْلُهٗ فَضَحِكَ : এটা فَانْظُرِىْ-এর উহ্য جَوَاب ; جَوَاب اَمْر হিসেবে مَجْزُوْم হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِمَا يَرْجِعُوْنَ : بِمَ হলো يَرْجِعُوْنَ-এর مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهٗ مِنْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ : এটা بِمَ-এর مَا-এর বিবরণ। فَنَاظِرَةٌ-এর عَطْف হলো مُرْسِلَةٌ-এর উপর। কারো মতে مِيْم-এর সম্পর্কে হলো نَاظِرَةٌ-এর সাথে। তবে এটা সঠিক নয়। কেননা مَا اِسْتِفْهَامِيَّه বাক্যে صَدَارَتْ বা প্রথমে আসার দাবি করে। আর এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না।

قَوْلُهٗ اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ : اَذِلَّةً হলো উক্ত বাক্যের প্রথম حَالْ আর وَهُمْ صَاغِرُوْنَ হলো দ্বিতীয় حَالْ ; এটা হলো حَال مُؤَكِّدَة

قَوْلُهٗ اَىْ اِنْ لَمْ يَاْتُوْنِى مُسْلِمِيْنَ : এটা উহ্য ইঙ্গিত করেছেন যে, وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ হলো شَرْط مَحْذُوْف مُؤَخَّر-এর جَزَاء 'সাবা'বাসীকে সাবা থেকে উৎখাত করাটা ঈমান আনার শর্ত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ঈমান আনলে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা হবে না।

قَوْلُهٗ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ : এ জিনসের নাম ছিল যাকওয়ান কিংবা সখর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ .... حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ : গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত : افتونى শব্দটি فتوى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো বিশেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জবাবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল–

نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ সভার সদস্য তিনশ' তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন! ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোনো পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্য সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয় অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকিদও হয়ে যায়।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্রের জবাবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া : রাষ্ট্রের আমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরিক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল– হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গাম্বর কিনা? তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, নাকি তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এই রূপ স্থির করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গাম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তুটি ইবনে জারীর (র.) একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি : ঐতিহাসিক ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য এবং একশ বাঁদি ছিল। কিন্তু বাঁদিদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতাদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও, তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়! এমনিভাবে

তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্নসহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানে ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল, দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহঙ্গকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহবল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা শাহী দরবারে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে হাজির হলো তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। -[কুরতুবী -সংক্ষেপিত]

হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকিসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না : যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোনো কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? : হযরত সুলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল নাজায়েজ কিংবা জায়েজ হলেও অনুত্তোম। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ নয়। -[রূহুল মা'আনী] হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়, যেমন এর মাধ্যমে কোনো কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোনো অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূল ﷺ -এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোনো কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল করেছেন এবং কারো কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোনো প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল আইম্মা (র.) বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারো কারো উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন। -[উমদাতুল কারী]

বিলকীস উপঢৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করা জায়েজ নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলে, যাতে এর মাধ্যমে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি : কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াতের বরাত দিয়ে লিখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোনো সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল, বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে একলক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল বলে আগমন করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আ.) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মুজেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মুজেযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনো রূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পরিষদবর্গকে [তাদের মধ্যে জিনও ছিল] সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্যে থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এতদূরবর্তী স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর পক্ষে থেকেই কোনো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَوْلُهُ قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ : مُسْلِمِيْنَ শব্দটি مُسْلِمٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী অনুগত। কারণ তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কুরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষ্য থেকে তাই বোঝা যায়।

٤٠. قَالَ سُلَيْمَانُ أُرِيْدُ اَسْرَعَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ الْمُنْزَلِ وَهُوَ اٰصِفُ بْنُ بَرْخِيَا كَانَ صِدِّيْقًا يَعْلَمُ اِسْمَ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهٖ اَجَابَ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ طَرْفُكَ ط اِذَا نَظَرْتَ بِهٖ اِلٰى شَيْءٍ مَا قَالَ لَهٗ اُنْظُرْ اِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ رَدَّ بِطَرْفِهٖ فَوَجَدَهٗ مَوْضُوْعًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَفِيْ نَظْرِهٖ اِلَى السَّمَاءِ دَعَا اٰصِفُ بِالْاِسْمِ الْاَعْظَمِ اَنْ يَّاْتِيَ اللّٰهُ بِهٖ فَحَصَلَ بِاَنْ جَرٰى تَحْتَ الْاَرْضِ حَتّٰى ارْتَفَعَ عِنْدَ كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا اَيْ سَاكِنًا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا اَيِ الْاِيْتَانُ لِيْ بِهٖ مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف لِيَبْلُوَنِيْ لِيَخْتَبِرَنِيْ ءَاَشْكُرُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَمْ اَكْفُرُ ط النِّعْمَةَ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج اَيْ لِاَجْلِهَا لِاَنَّ ثَوَابَ شُكْرِهٖ لَهٗ وَمَنْ كَفَرَ النِّعْمَةَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ عَنْ شُكْرِهٖ كَرِيْمٌ بِالْاِفْضَالِ عَلٰى مَنْ يَكْفُرُهَا ـ

অনুবাদ :

৪০. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি এর চেয়েও দ্রুত কামনা করছি। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তিনি হলেন আসিফ বরখিয়া। তিনি সিদ্দিকিয়্যাতের স্তরে উপনীত ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। যার মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা করা হলে তা মঞ্জুর হয়। আপনি চক্ষুর পালক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। যখন আপনি কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তা থেকে দৃষ্টি ফেরানোর পূর্বেই হযরত আসিফ বরখিয়া হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বললেন, আপনি আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! তিনি তাকালেন। এরপর দৃষ্টি ফেরালেন। সাথে সাথে তিনি তা তাঁর সম্মুখে স্থাপিতরূপে দেখতে পেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপকালে হযরত আসিফ বরখিয়া ইসমে আযমের মাধ্যমে সিংহাসনটি নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেন। ফলে সাথে সাথে তার দোয়া কবুল হয়ে গেল এবং সিংহাসনটি মাটির তলদেশ দিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কুরসির সম্মুখে আবির্ভূত হলো হযরত সুলায়মান (আ.) যখন তা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, এটা অর্থাৎ আমার জন্য এটা উপস্থিত করা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ নিয়ামতের। এখানে উভয় হামযাকে বহাল রেখে। দ্বিতীয়টিকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে লঘু আকারে অথবা লঘুকৃতটিও অপরটির মাঝে اَلِفْ প্রবিষ্ট করে কিংবা اَلِفْ প্রবিষ্ট না করে পঠিত রয়েছে। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ তার নিজের কারণে বা স্বার্থে। কেননা তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান তারই জন্য তথা সে নিজেই ভোগ করবে আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে নিয়ামতের। সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে, মহানুভব যে তার অকৃতজ্ঞ হয় তার প্রতি অনুগ্রহ করার ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٤١. قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا اَىْ غَيِّرُوْهُ اِلٰى حَالٍ تُنْكِرُهُ اِذَا رَاَتْهُ نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اِلٰى مَعْرِفَتِهٖ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ـ اِلٰى مَعْرِفَةِ مَا يُغَيَّرُ عَلَيْهِمْ قَصَدَ بِذٰلِكَ اِخْتِبَارَ عَقْلِهَا لَمَّا قِيْلَ لَهٗ اِنَّ فِيْهِ شَيْئًا فَغَيَّرُوْهُ بِزِيَادَةٍ اَوْ نَقْصٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ ـ

৪১. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করে বদলে দাও। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পরিবর্তন কর যাতে সে যখন এটাকে দেখে অপরিচিত মনে করে। দেখি সে সঠিক দিশা পায় এটার পরিচয়ের ব্যাপারে নাকি সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ এর পরিচয় লাভে। তাতে যে পরিবর্তন আনা হবে তার পরিচয় লাভে। এর দ্বারা তিনি বিলকীসের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কেননা তার নিকট বলা হয়েছিল যে, তার মধ্যে এ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি রয়েছে। ফলে তারা তাতে কিছু কম বেশি করে বা অন্য কোনোভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

٤٢. فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ لَهَا اَهٰكَذَا عَرْشُكِ اَىْ اَمِثْلُ هٰذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ج اَىْ فَعَرَفَتْهُ وَشَبَّهَتْ عَلَيْهِمْ كَمَا شَبَّهُوْا عَلَيْهَا اِذَا لَمْ يَقُلْ اَهٰذَا عَرْشُكِ وَلَوْ قِيْلَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ سُلَيْمَانُ لَمَّا رَاٰى لَهَا مَعْرِفَةً وَعِلْمًا وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ـ

৪২. সেই নারী যখন আসল তখন তাকে বলা হলো তোমার সিংহাসন কি এরূপই অর্থাৎ তোমার সিংহাসন কি এ সিংহাসনের মতোই সে বলল এটাতো যেন সেটাই অর্থাৎ সে এটা চিনে ফেলল। তারা যেরূপ তার নিকট তার সদৃশ্যতামূলক প্রশ্ন করেছিল তদ্রূপ সেও তাদের নিকট সদৃশ্যতামূলক জবাব দিল। যেহেতু তারা একথা বলেনি যে, এটাই কি তোমার সিংহাসন? যদি এরূপ বলা হতো, তবে সে বলত, হ্যাঁ! হযরত সুলায়মান (আ.) তার জ্ঞান-বুদ্ধি যাচাই করার পর তাকে বললেন যে, আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।

٤٣. وَصَدَّهَا عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ـ

৪৩. তাকে নিবৃত্ত করেছে আল্লাহর ইবাদত হতে আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা-ই সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤. قِيْلَ لَهَا اَيْضًا ادْخُلِى الصَّرْحَ ج هُوَ سَطْحٌ مِنْ زُجَاجٍ اَبْيَضَ شَفَّافٍ تَحْتَهٗ مَاءٌ جَارٍ فِيْهِ سَمَكٌ اِصْطَنَعَهٗ سُلَيْمَانُ لَمَّا قِيْلَ لَهٗ اِنَّ سَاقَيْهَا وَرِجْلَيْهَا كَقَدَمَىْ حِمَارٍ ـ

৪৪. তাকে আরো বলা হলো এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। প্রাসাদটি উপরিভাগ ছিল সাদা স্বচ্ছ কাঁচের, তার নিচে ছিল প্রবহমান পানি, তাতে ছিল জীবন্ত মৎস বিচরণশীল। হযরত সুলায়মান (আ.) এটাকে এ কারণে নির্মাণ করেছিলেন যে, বিলকীসের উভয় পা ও পায়ের গোছা গর্দভের পায়ের ন্যায় ছিল।

فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً مِنَ الْمَاءِ وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط لِتَخُوْضَهُ وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فِيْ صَدْرِ الصَّرْحِ فَرَاٰى سَاقَيْهَا وَقَدَمَيْهَا حَسَّانًا قَالَ لَهَا اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مُّمَلَّسٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط اَيْ زُجَاجٍ وَدَعَاهَا اِلَى الْاِسْلَامِ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ بِعِبَادَةِ غَيْرِكَ وَاَسْلَمْتُ كَائِنَةً مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَ اَرَادَ تَزَوَّجَهَا فَكَرِهَ شَعْرَ سَاقَيْهَا فَعَمِلَتْ لَهُ الشَّيَاطِيْنُ النُّوْرَةَ فَاَزَالَتْهُ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَاَحَبَّهَا وَاَقَرَّهَا عَلٰى مُلْكِهَا وَكَانَ يَزُوْرُهَا كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَيُقِيْمُ عِنْدَهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَانْقَضٰى مُلْكُهَا بِانْقِضَاءِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ رُوِىَ اَنَّهٗ مَلَكَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَسُبْحَانَ مَنْ لَا اِنْقِضَاءَ لِدَوَامِ مُلْكِهٖ ـ

অনুবাদ :

যখন সে তা দেখল, তখন সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল পানি ভর্তি এবং সে তার পদদ্বয় অনাবৃত করল পানিতে অবতরণের জন্য। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) প্রাসাদের প্রধান ফটকের নিকট কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার উভয় পা ও পায়ের গোছা সুন্দর। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে বললেন, এটা স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত প্রাসাদ। অর্থাৎ কাঁচের। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। তুমি বিনে অন্যের উপাসনা করে আমি সুলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করলেন; কিন্তু তার পায়ের গোছার পশম অপছন্দ করলেন। তখন শয়তান তার জন্য লোমনাশক দ্রব্য তৈরি করল। বিলকীস তার দ্বারা পশম পরিষ্কার করল। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করেন এবং তার প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। তাকে তার রাজত্বে বহাল রাখেন। তিনি প্রতি মাসে একবার তাঁর সাক্ষাৎ করতেন এবং তার নিকট তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের পরিসমাপ্তিকালে তার রাজত্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্ণিত আছে যে, তিনি তের বৎসর বয়সে রাজত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মহান পবিত্র সে সত্তা, যার রাজত্বের স্থায়িত্বে কখনো অস্থিতি স্পর্শ করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اٰصِفُ بْنُ بَرْخِيَا : কথিত আছে যে, আসিফ ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খালাতো ভাই। তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট নবী, তার হাতে বহু অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড তথা কারামত প্রকাশ পেত।

قَوْلُهٗ ثُمَّ رَدَّ بِطَرْفِهٖ : بِطَرْفِهٖ-এর بَاء অব্যয়টি অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ بِالْاِفْضَالِ عَلٰى مَنْ يَكْفُرُهَا : তিনি তার সাধারণ নিয়ামতসমূহকে কুফর ও অকৃতজ্ঞতার দরুন ছিনিয়ে নেন না। قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا -এর- عَطْف হলো قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ -এর উপর।

قَوْلُهُ فَنَنْظُرْ : এটা جَوَاب اَمْر হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَرِهَ شَعْرَ سَاقَيْهَا : এর তাফসীরটি পূর্বের তাফসীর حَسَنًا وَقَدَمَيْهَا فَرَاٰى سَاقَهَا -এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, কেউ কেউ এভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, পশমের প্রতি লক্ষ্য না করলে তার পা ও পায়ের গোছা ছিল বেশ সুন্দর। তবে এ ব্যাখ্যা মনঃপূত নয়।

قَوْلُهُ مُمَرَّدٌ : এটা تَمْرِيْد থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো মসৃণ, তৈলাক্ত। এ থেকে اَمْرَد শব্দের উৎপত্তি, অর্থ শ্মশ্রুহীন বালক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ : অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। কিন্তু এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপাটাই একটা মুজেযা এবং বিলকীসকে পয়গাম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোনো কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক (র.) তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যা-ই চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরি নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোনো ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরো বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বাধন করে বলেছেন- اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ [ফুসূসুল হিকাম] এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হিসেবে গণ্য হবে।

মুজেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মুজেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কুরআন পাকে বলা হয়েছে- وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ; কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কোনো কাজ হয়ে যায়। মুজেযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোনো অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গাম্বরের হাতে প্রকাশ পায় তবে তাকে মুজেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্যকোনো নেককার মুসলমানের হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলি তাঁর পয়গাম্বরের গুণাবলির প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায় সেগুলো পয়গাম্বরের মুজেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ : শায়েখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ হলো কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এইজন্য নবী, ওলী এমনকি, মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সুফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্তে মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গাম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ [কিতাবের জ্ঞান] -এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থেই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোনো দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

قَوْلُهُ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ : আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব– আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামাত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জবাব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজটি এত দ্রুত করে দেব।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপারটি اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ কুরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেনের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আ.) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের জন্য ইয়েমেনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

অনুবাদ :

٤٥. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيْلَةِ صٰلِحًا اَنِ اَىْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ ـ فِى الدِّيْنِ فَرِيْقٌ مُؤْمِنُوْنَ مِنْ حِيْنَ اِرْسَالِهٖ اِلَيْهِمْ وَفَرِيْقٌ كَافِرُوْنَ ـ

৪৫. আমি অবশ্যই ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের বংশীয় ভ্রাতা হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম এই আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর; কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। দীনের ব্যাপারে। একদল তাঁকে প্রেরণ করার সময় থেকেই ঈমান আনয়ন করল। আর একদল স্বীয় কুফরির উপর অটল রইল।

٤٦. قَالَ لِلْمُكَذِّبِيْنَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ج اَىْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ حَيْثُ قُلْتُمْ اِنْ كَانَ مَا اَتَيْتَنَا بِهٖ حَقًّا فَاْتِنَا بِالْعَذَابِ لَوْلَا هَلَّا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ مِنَ الشِّرْكِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ فَلَا تُعَذَّبُوْنَ ـ

৪৬. তিনি বললেন, অবিশ্বাসীদেরকে। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন, কল্যাণের পূর্বেই অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? অর্থাৎ অনুগ্রহ ও রহমতের পূর্বেই শাস্তিকে। কেননা তোমরা বলেছ যে, তুমি যা নিয়ে আমাদের নিকট এসেছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে শাস্তি নিয়ে এসো! কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না? শিরক থেকে যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। ফলে তোমরা শাস্তির সম্মুখীন হবে না।

٤٧. قَالُوا اطَّيَّرْنَا اَصْلُهٗ تَطَيَّرْنَا اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الطَّاءِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ وَصْلٍ اَىْ تَشَاءَمْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوْا قَالَ طٰٓئِرُكُمْ شُؤْمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَاكُمْ بِهٖ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ تُخْتَبَرُوْنَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ ـ

৪৭. তারা বলল, আমরা অমঙ্গল মনে করি اِطَّيَّرْنَا -এর মূলরূপ হলো تَطَيَّرْنَا এরপর تَاء কে طَاء -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়ে শুরুতে একটি হামযায়ে ওয়াসল নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা অশুভ মনে করি। তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অর্থাৎ মুমিনগণকে। যেহেতু তারা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের স্বীকার হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে তিনিই তা তোমাদের নিকট নিয়ে আসেন। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

٤٨. وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ ثَمُوْدَ تِسْعَةُ رَهْطٍ اَىْ رِجَالٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِالْمَعَاصِىْ مِنْهَا قَرْضُهُمُ الدَّنَانِيْرَ وَالدَّرَاهِمَ وَلَا يُصْلِحُوْنَ بِالطَّاعَةِ ـ

৪৮. আর সেই শহরে ছামূদের শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত অন্যায় আচরণ ও নাফরমানির মাধ্যমে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা কর্তন তন্মধ্যে অন্যতম। তারা সংশোধন করত না আনুগত্যের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٤٩. قَالُوْا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَاسَمُوْا اَىْ اَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ التَّاءِ الثَّانِيَةِ وَاَهْلَهُ اَىْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ اَىْ نَقْتُلُهُمْ لَيْلًا ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ الثَّانِيَةِ لِوَلِيِّهٖ اَىْ وَلِيِّ دَمِهٖ مَا شَهِدْنَا حَضَرْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَىْ اِهْلَاكَهُمْ اَوْ هَلَاكَهُمْ فَلَا نَدْرِىْ مَنْ قَتَلَهُ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ .

৪৯. তারা বলল, অর্থাৎ তারা পরস্পর একে অপরকে বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা অবশ্যই রাত্রিবেলা আক্রমণ করব তাকে لَنُبَيِّتَنَّهُ সীগাহটি نُوْن -এর সাথে এবং نُوْن -এর স্থানে تَاء দিয়ে এবং দ্বিতীয় تَاء-এ পেশ দিয়ে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তার পরিবার-পরিজনকে অর্থাৎ যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে রাতের আঁধারে হত্যা করব অতঃপর নিশ্চয় বলব لَنَقُوْلَنَّ ফে'লটি نُوْن যোগে এবং نُوْن -এর স্থানে تَاء দিয়ে এবং দ্বিতীয় لَامْ কে পেশ দিয়ে [لَتَقُوْلُنَّ] পঠিত রয়েছে। তার অভিভাবককে, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি অর্থাৎ আমরা উপস্থিত হইনি। مَهْلِكَ শব্দটির مِيْم বর্ণে পেশ ও যবর উভয়টিই বৈধ অর্থাৎ اِهْلَاكُهُمْ [তাদের ধ্বংস করা] অথচ هَلَاكُهُمْ [তাদের ধ্বংস হওয়া] আমরা জানি না যে, কে তাদেরকে হত্যা করেছে। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

٥٠. وَمَكَرُوْا فِىْ ذٰلِكَ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا اَىْ جَازَيْنَاهُمْ بِتَعْجِيْلِ عُقُوْبَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ .

৫০. তারা এ ব্যাপারে এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। অর্থাৎ আমিও তাদেরকে প্রতিদান দিলাম তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করে; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

٥١. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ اَهْلَكْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ . بِصَيْحَةِ جِبْرِيْلَ اَوْ بِرَمْيِ الْمَلَائِكَةِ بِحِجَارَةٍ يَرَوْنَهَا وَلَا يَرَوْنَهُمْ .

৫১. অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। হযরত জিবরীল (আ.)-এর বিকট আওয়াজ দ্বারা কিংবা ফেরেশতাদের প্রস্তর নিক্ষেপণের মাধ্যমে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে দেখতেন; কিন্তু তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেত না।

٥٢. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً خَالِيَةً وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ بِمَا ظَلَمُوْا ط بِظُلْمِهِمْ اَىْ كُفْرِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَعِبْرَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ قُدْرَتَنَا فَيَتَّعِظُوْنَ .

৫২. এই তো তাদের ঘর বাড়ি যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে উজার হয়ে পড়ে আছে। এখানে خَاوِيَةً শব্দটি حَالْ হওয়ার ভিত্তিতে নসবযুক্ত হয়েছে। আর এর আমেল হলো اِسْمِ اِشَارَه -এর مَعْنٰى বা অর্থ তথা اُشِيْرَ তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে অর্থাৎ তাদের কুফরির কারণে এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

অনুবাদ :

٥٣. وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِصَالِحٍ وَهُمْ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ الشِّرْكَ

৫৩. এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছি যারা ছিল মুমিন ও বিশ্বাসী হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি তারা ছিলেন চার হাজার এবং তারা ছিল মুক্ত/সতর্ক শিরক হতে।

٥٤. وَلُوْطًا مَنْصُوْبٌ بِاُذْكُرْ مُقَدَّرًا قَبْلَهٗ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اَيِ اللِّوَاطَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ يُبْصِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِنْهِمَاكًا فِى الْمَعْصِيَةِ ـ

৫৪. স্মরণ করুন, হযরত লূত (আ.)-এর কথা لُوْطًا শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে পূর্বে اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে আর তার থেকে بَدَلْ হলো– যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অর্থাৎ, পুং মৈথুন/সমকামিতা জেনে শুনে একে অপরকে দেখিয়ে চরম অবাধ্যতামূলক ভাবে।

٥٥. اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ عَاقِبَةَ فِعْلِكُمْ ـ

৫৫. তোমরা কি اَئِنَّكُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযা বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি করে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কাম তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায় তোমাদের কুকর্মের পরিণতি সম্পর্কে।

٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ اَىْ اَهْلَهٗ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ مِنْ اَدْبَارِ الرِّجَالِ ـ

৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর। এরাতো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। সমকামিতা থেকে।

٥٧. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيْرِنَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ ـ

৫৭. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম আমার ভাগ্য নির্ধারণীতে অবশিষ্টদের ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ শাস্তিতে নিপতিতগণের অন্তর্গত।

٥٨. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج هُوَ حِجَارَةُ السِّجِّيْلِ اَهْلَكَتْهُمْ فَسَاءَ بِئْسَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ بِالْعَذَابِ مَطَرُهُمْ ـ

৫৮. এবং তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর তা হলো পাথর বৃষ্টি যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কতই না নিকৃষ্ট। তাদের বৃষ্টি যা আজাবের মাধ্যমে হয়েছিল।

٥٩. قُلِ يَا مُحَمَّدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى هَلَاكِ كُفَّارِ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى هُمْ ءَآللّٰهُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرٰى وَتَرْكُهُ خَيْرٌ لِمَنْ يَعْبُدُهُ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ بِهِ الْاٰلِهَةَ خَيْرٌ لِعَابِدِيْهَا ـ

অনুবাদ :

৫৯. আপনি বলুন হে মুহাম্মদ ﷺ ! সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অতীতের কাফের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করায় এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ নাকি তারা? অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা যাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে তারা? ءَآللّٰهُ-এর মধ্যে উভয় হামাযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয়টিকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা দ্বিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃতটি ও অপরটির মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি করে বা তা পরিহার করে পঠিত রয়েছে। আর يُشْرِكُوْنَ শব্দটি يَاء এবং تَاء উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে তারা তাদের উপাসনাকারীদের জন্য উৎকৃষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ : সামূদ হলো উক্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। সালিহ (আ.) ও উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এখানে সামূদ দ্বারা উক্ত নামের সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত সামূদকে দ্বিতীয় আ'দ [عَاد ثَانِيَة] -ও বলা হয়। عَاد اُوْلٰى [প্রথম আদ] হলো হুদ সম্প্রদায়ের নাম। প্রথম আ'দ ও দ্বিতীয় আ'দ -এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল। –[জুমাল]

قَوْلُهُ صَالِحًا : এটা اَخَاهُمْ থেকে بَدَل কিংবা عَطْف بَيَانْ ; হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। হযরত হুদ (আ.) হায়াত পেয়েছিলেন ৪৬৪ বছর। হযরত হুদ (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে ৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ : এখানে فَرِيْقَانِ দ্বারা হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিছু মানুষ ঈমান আনল আর কিছু মানুষ ঈমান আনল না। আর আল্লামা যমখশরী (র.) বলেছেন, দু'দলের দ্বারা একদল হলো হযরত সালেহ (আ.) ও আরেক দল দ্বারা তাঁর উম্মত উদ্দেশ্য। তিনি فَاء দ্বারা عَطْف হওয়ার দরুন এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা فَاء অব্যয়টি تَعْقِيْبٌ بِالْاِتِّصَال বুঝায়। অর্থাৎ রাসূল হওয়ার দাবির সাথে সাথেই দু'দল হয়ে গেছে। এক পক্ষে হলো হযরত সালেহ (আ.) আর আরেক পক্ষে তার কওমের লোকজন।

قَوْلُهُ يَخْتَصِمُوْنَ : অর্থের দিক দিয়ে এটা فَرِيْقَانِ -এর সিফত। অর্থাৎ فَرِيْقَانِ শব্দটি শাব্দিক বিচারে যদিও দ্বিবচন তবে প্রত্যেক দল যেহেতু কিছু সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এদিক দিয়ে তার মধ্যে বহুবাচনিক অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এ হিসেবে তার সিফতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِمَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ : অর্থাৎ بِطَلَبِ السَّيِّئَةِ আর سَيِّئَة দ্বারা আজাব এবং حَسَنَة দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ قُحِطُوا الْمَطَرَ اَىْ حُبِسُوْا : অর্থাৎ তোমাদের কুলক্ষণে হওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مَدِيْنَةِ ثَمُوْدَ : কথিত আছে যে, সামূদের শহরের নাম ছিল হিজর। কারো মতে হিজর হলো মদীনা ও শামের মধ্যকার এক উপত্যকা। সামূদ জাতি সেখানকার অধিবাসী ছিল।

قَوْلُهُ رَهْطٍ : দশ থেকে কম সংখ্যক পুরুষ লোকের সমষ্টিকে رَهْط বলা হয়। رَهْط -এর ব্যাখ্যা رِجَالٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে. رَهْطٍ শব্দটি تِسْعَةٌ থেকে অর্থের দিক দিয়ে تَمْيِيز ; শব্দের দিকে দিয়ে যদিও এটা একবচন তবে অর্থের দিকে দিয়ে বহুবচন। এর কারণে تمييز হওয়া সঙ্গত হয়েছে। تِسْعَةَ رَهْط -এর মধ্যকার اِضَافَت টি بَيَانِيَّة অর্থাৎ, تِسْعَةٌ هُمْ رَهْطٌ

قَوْلُهُ تَقَاسَمُوْا : تَقَاسَمُوْا -এর ব্যাখ্যা اَحْلِفُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اَمْر -এর সীগাহ্। অর্থ এই যে, নয়জন মানুষ হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, আমরা সালিহ (আ.) ও তার উষ্ট্রীর উপর রাতে চড়াও হব। تَقَاسَمُوْا ক্রিয়াটি অতীতকালীনও হতে পারে। এ সময় এটা لَقَالُوْا -এর তাফসীর হবে। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে- مَا قَالُوْا তারা কি বলল? উত্তরে বলা হয়েছে- تَقَاسَمُوْا ; আর نُبَيِّتَنَّهُ ক্রিয়াটি مُضَارِعْ جَمْع مُتَكَلِّمْ بَانُوْن تَاكِيْد -এর সীগাহ। যমীরটি مَفْعُوْل এটা بَاب تَفْعِيْل থেকে। অর্থ- আমরা অবশ্যই রাতে তার উপর আক্রমণ করব।

قَوْلُهُ بِمَا ظَلَمُوْا -এর ব্যাখ্যা بِظُلْمِهِمْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে رُؤيَتْ তথা দেখার দ্বারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য। [অর্থাৎ তারা একে অন্যের সামনে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতো।]

قَوْلُهُ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ : اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ -এর মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়েছে এর দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত অস্পষ্ট রাখার এ ইঙ্গিত ছিল যে, তাদের এ আচরণ উচ্চারণ করারও যোগ্য নয়; বরং তা অতিশয় ঘৃণিতও জঘন্য বিষয়। বিবেকবান কোনো মানুষ এ কথা স্বীকারও করবে না যে, মানুষের দ্বারা এমন জঘন্যতম আচরণ প্রকাশ পেতে পারে।

قَوْلُهُ مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ : এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে দু'পক্ষ থেকে পাপ রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার এবং নারীদেরকে বর্জন করার।

قَوْلُهُ تَجْهَلُوْنَ : **প্রশ্ন** : تَجْهَلُوْنَ হলো قَوْمٌ -এর সিফত, অথচ مَوْصُوْف صِفَتْ -এর মধ্যে تَطَابُقْ তথা সঙ্গতি নেই কেননা قَوْم হলো غَائِبْ আর تَجْهَلُوْنَ হলো حَاضِرْ

উত্তর : কোথাও غَيْبْ ও مُخَاطَبْ তথা নাম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষ একত্র হলে مُخَاطَبْ বা মধ্যমপুরুষ জোরদার হওয়ার কারণে তাকে غَيْبْ তথা নামপুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। -[জুমাল]

এ উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে যেহেতু قَوْم কে, এ কারণে তাকে حَاضِرْ -এর স্থলে রেখে সিফতকে حَاضِرْ -এর সীগাহ দ্বারা আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَاقِبَةَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَجْهَلُوْنَ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ : اِلَّا اَنْ قَالُوْا এখানে كَانَ -এর خَبَرْ আগে এসেছে, এর اِسْم হলো- ইবনে আবূ ইসহাক جَوَابْ -কে كَانَ -এর اِسْم সাব্যস্ত করে مَرْفُوْع পড়েছেন। আর পরবর্তী অংশকে তার خَبَرْ স্থির করেছেন।

قَوْلُهُ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا : এ তাকিদটি বৃষ্টিপাতে তীব্রতা বুঝানোর জন্য উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ সে বৃষ্টি ছিল অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। بِالْعَذَابِ এটা মুতা'আল্লিক হয়েছে مُنْذَرِيْنَ -এর সাথে । আর مَطَرِهِمْ হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ : এটা এ সূরার চতুর্থ কাহিনী, কুরআন মজীদে ৮ স্থানে হযরত সালেহ (আ.)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাকে সামূদ বলা হয়। হযরত সালেহ (আ.) এর থেকে তার বংশ পরম্পরা ছয় পুরুষের মাধ্যমে সামূদ পর্যন্ত পৌঁছে। এটা ইমাম বগভী (র.)-এর অভিমত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ মতে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। -[কাসাসুল কুরআন]

এর দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামূদ জাতির ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম হলো সামূদ। সামূদ থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত বংশ-পরম্পরার ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। ১. সামূদ ইবনে আমির, আমির ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ। ২. সামূদ ইবনে আ'দ ইবনে আউস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেন, ইমাম সা'লাবী (র.) দ্বিতীয় উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামূদ জাতি হলো সামীয় গোত্রসমূহেরই একটি শাখা। عَادُ الْأُوْلٰى তথা প্রথম আ'দ -এর ধ্বংসের সময় হযরত হূদ (আ.)-এর সাথে সে বেঁচে গিয়েছিল। এ সামূদ -এর বংশকেই عَادُ ثَانِيَة বা দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়।

সামূদ জাতির বসতি : সামূদ জাতি কোথায় বসবাস করত? এ বিষয়ে এটা নিশ্চিত যে, তারা হিজর এলাকার অধিবাসী ছিল। হেজায ও শাম -এর মাঝে ওয়াদিউলু কুরা পর্যন্ত যে এলাকা দেখা যায়, এ সবই হলো তাদের আবাসভূমি। বর্তমানে তা 'ফাজ্জুন্নাকা' নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

সামূদ জাতির ধর্ম : সামূদ জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় পৌত্তলিক তথা মূর্তিপূজক ছিল। আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরই গোত্র থেকে হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। উক্ত জাতির প্রায় ৪ হাজার মানুষ তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, আজাব আসার আগে তিনি তাদেরকে নিয়ে বর্তমান 'হাজারা মাউত' নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) পরবর্তীতে সেখানেই ইন্তেকাল করায় উক্ত এলাকাটি 'হাজারা মাউত' [মৃত্যু উপস্থিত হলো] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ তাআলার উষ্ট্রী : হযরত সালেহ (আ.) তার জাতিকে বহু বুঝালেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ এবং মূর্তিপূজা বর্জনের পরিবর্তে আরো বেশি শত্রুতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত হলো। যদিও নিরীহ সহজ-সরল কিছু মানুষ তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল, তবে নেতৃত্বস্থানীয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনী শ্রেণির লোকজন ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রইল। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা পৌত্তলিকতার উপর অটল রইল। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সর্বপ্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতাকে নিজেদের পেশা বানিয়েছিল। তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে শুধু মিথ্যাবাদীই আখ্যা দেয়নি; বরং তাকে বিভিন্নভাবে উপহাস ও কটুক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তারা তাঁর দাওয়াত ও নসীহতকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিকট নবুয়তের বিশেষ নিদর্শন বা প্রমাণ চাইল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উষ্ট্রীর ঘটনার বিবরণ : হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনীর বিবরণ হচ্ছে, হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমের লোকজন যখন তাঁর দাওয়াতের দরুন বিরক্ত হয়ে গেল, তখন তাদের নেতৃত্বস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি জনতার সামনে হযরত সালেহ (আ.)-কে বলল যে, সত্যিই যদি তুমি আল্লাহর প্রেরিত হও, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো নিদর্শন বা মুজেযা দেখাও। একে আমরা তোমার সত্যতায় বিশ্বাস করব। হযরত সালেহ (আ.) বললেন, এমন যেন না হয় যে, উক্ত নিদর্শন দর্শনের পরও তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধর্ম বিশ্বাসের উপর অনড় থাক। নেতৃবর্গ তখন জোরালোভাবে বলল, না, আমরা তা দেখামাত্রই ঈমান আনয়ন করব। হযরত সালেহ (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন ধরনের নিদর্শন চাও? তারা জবাবে বলল– সামনের পাহাড় বা বসতির এ পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাও, আর উক্ত উষ্ট্রীটি বের হওয়ার পর পরই সবার সামনে বাচ্চাও প্রসব করবে।

হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। ফলে তখনই উক্ত পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো এবং সাথে সাথে তা একটি বাচ্চা প্রসব করল। এ থেকে তাদের নেতৃবর্গের মধ্যে হতে জুনদা ইবনে ওমর তো তখনই ঈমান নিয়ে এলো, আর অন্যান্যরাও যখন তার অনুকরণে ঈমান আনবে এমন সময় তাদের মন্দিদের ঠাকুর ও পুরোহিতরা তাদেরকে নানা কথা বলে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখল।

হযরত সালেহ (আ.) কওমের সকলকে বিভিন্নভাবে বুঝালেন। তিনি বললেন– দেখ, তোমাদের কামনা মতেই এ উষ্ট্রী প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এটাই সিদ্ধান্ত যে, এর জন্য পানি পানের পালা নির্দিষ্ট থাকবে। একদিন এই উষ্ট্রীর,

আরেকদিন অন্য সকল লোকজন ও তাদের পালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর সাবধান! এর যেন কোনোরূপ কষ্ট না হয়। এর যদি কোনোরূপ কষ্ট হয় তাহলে তোমাদের কোনো নিস্তার নেই। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এ ধারা বহাল ছিল। বহু লোক তার দুধ দ্বারা উপকৃত হতো। তবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এ বিষয়টি অসহনীয় হয়ে উঠে। তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র হতে থাকে যে, এ উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে হবে। যাতে পালাবণ্টন থেকে মুক্তি লাভ হয়। কেননা এটা আমাদের নিজেদের ও আমাদের পশু-পাখিদের জন্য অত্যন্ত দুর্বিসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই এর দরুন কষ্টের শিকার হচ্ছি। তবে তাকে হত্যা করার কারো হিম্মত হচ্ছিল না।

পরে সাদূক নামক জনৈক সুন্দরী ধনবতী রমণী নিজেকে 'মিসদা' নামক ব্যক্তির সামনে এবং অপর এক ধনবতী রমণী উনায়যা তার সুন্দরী কন্যাকে কায়দার [কুদার] নামক ব্যক্তির সামনে এ কথা বলে পেশ করল যে, তারা যদি উক্ত উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে এরা তাদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। তাদেরকে বিবাহ করে আনন্দ উপভোগ করবে। তাদের এ উত্তেজনাকর প্রস্তাবে কায়দার ইবনে সালিফ ও মিসদা উদ্বুদ্ধ হয়ে এর জন্য প্রস্তুতি নিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, উষ্ট্রীর চলাচল পথে আত্মগোপন করে বসে থাকবে। উষ্ট্রীটি যখন মাঠের দিকে যাওয়ার জন্য বের হবে, তখন অতর্কিত তার উপর আক্রমণ করবে। এ ব্যাপারে তারা আরো কয়েকজনের সহায়তা কামনা করল এবং তারা তাতে সম্মত হলো।

মোটকথা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত মাফিক উষ্ট্রীকে হত্যা করে ফেলল। তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, রাতে আমরা সবাই একত্র হয়ে সালেহ (আ.) ও পরিবারের সবাইকে হত্যা করব। তাদের অলী তথা অভিভাবকদের কেউ আমাদেরকে সন্দেহ বা দোষরোপ করলে আমরা বলব যে, এ কাজ আমরা করিনি। আমরা তো সেখানে হাজিরই ছিলাম না । উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর তার বাচ্চাটি পালিয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়ে চিৎকার করতে করতে এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত সালেহ (আ.)-এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বললেন, অবশেষে তা-ই হলো আমি যার আশঙ্কা করেছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা কর। তিনদিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব এসে তোমাদেরকে অনিবার্য ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর বজ্রপাতের আজাব আপতিত হলো এবং রাতে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলল, আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে রয়ে গেল।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী প্রণেতা আল্লামা আলূসী (র.) লিখেন, সামূদ জাতির উপর পূর্বের দিনের ভোরবেলা থেকেই আজাবের নিদর্শনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথম দিন তাদের সকলের মুখমণ্ডল এমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল যেমন ভয়ের প্রাথমিক পর্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয় দিন সবার চেহারা রক্তিমাকার ধারণ করল। এটা ভয়-ভীতির দ্বিতীয় পর্যায় ছিল। আর তৃতীয় দিন সবার চেহারা সম্পূর্ণ কাল বর্ণের হয়েছিল। এটা ছিল ভয়-ভীতির তৃতীয় পর্যায় । যার পরে কেবল মৃত্যুই বাকি থেকে যায়।

মোটকথা এ তিন দিনের পরে আজাবের প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এসে গেল। রাত্রিকালে এক ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ তাদের সবাইকে যে যে অবস্থায় ছিল উক্ত অবস্থায় ধ্বংস করে ফেলল। কুরআন মজীদে এ ভয়ঙ্কর আওয়াজকে কোথাও صَاعِقَةً [বজ্র], কোথাও زَلْزَلَةً বা কম্পন সৃষ্টি, কোথাও اَلطَّاغِيَةُ [ভীতিকর পরিস্থিতি] এবং কোথাও صَيْحَةً [চিৎকার] দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবই একই বাস্তবতার বিভিন্নরূপ প্রকাশমাত্র। যাতে এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তা কত মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর ছিল। একদিকে সামূদ জাতির উপর এ আজাব অবতীর্ণ হলো। অপরদিকে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর অনসুসারী মুসলমানগণকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিলেন। তাদেরকে তিনি এ আজাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন।

قَوْلُهُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ الخ : হযরত লুত (আ.)-এর কাহিনী : ইতিপূর্বে হযরত লূত (আ.)-এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত লূত (আ.)-এর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর হিজরতকালে হযরত লূত তাঁর সফর-সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন মিশর গমন করেন তখনো তিনি তার সঙ্গে

ছিলেন এবং একই সঙ্গে মিশরে অবস্থান করেন। তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, লূত (আ.) মিশর থেকে হিজরত করে شَرْق أُرْدُنّ তথা উর্দুন -এর পূর্বাঞ্চলের সাদূম ও সামূরা এলাকায় চলে যাবেন। সেখানে থেকে তিনি আল্লাহর বান্দাদের নিকট দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করবেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তন করবেন।

قَوْلُهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ : رَهْط শব্দের অর্থ– দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رَهْط বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জাঁকজমকতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয়জন ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শাম দেশের একটি স্থানের নাম।

قَوْلُهُ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ .... وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ : উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতিগোষ্ঠির উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদি গণ্য হব। কারণ রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো হযরত সালেহ (আ.)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জবাব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিকে দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল; কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ : পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে আকরাম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আজাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এই বাক্যটিও হযরত লূত (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বাক্যে বাহ্যত পয়গাম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন– অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এই মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গাম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

اَلْجُزْءُ الْعِشْرُوْنَ : বিংশতিতম পারা

অনুবাদ :

٦٠. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَاءً ج فَاَنْبَتْنَا فِيْهِ الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ بِهِ حَدَآئِقَ جَمْعُ حَدِيْقَةٍ وَهُوَ الْبُسْتَانُ الْمُحَوَّطُ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج حُسْنٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا لِعَدَمِ قُدْرَتِكُمْ عَلَيْهِ ءَاِلٰهٌ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيْ مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَّعَ اللّٰهِ ج اِعَانَةً عَلٰى ذٰلِكَ اَىْ لَيْسَ مَعَهُ اِلٰهٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَهُ.

৬০. বল দেখি কে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি? অতঃপর আমি সৃষ্টি করি এখানে غَائِبٌ তথা নাম পুরুষ হতে مُتَكَلِّمٌ তথা উত্তম পুরুষের দিকে اِلْتِفَاتٌ তথা বাক্যের ধারার পরিবর্তন হয়েছে। এর দ্বারা মনোরম উদ্যান حَدَائِقُ শব্দটি حَدِيْقَةٌ -এর বহুবচন; অর্থ- চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান। তার বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এ ব্যাপারে তোমাদের ক্ষমতা না থাকার কারণে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? এ বিষয়ে কোনো সাহায্যের জন্য অর্থাৎ তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। اِلٰهٌ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয়ের মাঝে একটি اَلِفٌ বৃদ্ধি করে এর সাত স্থানেই। তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।

٦١. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا لَا تَمِيْدُ بِاَهْلِهَا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ فِيْمَا بَيْنَهَا اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ جِبَالًا اَثْبَتَ بِهَا الْاَرْضَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط بَيْنَ الْعَذْبِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ تَوْحِيْدَهُ.

৬১. অথবা কে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন ফলে পৃথিবী তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করে না এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত পাহাড় এবং তার দ্বারা পৃথিবীকে স্থির করেছেন এবং দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায় লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির মধ্যে; একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না তাঁর একত্ববাদকে।

অনুবাদ :

٦٢. اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ الْمَكْرُوْبَ الَّذِىْ مَسَّهُ الضُّرُّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهٖ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ط اَلْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى فِىْ اَىْ يَخْلُفُ كُلُّ قَرْنٍ الْقَرْنَ الَّذِىْ قَبْلَهٗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَتَّعِظُوْنَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقْلِيْلِ الْقَلِيْلِ ـ

৬২. অথবা কে আর্তের আহবান সাড়া দেন অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তি আহবানে সাড়া দেন। যখন সে তাঁকে ডাকে এবং আপদবিপদ দূরীভূত করেন তার থেকে ও অন্যান্যদের থেকে। এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। এখানে ইযাফতটি فِىْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরবর্তী বংশকে পূর্ববর্তী বংশের স্থালাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক। تَذَكَّرُوْنَ ফে'লটি يَاء এবং تَاء উভয়ভাবেই পঠিত। আর এতে تَاء টা ذَال -এর মধ্যে প্রবিষ্ট বা ইদগাম হয়েছে। আর مَا অতিরক্তি হয়েছে যা অতি সামান্য ও নগণ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٣. اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ يُرْشِدُكُمْ اِلٰى مَقَاصِدِكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِالنُّجُوْمِ لَيْلًا وَبِعَلَامَاتِ الْاَرْضِ نَهَارًا وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط اَىْ قُدَّامَ الْمَطَرِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهٖ غَيْرَهٗ ـ

৬৩. অথবা যে সত্তা তোমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তোমদেরকে তোমাদের লক্ষ্যস্থলের প্রতি দিক নির্দেশনা দান করেন জল ও স্থলের অন্ধকারে রাতের বেলায় তারকারাজির মাধ্যমে এবং দিবসে পৃথিবীর বিভিন্ন নিদর্শনসমূহের মধ্যে। এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে। তাঁর সাথে অন্যকে

٦٤. اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ فِى الْاَرْحَامِ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاِنْ لَّمْ يَعْتَرِفُوْا بِالْاِعَادَةِ لِقِيَامِ الْبَرَاهِيْنِ عَلَيْهَا وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ بِالمطر وَالْاَرْضِ ط بِالنَّبَاتِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ اَىْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا اِلٰهَ مَعَهٗ قُلْ يَا مُحَمَّدُ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ اِنَّ مَعِىَ اِلٰهًا فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ ـ

৬৪. অথবা যিনি মাখলুককে আদিতে সৃষ্টি করেন মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দু থেকে। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন মৃত্যুর পরে যদিও তারা পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না। কারণ এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কে তোমাদের কে আকাশ থেকে বৃষ্টির সাহায্যে এবং পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও তরুলতার সাহায্যে জীবনোকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো! অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে, আমার সাথে অন্য ইলাহ রয়েছে, সে উল্লিখিত কাজের কোনটি আঞ্জাম দিয়েছে?

অনুবাদ :

٦٥. وَسَأَلُوْهُ عَنْ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ فَنَزَلَ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ الْغَيْبَ اَىْ مَا غَابَ عَنْهُمْ اِلَّا لٰكِنَّ اللّٰهُ ط يَعْلَمُهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ كَغَيْرِهِمْ اَيَّانَ وَقْتَ يُبْعَثُوْنَ .

৬৫. মুশরিকরা কিয়ামতের ক্ষণ ও কাল সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে অবতীর্ণ হয়- আপনি বলুন! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানুষদের থেকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। আল্লাহ ছাড়া অর্থাৎ একমাত্র তিনিই সে জ্ঞান রাখেন। এবং তারা জানে না অর্থাৎ কাফেররা অন্যান্যদের ন্যায় কখন তারা উত্থিত হবে?

٦٦. بَلِ بِمَعْنٰى هَلْ اَدْرَكَ بِوَزْنِ اَكْرَمَ فِىْ قِرَاءَةٍ وَفِىْ اُخْرٰى اِدَّارَكَ بِتَشْدِيْدِ الدَّالِ وَاَصْلُهُ تَدَارَكَ اُبْدِلَتِ التَّاءُ دَالًا وَاُدْغِمَتْ فِى الدَّالِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ اَىْ بَلَغَ وَلَحِقَ اَوْ تَتَابَعَ وَتَلَاحَقَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ قف اَىْ بِهَا حَتّٰى سَاَلُوْا عَنْ وَقْتِ مَجِيْئِهَا لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا قف بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ مِنْ عَمَى الْقَلْبِ وَهُوَ اَبْلَغُ مِمَّا قَبْلَهُ وَالْاَصْلُ عَمِيُوْنَ اُسْتُثْقِلَتِ الضَّمَّةُ عَلَى الْيَاءِ فَنُقِلَتْ اِلَى الْمِيْمِ بَعْدَ حَذْفِ كَسْرَتِهَا .

৬৬. আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে। এখানে بَلْ টি هَلْ অর্থে হয়েছে এবং اَدْرَكَ শব্দটি اَكْرَمَ ওজনে। অন্য কেরাতে اِدَّارَكَ তাশদীদযুক্ত دَالْ -সহ মূলত ছিল تَدَارَكَ ; এরপর تَاء -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ -কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে শুরুতে সাকিন হওয়ায় একটি হামযায়ে ওয়াসল আনা হয়েছে ফলে ادارك হলো। অর্থ- মিলিত হলো, উপনীত হলো। এ অর্থ প্রথম কেরাত অনুপাতে আর পরবর্তী কেরাত অনুপাতে অর্থ হলো- একের পর এক আসা, মিলিত হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্তি অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কিয়ামত আগমনের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে- বিষয়টি এরূপ নয়। তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ; বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। عَمُوْنَ শব্দটি عَمَى الْقَلْبِ তথা অন্তর অন্ধ হওয়া থেকে গৃহীত। এটা পূর্বের فِىْ شَكٍّ -এর তুলনায় مُبَالَغَه পূর্ণ বা আধিক্যজ্ঞাপক। এটা মূলত عَمِيُوْنَ ছিল। يَاء -এর উপর পেশ কঠিন হওয়ায় তা তার পূর্বের বর্ণে স্থানান্তর করা হয়েছে তার পূর্বের বর্ণের তথা مِيْم -এর كَسْرَة ফেলে দেওয়ার পর। এরপর দু সাকিন একত্র হওয়ায় يَاء -কে ফেলে দিয়ে عَمُوْنَ বানানো হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ : এখানে اَمْ হলো مُنْقَطِعَة ; আবূ হাতিম বলেন- এর আসল রূপ হলো- اَعِبَادَةُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ اَوْثَانِكُمْ خَيْرٌ اَمْ عِبَادَةُ خَلَقَ ; আর কেউ কেউ বলেন- اٰلِهَتُكُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ; এ সময় اَمْ مُتَّصِلَة হবে। এ ক্ষেত্রে تَوْبِيْخ وَتَهَكُّم তথা ধমক ও হুমকি অর্থে হবে।

قَوْلُهُ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ : এটা عَدْل থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো বরাবর করা, সমপর্যায়ের করা। ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে এ অর্থেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আবার عُدُوْل থেকেও নিষ্পন্ন হতে পারে। যার অর্থ হলো বের হওয়া, সীমাতিক্রম

করা। অর্থাৎ তোমরা হলে সীমাতিক্রমকারী জাতি। কেউ কেউ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا এবং পরবর্তী এ ধরনের বাক্যত্রয়কে تَبْكِيْت তথা اَمَّنْ جَعَلَ السَّمٰوٰتِ থেকে بَدْل স্থির করেছেন। তবে এটাই বিশুদ্ধ মনে হয় যে, তিনো জায়গায় بَلْ অব্যয়টি প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করার এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَالَهَا : এটা جَعَلَ -এর ظَرْف -ও হতে পারে, যদি جَعَلَ -কে خَلَقَ অর্থে নেওয়া হয়। আবার جَعَلَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل -ও হতে পারে যদি এটাকে صَيَّرَ অর্থে নেওয়া হয়। -[জুমাল]

قَوْلُهُ وَيَكْشِفُ : এর عَطْف হলো وَيُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ -এর উপর। এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। মুসান্নিফ (র.) وَعَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ تَقْلِيْلًا لِقَلِيْل : এটা عَدَمٌ بِالْكُلِّيَّةِ [সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা] -এর প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ تَذَكُّرٌ -কে সম্পূর্ণরূপে نَفِيٌّ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوْا بِالْاِعَادَةِ : এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন : কাফেররা যখন পুনরুত্থানে বিশ্বাসীই নয়, সুতরাং তাদেরকে এ কথা বলা যে, 'যে সত্ত্বা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন, তিনি উত্তম নাকি তাদের দেবতারা কতুটুক সঙ্গত?

উত্তর : কাফেররা যদিও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, তবে প্রাথমিক সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। আর সূচনার মাধ্যমে পুনরুত্থান বুঝাটা অতি সহজ বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে বিশ্বাসী ধরে নিয়ে এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ : এ বাক্যটি এখানে পরপর পাঁচ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি بَلْ هُمْ يَعْدِلُوْنَ -এর উপর সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত হয়েছে بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর উপর, তৃতীয়টি قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ -এর উপর, চতুর্থটি قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -এর উপর এবং পঞ্চমটি শেষ হয়েছে عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -এর উপর।

قَوْلُهُ اِمَنْ مَعِيَ اِلٰهًا : এর স্থলে اِنَّ مَعَهُ اِلٰهًا বলা সঙ্গত ছিল। কারণ পূর্বে اٰلِهَةٌ مَعَ اللّٰهِ বলা হয়েছে। কোনো কোনো কপিতে مَعَهُ -এর স্থলে مَعَ اللّٰهِ উল্লেখ আছে। এটা অধিক স্পষ্ট। اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتِثْنَاء টি مُنْقَطِعٌ ; কেননা مُتَّصِلٌ সাব্যস্ত করা হলে اَللّٰهُ -কে مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর অন্তর্গত মানতে হবে। আর আসমান ও জমিনে থাকার জন্য مَكَانٌ বা স্থান [আধার] এর প্রয়োজন পড়ে। কাজেই আল্লাহর জন্যও مَكَانٌ বা আধার থাকা সাব্যস্ত হবে। অথচ এটা ঠিক নয়। এ কারণেই مُسْتَثْنٰى -কে مُنْقَطِعٌ স্থির করতে হবে।

قَوْلُهُ فِى الْاٰخِرَةِ : فِى الْاٰخِرَةِ -এর ব্যাখ্যা بِهَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِىْ অব্যয়টি بَاء অর্থে, অর্থাৎ পরকালের বিষয়ে তাদের জ্ঞান কি অক্ষম হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بَلْ অব্যয়টি هَلْ তথা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ অর্থে। অর্থাৎ বাক্যটি এরূপ- لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ عِلْمٌ بِالْاٰخِرَةِ اَىْ لَمْ يُصَدِّقُوْا بِهَا وَلَمْ يَعْتَقِدُوْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের তাওহীদে বিশ্বাস করতো না, যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে স্বীকার করতো না। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, হয়তো এ হতভাগারা শিরক ও কুফর থেকে বিরত হবে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানির কারণে যারা ধ্বংস হয়েছে, তাদের অবস্থা দেখে নিজদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং নিখিল বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

কেননা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণু তাঁরই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো শিরক ও কুফর থেকে খাঁটি তওবা করা এবং এক আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হওয়া। পূববর্তী পারার সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- آللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকই উত্তম? নাকি তারা যাদের শরিক করে সেই অসহায় জড় পদার্থ মূর্তিগুলো উত্তম? এ প্রশ্নের জবাব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, যিনি সবকিছুর পালনকর্তা, তিনিই উত্তম, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর এক আদেশেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

তাওহীদের প্রমাণ : বল দেখি, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন? وَأَنْزَلَ لَكُمْ আর কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান? আর ঐ বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ পাকই জমিনে তরুলতা উৎপাদন করেন, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে আর কারো নেই। বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ.

"নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিজীবিমহলের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে"। -[সূরা আলে ইমরান]

আরো ইরশাদ হয়েছে- وَفِى الْأَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ "এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।" -[সূরা জারিয়াত]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ "এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে, তা কেন তোমরা দেখছো না"? -[সূরা জারিয়াত]

বস্তুত মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং বার্ধ্যক্যের বিভিন্ন অবস্থায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ পাক জমিনকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন, তাতে উদ্যান তৈরি করে দেন। এ পৃথিবীতে সামান্য তরুলতা উৎপাদনের ক্ষমতা কি তোমাদের আছে? বস্তুত এসব কিছুই ধ্রুব সত্য। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের স্থলে অন্যের পূজা করতে যাও কোন যুক্তিতে? কোন বুদ্ধিতে?

তবু কি বলবে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য প্রভু রয়েছে? বরং তারা এমন লোক যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছেন। অক্ষম অসহায় জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করা, এমনকি আল্লাহ পাকের সমান এবং সমকক্ষ মনে করা এবং তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا : লক্ষ্য করে দেখ, এ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করেছেন কে? আল্লাহ পাকই পৃথিবীকে মানুষের অবস্থান এবং বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়েছেন, তদুপরি তার ফাঁকে ফাঁকে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবী যেন নড়াচড়া না করে, তজ্জন্যে পাহাড়গুলোকে পৃথিবীর উপর বসিয়ে দিয়েছেন। তখন থেকে পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে, আর দু'টি নদীকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করে রেখেছেন, যাতে করে একের পরিচয় অন্যের মধ্যে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কাছাকাছি থেকেও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। এসব একমাত্র আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতেরই জীবন্ত নিদর্শন।

قَوْلُهُ أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ : مُضْطَرَّ শব্দটি اِضْطِرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো অভাব হেতু অপারগ ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয় যখন কোনো হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مُضْطَرّ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তাফসীর সুদ্দী, যুন্নুন মিসরী, সহল ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى طَرْفَةِ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। –[কুরতুবী]

অসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করাটাই হলো ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার কাছে, ইখলাসের বিরাট মর্তবা রয়েছে। মুমিন কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছে থেকেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ ইখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয় এতে সন্দেহ নেই। ১. উৎপীড়িতের দোয়া। ২. মুসাফিরের দোয়া এবং ৩. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি কখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদীস্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনো বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনো রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়। –[কুরতুবী]

যদি কোনো নিঃসহায়, মজলুম ও মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও কল্যাণবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোনো ত্রুটি আছে কিনা। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهٗ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল স্বরূপ তাঁর কুদরত ও হিকমতের কয়েকটি নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহ পাকের কুদরতের আরো কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

"[বল,] মাঠে-ময়দানে এবং সমুদ্রের অন্ধকারে কে তোমাদেরকে পথ দেখান? কে তাঁর রহমতের পূর্বে সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।"

অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সামুদ্রিক ভাগে বা স্থলভাগে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যখন কোনো দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন কে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের একই জবাব, তা হলো আল্লাহ পাকই পথ দেখিয়ে থাকেন। এমনিভাবে বৃষ্টির জন্যে যখন মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাকই সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।

قَوْلُهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে যেমন ফেরেশতা, যত মাখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরিক হতে পারেন না। এ বিষয়ের জরুরি ব্যাখ্যা সূরা আন'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ : اِدَّارَكَ শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাতও আছে এবং এর অর্থ সম্পর্কেও নানাজনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তাফসীরে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোনো তাফসীরকার اِدَّارَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন- تَكَامُلْ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِى الْاٰخِرَةِ -কে اِدَّارَكَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোনো কাজে লাগবে না। কারণ দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে اِدَّارَكَ শব্দের অর্থ ضَلَّ ও غَابَ এবং فِى الْاٰخِرَةِ শব্দটি عِلْمُهُمْ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بَلْ শব্দটি لَوْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে যে ইলম তাঁরা আখিরাতে অর্জন করবে, তা যদি দুনিয়াতেই অর্জিত হতো, তবে তারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করতো না। কিন্তু এখন যেহেতু কিয়ামত সম্পর্কে একীন নেই, তাই তারা সন্দেহে পড়ে আছে।

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ : "বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে।" অর্থাৎ, অন্ধ ব্যক্তি যেমন তার সম্মুখে কোনো কিছুই দেখে না, ঠিক তেমনিভাবে কাফেররাও তাদের ভবিষ্যতের কিছুই দেখে না।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ব্যতীত গায়েবের ইলম কারোরই নেই; বরং এরপর ইরশাদ করেছেন, এ কাফেরদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। এরপর ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ দেখে তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, কিয়ামত অবশেষে হবে, কিন্তু কবে হবে তা কেউ জানে না। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহের ঘোরে আচ্ছন্ন রয়েছে। আর এ সন্দেহের নিরসন তারা করতে পারে না। এরপর ইরশাদ করেছেন, এই কাফেররা অন্ধ হয়ে রয়েছে। এ অবস্থা হলো মুশরিকদের । -[মাযহারী খ. ৯, পৃ. ৬৮-৬৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের তিনটি দল রয়েছে, এক দল যাদের প্রকাশ্যে আখিরাত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং এ অবস্থায়ই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ "বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে"।

আর কাফেরদের দ্বিতীয় দল যারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا অর্থাৎ বরং তারা তাতে সন্দেহে রয়েছে। আর কাফেরদের তৃতীয় দলের পথভ্রষ্টতায় আরো উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে তারা অন্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ অর্থাৎ বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৭৭৪]

অনুবাদ :

٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَيْضًا فِىْ اِنْكَارِ الْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ اَىْ مِنَ الْقُبُوْرِ.

৬৭. কাফেররা বলে অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে এ কথাও বলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে? অর্থাৎ কবর থেকে।

٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ اَىْ مَا سُطِرَ مِنَ الْكِذْبِ.

৬৮. এই বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটাতো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়। اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ -এর বহুবচন; অর্থ– যে সকল মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

٦٩. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ. بِاِنْكَارِهِمْ وَهِىَ هَلَاكُهُمْ بِالْعَذَابِ.

৬৯. আপনি বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? তাদের অস্বীকার করার কারণে। আর তা হলো শাস্তি দ্বারা বিনাশ হয়ে যাওয়া।

٧٠. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ لَا تَهْتَمَّ بِمَكْرِهِمْ عَلَيْكَ فَاِنَّا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ.

৭০. তাদের সম্পর্কে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এর দ্বারা মহানবী ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে তাদের কৃত ষড়যন্ত্রে আপনি অস্থির হবেন না। কারণ তাদের বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

٧١. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ.

৭১. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? এ বিষয়ে।

٧٢. قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ قَرُبَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ فَحَصَلَ لَهُمُ الْقَتْلُ بِبَدْرٍ وَبَاقِى الْعَذَابِ يَاْتِيْهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ.

৭২. আপনি বলুন, তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। বদর যুদ্ধে তাদের হত্যার মাধ্যমে কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর অবশিষ্ট আজাব আসবে মৃত্যুর পরে।

٧٣. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَمِنْهُ تَاخِيْرُ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ. فَالْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُوْنَ تَاخِيْرَ الْعَذَابِ لِاِنْكَارِهِمْ وُقُوْعَهُ.

৭৩. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল তন্মধ্য হতে কাফেরদের শাস্তিকে বিলম্ব করাও একটি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। কাফেররা শাস্তি বাস্তবায়িত হওয়াকে অস্বীকার করার কারণে শাস্তি বিলম্বিত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

অনুবাদ :

٧٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ تُخْفِيْهِ وَمَا يُعْلِنُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ـ

৭৪. তাদের অন্তরে যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তাদের রসনার মাধ্যমে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

٧٥. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَلتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ اَيْ شَيْءٌ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ عَلَى النَّاسِ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ وَمَكْنُوْنُ عِلْمِهٖ تَعَالٰى وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكُفَّارِ ـ

৭৫. আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। এখানে غَائِبَةٍ -এর تَاء টি মুবালাগার জন্য অর্থাৎ মানুষের নিকট যা অতি গোপন। আর كِتَابٍ مُّبِيْنٍ তথা সুস্পষ্ট গ্রন্থ দ্বারা এখানে লওহে মাহফূয উদ্দেশ্য। অথবা যা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমে রয়েছে তা উদ্দেশ্য। কাফেরদের শাস্তিও উক্ত সংরক্ষিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

٧٦. إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ اَيْ بِبَيَانِ مَا ذُكِرَ عَلٰى وَجْهِهِ الرَّافِعِ لِلْاِخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ لَوْ اَخَذُوْا بِهٖ وَاَسْلَمُوْا ـ

৭৬. এই কুরআন বনী ইসরাঈলের নিকট বিবৃত করে আমাদের মহানবী ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান বনী ইসরাঈলীদের নিকট। তাদের অধিকাংশ বিষয়কে যেসব নিয়ে তারা মতভেদ করে। অর্থাৎ উল্লিখিত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, তারা যদি তা মানত ও গ্রহণ করত তবে তাদের পারস্পরিক মতভেদ বিদূরীত হয়ে যেত।

٧٧. وَإِنَّهٗ لَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْعَذَابِ ـ

৭৭. এবং নিশ্চয় এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত ভ্রষ্টতা থেকে এবং রহমত আজাব হতে।

٧٨. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ كَغَيْرِهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِحُكْمِهٖ ج اَيْ عَدْلِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْعَلِيْمُ ـ بِمَا يَحْكُمُ بِهٖ فَلَا يُمْكِنُ اَحَدًا مُخَالِفَتُهٗ كَمَا خَالَفَ الْكُفَّارُ فِي الدُّنْيَا اَنْبِيَاءَهٗ ـ

৭৮. আপনার প্রতিপালক তো তাঁর বিধান অর্থাৎ ইনসাফ অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন অন্যদের ন্যায় কিয়ামতের দিন। তিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ। যে বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে। কাজেই কারো জন্য তার ফয়সালার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। যেমন কাফেররা পৃথিবীতে তাঁর নবীগণের বিরোধিতা করে থাকে।

٧٩. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ق ثِقْ بِهٖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ـ اَيِ الدِّيْنِ الْبَيِّنِ فَالْعَاقِبَةُ لَكَ بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّارِ ـ

৭৯. অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করুন! আপনি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সুস্পষ্ট সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব পরিণামে কাফেরদের বিপরীতে বিজয় আপনারই জন্য নির্ধারিত।

অনুবাদ :

৮০. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ اَمْثَالًا بِالْمَوْتٰى وَالصُّمِّ وَالْعُمْىِ فَقَالَ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۤءَ اِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.

৮০. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত, বধির ও অন্ধের সাথে উপমা দিয়ে বলেন– মৃতকে আপনি কথা শোনাতে পারবেন না। বধিরকেও পারবেন না আহবান শোনাতে। যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। اَلدُّعَاۤءَ اِذَا -এর হামযাদ্বয় বহাল রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে হামযা ও يَاءٌ -এর মাঝে লঘু করে পঠিত।

৮১. وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ مَا تُسْمِعُ سِمَاعَ اِفْهَامٍ وَقَبُوْلٍ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ مُخْلِصُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ.

৮১. আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেন না। আপনি শোনাতে পারবেন বুঝার ও মান্য করার শোনা তবে কেবল তাদেরকে যারা আমার নিদর্শনাবলিতে কুরআনে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে একনিষ্ঠ।

৮২. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ حَقَّ الْعَذَابُ اَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ فِىْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاۤبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَىْ تُكَلِّمُ الْمَوْجُوْدِيْنَ حِيْنَ خُرُوْجِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَقُوْلُ لَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهَا نَائِبَةً عَنَّا اَنَّ النَّاسَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَتْحِ هَمْزَةِ اَنَّ بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ بَعْدَ تُكَلِّمُهُمْ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ اَىْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وَبِخُرُوْجِهَا يَنْقَطِعُ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يُؤْمِنُ كَافِرٌ كَمَا اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى نُوْحٍ اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ.

৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর আসবে আজাব এসে যাবে অর্থাৎ অন্যান্য কাফেরদের সাথে তাদের উপর আজাব অবতীর্ণ হবে। তখন আমি মৃত্তিকার গর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে অর্থাৎ তার আবির্ভাবের সময় যারা বিদ্যমান থাকবে, তাদের সাথে সে আরবি ভাষায় কথা বলবে, সে তাদের সাথে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ সব কথা বলবে। এ জন্য যে, মানুষ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা অন্য কেরাতে اَنَّ -এর হামযা যবরসহ একটি بَاءٌ উহ্য মনে করে। আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না যা পুনরুত্থান, হিসাব ও শাস্তি সম্বলিত। আর 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়ার সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর তখন কোনো কাফেরও আর নতুন করে ঈমান আনবে না। যেমন– আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রত্যাদেশ করেছিলেন তোমাদের সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছে, এরা ব্যতীত আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : আল্লাহ তা'আলা এখানে যমীর বা সর্বনামের স্থলে اَلَّذِيْنَ - اِسْم مَوْصُوْل উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ قَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا -এর স্থলে قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا উল্লেখ করেছেন এ জন্যে যাতে صِلَة -এর মাধ্যমে তাদের কু-স্বভাব উল্লেখের দ্বারা কুফর -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে যায়, সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত উক্তির ইল্লত বা কারণের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায়। –[রূহুল মাআনী]

ءَاِذَا হলো উহ্য ফে'লের ظَرْف বা আধার। مُخْرَجُوْنَ শব্দটি এটি নির্দেশ করছে। বাক্যটি এরূপ হবে– اَنُخْرَجُ اِذَا كُنَّا تُرَابًا এখানে اِذَا -কে لَمُخْرَجُوْنَ -এর ظَرْف সাব্যস্ত করা সঙ্গত হবে না। কারণ পূর্বে আমল করার তিনটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে لَامْ ، اِنَّ ، ءَ এগুলোর প্রত্যেকটি তার পরবর্তী শব্দকে পূর্ববর্তী শব্দে আমল করতে দেওয়ার প্রতিবন্ধক। আর তিনটিই একত্রে আসলে তো আমলের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। কেউ কেউ বলেন– اِنَّ -এর خَبَرْ যদি لَامْ -এর সাথে মিলিত হয় তাহলে তখন সেটি পূর্ববর্তী শব্দে আমল করতে পারে। যেমন– اِنَّ زَيْدًا طَعَامَكَ لَاٰكِلٌ তবে এরপরও দুটি প্রতিবন্ধক থেকেই যায়। কাজেই এটা স্বীকার করতেই হবে যে, اِذَا لَمُخْرَجُوْنَ -এর مَعْمُوْل নয়; বরং এর عَامِلْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَنُخْرَجُ

قَوْلُهُ وَاٰبَائُنَا : এর عَطْف হলো كَانَ -এর اِسْم -এর উপর, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে– ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ -এর উপর عَطْف করার জন্য ضَمِيْر مُنْفَصِلْ -এর মাধ্যমে تَاكِيْد উল্লেখ করা জরুরি। অথচ এখানে তা নেই?

উত্তর : এখানে যেহেতু মাঝে تُرَابًا -এর فَصْل বা ব্যবধান ঘটেছে, কাজেই تَاكِيْد -এর প্রয়োজন নেই। ءَاِنَّا -এর মধ্যে হামযার দ্বিরুক্তি প্রত্যাখ্যানের তীব্রতাজ্ঞাপক। –[রূহুল মা'আনী]

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ : এখানে ভ্রমণের এ নির্দেশটি تَهْدِيْد বা ধমকমূলক এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তোমাদের পূর্বের উম্মতরাও আল্লাহর প্রতি রুজু হয়নি। পরিশেষে তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করা হয়েছে। তোমরাও যদি আল্লাহর প্রতি রুজু না হও তাহলে তোমাদেরকেও ধ্বংস করে ফেলা হবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ : এখানে বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ কেবল নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : পুনরুত্থানের সংবাদদানের ব্যাপারে মুমিনগণও রাসূল ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলেন। এ জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ : এখানে عَسٰى একীন অর্থে فِعْل مُقَارِبْ হিসেবে নয়। কাযী বায়যাভী (র.) বলেন– عَسٰى ، لَعَلَّ ও سَوْفَ বড়দের প্রতিশ্রুতিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একীন বা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক হয়। আর এটাও বুঝা যে, তাদের ইঙ্গিতই অন্যদের স্পষ্ট বর্ণনার পর্যায়ে হয়।

قَوْلُهُ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ : رَدِفَ এমন একটি ক্রিয়ারূপ অর্থ বিশিষ্ট হয় যা لَامْ -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়। যেমন– دَنَا ، قَرُبَ কেননা رَدِفَ এর ব্যবহার لَامْ -এর সাহায্যে হয়নি। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) رَدِفَ -এর তাফসীর করেছেন قَرُبَ দ্বারা আর بَعْضُ الَّذِىْ হলো رَدِفَ-এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ مَا تُكِنُّ : এটা اِكْنَانٌ শব্দমূল হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। বাবে اِفْعَالْ হতে مُضَارِعْ -এর সীগাহ। অর্থ– লুকানো, গোপন করা। এখানে এর فَاعِلْ যেহেতু صُدُوْر শব্দ যা اِسْم ظَاهِرْ مُكَسَّرْ -এ কারণে فِعْل -কে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ غَائِبَةٍ : এ শব্দটি যদিও সিফত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে مَوْصُوْف -বিহীন ব্যবহৃত হয়। কারো মতে এটা صِفَتْ থেকে اِسْمِيَّتْ -এর প্রতি প্রবর্তিত নয়। তবে اِسْمِيَّتْ -এর প্রাধান্য ঘটেছে। যেমনটা مُؤْمِنْ ও كَافِرْ -এর মধ্যে ঘটেছে। এ

কারণে غَائِبَةٍ -এর ة টি স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে নয়। কেননা এর কোনো مَوْصُوْف স্ত্রীলিঙ্গ নেই যে, এটি তার সিফত হবে। যেমন অধিক রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে رَاوِيَة বলা হয় এটাও তদ্রূপ। অতএব এ ة টি مُبَالَغَة বা আধিক্যজ্ঞাপক। আর কেউ কেউ এটাকে صِفَتْ থেকে اِسْمِيَّتْ -এর প্রতি প্রবর্তিত বলেছেন। সুতরাং যে বস্তুটি অদৃশ্য ও গুপ্ত হয় তাকে غَائِبَة বলা হয়। আর এ ة কে تَائى نَقْل বলা হয় ; [যেমন فَاتِحَة ، ذَبِيْحَة ও نَطِيْحَة -এর تَاء -এর মধ্যে বলা হয়।

قَوْلُهُ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দু'টি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। **ক.** লওহে মাহফূয **খ.** আল্লাহ তা'আলার ইলম। وَمَكْنُوْن -এর মধ্যকার وَاو টি اَوْ অর্থে, অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয়াদি লওহে মাহফূযে রয়েছে। অথবা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের অধীনে রয়েছে। اَىْ بِبَيَانِ مَا ذُكِرَ বাক্যাংশে جَار مَجْرُوْر টি يَقُصُّ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, আর مَاذُكِرَ দ্বারা সেসব বিষয় উদ্দেশ্য যে সব বিষয়ে তারা বেশিরভাগ মতানৈক্য করত।

اَلرَّافِعُ -এর সম্পর্ক عَلٰى وَجْهِ এটা مُتَعَلِّقْ হলো بِبَيَانِ -এর সাথে। اَلرَّافِعُ হলো بَيَانٌ -এর সিফত। لَوْاَخَذُوْا بِهٖ -এর সাথে। অর্থাৎ কুরআন তাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদিকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, যদি তারা উক্ত বর্ণনাকে গ্রহণ করে তাহলে তাদের মতপার্থক্য তিরোহিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِلٰى عَدْلِهٖ : حُكْمِهٖ -এর তাফসীর عَدْلِهٖ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : يَقْضِىْ -এর পরে بِحُكْمِهٖ উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। এর অর্থ হয় يَقْضِىْ يَحْكُمُ بِحُكْمِهٖ বা بِقَضَائِهٖ

উত্তর : এখানে حُكْم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حُكْمٌ بِالْعَدْلِ তথা ন্যায়-নিষ্ঠাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সুতরাং উভয়টি مُتَرَادِفٌ বা সর্থবোধক নয়।

قَوْلُهُ فَلَا يُمْكِنُ اَحَدًا مُخَالِفَتُهٗ : এটা وَهُوَ الْعَزِيْزُ -এর বিশ্লেষণ, মুসান্নিফ (র.) এটাকে وَهُوَ الْعَزِيْزُ -এর সাথে মিলিত করে উল্লেখ করলে তা আরো উত্তম হতো।

قَوْلُهُ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى : এ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হেদায়েতের আশাকে তিরোহিত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফেরদেরকে মৃতদের সাতে তুলনা করে তাদের থেকে সঠিক পথ গ্রহণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের থেকে যেভাবে কোনো কিছু আশা করা যায় না, তদ্রূপ এরাও কলব বা আত্মার বিচারে মৃততুল্য। কেননা তাদের অন্তরে মোহারাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তা থেকে কুফরও বের হতে পারে না এবং তাতে ঈমানও প্রবেশ করতে পারে না। [এখানে মৃতদের শ্রবণ করা না করার কোন মাসআলা নেই। তাই মৃতদের জীবিতদের কথা শ্রবণ না করতে পারার ব্যাপারে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সঙ্গত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ : অর্থাৎ একে তো বধির, উপরন্তু তারা পিঠও ঘুরিয়ে নিয়েছে, যার ফলে হেদায়েত লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। কেননা শুধু শ্রবণ করার সম্ভাবনা তো বধির হওয়ার কারণে দূরীভূত হয়েছে। তবে বধির মানুষও কখনো কখনো ইশারা ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝে নেয়। কিন্তু সে যখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তখন ইশারায় বুঝার আশাও দূর হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِهَادِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ : هِدَايَة শব্দের صِلَه সাধারণত عَنْ ব্যবহৃত হয় না। এখানে هِدَايَتْ যেহেতু صَرْف -এর অর্থবিশিষ্ট, এ কারণেই এর صِلَة স্বরূপ عَنْ আসা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ حَقَّ الْعَذَابُ الخ : এটা وَقَعَ الْقَوْلُ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً : কিয়ামতের সন্নিকটকালে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী (র.)-এর ইন্তেকালের পরে সাফা পর্বত থেকে এক আজব প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। কোনো কোনো আলেম হিজর ও তায়েফকে তার আবির্ভাবস্থল বলেছেন। সে প্রাণীটি মানুষের সাথে আরবিতে কথা বলবে। তার কথাবার্তার মধ্য থেকে কিছু কথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বস্বরূপ হবে। যেমন সে আল্লাহ তা'আলার হয়ে বলবে– اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে, তাই তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করত। ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ
অর্থাৎ আর কাফেররা বলে , আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে? তাদের এসব কথা তাদের মনের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

তাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখিরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। অতএব, আখিরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাফেরদের এসব অন্যায় কথার জবাবেই তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের বিশেষ সতর্কবাণী।

قَوْلُهُ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : [হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, তা লক্ষ্য করে দেখ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু জাতি উন্নতি অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, কিন্তু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি। আখিরাতকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তারা ভোগ করেছে, তাদের নির্মিত আকাশচুম্বি ইমারতগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পরিণামদর্শী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। তাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদেরকে পূর্বকালের অবাধ্য লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে- سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।"

তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ ইবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই ইবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন যেভাবে কাফেররা আখিরাতকে অবিশ্বাস করত, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আর আখিরাতকে শুধু ভুলে যায় না; বরং অবিশ্বাসও করে। তাদের উদ্দেশ্যেও পবিত্র কুরআনের একই নির্দেশ- পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুষোলিনী এবং [সাবেক] সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন যে মহাসত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগের কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতিপূর্বে যেসব জাতি কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।

قَوْلُهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ : প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : বর্ণিত আছে, মক্কার কোনো কোনো কাফের প্রিয়নবী ﷺ -কে শুধু যে অস্বীকার করত তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্রূপও করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল ! কাফেদের এ অন্যায় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে, তবে তাদের জন্যে করার কিছুই নেই।

দ্বিতীয়ত তারা আপনার প্রতি যে বিদ্রূপ করে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এ ব্যাপারেও আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা তাদের শাস্তি অবধারিত, এ অন্যায়ের শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

দুরাত্মা কাফেরদের ঔদ্ধত্য : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু সেই স্থলে তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে– وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ "তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল সেই প্রতিশ্রুত কিয়ামত কবে আসবে?"

এটা নিঃসন্দেহে দুরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করার জন্য বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কত জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উন্নতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলি ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আস্ফালনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ

"[হে রাসূল, আপনি] ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো বিচিত্র নয় যে, তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

অর্থাৎ তোমরা যে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে চাও তা অতি সত্বরই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতে পারে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সেই আজাব সম্পর্কে টের পেয়েছে, যেখানে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে। আখিরাতের কঠিন শাস্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শাস্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়; বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আজাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শাস্তি, যে যুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াসমূহে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গাম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা স্বয়ং কুরআন এবং কুরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে

বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ সত্যকে সাহায্যে করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাতো নিশ্চিত।

قَوْلُهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى الخ : সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ -এর স্নেহ মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারো সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াসমূহে وَلَا تَحْزَنْ এবং وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোনো দোষ ও ক্রটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। **এক.** তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারো কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। **দুই.** তাদের উদাহরণ বধিরের মতো, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। **তিন.** তারা অন্ধের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ : অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌঁছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কুরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হতো, তবে কুরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জবাব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, সুতরাং যদি কোনো সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুল করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেররাই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে। কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারো কোনো কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারো কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন. মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে- وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতদ্বয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; বরং তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনিটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ মৃতদের জন্য নয়, তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্কে দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন।

মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীসটি এই–

مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهٗ فِى الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ رُوْحَهٗ حَتّٰى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জবাব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জবাব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো। **এক.** মৃতরা শুনতের পারে এবং **দুই.** তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জবাব দেওয়ারও শক্তি দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কিনা? তাই ইমাম গাযালী ও আল্লামা সুবকী (র.) প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ হাদীস ও উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে: কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; এবং অন্য সময় শুনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা সূরা নামল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। অকাট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ : ভূগর্ভের জীব কি এবং তা কোথায় এবং কবে নির্গত হবে? মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া ২. ধুম্র নির্গত হওয়া ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৬. দাজ্জাল ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ এক. পশ্চিমে **দুই.** পূর্বে এবং **তিন.** আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নি সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভে থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دابة শব্দের تنوين দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরো জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না: বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর (র.) আবূ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন একে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। -[ইবনে কাসীর]

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি প্রথমে প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। -[ইবনে কাসীর]

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। [মাযহারী] এ স্থলে ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটি কিম্ভূতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে। অতঃপর সে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরি নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জবাবে الناس كانوا باياتنا لا يوقنون এই বাক্যটিই সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই ; অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনগতভাবে ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। -[ইবনে কাসীর]

٨٣. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا جَمَاعَةً مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا وَهُمْ رُؤَسَاؤُهُمُ الْمَتْبُوْعُوْنَ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ . اَىْ يَجْمَعُوْنَ بِرَدِّ اٰخِرِهِمْ اِلٰى اَوَّلِهِمْ ثُمَّ يُسَاقُوْنَ .

٨٤. حَتّٰى اِذَا جَآءُوْا مَكَانَ الْحِسَابِ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ اَكَذَّبْتُمْ اَنْبِيَائِىْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا مِنْ جِهَةِ تَكْذِيْبِهِمْ بِهَا عِلْمًا اَمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ اَمْ فِىْ مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ ذَا مَوْصُوْلٌ اَىْ مَا الَّذِىْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِمَّا اُمِرْتُمْ .

٨٥. وَوَقَعَ الْقَوْلُ حَقَّ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا اَىْ اَشْرَكُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ . اِذْلَا حُجَّةَ لَهُمْ .

٨٦. اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا خَلَقْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط بِمَعْنٰى يَبْصُرُ فِيْهِ لِيَتَصَرَّفُوْا فِيْهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ . خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِانْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِى الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ .

অনুবাদ :

৮৩. স্মরণ করুন সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করত তারা হলো তাদের নেতৃবৃন্দ যাদের এরা অনুসরণ করে চলতো। আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। অর্থাৎ আগে পিছে করে সমবেত করা হবে। অতঃপর তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

৮৪. যখন তারা সমাগত হবে হিসাবের জায়গায় তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন তাদেরকে তোমরা কি আমার নিদর্শন নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে অথচ তা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিষয়ে; বরং তোমরা আরো কিছু করতে ছিলে? যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে اَمَّا -এর মধ্যে اَمْ টা مَا اِسْتِفْهَامِيَّة -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে, ذَا হলো اِسْم مَوْصُوْل অর্থাৎ- مَا الَّذِىْ

৮৫. তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে আজাব অবধারিত হয়েছে। তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে অর্থাৎ তাদের শিরকের কারণে ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। যেহেতু তাদের নিকট কোনোই দলিল প্রমাণ নেই।

৮৬. তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি, তাদের বিশ্রামের জন্য অন্যান্যদের ন্যায়। এবং দিবসকে করছি আলোকপ্রদ অর্থাৎ যাতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের কাজ-কর্ম করার সুবিধার্থে। এতে রয়েছে নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার নির্দেশিকা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ বিশেষভাবে ঈমান দ্বারা উপকৃত হওয়ার কারণে তাদের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ :

৮৭. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةَ الْاُوْلٰى مِنْ اِسْرَافِيْلَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اَيْ خَافُوْا الْخَوْفَ الْمُفْضِيْ اِلَى الْمَوْتِ كَمَا فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ بِالْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهٖ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط اَيْ جِبْرَئِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاِسْرَافِيْلُ وَعَزْرَائِيْلُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هُمُ الشُّهَدَاءُ اِذْ هُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ وَكُلٌّ تَنْوِيْنُهٗ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ اَيْ كُلُّهُمْ بَعْدَ اِحْيَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَتَوْهُ بِصِيْغَةِ الْفِعْلِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ دٰخِرِيْنَ. صَاغِرِيْنَ وَالتَّعْبِيْرُ فِي الْاِتْيَانِ بِالْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهٖ.

৮৭. যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা হলো হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার সেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হয়ে পড়বে অর্থাৎ এতই ভীত হয়ে পড়বে যে, তা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে فَصَعِقَ [ফলে তারা মূহ্যমান হয়ে পড়বে] এটার বস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে এটাকে ফে'লে মাযী দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ যাদেরকে চাবেন তারা ব্যতীত। অর্থাৎ হযরত জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আ.) ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা হলেন শহীদগণ। কেননা তারা হলেন জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জীবিকাপ্রাপ্ত। বরং সকলেই এখানে كُلٌّ -এর তানভীনটি হলো تَنْوِيْن عِوَض যা مُضَاف اِلَيْه -এর পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ كُلُّهُمْ [তাদের প্রত্যেকেই] কিয়ামতের দিন তাদেরকে জীবিত করার পর তাঁর নিকট আসবে اَتَوْهُ এটি فِعْل এবং ইসমে ফায়েল উভয়ই হতে পারে। বিনীত অবস্থায়। আর اَتَوْهُ -কে ফে'লে মাযী আনা হয়েছে তার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে।

৮৮. وَتَرَى الْجِبَالَ تُبْصِرُهَا وَقْتَ النَّفْخَةِ تَحْسَبُهَا تَظُنُّهَا جَامِدَةً وَاقِفَةً مَكَانَهَا لِعِظَمِهَا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ الْمَطَرِ اِذَا ضَرَبَتْهُ الرِّيْحُ اَيْ تَسِيْرُ سَيْرَهٗ حَتّٰى تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ فَتَسْتَوِيْ بِهَا مَبْثُوْثَةً ثُمَّ تَصِيْرُ كَالْعِهْنِ ثُمَّ تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا صُنْعَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهٗ اُضِيْفَ اِلٰى فَاعِلِهٖ بَعْدَ حَذْفِ عَامِلِهٖ اَيْ صَنَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ صُنْعًا الَّذِيْ اَتْقَنَ احكم كُلَّ شَيْءٍ ط صَنْعَهٗ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ. بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَيْ اَعْدَاؤُهٗ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَاَوْلِيَاؤُهٗ مِنَ الطَّاعَةِ.

৮৮. আপনি পর্বতমালাকে দেখছেন, মনে করেছেন যে, তা অচল। বিশালত্বের কারণে স্বীয় অবস্থানে অবিচল রয়েছে অথচ সিঙ্গায় ফুৎকারকালে তাকে দেখতে পাবেন তারা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ যখন তাকে বায়ু আঘাত করে, অর্থাৎ তা বায়ুর গতিতে চলতে থাকবে। অবশেষে মাটিতে পতিত হয়ে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তা ধুনিত তুলার ন্যায় হবে। পরে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। এটা মাসদার, যা তার পূর্বের বাক্যের পূর্ণ বিষয়বস্তুর জোর তাকিদ সৃষ্টিকারী। তার আমেলকে ফেলে দিয়ে তার فَاعِلْ -এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। অর্থাৎ صَنَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ صُنْعًا অর্থে। যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম অর্থাৎ সকল কর্ম-কীর্তিকে। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। تَفْعَلُوْنَ শব্দটি يَاء ও تَاء উভয়টি যোগে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তার শত্রুরা সে সকল অবাধ্য আচরণ করে এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণ যে সকল সৎকর্ম করে, সে বিষয়ে তিনি অবগত।

٨٩. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ اَىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ ثَوَابٌ مِّنْهَا ج اَىْ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفْضِيْلِ اِذْ لَا فِعْلَ خَيْرٌ مِنْهَا وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَهُمْ اَىِ الْجَاۤؤُوْنَ بِهَا مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ بِالْاِضَافَةِ وَكَسْرِ الْمِيْمِ وَبِفَتْحِهَا وَفَزَعٌ مُنَوَّنًا وَفَتْحِ الْمِيْمِ اٰمِنُوْنَ.

অনুবাদ :

৮৯. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উপস্থিত হবে। সে তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে خَيْرٌ টি تَفْضِيْل বা তুলনামূলক আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত নয়। যেহেতু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর তুলনায় উত্তম কোনো আমল নেই। অপর আয়াতে রয়েছে যে, সে তার দশগুণ লাভ করবে। এবং সেদিন তারা অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর সাক্ষ্য প্রদানকারীরা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে। فَزَعِ يَّوْمَئِذٍ এটা ইযাফত আকারে আর مِيْم বর্ণে যবর বা যেরযোগে। অথবা فَزَعٍ তানভীনসহ এবং مِيْم বর্ণ যবরযোগে।

٩٠. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اَىِ الشِّرْكِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ط بِاَنْ وُلِّيَتْهَا وَذُكِرَتِ الْوُجُوْهُ لِاَنَّهَا مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَوَاسِ فَغَيْرُهَا مِنْ بَابِ اَوْلٰى وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيْتًا هَلْ اَىْ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءً مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِىْ.

৯০. এবং যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ শিরক নিয়ে তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এভাবে যে, মুখমণ্ডলকে আগুনের কাছে সোপর্দ করা হবে। মুখমণ্ডল উল্লেখের কারণ হচ্ছে তাহলো ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত স্থান। কাজেই অন্যান্য অঙ্গ আরো উত্তমভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য এটা বলা হবে। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ, শিরক ও বিরুদ্ধাচরণের।

٩١. قُلْ لَهُمْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ اَىْ مَكَّةَ الَّذِىْ حَرَّمَهَا اَىْ جَعَلَهَا حَرَمًا اٰمِنًا لَا يُسْفَكُ فِيْهَا دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهَا اَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَذٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلٰى قُرَيْشٍ اَهْلِهَا فِىْ رَفْعِ اللّٰهِ عَنْ بَلَدِهِمُ الْعَذَابَ وَالْفِتَنَ الشَّائِعَةَ فِىْ جَمِيْعِ بِلَادِ الْعَرَبِ وَلَهٗ تَعَالٰى كُلُّ شَىْءٍ ز فَهُوَ رَبُّهٗ وَخَالِقُهٗ وَمَالِكُهٗ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . لِلّٰهِ بِتَوْحِيْدِهٖ .

৯১. আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর অর্থাৎ মক্কার প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। অর্থাৎ তিনি একে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। এখানে কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটানো হবে না। কারো প্রতি কোনো রূপ নির্যাতন চালানো হবে না, এর কোনো প্রাণী শিকার করা হবে না এবং এর ঘাসও কর্তন করা হবে না। আর এটা তথাকার অধিবাসী কুরাইশদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ; তাদের থেকে আজাব আরবের সকল নগরে ব্যাপৃত ফেতনা ফ্যাসাদকে উঠিয়ে নেওয়ার কারণে। সমস্ত কিছু তাঁরই তিনি তার প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও স্বত্বাধিকারী আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহর নিকট তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে।

অনুবাদ :

৯২. وَاَنْ اَتْلُوا الْقُرْاٰنَ عَلَيْكُمْ تِلَاوَةَ الدَّعْوَةِ اِلَى الْاِيْمَانِ . فَمَنِ اهْتَدٰى لَهٗ فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج اَيْ لِاَجْلِهَا لِاَنَّ ثَوَابَ اِهْتِدَائِهٖ لَهٗ وَمَنْ ضَلَّ عَنِ الْاِيْمَانِ وَاَخْطَاَ طَرِيْقَ الْهُدٰى فَقُلْ لَهٗ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ . الْمُخَوِّفِيْنَ فَلَيْسَ عَلَيَّ اِلَّا التَّبْلِيْغُ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

৯২. আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি কুরআন তেলাওয়াত করতে তোমাদের নিকট ঈমানের প্রতি আহবানের জন্য। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থে। কেননা সৎপথ অনুসরণের ছওয়াব তার নিজেরই হবে। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে ঈমান থেকে এবং হেদায়েতের পথ বিচ্যুত হবে। আপনি বলুন আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন। অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী। আমার দায়িত্ব কেবলমাত্র পৌঁছে দেওয়া। এটা জিহাদের বিধান অবতীর্ণের পূর্বের কথা।

৯৩. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ط فَاَرَاهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ بَدْرٍ الْقَتْلَ وَالسَّبْيَ وَضَرْبَ الْمَلَائِكَةِ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَعَجَّلَهُمُ اللّٰهُ اِلَى النَّارِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ وَاِنَّمَا يُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ .

৯৩. আর আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি তোমাদেরকে অতিসত্বর তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তা দেখিয়ে ছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে তাদেরকে হত্যা, বন্দী এবং ফেরেশতা কর্তৃক তাদের মুখে ও পশ্চাতে প্রহারের মাধ্যমে। আর তাদেরকে জাহান্নাম পানে ত্বরান্বিত করেছিলেন তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালক গাফিল নন تَعْمَلُوْنَ শব্দটি يَاء এবং تَاء যোগে পঠিত। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا : مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ -এর مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيَّة আর مِمَّنْ يُكَذِّبُ -এর مِنْ হলো بَيَانِيَّة যা فَوْجًا -এর বিবরণ বুঝাচ্ছে। فَوْج এর অর্থ যদিও দ্রুত ধাবমান দল, তবে এখানে সাধারণ দল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ দলের দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নেতৃবর্গ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ بِرَدِّ اٰخِرِهِمْ اِلٰى اَوَّلِهِمْ : ব্যাখ্যাকার (র.) যদি بِرَدِّ اَوَّلِهِمْ اِلٰى اٰخِرِهِمْ বলতেন তাহলে তা আরো উপযোগী হতো। অর্থাৎ আগে গমনকারীদেরকে বাধা দেওয়া হবে। যাতে পিছনের লোকজন তাদের সঙ্গী হতে পারে এবং একত্রে চলতে পারে। -[সাবী]

قَوْلُهٗ اَكَذَّبْتُمْ اَنْبِيَائِيْ : এ জিজ্ঞাসাটি ধমকমূলক। অর্থাৎ তোমরা আয়াতকে কেন মিথ্যা অভিহিত করেছিলে? بِاٰيَاتِيْ হলো كَذَّبْتُمْ -এর مَفْعُوْل আর بَا অব্যয়টি تَعْدِيَة -এর জন্য। ব্যাখ্যাকার (র.) كَذَّبْتُمْ -এর مَفْعُوْل হিসেবে اَنْبِيَائِيْ -কে উহ্য মেনেছেন, অথচ এর কোনো প্রয়োজন নেই। এর জন্য অহেতু কৃত্রিমতার শিকার হতে হয়।

قَوْلُهٗ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا : এ বাক্যটি كَذَّبْتُمْ -এর যমীরের حَالْ এবং পূর্বের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের তাকিদ। অর্থাৎ তোমরা কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করলে। মনে রেখ! এটা তোমাদেরকে পাকড়াও করার অন্যতম কারণ হবে।

قَوْلُهُ اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : এ বাক্যের আসল রূপ এমন হবে- اَىُّ الشَّيْئِ الَّذِىْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ بِهٖ এখানে مَا مُبْتَدَأٌ আর مَوْصُوْل صِلَة মিলে خَبَرٌ-এর অর্থাৎ তোমরা এ কথার উত্তর দাও যে, তোমরা কি করতে, যার দরুন আমার আয়াতসমূহে চিন্তা–ভাবনা করার সুযোগই পাওনি?

قَوْلُهُ وَقَعَ الْقَوْلُ اَىْ قَرُبَ وُقُوْعُهُ : অর্থাৎ বাস্তাবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে مَاضِىْ-এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। وَجَعَلْنَا الَّيْلَ-এর পরে مُظْلِمًا উহ্য রয়েছে। এর আলামত বা নির্দেশক হলো وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا অর্থাৎ যেভাবে لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ-এর উপর কিয়াস বা অনুবাদ করে। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا থেকে لِيَتَصَرَّفُوْا فِيْهِ বাক্যাংশকে বিলোপ করা হয়েছে এখানেও তদ্রূপ مُظْلِمًا শব্দকে বিলোপ করা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকে صَنْعَت اِحْتِبَاك বলা হয়।

قَوْلُهُ فَفَزِعَ : প্রথম ফুৎকারকে نَفْخَةُ الصَّعْقِ ও نَفْخَةُ الْفَزَعِ বলা হয়। সুরায় জুমার -এর মধ্যে প্রথম ফুৎকারকে صَعِقَ বলা হয়েছে। صَعِقَ বলা হয় এমন মূর্ছা যাওয়াকে যার পরে আর হুঁশ ফিরে আসে না, বরং উক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। প্রথম ফুৎকারে প্রথমত সকল প্রাণী বেহুঁশ হয়ে যাবে, অতঃপর এ অবস্থায় সব প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। তবে কেবল সে সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এর থেকে مُسْتَثْنٰى বা ব্যতিক্রম আকারে প্রকাশ করছেন।

আর দ্বিতীয় ফুৎকারে সকল মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে। উভয় ফুৎকারের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকবে। কোনো কোনো মনীষী মোট তিন ফুৎকার উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. نَفْخَةُ زَلْزَلَة [ভূ-কম্পনের ফুৎকার] অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূকম্পন সৃষ্টি হবে। এমনকি পর্বতরাজি ধুনিত তুলার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে। ২. نَفْخَةُ مَوْت [মৃত্যুর ফুৎকার] দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। ৩. نَفْخَةُ حَيَاتٌ [পুনর্জীবনের ফুৎকার] অর্থাৎ তৃতীয়বার ফুৎকার সকল প্রাণী নিজ নিজ সমাধি বা মৃত্যুস্থল হতে জীবিত হয়ে উঠবে। তবে এ বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বিশুদ্ধ হাদীস মতে মোট দু'বার ফুৎকার ঘটবে।

قَوْلُهُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ الْمَطَرِ : মুফাসসির (র.) سَحَابٌ -এর তাফসীর مَطَرٌ [বৃষ্টি] দ্বারা করেছেন । অথচ এটা না অভিধানসম্মত, আর না জ্ঞান-বিবেক বা যুক্তিসম্মত, বরং سَحَابٌ দ্বারা এর স্বাভাবিক অর্থ তথা মেঘ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, صُنْعَ اللّٰهِ হলো পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্তুর تَاكِيْد অর্থাৎ সিঙ্গায় ফুৎকার, অতঃপর সকলের বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করা, পাহাড়-পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকা এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলা করবেন।

قَوْلُهُ بِالْاِضَافَةِ : অর্থাৎ فَزَعٍ-এর প্রতি يَوْمَ শব্দটি مُضَافٌ হয়েও যবরযুক্ত হতে পারে فَتْح-এর উপর মবনী হওয়ার কারণে। কেননা يَوْمَ শব্দটি اِذْ-এর প্রতি مُضَافٌ হয়েছে, আর اِذْ হলো مَبْنِىُّ الْاَصْلِ কেমন যেন يَوْم-এর مِيْم বর্ণে দুটি কেরাত রয়েছে, যবর ও যের।

قَوْلُهُ وَفَزَعٍ مُنَوَّنًا : مُنَوَّنًا-এর عَطْف হলো اِضَافَتْ-এর উপর, অর্থাৎ يَوْمَ-কে اِضَافَتْ সহ বা اِضَافَتْ –বিহীন উভয়রূপে পড়া যায়। اِضَافَتْ আকারে পড়লে يَوْمَ-এর مِيْم যেরযুক্ত হবে, আর اِضَافَتْ –বিহীন পড়লে যবরযুক্ত হবে।

قَوْلُهُ مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَوَاسِّ : حَوَاسٌّ শব্দটি حَاسَّةٌ-এর বহুবচন, এর অর্থ হলো ইন্দ্রিয়, حَوَاسّ خَمْسَه بَاطِنَة বা গুপ্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সব ক'টি মাথায় অবস্থিত। যেমন– ১. دِمَاغ বা মস্তিষ্ক, এটা ত্রিভুজ আকৃতি। এর রয়েছে ৩টি অংশ, সেগুলোকে بُطُوْنٌ বলা হয়। ১. بَطْن مُؤَخَّر এটা বক্রকোণের নিকটবর্তী অংশ ২. بَطْن اَوْسَط ঃ এটা দু' بَطْن-এর মধ্যবর্তী অংশ। ৩. بَطْن مُقَدَّمْ এ অংশটি অন্য দু'টি থেকে বড়। এবং এ অংশটিই حِسّ مُشْتَرَكْ বা সমন্বিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি শক্তি] ও قُوَّة خَيَال বা কল্পনাশক্তির মূলকেন্দ্র। পিছনে ঘাড়ের দিকে যে, بَطْن مُؤَخَّرْ রয়েছে উক্ত অংশটি بَطْن مُقَدَّمْ-এর তুলনায় ছোট, এটা হলো قُوَّة حَافِظَة বা স্মৃতিশক্তির স্থান। بَطْن اَوْسَطْ হলো সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এ অংশটি হলো قُوَّة مُتَصَرِّفَة ও قُوَّة وَاهِمَه তথা কার্য পরিচালনা ও চিন্তাশক্তির স্থান।

قَوْلُهُ حَوَاسّ خَمْسَة ظَاهِرَة : তথা বাহ্যিক বা প্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে হতে কেবল قُوَّة لَامِسَة [স্পর্শ শক্তি] ছাড়া অবশিষ্ট ৪টির অবস্থানও মাথায়। সেগুলো হলো- ১. قُوَّة بَاصِرَة [দৃষ্টি শক্তি] ২. قُوَّة سَامِعَة [শ্রবণ শক্তি] ৩. قوة شَامَّة [ঘ্রাণ শক্তি] ও ৪. قُوَّة ذَائِقَة [আস্বাদন শক্তি]; قُوَّة لَامِسَة বা স্পর্শ শক্তি [ত্বক] সমস্ত শরীরে বিরাজমান। এটা অন্যান্য শক্তিসমূহের তুলনায় সর্বাপেক্ষা নিস্তেজ ও অসাড়। কেননা স্পর্শ না করা পর্যন্ত কোনো কিছু অনুভব করতে পারে না।

قَوْلُهُ فَقُلْ لَهُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ : এ বাক্যটি مَنْ ضَلَّ -এর جَزَاء আর لَهُ হলো رَابِطَه বা যোগসূত্র-স্থাপক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ : এ শব্দটি وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وَزْعٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الخ : فَزِعَ শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ- অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনর্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। -[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

ইবনে মোবারক (র.) হাসান বসরী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারে মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ : উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত বিহ্বল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনর্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না। -[কুরতুবী]

সাঈদ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গাম্বরগণ আরো উত্তমরূপে এই শ্রেণিভুক্ত। কারণ তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও। -[কুরতুবী]

সূরা যুমারে আছে- وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এখানে فَزِعَ শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ- সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে।

তাঁরা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তাফসীরবিদ فَزَعَ ও صَعِقَ -কে একই অর্থে ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন, তাঁদের মতে শহীদগণ فَزَعَ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন, যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ : উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোনো একদিকে চলমান হয়, তখন তা যতই দ্রুত গতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। যেমন– সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘ সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কালো মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই সাব্যস্ত করেছেন । কিন্তু তাফসীরের সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনো টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। আর تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কুরআন পাকে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা। ইরশাদ হচ্ছে– اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا ও اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

২. পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে– وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ; এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নীচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–
يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

৩. পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মতো একত্র হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا

৪. চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে– قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا

৫. চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে। ইরশাদ হচ্ছে– وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ; তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিংগায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠকে সমতল স্তরের মতো করে দেওয়া হবে। তাতে কোনো গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে– قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا –وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ [কুরতুবী, রূহুল মা'আনী।

قَوْلُهُ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ : صُنْعٌ শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা, শিল্প। أَتْقَنَ শব্দটি إِتْقَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়সবস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং শিঙ্গায় ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোনো সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয়; বরং এগুলোর স্রষ্টা হলেন বিশ্বজাহানের পালনকর্তা।

যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

قَوْلُهُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا : এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা। হযরত কাতাদা (র.)-এর মতে حَسَنَة বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত তথা ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ এবং আজাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ : فزع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভীরু- পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ পালনকর্তার আজাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেই দিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে بَلْدَة বলে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ হচ্ছে মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حَرَّمَ শব্দটি تَحْرِيْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন- কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েজ নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েজ নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়িদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বে-খবর নন। তোমরা মনে করো না যে, তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ পাকের অজানা রয়েছে, তা কখনো নয়; বরং পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দান করবেন, আর তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, এমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন-

اِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ * خَلَوْتُ وَلٰكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيْبٌ ـ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ يَغْفَلُ سَاعَةً * وَلَا اَنَّ مَا يَخْفٰى عَلَيْهِ يَغِيْبُ ـ

অর্থাৎ যখন তুমি কখনো একাকী হও, তখন কিন্তু নিজেকে একা মনে করো না; বরং আল্লাহ পাককে সেখানেও হাজির নাজির জানবে। তিনি ক্ষণিকের জন্যেও তোমাদের ব্যাপারে গাফেল নন, আর কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।
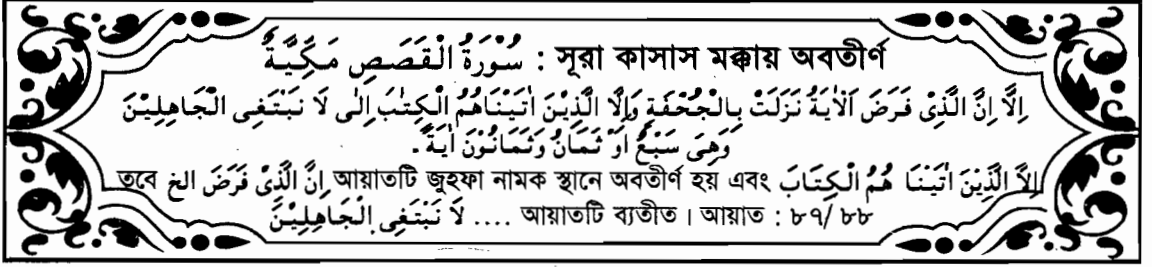
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. طٰسٓمٓ . اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ .

٢. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ اَلْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِيْنِ . اَلْمُظْهِرِ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ .

٣. نَتْلُوْا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ خَبَرِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ . لِاَجْلِهِمْ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهٖ .

٤. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا تَعَظَّمَ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا فِرَقًا فِىْ خِدْمَتِهٖ يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ وَهُوَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ يَسْتَبْقِيْهِنَّ اَحْيَاءً لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهٗ اِنَّ مَوْلُوْدًا يُّوْلَدُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبَ ذَهَابِ مُلْكِكَ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهٖ .

অনুবাদ :

১. ত্বা-সীন-মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

২. এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের اٰيٰتُ الْكِتَابِ -এর মধ্যে ইযাফতটা مِنْ অর্থে তথা اِضَافَت مِنِّيَّة হয়েছে, যা বাতিল থেকে হককে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশকারী।

৩. আমি আপনার নিকট হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। এ কারণে যে, মুমিনরাই এর মাধ্যমে উপকৃত হয়।

৪. ফেরাউন পৃথিবীতে মিশরের ভূমিতে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তার সেবায় তাদের একটি শ্রেণিকে হীনবল করেছিল। তারা ছিল বনী ইসরাঈল সে তাদের পুত্রগণকে হত্যা করত যারা জন্মগ্রহণ করত/সদ্য ভূমিষ্ট এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। তাদের জীবিত রাখত। কারণ কতিপয় গণক এসে ফেরাউনকে বলল যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিবে, যে তোমার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٥. وَنُرِيْدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِىْ بِهِمْ فِى الْخَيْرِ وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ مُلْكَ فِرْعَوْنَ .

৫. আমি ইচ্ছা করলাম সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে أَئِمَّةً শব্দের উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় টি يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা হবে। এবং উত্তরাধিকারী করতে ফেরাউন সাম্রাজ্যের।

٦. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ وَيَرَى بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَرَفْعِ الْأَسْمَاءِ الثَّلٰثَةِ مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ . يَخَافُوْنَ مِنَ الْمَوْلُوْدِ الَّذِىْ يَذْهَبُ مُلْكُهُمْ عَلٰى يَدَيْهِ .

৬. এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে মিশর ও সিরিয়ার ভূমিতে আর ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে। অন্য কেরাতে نُرِىْ -এর পরিবর্তে يَرَى তথা يَاء ও رَاء বর্ণদ্বয় যবরযোগে আর اِسْم তিনটি তথা فِرْعَوْن، هَامَان ও جُنُوْد মারফূ' রূপে পঠিত রয়েছে। যা তাদের নিকট তারা আশঙ্কা করত। তারা ভয় করত সেই শিশুর ব্যাপারে যার হাতে তাদের রাজত্বের পতন ঘটবে।

٧. وَأَوْحَيْنَآ وَحْىَ اِلْهَامٍ أَوْ مَنَامٍ اِلٰى أُمِّ مُوْسٰى وَهُوَ الْمَوْلُوْدُ الْمَذْكُوْرُ وَلَمْ يَشْعُرْ بِوِلَادَتِهِ غَيْرُ أُخْتِهِ أَنْ أَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ الْبَحْرِ أَىِ النِّيْلِ وَلَا تَخَافِىْ غَرَقَهُ وَلَا تَحْزَنِىْ لِفِرَاقِهِ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . فَأَرْضَعَتْهُ ثَلٰثَةَ أَشْهُرٍ لَا يَبْكِىْ وَخَافَتْ عَلَيْهِ فَوَضَعَتْهُ فِىْ تَابُوْتٍ مَطْلِىٍّ بِالْقَارِ مِنْ دَاخِلٍ مُمَهَّدٍ لَهُ فِيْهِ وَأَغْلَقَتْهُ وَأَلْقَتْهُ فِىْ بَحْرِ النِّيْلِ لَيْلًا .

৭. মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম এখানে ওহী দ্বারা ইলহাম কিংবা স্বপ্নে পাওয়া ইঙ্গিত উদ্দেশ্য। এই হলো উল্লিখিত সেই ছেলে; তার জন্ম সম্পর্কে তার বোন ছাড়া আর কেউই জানতে পারেনি। শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন একে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও অর্থাৎ নীলনদে। এবং ভয় করো না ডুবে যাওয়ার এবং দুঃখ করো না তাঁর বিরহে আমি অবশ্যই একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং একে রাসূলগণের একজন করব। হযরত মূসা (আ.)-এর জননী তাকে তিন মাস দুগ্ধ পান করালেন। তিনি কখনো কান্নাকাটি করতেন না। এরপর তাঁর মাতা তাঁর প্রতি শঙ্কাগ্রস্ত হলেন। ফলে তাঁকে আলকাতরা প্রলেপকৃত ও বিছানা সজ্জিত একটি সিন্দুকের ভেতরে রেখে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং রাতের আঁধারে অতি সঙ্গোপনে তা নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন।

অনুবাদ :

٨. فَالْتَقَطَهُ بِالتَّابُوْتِ صَبِيْحَةَ اللَّيْلِ اٰلُ اَعْوَانُ فِرْعَوْنَ فَوَضَعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفُتِحَ وَاُخْرِجَ مُوْسٰى مِنْهُ وَهُوَ يَمُصُّ مِنْ اِبْهَامِهٖ لَبَنًا لِيَكُوْنَ لَهُمْ اَىْ فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ عَدُوًّا لِيَقْتُلَ رِجَالَهُمْ وَّحَزَنًا ط يَسْتَعْبِدَا نِسَاءَهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ الزَّاىِ لُغَتَانِ فِى الْمَصْدَرِ وَهُوَ هُنَا بِمَعْنٰى اِسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ حَزَنَهٗ كَاَحْزَنَهٗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَزِيْرَهٗ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ـ مِنَ الْخَطِيْئَةِ اَىْ عَاصِيْنَ فَعُوْقِبُوْا عَلٰى يَدِهٖ ـ

৮. ফেরাউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল সিন্দুকসহ উক্ত রাতের [পরবর্তী] সকালে। তারা তাকে ফেরাউনের সামনে রেখে খুলল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে সিন্দুক থেকে বের করল। তখন তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে দুধ চুষছিলেন। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। অর্থাৎ শেষ পরিণামে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবেন এবং তাদের নারীদেরকে দাসীতে রূপান্তর করবেন। অপর কেরাতে حَزَنًا শব্দটির حَا، বর্ণে পেশ ও زَا، বর্ণ সাকিনসহ পঠিত। উভয়টিই মাসদার। এখানে এটা اِسْمِ فَاعِلْ অর্থে (س) حَزِنَهٗ হতে নিষ্পন্ন। যা اَحْزَنَهٗ অর্থে। ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী হামান ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী। خَاطِئِيْنَ শব্দটি اَلْخَطِيْئَةُ হতে গঠিত। অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

٩. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ وَقَدْ هَمَّ مَعَ اَعْوَانِهٖ بِقَتْلِهٖ هُوَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوْهُ ق عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا فَاَطَاعُوْهَا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِعَاقِبَةِ اَمْرِهِمْ مَعَهٗ ـ

৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, অথচ তখন ফেরাউন ও তার লোকজন তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। এ আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর হবে। তোমরা একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। সুতরাং তারা তার অনুগত হলো/ তার কথা মেনে নিল। প্রকৃত পক্ষে এর পরিণাম তারা বুঝতে পারেনি।

١٠. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى لَمَّا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِهٖ فٰرِغًا مِمَّا سِوَاهُ اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاِسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهَا كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ اَىْ بِاَنَّهٗ اِبْنُهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا بِالصَّبْرِ اَىْ سَكَّنَّاهُ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَلْمُصَدِّقِيْنَ بِوَعْدِ اللّٰهِ وَجَوَابُ لَوْلَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا ـ

১০. মূসা জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল যখন তিনি ফেরাউন কর্তৃক তাকে উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ জানতে পারলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ছাড়া তার হৃদয়ে অন্য কিছু স্থান পায় না। এমন কি সে তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতই অর্থাৎ সে যে তার পুত্র তা। এখানে اِنْ টি ثَقِيْلَةٌ থেকে خَفِيْفَةٌ বানানো হয়েছে। আর এর ইসিম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِنَّهَا আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে ধৈর্য্য দ্বারা অর্থাৎ যদি তাকে প্রবোধ না দিতাম। যাতে সে আস্থাশীল হয় আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর। لَوْلَا -এর পূর্ববর্তী অংশ তথা لَوْلَا لَتُبْدِىْ -এর জবাব নির্দেশ করেছে।

অনুবাদ :

١١. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ مَرْيَمَ قُصِّيْهِ زِ اتَّبِعِي أَثَرَهُ حَتّٰى تَعْلَمِيْ خَبَرَهُ فَبَصُرَتْ بِهِ اَيْ اَبْصَرَتْهُ عَنْ جُنُبٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ اِخْتِلَاسًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اَنَّهَا اُخْتُهُ وَاَنَّهَا تَرْقُبُهُ .

১১. তার ভগ্নী মারইয়াম-কে বললেন, এর পেছনে পেছনে যাও। তুমি এর অনুসরণ কর যাতে তার সংবাদ জানতে পার। সে তাকে দেখতেছিল দূর হতে অতি সঙ্গোপনে। তাদের অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ সে যে তার ভগ্নী এবং তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা তা জানত না।

١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اَيْ قَبْلَ رَدِّهِ اِلٰى اُمِّهِ اَيْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَبُوْلِ ثَدْيِ مُرْضِعَةٍ غَيْرِ اُمِّهِ فَلَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرَاضِعِ الْمُحْضَرَةِ فَقَالَتْ اُخْتُهُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ لَمَّا رَاَتْ حُنُوَّهُمْ عَلَيْهِ يَّكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ بِالْاِرْضَاعِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ لَهُ نٰصِحُوْنَ . وَفُسِّرَتْ ضَمِيْرُ لَهُ بِالْمَلِكِ جَوَابًا لَهُمْ فَاُجِيْبَتْ فَجَاءَتْ بِاُمِّهِ فَقَبِلَ ثَدْيَهَا وَاَجَابَتْهُمْ عَنْ قَبُوْلِهِ بِاَنَّهَا طَيِّبَةُ الرِّيْحِ طَيِّبَةُ اللَّبَنِ فَاَذِنَ لَهَا بِاِرْضَاعِهِ فِيْ بَيْتِهَا فَرَجَعَتْ بِهِ .

১২. এবং পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীর স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম অর্থাৎ তার মায়ের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ আমি তাকে তার মা ব্যতীত অন্য ধাত্রীর স্তন্যপান হতে বিরত রেখেছিলাম। ফলে সে উপস্থিত অন্য কোনো ধাত্রীর স্তন্য গ্রহণ করেনি। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের কথা বলব এ কথা তখনই বলল, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাদের মায়া-মমতা ও আকর্ষণ লক্ষ্য করল যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে স্তন্য পান ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করবে এবং তারা এর জন্য মঙ্গলকামী হবে لَهُ -এর যমীরটি তাদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ বাদশাহকে বুঝিয়েছে। তার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করা হলে সে তার মাকে নিয়ে এলো। হযরত মূসা (আ.) তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। শিশু তার স্তন্য গ্রহণের কারণ হিসেবে মূসা জননী বললেন যে, তিনি সুঘ্রাণ ও সুপেয় স্তন্যের অধিকারিণী। ফেরাউন তাকে বাড়িতে নিয়ে স্তন্যদানের অনুমতি দিল। ফলে তিনি তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

١٣. كَمَا قَالَ تَعَالٰى فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِهِ وَلَا تَحْزَنَ حِيْنَئِذٍ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِرَدِّهِ اِلَيْهَا حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اَيِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ . بِهٰذَا الْوَعْدِ وَلَا بِاَنَّ هٰذِهِ اُخْتُهُ وَهٰذِهِ اُمُّهُ فَمَكَثَ عِنْدَهَا اِلٰى اَنْ فَطَمَتْهُ وَاَجْرٰى عَلَيْهَا اُجْرَتَهَا لِكُلِّ يَوْمٍ دِيْنَارٌ وَاَخَذَتْهَا لِاَنَّهَا مَالُ حَرْبِيٍّ فَاَتَتْ بِهِ فِرْعَوْنَ فَتَرَبّٰى عِنْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْهُ فِيْ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ .

১৩. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মায়ের নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে সে দুঃখ না করে সে সময় এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাঁকে তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না। এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে। আর এ কথাও জানতে পারেনি যে, সে তার বোন আর দুগ্ধ দানকারিনী তার মা। হযরত মূসা (আ.) দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তার নিকট অবস্থান করলেন। আর ফেরাউন স্তন্যদানের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতিদিনের বিনিময় এক দীনার ভাতা চালু করল। আর মূসার জননী এটা হরবীর সম্পদ হওয়ায় তা গ্রহণ করলেন। স্তন্যদান শেষ হওয়ার পর তিনি তাকে ফেরাউনের নিকট নিয়ে এলেন, তখন থেকে তিনি ফেরাউনের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরাতে এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "তোমাকে কি আমরা শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনি? এবং আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছর অবস্থান করনি?

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ نَتْلُو عَلَيْكَ اَىْ بِوَا سِطَةِ جِبْرَائِيْلَ الخ : مِنْ نَّبَإِ -এর مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيَّة অর্থাৎ نَتْلُوْ عَلَيْكَ بَعْضَ نَبَإِ مُوْسٰى আপনার নিকট মূসার কিছু সংবাদ বর্ণনা করছি। مَفْعُوْل উহ্যও হতে পারে। তখন বাক্যটি এমন হবে نَتْلُوْا عَلَيْكَ شَيْئًا فِيْ مُوْسٰى আর নাহব শাস্ত্রবিদ আখফাশ-এর মতে مِنْ অতিরিক্তও হতে পারে। অর্থাৎ- نَتْلُوْا عَلَيْكَ نَبَأَ مُوْسٰى

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : এটা نَتْلُوْ -এর যমীরের حَالْ অর্থাৎ حَالَ كَوْنِنَا مُتَلَبِّسِيْنَ بِالصِّدْقِ অথবা نَتْلُوْ -এর مَفْعُوْل হলো ذُوالْحَالِ আর এটা তার حَالْ অর্থাৎ বাক্যটি হলো- كَوْنُ الْخَبَرِ مُتَلَبِّسًا

قَوْلُهُ لِاَجْلِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِقَوْمٍ -এর لَامْ টি تَعْلِيْلِيَّة বা কারণজ্ঞাপক। এটা مُتَعَلِّقْ হলো نَتْلُوْ -এর সাথে। অর্থাৎ উল্লেখের মূল লক্ষ্য হলো মুমিনগণ। কারণ তারাই এর দ্বারা উপকৃত হয়।

قَوْلُهُ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا : এটা مُسْتَانِفَه বাক্য। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মূসা ও ফিরআউনের ঘটনাটি কী ছিল? উত্তরে বলা হয়- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا

قَوْلُهُ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ : এ অংশটি يَسْتَضْعِفُ থেকে بَدْل ; لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ এটা يُذَبِّحُ -এর ইল্লত বা কারণ।

قَوْلُهُ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ : এখানে نُمَكِّنَ لَهُمْ বাক্যটি نُسَلِّطَهُمْ অর্থে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কর্তৃত্ব বা রাজত্ব দান করব। আর اَرْض দ্বারা এখানে মিশর ও শামদেশ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ نُرِى فِرْعَوْنَ : এটা এবং এর সকল مَعْطُوْف হলো نُرِى -এর প্রথম مَفْعُوْل আর وَمَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل . جُنُوْدَهُمَا এর মধ্যে اِضَافَتْ টি تَغْلِيْب তথা প্রাধান্যদান স্বরূপ। অর্থাৎ বাহিনী ছিল যদিও ফেরাউনের, কিন্তু হামান ছিল তার মন্ত্রী আর রাজার সৈন্যদেরকে تَغْلِيْب বা প্রাধান্য স্বরূপ তার মন্ত্রীর সৈন্য বলা হয়েছে। তাছাড়া হামানের নিজস্ব কিছু সৈন্য থাকারও সম্ভাবনা আছে। অপর এক কেরাতে يَرٰى রয়েছে। এ সময় তিনোটি শব্দ اِسْم فِعْل হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে।

قَوْلُهُ اِلَى اُمِّ مُوْسٰى:হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইউহানিয ছিল। সা'লাবী সূত্রে কুরতুবীর বর্ণনা মতে তা নাম ছিল লূখা বিনতে হানিফ ইবনে লাবী ইবনে ইয়াকুব। এছাড়া আরো বিভিন্ন মত রয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ اَرْضِعِيْهِ : اَنْ এখানে تَفْسِيْرِيَّة বা مَصْدَرِيَّة যে কোনোটি হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَا تَخَافِىْ غَرْقَهُ : পূর্বে বলা হয়েছিল فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ এখানে বলা হচ্ছে- وَلَا تَخَافِىْ , কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে? এ দ্বন্দ্বটি لَا تَخَافِىْ -এর ব্যাখ্যা غَرْقَه দ্বারা করে নিরসন করা হয়েছে। فَاِذَا خِفْتِ -এর মধ্যে জবাই -এর আশঙ্কা উদ্দেশ্য। আর لَا تَخَافِىْ -এর মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভয়ের نَفِىْ উদ্দেশ্য। অতএব উভয় জায়গায় একই ধরনের আশঙ্কা নেই। সুতরাং দ্বন্দ্বও নেই। اَلْقَارُ হলো আলকাতরা, যা নৌকা ও জাহাজে লাগানো হয়। যাতে নৌকার ভিতরে পানির কোনো আছর বা প্রভাব না পড়ে।

قَوْلُهُ مُمَهَّدٍ : এটা تَابُوْت -এর দ্বিতীয় সিফত। প্রথম সিফত হলো مَطْلِى অর্থাৎ কাঠের বাক্সে আলকাতারা লাগিয়ে দিল, যাতে পানির প্রভাব না পড়ে, এবং তাতে ধুনিত তুলা তথা ছোট তোষক বিছিয়ে দিল যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর কষ্ট না হয়। مُمَهَّدْ অর্থ- বিছানা।

قَوْلُهُ فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, لِيَكُوْنَ -এর لَامْ টি عَاقِبَتْ তথা পরিণামজ্ঞাপক। عِلَّتْ বা কারণজ্ঞাপক নয়। কেননা বাক্স উঠিয়ে নেওয়ার সময় তো পুত্ররূপে বরণ করে নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, যুবক হওয়ার পর তিনি ফেরাউন ও তার পরিবার বা অনুসারীদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ اِنَّ قَارُوْنَ وَهَامَانَ الخ : এ বাক্যটি فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ ; مَعْطُوْف عَلَيْه এবং وَقَالَتِ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ - مَعْطُوْف -এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة -[জুমাল]

قَوْلُهُ قَالَتِ امْرَاةُ فِرْعَوْنَ : ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আছিয়া। [اٰسِيَةُ] বিনতে মুযাহিম ইবনে উবায়দা ইবনে রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ।

قَوْلُهُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ : هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, قُرَّةُ عَيْنٍ হলো উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ

قَوْلُهُ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا الخ : এখানে لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে, لولا -এর পূর্ববর্তী অংশ তথা لَتُبْدِىْ তার প্রতি دَلَالَتْ বা নির্দেশ করছে। বাক্যটি এরূপ ছিল- لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لَاَبْدَتْ اَنَّهُ اِبْنُهَا

قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ : এ বাক্যটি اٰلُ فِرْعَوْن -এর حَالْ

قَوْلُهُ لِاُخْتِهِ مَرْيَمَ : মারইয়াম হলো হযরত মূসা (আ.)-এর সহোদর বোন। কেউ কেউ মারইয়াম -এর স্থলে কুলসূমা বা কুলসুম উল্লেখ করেছেন। তার মায়ের নাম হলো ইউহানিয এবং পিতার নাম ইমরান। তবে এ ইমরান হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী মারইয়ামের পিতা ইমরান নন। উভয় ইমরানের মধ্যে ১৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল। -[জুমাল]

قَوْلُهُ فِىْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُنُبٍ হলো উহ্য مَوْصُوْف -এর صِفَتْ অর্থাৎ عَنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ আর اِخْتِلَاسٌ অর্থ হলো- اِخْتِفَاء বা গোপন থাকা।

قَوْلُهُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ : এখানে حَرَّمْنَا ক্রিয়াটি مَنَعْنَا তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থে। এটা تَحْرِيْم থেকে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে تَحْرِيْم -এর শরয়ী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সহীহ নয়। কারণ শিশুরা শরয়ী বিধি বিধানের মুকাল্লাফ বা দায়নির্ভর নয়। مَرَاضِع শব্দটি مَرْضَعٌ -এর বহুবচন। স্তন্যদান করা যেহেতু নারীদের সাথে খাছ। তাই ة বর্জিত হয়েছে। যেমনটা حَائِضْ -এর মধ্যে হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাসাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহফা [রাবেগ]-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জুহফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ কি! অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

হযরত হাসান বসরী (র.) আতা (র.), তাউস (র.), ইকরামা (র.) বলেছেন, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, এতে একটি আয়াত মদনী রয়েছে। আয়াতটি এই-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ ......لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ

পর্যন্ত এ আয়াত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর হিজরতের সময় 'জুহফা' নামক স্থানে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে এবং জুহফার মধ্যস্থলে। -[রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৪১]

আল্লামা সুয়ূতি (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আহমদ, তাবারানী হযরত মাদীকারব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বললাম, আমাদেরকে এ সূরাটি শুনিয়ে দিন, তখন তিনি বললেন, তোমরা বরং হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে এ সূরা শ্রবণ কর! কেননা স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ সূরা শিখিয়েছেন। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১৩০]

এ সূরায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে কারূনের ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিভাবে দুশমনদের দেশ থেকে বের হয়ে মাদায়েনে পৌঁছলেন, যেখানে আল্লাহ পাকের নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুশমনের কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও

আরামের কি ব্যবস্থা করলেন, এ সূরায় তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। এরপর যখন তিনি পুনরায় মিশরের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত প্রদানে ধন্য করলেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা নামলের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর ঐ সূরার শেষে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপণ করা এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়ত পূর্ববর্তী সূরা নামলে যেভাবে নবী রাসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখিরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তাওহীদের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বিস্তারিতভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল; কিন্তু সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মুজেযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে, ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর মুজেযাসমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ গ্রহণের তাওফীক দান কর"।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ফেরাউন ছিল ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ আর কারূন ছিল ধন-সম্পদের মোহে আত্মাহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিভাবে কলুষিত করে এবং মানুষকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়।

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের সম্মুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি রোগই মানব চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছেন। এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়। এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কুরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কুরআনের অবদান অসামান্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহাফে তাঁর কাহিনী হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্বা-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বলা হয়েছে– وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا; ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুফতি শফী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা ত্বা-হায় উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরি মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা ত্বা-হায় এবং কিছু সূরা কাহাফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে।

قَوْلُهُ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً : এই আয়াতে বিধিলিপির মোকাবিলায় ফেরআউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ তা'আলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনতুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে– আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছে থেকে তার

সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনোরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল। অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ থেকে مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তা-ই।

قَوْلُهُ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিশরের ক্ষমতা দান করবেন। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশঙ্কা করছিল যে, বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা অটুট থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে হামান ছিল ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায় অনাচারে সে ছিল তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিল সিদ্ধহস্ত।

قَوْلُهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার নাম ছিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের أَوْحَيْنَا শব্দটি وحى থেকেই নিষ্পন্ন, তবে এই ওহী নবুওয়তের ওহী নয়, কেননা কোনো স্ত্রীলোক নবী হয়নি।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এ জন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, 'আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম''। সুফীবাদের ভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আর ইলহামের আরেকটি পন্থা হলো সত্য স্বপ্ন, যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পন্থা।

যারা পুণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ইলহাম করেন এবং তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন বা অন্য কোনো পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেন- "শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক''।

শিশু হযরত মূসা (আ.) কখনো কাঁদতেন না : হযরত মূসা (আ.)-তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেন? এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাতেন, কখনো তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়াচড়াও করতেন না। এ বিবরণটি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (র.)।

قَوْلُهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ : আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে একথাও বললেন যে, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা কর, তখন তাকে একটি বাক্সে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়ো না। কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌঁছিয়ে দেব। আমি তাকে শুধু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবো না; বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রাসূল হিসেবেও মনোনীত করব।

আলোচ্য আয়াতের اَلْيَمّ শব্দটি দ্বারা মিশরের নীলনদকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপাতত তুমি তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দাও, এরপর আমি তাকে যথাসময়ে তোমার নিকট পৌঁছে দেব।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : তাফসীরকার আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মিশরে যখন বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তার মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, কিবতীরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করলো এবং

তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে লাগলো। এ অবস্থায় বহুদিন অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা হলো এই, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে বাড়িতে কোনো শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ দেওয়া। এ খবরের ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিশুকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মুসা জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথাসময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে এ অবস্থা, তা তুমি জান, তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাকে কোলে নিল। তখন মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিস্মিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর হযরত মূসা (আ.)-এর মায়া মহব্বত দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। তখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে বলল, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল। অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো; কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্য এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি। এজন্যে আমি বলছি, তোমার পুত্রের হেফাজত করো! এরপর যখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর গৃহ থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন মূসা (আ.)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল, চুলোয় আগুন জ্বলছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মা দেখলেন, এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে এবং শিশু মূসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদিন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগল, তখন তিনি তার পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তার অন্তরে ইলহাম করলেন যে শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। আলোচ্য আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে– وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى অর্থাৎ, আমি মূসা-জননীর নিকট এ প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীলনদে ভাসিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিস্ত্রিকে বাক্স তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, এমন বাক্সের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মূসা জননী মিথ্যা বলেননি। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিস্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেওয়ার জন্যে হাজির হলো। সে কিছু বলতে চাইল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বুঝাতে চাইল; কিন্তু যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিল। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। আর সে তখন পুনরায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সৈন্যদের নিকট হাজির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। অবশেষে লোকেরা তাকে মেরে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো যে যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনো সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বান্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তাকে মূসা (আ.)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌঁছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন তিনি তার অবস্থা গোপন রাখলেন। কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি ইহসান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন। এখানে উল্লেখ্য, যখন বনী ইসরাইলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে যে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো। এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। ফেরাউনের জাতি কিবতীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এ দাবির প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না করার সিদ্ধান্ত ছিল সে বছর হযরত হারূন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছরই হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করে, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর মাতার দেহে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ তা জানতেই পারল না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ কথার ইলহাম করলেন যে, তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা হয়, তখন তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিও। মূসা (আ.)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিশু মূসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়াচড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূসা জননীর আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউনের লোকেরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ফেরাউনের শুধু একটি কন্যাসন্তান ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। ঐ কন্যাসন্তানটিও শ্বেতরোগে আক্রান্ত ছিল, তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ হয়নি। জাদুকররা বলেছিল, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীলনদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোনো প্রাণী এ নীলনদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে শ্বেতরোগগ্রস্ত এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়। ঐদিন ছিল সোমবার। ফেরাউন নীলনদের তীরে তার বসবার স্থান তৈরি করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়ো বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ অসুস্থ কন্যাটিও ছিল। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে আসতে, ক্ষণিকের মধ্যে তার পরিচালকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পারেনি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, যার ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ্ পাক তাঁর রিজিক তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দুধ পান করত, এ নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহমায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালোবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার শ্বেতরোগগ্রস্ত দেহে মালিশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করল। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

এরপর ইরশাদ হচ্ছে– فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ عَدُوًّا وَحَزَنًا

"এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়"।

অর্থাৎ, ভবিষ্যতে হযরত মূসা (আ.) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিল।"

আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিল, যেমন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

দ্বিতীয়ত শিশু মুসাকে তারা নীলনদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীকালে যা হবার তা হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার মতো বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সেই শিশুটিকে আল্লাহ পাক তার বাড়িতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। -[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ২০ - ২১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতংকিত ছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান নিয়েছেন এবং তার বুকের উপর বসে গেছেন। আর নিরাপদে নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছেন। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না- এ ঘটনা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদরিয়া" তকদিরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ২০, পৃ. ২০]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বলল, এটিই সেই শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতংকগ্রস্ত। এটি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের সন্তান, তোমার ভয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ

"আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ যে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি] তাকে হত্যা করো না।"

ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন শিশু মুসাকে দেখেই রাগান্বিত হয়ে বলল, এ শিশুটি এখনো কিভাবে বেঁচে গেছে? তার স্ত্রী আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত নেককার, নবী রাসূলগণের বংশধর, এতিম মিসকিনদের মা, অত্যন্ত বড় দানশীল। ফেরাউন যখন শিশু মুসাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল তখন তিনি বললেন- قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَاتَقْتُلُوْهُ

অর্থাৎ "সে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি], তাকে হত্যা করো না।" ফেরাউন বলল, তোমার নয়নের মণি হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি ফেরাউন এ কথা বলতো যে, যেমন তোমার নয়নের মণি, আমার জন্যও শান্তি ও তৃপ্তির উপরকণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত করতেন।"

আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, শিশুটি আমাকে দিয়ে দাও। এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরো বললেন- عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

অর্থাৎ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।"

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু মূসার (আ.)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরো বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছ, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারবে! বিশেষত আমাদের নিকট লালিত পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

অনুবাদ :

١٤. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَةً أَوْ وَثَلٰثٍ وَاسْتَوٰى اَىْ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا حِكْمَةً وَّعِلْمًا ط فِقْهًا فِى الدِّيْنِ قَبْلَ اَنْ يَبْعَثَ نَبِيًّا وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ.

১৪. যখন হযরত মূসা (আ.) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন আর তা হলো ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর এবং পরিণত বয়স হলো অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছলেন তখন আমি তাকে হিকমত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম দীনের বুঝ, নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে। এভাবে যেমনিভাবে তাকে প্রতিদান দিয়েছি আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি।

١٥. وَدَخَلَ مُوْسٰى الْمَدِيْنَةَ مَدِيْنَةَ فِرْعَوْنَ وَهِىَ مُنْفَ بَعْدَ اَنْ غَابَ عَنْهُ مُدَّةً عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا وَقْتَ الْقَيْلُوْلَةِ فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ اَىْ اِسْرَائِيْلِىٌّ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج اَىْ قِبْطِىٌّ يُسَخِّرُ اِسْرَائِيْلِىٌّ لِيَحْمِلَ اِلٰى مَطْبَخِ فِرْعَوْنَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى خَلِّ سَبِيْلَهُ فَقِيْلَ اِنَّهُ قَالَ لِمُوْسٰى لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَحْمِلَهُ عَلَيْكَ فَوَكَزَهُ مُوْسٰى اَىْ ضَرَبَهُ بِجُمْعِ كَفِّهٖ وَكَانَ شَدِيْدَ الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ فَقَضٰى عَلَيْهِ ز قَتَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُ قَتْلِهٖ وَدَفَنَهُ اَىْ فِى الرَّمَلِ قَالَ هٰذَا اَىْ قَتْلُهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط الْمُهَيِّجِ غَضَبِىْ اِنَّهُ عَدُوٌّ لِابْنِ اٰدَمَ مُّضِلٌّ لَه مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِضْلَالِ.

১৫. তিনি হযরত মূসা (আ.) নগরীতে প্রবেশ করলেন ফেরাউনের শহরে। আর তা হলো 'মুনফ'; দীর্ঘদিন তা থেকে দূরে অবস্থান করার পর যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। দ্বি-প্রহরের আরামের সময় সেথায় তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন; একজন তার নিজের দলের অর্থাৎ ইসরাঈলী এবং অপরজন তার শত্রুদলের অর্থাৎ কিবতী সম্প্রদায়ের। সে ইসরাঈলী ব্যক্তিকে ফেরাউনের রন্ধনশালায় কাঠ বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে। হযরত মূসা (আ.)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কথিত রয়েছে যে, তখন কিবতী হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি তো বরং তোমার উপরে তা চাপানোর ইচ্ছা করছি। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে ঘুষি মারলেন অর্থাৎ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে তাকে আঘাত করলেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন অর্থাৎ তিনি তাকে মেরে ফেললেন অথচ তাকে হত্যা করা তার ইচ্ছা ছিল না এবং তাকে তিনি বালুতে পুঁতে ফেললেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলা শয়তানের কাণ্ড যা আমার ক্রোধকে উত্তেজিতকারী। সে তো প্রকাশ্য শত্রু আদম সন্তানের জন্য ও স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী তাঁকে।

অনুবাদ :

١٦. قَالَ نَادِمًا رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ بِقَتْلِهِ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ أَيِ الْمُتَّصِفُ بِهِمَا أَزَلًا وَأَبَدًا .

১৬. তিনি বললেন লজ্জিত হয়ে হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; তাকে হত্যা করার মাধ্যমে। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ অনাদি অনন্তকাল তিনি এ গুণে গুণান্বিত।

١٧. قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ بِحَقِّ إِنْعَامِكَ عَلَىَّ بِالْمَغْفِرَةِ أَعْصِمْنِىْ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا عَوْنًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ . الْكَافِرِيْنَ بَعْدَ هٰذِهِ إِنْ عَصَمْتَنِىْ .

১৭. তিনি আরো বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমার উপর আপনার ক্ষমার অনুগ্রহের দাবি এই যে, আমি কখনো দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্যকারী হবো না। অর্থাৎ কাফেরদের, আপনি আমাকে রক্ষা করার পর।

١٨. فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ يَنْتَظِرُ مَا يَنَالُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَتِيْلِ فَإِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط يَسْتَغِيْثُ بِهِ عَلٰى قِبْطِىٍّ اٰخَرَ قَالَ لَهُ مُوْسٰىٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ . بَيِّنُ الْغَوَايَةِ لِمَا فَعَلْتَهُ أَمْسِ وَالْيَوْمَ .

১৮. অতঃপর ভীত সতর্কাবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো নিহতের পক্ষ থেকে কি ঘটে, তার অপেক্ষায়। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, আগের দিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে অপর এক কিবতীর বিরুদ্ধে সে তাকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি গতকাল এবং আজ যা করছ তার কারণে।

١٩. فَلَمَّآ أَنْ زَائِدَةٌ أَرَادَ أَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لِمُوْسٰى وَالْمُسْتَغِيْثِ بِهِ قَالَ الْمُسْتَغِيْثُ ظَانًّا أَنَّهُ يَبْطِشُ بِهِ لِمَا قَالَ لَهُ يٰمُوْسٰىٓ أَتُرِيْدُ أَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ق إِنْ مَا تُرِيْدُ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ . فَسَمِعَ الْقِبْطِىُّ ذٰلِكَ فَعَلِمَ أَنَّ الْقَاتِلَ مُوْسٰى فَانْطَلَقَ إِلٰى فِرْعَوْنَ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ . فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ الذَّبَّاحِيْنَ بِقَتْلِ مُوْسٰى فَأَخَذُوا الطَّرِيْقَ إِلَيْهِ .

১৯. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ও সাহায্যপ্রার্থীর শত্রুকে। সে বলল সাহায্যপ্রার্থী, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তিনি তাকেই ধরে ফেলবেন, যেহেতু একটু পূর্বেই তাকে কটুকথা বলেছেন। হে মূসা গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না। কিবতী এটা শুনে জানতে পারল যে, গতকালের হত্যাকারী হযরত মূসা (আ.)-ই। কাজেই সে দ্রুত ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এ মর্মে তাকে অবহিত করল। এটা শুনে ফেরাউন তৎক্ষণাৎ জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে দিল। তারা তাকে আটক করার জন্য রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল।

অনুবাদ :

٢٠. قَالَ تَعَالٰى وَجَاۤءَ رَجُلٌ هُوَ مُؤْمِنُ اٰلِ فِرْعَوْنَ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ اٰخِرِهَا يَسْعٰى ز يُسْرِعُ فِىْ مَشْيِهِ مِنْ طَرِيْقٍ اَقْرَبَ مِنْ طَرِيْقِهِمْ قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ يَتَشَاوَرُوْنَ فِيْكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ فِى الْاَمْرِ بِالْخُرُوْجِ -

২০. আল্লাহ তা'আলা বলেন– এক ব্যক্তি আসল সে ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক মুমিন ব্যক্তি শহরের দূর প্রান্ত হতে শেষ প্রান্ত হতে ছুটে দ্রুত বেগে জল্লাদের রাস্তার তুলনায় নিকটবর্তী এক রাস্তা ধরে। সে বলল, হে মূসা! ফেরাউনের পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বের হয়ে যান শহর থেকে আমি তো আপনার মঙ্গলকামী। বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দানে।

٢١. فَخَرَجَ مِنْهَا خَاۤئِفًا يَّتَرَقَّبُ لُحُوْقَ طَالِبٍ اَوْ غَوْثَ اللّٰهِ اِيَّاهُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ -

২১. তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় তথা হতে বেরিয়ে পড়লেন কোনো অনুসন্ধানকারীর সাক্ষাতের ভয়ে অথবা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকামী হয়ে তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاسْتَوٰى : মুসান্নিফ (র.) এর ব্যাখ্যা করেছেন– اَىْ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলেন। বস্তুত এর ব্যাখ্যা– اِنْتَهٰى شَبَابُهُ وَتَكَامَلَ عَقْلُهُ দ্বারা করলে তা আরো সমীচীন হতো। কেননা ১০ বছর মাদায়েনে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর খেদমত করার পর হযরত মূসা (আ.) মিশর চলে আসেন। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বয়স হয়েছিল তখন ৪০ বছর। অর্থাৎ মূসা (আ.) মিশরে ৩০ বছর অবস্থান করেন। যদি তিনি মিশরে ৪০ বছর ছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া হয়, যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন তাহলে মাদায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত মূসা (আ.)-এর বয়স হওয়া উচিত ছিল ৫০ বছর। অথচ তা উল্লিখিত কথার পরিপন্থি।

قَوْلُهُ مُنْفُ : ফেরআউন যে নগরীতে থাকত এটা উক্ত নগরীর নাম। এটা عَلَمِيَّتْ ও عُجْمَةَ -এর কারণে কিংবা عَلَمِيَّتْ ও تَانِيْث -এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفْ ; এটাকে مَنُوْف শহরও বলা হয়।

قَوْلُهُ فَقَضٰى عَلَيْهِ : এটা اَوْقَعَ الْقَضَاءَ অর্থে হওয়ার কারণে عَلٰى -এর সাহায্যে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : হযরত মূসা (আ.) শরিয়ত বিরোধী এ হত্যা কিভাবে করলেন যে, হত্যাযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তিকে মেরে ফেললেন?

উত্তর : এটা قَتْل عَمْد [স্বেচ্ছায় হত্যা] নয়; বরং এটা ছিল قَتْل خَطَا [ভুলবশত হত্যা]। আর হত্যার কারণে তার ক্ষমা প্রার্থনা করাটা حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ [তথা সাধারণ নেককারদের অনেক ভালো কাজ আল্লাহর নৈকট্যভাজনদের জন্য পাপরূপে বিবেচিত] -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ هٰذَا اَىْ قَتْلُهُ : هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ বলে اَىْ قَتْلُهُ -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এর দ্বারা হত্যাক্রিয়া উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য স্থির করেছেন নিহত ব্যক্তির ক্রিয়াকে। অর্থাৎ নিহত লোকটির ক্রিয়া অর্থাৎ ইসরাইলীকে বাধ্য করাটা শয়তানী কাজ তথা অন্যায় ছিল এবং সাজাযোগ্য অপরাধ ছিল।

আবার কেউ কেউ স্বয়ং কিবতীকেই এর مُشَارٌ اِلَيْهِ বলেছেন। অর্থাৎ কিবতী নিজেই শয়তানের বাহিনী ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের সদস্য ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-এর اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ বলা নিজ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ স্বরূপ ছিল।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ عَلَىَّ : মুসান্নিফ (র.) بِمَآ اَنْعَمْتَ -এর ব্যাখ্যা بِحَقِّ اِنْعَامِكَ দ্বারা করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা- ১. بِمَا -এর مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ اَنْعَمْتَ ক্রিয়াটি اِنْعَامِكَ অর্থে, আর বাক্যে বিলুপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ ২. اَعْصِمْنِىْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, جَارْ مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقْ হয়েছে اَعْصِمْنِىْ -এর সাথে। বাক্যটি এরূপ হবে- اَعْصِمْنِىْ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ عَلَىَّ بِالْمَغْفِرَةِ

قَوْلُهُ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ : এ বাক্যটি উহ্য شَرْط -এর جَوَابْ ; বাক্যটি এরূপ হবে- اِنْ عَصَمْتَنِىْ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

قَوْلُهُ بَعْدَ هٰذِهٖ اَىْ بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ : মুসান্নিফ (র.)-এর مُجْرِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা كَافِرِيْنَ দ্বারা করাটা সমীচীন হয়নি। কেননা এ ব্যাখ্যা মোতাবেক ইসরাঈলী লোকটি কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ব্যাখ্যা না করে স্বঅবস্থায় রাখাই উচিত ছিল'। -[জুমাল]

قَوْلُهُ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ : এখানে مَدِيْنَة দ্বারা সে শহর উদ্দেশ্য যেখানে قِبْطِىْ নিহত হয়েছিল।

قَوْلُهُ خَآئِفًا : এটা اَصْبَحَ -এর خَبَرْ আর فِى الْمَدِيْنَةِ হলো তার مُتَعَلِّقْ; يَتَرَقَّبُ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَلْخَبَرَ অথবা اَلْفَرَجَ অথবা يَتَرَقَّبُ الْمَكْرُوْهَ

قَوْلُهُ اِذَا الَّذِىْ : এখানে اِذَا টি مُفَاجَاتِيَه বা আকস্মিকতাজ্ঞাপক। اَلَّذِىْ. مَوْصُوْل আর اِسْتَنْصَرَهٗ হলো صِلَة উভয়টি মিলে উহ্য اَلْاِسْرَائِيْلِىُّ. مَوْصُوْف -এর صِفَتْ অতঃপর مَوْصُوْف. صِفَتْ মিলে مُبْتَدَأ এবং يَسْتَصْرِخُهٗ হলো خَبَرْ এখানে بِالْاَمْسِ মুতা'আল্লিক হলো اِسْتَنْصَرَهٗ -এর সাথে। বাক্যটি এরূপ ছিল- اِذَا الْاِسْرَائِيْلِىُّ الَّذِىْ اِسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ

قَوْلُهُ يَسْعٰى : এটা رَجُلٌ -এর صِفَتْ আর يَسْعٰى. رَجُلٌ -এর حَالْ -ও হতে পারে। কেননা رَجُلٌ শব্দটি مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ -এর সাথে مُتَّصِفْ বা গুণান্বিত হওয়ায় مَعْرِفَة হয়েছে। এ হিসেবে ذُوالْحَالِ হওয়া সঙ্গত হয়েছে। اَلْمَلَاَ হলো اِسْم جِنْس - ভদ্র ও সুসভ্য দল, নেতৃবর্গ يَاْتَمِرُوْنَ ক্রিয়াটি اِئْتِمَارٌ থেকে গঠিত। অর্থ- পরামর্শ করা, اِيَّاهُ যমীর مُوْسٰى -এর প্রতি ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.) এর জন্ম, তাঁর নিরাপত্তার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা এবং দুশনের গৃহে তাঁর লালন-পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে তাঁর যৌবনের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

اَشُدَّ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি- সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে যখন তাঁর অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اَشُدَّ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারো এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারো দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে اَشُدَّ -এর জমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে

দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে إِسْتَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, أَشُدَّ তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا : حُكْم বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং عِلْم বলে বিধি বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مَدِيْنَةٌ বলে মিশর নগরী বুঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) মিশরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সত্যধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারী দল বলা হতো। مِنْ شِيْعَتِهٖ শব্দটি এরই সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্যধর্মের কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর হযরত মূসা (আ.) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিশর নগরীতে আগমন করতেন। عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে দ্বি-প্রহর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى : وَكْز শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضٰى عَلَيْهِ : বাক পদ্ধতিতে قَضَاءٌ ও قَضٰى عَلَيْهِ তখন বলা হয় যখন কারো ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَلَهٗ : এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থি এবং তাঁর পয়গাম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমাও করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরিয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা সে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তার কোনো চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.) একে 'শয়তানের কাজ ও গুনাহ' কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত ছওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোনো সময় লিখিত হয় এবং কোনো সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তির স্বরূপ : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী شُرُوْط অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফেরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ আবূ দাউদের রেওয়াতের এর ভাষ্য এরূপ- أَمَّا الْمَالُ فَمَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান। কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা একসাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরজ, সে কাফের হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফেরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছে থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফেরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। বুখারীর টীকাকার আল্লামা কুস্তল্লানী (র.) বলেন-

إِنَّ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنْ كَانَتْ مَغْنُوْمَةً عِنْدَ الْقَهْرِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا عِنْدَ الْأَمْنِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُصَاحِبًا لَهُمْ فَقَدْ أَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَأَخَذَ الْمَالَ مَعَ ذٰلِكَ غَدْرٌ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلٰى سَوَاءٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফেরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোনো কাফেরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে তার অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েজ হতো না; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরো কম মাত্রার প্রহারই যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েজ ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

কোনো তাফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গাম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গুনাহ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ : হযরত মূসা (আ.)-এর বিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরজ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ স্থলে مُجْرِمِيْنَ [অপরাধী] -এর তাফসীরে كَافِرِيْنَ [কাফের] বর্ণিত আছে। কাতাদা (র.)-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তাফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তি থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা প্রমাণিত হয়-

১. মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। ২. কোনো জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার অধীনে চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। -[রূহুল মা'আনী]

কাফের অথবা জালিমদের সাহায্য-সযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। মুফতি শফী (র.) আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কুরআন'-এ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জানান্বেষী বিজ্ঞজন তা দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ : কিবতী ব্যক্তির হত্যার ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিশোধ নিতে পারে, এ আশঙ্কা অতি স্বাভাবিক। বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের নিকট নিহত কিবতীর উত্তরাধিকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। এমনি অবস্থায় তাঁর ভীত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ফেরাউনের নিকট অনেক লোক হাজির হয়ে বলল, বনী ইসরাঈলরা আমাদের একজনকে হত্যা করেছে। আমরা এ হত্যার বিচার চাই। ফেরাউন বলল, ঘাতকের অনুসন্ধান কর এবং হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ কর, এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। লোকেরা তখন ঘাতকের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল।

قَوْلُهُ فَاِذَا الَّذِىْ اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ الخ : এমনি অবস্থায় পরদিন আরেকটি ঘটনা ঘটে। তিনি দেখতে পান, গতকাল যার সাহায্যে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি আজ আরেক কিবতীর সঙ্গে লড়াই রত রয়েছে এবং গতকালের ন্যায় আজও সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য কামনা করলো।

হযরত মূসা (আ.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমিই সকল নষ্টের মূল, তা না হলে প্রতিদিন শুধু তোমার সঙ্গেই কেন মানুষের ঝগড়া হয়? হযরত মূসা (আ.) গতকালের ঘটনার নিজেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। কেননা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর হাতে একজন কিবতী নিহত হয়েছে। আর ঐ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল এ বনী ইসরাঈলী ব্যক্তিটি, আজ সে পুনরায় অপর এক কিবতীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছে, তাই মূসা (আ.) তাকে বললেন– اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট, তুমিই সকল নষ্টের মূল কারণ। একথা বলে যখন তিনি অত্যাচারী কিবতী লোকটিকে প্রহার করার জন্যে হাত তুলতে ইচ্ছা করলেন তখন ইসরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করছিল, তিনি ধমক যখন আমাকে দিয়েছেন, হয়তো আমাকেই তিনি প্রহার করতে চান, তাই 'সে বলল, হে মূসা! আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান? যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, আপনি দেখি দেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে চান, আপনি শান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী নন। ইসারাঈলী ব্যক্তিটি একথা বলে গতকালের ঘটনা প্রকাশ করে দেয় এবং গতকালের ঘাতকের সন্ধান দেয়। অথচ হযরত মূসা (আ.) চেয়েছিলেন তাকে সাহায্য করতে এবং জালেম কিবতীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে; কিন্তু সে ভুল বুঝে এ মন্তব্য করে বসে। এরপর যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর হাতেই কিবতীর নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে। দাবানলের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ফেরাউনের গোচরীভূত হয়। এদিকে ফেরাউনের পরিষদবর্গ ফেরাউনকে এ পরামর্শ দেয় যে, মূসার দুঃসাহস উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, এমনকি আজ রাজার জাতির বিরুদ্ধে হাত তুলতে এবং তাদেরকে হত্যা করতেও তার বাঁধেনি। অতএব, তার কঠোর শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড একান্ত জরুরি। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তাকে ধরে আনার জন্য লোকও প্রেরিত হয়। এদিকে ফেরাউনের দরবারেই এক ব্যক্তির মন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সহমর্মিতায় এবং তাঁর কল্যাণ কামানায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে, সে অনতিবিলম্বে সকলের অলক্ষ্যে ছুটে আসে এবং হযরত মূসা (আ)-কে অতিসত্বর শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তাফসীরকারগণ তাঁর নামোল্লেখ করেছেন হাজঈল। ফেরাউনের জাতির মধ্যে এ ব্যক্তি ছিলো মুমিন। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন শামউন। আর কেউ বলেছেন সামআ।

তাঁর অন্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ছিল গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি এবং মহব্বত, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মূসা রাজার পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, তুমি [এ মুহূর্তে] নগর থেকে বাইরে চলে যাও, নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রাখ যে, আমি তোমার একান্ত কল্যাণকামী। আর এজন্যেই আমি তোমাকে সতর্ক করার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) ঐ ব্যক্তির পরামর্শ মোতাবেক অনতিবিলম্বে মিশর ছেড়ে যান। তিনি তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আর এ আশঙ্কা করছিলেন যে, ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন; যে ব্যক্তিটি হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করার জন্যে এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হিজকীল, আর কেউ বলেছেন, শামউন ইবনে ইসহাক। আর তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাতো ভাই। একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৫৮]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ফেরাউনের লোকেরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু ধাওয়া করল, এ ব্যক্তিও হয়তো কিছুটা আগে ঐ একই পরামর্শ সভা থেকে বের হয়ে আসে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে পেল না, অথচ তিনি কি করে পেলেন?

ইমাম তাবারী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় দিন যে কিবতী লোকটির সঙ্গে ইসরাঈলী ব্যক্তির সংঘর্ষ চলছিল, যখন সে ইসরাঈলী ব্যক্তি থেকে একথা শ্রবণ করে যে, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছো? তখনই সে দ্রুতবেগে ফেরাউনের দরবারে এসে বলল, গতকালের ঘাতকের সন্ধান পেয়েছি, সে হলো মূসা। তখন ফেরাউন তার জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করল, তারা রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হলো, তারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তারা অনায়াসে পালন করতে পারবে।

কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর হিতাকাংখী ঐ ব্যক্তি রাজপথ দিয়ে নয়; বরং ছোট ছোট গলি দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তাদের পূর্বেই হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যান। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ৩৩]

ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রথম দিনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাক ক্ষমাও করেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলেন যে– رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! যেহেতু তুমি আমাকে নিয়ামত দান করেছো, তাই আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

এ শপথের সময় হযরত মূসা (আ.) 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, আর এ কারণেই পরদিন সকালে তিনি পুনরায় একই বিপদে পড়েছেন এবং তিনি তাঁর সংকল্পে স্থির থাকতে পারেননি।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন : আলোচ্য ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ -এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের জল্লাদরা হত্যা করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে মক্কার দুরাত্মা কাফেররা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও হত্যা করার অপচেষ্টা করবে। আর যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মূসা (আ.)-কে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনী ষড়যন্ত্রগুলোকে বানচাল করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে মক্কার কাফেরদের সকল চক্রান্তকেও তিনি নস্যাৎ করে দেবেন এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও হেফাজত করবেন। আর অবেশেষে তা-ই হয়েছিল।

অনুবাদ :

২২. وَلَمَّا تَوَجَّهَ قَصَدَ بِوَجْهِهِ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ جِهَتَهَا وَهِيَ قَرْيَةُ شُعَيْبٍ مَسِيْرَةَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ مِصْرَ سُمِّيَتْ بِمَدْيَنَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ طَرِيْقَهَا قَالَ عَسٰى رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ . أَيْ قَصْدَ الطَّرِيْقِ أَيِ الطَّرِيْقِ الْوَسَطِ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ اللّٰهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِيَدِهِ عَنَزَةٌ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَيْهَا .

২২. যখন হযরত মূসা (আ.) মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করলেন স্বীয় মুখমণ্ডলকে মাদায়েন অভিমুখী করার সংকল্প করলেন। আর তা হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গ্রাম, মিশর থেকে আট দিনের দূরত্বের পথ। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম -এর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে, আর তিনি এর রাস্তাও চিনতেন না। তখন তিনি বললেন, আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ মাদায়েন গমনের সোজা রাস্তা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন, তার হাতে ছিল একটি বর্শা। উক্ত ফেরেশতা তাকে মাদায়েন নিয়ে গেলেন।

২৩. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ بِئْرٍ فِيْهَا أَيْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً جَمَاعَةً كَثِيْرَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز مَوَاشِيَهُمْ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ أَيْ سِوَاهُمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدَانِ ج تَمْنَعَانِ أَغْنَامَهُمَا عَنِ الْمَاءِ قَالَ مُوْسٰى لَهُمَا مَا خَطْبُكُمَا أَيْ شَأْنُكُمَا لَا تَسْقِيَانِ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ سكته جَمْعُ رَاعٍ أَيْ يَرْجِعُوْا مِنْ سَقْيِهِمْ خَوْفَ الزِّحَامِ فَنَسْقِيْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُصْدِرُ مِنَ الرُّبَاعِيْ أَيْ يُصْرِفُوْا مَوَاشِيَهُمْ عَنِ الْمَاءِ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْقِيَ .

২৩. যখন তিনি মাদায়েনের কূপের নিকট পৌঁছলেন, তখন দেখলেন একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে তাদের ব্যতীত দু'জন নারীকে তাদের পশুগুলো আগলিয়ে রাখছে পানি থেকে বিরত রাখছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান করাচ্ছ না? তারা বলল, আমরা আমাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো নিয়ে সরে না যায়। اَلرِّعَاءُ শব্দটি رَاعٍ -এর বহুবচন। অর্থ– রাখাল। অর্থাৎ পান করানো শেষে চলে যায়। ভীড়ের আশঙ্কায়। তারপর আমরা পান করাব। অপর এক কেরাতে يُصْدِرُ তথা رُبَاعِيْ হতে রয়েছে। অর্থাৎ, পানি হতে তাদের পশুগুলোকে যতক্ষণ ফিরিয়ে না নেয়। আর আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ তিনি এগুলোকে পানি পান করাতে সক্ষম নন।

অনুবাদ :

٢٤. فَسَقٰى لَهُمَا مِنْ بِئْرٍ اُخْرٰى بِقُرْبِهَا رَفَعَ حَجَرًا عَنْهَا لَا يَرْفَعُهُ اِلَّا عَشَرَةُ اَنْفُسٍ ثُمَّ تَوَلّٰى اِنْصَرَفَ اِلَى الظِّلِّ سَمُرَةٍ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الشَّمْسِ وَهُوَ جَائِعٌ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ طَعَامٍ فَقِيْرٌ ـ مُحْتَاجٌ فَرَجَعَتَا اِلٰى اَبِيْهِمَا فِىْ زَمَنٍ اَقَلَّ مِمَّا كَانَتَا تَرْجِعَانِ فِيْهِ فَسَاَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَتَاهُ بِمَنْ سَقٰى لَهُمَا فَقَالَ لِاِحْدٰهُمَا اُدْعِيْهِ لِىْ ـ

২৪. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন নিকটস্থ অপর একটি কূপ থেকে তিনি একাই সে কূপের মুখের পাথর সরিয়ে ফেললেন, যা দশজন ব্যতীত সরানো সম্ভব ছিল না, এরপর ছায়ার নিচে আশ্রয় নিলেন ফিরে গেলেন, বাবুল বৃক্ষের নিচে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে। আর তখন তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন আমি তার কাঙ্গাল। মুখাপেক্ষী। এরপর নারীদ্বয় উভয়েই তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলেন। প্রাত্যহিক ফিরে যাওয়ার সময়ের পূর্বেই ফিরে গেলেন। ফলে তাদের পিতা তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা উভয়ে যিনি তাদেরকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার সম্পর্কে বললেন। তখন তিনি তাদের একজনকে বললেন, তাঁকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো!

٢٥. قَالَ تَعَالٰى فَجَاۤءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاۤءٍ ز اَىْ وَاضِعَةً كُمَّ دِرْعِهَا عَلٰى وَجْهِهَا حَيَاءً مِنْهُ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَاَجَابَهَا مُنْكِرًا فِىْ نَفْسِهٖ اَخْذَ الْاُجْرَةِ وَكَاَنَّهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاةَ اِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرِيْدُهَا فَمَشَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَتِ الرِّيْحُ تَضْرِبُ ثَوْبَهَا فَتَكْشِفُ سَاقَهَا فَقَالَ لَهَا اِمْشِىْ خَلْفِىْ وَدُلِّيْنِىْ عَلَى الطَّرِيْقِ فَفَعَلَتْ اِلٰى اَنْ جَاۤءَ اَبَاهَا وَهُوَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

২৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তখন নারীদ্বয়ের একজন লাজুক চরণে অর্থাৎ তার প্রতি লজ্জায় ওড়নার আঁচল মুখের উপর অবনমিত করে তার নিকট এসে বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক গ্রহণকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার আহবানে সাড়া দিলেন। যেন সেই মহিলার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক কামনা করলে তাঁকে তা প্রদান করার। এরপর সে হযরত মূসা (আ.)-এর অগ্রে চলতে লাগল। এ সময় বাতাসে তার কাপড় উড়ানোর ফলে তার পায়ে গোছা প্রকাশ পেয়ে যেতে লাগল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে চলো এবং পেছন থেকে আমাকে রাস্তা বলে দিতে থাকো। সে তা-ই করল। এভাবে মূসা (আ.) মহিলার পিতা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট পৌছলেন।

وَعِنْدَهُ عَشَاءٌ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَتَعَشَّ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَّكُوْنَ عِوَضًا مِمَّا سَقَيْتُ لَهُمَا وَأَنَا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَطْلُبُ عَلٰى عَمَلٍ خَيْرٍ عِوَضًا قَالَ لَا عَادَتِيْ وَعَادَةُ اٰبَائِيْ نَقْرِي الضَّيْفَ وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ فَأَكَلَ وَأَخْبَرَهُ بِحَالِهِ قَالَ تَعَالٰى فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَقْصُوْصِ مِنْ قَتْلِهِ الْقِبْطِيَّ وَقَصْدِهِمْ قَتْلَهُ وَخَوْفِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - إِذْ لَا سُلْطَانَ لِفِرْعَوْنَ عَلٰى مَدْيَنَ -

অনুবাদ :

তখন তাঁর নিকট রাতের খাবার প্রস্তুত ছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে বললেন, এসো, বসো। খাবারে অংশগ্রহণ কর। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ খাবার আমি যে পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছি তার পারিশ্রমিক না হয়ে যায়। কেননা আমি এমন পরিবারের মানুষ যে, নেক কাজের বিনিময়ে আমরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করি না। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, না এমনটি নয়; বরং এটা আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত রীতি হচ্ছে এই– আমরা অতিথিদের আতিথেয়তা করে থাকি। তাদেরকে আহার করাই। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) খাবার নিলেন এবং তার নিকট নিজের সকল বৃত্তান্ত খুলে বললেন। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন হযরত মূসা (আ.) তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন اَلْقَصَصُ শব্দটি মাসদার; এটা اَلْمَقْصُوْصُ বা ঘটিত বিষয় অর্থে। অর্থাৎ কিবতী তার নিকট নিহত হওয়া, তাদের কর্তৃক তাকে হত্যা করার সঙ্কল্প এবং ফেরাউনের ভয়ে পলায়নের কাহিনী। তখন হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ। কেননা মাদায়েনে ফেরাউনের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

٢٦. قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا وَهِيَ الْمُرْسَلَةُ الْكُبْرٰى أَوِ الصُّغْرٰى يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز اتَّخِذْهُ أَجِيْرًا يَرْعٰى غَنَمَنَا أَيْ بَدَلَنَا إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ أَيْ اسْتَأْجِرْهُ لِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُمَا فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَفْعِهِ حَجَرَ الْبِئْرِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَهَا امْشِيْ خَلْفِيْ وَزِيَادَةٍ أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْهُ وَعَلِمَ بِهَا صَوَّبَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ فَرَغِبَ فِيْ إِنْكَاحِهِ -

২৬. তাদের একজন বলল, সে হলো হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে আনার জন্য প্রেরিত জন ছোটজন বা বড়জন, হে পিতা! আপনি তাঁকে মজুর নিযুক্ত করুন অর্থাৎ তাকে মজুর হিসেবে রাখুন, তিনি আমাদের পরিবর্তে আমাদের ছাগলগুলো ছড়াবেন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। অর্থাৎ তার শক্তি ও আমানতদারীর কারণে তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। হযরত শুয়াইব (আ.) তখন কন্যার নিকট এ দু ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, সে পূর্বে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বিষয়ে তাঁকে অবহিত করল। যেমন– হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক কূপের পাথর সরিয়ে ফেলা এবং "তুমি আমার পেছনে হাঁট" উক্তিটি। উপরন্তু সে যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসেছিল, আর তিনি তার ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি যে মস্তকাবনত করেছিলেন তারপর থেকে তিনি তার প্রতি মাথা উত্তোলন করেননি। এতদ শ্রবণে হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর নিকট কন্যা বিবাহদানের প্রতি আগ্রাহান্বিত হলেন।

অনুবাদ :

٢٧. قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ وَهِيَ الْكُبْرٰى أَوِ الصُّغْرٰى عَلٰى أَنْ تَأْجُرَنِيْ تَكُوْنُ أَجِيْرًا لِيْ فِيْ رَعْيِ غَنَمِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج أَيْ سِنِيْنَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا أَيْ رَعْيَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَمِنْ عِنْدِكَ ج التَّمَامُ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط بِاشْتِرَاطِ الْعَشْرِ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لِلتَّبَرُّكِ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ الْوَافِيْنَ بِالْعَهْدِ .

২৭. তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই। সে হলো বড়জন বা ছোট জন। এ শর্তে যে, তুমি আমার কাজ করবে। অর্থাৎ তুমি আমার বকরি চড়ানোর মজুর হবে আট বৎসর; যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর অর্থাৎ দশবছর চড়ানো সে তোমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না দশ বৎসরের শর্তারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। অর্থাৎ অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের অন্তর্গত। এখানে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ মূলত বরকত হাছিলের জন্য বলা হয়েছে।

٢٨. قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ الَّذِيْ قُلْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ الثَّمَانَ أَوِ الْعَشْرَ وَمَا زَائِدَةٌ أَيْ رَعْيَهُ قَضَيْتُ بِهِ أَيْ فَرَغْتُ عَنْهُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ أَنَا وَأَنْتَ وَكِيْلٌ . حَفِيْظٌ أَوْ شَهِيْدٌ فَتَمَّ الْعَقْدُ بِذٰلِكَ وَأَمَرَ شُعَيْبٌ اِبْنَتَهُ أَنْ تُعْطِيَ مُوْسٰى عَصًا يَدْفَعُ بِهَا السِّبَاعَ مِنْ غَنَمِهِ وَكَانَتْ عِصِيُّ الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَهُ فَوَقَعَ فِيْ يَدِهَا عَصَا اٰدَمَ مِنْ اٰسِ الْجَنَّةِ فَأَخَذَهَا مُوْسٰى بِعِلْمِ شُعَيْبٍ .

২৮. হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা অর্থাৎ যা আপনি বললেন আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি রইল অর্থাৎ আট বা দশ বৎসর। আর أَيَّمَا -এর مَا টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদ চরানো। এই দুই মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার উপর কোনো অভিযোগ থাকবে না তার চেয়ে অতিরিক্তের ব্যাপারে। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আমি ও আপনি আল্লাহ তার সাক্ষী। রক্ষক বা সাক্ষী। এ ব্যাপারে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেল। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে নির্দেশ দিলেন হযরত মূসা (আ.) কে একটি লাঠি প্রদান করতে, যার দ্বারা তিনি তাঁর ছাগপালের উপর হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করবেন। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট নবীগণের লাঠি সুরক্ষিত ছিল। তার হাত হযরত আদম (আ.)-এর বেহেশতের মাওরো বৃক্ষের ডালের যে লাঠি ছিল তার উপর পতিত হলো। হযরত মূসা (আ.) তা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অবগতির সাথে গ্রহণ করলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سَوَاءَ السَّبِيْلِ : এখানে اِضَافَتُ الصِّفَتِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ ঘটেছে। অর্থাৎ اَلطَّرِيْقُ الْوَسْطُ আর سَوَاءَ السَّبِيْلِ এর ব্যাখ্যা করেছেন قَصْدُ السَّبِيْلِ দ্বারা, এটা এ কথা বুঝানোর জন্য যে, اِضَافَتُ الْمَوْصُوْفِ হিসেবে قَصْدُ السَّبِيْلِ এর ব্যাখ্যা হয়- اَلطَّرِيْقُ الْوَسْطُ এর ব্যাখ্যা হয়- اَلطَّرِيْقُ

قَوْلُهُ عَنَزَة : عَنَزَه অর্থ ছড়ি; যা عَصَا থেকে বড় ও বর্শা থেকে ছোট। এর নিচের মাথায় লোহার ফলক থাকে।

قَوْلُهُ مَاءَ مَدْيَنَ : এর ব্যাখ্যা بِئْر দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে حَالٌ বলে مَحَلٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পানি দ্বারা পানির স্থান উদ্দেশ্য। আর بِئْر-এর পূর্বে هُوَ مُبْتَدَأ উহ্য রয়েছে। بِئْرٌ হলো তার خَبَرٌ অর্থাৎ- هُوَ بِئْرٌ كَائِنٌ فِيْهَا

قَوْلُهُ اُمَّةً : এর ব্যাখ্যা جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তানভীনটি تَكْثِيْر বা আধিক্যজ্ঞাপক।

قَوْلُهُ تَذُوْدَانِ : এটা اِمْرَأَتَيْنِ-এর সিফাত। وَجَدَ-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل নয়। কেননা وَجَدَ এখানে لَقِىَ অর্থে

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত ক্রিয়া চতুষ্ঠয়ের مَفْعُوْل-গুলোকে বিলোপ করা হয়েছে কেন? يَسْقُوْنَ، تَذُوْدَانِ، لَا نَسْقِىْ এবং يُصْدِرُ الرِّعَاءُ

উত্তর : যেহেতু فِعْل-ই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে مَفْعُوْل নয়, এ কারণে চারোটি ফে'লের مَفْعُوْل-কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ : এটা فَاعِلْ অথবা مَفْعُوْل হয়েছে। অর্থাৎ مَشْرُوْطًا عَلٰى বা عَلَيْكَ ذَالِكَ

قَوْلُهُ التَّمَامُ : এটা উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ عِنْدِكَ যে, مِنْ عِنْدِكَ উহ্য مُبْتَدَأ-এর خَبَرْ

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এটা مُبْتَدَأ আর بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ হলো خَبَرْ

قَوْلُهُ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ : اَىْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর مَا অতিরিক্ত , فَلَا عُدْوَانَ হলো جَوَابُ شَرْط

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ : শামদেশের একটি শহরের নাম মাদায়েন। মাদয়েন ইবনে ইবরামীম (আ.)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিশর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশঙ্কাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনোটিরই পরিপন্থি নয়। মাদায়েনের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদায়েনেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। হযরত মূসা (আ.)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন- عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দোয়া কবুল করলেন। তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ছিল হযরত মূসা (আ.) -এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা।

قَوْلُهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ : مَاءَ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَوْلُهُ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ .... وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ : خَطْب শব্দের অর্থ– শান, অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জবাব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তাঁরা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোনো পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যথা–

১. দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। হযরত মূসা (আ.) যখন দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না, তখন তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন।

২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোনো অনর্থের আশঙ্কা না হয়।

৩. আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনো স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে।

৪. এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনো পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওজর বর্ণনা করেছে।

قَوْلُهُ فَسَقٰى لَهُمَا : অর্থাৎ মূসা (আ.) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারি পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারি পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) একাই, পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ : হযরত মূসা (আ.) সাত দিন পর্যন্ত থেকে কোনো কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْر শব্দটি কোনো কোনো সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ আয়াতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় শক্তির অর্থেও আসে। যেমন– اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ আয়াতে। আবার কোনো সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তা-ই উদ্দেশ্য। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَجَاۤءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاۤءٍ : কুরআনী রীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ– নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কন্যাদ্বয় বাড়ি পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলি অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। তাই প্রয়োজনবশত সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তাফসীরে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) তার

সাথে পথচলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এ বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন? এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শুয়াইব (আ.)। যেমন এক আয়াতে আছে- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ : বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোনো বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থি ছিল।

قَوْلُهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ : অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরজ করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ চাকরের মধ্যে দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা-

১. কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং ২. বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সমার্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোনো চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত হলো দুইটি : হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে গেছে। আফসোস! এই কুরআনী পথনির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

قَوْلُهُ قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ : অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শুয়াইব (আ.) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা; বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণত হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উসমান গনি (রা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। -[কুরতুবী]

হযরত শুয়াইব (আ.) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেননি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোনো একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিত জরুরি হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। কুরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিতা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিত ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপ সংঘটিত হলো? -[রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ : এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে,

মোহরানার এই ব্যাপারটি মুহাম্মদী শরিয়তে জায়েজ না হলেও হযরত শুয়াইব (আ.)-এর শরিয়তে জায়েজ ছিল। বিভিন্ন শরিয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কুরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়, যেমন– পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে চাকরিকে মোহরানা করা জায়েজ। যেমন– আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরি। একে মোহরানা গণ্য করা জায়েজ। –[বাদায়েউস সানায়ে'অ]

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর অথবা অন্য কোনো স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানার অর্থ হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় اَنْ تَاْجُرَنِىْ শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে,এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি হযরত মূসা (আ.) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার জিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরি হয়, তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাসআলা : اُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবেন; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোনো কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

তিনজন বুদ্ধিমান : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধিমান এবং পরিণামদর্শী পাওয়া যায় না। আর তাঁরা হলেন–

এক. হযরত আবূ বকর (রা.) তিনি তাঁর পরে হযরত ওমর (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্রেতা, তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে চিনে ফেলেছিলেন এবং চড়া মূল্যে ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীর নিকট বলেছিলেন, একে ভালোভাবে রাখ।

তিন. হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে সুপারিশ করেছিলেন যে, তাঁকে আমাদের কাজে নিযুক্ত করুন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে এক নজরেই তিনি চিনে ফেলেছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১০-১১১]

হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা : চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে হুকুম দিলেন যে, মূসাকে লাঠি এনে দাও, যেন সে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বকরিদের হেফাজত করতে পারে। এই লাঠিটি কিরূপ এবং কোনটি ছিল? এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইকরিমা (রা.)-এর ধারণা হলো যে, হযরত আদম (আ.) এই লাঠিটি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) এই লাঠিটি নিজের কাছে রেখে দেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এক রাত্রিতে এসে তাঁকে দান করেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, লাঠিটি ছিল জান্নাতের 'আস' নামক একটি বৃক্ষের। হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে লাঠিটি সঙ্গে এনেছিলেন। এরপর নবীগণ ক্রমান্বয়ে এর উত্তরাধিকারী হতে থাকেন। নবী ব্যতীত কেউ এই লাঠি লাভ করেননি। এভাবে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত আসে। অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত আসে। তারপর হযরত শুয়াইব (আ.) লাভ করেন। অবশেষে শুয়াইব (আ.) তা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করেন।

সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন যে, একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে এ লাঠিটি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আমানত রেখেছিলেন। যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে লাঠি আনার হুকুম দিলেন তখন সে এই লাঠিটিই নিয়ে আসে। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এই লাঠি ফেরত নিয়ে যাও, অন্যটি নিয়ে এসো! কন্যা লাঠি ফেরত নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল এবং অন্য লাঠি উঠাতে চাইল। কিন্তু আগের ঐ লাঠিটি ছাড়া আর কোনো লাঠি হাতে উঠলো না। শেষে এ লাঠিটিই উঠিয়ে নিয়ে আসলো। হযরত শুয়াইব (আ.) আবার তা ফেরত দিলেন। এভাবে তিন বার আনা নেওয়া হলো। অবশেষে হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে সে লাঠিটিই দিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ.) তা নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বিবেকের কাছে লজ্জিত হয়ে বললেন, এটাতো এক ব্যক্তির আমানত ছিল। আমি এটা কেমন কাজ করলাম? তিনি তখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাঠি ফেরত চাইলেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এই লাঠি এখন আমার হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। অবশেষে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাদের সামনে আসবে তার ফায়সালা আমরা মেনে নেব। তখন একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে আসলো। তিনি ফয়সালা করলেন যে এই লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন, তারপর যে সর্বপ্রথম লাঠিটি ধরতে পারবে, লাঠি তারই হবে। হযরত মূসা (আ.) লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) লাঠিটি আগে ধরার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। হযরত মূসা (আ.) লাঠি ধরে ফেললেন। এভাবে হযরত শুয়াইব (আ.) লাঠিটি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ করলেন এবং হযরত শুয়াইব (আ.) নিজের কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন, তখন হযরত মূসা (আ.) স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতাকে বল যেন তিনি আমাদেরকে কিছু বকরি প্রদান করেন। স্ত্রীর তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বকরি প্রার্থনা করলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এ বছর দুই বর্ণ বিশিষ্ট যত বাচ্চা হবে তা তোমাদের হবে।

হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আন্তরিক খেদমতের বিনিময় দিতে এবং নিজ কন্যার রক্তের দাবি মেটাতে ইচ্ছা করেছিলেন বলেই তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, এ বছর যত দুই রংগা বাচ্চা হবে, সে নর হোক অথবা মাদী উভয় প্রকারই তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। তাই আল্লাহ পাক স্বপ্নে হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন, বকরির দল যেখান থেকে পানি পান করে, সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত কর। হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হয়ে সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বকরীর পালকে সেই পানি পান করানো হলো, যত বকরি সেই পানি পান করেছিল তাদের সব বাচ্চাই সাদা-কালো বর্ণের পয়দা হয়েছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) বুঝলেন এটা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নছীব। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যে এ রিজিক দান করেছেন। তাই হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং সকল সাদা-কালো বর্ণের বাচ্চা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৩-১৫]

অনুবাদ :

২৯. فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ اَىْ رَعْيَهُ وَهُوَ ثَمَانِ اَوْ عَشْرِ سِنِيْنَ وَهُوَ الْمَظْنُوْنُ بِهِ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ زَوْجَتِهٖ بِاِذْنِ اَبِيْهَا نَحْوَ مِصْرَ اٰنَسَ اَبْصَرَ مِنْ بَعِيْدٍ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ اِسْمُ جَبَلٍ نَارًا ط قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا هُنَا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ عَنِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ اَخْطَاهَا اَوْ جَذْوَةٍ بِتَثْلِيْثِ الْجِيْمِ قِطْعَةٍ اَوْ شُعْلَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ـ تَسْتَدْفِئُوْنَ وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ مِنْ صَلِىَ بِالنَّارِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا ـ

২৯. হযরত মূসা (আ.) যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করলেন অর্থাৎ ছাগল চরানোর মেয়াদ। আর তা হলো আট কিংবা দশ বছর আর প্রবল ধারণা মতে দশ বছরই। এবং তার পরিবার পরিজন নিয়ে যাত্রা নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে মিশর পানে। তখন তিনি অনুভব করলেন দূরে দেখতে পেলেন তূর পর্বতের দিকে তূর একটি পাহাড়ের নাম। আগুন। তিনি তার পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর এখানে আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি রাস্তা সম্পর্কে। কারণ তিনি রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি جَذْوَةٌ শব্দের جِيْم বর্ণে তিনো হরকতই বৈধ। অর্থ– খণ্ড আঙ্গার। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। উত্তাপ গ্রহণ করতে পার। تَصْطَلُوْنَ -এর طَاءٌ টি اِفْتِعَالٌ -এর تَاءٌ -এর পরিবর্তে এসেছে। এটা صَلِىَ النَّارُ [لَامٌ বর্ণে যের ও যবর] হতে নিষ্পন্ন।

৩০. فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ جَانِبِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ لِمُوْسٰى فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ لِمُوْسٰى لِسِمَاعِهٖ كَلَامَ اللّٰهِ فِيْهَا مِنَ الشَّجَرَةِ بَدَلٌ مِنْ شَاطِئِ بِاِعَادَةِ الْجَارِ لِنَبَاتِهَا فِيْهِ وَهِىَ شَجَرَةُ عِنَابٍ اَوْ عُلَّيْقٍ اَوْ عَوْسَجٍ اَنْ مُفَسِّرَةٌ لَا مُخَفَّفَةٌ يٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৩০. হযরত মূসা (আ.) যখন আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত একটি বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহবান করে বলা হলো ভূমির পবিত্রতা মূলত হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বিশেষত তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণের কারণে, আর مِنَ الشَّجَرَةِ এটা مِنْ شَاطِئِ -এর থেকে حَرْف جَارّ পুনরুল্লেখের মাধ্যমে بَدَل হয়েছে। উক্ত উপত্যকায় বৃক্ষটি উৎপন্ন হওয়ায়, বৃক্ষটি ছিল ইনাব বা ইল্লীক কিংবা আউসাজ তথা ঝাউ গাছ। হে মূসা! আমিই আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতিপালক। এখানে اَنْ টি হরফে তাফসীর; مُخَفَّفَهْ তথা তাশদীদযুক্ত থেকে লঘুকৃত নয়।

অনুবাদ :

٣١. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ط فَاَلْقَاهَا فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَهِىَ الْحَيَّةُ الصَّغِيْرَةُ مِنْ سُرْعَةِ حَرَكَتِهَا وَلّٰى مُدْبِرًا هَارِبًا مِنْهَا وَلَمْ يُعَقِّبْ اَىْ يَرْجِعْ فَنُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ـ

৩১. তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন অতঃপর যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন আর جَآنٌّ হলো ছোট সাপ; দ্রুতগতির কারণে। তখন পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন তা থেকে পালিয়ে এবং ফিরে তাকালেন না তখন পুনরায় তাকে আহবান করা হলো। হে মূসা! সম্মুখে অগ্রসর হও। ভয় করো না। তুমি তো নিরাপদ।

٣٢. اُسْلُكْ اَدْخِلْ يَدَكَ الْيُمْنٰى بِمَعْنٰى الْكَفِّ فِىْ جَيْبِكَ هُوَ طَوْقُ الْقَمِيْصِ وَاَخْرِجْهَا تَخْرُجْ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ز اَىْ بَرَصٍ فَاَدْخَلَهَا وَاَخْرَجَهَا تُضِيْئُ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ تُغْشِى الْبَصَرَ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ بِفَتْحِ الْحَرْفَيْنِ وَسُكُوْنِ الثَّانِىْ مَعَ فَتْحِ الْاَوَّلِ وَضَمِّهِ اَىْ الْخَوْفِ الْحَاصِلِ مِنْ اِضَاءَةِ الْيَدِ بِاَنْ تُدْخِلَهَا فِىْ جَيْبِكَ فَتَعُوْدَ اِلٰى حَالَتِهَا الْاُوْلٰى وَعُبِّرَ عَنْهَا بِالْجَنَاحِ لِاَنَّهَا لِلْاِنْسَانِ كَالْجَنَاحِ لِلطَّائِرِ فَذٰنِكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اَىْ الْعَصَا وَالْيَدُ وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ وَاِنَّمَا ذُكِّرَ الْمُشَارُ بِهِ اِلَيْهِمَا الْمُبْتَدَأُ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهِ بُرْهَانٰنِ مُرْسَلَانِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

৩২. তুমি তোমার ডান হাত অর্থাৎ হাতের তালু/অগ্রভাগ তোমার বগলে রাখ প্রবেশ করাও جَيْب হলো জামার হাতা এবং তাকে বের কর বের হয়ে আসবে তার যে পীত বর্ণ ছিল তার ব্যতিক্রম শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দেশ হয়ে অর্থাৎ শ্বেতরোগ ছাড়াই। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) বগলে হাত ঢুকিয়ে তা বের করে আনলে তা সূর্যের জ্যোতির ন্যায় আলোক বিচ্ছুরণ করতে লাগল, যা চোখ ঝলসে দেয়। এবং ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। اَلرَّهْبُ শব্দের প্রথম দু'বর্ণ যবর যোগে, প্রথমটি যবর ও দ্বিতীয়টি সাকিন অথবা প্রথমটি পেশ যোগেও পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ হাত সমুজ্জ্বল হওয়ার কারণে যে ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল তা। এভাবে চেপে ধর যে, হাতকে তোমার বগলে প্রবেশ করাও! ফলে তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। আর হাতকে جَنَاحٌ [ডানা] এজন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য হাত পাখির ডানার পর্যায়ে। এই দুটি فَذَانِكَ-এর نُوْن বর্ণটি তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। অর্থাৎ লাঠি এবং হস্ত। উভয়টি স্ত্রীলিঙ্গ তবে مُشَارٌ اِلَيْهِ তথা মুবতাদাকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে তার খবর তথা بُرْهَانَانِ শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়ার কারণে। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। এরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَذْوَةٌ : এ শব্দে তিনো প্রকার اِعْرَابْ হতে পারে। جَذْوَةٌ অর্থ– মাথায় আগুন বিশিষ্ট ডাল বা কাষ্ঠখণ্ড, মোটা কাষ্ঠ, مِنَ نَارٍ হলো جَذْوَةٌ -এর বয়ান, فَلَمَّا اَتَاهَا -এর মধ্যকার هَا দ্বারা উদ্দেশ্য আগুন।

قَوْلُهُ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِئْ : এর মধ্যকার مِنْ অব্যয়টি اِبْتِدَاءُ غَايَةٌ তথা সীমারেখার শুরু বুঝানোর জন্য, اَيْمَنْ হলো وَادِئْ বা شَاطِئْ -এর সিফত। جَانِبُ يَمِيْن তথা ডান দিক দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর ডান দিক উদ্দেশ্য। فِى الْبُقْعَةِ হলো نُوْدِىَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهُ لِسِمَاعِهِ كَلَامُ اللّٰهِ : অর্থাৎ উক্ত ময়দানটি হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য এ কারণে মোবারক ছিল যে, উক্ত ময়দানে তাকে নবুয়ত দান করা হয়েছিল এবং মহান আল্লাহর নূরের দীদার ও তাঁর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

قَوْلُهُ مِنَ الشَّجَرَةِ : এটা شَاطِئْ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالْ আর وَجْهُ مُلَابَسَةٍ তথা مُبْدَلْ مِنْهُ -এর সংশ্লিষ্ট বস্তু নির্দেশকল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) لِنَبَاتِهَا فِيْهِ বলে ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত বৃক্ষটি যেহেতু شَاطِئْ [প্রান্তে] ছিল। তাই যেন উক্ত বৃক্ষ থেকেই আহবান করা হয়েছিল। সেটা কোনো বৃক্ষ ছিল এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। যথা–

১ عِنَابٌ [উনাব], এ বৃক্ষের ফলকেও উনাব বলা হয়। ফলের রং হলো লাল খয়েরী।

২. عِلِّيْق [ইল্লীক] আলোক লতা, যা অন্য গাছের উপর বিস্তার লাভ করে, যে গাছের উপর ছেয়ে যায় তার রস চুষে নেয়, ফলে ক্রমান্বয়ে সেটি শুকিয়ে যায়। উক্ত লতার রং হয় হলুদ। উর্দুতে আকাশ বেল ও আমরবেল এবং ফার্সিতে ইশকপেচা বলে।

৩. عَوْسَجٌ [আওসাজ] কাঁটাযুক্ত বন্য বৃক্ষ। এর ফল ছোট টক মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। উর্দূতে এটাকে ঝটরবেরী বলা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِنْ مُفَسِّرَةٌ : কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এটাকে مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ বলেছেন। বস্তুত এটা ঠিক নয়; বরং এটা مُفَسِّرَةٌ ; এর পূর্বে যেহেতু نُوْدِىَ রয়েছে, যা قَوْل -এর সমার্থ বিশিষ্ট। কাজেই এটা مُفَسِّرَةٌ হওয়া সুনিশ্চিত। অর্থাৎ نُوْدِىَ بِاَنْ يَّا مُوْسٰى

جَآنٌّ অর্থ ছোট সাপ, ثُعْبَانٌ বড় সাপ, আর حَيَّةٌ যে কোনো সাপকে বলে। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যে সাপে পরিণত হয়েছিল, তাকে কুরআন মজীদে একেক জায়গায় একেক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং সবগুলোর অর্থের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, সূচনালগ্নে তা جَآنٌّ [ছোট সাপ] ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা ثُعْبَانٌ [বড় সাপ] -এ পরিণত হতো। অথবা ক্ষিপ্রগতিতে তা جَآنٌّ এবং দৈহিক গঠনে তা ثُعْبَانٌ তথা বিশার আকৃতির ছিল।

قَوْلُهُ ذِكْرُ الْمُشَارِ بِهِ اِلَيْهَا : এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : عَصًا এবং يَدٌ উভয়টি স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই এর জন্য اِسْمُ اِشَارَةٌ - تَانِ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। অথচ এখানে ذَانِ উল্লেখ করা হয়েছে। আর خَبَرٌ হলো بُرْهَانَانِ এটা পুংলিঙ্গ। তাই এখানে খবরের প্রতি رِعَايَتْ করে মুবতাদাকেও مُذَكَّرٌ আনা হয়েছে। যাতে মুবতাদা ও খবরের মাঝে مُطَابَقَتْ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مِنْ رَّبِّكَ : এটা উহ্য শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যাখ্যাকার (র.) مُرْسَلَانِ উল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর কেউ কেউ كَائِنَانِ উহ্য বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ : **মিশরের পথে হযরত মূসা (আ.) :** হযরত মূসা (আ.) হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট অবস্থানের মেয়াদ পূর্ণ করলেন, অর্থাৎ দশ বছর যাবত হযরত শুয়াইব (আ.)-এর

সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত রইলেন এবং তাঁর বকরিগুলোর দেখাশোনা করলেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, তখন হযরত শুআইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাদায়েনে থেকে মিশরের দিকে রওয়ানা হন। যখন তাঁরা তূর পর্বতের নিকট পৌছেন, তখন রাত হয়ে যায়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন চতুর্দিক, তুহীন শীত, এদিকে তিনি পথও হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু তাই নয়; ঐ সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনাও শুরু হয়, শীতের প্রকোপের দরুন একটু আগুনের প্রয়োজন ছিল ঐ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি, তিনি তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন।

তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, اُمْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি একটি আগুন দেখতে পেয়েছি, হয়তো তোমাদের জন্যে সেখান থেকে কোনো খবর অথবা আগুন নিয়ে আসতে পারব। হযরত মূসা (আ.) আগুন দেখে বুঝলেন, হয়তো সেখানে কেউ আছে যার দ্বারা আমি সাহায্য পেতে পারি, সে আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে, যদি সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাওয়া না যায় তবে এতটুকু উপকার হবে যে, কিছু জ্বলন্ত অংগার হলেও নিয়ে আসতে পারব, যাতে করে তুমি শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কাতাদা এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের جَذْوَةٍ শব্দটি সেই জ্বলন্ত লাকড়িকে বলা হয়, যার কিছু অংশ জ্বলে গেছে। এর বহুবচন হচ্ছে- جِذًى

قَوْلُهُ فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ : যখন হযরত মূসা (আ.) আগুনের নিকট পৌছলেন, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের বরকতময় ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হলো, হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্ব প্রতিপালক।

অর্থাৎ, হে মূসা! যে আগুন তুমি দেখছ তা আমার নূরের তাজাল্লী, আর যে কথা তুমি শ্রবণ করছ, তা আমারই মহান বাণী, আর এ বৃক্ষ এ স্থান আর যেদিক থেকে তুমি এ শব্দ শ্রবণ করছ সেদিক, এসব কিছুই আমার তাজ্জাল্লী অবতরণের স্থান, আমার পবিত্র সত্তার স্থান নয়; কেননা তা স্থান, কাল ও দিক থেকে পবিত্র এবং উর্ধ্বে।

হযরত মূসা (আ.)-এ নবুয়ত লাভ : আলোচ্য আয়াতে اَلْبُقْعَةُ الْمُبٰرَكَةُ বলে পবিত্র ও বরকতময় স্থান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এ স্থানেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত দানে ধন্য করেছেন।

তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোবারাকাহ শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র এর স্থলে 'আল মোকাদ্দাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلشَّجَرَةُ অর্থ- বৃক্ষ। এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ বৃক্ষটি ছিল সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।

তাফসীরকার কাতাদা, কালবী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিল আওজাহ। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, এর নাম ছিল আলীক। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি ছিল আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে- اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং সূরা ত্বা-হায় ইরশাদ হয়েছে- اَنَا رَبُّكَ

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন কারীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের

উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ত্বো-হায় ইরশাদ হয়েছে- فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ [হে মূসা!] তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছ।

আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে- بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যিনি আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছেন, তিনি মোবারক।" এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ, "যারা তার চারপার্শ্বে" এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরুত মূসা (আ.)-কে নবুওয়ত ও রিসালতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। আর এ আয়াত থেকে নবুওয়তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে যে মুজেযা প্রদান করা হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

হে মূসা! তোমার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর! যখন হযরত মূসা (আ.) তার লাঠিটি ফেলে দিলেন, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট আজগরে পরিণত হলো।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, আর পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ হলো- يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ অর্থাৎ হে মূসা ! সম্মুখের দিকে এসো, আর ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে থাকবে, তোমার কোনো আশঙ্কা নেই।

অর্থাৎ, এ অজগর দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, দুশমনকে ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তেই তোমাকে এ মুজেযা দেওয়া হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে মানুষ হিসেবে যে ভীতি ছিল তা দূরীভূত হয়।

বর্ণিত আছে যে, এ ভয়ংকর অজগরটি যখন মুখ খুলত, তখন মনে হতো এখনি সব কিছু গিলে ফেলবে। আর যেদিক থেকে তা যাতায়াত করত, সেদিকের পাথরগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এসব দেখে হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত হলেন, এজন্যে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি, আর পেছনেও তাকাননি। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে অভয় দান করলেন, তখন তিনি নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হলেন এবং আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ أُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত হযরত মূসা (আ.)-এর একটি মুজেযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর আরেকটি মুজেযার কথা বলা হয়েছে। প্রথম মুজেযা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যা মাটিতে ফেললেই ভয়ংকর অজগরে পরিণত হতো এবং দুশমনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মুজেযা হলো তাঁর হাত থেকে নূর প্রকাশিত হওয়া। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর বগলে হাত দিয়ে তা বের করে আনতেন, তখন তা আলোয় ঝলমল করত এবং তা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ মুজেযাটি ছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর আলোকময় অন্তরের আলোর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ দু'টি হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে। লাঠি দ্বারা দুষ্টের দমন বা পাপাচার বন্ধ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দীপ্তিমান হাত দ্বারা মনকে আলোকিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি নিদর্শন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। যেভাবে এ দু'টি নিদর্শন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে তূর পর্বতে ঐ নূরানী বৃক্ষ থেকে তুমি যা শ্রবণ করেছ তা-ও আমারই বাণী। আর যে অগ্নি তুমি দেখেছ তা আমারই নূরের তাজাল্লী, যা তোমাকে অগ্নির আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যেহেতু তখন তুমি অগ্নির অনুসন্ধানে ছিলে, তাই তোমাকে অগ্নির আকৃতিতেই নূরের তাজাল্লী দেখানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর হাত যে আলোকময় হতো, তা কোনো রোগের কারণে নয়; যেমন শ্বেতরোগের কারণে মানুষের হাত সাদা হয়ে যায়; বরং এটি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা। যেহেতু পরিবর্তিত তাওরাতে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের মুজেযাকে শ্বেতরোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ বাক্য দ্বারা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এটা কোনো রোগ নয়; বরং আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত মূসা (আ.)-এর হাত নূরানী হতো। এটি ছিল তাঁর অন্যতম মুজেযা।

قَوْلُهُ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ : **ভয় দূর করার পন্থা :** তাফসীরকার আতা (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। অর্থাৎ তোমার হাতকে তোমার বক্ষের উপর স্থাপন কর! যাতে করে তোমার মনের ভয় দূরীভূত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর পর যে কোনো ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিই নিজ হাত তার বক্ষের উপর রাখে, তার ভয় দূর হয়ে যায়। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু'বাহু নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ দ্বারা শান্তি, দৃঢ়তা এবং সৎসাহস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এভাবে বক্ষের উপর হাত রাখবে, সে এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর। কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূরীভূত হয়।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جَنَاحٌ শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তুমি লাঠিকে নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

قَوْلُهُ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ : অর্থাৎ এই লাঠি এবং আলোকময় হাত– এ দু'টি মুজেযা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নবুয়তের দলিল প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা হলো। ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাওয়ার জন্যে এ দু'টি হলো তোমার নিকট দলিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা অত্যন্ত নাফরমান, পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমার নবুয়ত ও রিসালতের এ দুটি জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে তুমি তাদের নিকট যাও! –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৭-১১৮]

অনুবাদ :

৩৩. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا هُوَ الْقِبْطِىُّ السَّابِقُ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ بِهٖ ـ

৩৩. হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। সে ছিল পূর্বোক্ত কিবতী ফলে আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার পরিবর্তে কিসাস রূপে।

৩৪. وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا اَبْيَنَ فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا مُعِيْنًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الدَّالِ بِلَا هَمْزَةٍ يُّصَدِّقُنِىْ ز بِالْجَزْمِ جَوَابُ الدُّعَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ وَجُمْلَةُ صِفَةُ رِدْءًا اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ـ

৩৪. আমার ভ্রাতা হারুন আমার অপেক্ষা বাগ্মী স্পষ্টভাষী অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। رِدْءًا শব্দটি অন্য কেরাতে دَالْ বর্ণে যবর দিয়ে হামযাবিহীনভাবে গঠিত রয়েছে। সে আমাকে সমর্থন করবে। يُصَدِّقُنِىْ -এর قَافْ বর্ণটি জযমযুক্ত। এটা دُعَاءٌ -এর জবাব। অপর কেরাতে قَافْ বর্ণটি পেশ যুক্ত রয়েছে। আর বাক্যটি رِدْءًا -এর সিফত হয়েছে। আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

৩৫. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ نُقَوِّيْكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا غَلَبَةً فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ج بِسُوْءٍ اِذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا ج اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ لَهُمْ ـ

৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে। তোমরা উভয়ে গমন কর আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা তাদের উপর প্রবল হবে।

৩৬. فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى مُخْتَلَقٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا كَائِنًا فِىْٓ اَيَّامِ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ـ

৩৬. হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসলেন, তারা বলল, এটাতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। অর্থাৎ নিজের তৈরিকৃত। আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনো এরূপ কথা শুনিনি।

৩৭. وَقَالَ بِوَاوٍ وَبِدُوْنِهَا مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ الضَّمِيْرُ لِلرَّبِّ وَمَنْ عَطْفٌ عَلٰى مَنْ تَكُوْنُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط اَىِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَىْ وَهُوَ اَنَا فِى الشِّقَّيْنِ فَاَنَا مُحِقٌّ فِيْمَا جِئْتُ بِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ ـ

৩৭. হযরত মূসা (আ.) বললেন, قَالَ ফে'লটি وَاوْ সহ এবং وَاوْ বিহীন উভয়রূপেই পঠিত। আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত অর্থাৎ জ্ঞাত আছেন কে তাঁর নিকট হতে পথনির্দেশ এনেছেন عِنْدِهٖ -এর যমীর رَبٌّ -এর দিকে ফিরেছে। এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। আর يَكُوْنُ -এর عَطْف হয়েছে بِمَنْ -এর উপর আর مَنْ শব্দটি يَاءْ এবং تَاءْ দ্বারা উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ পরকালের আবাসে সুপরিণতি কার হবে? আর উভয় অবস্থায় আমিই। সুতরাং আমার আনীত বিষয়ে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জালেমরা কখনোই সফলকাম হবে না কাফেররা।

অনুবাদ :

٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ج فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاطْبَخْ لِيَ الْأُجُرَّ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا قَصْرًا عَالِيًا لَعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَقِفُ عَلَيْهِ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْ اِدِّعَائِهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَاَنَّهُ رَسُوْلُهُ.

৩৮. ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। হে, হামান! আমার জন্য ইট পোড়াও ইট পরিপক্ক কর এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর। হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহ্ সম্পর্কে অবগত হতে পারি। দেখতে পারি ও তার সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। তার এ দাবিতে যে, অন্য ইলাহ রয়েছে এবং সে তাঁর রাসূল হওয়ার বিষয়ে।

٣٩. اِسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يَرْجِعُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ.

৩৯. ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। لَا يَرْجِعُوْنَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٤٠. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ طَرَحْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَغَرِقُوْا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ - حِيْنَ صَارُوْا اِلَى الْهَلَاكِ.

৪০ অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম লোনা সমুদ্রে, ফলে তার নিমজ্জিত হলো। দেখুন জালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে। যখন তারা ধ্বংসের কবলে পড়েছিল।

٤١. وَجَعَلْنٰهُمْ فِي الدُّنْيَا اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً رُؤَسَاءَ فِي الشِّرْكِ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج بِدُعَائِهِمْ اِلَى الشِّرْكِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ - بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ.

৪১. আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। পৃথিবীতে। اَئِمَّةً শব্দটির উভয় হামযা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ শিরকের ক্ষেত্রে নেতা বানিয়েছি। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত শিরকের প্রতি ডাকার মাধ্যমে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তাদের থেকে শাস্তি প্রতিহত করার ব্যাপারে।

٤٢. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج خِزْيًا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ الْمُبْعَدِيْنَ.

৪২. এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত। লাঞ্ছনা, এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। দূরে নিক্ষিপ্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رِدْءًا : এটা أَرْسِلْهُ-এর যমীরের حَالٌ অর্থ- সাহায্যকারী। جَوَابُ الدُّعَاءِ না বলে মূলত جَوَابُ أَمْرٍ বলা উচিত ছিল। তবে আদবস্বরূপ جَوَابُ دُعَاءٍ বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে আমরের সীগাহ ব্যবহৃত হলে তাকে دُعَاءٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ : এর মধ্যে مَجَازٌ مُرْسَلٌ ঘটেছে, سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা বাহুর শক্তি ব্যক্তির শক্তিকে অনিবার্য করে।

قَوْلُهُ بِاٰيَاتِنَا : এখানে اٰيَاتٌ দ্বারা عَصَا ও يَدٌ উদ্দেশ্য, তবে দু'টির ক্ষেত্রেই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটি কয়েকটি মুজেযা সম্বলিত ছিল। اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ হলো اٰيَاتٌ-এর حَالٌ

قَوْلُهُ اَعْلَمُ اَیْ عَالِمٌ : اَعْلَمُ-এর ব্যাখ্যা عَالِمٌ দ্বারা করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : اِسْمُ تَفْضِيْل সাধারণত اِسْمُ ظَاهِرٌ-কে نَصَبٌ দেয় না। কিন্তু এখানে نَصَبٌ দিল কেন?

উত্তর : اِسْمُ تَفْضِيْل টি এখানে اِسْمُ فَاعِلٌ অর্থে, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَتَكُوْنُ : অধিকাংশ কারীগণ এটাকে تَاءٌ যোগে পড়েছেন, لَهُ হলো تَكُوْنُ-এর خَبَرٌ আর عَاقِبَةٌ হলো এর اِسْم আবার এমনো হতে পারে যে, تَكُوْنُ-এর هِیَ যমীরটি তার اِسْم আর لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ বাক্য হয়ে خَبَرٌ-এর স্থলে হয়েছে। شِقَّيْنِ শব্দটি شِقٌّ-এর দ্বিবচন; অর্থ- কিনারা, পার্শ্ব। এখানে এর দ্বারা مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى এবং مَنْ يَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ হলো مَقْبُوْحِيْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে উহ্য শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াটাই অধিক স্পষ্ট। বাক্যটি এরূপ হবে- قَبِحُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ এখানে مَقْبُوْحِيْنَ শব্দটি উহ্য قَبِحُوْا-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। مَقْبُوْحِيْنَ শব্দটি مَقْبُوْحٌ-এর বহুবচন। অর্থ হলো উদ্ভ্রান্ত, পরিবর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিবসে তাদের মুখমণ্ডল বিবর্তিত হয়ে কালো ও চক্ষু নীল বর্ণের হয়ে যাবে। مَقْبُوْحٌ এটা اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ بَابُ كَرُمَ وَفَتَحَ থেকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ : ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) একজন মজলুম বনী ইসরাঈলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জনৈক জালেম কিবতীকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন, পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে। তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। ফেরাউনের জল্লাদরা এ আদেশ কার্যকর করার জন্যে বের হয়েছিল। দশ বছর পূর্বে এ অবস্থায় হযরত মূসা (আ.)-কে মিশর থেকে বের হয়ে মাদায়ানে চলে যেতে হয়েছিল। এখন হযরত মূসা (আ.)-কে যখন আল্লাহ পাক নবী ও রাসূল মনোনীত করে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁর পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে। তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজি পেশ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় আমার হাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল, আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো তারা দেখামাত্রই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এমননি অবস্থায় আমি তাদের নিকট আপনার পয়গাম কি করে পৌঁছাবো। তাদেরকে তাবলীগ করার পূর্বেই আমার কাজ তারা শেষ করে দেবে। আল্লাহ পাক তখন হযরত মূসা (আ.)-কে সান্ত্বনা দেন যে, এমন অবস্থা কখনো হবে না। আল্লাহ পাক তখন ইরশাদ করেছেন- لَا تَخَافَا اِنَّنِیْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰی অর্থাৎ তোমরা কোনো ভয় করো না! কেননা আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি তোমাদের এবং তার মধ্যে যে সব কথাবার্তা হবে তা আমি শুনতে পাব এবং তোমাদের সাথে সে যে আচরণ করবে তাও আমি দেখতে পাব।

قَوْلُهُ وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً : বর্ণিত আছে, শৈশবে একবার হযরত মূসা (আ.) জ্বলন্ত অংগার মুখে নিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর জিহবা পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর রসনায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করেছেন যে, আমার ভাই হারূনকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে দিন, যাতে করে সে সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার মহান বাণী ফেরাউনের নিকট পৌঁছাতে পারে এবং রিসালতের দায়িত্ব পালনে আমার সাহায্যকারী হয়!

قَوْلُهُ يُصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ : অর্থাৎ আমার ভাই আমাকে সত্যায়িত করবেন এবং আমার কথাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করবেন এবং তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করবেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি হারূনকে আমার সাথে নবী মনোনীত করে প্রেরণ কর, তবে তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে ফেরাউন আমার প্রতি ঈমান আনতেও পারে। তবে আমি আশঙ্কা করি যে, সে আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে এবং তোমার নবী রাসূল হিসেবে সে আমাকে মেনে নেবে না।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যদি হারূন আমার সঙ্গে থাকে তবে সে আমার সাহায্যকারী এবং পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবে এবং আমার কথাগুলো সে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে আর তার কারণে আমার হাত শক্তিশালী হবে।

এতদ্ব্যতীত, একজনের স্থলে দু'জন হলে এ মহান দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হবে। পক্ষান্তরে যদি আমি একা থাকি, এমন অবস্থায় আমার আশঙ্কা হয় যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমার নবুয়তের দাবিকে মিথ্যাজ্ঞান করবে।

قَوْلُهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। এমন অবস্থায় তারা তোমার নিকট পৌঁছতেই পারবে না।

অর্থাৎ হে মূসা! আমি তোমার আরজি কবুল করেছি, তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব, তোমাদেরকে এমন প্রাধান্য দেব যে, তোমাকে হত্যা করার তো প্রশ্নই উঠে না; এমনকি কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়ার জন্যে তোমাদের কাছেও আসতে পারবে না। অতএব, এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এরপর পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ

অর্থাৎ তুমি আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ফেরাউনের নিকট যাও! তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীগণ অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করবে। আমার প্রদত্ত মুজেযাসমূহের কারণে তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। আমার মহিমা বলে তোমরা আধিপত্য লাভ করবে, ফেরাউন এবং তার দল তোমাদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

আল্লামা সয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ফেরাউনের ব্যাপারে একটু ভয় ছিল। কেননা সে ছিল অত্যন্ত জালিম ও স্বেচ্ছাচারী। সে যা ইচ্ছা তা করত, তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, এমনি অবস্থায় হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এজন্যে হযরত মূসা (আ.) যখন তাকে দেখতেন, একটি দোয়া পাঠ করতেন। এর বরকতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তর থেকে ফেরাউনের ভয় দূরীভূত করে দিলেন এবং ফেরাউনের অন্তরে মূসা (আ.)-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.)-কে দেখত তখন সংগে সংগে তার প্রস্রাব শুরু হয়ে যেত, আর তা হতো গর্দভের প্রস্রাবের ন্যায়।

বায়হাকী তাফসীরকার যাহহাক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উদ্দেশ্যে যখন দোয়া করেছেন, তখন তা যেমন কবুল হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হুনাইনের যুদ্ধে দুশমনের বিরুদ্ধে রাসূলে কারীম ﷺ যখন দোয়া করেছিলেন, তা-ও তেমনি কবুল হয়েছিল। আর এভাবে যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন।

দোয়াটি হলো এই-

كُنْتَ وَتَكُوْنُ وَاَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوْتُ تَنَامُ الْعُيُوْنُ وَتَنْكَدِرُ النُّجُوْمُ وَاَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ -

قَوْلُهُ فَاَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ : ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উজির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। অন্যান্য মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর বাইরে। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পরে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের পরিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তাফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহ্বান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরি কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত [ইবনে আরাবীর অনুকরণে] এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পরিণত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু, এবং নানারকম আজাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোনো রূপকথা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকথার আশ্রয় নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে : উদাহরণত مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ এবং وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا আয়াতদ্বয়ে।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ : مَقْبُوْحٌ শব্দের বহুবচন مَقْبُوْحِيْنَ অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

٤٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ التَّوْرٰىةَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى قَوْمَ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَغَيْرَهُمْ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ حَالٌ مِنَ الْكِتَابِ جَمْعُ بَصِيْرَةٍ وَهِيَ نُوْرُ الْقَلْبِ اَيْ اَنْوَارًا لِلْقُلُوْبِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَرَحْمَةً لِمَنْ اٰمَنَ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ يَتَّعِظُوْنَ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ ـ

অনুবাদ :

৪৩. আমি হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর। অর্থাৎ, নূহ, আদ ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে। মানবজাতির জন্যে জ্ঞানবর্তিকা بَصَائِرُ শব্দটি اَلْكِتَابُ থেকে حَالٌ হয়েছে। এটা بَصِيْرَةٌ -এর বহুবচন। আর তা হলো- কলবের জ্যোতি। অর্থাৎ اَنْوَارًا لِلْقُلُوْبِ অর্থে। পথনির্দেশ পথভ্রষ্টতা থেকে যে এর উপর আমল করে। এবং অনুগ্রহ স্বরূপ যে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এতে যে সকল উপদেশ রয়েছে তা দ্বারা।

٤٤. وَمَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِجَانِبِ الْجَبَلِ اَوِ الْوَادِيْ اَوِ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ مِنْ مُّوْسٰى حِيْنَ الْمُنَاجَاةِ اِذْ قَضَيْنَآ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ بِالرِّسَالَةِ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ لِذٰلِكَ فَتَعْرِفُهُ فَتُخْبِرُ بِهِ ـ

৪৪. হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম প্রান্তে পাহাড় অথবা উপত্যকা অথবা স্থানের, যখন হযরত মূসা (আ.) অতি সঙ্গোপনে আলাপরত ছিলেন, যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে রিসালতের বিধান। এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। এ ব্যাপারে যে, আপনি জেনে শুনে সে বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন।

٤٥. وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا اُمَمًا بَعْدَ مُوْسٰى فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ج اَيْ طَالَتْ اَعْمَارُهُمْ فَنَسُوا الْعُهُوْدَ وَانْدَرَسَتِ الْعُلُوْمُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ فَجِئْنَا بِكَ رَسُوْلًا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ خَبَرَ مُوْسٰى وَغَيْرِهِ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا مُقِيْمًا فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا خَبَرٌ ثَانٍ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ فَتُخْبِرُ بِهَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ـ لَكَ وَاِلَيْكَ بِاَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ ـ

৪৫. বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম হযরত মূসা (আ.)-এর পরে বহু জাতির। অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের বয়স সুদীর্ঘ হয়েছে। ফলে তারা তাদের অঙ্গীকারসমূহ ভুলে গেছে এবং জ্ঞান-গরিমা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর ওহীও বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আপনার কাছে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্যদের সংবাদ প্রত্যাদেশ করেছি। আপনি তো মাদায়েনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না অবস্থান করছিলেন না। তাদের নিকট আমার নিদর্শন বর্ণনা করবার জন্য। اٰيٰتِنَا হলো দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ তাদের ঘটনা অবগত হয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আপনাকে এবং আপনার নিকট পূর্ববর্তীদের সংবাদকে।

অনুবাদ :

٤٦. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ الْجَبَلِ اِذْ حِيْنَ نَادَيْنَا مُوْسٰى اَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَلٰكِنْ اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَّةَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ ـ

৪৬. আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি আহবান করেছিলাম মূসাকে এ বলে যে, আমার কিতাবকে শক্তভাবে আকড়ে ধর! বস্তুত আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ। যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। আর তারা হলো মক্কাবাসীরা যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٧. وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ عُقُوْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا هَلَّآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ الْمُرْسَلَ بِهَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوْفٌ وَمَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأٌ وَالْمَعْنٰى لَوْلَا الْاِصَابَةُ الْمُسَبَّبُ عَنْهَا قَوْلُهُمْ اَوْ لَوْلَا قَوْلُهُمْ الْمُسَبَّبُ عَنْهَا لَعَاجَلْنَاهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ وَلَمَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلًا ـ

৪৭. তাদের উপর কোনো বিপদ হলে শাস্তি হলে তাদের কৃতকর্মের কারণে কুফর ইত্যাদির কারণে তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নির্দেশ মেনে চলতাম যা আমাদের নিকট প্রেরণ করা হতো। এবং আমরা হতাম মু'মিন। لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে। তার পরের অংশটি মুবতাদা। অর্থ হলো বিপদ হওয়াটা যদি যা তোমাদের উক্তি لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا -এর সবব বা কারণ না হতো, তাহলে আমি তাদের শাস্তিকে দ্রুত করতাম। অথবা যদি তাদের উক্তি– لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا মূলত বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণ সাপেক্ষ বিষয় তা না হতো, তাহলে আমি আপনাকে তাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করতাম না।

٤٨. فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا هَلَّآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ط مِنَ الْاٰيَاتِ كَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا وَغَيْرِهِمَا اَوِ الْكِتَابِ جُمْلَةً وَاحِدَةً قَالَ تَعَالٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ج حَيْثُ قَالُوْا فِيْهِ وَفِيْ مُحَمَّدٍ ﷺ سَاحِرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ اَيِ التَّوْرٰىةُ وَالْقُرْاٰنُ تَظَاهَرَا تَعَاوَنَا وَقَالُوْآ اِنَّا بِكُلٍّ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْكِتَابَيْنِ كٰفِرُوْنَ ـ

৪৮. অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ আসল, তারা বলতে লাগল হযরত মূসা (আ.)-কে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল তাকে সেরূপ দেওয়া হলো না কেন? অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ হতে যেমন শুভ্র হস্ত, লাঠি ইত্যাদি। অথবা একই সাথে সম্পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন কিন্তু পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? কেননা তারা বলেছিল তার ব্যাপারে ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে দুটিই জাদু অন্য কেরাতে রয়েছে سِحْرَانِ অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন একে অপরকে সমর্থন করে সাহায্য করে [এবং তারা বলেছিল আমরা সকলকেই নবীগণ এবং কিতাবসমূহকে প্রত্যাখ্যান করি।

অনুবাদ :

٤٩. قُلْ لَّهُمْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا مِنَ الْكِتَابَيْنِ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِكُمْ.

৪৯. আপনি বলুন তাদেরকে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে কিতাব দুটি থেকে উৎকৃষ্টতর হবে। আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের উক্তিতে।

٥٠. فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ دُعَاءَكَ بِالْاِتْيَانِ بِكِتَابٍ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاۤءَهُمْ ط فِىْ كُفْرِهِمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اَىْ لَا اَضَلَّ مِنْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৫০. অতঃপর তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় আপনার কিতাব আনয়নের ডাকে। তা হলে জানবেন তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। তাদের কুফরির ক্ষেত্রে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কেউ নেই। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। অর্থাৎ কাফের তথা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَعَادًا : এর عَطْف হলো قَوْم-এর উপর; نُوْح এর উপর নয়। কেননা نُوْح-এর উপর عَطْف হলে عَادْ-এর জন্য কওম হওয়া অনিবার্য হয়। অথচ আদই হলো একটি কওম। বাক্যটি এরূপ হবে– مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ [আমি নূহ -এর কওম এবং আদ ও সামূদের কওমকে ধ্বংস করার পরে......] সুতরাং عَادْ -কে আলিফ সহকারে লিখলে তা যথোচিত হতো। কেননা এ সময় نُوْح-এর উপর عَطْف হওয়ার সন্দেহ থাকত না।

قَوْلُهٗ بَصَائِرُ : এটা مُضَافْ বিলুপ্তিসহ كِتَابْ-এর حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ ذَا بَصَائِرْ আর যদি مُضَافْ উহ্য না হয় তাহলে مُبَالَغَةْ স্বরূপও حَالْ হতে পারে। আবার كِتَابْ-এর مَفْعُوْلْ لَهٗ-ও হতে পারে। هُدًى এবং رَحْمَةً শব্দদ্বয়েও উপরিউক্ত তিনো তারকীব হতে পারে।

قَوْلُهٗ بِجَانِبِ الْجَبَلِ اَوِ الْوَادِىْ اَوِ الْمَكَانِ : এ ইবারত দ্বারা বসরী নাহভীগণের মাযহাব মতে আরোপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : اَلْغَرْبِىّ-এর প্রতি جَانِبْ-এর ইযাফতটি اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত। আর বসরী নাহভীগণের মতে তা বৈধ নয়। কেননা صِفَتْ ও مَوْصُوْفْ একই বস্তু হয়ে থাকে। ফলে এতে اِضَافَةُ الشَّيْئِ اِلٰى نَفْسِهٖ অনিবার্য হয়, আর এটা অবৈধ। কেননা جَانِبْ এবং غَرْبِىّ একই বস্তু।

উত্তর : এ প্রশ্ন থেকে রক্ষাকল্পে غَرْبِىّ-এর মওসূফ اَلْجَمَلْ -কে উহ্য মেনেছেন। যাতে جَانِبْ-এর ইযাফত جَبَلْ-এর প্রতি হয়; اَلْغَرْبِىّ-এর প্রতি না হয়। মুসান্নিফ (র.) এখানে তিনটি শব্দ উহ্য মেনেছেন। এ তিনটির কোনো একটিকে جَانِبْ-এর مُضَافْ اِلَيْهِ বলা যেতে পারে। কূফীগণের মতে উপরিউক্ত প্রশ্ন আরোপিত হবে না। কুরআন-হাদীসে এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে।

قَوْلُهٗ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ لِذَالِكَ : অর্থাৎ আর আপনি সেসব ঘটনাকে দেখেননি।

প্রশ্ন : পূর্বে বলা হয়েছে যে, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বিদ্যমান ছিলেন না, এর দ্বারা তো দেখার বিষয়টি এমনিতেই বাদ হয়ে যায়, কাজেই وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলার প্রয়োজন কি?

উত্তর : হাজির হওয়ার জন্য দেখা জরুরি নয়। কখনো এমনো হয় যে, মানুষ হাজির থাকে সত্য; কিন্তু দেখা সম্ভব হয় না। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– لَمْ تَحْضُرْ ذَالِكَ الْمَوْضَعَ وَلَوْ حَضَرْتَهُ مَا شَاهَدْتَ وَمَا وَقَعَ فِيْهِ

قَوْلُهُ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا : এটা বাক্য হয়ে كُنْتَ-এর দ্বিতীয় خَبَرْ আবার كُنْتَ-এর যমীরের حَالْ-ও হতে পারে। هم যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কাবাসী। অর্থাৎ আপনি যখন মক্কাবাসীকে মাদায়েনবাসীদের ঘটনাবলি শুনাচ্ছিলেন তখন আপনি মাদায়েনবাসীদের সাথে বসবাসরত ছিলেন না যে, তাদের ঘটনাবলি দেখে দেখে মক্কাবাসীদেরকে শুনাচ্ছেন, বরং হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনা ও মানুষের অবস্থাদি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই তা শুনিয়ে থাকেন। এটা আপনার নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

قَوْلُهُ اَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ : اَنْ হলো تَفْسِيْرِيَّةٌ অর্থাৎ نِدَاءٌ-এর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ خُذِ الْكِتَابَ-কে তাওরাত দানের [اِيْتَاءُ تَوْرَاتْ-এর] এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর পূর্বের আয়াত– وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ-কে اِرْسَالْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। অথচ اِرْسَالْ [রাসূল বানানো] এবং اِيْتَاءُ تَوْرَاتْ-এর মাঝে ৩০ বছরের ব্যবধান ছিল। আবার কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন।

قَوْلُهُ لَوْلَا اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةٌ : এখানে لَوْلَا হলো اِمْتِنَاعِيَّةٌ যা اَوَّلْ وُجُوْدْ তথা তার পরে উল্লিখিত প্রথমটির অস্তিত্বের দরুন ثَانِيْ اِنْتِفَاءُ তথা তার পরবর্তীটির অস্তিত্ব না হওয়া বুঝায়। اَنْ تُصِيْبَهُمْ-এর মধ্যকার اَنْ হলো مَصْدَرِيَّةٌ এটা لَوْلَا اَصَابَةُ الْمُصِيْبَةِ لَهُمْ-এর অর্থ হয়ে مُبْتَدَأْ এর خَبَرْ হলো উহ্য مَوْجُوْدٌ ; لَوْلَا-এর جَوَابْ হলো উহ্য مَا اَرْسَلْنَا ; দ্বিতীয় لَوْلَا টি تَحْضِيْضِيَّةٌ ; এর জবাব হলো فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ ; বাক্যটি এরূপ হবে–

لَوْلَا قَوْلُهُمْ هٰذَا اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ لَمَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رَسُوْلًا (خُلَاصَةٌ)

اِصَابَةُ عَقَبَةٍ হলো قَوْل-এর سَبَبْ আর قَوْل হলো اِرْسَالْ-এর سَبَبْ। যেহেতু سَبَبْ-এরও سَبَبْ হয়, এর কারণে اِصَابَةُ مُصِيْبَةٍ হলো قَوْل-এর মাধ্যমে سَبَبْ হয়েছে اِرْسَالْ-এর। এ কারণে لَوْلَا-কে اِصَابَةٌ-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর فَا سَبَبِيَّةٌ-এর মাধ্যমে فَيَقُوْلُوْا-এর عَطْف হয়েছে اِصَابَةٌ এর উপর, অর্থাৎ আপনাকে প্রেরণের কারণ হলো মক্কাবাসীদের এ উক্তি। যদি মক্কাবাসীদের এ উক্তি না হতো তাহলে আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করতাম না। অর্থাৎ عَدَمْ اِرْسَالْ-এর اِنْتِفَاءٌ-(اِرْسَالْ)-এর سَبَبْ হলো اِصَابَةُ مُصِيْبَةٍ

জ্ঞাতব্য : عَدَمْ اِرْسَالْ [রাসূল রূপে প্রেরণ না করা] এর اِنْتِفَاءٌ [না হওয়া] نَفْيُ النَّفْيِ হিসেবে اِثْبَاتْ [ইতিবাচক] এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার ارسال-এর অর্থ বুঝায়।

قَوْلُهُ اَوْ لَوْ لَا قَوْلُهُمْ السَّبَبُ الخ : অর্থাৎ اَصَابَتْ مُصِيْبَةٌ [বিপদের সম্মুখীন হওয়া] এর সময় তাদের উক্তি– اِنْتِفَاءُ عَدَمِ رِسَالَتْ-এর سَبَبْ না হতো, তাহলে আমি তাদের আজাব প্রদানে ব্যস্ততা অবলম্বন করতাম না এবং আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করতাম না। এ ব্যাখ্যা মূলত حَاصِلْ مَعْنٰى-এর প্রতি লক্ষ্য করে। এর সার এই যে, لَوْلَا-এর جَوَابْ-এর اِنْتِفَاءْ-এর কারণ হলো তাদের উল্লিখিত উক্তি। এ কারণেই মুফাসসির (র.) اَلْمُسَبَّبُ عَنْهَا قَوْلُهُمْ বলেছেন।

قَوْلُهُ مَا اَرْسَلْنَاكَ : এটা نَفْيٌ-এর جَوَابْ ; এটা وُجُوْدْ شَرْط-এর কারণে اِنْتِفَاءُ جَوَابْ বুঝায়, فَالْمَعْنٰى اِنْتَفٰى عَدَمَ اِرْسَالِكَ اِلَيْهِمْ لِقَوْلِهِمُ الْمَذْكُوْرِ যাতে আজাব অবতীর্ণের সময় তাদের ওজর-আপত্তি শেষ হয়ে যায়, অন্যথায় আজাব নাজিল করলে তারা বলতে পারত যে, যদি আমাদের নিকট পূর্বের নবীগণের ন্যায় নবী আগমন করতেন; তাহলে আমরাও ঈমান আনতাম। তাহলে আজ এ আজাবে পতিত হতাম না। রাসূলে কারীম ﷺ-কে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ওজর পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, তাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং উল্লিখিত উক্তি তো হাশরের ময়দানে উপস্থাপিত হবে। আর لَوْلَا -এর অস্তিত্ব বাস্তবপক্ষে হওয়ার কারণে তা দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব না হওয়া (اِنْتِفَاءْ) বুঝায়। অথচ এখানে এ বিষয়টি এমন নয়।

উত্তর : مَانِعٌ [প্রতিবন্ধক] কখনো বাস্তবে হয়, কখনো তা مَفْرُوْضٌ তথা ধরে নিতে হয়। এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ (جُمَلٌ)

قَوْلُهُ اَوِ الْكِتَابُ : এর দ্বারা مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। اَوِ الْكِتَابُ -এর **عَطْف** হলো اَلْاٰيَاتُ -এর উপর।

قَوْلُهُ سَاحِرَانِ : এটা উহ্য هُمَا মুবতাদার خَبَرْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ .... بَصَائِرَ لِلنَّاسِ : পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নূহ, হুদ, সালেহ ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ -এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ- জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَائِرَ لِلنَّاسِ এখানে نَاسٌ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোনো খটকা নেই। কারণ সেই উম্মতের জন্য তাওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি نَاسٌ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর যুগে যে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতের মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এছাড়া এ থেকে জরুরি হয় যে, মুসলমানদেরও তাওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাওরাতের উপদেশাবলি পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তাওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং সেটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কুরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো রহিত আসমানীগ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থি ছিল। এ থেকে জরুরি নয় যে, সর্বাবস্থায় তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেই সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেজ্ঞ আলেম শ্রেণি। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

قَوْلُهُ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ : এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ অর্থাৎ এমন কোনো উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোনো পয়গাম্বর আসেননি। এই বাণী আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোনো নবী আসেননি। কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ : এ আয়াতসমূহে প্রিয়নবী ﷺ--এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি কোনো মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনাসমূহ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন যেন ঐগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ.

অর্থাৎ "আর [হে রাসূল!] আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না।"

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, পশ্চিম প্রান্ত বলে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের সংগে কথা বলেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতের وَمَا كُنْتَ শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আল্লাহ পাক যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর اَلشّٰهِدِيْنَ শব্দ দ্বারা সেই ৭০ জন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, সেখানেও আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না; অথচ সেসব ঘটনা আপনি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আপনাকে এসব গায়েবী ইলম দান করেছেন। কেননা আপনি তাঁর প্রেরিত নবী, আর এসব সত্য ঘটনার সঠিক ইলম আল্লাহ পাক আপনাকে [মুজেযা স্বরূপ] দান করেছেন। এজন্যেই প্রিয়নবী ﷺ -ইরশাদ করেছেন– اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত ইলম দান করা হয়েছে। আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহান বাণী।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ...... وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাসূলগণের আবির্ভাব এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে বিষয়টিকে আরো দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে পেশ করা হয়েছে যে, নবী রাসূল প্রেরণ একটি চূড়ান্ত দলিল। অর্থাৎ এটা সর্বশেষ দলিল যার মধ্য দিয়ে বান্দার জন্যে সকল প্রমাণ প্ররিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের কয়েকটি ওজর-আপত্তির উল্লেখ করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল প্রেরণ করার পর কাফেররা কিয়ামতের দিন আর এ ওজর পেশ করতে পারবে না যে, আমাদেরকে কেন অকারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলিল পরিপূর্ণ হওয়ার পরই আজাব এসে থাকে এবং রাসূল প্রেরণই হচ্ছে এ পর্যায়ের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত দলিল। এরপর অপরাধীর জন্যে আর কোনো ওজর আপত্তির সুযোগ থাকে না। তাই ইরশাদ হয়েছে ....وَلَوْلَا اَنْ

অর্থাৎ "আর যদি রাসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোনো বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎকাজ করতাম।"

এ দাবি অনুযায়ী তাদের উচিত রাসূলের আগমনকে একটি বড় নিয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দীনকে তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেওয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কোনো নবী প্রেরণের পূর্বে কাফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রাসূলের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। যখন তাদের কাছে 'সত্য' নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগল, আপনাকে সেই সকল মুজেযা কেন দেওয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল? যেমন- হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। যদি আপনার নিকটও এমন মুজেযা থাকতো, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। শুধু তাই নয়, বরং কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে একথাও বলতো, কুরআন যদি তাওরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাজিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কেননা সকল নবী রাসূলের মুজেযা একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থা একইভাবে নাজিল হওয়া ও জরুরি নয়। অথচ পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থে।

আবদ ইবনে হামিদ, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদেরকে বলতো যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তোমরা বল, ইনি কেমন রাসূল? যদি তিনি সত্য রাসূল হন, তবে তাঁকে মূসার ন্যায় মুজেযা কেন দেওয়া হলো না, আর এই কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় তবে তা তাওরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাজিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?

আল্লাহ পাক তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে ইরশাদ করেছেন- أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলছে মূসা যেমন মুজেযা পেয়েছিল এ রাসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হলো যে তারা কি ইতিপূর্বে হযরত মূসাকে (আ.) অস্বীকার করেনি? প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ণ মজ্জাগত, তাই রাসূল প্রেরণ না করলে তারা বলতো, আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি রাসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রাসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছে।

قَوْلُهُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ : অর্থাৎ "তারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি।

তাফসীরকারগণ "দু'টিই জাদু"-এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তাওহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তাওরাত এবং কুরআনে কারীম; আর তাওরাত ও কুরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা- ২০, পৃ. ৩৪]

আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানি না। মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর যদি অনুরূপ মুজেযা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে, হুজুর আকরাম ﷺ সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কুরআন

আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানি না, পবিত্র কুরআন ও তাওরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই জাদু মনে করি, [হযরত] মূসা এবং [হযরত] মুহাম্মদ ﷺ উভয়েই জাদুকর। [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]

قَوْلُهُ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَا অর্থাৎ "[হে রাসূল!] আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনয়ন কর যা উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম তবে তা আমি মেনে চলবো।"

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা কোনো কিতাবেরই সমকক্ষ হবে না, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।

قَوْلُهُ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ : "এরপর [হে রাসূল] তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে"।

অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না। এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয় তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?

٥١. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا بَيَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ الْقُرْاٰنَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَتَّعِظُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

٥٢. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ اَىْ الْقُرْاٰنِ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ـ اَيْضًا نَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ اَسْلَمُوْا مِنَ الْيَهُوْدِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهٖ وَمِنَ النَّصَارٰى قَدِمُوْا مِنَ الْحَبْشَةِ وَمِنَ الشَّامِ ـ

٥٣. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ الْقُرْاٰنُ قَالُوْاۤ اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ مُوَحِّدِيْنَ ـ

٥٤. اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِاِيْمَانِهِمْ بِالْكِتَابَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا وَيَدْرَءُوْنَ يَدْفَعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ يَتَصَدَّقُوْنَ ـ

٥٥. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ الشَّتْمَ وَالْاَذٰى مِنَ الْكُفَّارِ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز سَلَامُ مُتَارَكَةٍ اَىْ سَلِمْتُمْ مِنَّا مِنَ الشَّتْمِ وَغَيْرِهٖ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ لَا نَصْحَبُهُمْ ـ

অনুবাদ :

৫১. আমি তো পৌঁছে দিয়েছি বর্ণনা করেছি তাদের নিকট বাণী কুরআন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ফলে তারা ঈমান আনয়ন করবে।

৫২. ইতিপূর্বে কুরআনের পূর্বে, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ আয়াতটি ইহুদিদের সে সকল ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। আর খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে সে সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা আবিসিনিয়া ও সিরিয়া থেকে আগমন করেছিলেন।

৫৩. যখন তাদের নিকট কুরআন আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলাম।

৫৪. তাদেরকেই দু বার প্রতিদান দেওয়া হবে। দুটি কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের কারণে। যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। উভয়ের উপর আমলের ক্ষেত্রে তাদের ধৈর্যের কারণে এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে তাদের মধ্য হতে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে সদকা করে।

৫৫. তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে কাফেরদের পক্ষ হতে গালমন্দ ও নির্যাতনের তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য. তোমাদের প্রতি সালাম। এটা একে অন্যের পেছনে লেগে না থাকাটা সালাম-জ্ঞাপক। অর্থাৎ তো[illegible] আমাদের গালমন্দ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ। আম[illegible] অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। অর্থাৎ তাদের সা[illegible] থাকব না।

অনুবাদ :

٥٦. وَنَزَلَ فِىْ حِرْصِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِيْمَانِ عَمِّهٖ اَبِىْ طَالِبٍ اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ هِدَايَتَهٗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

৫৬. রাসূল ﷺ -এর চাচা আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তাঁর অধিক আগ্রহের কারণে অবতীর্ণ হয়– আপনি যাকে ভালোবাসেন যার হেদায়েত কামনা করেন। ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে আনয়ন করেন তিনিই ভালো জানেন অবগত আছেন সৎপথ অনুসারীদের ব্যাপারে।

٥٧. وَقَالُوْا اَىْ قَوْمُهٗ اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ط اَىْ نُنْتَزَعْ مِنْهَا بِسُرْعَةٍ قَالَ تَعَالٰى اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يَاْمَنُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْاِغَارَةِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعَيْنِ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلٰى بَعْضٍ يُجْبٰٓى بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ مِّنْ كُلِّ اَوْبٍ رِزْقًا لَّهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا اَىْ عِنْدِنَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ مَا نَقُوْلُهٗ حَقٌّ ـ

৫৭. তারা বলে অর্থাৎ তার সম্প্রদায় আমরা যদি আপনার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। অর্থাৎ আমাদের থেকে তা দ্রুত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি। যেখানে লুটপাট ও হত্যা থেকে নিরাপদ থাকে; যাতে আরবরা একে অন্যের সাথে নিপতিত রয়েছে। যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় সর্বদিক থেকে। يُجْبٰى শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। রিজিক স্বরূপ তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। যে, আমি যা বলি তা-ই সত্য।

٥٨. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا اَىْ عَيْشَهَا وَاُرِيْدَ بِالْقَرْيَةِ اَهْلُهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ط لِلْمَارَّةِ يَوْمًا اَوْ بَعْضَهٗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ مِنْهُمْ ـ

৫৮. আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগসম্পদের দম্ভ করত। অর্থাৎ তাদের সুখ-সামগ্রীর উপর। এখানে اَلْقَرْيَةُ দ্বারা তার অধিবাসী উদ্দেশ্য। এগুলো তো তাদেরই ঘরবাড়ি; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। অর্থাৎ গমনকারীরা একদিন বা তার কিছু অংশ পরিমাণ। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। তাদের থেকে।

অনুবাদ :

٥٩. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ أَهْلِهَا حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ أُمِّهَا اَىْ أَعْظَمِهَا رَسُوْلاً يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ .

৫৯. আপনার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না। তার অধিবাসীদের অত্যাচারের কারণে তার কেন্দ্রে সর্ববৃহৎ অংশে রাসূল প্রেরণ না করে যিনি তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর অধিবাসীরা জুলুম করে। রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে।

٦٠. وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ط اَىْ تَتَمَتَّعُوْنَ وَتَتَزَيَّنُوْنَ بِهٖ اَيَّامَ حَيٰوتِكُمْ ثُمَّ يَفْنٰى وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ ثَوَابُهٗ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ . بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَنَّ الْبَاقِىَ خَيْرٌ مِنَ الْفَانِىْ .

৬০. তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা অর্থাৎ যা দ্বারা তোমরা পার্থিব জীবনে উপভোগ কর এবং সজ্জিত হও। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর তা হলো এর পুণ্যফল তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না। যে, স্থায়ী বস্তু অস্থায়ী বস্তু হবে উৎকৃষ্ট تَعْقِلُوْنَ শব্দটি يَاءْ এবং تَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ وَصَّلْنَا : এটা (تَفْعِيْل) مَاضِىْ جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ, অর্থ– আমি একের পর এক প্রেরণ করেছি, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ : صِلَةْ، مَوْصُوْل মিলে مُبْتَدَاْ আর هُمْ হলো দ্বিতীয় مُبْتَدَاْ-এর خَبَرْ হলো يُؤْمِنُوْنَ ; بِهٖ-এর সম্পর্ক হলো يُؤْمِنُوْنَ-এর সাথে, দ্বিতীয় مُبْتَدَاْ তার خَبَرْ সহ প্রথম مُبْتَدَاْ-এর خَبَرٌ

قَوْلُهٗ اَيْضًا : অর্থাৎ তাদের কিতাবের উপর যেরূপ ঈমান এনেছে তদ্রূপ।

قَوْلُهٗ بِصَبْرِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতের مَا-টি مَا مَصْدَرِيَّةْ

قَوْلُهٗ يَدْرَئُوْنَ : يَدْرَءُوْنَ، يُنْفِقُوْنَ ও وَاِذَا سَمِعُوْا এ সবগুলোর عَطْف হলো يُؤْتُوْنَ-এর উপর।

قَوْلُهٗ وَالْاَذٰى مِنَ الْكُفَّارِ : এটা خَاصّ-এর উপর عَامْ-এর عَطْف-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهٗ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ : এখানে اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ তথা হেদায়েত দ্বারা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার অর্থকে নَفِىْ করা হয়েছে ; اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ [পথ প্রদর্শন] -কে নয়। সুতরাং اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-এর সাথে এর কোনো সংঘাত নেই।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا اَىْ قَوْمُهُ : এখানে কওম দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর কওম উদ্দেশ্য। আর এর কথক হলো হারিস ইবনে উসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফ।

قَوْلُهُ يُجْبٰى : এর অর্থ হলো বহন করে আনা হয়, আমদানি করা হয়। مِنْ كُلِّ اَوْبٍ অর্থ– প্রত্যেক দিক তথা অঞ্চল থেকে।

قَوْلُهُ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْئٍ : এর দ্বারা আধিক্য উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ-এর মধ্যে সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু উদ্দেশ্য, দুনিয়ার সকল বস্তু উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ مَعِيْشَتَهَا اَىْ عَيْشَتَهَا : مَعِيْشَتَهَا-এর মধ্যে مُضَافٌ বিলোপ করে ظَرْفٌ তথা مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) عَيْشٌ দ্বারা مَعِيْشَةٌ-এর ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং বাক্যটি এরূপ হবে– بَطِرَتْ فِىْ زَمَنِ حَيَاتِهَا

قَوْلُهُ لَمْ تَسْكُنْ : এটা বাক্য হয়ে حَالٌ হয়েছে, আমিল হলো [أُشِيْرَ-এর অর্থবোধক] تِلْكَ ; আর تِلْكَ শব্দটি مُبْتَدَأٌ-এর দ্বিতীয় خَبَرٌ-ও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا : এর মধ্যকার مَا হলো شَرْطِيَّةٌ আর مِنْ شَيْئٍ হলো এর বিবরণ। فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا হলো هُوَ উহ্য। مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ এবং বাক্য হয়ে جَوَابُ شَرْط

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, এভাবে মানুষের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে করে কেউ কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে যদি আমাদের হেদায়েতের সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আমরাও মুমিন হতাম। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি হক্ব বা সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি, আর তাদের হেদায়েতের জন্যে আমার বাণীকে বার বার প্রেরণ করোছি, কুরআনে কারীমকে ধারাবাহিকভাবে অনবরত নাজিল করেছি, যাতে করে মানুষ তার মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা স্মরণ করতে পারে। একই সঙ্গে পবিত্র কুরআন নাজিল করলে এ সুযোগ হতো না। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আর নিশ্চয় আমি তাদের নিকট আমার বাণী প্রেরণ করতে থাকি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ الخ : শানে নুযূল : ইবনে জারীর কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কিতাবের দশজন লোক সত্যের অনুসারী ছিলেন, যখন প্রিয়নবী ﷺ-এর শুভাগমন হয়, তখন তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য আয়াত তাঁদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। –[বগভী, ইবনে মরদবিয়া]

তাবারানী (র.) আওসাত গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধিতি দিয়ে বলেছেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর (র.) সাথীদের মধ্যে থেকে চল্লিশ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সপ্তম হিজরিতে অনুষ্ঠিত খায়বারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আহত হয়েছিলেন। খায়বারের ঘটনার পর তাঁরা দেখলেন, মুসলমানগণ অত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত, তাই তাঁরা প্রিয়নবী ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা অর্থ-সম্পদশালী লোক, আমাদেরকে অনুমতি দান করুন আমরা যেন অর্থ সম্পদ নিয়ে আসতে পারি এবং মুসলমানগণের সাহায্য করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম (র.) সাঈদ ইবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন হযরত জাফর (রা.) এবং তাঁর সাথীগণ যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গমন করেন, তখন নাজ্জাশী তাঁদের মেহমানদারী করেন এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত

ভালো ব্যবহার করেন। যখন তাঁরা সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন নাজ্জাশীর দেশের সীমান্তের অধিবাসী কিছু লোক নাজ্জাশীর নিকট বলেন যে, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি এবং সামুদ্রিক সফরে তাঁদের খেদমত করতে পারি। এরপর প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে পুনরায় আমরা ঈমান আনব, নাজ্জাশীর অনুমতিক্রমে তাঁরা হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন এবং উহুদ, খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গেই শরিক হলেন। এরপর তারা অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, আমাদেরকে দেশে ফেরত যেতে দিন, আমাদের অর্থ সম্পদ রয়েছে, তা দেশ থেকে এনে আমরা মুসলমান ভাইদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই। কেননা মুহাজিরগণ আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত কষ্টে রয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা দেশে চলে গেলেন এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে এসে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন, তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ : وَصَّلْنَا শব্দটি تَوْصِيْل থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি : এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গাম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারো মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোনো সুহৃদ উপদেশদাতার নেই; কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, নাকি সব উম্মতের জন্য ব্যাপক? إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলেমগণ বললেন, আমরা তো কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ [অনুগত, আজ্ঞাবহ] নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কুরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গাম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'ইসলাম ও 'মুসলিম' শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি স্বয়ং কুরআনেই আছে যে- هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

আল্লামা সূয়ূতী (র.) এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গাম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি- এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারূক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারূক হতে পারেন।

قَوْلُهُ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে বা প্রতিদান দেওয়া হবে। কুরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্রা ভার্যাগণ সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– ১. যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ২. যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন মনিবেরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করে। ৩. যার মালিকানায় কোনো বাঁদি ছিল। এই বাঁদির সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েজ ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই, কয়েক প্রকার লোককে দুবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দু'টি তাই তাদেরকে দুবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, পূর্বে এক পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য তথা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং মনিবের আনুগত্য। বাঁদিকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জবাবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিত্তিক হওয়ার কারণ সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে সে দুই পুরস্কার পাবে। কুরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এইযে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কুরআনিক বিধি– لَا يُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল কারীর আমল বিনষ্ট করেন না; বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসাবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাজের দ্বিগুণ, রোজা, সদকা, হজ ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল أَجْرَيْنِ ; কিন্তু কুরআন এর পরিবর্তে বলেছে– أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক আমল দুইবার লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা আছে তিনি বিশেষ কোনো আমলকে অন্যান্য আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারো এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রোজার ছওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? জাকাত ও সদকার ছওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চেয়ে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য– بِمَا صَبَرُوْا-এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ ছওয়াবের কারণ।

قَوْلُهُ وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ : অর্থাৎ তারা মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভালো বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গুনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেন– اِتَّبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ গুনাহের পর নেক কাজ কর। নেক কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনুবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জবাব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভালো ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে। যথা– ১. কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেল তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যেমনটা উপরে মুয়াজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. কেউ কারো প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরিয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভালো এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর [জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর]। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ : অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোনো অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ : শানে নুযূল : যখন হুজুর ﷺ-এর বিশেষ পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিবের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট গমন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে আরজ করলেন, চাচাজান! আপনি একটি বার মুখে এ কথা বলুন যে, লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু; যাতে আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু সে সময় পার্শ্বে কতিপয় কুরাইশ নেতৃবর্গও উপস্থিত ছিল। তাদের কারণে তিনি কালিমা শরীফ পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে এ কথা বলেছিলেন যে, ভাতিজা ! আমি জানি যে, তুমি সত্যবাদী, কিন্তু আমি একথা সহ্য করতে পারি না যে, লোকেরা আমার মৃত্যুর পর এ কথা বলবে যে, আবূ তালিবকে মৃত্যুর ভয় পেয়ে বসেছে। যদি এ আশঙ্কা না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমার চক্ষুশীতল করে দিতাম। কারণ আমি তোমার মনের আক্ষেপ ও কল্যাণকা-মিতা প্রত্যক্ষ করছি। এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন–

لَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ ٭ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حِذَارُ مُسَبَّةٍ ٭ لَوَجَدْتَنِىْ سَمَاحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا

তবে এরপর তিনি বলেন– لٰكِنْ سَوْفَ اَمُوْتُ عَلٰى مِلَّةِ الْاَشْيَاخِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمٍ وَعَبْدِ مَنَافٍ ثُمَّ مَاتَ

অর্থাৎ "তবে আমি মৃত্যুবরণ করছি আমার পূর্বসূরিদের ধর্মের উপর, আর তারা হলেন আব্দুল মুত্তালিব, হাশিম, ও আবদে মানাফ" অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

এতে নবী করীম ﷺ অতিশয় ব্যথিত হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ অর্থাৎ কাউকে ঈমানদার বানানো এবং হৃদয়ে ঈমান প্রবিষ্ট করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। আপনার কাজ হলো কেবল চেষ্টা পরিশ্রম করতে থাকা। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে যে, খাজা আবূ তালিবের কুফর ও ঈমানের ব্যাপারে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ এতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মনে কষ্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। [এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত]

قَوْلُهٗ قَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا : অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে। –[নাসায়ী]

কুরআন পাক তাদের এই খোড়া অজুহাতের নিম্নোক্ত তিনটি জবাব দিয়েছে–

প্রথম জবাব : أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাজতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হেরেম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোরতর হারাম। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছুনয়। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হেরেমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিজিক স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না, উল্টা ভয় হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতে হেরেমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যথা– ১. এটা শান্তির আবাসস্থল ২. এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন : মক্কা মুকাররামা যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহ হিসেবে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোনো বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরো বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনো শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে; বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময় প্রচুর পরিমাপে তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرَاتٌ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থানটি ছিল এরূপ বলার– ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ ; এর পরিবর্তে ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, ثَمَرَاتٌ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোনো উৎপাদন। মিল কারখানার নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ثَمَرَاتٌ তথা উৎপন্ন দ্রব্য। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হেরেমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানি হবে না; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোনো দেশেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জবাব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোনো কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামাগ্রী এখানে এনে একত্র করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে– এরূপ আশঙ্কা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয় জবাব : তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জবাব হলো– وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপাদাশঙ্কা বোধ কর না; কিন্তু ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর।

তৃতীয় জবাব : তাদের অজুহাতের তৃতীয় জবাব হলো– وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী এবং কারো কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী সম্পদ ও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

قَوْلُهُ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا : অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আজাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'-এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোনো বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-এর অর্থ সামান্য ক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্য ক্ষণ থাকে, যেমন– কোনো পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

قَوْلُهُ أُمٌّ حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْ أُمِّهَا رَسُوْلًا : أُمّ শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। أُمِّهَا-এর সর্বনাম দ্বারা قُرٰى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোনো রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করেন না, তখন জনপদসমূহের উপর আজাব নেমে আসে। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই কোনো বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহর পয়গাম কবুল করা ফরজ হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আজাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন : এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোনো নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার উপর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমজান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকহবিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারি না করা পর্যন্ত জরুরি হবে না। –[ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়া]

قَوْلُهُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى : অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকারে দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরিয়তসম্মত প্রাপক হবে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

অনুবাদ :

٦١. اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ مُصِيْبُهُ وَهُوَ الْجَنَّةُ كَمَنْ مَتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَيَزُوْلُ عَنْ قَرِيْبٍ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ . اَلنَّارُ اَلْاَوَّلُ الْمُؤْمِنُ وَالثَّانِيْ الْكَافِرُ اَيْ لَا تَسَاوِيْ بَيْنَهُمَا .

৬১. যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে পাবে আর তা হলো জান্নাত সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি। যা অতি নিকটকালেই নিঃশেষ হয়ে যাবে যাকে পরে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে জাহান্নামের আগুনে। এখানে প্রথমজন হলো মুমিন, আর দ্বিতীয়জন হলো কাফের। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো সমতা নেই।

٦٢. وَاذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ هُمْ شُرَكَائِيْ .

৬২. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন তিনি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আহবান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে শরিক আমার অংশীদার। গণ্য করতে তারা কোথায়?

٦٣. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِدُخُوْلِ النَّارِ وَهُمْ رُؤَسَاءُ الضَّلَالَةِ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج مُبْتَدَأٌ وَصِفَتُهُ اَغْوَيْنٰهُمْ خَبَرُهُ فَغَوَوْا كَمَا غَوَيْنَا ج لَمْ نُكْرِهْهُمْ عَلَى غَيٍّ تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ ز مِنْهُمْ مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ . مَا نَافِيَةٌ وَقُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلْفَاصِلَةِ .

৬৩. যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, নরকাগ্নিতে প্রবেশ করার। তারা হলো চরম পথভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদা এবং সিফত এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদার খবর, ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে বাধ্য করিনি আমরা আপনার সমীপে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি তাদের থেকে। এরা তো আমাদের উপাসনা করত না এখানে مَا টি হলো نَافِيَةٌ আর আয়াতের শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য মাফউলকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦٤. وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ اَيْ الْاَصْنَامَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللّٰهِ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ دُعَاءَهُمْ وَرَاَوُا هُمُ الْعَذَابَ اَبْصَرُوْهُ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ فِي الدُّنْيَا مَا رَاَوْهُ فِي الْاٰخِرَةِ .

৬৪. তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহবান কর। অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরিক বলে মনে করতে তখন এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে চাক্ষুষ দেখবে হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত। পৃথিবীতে অবস্থানকালে। তবে তারা পরকালে শাস্তি প্রত্যক্ষ করত না।

অনুবাদ :

٦٥. وَ اذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَيْكُمْ ـ

৬৫. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন এদেরকে ডাকবেন আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? তোমাদের নিকট প্রেরিতগণকে।

٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ الْاَخْبَارُ الْمُنْجِيَةُ فِى الْجَوَابِ يَوْمَئِذٍ اَىْ لَمْ يَجِدُوْا خَبَرًا لَهُمْ فِيْهِ نَجَاةٌ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ـ عَنْهُ فَيَسْكُتُوْنَ ـ

৬৬. সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে উত্তরের ক্ষেত্রে নাজাত দানকারী তথ্যাবলি। অর্থাৎ এমন কোনো তথ্য পাবে না যার মধ্যে তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। আর এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না সে সম্পর্কে; বরং নীরব হয়ে থাকবে।

٦٧. فَاَمَّا مَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ وَاٰمَنَ صَدَّقَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اَدَّى الْفَرَائِضَ فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ النَّاجِيْنَ بِوَعْدِ اللّٰهِ ـ

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে শিরক হতে এবং ঈমান এনেছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করেছে ফরজসমূহ পালন করেছে আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুপাতে মুক্তিপাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ط مَا يَشَآءُ مَا كَانَ لَهُمْ لِلْمُشْرِكِيْنَ الْخِيَرَةُ ط الْاِخْتِيَارُ فِىْ شَىْءٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ عَنْ اِشْرَاكِهِمْ ـ

৬৮. আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের মুশরিকদের কোনো হাত নেই। এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। তাদের শরিক স্থাপন থেকে।

٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ تُسِرُّ قُلُوْبُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهٖ وَمَا يُعْلِنُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ ـ

৬৯. আর আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তরে যা গোপন করে অর্থাৎ তাদের হৃদয় কুফর ইত্যাদি হতে যা লুকিয়ে রাখে। এবং তারা যা ব্যক্ত করে। তাদের রসনার মাধ্যমে, মিথ্যা ইত্যাদি।

٧٠. وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ الْجَنَّةِ وَلَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالنُّشُوْرِ ـ

৭০. তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সকল প্রশংসা তাঁরই ইহকালে পৃথিবীতে ও পরকালে জান্নাতে বিধান তাঁরই সর্ববিষয়ে জারিকৃত সিদ্ধান্ত তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٧١. قُلْ لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ اَرَاَيْتُمْ اَىْ اَخْبِرُوْنِىْ وَاِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا دَائِمًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ط نَهَارٍ تَطْلُبُوْنَ فِيْهِ الْمَعِيْشَةَ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ذٰلِكَ سِمَاعَ تَفَهُّمٍ فَتَرْجِعُوْنَ عَنِ الْاِشْرَاكِ ـ

৭১. আপনি বলুন! মক্কাবাসীকে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? অর্থাৎ আমাকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন। তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে যে, তোমাদের আলোক এনে দিতে পারে? দিন যাতে তোমরা জীবিকা অন্বেষণ করবে তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না। বুঝার জন্য। ফলে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ হতে ফিরে আসবে।

٧٢. قُلْ لَهُمْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ تَسْتَرِيْحُوْنَ فِيْهِ ط مِنَ التَّعْبِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَاءِ فِى الْاِشْرَاكِ فَتَرْجِعُوْنَ عَنْهُ ـ

৭২. আপনি বলুন তাদেরকে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার আরাম গ্রহণ করতে পার ক্লান্তি থেকে। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণের কারণে তোমরা ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছ, ফলে তার থেকে ফিরে আসবে।

٧٣. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ تَعَالٰى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ فِى اللَّيْلِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ فِى النَّهَارِ بِالْكَسْبِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ النِّعْمَةَ فِيْهِمَا ـ

৭৩. তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার রজনীতে এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার দিবসে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। রাতে দিনে তার নিয়ামতের।

অনুবাদ :

٧٤. وَ اذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ذُكِرَ ثَانِيًا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ـ

৭৪. স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক গণ্য করতে তারা কোথায়? সামনের কথাকে এর উপর ভিত্তি করার উদ্দেশ্যে এটাকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

٧٥. وَنَزَعْنَا اَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا وَ هُوَ نَبِيُّهُمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوهُ فَقُلْنَا لَهُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلٰى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْاِشْرَاكِ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ فِي الْاِلٰهِيَّةِ لِلّٰهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا اَحَدٌ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ـ فِي الدُّنْيَا مِنْ اَنَّ مَعَهُ شَرِيكًا تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ ـ

৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব আর তিনি হলেন তাদের নবী। তিনি তাদেরকে যা বলেছেন সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং বলব তাদেরকে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর শিরক সম্পর্কে তোমরা যা বলতে সে বিষয়ে তখন তারা জানতে পারবে যে, ইলাহ হওয়ার অধিকার আল্লাহরই তাতে কেউই অংশীদার নয়। এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে। পৃথিবীতে যে, তাঁর সাথে অংশীদার রয়েছে। আল্লাহ তা থেকে ঊর্ধ্বে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ; এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের জবাব স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে–

প্রশ্ন : সেদিন মুশরিকদরেকে বলা হবে যে, আমার শারকগণ কোথায়, যাদের তোমরা উপাসনা ও পূজা-অর্চনা করতে? এ প্রশ্নের উত্তরদানের পরিবর্তে মুশরিকদের নেতৃবর্গের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যাবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে দোষারোপ করবে, আর অনুসৃতগণ অনুসারীদেরকে দোষ চাপাবে।

قَوْلُهُ مُبْتَدأٌ وَصِفَتُهُ : এখানে هٰؤُلَاءِ হলো مَوْصُوف আর , الَّذِينَ হলো اِسْمُ مَوْصُول আর اَغْوَيْنَا জুমলা হয়ে তার صِلَةٌ , এখানে عَائِدٌ هُمْ উহ্য রয়েছে, বাক্যটি এরূপ ছিল– اَغْوَيْنَاهُمْ . مَوْصُوْل صِلَةٌ মিলে صِفَتٌ আর مَوْصُوْف এবং خَبَرٌ হলো اَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا মিলে مُبْتَدأٌ এবং صِفَتْ

قَوْلُهُ قُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلْفَاصِلِ : মূলত বাক্যটি ছিল– مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَنَا আয়াতের শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য مَفْعُوْل-কে আগে আনা হয়েছে। ফলে مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا رَاَوْهُ فِي الْاٰخِرَةِ : এটা হলো لَمْ-এর جَوَابٌ, কেউ কেউ لَا نجاهم ذَالِكَ-কে উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় হেদায়েতের উপর থাকত তাহলে তাদের হেদায়েত পরকালে তাদেরকে কামিয়াব করে দিত।

قَوْلُهُ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ : এখানে বাক্যে قَلْبٌ বা স্থানচ্যুতি ঘটেছে। আর এটা বাক্যের অলংকার বিবেচিত হয়। মূলত فَعَمُوْا عَنِ الْاَنْبَاءِ ছিল। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি لَمْ يَجِدْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ : এখানে عَمّى -এর- صِلَةٌ -عَلىٰ আসায় তা خَفِيْ -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ : এখানে عَسٰى تَحْقِيْق -এর জন্য, تَقْرِيْب -এর জন্য নয়। কেননা বড়দের পক্ষ থেকে আশা প্রদান করাটা তা বাস্তবায়িত হওয়ার একীন বুঝায়। আর আল্লাহ তা'আলা তো اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ [সকল দয়ালুদের দয়ালু] অতএব, আল্লাহ তা'আলার বাণীতে عَسٰى শব্দটি حَقِّقْ অর্থে হবে। আর যদি تَرَجِّى তথা সন্দেহসূচক অর্থেই নেওয়া হয় তাহলে তা তত্ত্বাকারীদের বিবেচনায় হবে।

قَوْلُهُ سَرْمَدًا : سَرْمَدًا শব্দটি جَعَلَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل সদা অর্থে, এটা سَرْد হতে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ আবিরত হওয়া, একের পর এক হওয়া, এতে مِيْم -টি অতিরিক্ত। আরবগণ হারাম মাসগুলো সম্পর্কে বলতেন– ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ وَاحِدٌ فَرْدٌ তিনটি মাস ধারাবাহিক, আর একটি পৃথক।

قَوْلُهُ قُلْ لَهُمْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا : এটা تَنَازُعُ الْفِعْلَانِ -এর অন্তর্গত اَرَاَيْتُمْ এবং جَعَلَ উভয়টি اَللَّيْلَ -কে মাফউল বানাতে চায়, উভয়টি চায় তার مَعْمُوْل তথা مَفْعُوْل اَللَّيْلُ -কে আমল দিতে। এখানে দ্বিতীয়টির আমল দেওয়া হয়েছে, আর প্রথম فِعْل -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত গণ্য করা হয়েছে। আর সেটা হলো اَرَاَيْتُمُوْهُ -এর মধ্যকার ه যমীর। এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো পরে উল্লিখিত প্রশ্নবোধক বাক্যটি। দ্বিতীয় ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল হলো سَرْمَدًا আর اَنْ হলো حَرْفُ شَرْط- جَعَلَ হলো فِعْل شَرْط- اَللّٰهُ হলো তার فَاعِلْ, اَللَّيْلَ হলো جَعَلَ -এর প্রথম مَفْعُوْل এবং سَرْمَدًا দ্বিতীয় مَفْعُوْل এখানে جَوَابُ شَرْط উহ্য রয়েছে, তা হলো مَاذَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا مَاذَا تَفْعَلُوْنَ [আল্লাহ যদি তোমাদের উপর স্থায়ী করে দিত তাহলে তোমরা কি করতে?]

قَوْلُهُ ذَكَرَ ثَانِيًا : অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উল্লেখের কারণ হলো তার উপর পরবর্তী কথার ভিত্তি করা।

قَوْلُهُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ : এটাকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। হুবহু এ আয়াত সূরার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছিল। ইমাম বায়যাভী (র.) বলেন– تَقْرِيْعٌ بَعْدَ تَقْرِيْعٍ অর্থাৎ এটা হলো তিরস্কারের পর তিরস্কার। কেননা শিরকের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় কোনো বিষয় নেই অথবা প্রথমটি তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধারণা বর্ণনা করার জন্যে, আর দ্বিতীয়টি এ কথা বলার জন্যে যে, শিরকী মতবাদ কোনো গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়; বরং তা নিছক কাল্পনিক ও স্বরচিত বিষয় মাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমান আনয়ন এবং হেদায়েত গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, এমনিভাবে কুফর ও নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেভাবে ঈমান ও হেদায়েতের সুফল কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে, ঠিক তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানির শোচনীয় পরিণতিও ভোগ করতে হবে আখিরাতে। আলোচ্য আয়াতের প্রারম্ভে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানের পার্থক্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রয়েছে।

তাই ইরশাদ হয়েছে– اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক তার ঈমান এবং নেক আমলের কারণে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে তা অবশ্যই পাবে। সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেছেন, এ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ হয়ে সে জীবনকে অতিবাহিত করেছে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবন যাপন করেছে, উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না, যেমন সমান হতে পারে না আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিল।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরিক বলতে এবং তাঁদের কথামতো চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে

কি? জবাবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গাম্বরগণও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গাম্বরগণের কথা আগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো ধর্তব্য ওজর নয়।

قَوْلُهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : শানে নুযূল : যখন নবী করীম ﷺ নবুয়তের দাবি করলেন, তখন মানুষের নিকট তার কথা বিস্ময়কর মনে হলো। বিশেষ করে অলীদ ইবনে মুগীরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, আল্লাহ তা'আলার যদি কাউকে নবী বানানোর প্রয়োজনই হতো তাহলে মক্কা ও তায়েফের দু'নেতার মধ্য হতে একজনকে বানালেন না কেন? তারাই তো এর যোগ্য ছিল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[জুমাল]

قَوْلُهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : يَخْتَارُ-এর অর্থ– বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যিম (র.) যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, يَخْتَارُ-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভী (র.)-এর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জবাব যে– لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এই কুরআন আরবের দুটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাজিল করার রহস্য কি? এ জবাবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্টজগতকে কোনো অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোনো বান্দাকে বিশেষ দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক বক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা : হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (র.) এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ঊর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গাম্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গাম্বরগণকে অন্য পয়গাম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও তাঁর হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গাম্বরগণের উপর, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কুরাইশকে তাদের সবার উপর, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সব বনী হাশিমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও দান করাও আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা

সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (র.) এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী এবং অতঃপর আলী মুর্তজা (রা.)-এর ক্রমকে উপরিউক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (র.)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। بَعْدَ التَّفْصِيْلِ لِمَسْئَلَةِ التَّفْضِيْلِ নামে মুফতী শফী (র.)-এর উর্দূ তরজমা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি আহকামুল কুরআন গ্রন্থের সূরা কাসাসেও আরবি ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا .... اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَاءٍ বলে তার কোনো উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলো যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোর অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়; বরং শুধুমাত্র মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ এবং রাত্রির ব্যাপারের শেষে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতায় তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। -[মাযহারী]

অনুবাদ :

٧٦. اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى ابْنِ عَمِّهٖ وَابْنِ خَالَتِهٖ وَاٰمَنَ بِهٖ فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص بِالْكِبَرِ وَالْعُلُوِّ وَكَثْرَةِ الْمَالِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ تُثْقِلُ بِالْعُصْبَةِ الْجَمَاعَةِ اُولِى اَصْحَابِ الْقُوَّةِ اَىْ تُثْقِلُهُمْ فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ وَعِدَّتُهُمْ قِيْلَ سَبْعُوْنَ وَقِيْلَ اَرْبَعُوْنَ وَقِيْلَ عَشَرَةٌ وَقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ اُذْكُرْ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ فَرَحَ بَطَرٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ بِذٰلِكَ ـ

৭৬. কারূন তো ছিল হযরত মূসা (আ) এর সম্প্রদায়ভুক্ত। তার চাচাতো ও খালাতো ভাই। সে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করোছিল। অহংকার, উন্নতি ও সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান ও শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টে ফেলে দিত। এখানে بِالْعُصْبَةِ-এর بَاءٌ টি تَعْدِيَةٌ-এর জন্য তথা تَنُوْٓءُ ক্রিয়াটি স্বকর্ম ক্রিয়ায় পরিণত করার জন্য। তাদের লোকসংখ্যা ৭০ জন, কারো মতে ৪০ জন, কারো মতে ১০ জন ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মুমিনগণ দম্ভ করো না সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে, দাম্ভিকতামূলক আনন্দ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। এর দ্বারা।

٧٧. وَابْتَغِ اُطْلُبْ فِيْمَا اٰتٰـكَ اللّٰهُ مِنَ الْمَالِ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ بِاَنْ تُنْفِقَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَلَا تَنْسَ تَتْرُكْ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اَىْ اَنْ تَعْمَلَ فِيْهَا لِلْاٰخِرَةِ وَاَحْسِنْ لِلنَّاسِ بِالصَّدَقَةِ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ تَطْلُبْ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط بِعَمَلِ الْمَعَاصِىْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ يُعَاقِبُهُمْ ـ

৭৭. আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন সম্পদ থেকে তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এভাবে যে, তুমি তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করবে এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না অর্থাৎ, দুনিয়ায় থেকে পরকালের জন্য কাজ করবে। তুমি অনুগ্রহ কর মানুষের জন্য সদকার মাধ্যমে যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। গুনাহ ও অবাধ্যাচরণের মাধ্যমে। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

অনুবাদ :

٧٨. قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ اَىِ الْمَالَ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَىْ فِىْ مُقَابَلَتِهٖ وَكَانَ اَعْلَمَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِالتَّوْرٰىةِ بَعْدَ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ قَالَ تَعَالٰى اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط لِلْمَالِ اَىْ وَهُوَ عَالِمٌ بِذٰلِكَ وَيُهْلِكُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ لِعِلْمِهٖ تَعَالٰى بِهَا فَيَدْخُلُوْنَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ .

৭৮. সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ জ্ঞানের বিনিময়ে। সে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাওরাত সম্পর্কে অবগত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক অর্থাৎ এ বিষয়ে সে ছিল অভিজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে। কাজেই তারা বিনা হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٧٩. فَخَرَجَ قَارُوْنُ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط بِاَتْبَاعِهِ الْكَثِيْرِيْنَ رُكْبَانًا مُتَحَلِّيْنَ بِمَلَابِسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلٰى خُيُوْلٍ وَبِغَالٍ مُتَحَلِّيَةٍ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ فِى الدُّنْيَا اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ نَصِيْبٍ عَظِيْمٍ وَافٍ فِيْهَا .

৭৯. কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমকতা সহকারে স্বর্ণ ও রেশমি পোশাক পরিধান করে তার অনুগত বিপুল সংখ্যক লোকের সমভিব্যহারে সুসজ্জিত অশ্ব ও খচ্চরে আরোহণ করে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহ! কারূনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো! পৃথিবীতে। প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।

٨٠. وَقَالَ لَهُمُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَيْلَكُمْ كَلِمَةُ زَجْرٍ ثَوَابُ اللّٰهِ فِى الْاٰخِرَةِ بِالْجَنَّةِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج مِمَّآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ فِى الدُّنْيَا وَلَا يُلَقّٰهَآ اَىِ الْجَنَّةَ الْمُثَابَ بِهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ . عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ .

৮০. এবং বলল তাদেরকে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা যে ব্যাপারে আল্লাহ পরকালে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন ধিক্ তোমাদেরকে। وَيْلَكُمْ শব্দটি ধিক্কারজ্ঞাপক পদ। আল্লাহর পুরস্কার পরকালের জান্নাত শ্রেষ্ঠ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য কারূনকে পৃথিবীতে যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে এবং এটা কেউ পাবে না অর্থাৎ ঈমান ও আমলের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত আনুগত্য প্রকাশ ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٨١. فَخَسَفْنَا بِهٖ بِقَارُوْنَ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِهٖ بِاَنْ يَّمْنَعُوْا عَنْهُ الْهَلَاكَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ مِنْهُ .

৮১. অতঃপর আমি তাকে কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারত। যারা তার ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে। এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না তা থেকে।

٨٢. وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ اَىْ مِنْ قَرِيْبٍ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يُوَسِّعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ج يُضَيِّقُ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ وَوَىْ اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنٰى اَعْجَبُ اَىْ اَنَا وَالْكَافُ بِمَعْنَى اللَّامِ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ كَقَارُوْنَ .

৮২. পূর্বদিনে যারা তার মতো হওয়ার কামনা করেছিল অর্থাৎ সামান্যকাল পূর্বে তারা বলতে লাগল, দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন وَىْ হলো اِسْمُ فِعْلٍ বা ক্রিয়া পদের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য اَعْجَبُ অর্থে, অর্থাৎ আমি বিস্ময় প্রকাশ করছি। আর كَافٌ হলো لَامٌ অর্থে। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন خَسَفَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। দেখলে তো কাফেররা সকলকাম হয় না আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকারকারীরা; যেমন– কারূন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِنَّ قَارُوْنَ : قَارُوْنَ [কারূন] শব্দটি অনারবী [ইবরানী] ভাষা। অনারবী (عُجْمَةٌ) ও নামবাচক (عَلَمِيَّتٌ) -এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। কারূন প্রসঙ্গে এতটুকু কথা সর্বস্বীকৃত যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ববংশীয় ছিল। বাকি আত্মীয়তার সম্বন্ধ কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন– ১. চাচাতো ভাই ২. খালাতো ভাই। আর উভয়টিই সত্য হতে পারে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর খালা হযরত মূসা (আ.)-এর চাচার বিবাহাধীন হতে পারে। এছাড়া আরো বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারূন এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ–

কারূন ইবনে ইয়াসহার, ইবনে কাহিস। আর হযরত মূসা (আ.)-এর বংশ-পরম্পরা হচ্ছে– মূসা ইবনে ইমরান, ইবনে কাহিস।

قَوْلُهٗ تَنُوْءُ : শব্দটি (ن) نَاءَ يَنُوْءُ نَوْءًا থেকে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ অর্থ– অবনমিত হওয়া, ঝুকে যাওয়া, বোঝা ভারি হওয়া।

قَوْلُهٗ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ : لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ -এর মধ্যে দু'টি ধরন হতে পারে। ক. بَاءٌ হলো تَعْدِيَةٌ -এর জন্য। এ সময় অর্থ হবে لَتَنُوْءُ الْمَفَاتِحُ الْعُصْبَةَ الْاَقْوِيَاءَ অর্থাৎ চাবি এতো বিপুল পরিমাণ ছিল যে, শক্তিশালী একদল মানুষকেও তা অবনমিত করে ফেলত। এ সময় বাক্যে قَلْبٌ হবে না। খ. বাক্যে قَلْبٌ বা পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ لَتَنُوْءُ الْمَفَاتِحُ الْعُصْبَةُ ছিল। অর্থাৎ চাবিগুলো একদল শক্তিশালী মানুষকে ক্লান্ত করে দিত। কেননা বাক্যে قَلْبٌ গণ্য না করলে অর্থ হবে– শক্তিশালী মানুষের দল চাবিগুলোকে ক্লান্ত করে দিত। আর এটা অযৌক্তিক হওয়া তো সুস্পষ্ট।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا : قَوْلُهُ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ : প্রশ্ন : এক আয়াতে يَعْمَلُوْنَ বলা হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তারা দোজখে প্রবিষ্ট হবে। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল পাপী-অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং এ উভয়টি তো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল?

উত্তর : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ দু'ধরনের।

ক. سُوَالُ اِسْتِعْتَابٌ বা তিরস্কারমূলক প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্নের পর স্বভাবত ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো পাপী মুমিনদের ক্ষেত্রে এমন ঘটবে।

খ. سُوَالُ تَقْرِيْعٍ বা বিপজ্জনক প্রশ্ন। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের পরে দোজখে প্রবিষ্ট করা হবে। এখানে প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসাবাদ এর نَفِىْ করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফের-মুশরিকদেরকে তিরস্কারমূলক প্রশ্ন করা হবে না। সুতরাং উভয় আয়াতে কোনো সংঘাত নেই।

قَوْلُهُ فَخَرَجَ : এর عَطْف হলো قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ -এর উপর মাঝের বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

قَوْلُهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ : فِئَةٌ হলো كَانَ -এর اِسْم যদি كَانَ নাকিসা হয়, আর لَهُ তার خَبَرْ হবে। আর যদি تَامَّةٌ হয় তাহলে فِئَةٌ তার فَاعِلْ হবে। يَنْصُرُوْنَهُ হবে فِئَةٌ -এর صِفَتْ ; فِئَةٌ শাব্দিকভাবে مَجْرُوْر হবে। আর অর্থের দিক দিয়ে مَرْفُوْع হবে। কারণ مِنْ হলো অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : এটা فِئَةٌ -এর حَالْ

قَوْلُهُ بِالْاَمْسِ : এর দ্বারা এর মূল অর্থ তথা গতকাল উদ্দেশ্য নয়, বরং নিকটবর্তীকাল উদ্দেশ্য। নিকটবর্তীকালকে রূপকার্থে গতকাল বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْكَاَنَّ : এটা বিস্ময় ও ধমকসূচক পদ, وَىْ -এর সমন্বিত রূপ। و হলো ضَمِيْر خِطَابْ আর اِنَّ হলো حَرْف مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ ; কেউ কেউ বলেন– وَا হলো اِسْم এটা বিস্ময়জ্ঞাপক, এরপরে কখনো কখনো هَا বৃদ্ধি করা হয়। তবে অর্থ একই থাকে। কখনো وَا -কে وَىْ পড়া হয়, আর এর পরে كَانَ যুক্ত করা হয়। যেমন বলা হয়–

وَيْكَاَنَّ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْبِبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِيْشُ عَيْشَ ضُرٍّ ـ

অর্থাৎ আরে! যার নিকট প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা থাকে তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়, আর যে অভাবী হয় সে দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিবাহিত করে। –[লুগাতুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** এ সূরার শুরুতে আল্লাহ পাক ফেরাউনের দম্ভ এবং অশান্তি সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। আর এ সূরার শেষ পর্যায়ে আরেক অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারী কারূনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফেরাউনের ন্যায় কারূনও ছিল দাম্ভিক এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী, ফেরাউনকে দান করা হয়েছিল অগাধ ধন-সম্পদ যে কারণে সে-ও অহংকার করেছিল, আর অহংকার যখন কোনো মানুষের চরিত্রে প্রবেশ করে, তখন সে অশান্তি, উপদ্রব এবং উৎপাত আরম্ভ করে , সমাজ ও জাতির জন্যে সে ডেকে আনে বিপদ, এজন্যে এসব চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করার আহবান জানায় পবিত্র কুরআন, আর এ প্রসঙ্গেই কারূনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে যে পূববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর একান্ত রহমতে তোমাদের জন্যে দিন রাতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– কারূন যেভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছিল, তোমরা এমনটি করো না। অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার আসবাবপত্রও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব কোনো বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ার অবস্থা লক্ষ্য করে দুনিয়ার ভোগ সম্পদে মুগ্ধ থাকতে পারে না। কেননা যে কোনো সময় দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে পারে। আর

আলোচ্য আয়াতে কারূনের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কেউ যেন কারূনের ন্যায় ভোগবাদের সুরা পান করে নিজেকে ধ্বংস না করে।

অথবা বিষয়টিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যায়। যেভাবে ফেরাউনের ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে কারূনের ঘটনা ও হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে ধনকুবের কারূনের বাড়িঘর ও ধন-সম্পদসহ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এসব কিছু হযরত মূসা (আ.)-এর বদ দোয়ার কারণেই হয়েছে, যা জনগণ স্বচক্ষে দেখেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযার ন্যায় এ মুজেযাটিও প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল, আর তাঁর মোকাবিলা ছিল ফেরাউন এবং কারূনের সঙ্গে। ফেরাউন ছিল স্বেচ্ছাচারী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, আর কারূন ছিল অঢেল অর্থ সম্পদের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাস্বরূপ ইতিহাসের দু'জন অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীকে ধ্বংস করে দেন। ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কারূনকে তার ধন-সম্পদসহ জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। ফেরাউনের সলিল সমাধি হওয়া হযরত মূসা (আ.)-এর সামুদ্রিক মুঁজেযা ছিল, আর কারূনের ধ্বংস হওয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলভাগের মুজেযা। ফেরাউন তার ক্ষমতার দর্পে হেদায়েতের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর কারূন তার অগাধ সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে হেদায়েতকে উপেক্ষা করেছিল। অবশেষে বিশ্বাবাসী দেখেছে– ক্ষমতা, আধিপত্য বা অর্থ-সম্পদ কোনোটিই কাজে লাগে না, এসবই নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। মানুষের জীবন আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এ নিয়ামতের শোকরগুজারী হয় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মাধ্যমে, আর এভাবেই মানব জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। আর এ সার্থকতা লাভের জন্যে নবী রাসূলগণের অনুসরণ পূর্বশর্ত। যারা এতে অবহেলা করে অথবা অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়; যেমন– ফেরাউন এবং নমরুদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এতে রয়েছে বিশ্বমানবের জন্যে এক মহান শিক্ষা।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে–

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الخ

আর কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন–ভাণ্ডারসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

قَارُونُ সম্ভবত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

রূহুল মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেজ ছিল এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি তার তাওরাত মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ । হযরত মূসা (আ.) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ.) ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট-স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হলো না; বরং সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল।

قَوْلُهُ فَبَغٰى عَلَيْهِمْ : بَغٰى শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ– জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়। –[কুরতুবী]

এর অপর অর্থ– অহংকার করা। অনেক তাফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের মোকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ : كُنُوز শব্দটি كَنْز -এর বহুবচন। এর অর্থ– ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার। শরিয়তের পরিভাষায় كَنْز এমন ধনভাণ্ডারকে বলা হয়, যার জাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ : نَاءَ শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুঁকিয়ে দেওয়া। আর عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধনভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজ বহন করতে পারত না। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ : فَرَحٌ -এর শাব্দিক অর্থ– উল্লাস। কুরআন পাক অনেক আয়াতে এই فَرَحْ -কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ; অন্য এক আয়াতে আছে– لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ আরো এক আয়াতে আছে– فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোনো কোনো আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে। যেমন يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে এবং فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয়; বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ : আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে জুলুম অত্যাচার করো না, কেননা পাপাচারের পরিণতিই হলো অশান্তি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, দুনিয়ার নিয়ামত দ্বারা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য কামনা করা হলো প্রকৃত মর্দে মুমিনের কাজ। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, 'দুনিয়াতে তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা ভুলে যেয়ো না'– কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহর রাহে দান করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ হলো, নিজের স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন এবং অর্থ-সম্পদকে আখিরাতের জিন্দেগীর জন্যে ব্যয় করতে ভুলে যেয়ো না।

প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ অর্থাৎ পাঁচটি জিনিসকে পরবর্তী পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ মনে কর। যথা– ১. বৃদ্ধকাল আসার পূর্বে যৌবনকে ২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে ৩. আর দারিদ্র আসার পূর্বে অর্থ– সম্পদকে ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে ৫. জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। –[হাকেম, বায়হাকী]

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যে সম্পদ রয়েছে, তা আল্লাহর রাহে দান কর। আর মনসুর ইবনে যাজান (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেয়ো না, অর্থাৎ তোমার নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি ব্যয় করাকে ভুলে যেয়ো না।

বস্তুত মানুষের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রথম তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, সে তার নিজের সম্পর্কে ভুল এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শুধু তাই নয়; বরং ঐ মুহূর্তে সে কারো হিতোপদেশও গ্রহণ করে না, নিজের কল্যাণকেও তার দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হয়। ঠিক এ অবস্থায়ই হয়েছিল কারূনের। তার সম্প্রদায় তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাকে বার বার সরল-সঠিক পথ অবলম্বনের তাগিদ করেছেন; কিন্তু তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করেনি। তিনি তাকে বলেছেন, ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের দান, এ দানের জন্যে তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, ধন সম্পদ নিয়ে কখনো গর্ব করো না। যারা গর্ব বা অহংকার করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাক তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তা ভোগ করতে কেউ তোমাকে নিষেধ করে না; কিন্তু তোমার যা করণীয় তা হলো এই যে, তোমার প্রয়োজন মিটানোর পর যা তোমার নিকট অবশিষ্ট থাকে, তা আল্লাহর রাহে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিতরণ

করতে থাক। এর ফলে তুমি আখিরাতের সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের দিকে তুমি অধিকতর মনযোগ দাও। যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমারও কর্তব্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাদের দুঃখ নিবারণ করা। এতদ্ব্যতীত অর্থ সম্পদ আছে বলেই তার দ্বারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, যারা অশান্তি সৃষ্টি করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না, আর একথা সর্বজনবিদিত যে আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন না, তারাই হয় অভিশপ্ত, তাঁর রহমত থেকে হয় বঞ্চিত, তারাই হয় কোপগ্রস্ত যেমন কারূন হয়েছিল।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ : কারো কারো মতে এখানে 'ইল্‌ম' বলে তাওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল। হযরত মূসা (আ.) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে ইলম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বোঝানো হয়েছে। উহাদরহণত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন এ কথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল। তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ : কারূনের উপরিউক্ত উক্তির আসল জবাব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে : অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ তা'আলার দান। এই জবাব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কুরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জবাব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন পাক অতীতের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আজাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ الخ : এই আয়াতে اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ তথা আলেমদের বিপরীতে اَلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালে চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কারূনের সম্পদ প্রথিত হওয়া : ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ) উপর ন্যস্ত ছিল এবং হযরত মূসা (আ.) স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.)-কে বায়তুল কুরবান তথা কুরবানি ও উৎসর্গীত দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করলেন। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে উৎসর্গের জন্য যেসব সামগ্রী আসবে তা হযরত হারূন (আ.)-এর মারফত তা কুরবানগাহে রাখা হবে। সে সময় আসমানি আগুন এসে তা পুড়িয়ে ফেলত। আর এটাই ছিল কুরবানি ও নযর-নেওয়াজ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন। এ বিষয়ে কারূনের হিংসা হলো। সে বলল, আপনি নবীও আবার কওমের সর্দারও, আর হারূন কুরবানগাহ' -এর তত্ত্ববধায়ক হবে; কিন্তু কোনো বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না, তা কি করে সহ্য করা যায়? অথচ আমি তাওরাতের হাফেজ ও আলেম? হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত; এ বিষয়ে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারূন তখন বলল, এটা অবশ্যই জাদু বলে ঘটেছে। এ কথার পর বনী ইসরাঈলের অনেক সরদারকে বিভিন্ন প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে তার দলভুক্ত করে নিল। এভাবেই উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জাকাত ওয়াজিব করলেন, তখন হযরত মূসা (আ.) কারূনের নিকট এসে প্রতি হাজারে এক দীনার [স্বর্ণমুদ্রা] জাকাত তলব করলেন। কারূন হিসাব করে দেখল, এতে তার প্রচুর অর্থ হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে সে চিন্তিত হয়ে বনী ইসরাঈলকে একত্র করে বলল, এতদিন যাবৎ মূসা যা বলেছেন, তা তোমরা মেনে নিয়েছ। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট

হয়নি। এখন সে তোমাদের মাল-সম্পদ গ্রাস করার ফন্দি করছে। লোকজন বলল, আপনি আমাদের সরদার, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান। সুতরাং আপনি যা বলেন, আমরা তা মানতে প্রস্তুত আছি।

কারূন নির্দেশ দিল যে, অমুক ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসো, তাকে তার চাহিদা মতো অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাকে এ কথা বলতে সম্মত কর যে, সে মূসার উপর তার সঙ্গে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলবে। লোকজন যখন এ কথা শুনবে, তখন তার থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাঁর বিদ্রোহী হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সবার জন্য তার গোলামী থেকে নিষ্কৃতি মিলবে।

নরাধম কারূনের নির্দেশ মতে উক্ত ব্যভিচারিণীকে নিয়ে আসা হলো। তাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়ে এ বিষয়ে সম্মত করা হলো। কারূন এবং তার লোকজন বনী ইসরাঈলকে সমবেত করে মূসা (আ.)-এর নিকট গেল এবং বলল, এসব লোকজন সমবেত হয়েছে এদের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়াজ-নসিহত করুন। হযরত মূসা (আ.) বাইরে এসে তাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ শুরু করলেন। ওয়াজের মধ্যে বিভিন্ন শরয়ী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তার মধ্যে চোরের সাজা হস্ত কর্তন, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা ৮০ কোড়া এবং ব্যভিচারী বিবাহিত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন না হলে ১০০ কোড়া আর বিবাহিত ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হলে তাকে 'সঙ্গেসার' তথা পাথর মেরে জীবনপাত করার বিধানও উল্লেখ করলেন।

এ সময় কারূন দাঁড়িয়ে বলে উঠল, এ অপকর্ম যদি আপনি করেন তাহলে তার সাজা কি হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান সবার জন্য সমান। কারূন তখন বলল, আপনি অমুক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো! যদি সে স্বীকার করে তাহলে সত্য হবে। সুতরাং উক্ত মহিলাকে হাজির করা হলো, হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন হে মহিলা! সত্যিই কি আমি তোমার সাথে কখনো এ অপকর্ম করেছি, যা এরা বলছে? আমি তোমাকে সে সত্তার দোহাই দিচ্ছি, যিনি বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এবং তাওরাত নাজিল করেছিলেন! তুমি ঠিক ঠিক বলবে। উক্ত মহিলা তখন তাদের শেখানো কথা ভুলে গেল এবং বলল, এরা মিথ্যাবাদী। কারূন আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে আপনার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতে বলেছিল। কারূন এ কথা শ্রবণে চিন্তাগ্রস্ত হলো এবং মাথা নিচু করে ফেলল। অন্যান্য নেতারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সবাই তখন আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! এ দুশমন আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। আমাকে সে লাঞ্ছিত অপমানিত করতে চেয়েছে। যদি আমি সত্য রাসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে তার উপর ক্ষমতাবান কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী এলো, হে মূসা! মাথা উত্তোলন কর এবং জমিনকে নির্দেশ দাও যা তুমি চাও, সে তা পালন করবে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) জমিনকে নির্দেশ দিলেন যে, কারূনকে গ্রাস করে নাও! সাথে সাথে মাটি কারূনকে গ্রাস করতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সে মাটির মধ্যে দেবে যেতে লাগল। কারূন 'মূসা! মূসা!' বলে চিৎকার শুরু করল। অপরিসীম কান্নাকাটি করতে লাগল। এমনকি ৭০ বার সে হে মূসা! বলে ডাকল। কিন্তু তার ডাকে কোনো উপকার হলো না। অবশেষে সে মাটির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। -[তাফসীর মাযহারী]

এ ঘটনার পর বনী ইসরাঈলের কতিপয় লোক মন্তব্য করল যে, হযরত মূসা (আ.) কারূনের সম্পদ লাভ করার জন্য তাকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! কারূনের ধন-ভাণ্ডারকেও মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দাও। ফলে তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারও মাটির নিচে ধ্বসে গেল। আর এ ধ্বস কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। -[খোলাসাতুত্তাফাসীর : তাইব লক্ষ্ণৌভী]

قَوْلُهٗ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ : অর্থাৎ যে সকল লোক কারূনের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে আক্ষেপ করে বলেছিল যে, হায়! আমাদেরও যদি এমন অর্থ সম্পদ হতো! আজ তারা তার কু-পরিণাম দেখে হতচকিত হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞান ফিরে এসেছে যে, এ সম্পদ বস্তুত চিত্তাকর্ষক সর্পতুল্য। যার মধ্যে প্রাণনাশক বিষাক্ত বিষ লুকিয়ে রয়েছে। কারো পার্থিব উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখে আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। পার্থিব উন্নতি অগ্রগতি কারো আল্লাহর দরবারে মাকবুল বা অভিশপ্ত হওয়ার দলিল নয়; বরং বহু ক্ষেত্রে তো তা ধ্বংস ও চিরবঞ্চিত হওয়ারও কারণ ঘটে। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন-

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهٗ * وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا
هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً * وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا

অর্থাৎ ১. বহু জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবীর চলার পথ সংকুচিত হয়ে গেছে। আর বহু নির্বোধ অজ্ঞ-মূর্খকে তুমি দেখবে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে।

২. এ বিষয়টি মানুষের চিন্তাশক্তিকে হতবাক করে দিয়েছে। এমন কি বিদগ্ধ আলেমকে নাস্তিকে পরিণত করেছে।

অনুবাদ :

٨٣. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ اَىِ الْجَنَّةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ بِالْبَغْىِ وَلَا فَسَادًا ط بِعَمَلِ الْمَعَاصِىْ وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ - عِقَابُ اللّٰهِ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ -

৮৩. এটা আখিরাতের সেই নিবাস অর্থাৎ জান্নাত যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না বিরুদ্ধাচরণ করে শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে।

٨٤. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج ثَوَابٌ بِسَبَبِهَا وَهُوَ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا جَزَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَىْ مِثْلَهٗ -

৮৪. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম ফল। উক্ত কাজের কারণে এবং তার দশ গুণ। আর যে মন্দ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়; তবে যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ তার সমপরিমাণ।

٨٥. اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ اَنْزَلَهٗ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ط اِلٰى مَكَّةَ وَكَانَ قَدْ اِشْتَاقَهَا قُلْ رَّبِّىْ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - نَزَلَ جَوَابًا لِقَوْلِ كُفَّارِ مَكَّةَ لَهٗ اِنَّكَ فِىْ ضَلَالٍ اَىْ فَهُوَ الْجَائِىْ بِالْهُدٰى وَهُمْ فِى الضَّلَالِ وَاَعْلَمُ بِمَعْنٰى عَالِمٌ -

৮৫. যিনি আপনার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন জন্মভূমিতে অর্থাৎ মক্কায়! রাসূল ﷺ মক্কায় ফিরে আসার প্রবল আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছেন এবং কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে। এ আয়াতটি মক্কার কাফেরদের কথার উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে বলত যে, তিনি বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই তো প্রকৃত হেদায়েত আনয়নকারী, আর তারা রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। এখানে اَعْلَمُ শব্দটি عَالِمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٦. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ الْقُرْاٰنُ اِلَّا لٰكِنْ اُلْقِىَ اِلَيْكَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا مُعِيْنًا لِّلْكٰفِرِيْنَ - عَلٰى دِيْنِهِمُ الَّذِىْ دَعَوْكَ اِلَيْهِ -

৮৬. আপনি আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হবে, তবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এটা তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং আপনি কখনো কাফেরদের সহায় হবেন না। তাদের ধর্মের প্রতি যার দিকে তারা আপনাকে আহবান করে।

অনুবাদ :

٨٧. وَلَا يَصُدَّنَّكَ اَصْلُهُ يَصُدُّوْنَنَكَ حُذِفَتْ نُوْنُ الرَّفْعِ لِلْجَازِمِ وَالْوَاوُ الْفَاعِلِ لِالْتِقَائِهَا مَعَ النُّوْنِ السَّاكِنَةِ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ اَىْ لَا تَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ وَادْعُ النَّاسَ اِلٰى رَبِّكَ بِتَوْحِيْدِهٖ وَعِبَادَتِهٖ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ج بِاِعَانَتِهِمْ وَلَمْ يُؤَثِّرِ الْجَازِمُ فِى الْفِعْلِ لِبِنَائِهٖ ـ

৮৭. তারা যেন কিছুইতেই আপনাকে বিমুখ না করে يَصُدَّنَّكَ শব্দটি মূল ছিল يَصُدُّوْنَنَكَ এখন رَفْع -এর نُوْن টি جَازِمْ তথা لَائِىْ نَهِىْ -এর কারণে পড়ে গেছে এবং فَاعِلْ -এর وَاوْ -টিও نُوْن سَاكِنْ -এর সাথে একত্র হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আপনার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সেগুলো হতে। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের প্রতি ফিরে যাবেন না। আপনি আহবান করুন মানুষকে আপনার প্রতিপালকের প্রতি তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের প্রতি আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে। لَا تَكُوْنَنَّ ফে'লটি مَبْنِىْ হওয়ার কারণে তাতে لَائِىْ جَازِمْ টি কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

٨٨. وَلَا تَدْعُ تَعْبُدْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالنُّشُوْرِ مِنَ الْقُبُوْرِ ـ

৮৮. আপনি আহবান করবেন না ইবাদত করবেন না আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই কার্যকর সিদ্ধান্ত এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যবর্তিত হবে কবর থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ : تِلْكَ হলো مَوْصُوْف যা মুবতাদা হয়েছে। আর اَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ হলো সিফত مَوْصُوْف; صِفَتْ মিলে সিফত হয়েছে تِلْكَ মওসূফের, نَجْعَلُهَا বাক্য হয়ে خَبَرْ

قَوْلُهُ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ : এখানে مَعَادْ দ্বারা অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার মক্কা নগরী উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ সম্মানিত স্থান উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَصُدَّنَّكَ : এখানে لَا হলো نَاهِيَةٌ বা নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক, আর يَصُدَّنَّكَ হলো فِعْل مُضَارِعْ مَجْزُوْم -এর ; وَاوْ যুক্ত نُوْن ثَقِيْلَةْ -টি মধ্যে হলো عَلَامَتْ نُوْن اِعْرَابِىْ বিলুপ্ত হওয়া। আর বিলুপ্ত وَاوْ যমীর হলো فَاعِلْ এবং শেষে مَفْعُوْل -এর আলামত।

قَوْلُهُ عَنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ : এখানে مُضَافْ উহ্য হয়েছে। মূলত عَنْ تَبْلِيْغِ آيَاتِ اللّٰهِ ছিল।

قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرِ الْجَازِمُ : وَلَا تَكُوْنَنَّ -এর মধ্যে لَا جَازِمَةْ টি শব্দের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া করেনি। তবে مَحَلْ -এর মধ্যে আছর করেছে। শব্দে কোনোরূপ আছর [প্রভাব] না করার কারণ হলো تَكُوْنَنَّ ক্রিয়াটি نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَةْ -এর কারণে মবনী হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَعْبُدُ : تَدْعُ -এর ব্যাখ্যা تَعْبُدُ দ্বারা করে খারেজীদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে যে, জীবিত বা মৃত কারো নিকট কোনো কিছু কামনা করা শিরক। বস্তুত এটা তাদের বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা গায়রুল্লাহ্‌কে مُؤَثِّرٌ بِالذَّاتِ তথা প্রকৃতার্থে প্রভাব সৃষ্টিকারী মনে করলে তা শিরক হবে। তবে সেটাকে সবব তথা কারণ বা মাধ্যম -এর পর্যায়ে গণ্য করলে তা শিরক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا : এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। عُلُوٌّ শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فَسَادٌ বলে অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে। -[সুফিয়ান সওরী]

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, গুনাহ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ গুনাহের কুফল স্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার জুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য : যে অহংকারে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভালো পোশাক পরাটা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমনটা সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গুনাহের দৃঢ় সংকল্প গুনাহ : আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোনো গুনাহের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ। -[রূহুল মা'আনী]

তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোনো ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ করতে সক্ষম না হয় কিন্তু চেষ্টা ষোল আনাই থাকে, তবে গুনাহ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ লেখা হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরি। যথা- ১. ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং ২. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। শুধু এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী কারার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাগে শেষনবী রাসূল ﷺ -এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- اَلَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন তথা তেলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হেরেম ও বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তাফসীরবিদ মুকাতেল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় এটি মক্কী নয়, মদনীও নয়। -[কুরতুবী]

কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

قَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ : এখানে وَجْهَهُ বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন- وَجْهَهُ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. আলিফ লাম-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

٢. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اى بِقَوْلِهِمْ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ يُخْتَبَرُوْنَ بِمَا يَتَبَيَّنُ بِهٖ حَقِيْقَةُ اِيْمَانِهِمْ ـ

২. মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এ কথা বললেই এ উক্তির তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? অর্থাৎ তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করা হবে যার মাধ্যমে তাদের ঈমানের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

٣. نَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ اٰمَنُوْا فَاٰذَاهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِىْ اِيْمَانِهِمْ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ فِيْهِ ـ

৩. নিম্নোক্ত আয়াত এমন একদল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তারা যখন ঈমান এনেছে তখনই মুশরিকরা তাদেরকে সীমাহীন নির্যাতন করেছে। আমি তো এদের পূর্ববর্তীগণকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদের ঈমানের ব্যাপারে চাক্ষুষ জ্ঞানের ভিত্তিতে। এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন যে, কারা মিথ্যাবাদী? এ ব্যাপারে। অর্থাৎ ঈমানের ব্যাপারে।

٤. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَلشِّرْكَ وَالْمَعَاصِىَ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط يَفُوْتُوْنَا فَلَا نَنْتَقِمُ مِنْهُمْ سَاۤءَ بِئْسَ مَا الَّذِىْ يَحْكُمُوْنَهٗ حُكْمُهُمْ هٰذَا ـ

৪. তবে কি যারা মন্দ কাজ করে অর্থাৎ শিরক ও গুনাহের কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমার থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো না। তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ। তাদের এই সিদ্ধান্ত।

٥. مَنْ كَانَ يَرْجُوْا يَخَافُ لِقَاۤءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ بِهٖ لَاٰتٍ ط فَلْيَسْتَعِدَّ لَهٗ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِ الْعِبَادِ الْعَلِيْمُ بِاَفْعَالِهِمْ ـ

৫. যে কামনা করে ভয় করে আল্লাহর সাক্ষাতের সে জেনে রাখুক! আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। কাজেই সে যেন তার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তিনি সর্বশ্রোতা বান্দার কথা শ্রবণে সর্বজ্ঞ তাদের কর্মের ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٦. وَمَنْ جَاهَدَ جِهَادَ حَرْبٍ اَوْ نَفْسٍ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط لِاَنَّ مَنْفَعَةَ جِهَادِهٖ لَهٗ لَا لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ ـ

৬. যে কেউ জিহাদ/সাধনা করে শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদ বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সে তো নিজের জন্যই জিহাদ/ সাধনা করে কেননা জিহাদের লাভ ও উপকারিতা তো তার জন্যই, আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা ও তাদের ইবাদত থেকে।

٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ بِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ بِمَعْنٰى حَسَنٍ وَنَصَبُهٗ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْبَاءِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَهُوَ الصَّالِحَاتُ ـ

৭. এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আমি তাদের থেকে তাদের মন্দকর্মগুলো মিটিয়ে দিব সৎকর্মের কারণে এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দিব, তারা যে উত্তম কর্ম করত তার আর তা হলো সৎকর্ম। এখানে اَحْسَنْ শব্দটি حَسَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাতে مَنْصُوْب بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার بَاءْ -কে ফেলে দেওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

٨. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط اَىْ اِيْصَاءً ذَاحُسْنٍ بِاَنْ يَّبُرَّهُمَا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ بِاِشْرَاكِهٖ عِلْمٌ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهٗ فَلَا تُطِعْهُمَا ط فِى الْاِشْرَاكِ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَاُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

৮. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে অর্থাৎ ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ এভাবে যে, তাদের অনুগত থাকবে ও তাদের সাথে সদাচরণ করবে। তবে তারা যদি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে যার যাকে শরিক করা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই বাস্তব অনুযায়ী। এর দ্বারা مَفْهُوْم مُخَالِفْ তথা বিপরীত বিষয় উদ্দেশ্য নয়। তখন তুমি তাদের অনুসরণ করো না শিরকের ক্ষেত্রে আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা কি করছিলে। সুতরাং আমি তোমাদের কর্মের প্রতিদান দিব।

٩. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّالِحِيْنَ ـ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ بِاَنْ نَحْشُرَهُمْ مَعَهُمْ ـ

৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অব্যশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। নবী এবং ওলীগণের। এভাবে যে, তাঁদের সাথে তাদের হাশর করব।

অনুবাদ :

١٠. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ اَىْ اَذَاهُمْ لَهٗ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط فِى الْخَوْفِ مِنْهُ فَيُطِيْعُهُمْ فَيُنَافِقُ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ جَآءَ نَصْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ رَّبِّكَ فَغَنِمُوْا لَيَقُوْلُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى النُّوْنَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط فِى الْاِيْمَانِ فَاَشْرِكُوْنَا فِى الْغَنِيْمَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ اَىْ بِعَالِمٍ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ بَلٰى ـ

১০. মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে অর্থাৎ তাদের নির্যাতনকে নিজের জন্য আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে সেটাকে ভয় করে এবং এ কারণেই তাদের অনুকরণ করে এবং নেফাকে জড়িয়ে পড়ে। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে কোনো সাহায্য আসলে মুমিনদের জন্য যার ফলে তারা গণিমতের মাল প্রাপ্ত হয় তখন তারা বলতে থাকে لَيَقُوْلُنَّ-এর মধ্যে رَفْع-এর- نُوْن-কে ধারাবাহিকভাবে তিন نُوْن একত্র হওয়ার কারণে এবং وَاوْ [যা বহুবচনের যমীর] -কে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম ঈমানের ক্ষেত্রে। কাজেই আমাদেরকে গনিমতে অংশীদার কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বিশ্ববাসীর অন্তকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? তাদের হৃদয়ে ঈমান ও নিফাক হতে যা কিছুর রয়েছে তা? হ্যাঁ।

١١. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِقُلُوْبِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فَيُجَازِىْ الْفَرِيْقَيْنِ وَاللَّامُ فِى الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسَمٍ ـ

১১. আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে বিশুদ্ধ অন্তকরণে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। অতঃপর উভয় দলকেই প্রতিদান দিবেন আর উভয় ফে'লের মধ্যেই لَامْ বর্ণটি শপথের জন্য হয়েছে।

١٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا طَرِيْقَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ط فِىْ اِتِّبَاعِنَا اِنْ كَانَتْ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ قَالَ تَعَالٰى وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ ـ

১২. কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ কর দীনের ব্যাপারে আমাদের মতাদর্শ তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব যদি আমাদের অনুসরণের কারণে তোমাদের কোনো পাপ হয়েই যায়। এখানে اَمْر টা খবরের অর্থে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এ ব্যাপারে।

অনুবাদ :

১৩. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ اَوْزَارَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَاِضْلاَلِهِمْ مُقَلِّدِيْهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ يَكْذِبُوْنَ عَلَى اللّٰهِ سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ فَاللَّامُ فِى الْفِعْلَيْنِ لاَمُ قَسَمٍ وَحُذِفَ فَاعِلُهُمَا الْوَاوُ وَنُوْنُ الرَّفْعِ ـ

১৩. তারা নিজেদের ভার বহন করবে তাদের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা মুমিনগণকে একথা বলার কারণে যে, তোমরা আমাদের মতাদর্শ গ্রহণ কর এর তাদের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ব্যাপারে যে মিথ্যা রটনা করে। এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে ধমকি স্বরূপ। আর উভয় ফে'লের মধ্যে لَامْ বর্ণটি শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়ের ফায়েল তথা وَاوْ এবং رَفْع -এর نُوْن -কে হযফ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ بِقَوْلِهِمْ : এটা مَا অব্যয়টি মাসদারিয়া হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং بَاءْ উহ্য রয়েছে। আর اَنْ يَتْرُكُوْا ফে'লটি حَسِبَ -এর দু' মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ نَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আম্মা ইবনে ইয়াসির, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ এবং সালমান ইবনে হিশাম (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সকল দরিদ্রজনেরা মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কারণে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

قَوْلُهُ عِلْمُ مُشَاهَدَةٍ : এই ইবারত বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা। প্রশ্নটি হলো– এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের تَجَدُّدْ -কে বুঝায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার ইলম হলো قَدِيْم غَيْرُ حَادِثْ

জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো عِلْم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِلْمُ ظُهُوْر ; আর عِلْمُ مُشَاهَدَةْ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদের সততা এবং মিথ্যুকদের মিথ্যা প্রকাশ করে দিবেন। যাতে করে مَعْلُوْمْ টা আল্লাহর ইলম অনুযায়ী হওয়া প্রকাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের কাছে আল্লাহর ইলমও مَعْلُوْمْ -এর অনুযায়ী হওয়া জ্ঞাত হয়ে যায়, যা مَعْلُوْمْ টা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে অস্পষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ يَحْكُمُوْنَ : এটা مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ হয়ে جُمْلَهْ -এর সেলাহ হয়েছে। ه যমীর উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যেমনটা আলোচনা করেছেন। আর حُكْمُهُمْ هٰذَا হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ

قَوْلُهُ فَلْيَسْتَعِدَّ : এটা مَنْ كَانَ -এর جَوَابُ شَرْط আর اَحْسَنْ শব্দটি হরফে জার উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে; শব্দটি মূলত بِاَحْسَنْ ছিল।

قَوْلُهُ اِيْصَاءُ ذَاحُسْنٍ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حُسْنًا হলো وَصَّيْنَا -এর উহ্য মাসদারের সিফত উহ্য মুযাফের সাথে। আর যদি মুযাফকে উহ্য মানা না হয় তবে مُبَالَغَةْ সিফত মানাও বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ : এ বাক্যাংশটি হলো মুবতাদা। আর উহ্য لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ শপথের সাথে মিলে মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হলো– وَاللّٰهِ لَنُكَفِّرَنَّ ; আবার এটাও হতে পারে যে, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ উহ্য ফে'লের কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে– وَنُخَلِّصُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ

قَوْلُهُ مُوَافِقَةً لِلْوَاقِعْ : এটা উহ্য বাক্যের কারণ। মূল ইবারত হলো– وَذُكِرَ هٰذَا الْقَيْدُ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ

قَوْلُهُ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর مَفْهُوْمٌ مُخَالِفٌ উদ্দেশ্য নয়– একথা বুঝানো। অর্থাৎ যার মাবুদ হওয়ার ব্যাপারে তোমার নিকট কোনো দলিল নেই তাকে আমার অংশীদার করিও না। আর যার মাবুদ হওয়ার উপর প্রমাণ রয়েছে, তাকে অংশীদার করা যেতে পারে [এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়]। কেননা তিনি ব্যতীত এমন কোনো মাবুদ নেই, যার অস্তিত্বের উপর প্রমাণ রয়েছে। আর এমন কোনো মাবুদও নেই, যার অস্তিত্বের উপর প্রমাণ নেই; বরং তিনি তো এক ইলাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : এ সূরায় শিরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাক আনকাবুত তথা মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই উক্ত সূরাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ আয়াতে মক্কা বিজয়ের তথা মুসলমানদের বিরাট সাফল্যের সুসংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হেয়েছে, সাফল্য সহজলভ্য বস্তু নয়; তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ তিতিক্ষা, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ শুরু হয়, তাই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াই একান্ত কর্তব্য। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সুদৃঢ় হয়, শুধু মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, নির্যাতিত উৎপীড়িত হন, এ সবকিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় মুমিনদের জন্যে এ মর্মে সান্ত্বনা রয়েছে যে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে যেন মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে, তা ছিল বর্ণনাতীত; কিন্তু অবশেষে সেই জুলুমের অবসান হয়েছে এবং মজলুম বনী ইসরাঈল জাতি জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় মক্কার কাফেরদের ফেতনা-ফ্যাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব সাময়িক কষ্টে কেউ যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

যাহোক, এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারস্য সাম্রাজ্যে এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমরা লাভ করবে, সে সময় দূরে নয়, যখন পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

এতএব, কখনো দুনিয়ার নিয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের কথা ভুলে যাবে না, অহংকার করো না; বরং প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, আর একথা মনে রাখবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আখিরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের তুলনায় মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি কিছু নয়। –[তাফসীরে মা'আ'রিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) খ. ৫ পৃ. ৩৫০]

শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কা মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন, সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবে না। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়– اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْاۤ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে শুধুমাত্র 'ঈমান এনেছি' বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"

মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, কয়েকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا : শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম কাতাদা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত কিছু মক্কাবাসী মুসলমানের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁরা প্রিয়নবী ﷺ-এর খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দিলে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম আলোচ্য আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন, তখন তারা মক্কা শরীফ থেকে পুনরায় বের হন। কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ফলে কিছু লোক শহীদ হন। আর কিছু লোক জীবিত থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا : আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন, সূরা আনকাবূতের প্রথম আয়াতের اَلنَّاسُ শব্দটি দ্বারা মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তাঁরা হলেন সালমা ইবনে হিশাম, ইয়াশ ইবনে রবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রমুখ।

ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম (র.) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর রাহে তাকে চরম কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- اَحَسِبَ النَّاسُ الخ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, ইবনে জোরাইজ (র.)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.)-এর আজাদ করা গোলাম হযরত মাহজা ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে। এ উম্মতের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে জান্নাতের দুয়ারের দিকে ডাকা হবে। বদরের যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম তিনিই মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফেরদের মুকাবিলার জন্যে বের হয়ে এসেছিলেন। আমের ইবনে হাজরামী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এদিকে থেকে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ। যখন তাঁর পিতা মাতা এবং স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন নাজিল হয়, তখন প্রথম দিকে আল্লাহ পাক শুধু ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, এরপর ধীরে ধীরে নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ এবং অন্যান্য বিধি-নিষেধ জারি হয়। কোনো কোনো লোকের জন্যে এসব বিধি-নিষেধের উপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। শানে নুযূল সম্পর্কীয় এ বিবরণ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এরূপ "মানুষ কি এ ধারণা করেছে যে শুধু ঈমান আনয়নের পরই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে; অন্যান্য বিধি-নিষেধ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

এখানে একথা উল্লেখ যে, শুধু ঈমান দোজখের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে নাজাতের কারণ হয়। আর কখনো না কখনো জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমলের অভাবে তথা ফরজ ওয়াজিব আদায় না করার কারণে সাময়িকভাবে শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাই আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা পেতে হলে দুটি বিষয় একান্ত জরুরি। যথা- ১. আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা, । ২. মন যা চায় তা না করা; বরং মনের চাওয়াকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধি নিষেধের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৫৫]

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারগণ আরো বিবরণ দিয়েছেন। একদিন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তখন কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের ব্যাপারে এই অভিযোগ করলেন যে, তারা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম অত্যাচার করে এবং তাঁরা একথাও বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক কাফেরদের এ জুলুম অত্যাচার বন্ধ করে দেন।" প্রিয়নবী ﷺ তাদের এ বক্তব্য শ্রবণ করে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমাদের পূর্বকালের দীনদার লোকেরা এর চেয়ে অধিক পরিমাণে জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাদের মাথার মাঝখান দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তবু তারা তাদের দীন পরিত্যাগ করেননি। আবার কারো কারো মাথা লৌহ শলাকার চিরুণী দিয়ে এমন ভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে, গোশত চিরে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তবু তারা দীন পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহ পাকের শপথ করে বলেছি, এই দীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবেই। সেদিন অবস্থা এমন হবে যে, ছাফা পাহাড় থেকে একজন যাত্রী হাজারামাউত নামক স্থান পর্যন্ত এত নিরাপদে সফর করবে তার বিপদের কোনো আশংকাই থাকবে না। কিন্তু তোমরা সেই অবস্থার জন্যে বড় তাড়াহুড়া করছো!" -[বুখারী শরীফ]

অর্থাৎ তোমরা তাড়াহুড়া করো না, সবর অবলম্বন কর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাক। কাফেরদের পক্ষ থেকে যত কষ্ট তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, যেন কে প্রকৃত মুমিন এবং কে মুনাফিক তার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন কাফেরদের দেওয়া কষ্টে বিচলিত হয়ে হুজুর পাক ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– الٓمّٓ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ কেউ কি ভেবেছে যে, শুধুমাত্র মুখে "আমরা ঈমান এনেছি এবং মুমিন হয়েছি" বলে দেওয়াই যথেষ্ট হবে? অতঃপর তাদের আর পরীক্ষা নেওয়া হবে না? এবং বিপদ ও দুঃখ কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না? অথচ এ দুঃখ কষ্ট দ্বারাই তাদের ঈমানের পরীক্ষা করা হবে এবং ইখলাছ ও নেফাকের পার্থক্য প্রকাশিত হবে। তাই তাদের এ ধারণা যে "দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না" সঠিক নয়, তাদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে।

পরীক্ষা তিনভাবে হবে। প্রথমত আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত রোগ ও কষ্ট দ্বারা। তৃতীয়ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতন উৎপীড়নের মাধ্যমে।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : "আর নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করেছিলাম।" অর্থাৎ তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি সঠিক কিনা? তা পরীক্ষা করেছিলাম। এ পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ পাক এ সকল লোকদের অবস্থা প্রকাশ করে দেন যারা তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবিতে সত্য এবং ঐ সকল লোকদের অবস্থাও প্রকাশ করে দেন, যাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি মিথ্যা। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক ঐ সকল লোককে সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা এ ধারণা পোষণ করেছিল যে শুধুমাত্র ঈমানের দাবি করাই যথেষ্ট হয়, এটা ভুল ধারণা। ইসলাম গ্রহণের দাবির সাথে সাথে ঈমানের পরীক্ষাও জরুরি হয়ে পড়ে যেন ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি পরীক্ষা না করা হতো, তবে সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী সকলেই সমপর্যায়ের হয়ে যেতো। কারো মনের গভীরে সত্য আছে, নাকি মিথ্যা, তা কেউ জানতে পারতো না। মোট কথা, দুঃখ কষ্ট দিয়ে সত্য এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করার জন্যে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করা ব্যতীতও আল্লাহ পাক জানেন যে, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী; কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা তা জানে না। তাই আল্লাহ পাক পরীক্ষার দ্বারা দুনিয়ার লোকদেরকেও জানিয়ে দেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।

قَوْلُهٗ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا : অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ-অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটির মধ্যকার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন করা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও তিনি প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব (র.) থেকে এর আরো একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কুরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

قَوْلُهٗ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ : হিতাকাঙ্ক্ষা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোনো কাজ করতে বলাকে وَصِيَّتْ বলা হয়। –[মাযহারী]

قَوْلُهٗ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا : حُسْن শব্দটি মূলধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حُسْن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ : অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরি যে, তাতে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্তই পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু তারা যদি সন্তানকে

কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না। যেমন হাদীসে আছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবূ সুফিয়ান স্বীয় পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করলেন যে, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্বাবাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। –[মুসলিম ও তিরমিযী] এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েত আছে, হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আম্মাজান! যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন! আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অশেষে অনশন ভঙ্গ করল।

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا الخ : কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনো শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনো সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রকূতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– اَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ; এতে উল্লিখিত আছে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আজাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْئٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নাজমে আরো বলা হয়েছে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কেননা একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টাও স্বয়ং একটি বড় পাপ। এ পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী : আসল পাপীর যে শাস্তি হবে তার প্রাপ্যও তা-ই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের ছওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং এতে সৎকর্মীদের ছওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপকাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং এতে আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না। –[কুরতুবী]

অনুবাদ :

١٤. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَعُمْرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ط يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللّٰهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ أَيِ الْمَاءُ الْكَثِيرُ طَافَ بِهِمْ وَعَلَاهُمْ فَغَرِقُوا وَهُمْ ظَالِمُونَ مُشْرِكُونَ.

১৪. আমি তো হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান করতেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে অর্থাৎ অথৈ পানি তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তা তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো। ফলে তারা ডুবে মরল। কারণ তারা ছিল সীমালজ্ঘনকারী মুশরিক।

١٥. فَأَنْجَيْنَاهُ أَيْ نُوحًا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ أَيِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِيهَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً عِبْرَةً لِلْعَالَمِينَ. لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّاسِ إِنْ عَصَوْا رُسُلَهُمْ وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ.

১৫. আমি তাঁকে হযরত নূহ (আ.)-কে এবং তরীতে আরোহণকারীদেরকে অর্থাৎ যারা তাঁর সাথে নৌকায় অবস্থান করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন শিক্ষণীয় বিষয়। তাদের পরবর্তীতে আগত মানুষের জন্য, যদি তারা তাদের রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে। হযরত নূহ (আ.) প্লাবনের পরে ৬০ বছর বা তার চেয়ে অধিক জীবিত ছিলেন ফলে মানুষের বিস্তৃতি ঘটে।

١٦. وَ اذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ط خَافُوا عِقَابَهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْخَيْرَ مِنْ غَيْرِهِ.

১৬. এবং স্মরণ করুন! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় তোমরা যে মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা কর তা থেকে। যদি তোমরা জানতে উত্তমকে অনুত্তম থেকে।

١٧. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ط تَقُولُونَ كَذِبًا إِنَّ الْأَوْثَانَ شُرَكَاءُ لِلّٰهِ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَرْزُقُوكُمْ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ اُطْلُبُوهُ مِنْهُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ط إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

১৭. তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করতেছ। মিথ্যা বলতেছ এ মর্মে যে, এ মূর্তিগুলো আল্লাহ তা'আলার অংশীদার, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। তারা তোমাদেরকে জীবিকা দিতে সক্ষম নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটই জীবনোপকরণ কামনা কর তাঁর থেকেই তা অনুসন্ধান কর। তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

অনুবাদ :

১৮. وَاِنْ تُكَذِّبُوْا اَىْ تُكَذِّبُوْنِىْ يٰاَهْلَ مَكَّةَ فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِىْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - اَلْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ فِىْ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ تَسْلِيَةً لِلنَّبِىِّ ﷺ -

১৮. যদি তোমরা অস্বীকার কর অর্থাৎ হে মক্কাবাসীরা! যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর [এটা কোনো নতুন বিষয় নয়] তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যাবাদী বলেছিল যারা আমার পূর্বে ছিলেন তাঁদেরকে। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া। এ দুটো ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে।

১৯. وَقَالَ تَعَالٰى فِىْ قَوْمِهٖ اَوَلَمْ يَرَوْا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَنْظُرُوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ بِضَمِّ اَوَّلِهٖ وَقُرِئَ بِفَتْحِهٖ مِنْ بَدَأَ وَاَبْدَأَ بِمَعْنًى اَىْ يَخْلُقُهُمْ اِبْتِدَاءً ثُمَّ هُوَ يُعِيْدُهٗ ط اَىْ اَلْخَلْقَ كَمَا بَدَأَهٗ اِنَّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ مِنَ الْخَلْقِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ فَكَيْفَ يُنْكِرُوْنَ الثَّانِىَ -

১৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর [মুহাম্মদ ﷺ -এর] সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন– তারা কি লক্ষ্য করে না لَمْ يَرَوْا শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ– তারা কি দেখে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন يُبْدِئُ শব্দটির يَاءْ বর্ণে পেশসহ এবং يَاءْ বর্ণে যবর দিয়েও পঠিত রয়েছে اَبْدَأَ ও بَدَأَ হতে উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টকে যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এটা তো উল্লিখিত প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য সহজ কাজেই তোমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে কেন অস্বীকার কর।

২০. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاَمَاتَهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط مَدًّا وَ قَصْرًا مَعَ سُكُوْنِ الشِّيْنِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ الْبَدْءُ وَالْاِعَادَةُ -

২০. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। যারা তোমাদের পূর্বে ছিল এবং তাদেরকে মৃত্যুদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। نَشْاَةً শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন ش বর্ণটি সাকিন সহকারে। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। প্রথম ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও এরই অন্তর্ভুক্ত।

২১. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبَهٗ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ج رَحْمَتَهٗ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ تُرَدُّوْنَ -

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

অনুবাদ :

٢٢. وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ رَبَّكُمْ عَنْ اِدْرَاكِكُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ز لَوْ كُنْتُمْ فِيْهَا اَىْ لَا تَفُوْتُوْنَهٗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ وَلِيٍّ يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيْرٍ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

২২. তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না তোমাদের প্রতিপালককে তোমাদের পাকড়াও করা থেকে। না পৃথিবীতে, না আকাশে যদি তোমরা আকাশে থাক, অর্থাৎ তোমরা তার থেকে বেঁচে বের হয়ে যেতে পারবে না আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যিনি তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবেন এবং সাহায্যকারীও নেই। যিনি তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষায় সাহায্য করতে পারবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نُوْحًا : হযরত নূহ (আ.)-এর নাম নিয়ে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা– ১. আব্দুল গাফফার ২. ইয়াশকুর ৩. আস সাকান। নূহ হলো তাঁর উপাধি; অতিশয় রোদনকারীকে নূহ বলা হয়। যেহেতু হযরত নূহ (আ.) স্বীয় উম্মতের অবস্থা দেখে অনেক বেশি কান্নাকাটি করতেন এজন্য তাঁর উপাধি নূহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

قَوْلُهٗ اِبْرَاهِيْمَ : সাধারণ কারীগণ اِبْرَاهِيْمَ-কে- نَصَبْ -এর সাথে পাঠ করেছেন। نَصَبْ হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে, প্রথমত এটা نُوْحًا-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এর পূর্বে নসব দানকারী عَامِلْ উহ্য থাকায় তা مَنْصُوْبْ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) اُذْكُرْ উহ্য মেনে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয়ত এটা اَنْجَيْنَاهُ-এর যমীরের উপর আতফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

আবার কেউ কেউ اِبْرَاهِيْمُ-কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مَرْفُوْعْ পড়েছেন। আর এর খবরটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত হলো– وَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِبْرَاهِيْمُ

قَوْلُهٗ اَوْثَانًا : এটা وَثَنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পাথর ইত্যাদি হতে নির্মিত মূর্তি, যার উপাসনা করা হয়।

قَوْلُهٗ يَرْزُقُوْكُمْ : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, رِزْقًا শব্দটি مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে– لَا يَمْلِكُوْنَ اَنْ يَرْزُقُوْكُمْ رِزْقًا

قَوْلُهٗ تُكَذِّبُوْنِىْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تُكَذِّبُوْا-এর মাফউলটি উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ يَااَهْلَ مَكَّةَ : এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হয়, এই আয়াত এবং আগত আয়াতটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার মাঝে جُمْلَهٗ مُعْتَرِضَهْ স্বরূপ, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া।

قَوْلُهٗ اِنْ تُكَذِّبُوْا : এটা হলো شَرْط আর তার جَزَاءْ হলো فَلَا يَضُرُّنِىْ تَكْذِيْبُكُمْ

قَوْلُهٗ مِنْ قَبْلُ : এখানে مَنْ হলো مَوْصُوْلَهْ যা كِذْبْ ফে'লের মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهٗ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত নূহ (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَوْا : এখানে رُؤْيَتْ দ্বারা عِلْمُ يَقِيْنِى উদ্দেশ্য। অন্যথায় প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টির সময় কোনো দ্রষ্টাই ছিল না। কাজেই اَوَلَمْ يَرَوْا দ্বারা প্রশ্ন করা তো অর্থহীন।

قَوْلُهُ اَلنَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ مَدًّا وَقَصْرًا : মদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شِيْن -এর পর اَلِفْ বৃদ্ধি করে আর قَصْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلِفْ ব্যতীত পাঠ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থিদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোনো সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গাম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো পয়গাম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কুরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স; এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরো বয়স রয়েছে।

মোটকথা, এই অসাধরণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনো সময় সাহস না হারানো– এগুলোর সব হযরত নূহ (আ.)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনীটিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান এবং স্বীয় আদরের দুলালকে জবাই করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলি এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এগুলো সব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মাদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তাওহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।"

এ পর্যায়ে কোনো দুরাত্মা কাফের, মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবো না, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমিন এ ইচ্ছা কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আর তোমরা জমিন ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শাস্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কেউ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। যথা– ১. পলায়ন করার মাধ্যমে। ২. হাজির থেকে আজাব মোকাবিলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যে আল্লাহ পাকের আজাবের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা

যায় না। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে- فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহর পাকের আজাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে- وَلَا فِى السَّمَآءِ অর্থাৎ জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে যদি কেউ [রকেটে আরোহণ করে] আসমানে তথা মহাশূন্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোনো স্থানই আল্লাহ পাকের গোপন নেই। অতএব কোনো অপরাধীই আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ : আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই। প্রকাশ্যে যারা সাহায্যকারী বলে পরিচয় দেয়, অবশেষে তারা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁর কুদরতের সম্মুখে নিতান্ত অসহায়-অক্ষম। আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যেমন اَلْاَرْضُ শব্দটিকে اَلسَّمَآءُ শব্দটির পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা স্বভাবত কোনো অপরাধী যদি পলায়ন করতে চায় তবে সর্বপ্রথম পৃথিবীতেই পলায়নের চেষ্টা করবে। যদি সারা পৃথিবীতে কোনো গোপন স্থান না পাওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে মহাশূন্যে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রথম اَلْاَرْضُ এবং পরে اَلسَّمَآءُ ব্যবহার করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২৫, পৃ. ৪৯-৫০]

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মুশরিক হোক বা মুরতাদ, কেউই তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, জমিন আসমান কোথাও না। ত্রিভুবনে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আল্লাহর কোনো দুশমন আশ্রয় নিতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহর দুশমন বা আল্লাহর কুরআনের দুশমন, আসমান জমিনে তাদের জন্যে পলায়নের কোনো স্থান নেই, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ "আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক বা বন্ধু নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।"

অর্থাৎ আসমানি জমিনী বালা-মসিবত থেকে রক্ষাকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নেই, আর তিনিই যখন রক্ষা করবেন না, তবে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু তাদের কোনো অভিভাবক নেউ, সাহায্যকারী নেই, তাই জমিনে বা আসমানে এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে- জমিনে বা আসমানে কোথাও কাফেরদের জন্যে পলায়নের বা আত্মগোপন করার কোনো আশ্রয়স্থল নেই, যেখানে তারা আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং আজাবকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পাবে। আর এ আয়াতাংশে ঘোষণা করা হয়েছে- কাফেররা শুধু যে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না, তাই নয়; বরং তাদের এমন কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই, যারা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আসমানি জমিনী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে। কাফের, মুশরিক ও মুরতাদ-নাস্তিকদেরকে মানুষের হাত থেকে হয়তো অন্য মানুষ রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে; কিন্তু আল্লাহ পাকের আজাব থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারে না; বরং যারা এমন হতভাগাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তারাও ধ্বংস হয়। -[তাফসীর রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯]

অনুবাদ :

٢٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ وَالْبَعْثِ اُولٰۤئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ اَىْ جَنَّتِىْ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ مُؤْلِمٌ ـ

২৩. যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে অর্থাৎ কুরআন ও পুনরুত্থানকে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয় অর্থাৎ আমার জান্নাত হতে আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক।

٢٤. قَالَ تَعَالٰى فِىْ قِصَّةِ اِبْرَاهِيْمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ط الَّتِىْ قَذَفُوْهُ فِيْهَا بِاَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَّسَلَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ اِنْجَائِهٖ مِنْهَا لَاٰيٰتٍ هِىَ عَدَمُ تَاْثِيْرِهَا فِيْهِ مَعَ عَظْمِهَا وَاِخْمَادُهَا وَاِنْشَاءُ رَوْضٍ مَكَانِهَا فِىْ زَمَنٍ يَسِيْرٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ يُصَدِّقُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

২৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন– উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় শুধু এই বলল, একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর; কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল। এভাবে যে, সেটাকে তার জন্য শীতল ও শান্তিময় করে দিলেন। এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ অগ্নি হতে তাঁকে পরিত্রাণদানের মধ্যে নিদর্শন বিরাট অগ্নিকুণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না হওয়া এবং তা নির্বাপিত হয়ে যাওয়া এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের স্থলে অতি অল্প সময়েই তা বাগিচায় পরিণত হয়ে যাওয়া। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী, কেননা তারাই এর দ্বারা লাভবান হয়ে থাকে।

٢٥. وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا تَعْبُدُوْنَهَا وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ خَبَرُ اِنَّ وَعَلٰى قِرَاءَةِ النَّصْبِ مَفْعُوْلٌ لَهٗ وَمَا كَافَّةٌ الْمَعْنٰى تَوَادَدْتُمْ عَلٰى عِبَادَتِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ يَتَبَرَّأُ الْقَادَةُ مِنَ الْاَتْبَاعِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز يَلْعَنُ الْاَتْبَاعُ الْقَادَةَ وَمَاْوٰىكُمْ مَصِيْرُكُمْ جَمِيْعًا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ق مَانِعِيْنَ مِنْهَا ـ

২৫. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ তোমরা এর উপাসনা কর, আর مَا টা হলো মাসদারিয়া। مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে বাক্যাংশটি اِنَّ -এর খবর, আবার এক কেরাতে نَصَبْ -এর সাথে রয়েছে, তখন এটা মাফউলে লাহু হবে। আর مَا টি হলো مَاءْ كَافَّةْ ; আয়াতের অর্থ হলো– এই মূর্তিগুলোর উপাসনার কারণে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পার্থিব জীবনে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ তাদের অধীনস্থদের থেকে দায়িত্বমুক্ততা প্রকাশ করবে। এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে অভিশাপ দিবে। তোমাদের সকলের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। অগ্নি হতে রক্ষাকারী থাকবে না।

অনুবাদ :

٢٦. فَاٰمَنَ لَهٗ صَدَّقَ بِاِبْرَاهِيْمَ لُوْطٌ وَهُوَ ابْنُ اَخِيْهِ هَارَانَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ مِنْ قَوْمِىْ اِلٰى رَبِّىْ ط اَىْ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِىْ رَبِّىْ وَهَجَرَ قَوْمَهٗ وَهَاجَرَ مِنْ سَوَادِ الْعِرَاقِ اِلَى الشَّامِ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ.

২৬. তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন হযরত লূত (আ.) সে তাঁর ভাই হারূনের পুত্র ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমি দেশ ত্যাগ করছি আমার সম্প্রদায় থেকে আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেদিকে যেতে আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দেন এবং তিনি তার সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে ইরাকের পার্শ্ব ঘেষে সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করলেন। তিনি তো পরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তাঁর কর্মে।

٢٧. وَوَهَبْنَا لَهٗ بَعْدَ اِسْمَاعِيْلَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ بَعْدَ اِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ فَكُلُّ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَالْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ اَىِ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَالزَّبُوْرَ وَالْقُرْاٰنَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِىْ كُلِّ اَهْلِ الْاَدْيَانِ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى.

২৭. আমি তাঁকে দান করলাম ইসমাঈলের পরে ইসহাক এবং ইয়াকূবকে ইসহাকের পরে এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর আগমনকারী প্রত্যেক নবীই তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং কিতাব এখানে كُتُبْ টি كِتَابْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও আল কুরআন। এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে উল্লেখ করে। আর আখিরাতেও তিনি নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন। যাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

٢٨. وَ اذْكُرْ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اَىْ اِدْبَارَ الرِّجَالِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ . اَلْاِنْسِ وَالْجِنِّ.

২৮. এবং স্মরণ করুন হযরত লূত (আ.)-এর কথা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা তো اَئِنَّكُمْ -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে উভয় সুরতে উভয় স্থানে আলিফ বৃদ্ধি করে। এমন অশ্লীল কর্ম করছ অর্থাৎ পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হও। যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। মানব ও দানব হতে কেউ।

অনুবাদ :

২৯. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ طَرِيْقَ الْمَارَّةِ بِفِعْلِكُمْ الْفَاحِشَةِ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمَمَرَّ بِكُمْ وَتَأْتُونَ فِيْ نَادِيْكُمْ مُتَحَدِّثِكُمُ الْمُنْكَرَ ط فِعْلَ الْفَاحِشَةِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ - فِيْ اِسْتِقْبَاحِ ذٰلِكَ وَاَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ لِفَاعِلِيْهِ -

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক। তোমরা পথ অতিক্রমকারীদের সাথে নির্লজ্জ কর্মে লিপ্ত হচ্ছ এবং মুসাফিরের পথে প্রতিবন্ধক হচ্ছ। ফলে লোকেরা তোমাদের পথ পরিহার করেছে। তোমরাই তো নিজেদের কথাবার্তার মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক অশ্লীল কর্ম একে অপরের সাথে। উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। এটাকে মন্দ কর্ম গণ্য করার ব্যাপারে। এবং এ ব্যাপারে যে, এ কর্ম সম্পাদনকারীর উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হবে।

৩০. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِتَحْقِيْقِ قَوْلِيْ فِيْ اِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ - الْعَاصِيْنَ بِاِتْيَانِ الرِّجَالِ فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ.

৩০ তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে সাহায্য করুন। শাস্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে আমার বক্তব্যকে সত্যায়ন করার মাধ্যমে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার মাধ্যমে আবাধ্যাচরণকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَيْ الْقُرْاٰنِ وَالْبَعْثِ : এখানে اَلْقُرْاٰنُ দ্বারা اٰيَاتٌ-এর তাফসীর করা হয়েছে। আর اَلْبَعْثُ দ্বারা لِقَائِهٖ-এর তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَئِسُوا مِنْ رَّحْمَتِيْ : অর্থাৎ এরা হলো সে সকল লোক যারা কিয়ামতের দিন আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। এটা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে مَاضِيْ-এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ : এখানে حَرْفُ تَرْدِيْد তথা اَوْ-এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আম্বিয়াতে শুধু মাত্র حَرِّقُوْهُ উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ কি?

জবাব : এখানে মূলত তাদের পরামর্শের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আম্বিয়াতে তাদের পরামর্শের পর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّتِيْ قَذَفُوْهُ فِيْهَا : মুফাসসির (র) এই ইবারতের মাধ্যমে উহ্য বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মূল ইবারত হলো– فَقَذَفُوْهُ فِى النَّارِ فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ

আর بَعْدَ اِنْجَائِهٖ مِنَ النَّارِ -এর এর- فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ এর আতফ- وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ

قَوْلُهٗ اِنْ مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا : এর মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি তারকীব হতে পারে–

প্রথম তারকীব : مَا হলো مَوْصُوْل যা اَلَّذِيْ অর্থে হয়েছে। আর عَائِدْ হলো উহ্য। আর তা اِتَّخَذْتُمْ-এর প্রথম মাফউল। আর اَوْثَانًا হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর مَوَدَّةَ হলো اِنْ-এর খবর। মূল ইবারত হলো– اِنَّ الَّذِيْ اتَّخَذْتُمُوْهُ আর এই সূরতে مَوَدَّةٌ-কে اَوْثَانًا-এর উপর মুবালাগা স্বরূপ হামল করা হবে। আর مَوَدَّةٌ-এর পূর্বে ذَوْ উহ্য মানা হবে। তবেই حَمْل বৈধ হবে। আর مَوَدَّةٌ-এর উপর নসব হওয়ার সূরতে اِنْ-এর খবর উহ্য থাকবে। মূল ইবারত হবে- اَلَّذِيْ اتَّخَذْتُمُوْهُ اَوْثَانًا لِاَجَلِ الْمَوَدَّةِ لَا يَنْفَعُوْكُمْ -

দ্বিতীয় তারকীব : مَا টা হলো كَافَّةٌ যা اِنَّ-কে আমল করা হতে বিরত রেখেছে। আর اَوْثَانًا হলো اِتَّخَذْتُمْ-এর মাফউলে বিহী,যদি اِتَّخَذْتُمْ-কে مُتَعَدِّيْ بِيَكْ مَفْعُوْل ধরা হয়। আর যদি مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْل ধরা হয় তবে দ্বিতীয় মাফউল হলো مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর যদি مَوَدَّةَ-কে মারফূ পড়া হয় তবে তা উহ্য মুবতাদা هِيَ-এর খবর হবে। অর্থাৎ هِيَ مَوَدَّةٌ-এ সুরতে বাক্যটি اَوْثَانًا-এর সিফত হবে। আবার এটা جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهٌ-ও হতে পারে। আর যদি مَوَدَّةٌ-এর উপর নসব পড়া হয় তবে তা اِتَّخَذْتُمْ-এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ হবে। আবার উহ্য اَعْنِيْ-এর কারণেও মানসূব হতে পারে।

তৃতীয় তারকীব : مَا-কে মাসদারিয়া মানা হবে। এরপর দুই সুরত হবে। হয়তো اِتِّخَاذْ-এর পূর্বে سَبَبْ মুযাফ উহ্য মানা হবে। তখন উহ্য ইবারত হবে– اِنَّ سَبَبَ اِتِّخَاذِكُمْ اَوْثَانًا مَوَدَّةٌ আবার এটাও হতে পারে যে, মুযাফ উহ্য মানা হবে না; বরং মুবালাগা স্বরূপ اِتِّخَاذْ-কেই مَوَدَّةٌ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আর مَوَدَّةٌ নসবের সুরতে খবর উহ্য থাকবে। যেমনটি প্রথম সুরতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَلْمَعْنٰى : উল্লিখিত কেরাতের মূল অর্থ হলো এই প্রতিমাগুলোর উপাসনার কারণেই তোমরা ঐকমত্য হয়ে পড়েছ।

قَوْلُهٗ صَدَّقَ بِاِبْرَاهِيْمَ : অর্থাৎ হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করেছেন। এটা নয় যে, نَفْس اِيْمَانْ-এর সত্যায়ন করেছেন। কেননা হযরত লুত (আ.) তো মুমিন ছিলেন। আয়াতে لُوْطٌ শব্দটির উপর ওয়াকফ আব্যশ্যক।

قَوْلُهٗ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَبِّيْ : ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংশয়ের উত্তর দান। আর তা হলো اِلٰى رَبِّيْ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক প্রমাণিত হয়। অথচ جِهَاتٌ বা দিক হতে তিনি পবিত্র। তাই اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَبِّيْ বলে এরই জবাব দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ سَوَادُ الْعِرَاقِ : এর অর্থ হলো তার কিনারা, পার্শ্ব। বলা হয় سَوَادُ الْبَلَدِ অর্থাৎ শহরের পার্শ্ব বা কিনারা।

قَوْلُهٗ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : এর অর্থ হলো اَلصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা– ১. তাওহীদ ২. আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে– "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং কাফেদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর আজাব।" ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাওহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনেও বিশ্বাস করে না, তারাই সেসব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ, তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শিরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। আর যে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা : যারা আল্লাহ পাকের কথা মানে না, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না এবং একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে– একথাও বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে না। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর এ কথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ– জান্নাত। অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কাফের, মুশরিক ও মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখিরাতে আল্লাহ পাকের রহমত তথা জান্নাত থেকে মাহরুম হবে। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তি।

পক্ষান্তরে, মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতের প্রতি তথা আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে।

আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন– رَحْمَتِيْ অর্থাৎ আমার রহমত। পক্ষান্তরে আজাবের ঘোষণায় বলেছেন– لَهُمْ عَذَابٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আজাব।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আজাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা তাঁর রহমত অনন্ত অসীম। –[তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দরদভরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্য পেশ করছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি তাঁর কথায় আদৌ কর্ণপাত করেনি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠে, তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের একই দাবি– হয়তো ইবরাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুত যারা যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা তারা এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি করেছিল।

قَوْلُهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি সিদ্ধান্ত করল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে ফেলবে, এক জাতীয় অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাঁকে তাতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তিনি অগ্নিকে নির্দেশ প্রদান করলেন– يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হে অগ্নি! তুমি শীতল হও এবং ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক হও।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ নশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। বস্তুত আল্লাহ পাক কিভাবে তাঁর প্রিয় বান্দাগণের হেফাজত করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনায়।

দ্বিতীয়ত বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরূদের তৈরি করা অগ্নিকুণ্ড পুড়তে পারেনি। কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপদেশেরই বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোনো সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অসুন্দর কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করছো। এর পেছনে কোনো যুক্তি যে নেই, একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তিপূজা করছো। অথচ কিয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয়; বরং কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে লানত দেবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি অনুরক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অপব্যবহারই মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিকতার মূলভিত্তি। সাধরণত দেখা যায় কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই; বরং এর দ্বারা একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। শুধুমাত্র পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

এরপর তাদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন– وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ অর্থাৎ "আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোজখ।" অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা হবে দোজখ। "আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না" যারা তোমাদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার উদ্দেশ্যে, পরস্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তিপূজা কর, মনে রেখো যে, তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, এটা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই। এরপর এ সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত কিয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদের পরস্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে–

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করবে আর একে অন্যকে লা'নত দেবে।

قَوْلُهُ فَاٰمَنَ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ : হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাগিনা। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মুজেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি তাঁর চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন– اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোনো জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোনো বাধা নেই।

হযরত নাখায়ী ও কাতাদা (র.) বলেন– اِنِّىْ مُهَاجِرٌ বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ তো নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোনো কোনো তাফসীরকার اِنِّىْ مُهَاجِرٌ-কে হযরত লূত (আ.)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তাফসীরই উপযুক্ত। উল্লেখ্য যে, হযরত লূত (আ.)-ও এই হিজরতে শরিক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আ.)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম পয়গাম্বর, যাকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো কর্মের প্রতিদান দুয়িাতেও পাওয়া যায় : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا। অর্থাৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদি, খ্রিস্টান ও প্রতিমাপূজারী- সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদেরকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে বহু সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ৭৫৯-৬০]

দুনিয়াতে বৃদ্ধকালে তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ছিল। এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালত তাঁর বংশে সংরক্ষিত থাকা তাঁর প্রতি মহাসম্মান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তাফসীরকার সুদ্দী (র.)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, দুনিয়াতে উত্তম বিনিময় বা اَجْرٌ -এর অর্থ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে সর্বদা নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত থাকা, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ- সকলের নিজেদের ধর্মকে দীনে ইবরাহীমী দাবি করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা, যেমন- নামাজের তাশাহহুদের শেষে তা উল্লেখ করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, যা কিছু ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে নিয়ামত দান করেছিলেন তা হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করার তাওফীক এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে তিনি বিশেষ স্বাদ লাভ করতেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৬৯-৭০]

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন সে সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তা হলো তাঁকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নাজাত দেওয়া এবং জালেম নমরূদের হাত থেকে রক্ষা করা।

তাফসীরকার ইবনে জুরায়েজ (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে উত্তম বিনিময় দান করেছেন, তা হলো বৃদ্ধকালে তাঁর পুত্র সন্তান লাভ, দ্বিতীয়ত তাঁর বংশেই নবুয়ত সংরক্ষিত রাখা।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, সেই নিয়ামত হলো তিনি দুনিয়াতে থাকতেই তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দুনিয়াতেই যে বিনিময় দান করেছেন তা হলো আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাওফীক -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০ পৃ. ১৫২-৫৩]

قَوْلُهٗ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান এবং মর্যাদা শুধু যে দুনিয়াতেই রয়েছে তা নয়; বরং আখিরাতেও তিনি শীর্ষস্থানীয়, মহাসম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সংবর্ধনা লাভ করবেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এটি আল্লাহ পাকের অত্যন্ত বড় নিয়ামত যে, তাওহীদ ও আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রচারে তাঁর বংশধরগণ যুগ যুগ ধরে আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন অতি ভাগ্যবান, আর আখিরাতে তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতে তাঁর কোনো প্রিয় বান্দাকে কোনো বিশেষ নিয়ামত দান করেন, তবে তা তাঁর আখিরাতের মর্যাদা কম করার কারণ হয় না। হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ.৭৮৩]

قَوْلُهُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ : হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে এসেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে 'সুদম' নামক শহর এবং তার উপকণ্ঠের জন্যে নবী করে প্ররণ করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা এতো অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছো যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি।"

আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তারা জঘন্যতম ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতো, তারা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধ পন্থায় যৌন সম্ভোগ করতো, শুধু তাই নয়; তারা ডাকাতি রাহাজানি, করতো মানুষের পথ রোধ করে তাদের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করতো।

এখানে হযরত লূত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. পুংমৈথুন ২. রাহাজানি এবং ৩. মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কুরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোনো গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। কোনো কোনো তাফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উম্মে হানী (রা.)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপন নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। [না'উযুবিল্লাহ]

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চেয়েও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

–[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৬, পৃ. ৭৬২-৬৩]

আল্লামা বগভী হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি এবং আরজ করেছি, তারা কোন মন্দ কাজটি করতো? তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তারা সদর রাস্তার উপরেই তাদের সভা অনুষ্ঠান করতো, মানুষের গতিরোধ করতো, তাদের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপ করতো। –[আহমদ, তিরমিযী]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, লূত সম্প্রদায় সদর রাস্তার উপর তাদের আসর জমিয়ে বসতো, প্রত্যেকের নিকট একটি পাত্র থাকতো, তাতে ছোট ছোট পাথর রাখা হতো, যখন কোনো পথচারীকে দেখতো, তখন একে অন্যকে বলতো শিকার কর। এরপর ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতো। যার পাথর ঐ ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করত ঐ পথিক পাথর নিক্ষেপকারীর মতো হয়ে যেত, তখন সে তার সব ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতো, এরপর সে তার সাথে অশ্লীল কাজ করতো, অবশেষে তাকে মাত্র তিন দেরহাম দিয়ে বিদায় দিত।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, তারা প্রকাশ্য সভায় বসে উচ্চৈঃস্বরে উদরের বাতাস বের করতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, তারা একে অন্যের প্রতি থুথু দিত।

মাকহুল (র.) বলেছেন, তারা মজলিসের মধ্যেই নগ্ন হয়ে যেত, মানুষের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতো এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো। তাই হযরত লূত (আ.) এ দুর্বৃত্তদের হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণে রাজি হয়নি; বরং তারা হযরত লূত (আ.)-কে বলেছে, তোমার এসব উপদেশ রাখ, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো! এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে– فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু একথা বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। অর্থাৎ তুমি যে আজাবের হুমকি দিচ্ছ তা নিয়ে এসো, যদি তুমি তোমার নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হও, অথবা আজাবের দাবিতে

সত্যবাদী হও, অথবা আমাদের কর্মকে মন্দ বলার ব্যাপারে যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ পাকের আজাব নিয়ে এসো!
-[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দূ), পারা ২০, পৃ. ৫৯, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭০-৭১]

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ : অর্থাৎ "আর আমি তাঁকে ইসহাক এবং ইয়াকূব দান করি এবং তাঁর বংশে নবুয়ত রেখে দেই এবং আসমানি কিতাব দান করি; আর তাঁকে পৃথিবীতেই উত্তম বিনিময় দান করি; আর নিশ্চয় সে আখিরাতেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হিজরতের পর সিরিয়ায় সুসন্তান দান করেন, যাতে করে তাদেরকে দেখে তাঁর নয়ন ও মন তৃপ্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কথা আয়াতে উল্লেখ করা হইনি; কারণ এ হিজরতের সফরে তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে ছিলেন না। আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁদেরকে ইতিপূর্বেই মক্কার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসা হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)-এর চৌদ্দ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

মোটকথা, হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নেক সন্তান দান করেন এবং এ কথাও ইরশাদ করেন যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে নবুয়ত এবং আসমানি কিতাব রেখে দিয়েছি। অর্থাৎ আগামীতে যাঁরা এ নবুয়তের নিয়ামত ও আসমানি কিতাব লাভ করবেন, তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরই হবেন।

সুতরাং নবুয়ত প্রথম পর্যায়ে বনী ইসরাঈলে [হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধারায়] ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে বনী ইসমাঈলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রেরিত হন এবং তাঁর উপরই নবুয়তের আগমন-ধারা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং কুরআন– এ সকল কিতাব সমন্বিতভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশেই নাজিল হয়। আর যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশেই নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত ছিল, তাই তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা 'নবীগণের পিতা' বলে উল্লেখ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশ ব্যতীত একজন নবীও অন্য কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে اَلْمُفْسِدِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো অশান্তি সৃষ্টিকারী। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আজাব হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, 'সাদূম' নামক শহরের অদিবাসীরা অস্বভাবিক পন্থায় পুরুষের যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে, তা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। দ্বিতীয়ত হযরত লূত (আ.) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা বলেছেন, তখন তারা বিদ্রূপ করে বলেছে, "আজাব এখনই নিয়ে এসো"। তাই তাদের প্রতি আজাব ত্বরান্বিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ২০ পৃ. ১৫৪, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭১]

অনুবাদ :

৩১. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ بَعْدَهُ قَالُوْا إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ط أَيْ قَرْيَةِ لُوْطٍ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ كَافِرِيْنَ ـ

৩১. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট আসলেন ইসহাকের এবং তারপর ইয়াকুবের তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব। অর্থাৎ হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে এর অধিবসীরা তো জালিম কাফের।

৩২. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا أَيِ الرُّسُلُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ز لَنُنَجِّيَنَّهُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ ـ

৩২. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, এই জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বললেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। সেথায় কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবই। তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত لَنُنَجِّيَنَّهُ শব্দটি তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে তো শাস্তির উপযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৩. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِأَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوْهِ فِى صُوْرَةِ أَضْيَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِمْ قَوْمَهُ فَاعْلَمُوْهُ بِأَنَّهُمْ رُسُلُ رَبِّهِ وَقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف إِنَّا مُنَجُّوْكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَنَصْبُ أَهْلَكَ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ الْكَافِ ـ

৩৩. এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-এর নিকট আসলেন, তখন তাদের জন্য তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন তাদের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। কেননা আগত মেহমানগণ খুবই সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন, সেহেতু তাদের ব্যাপারে স্বীয় সম্প্রদায় থেকে আশঙ্কা করতে লাগলেন, তখন তারা তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। তাঁরা বললেন, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব; তবে আপনার স্ত্রীকে ব্যতীত مُنَجُّوْكَ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। كَافْ-এর مَحَلْ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে أَهْلَكَ শব্দটি নসবযুক্ত হয়েছে।

৩৪. إِنَّا مُنْزِلُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ عَلٰى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا بِالْفِعْلِ الَّذِىْ كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ بِهِ أَىْ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ ـ

৩৪. আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাজিল করব مُنْزِلُوْنَ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কারণ তারা পাপাচার করছিল। অর্থাৎ তাদের ফিসক তথা পাপাচারের কারণে।

৩৫. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً ظَاهِرَةً هِىَ اٰثَارُ خَرَابِهَا لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ ـ

৩৫. আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি অর্থাৎ তাদের অবস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিহ্নসমূহ। বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা চিন্তাভাবনা করে।

অনুবাদ :

٣٦. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ اِخْشَوْهُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِىَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ -

৩৬. এবং আমি পাঠিয়েছিলাম মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা হযরত শুয়াইব (আ.)-কে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর। আর তা হলো কিয়ামতের দিন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটা তার আমেল عَثِىَ [ثَاءْ বর্ণে যেরযুক্ত] হতে حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ হয়েছে যা اَفْسَدَ অর্থে হয়েছে।

٣٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ - بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ -

৩৭. কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো اَلرَّجْفَةُ শব্দের অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

٣٨. وَ اَهْلَكْنَا عَادًا وَّثَمُوْدَا بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ بِمَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيْلَةِ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ اِهْلَاكُهُمْ مِنْ مَّسٰكِنِهِمْ قف بِالْحِجْرِ وَالْيَمَنِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ سَبِيْلِ الْحَقِّ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - ذَوِىْ بَصَائِرَ -

৩৮. এবং আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ ও ছামূদকে এ শব্দ দুটি غَيْرُ مُنْصَرِفٌ এবং مُنْصَرِفٌ উভয়ই হতে পারে। اَلْحَىُّ অর্থে হলে مُنْصَرِفٌ হবে, আর اَلْقَبِيْلَةُ অর্থে হলে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হবে। তাদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিজর এবং ইয়েমেনে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল কুফর ও অবাধ্যাচরণকে এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। অভিজ্ঞ।

٣٩. وَ اَهْلَكْنَا قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ قف وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ج فَائِتِيْنَ عَذَابَنَا -

৩৯. এবং আমি সংহার করছিলাম কারূন, ফেরাউন ও হামানকে, তাদের নিকট এসেছিলেন হযরত মুসা (আ.) ইতিপূর্বে, সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ। তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

অনুবাদ :

٤٠. فَكُلًّا مِنَ الْمَذْكُورِيْنَ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ج فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ج رِيْحًا عَاصِفًا فِيْهَا حَصْبَاءُ كَقَوْمِ لُوْطٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ج كَثَمُوْدَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ج كَقَارُوْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا ج كَقَوْمِ نُوْحٍ وَفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَيُعَذِّبَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ ـ

৪০. তাদের প্রত্যেককেই উল্লিখিতদের মধ্য হতে আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা অর্থাৎ ঝঞ্ঝা বায়ু যাতে ছিল কঙ্কর। যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর। তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ যেমন ছামূদ সম্প্রদায়ের উপর। কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে যেমন কারূন এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত যেমন নূহ সম্প্রদায় এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি যার ফলে তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই শাস্তি দিবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

٤١. مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ اَىْ اَصْنَامًا يَرْجُوْنَ نَفْعَهَا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط لِنَفْسِهَا تَاْوِىْ اِلَيْهِ وَاِنَّ اَوْهَنَ اَضْعَفَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ لَا يَدْفَعُ عَنْهَا حَرًّا وَلَا بَرْدًا كَذٰلِكَ الْاَصْنَامُ لَا تَنْفَعُ عَابِدِيْهَا لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا عَبَدُوْهَا ـ

৪১. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে; যাদের থেকে কল্যাণ ও উপকারের আশা পোষণ করে থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় যাতে সে অবস্থান করবে, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম। সেই ঘর তো তার থেকে গরম ও ঠাণ্ডা কোনো কিছুকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। অনুরূপভাবে মূর্তিগুলোও, সে তার উপাসকদেরকে কেনো ধবনেরই উপকার করতে সক্ষম হবে না। যদি তারা জানত। এ ব্যাপারে, তবে তারা মূর্তির উপাসনা করত না।

٤٢. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُوْنِهِ غَيْرِهِ مِنْ شَىْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ ـ

৪২. তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহবান করে, আল্লাহ তো তা জানেন مَا শব্দটি اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত। আর يَدْعُوْنَ শব্দটি يَاءْ এবং تَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজত্বে প্রজ্ঞাময় স্বীয় কাজ-কর্মে।

অনুবাদ :

٤٣. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ فِى الْقُرْاٰنِ نَضْرِبُهَا نَجْعَلُهَا لِلنَّاسِ ج وَمَا يَعْقِلُهَا اَىْ يَفْهَمُهَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ الْمُتَدَبِّرُوْنَ.

৪৩. এ সকল দৃষ্টান্ত কুরআনে আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গই এটা বুঝে।

٤٤. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اَىْ مُحِقًّا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً دَلَالَةً عَلٰى قُدْرَتِهِ تَعَالٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ. خَصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا فِى الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ.

৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার উপর দিকনির্দেশনা। মুমিনদের জন্য। মুমিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো এ দলিল প্রমাণ দ্বারা মুমিনগণই উপকৃত হন। কাফেরদের বিপরীতে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ : সুরা হূদের মধ্যে দু'টি বিষয়ের সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ এবং লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সংবাদ। কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে একটিকেই উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন পূর্বের বিস্তারিত বিবরণের কারণে اِجْمَالْ -এর উপর নির্ভর করেছেন। জামালাইন গ্রন্থকারের মতে, بَعْدَهٗ -এর পরিবর্তে ব্যাখ্যাকার যদি وَلَدَهٗ বলতেন, তবে তা অধিক উপযুক্ত হতো। কেননা হযরত ইয়াকূব (আ.) হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। بَعْدَهٗ -এর যমীর হযরত ইসহাক (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত ইসহাক (আ.)-এর পরে হযরত ইয়াকূত (আ.)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র। অথচ হযরত ইয়াকূব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র ছিলেন।

قَوْلُهُ قَرْيَةِ لُوْطٍ : এই জনপদের নাম ছিল 'সাযূম'। -[জুমাল]

কারো কারো মতে এর নাম ছিল 'সাদূম। এটা ছিল লূত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় স্থান। হযরত লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন।

قَوْلُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ : এর অর্থ হলো- فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ الْاَزَلِىْ

قَوْلُهُ سِيْئَ بِهِمْ : এর তাফসীর حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, سِيْئَ -এর যমীরের مَرْجِعْ হলেন হযরত লূত (আ.)। আল্লামা কাজী বায়যাভী (র.) سِيْئَ -এর যমীরের مَرْجِعْ নির্ধারণ করেছেন مَسَاءَةٌ মাসদারকে। অর্থাৎ- جَاءَتِ الْمَسَاءَةُ بِهِمْ ; কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, بِهِمْ -এর بَاءْ টি سَبَبِيَّةٌ

قَوْلُهُ صَدْرًا : ذَرْعًا -এর তাফসীর صَدْرًا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حَاصِلْ مَعْنٰى -এর মাধ্যমে এই তাফসীর করা হয়েছে। অন্যথায় ذَرْعًا -এর অর্থ হলো- শক্তি ও বল। আর ذَرْعًا টা ضَاقَ -এর নিসবতে تَمْيِيْزْ হয়েছে। যা فَاعِلْ থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। মূল ইবারত হলো- ضَاقَ اَمْرُهٗ بِهِمْ

قَوْلُهُ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ : لِقَوْمٍ -এর সম্পর্ক হয়তো تَرَكْنَا -এর সাথে হবে অথবা بِآيَةٍ -এর সাথে হবে অথবা بَيِّنَةٍ -এর সাথে হবে। আর এ তিনটির মাঝে তৃতীয়টি অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ : رَجَاءٌ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো আশা-আকাঙ্ক্ষা। কারণ অধিকাংশ মুফাসসির এটাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। এর একটি অর্থ ভয়ও রয়েছে। মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় করো। প্রথম সুরতে উদ্দেশ্য হবে– তোমরা পরকালের পুণ্যের আশা করো।

قَوْلُهُ مِنَ الْعَثْىِ : এটা বাবে سَمِعَ ও نَصَرَ হতে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো– বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ مُفْسِدِيْنَ : এটা لَا تَعْثَوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ হয়েছে। কেননা عَثِىَ অর্থ হলো اَفْسَدَ ; যেন এটা اَبُوْكَ عَطُوْفًا -এর মতো।

قَوْلُهُ الرَّجْفَةُ : এর অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। সূরা হূদে রয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ; এই উভয়টির মধ্যে কোনো দূরত্ব ও পার্থক্য নেই। অথচ ঘটনা একই। অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.)-এর চিৎকারের কারণে সম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং কম্পনের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এক স্থানে ধ্বংস হওয়ার সম্পর্ক سَبَبْ তথা صَيْحَةٌ -এর দিকে করা হয়েছে। অন্যত্র مُسَبَّبْ তথা رَجْفَةٌ -এর দিকে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ : এ উভয়টির সম্পর্ক শুধুমাত্র ثَمُوْدُ -এর সাথে হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْحَجَرِ : এটা একটি উপত্যকার নাম। যা মদীনা ও সিরিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত। এটা ছামূদ সম্প্রদায়ের জনপদ ছিল। আর ইয়েমেনে আদ সম্প্রদায়ের আবাস ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর আজাবে নিপতিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ ذَوِىْ بَصَائِرْ : এর অর্থ– অভিজ্ঞ, জ্ঞানী। অর্থাৎ তারা কোনো পাগল বা মাতাল নয়। পার্থিব কাজ-কর্মে তারা খুবই হুশিয়ার ছিল। তারা যদি ইচ্ছা করত তবে পরকালীন বিষয়েও স্বীয় জ্ঞান গরিমা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা কাজ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু পার্থিব লোভ ও সাম্প্রদায়িকতা তাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে রেখে ছিল।

قَوْلُهُ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ : এখানে কারূনকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মন্দচারিতা ও অহঙ্কারের ক্ষেত্রে ফেরাউন কারূন থেকেও এগিয়ে ছিল। যেহেতু কারূন হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে এক ধরনের মর্যাদার অধিকারী ছিল। এ কারণেই কারূনকে ফেরাউনের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَنْكَبُوْتَ : بَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ দ্বারা মাকড়সার জাল উদ্দেশ্য। মাকড়সা কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। এখানে সেই মাকড়সা উদ্দেশ্য, যারা সাধারণত মানুষের বসত ঘরে জাল বুনে। এরা খুবই অল্পতুষ্টে সন্তুষ্ট প্রাণী, স্বীয় নির্মিত জালে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসে থাকে, এ কারণেই খুবই লোভী প্রাণী যথা মাছিকে তার খাদ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের জালে আটকে গিয়ে তাদের খাদ্যে পরিণত হয়। عَنْكَبُوْتٌ শব্দটিতে نُوْنٌ হলো আসলী নূন এবং وَاوْ আর تَاءٌ হলো অতিরিক্ত। এ কারণেই এর বহুবচন عَنَاكِبُ আসে আর تَصْغِيْر হলো عُنَيْكِيْبٌ ; এটা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে স্ত্রীলিঙ্গে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مَا عَبَدُوْهَا : এটা لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর جَزَاءٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ : এটা হলো يَعْلَمُ -এর মাফউল। অর্থাৎ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَهُمْ আবার কেউ কেউ مَا -কে اِسْتِفْهَامِيَّةٌ تَوْبِيْخِيَّةٌ -ও বলেছেন। এ সুরতে يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْئٍ বাক্যটি এবং এটা وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হবে।

قَوْلُهُ مُحِقًّا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بِالْحَقِّ -এর মধ্যকার جَارْ مَجْرُوْرْ টা مُلَابَسَتْ -এর জন্য হয়েছে এবং এটা اَللّٰهُ শব্দ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ– مُحِقًّا غَيْرُ قَاصِدٍ بِهِ بَاطِلًا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْئَ بِهِمْ : আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে কথা বলার পর প্রিয়দর্শন আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানের আকৃতি ধারণ করে লূত (আ.)-এর নিকট হাজির হয়। হযরত লূত (আ.) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেননি, তাই তাদেরকে দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কেননা যদি সমাগত মেহমানদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে দেন, তবে কাফেররা খবর পেয়ে হাজির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেবে, আর যদি তাদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে না দেন তবুও কাফেররা তাদের পেছনে পড়বে এবং তাদের চরম কষ্টের কারণ হবে। কেননা তাঁর জাতির ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লূত (আ.)-এর এ ব্যাকুলতা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন- لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ অর্থাৎ "আপনি করবেন না, চিন্তিতও হবেন না; নিশ্চয় আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তবে আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

قَوْلُهُ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ : অর্থাৎ আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আজাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। এতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই যে, কাফেররা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি দেওয়ার জন্যে তথা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমরা হাজির হয়েছি।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, رِجْز-এর অর্থ হলো জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া, জমিনকে উল্টিয়ে দেওয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) 'সাদুম' নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে এ দুরাত্মা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন। তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হলো আর তাদের প্রতি পাথরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আজাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ : বস্তুত যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধানকে উপেক্ষা করে, তাদের পরিণাম এভাবেই শোচনীয় হয়। এ পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা এমনি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অনাগত ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এ ঘটনাটি হয়েছে অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) বলেছেন, এর অর্থ হলো লূত সম্প্রদায়ের সেই বিরাট জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষণীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اٰيَةً بَيِّنَةً তথা 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' বলা হয়েছে।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ পাথরগুলোকে অনেক দিন রেখে দিয়েছিলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলো দেখেছিলেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমিনের অভ্যন্তর থেকে যে কালো রং এর পানি বের হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাই এটি হলো 'সুস্পষ্ট নিদর্শন।'

قَوْلُهُ وَإِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ : হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাতুরা নাম্মী স্ত্রীর ঘরে মাদইয়ানের জন্ম। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ পাক হযরত শুয়াইব (আ.)-কে মাদয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো, কিয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে উৎপাত, উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্র করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর আখিরাতের আজাব হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী তাদের দৌরাত্ম্য এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫ পৃ. ৩৬৮]

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মাদায়েনবাসী লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত শুয়াইব (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করার, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি নাজিল হয়। ভূমিকম্প এসে তাদেরকে নিপাত করে। রাত্রি শেষ হওয়াব পূর্বেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এ অবস্থা হলো তাদের, যারা ধরাকে সরা মনে করতো, যারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করতো, আল্লাহর বিধান অমান্য করতো।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ : اِسْتِبْصَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– চক্ষুষ্মানতা। مُسْتَبْصِرٌ -এর অর্থ চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে করে আজাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোনো দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মজলুম বিপদগ্রস্ত ও কোণঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রুমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। সেখানকার আয়াতটি হচ্ছে– يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

قَوْلُهُ فَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ : মাকড়সাকে عَنْكَبُوْت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোনো কোনো মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সেই মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা

বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেত পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জালসদৃশ, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোনো প্রতিমা অথবা কোনো মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা : মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেওয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব বাগদাদী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা (র.) হযরত আলী (রা.) থেকেই বর্ণনা করেন যে- طَهِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ مِنْ نَسْجِ الْعَنْكَبُوْتِ فَاِنَّ تَرْكَهُ يُوْرِثُ الْفَقْرَ অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে এতে সংসারে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়াতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ : মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করেন। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় না।

আল্লাহর কাছে আলেম কে? ইমাম বগভী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলেই কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকে আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝেন।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন- تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ -[ইবনে কাসীর]